একটি নির্ভরযোগ্য কেশ তৈল
বেঙ্গল কেমিক্যালের
ক্যান্থারাইডিন হেয়ার অয়েল
ভেষজগুণ সম্পন্ন ক্যান্থারাইডিন হেয়ার অয়েল ব্যবহারে আপনার রেশম-কোমল ঘন কাল চুলের কোমলতা ও মসৃণতা অক্ষুণ্ণ রাখবে ও চুল পড়া বন্ধ করতে সাহায্য করবে।
বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর • দিল্লী

কিরণ
যেমন উজ্জ্বল তেমনি দীর্ঘায়ু
কিরণ ল্যাম্প পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ল্যাম্পগুলির সমকক্ষ। কারণ সর্বাধুনিক স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রে সেরা কাঁচামাল থেকে এগুলি তৈরি। এবং এর পেছনে রয়েছে দীর্ঘ ত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতাপ্রসূত কারিগরী দক্ষতা।
প্রস্তুতকারক : ভারত ইলেকট্রিক্যাল ইণ্ডাস্ট্রীজ লিঃ
১৯, রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-১
এজেন্ট : দি ওরিয়েণ্টাল মার্কেনটাইল কোং লিঃ
কলিকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ দিল্লী কানপুর
KIRON

ভারতবর্ষের সূচি

সপ্তপঞ্চাশত্তম বর্ষ—প্রথম খণ্ড—প্রথম সংখ্যা

আষাঢ়—১৩৭৫

লেখ-সূচী

লেখ-সূচী

লেখ-সূচী

প্রথম খণ্ড

প্রথম সংখ্যা,

সপ্তপঞ্চাশত্তম বর্ষ

ধর্ম ও বিজ্ঞান মহামিলনের পথে

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

'ধর্ম' শব্দের আক্ষরিক অর্থ—'যাহা ধারণ করে।' সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বে, বিভিন্নস্থানের মানবগণ—ঝড়,জল, বজ্রপাত, অগ্নি প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তি হইতে, এবং রোগ, শোক ও মৃত্যু হইতে—নিজেদের রক্ষা পাইবার জন্য, এক একটি অজানা শক্তির সন্ধান করিতে থাকেন। সেই শক্তি তাঁহাদিগকে ঐ সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারিবেন, অর্থাৎ তাঁহাদিগকে ধারণ করিতে পারিবেন, এই আশায় তাঁহারা সেই শক্তির উপাসনা করিতে থাকেন। ইহাই ধর্মের উৎপত্তির কারণ। এইভাবে, গাছ, পাথর প্রভৃতি পার্থিব দ্রব্যের, অগ্নি, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির, এবং পরে মৃত পূর্বপুরুষের উপাসনা আরম্ভ হয়। তবে, প্রথমের দিকে এক ঈশ্বরের ধারণা বা উপাসনা ছিল না, এবং সেই সকল আদিম ধর্মের ভিতর বিশেষ নৈতিক ভিত্তি ছিল না।

এইভাবে পৃথিবীর নানাস্থানে বহু ধর্ম স্থাপিত হয়, এবং ক্রমে ক্রমে,নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং এক-ঈশ্বর-

পৃথিবীতে সাধারণতঃ এগারটি ধর্মকে প্রধানধর্ম বলিয়া বিবেচনা করা হয়। সেইসকল ধর্ম ও তাহাদের উৎপত্তি-স্থান এইরূপ—
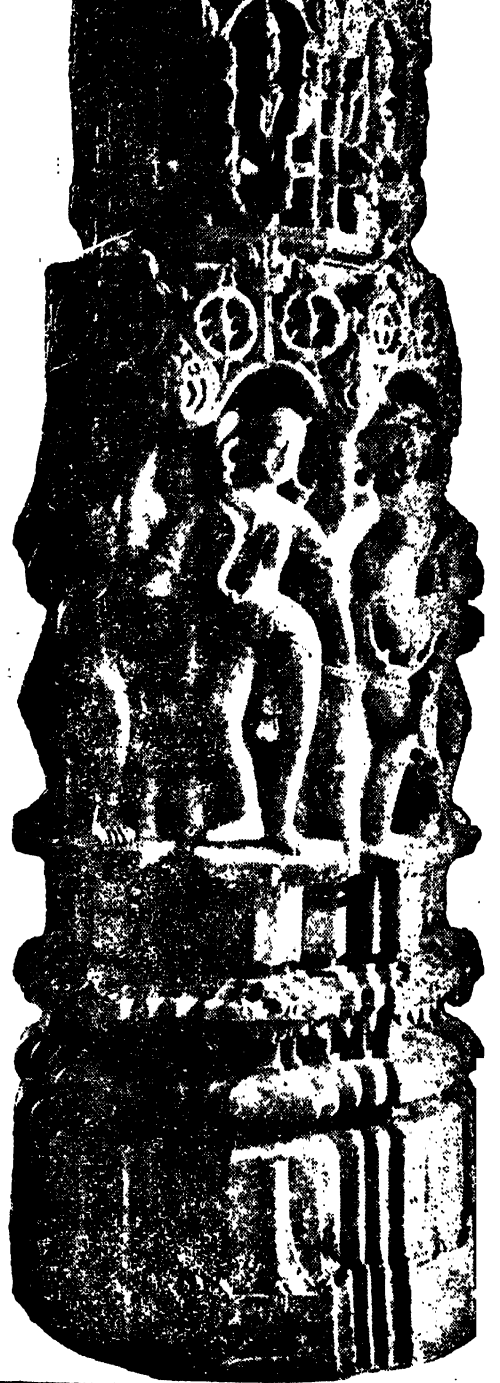
১। বর্তমান আকারের হিন্দুধর্ম, জৈন, বৌদ্ধ ও শিখ ধর্ম —দক্ষিণ এশিয়ায়, ভারতে। (মন্তব্য—আদি হিন্দুধর্ম উত্তর বা মধ্য এসিয়ায় উদ্ভূত হয়। পরে উহা উত্তর-পশ্চিম ভারতে আগমন করে, এবং তাহার পর বর্তমান হিন্দুধর্মের রূপ ধারণ করে।')

২। ইহুদি, পার্শী, খৃষ্ট ও ইসলাম ধর্ম—পশ্চিম এসিয়ায়, যথাক্রমে, প্যালেষ্টাইনে, পারস্য বা ইরান দেশে, প্যালেষ্টাইনে ও আরবে।

৩। তাও এবং কনফিউসিয় ধর্ম—মধ্য এসিয়ায়, চীনদেশে।

৪। সিন্টোধর্ম -পূর্ব এসিয়ায়, জাপানে। (মন্তব্য ইহাদের মধ্যে, জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম ভিন্ন অন্য নয়টি ধর্মের উপাস্য শক্তি হইতেছেন—এক ঈশ্বর।

'বিজ্ঞান' শব্দের আক্ষরিক অর্থ—"বিশেষ জ্ঞান'। ইহা দুই প্রকার—

১। আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান, যাহার সাহায্যে ঈশ্বরকে সঠিক ভাবে বুঝিতে পারা যায়, এবং

(২) পার্থিব বিজ্ঞান, যাহার সাহায্যে পার্থিব জগতে নানা প্রকার সুবিধা ও উন্নতি লাভ করা যায়। সাধারণতঃ বিজ্ঞান বলিতে পার্থিব জড় বিজ্ঞান বুঝায়। আমরা এই আলোচনায় বিজ্ঞান বলিতে পাশ্চাত্য জড় বিজ্ঞানের কথাই বলিতেছি। এই পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞান প্রায় আড়াই হাজার বৎসর ধরিয়া, নানা দেশের মানবগণের পার্থিব জীবনে নানা প্রকার সুবিধা ও উন্নতি প্রদান করিয়া আসিতেছে।

ধর্ম ও বিজ্ঞান অনুশীলন সত্বেও দুরবস্থা।

আমরা বহু শত বা বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া উপরোক্ত উৎকৃষ্ট ধর্ম অনুশীলন করিয়া আসিতেছি। তথাপি, ইহা অতি দুঃখের কথা যে, আমরা কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি দোষের অধীন হইয়া থাকায়, আমরা অধিকাংশ ব্যক্তি আজও ঐ সকল দোষে হিংস্র বন্য পশুর ন্যায় ব্যবহার করিয়া আসিতেছি।

আমরা আড়াই হাজার বৎসর ধরিয়া জড় বিজ্ঞান চর্চা করিয়া মানবের পার্থিব জীবনে নানা প্রকার সুবিধা ও উন্নতি সাধন করিয়াছি ইহা সত্য। তথাপি, ইহা অতি দুঃখের কথা যে, এই পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ ব্যক্তি আজিও, অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান-চিকিৎসা-শিক্ষা বিষয়ে অত্যন্ত অভাব ও দুঃখের মধ্যে জীবন কাটাইতেছেন। তদুপরি বৈজ্ঞানিকগণ আণবিক অস্ত্র আবিষ্কার ও নির্মাণ করায়, সারা পৃথিবীর সকল ব্যক্তি একটি ভীষণ আতঙ্কের মধ্যে জীবন কাটাইতেছেন। যে কোন মুহূর্তে আণবিক যুদ্ধ আরম্ভ হইতে পারে, এবং তাহা হইলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে, পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক মানুষ জীবন হারাইবেন।

'ধর্ম ও বিজ্ঞান অনুশীলন সত্বেও এই দুরবস্থার কারণ।

এই দুরবস্থার জন্য ধর্মানুশীলনকারীগণ এবং বৈজ্ঞানিক-গণ উভয়পক্ষই দায়ী, তবে বেশী দোষ ধর্মানুশীলন-কারীগণেরই।

ধর্মানুশীলনকারীগণের ত্রুটী।

প্রত্যেক ধর্মের অনুশীলনে কিছু না কিছু ত্রুটী আছে। কিন্তু অন্যের মনে আঘাত করা অনুচিত জানিয়া, অথচ ধর্মানু-শীলনের ত্রুটী সংশোধন করার জন্য এবং ধর্ম ও বিজ্ঞানের মিলনের উদ্দেশ্যে, আমি কেবল মাত্র আমার নিজ হিন্দুধর্মের ত্রুটীর সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি। প্রকৃত অবস্থা এই—

১। আমরা ধর্মের প্রকৃত তত্ত্ব জানিনা, অথবা তাহা জানিয়াও সেই প্রকৃতপথে ধর্মানুশীলন করি না। উপরোক্ত প্রত্যেকটি প্রধান ধর্মের মূল ভিত্তি হইতেছে নৈতিক জীবন যাপন। সত্য, প্রেম, পবিত্রতা প্রভৃতি নৈতিক পথে চলা, ধর্মানুশীলনে উন্নতির জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। ঈশ্বর সত্য, প্রেম ও পবিত্রতা স্বরূপ। তাঁহাকে লাভ করিতে হইলে আমাদের কর্তব্য (১) চিন্তায়, বাক্যে ও কার্যে সত্য পথ অবলম্বন করিতে হইবে, (২) প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি (এমন কি, পরম শত্রুর প্রতিও), তাঁহাকে ঈশ্বরের সন্তান মনে করিয়া, ভালবাসা প্রদর্শন করিতে হইবে, এবং প্রকৃত ভাল ব্যবহার করিতে হইবে, এবং (৩) আমাদের দৈনন্দিন জীবনে, মনে ও কার্যে, সচ্চরিত্রতা রক্ষা করিয়া ও দুর্নীতিমূলক কার্য পরিহার করিয়া চলিতে হইবে।

এইপ্রকার সত্য-প্রেম-পবিত্রতার নৈতিক ভিত্তিতে জীবন পরিচালনা না করিয়া, আমরা যত পরিশ্রম করিয়াই উপবাস, ব্রত, পূজা করি না কেন, যত অধিক দান করি

না কেন, যত অধিক সাধুসঙ্গ বা তীর্থ ভ্রমণ করি না কেন, (তাহাতে সামান্য কিছু উপকার হইলেও) আমরা ধর্মপথে বিশেষ অগ্রসর হইতে পারিব না, এবং ধর্মের চরম লক্ষ্যে (ঈশ্বর লাভে ও মানসিক শান্তি লাভে) পৌঁছাইতে পারি না। আমরা প্রায় সকলেই এই সত্য জানি। কিন্তু আমরা মূর্খের ন্যায়, সকল নৈতিক উপদেশ লঙ্ঘন করিয়া কঠিন পরিশ্রম পূর্বক উপবাস, ব্রত পূজাদি করি ও তীর্থ-ভ্রমণ করিয়া বেড়াই, এবং মনে মনে ভাবি যে, আমরা ঐ সকল ক্রিয়া দ্বারা ঈশ্বরকে ভুলাইয়া তাঁহাকে লাভ করিতে পারিব। আমরা এই আত্ম-প্রবঞ্চনা যতশীঘ্র ত্যাগ করিতে পারিব, তত শীঘ্রই ধর্মানুশীলনের পথে প্রকৃতভাবে অগ্রসর হইতে পারিব।

২। হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে ধর্মের সারতত্ত্ব সংগ্রহ করা বেশ কঠিন।

(১) হিন্দু ধর্মে কোন একখানি নির্দিষ্ট বাধ্যতামূলক গ্রন্থ নাই। ইহাতে অসংখ্য গ্রন্থ আছে। তন্মধ্যে অনেকগুলি দুষ্প্রাপ্য এবং অনেকগুলির অনেক অংশ দুর্বোধ্য। তদুপরি প্রায় প্রতি হিন্দুধর্মগ্রন্থের ভিতর বহু উপাখ্যান, অতিরঞ্জন প্রভৃতি, মহৎ উদ্দেশ্যে সন্নিবেশিত হইয়া থাকিলেও, আমাদিগকে সাহসের সহিত সেগুলি বাদ দিয়া সেই অমূল্য গ্রন্থগুলির সারতত্ত্ব গ্রহণ করিতে হইবে, নতুবা আমাদের ধর্মানুশীলন সফল হইবে না। বিভিন্ন শাস্ত্রকারগণ আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে ধর্মগ্রন্থগুলির কেবলমাত্র সারতত্ত্ব লইলেই ধর্মানুশীলন সফল হইবে, এবং আমাদের সকল শাস্ত্রের সকল অংশ জানিবার, বুঝিবার বা প্রতিপালন করিবার চেষ্টা করার আবশ্যকতা নাই। নিম্নে ঐ প্রকার কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করা হইল—

(ক) অনন্তশাস্ত্রং বহুবেদিতব্যং
স্বল্পশ্চ কালঃ বহবশ্চ বিঘ্নাঃ।
যৎ সারভূতং তদুপাসিতব্যং
হংসো যথা ক্ষীরমিবাম্বুমিশ্রম্॥

অর্থাৎ, আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থ অনন্ত, তন্মধ্যে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি বহু, কিন্তু আমাদের সময় কম এবং শাস্ত্রজ্ঞান-লাভে নানাপ্রকার বাধা-বিঘ্ন আছে। সুতরাং, হাঁস যেমন জলমিশ্রিত দুধ পাইলে, ঐ জল বাদ দিয়া কেবল দুধটুকু পান করে, সেইরূপ ধর্মানুশীলনকারীগণ কেবলমাত্র ধর্মের সারতত্ত্বগুলি অনুশীলন করিবেন।

(খ) শ্লোকার্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং শাস্ত্রকোটিভিঃ।
ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ॥

অর্থাৎ, শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন যে, কোটী শাস্ত্রগ্রন্থে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা তিনি অর্ধেক শ্লোকে বলিবেন। তাঁহার বক্তব্য সেই সারতত্ত্বটি এই—এই বিশ্বে একমাত্র সত্যবস্তু হইতেছেন ব্রহ্ম অন্য কোন বস্তুর পৃথক্ সত্তা নাই সমস্ত জীবই ব্রহ্ম, অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত।

(গ) সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥
গীতা

অর্থাৎ, সকল ধর্মের সারতত্ত্ব একটি—ঈশ্বরে শরণাগতি। এই শরণাগতি আনিতে পারিলে, কোন ধর্ম শাস্ত্র পাঠ আবশ্যক নাই।

(২) সামান্য সাধারণ বুদ্ধি ব্যবহার করিয়া, শাস্ত্রীয় উপাখ্যানগুলির মর্ম গ্রহণ করিয়া উহাদের আক্ষরিক সত্যতা উপেক্ষা করিলে কোন ধর্মহানি হইবে না। হিন্দু ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ উপনিষদ্ ও গীতা হইতে এই দৃষ্টিভঙ্গীর আলোচনা করিতেছি—

(ক) কঠোপনিষদ্—শাস্ত্রকার ঐ গ্রন্থে ব্রহ্ম, আত্মা ও পরলোক সম্বন্ধে অতি উৎকৃষ্ট তত্ত্ব বর্ণনা করিয়াছেন। উহা আমাদের সকল হিন্দুর গ্রহণীয়। কিন্তু, ঐ তত্ত্ব পাঠকের হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে উহাতে নচিকেতার যমালয়ে গমন ও যমরাজের সহিত কথোপকথন রূপ উপাখ্যান উল্লিখিত হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, নচিকেতা নিজে স্বশরীরে যমরাজের বাড়ী গেলেন, যমরাজ তখন সেখানে না থাকায়, নচিকেতা তিন দিন সেখানে যমরাজের জন্য অপেক্ষা করিলেন, যমরাজ আসিয়া লজ্জিত বোধ করিয়া তাঁহাকে তিনটি বর দিতে চাহিলেন নচিকেতা তন্মধ্যে একটি বর হিসাবে তাঁহার নিকট ব্রহ্ম, আত্মা, পরলোক প্রভৃতির তত্ত্ব জানিতে চাহিলেন। যমরাজ উহা দিতে প্রথমে কিছুতেই রাজী হইলেন না, এবং তৎপরিবর্তে দীর্ঘায়ুঃ, সম্পদ প্রভৃতির বহু প্রলোভন দেখাইলেন, কিন্তু নচিকেতা কিছুতেই ঐ গুহ্য প্রার্থনা হইতে নিবৃত্ত হইলেন না। তখন যমরাজ তাঁহাকে ঐ গুহ্য বিষয়ের জ্ঞান লাভ সম্বন্ধে উপযুক্ত পাত্র মনে করিলেন, এবং

অবশেষে তাঁহাকে ব্রহ্ম, আত্মা ও পরলোকের কথা জানাইলেন। এই উপাখ্যান অংশ বাদ দিয়াও, কেবলমাত্র ব্রহ্ম, আত্মা প্রভৃতি বিষয়গুলি জানিলেই, কঠোপনিষদ পাঠ করা সম্পূর্ণ সার্থক হইবে।

(খ) গীতা—ইহা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থের অন্যতম। ইহাতে হিন্দুধর্মের সারতত্ত্বগুলি সন্নিবেশিত আছে। গীতা-গ্রন্থকার ঐ ধর্মতত্ত্বগুলি আমাদিগকে একাদিকভাবে না জানাইয়া, শ্রীকৃষ্ণের মাধ্যমে জানাইয়াছেন। বলা হইয়াছে—কুরুক্ষেত্রে ভীষণ যুদ্ধ উপস্থিত, কুরুপাণ্ডবগণ রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া উভয় দল উভয় দলের সম্মুখীন হইয়া দণ্ডায়মান, কৃষ্ণ অর্জুনের সারথি হইয়া অর্জুনকে যুদ্ধার্থে সেখানে লইয়া গিয়াছেন, অর্জুন সেখানে স্বজন-বধের সম্ভাবনা মনে করিয়া মুহ্যমান হইয়াছেন, ইহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ সেই রথে দাঁড়াইয়া, একহস্তে রথের অশ্বগণের বল্গা ধরিয়া, অর্জুনকে অষ্টাদশ অধ্যায় ধর্মতত্ত্ব শুনা-ইতেছেন। এই সুন্দর উপাখ্যান অংশ বাদ দিয়াও কেবলমাত্র ধর্মতত্ত্বের উপদেশগুলি জানিলেই, গীতা পাঠ করা সম্পূর্ণ সার্থক হইবে।

(৩) হিন্দুশাস্ত্রগুলির মধ্যে কতকগুলিতে গ্রন্থকার ঈশ্বরে মন সমাহিত করিয়া অতীন্দ্রিয়তত্ত্ব জগৎ বাসীগণকে জানাইয়াছেন, অন্য কতকগুলিতে গ্রন্থকার নিজের বিচার বুদ্ধি ব্যবহার করিয়া তাঁহার নিজ অভিজ্ঞতালব্ধ তত্ত্বগুলি আমাদিগকে জানাইয়াছেন। আমরা, সাধারণ ব্যক্তিগণ, ঐ দুই প্রকার তত্ত্বের পার্থক্য বুঝিতে সক্ষম না হইয়া প্রত্যেকটি শাস্ত্রবাক্য অভ্রান্ত ও আমাদের প্রতি বাধ্যকর বলিয়া মনে করি। সেজন্য আমরা গ্রন্থগুলি পাঠের সময় আমাদের নিজ নিজ বিচার বুদ্ধি ব্যবহার করিতে সাহস করি না। ইহার ফলে, আমরা অনেক অনাবশ্যক শাস্ত্রবাক্য মানিয়া চলিতে চেষ্টা করি, এবং তজ্জন্য বিভ্রান্ত হই।

৩। ধর্মের সহিত যে বিজ্ঞানের অতি নিকট সম্বন্ধ তাহা আমরা অনেকে জানি না, আমরা সাধারণ ধর্মানুশীলন কারীগণ অনেক অবৈজ্ঞানিকতত্ত্ব গ্রহণ এবং অনেক অবৈজ্ঞানিক অনুষ্ঠান পালন করিয়া থাকি। অথচ, ধর্ম হইতেছে একপ্রকার উৎকৃষ্ট বিজ্ঞান, এবং উহা অনেক বিষয়ে বিজ্ঞানের (অর্থাৎ পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞানের) ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। অবশ্য, ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ (যাহা নিজ অনুভূতি সাপেক্ষ)এবং অন্য কোন কোন ধর্মীয়তত্ত্ব বিজ্ঞানের সীমার বহির্ভূত)। তথাপি ধর্মের অধিকাংশতত্ত্ব ও অনুষ্ঠান বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির দ্বারা পরীক্ষা করা যায়। তন্মধ্যে যাহা অবৈজ্ঞানিক বলিয়া মনে হইবে, তাহা না গ্রহণ করিলে ধর্মানুশীলনে কোন ক্ষতি হইবে না। আমাদের পূর্ব উল্লিখিত ধর্মগ্রন্থের আক্ষরিক সত্যের প্রতি অহেতুকী বিশ্বাস ও ভয়, আমাদের ধর্মে অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর একটি প্রধান কারণ।

এই সংপ্রবে ধর্ম ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের ও ভারতের ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি ডাক্তার রাধাকৃষ্ণণের কয়েকটি উপদেশ মনে রাখিলে উপকার হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—

(১) ধর্ম একপ্রকার প্রকৃত বিজ্ঞান। ইহার সহিত জড় বিজ্ঞানের কোন বিরোধ নাই। জড়বিজ্ঞান হইতেছে জড়পদার্থ সমূহের বিজ্ঞান। ধর্ম হইতেছে অধ্যাত্ম পদার্থ সমূহের বিজ্ঞান।

(২) ধর্ম ও জড়বিজ্ঞান পরস্পরের সহিত মিলিত হইবে, এবং উভয়ে উভয়কে আলিঙ্গন করিবে। (স্বামীজীর প্রায় সত্তর বৎসর পূর্বের এই ভবিষ্যদ্বাণী আজ সফল হইতে চলিয়াছে)।

ডাক্তার রাধাকৃষ্ণণ বলিয়াছেন—

পারিপার্শ্বিক অবস্থা পরিবর্তনের সহিত ধর্মীয় অনু-শীলনকে মিল রাখিয়া চলিতে হইবে। যে ধর্মীয় আচরণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকের সহিত মিল রাখিতে পারিবে না, সে আচরণ অনুশীলনীয় নহে। (আমাদিগকে সাহসের সহিত এই পথ অবলম্বন করিতে হইবে)।

বৈজ্ঞানিকগণের ত্রুটী।

১। অধিকাংশ ধর্মে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ ঈশ্বরের অস্তিত্বের কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ জানিতেন না বলিয়া, ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না। প্রকৃত বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেন—'ঈশ্বর আছেন কি না জানি না'। কিন্তু কুসংস্কারগ্রস্থ বৈজ্ঞানিক-গণ বলিতেন 'ঈশ্বর নাই'। এই ঈশ্বর তত্ত্ব লইয়া ধর্মানু-শীলনকারীদের সহিত বৈজ্ঞানিকগণের মত পার্থক্য থাকায়, ধর্ম ও বিজ্ঞান পরস্পর হইতে দূরে থাকিত। তদুপরি,

র্মানুষ্ঠানে বহু কুসংস্কার ও বহু ভুল প্রথা প্রচলিত আছে। হার ফলে, বৈজ্ঞানিকগণ মনে করিতেন যে, ধর্ম একটি বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান। সেজন্য বহুশত বৎসর ধরিয়া র্মও বিজ্ঞান পৃথক্‌ পথে চলিয়া আসিতেছিল, এবং তাহাদের ধ্যে কোন মিলন হয় নাই।

২। অধিকাংশ বৈজ্ঞানিকগণ জানেন না, অথবা ভুলিয়া ান যে, তাঁহাদের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও যন্ত্রাদি নির্মাণ রিয়া মানুষের কার্যে প্রয়োগই তাঁহাদের একমাত্র কর্তব্য হে। তাঁহাদের সর্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, তাঁহাদের বজ্ঞানিক প্রচেষ্টাগুলি মানবকল্যাণের জন্য, নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা আবশ্যক। বিজ্ঞান নীতির থ হইতে দূরে থাকার ফলে, (১) বহু ব্যক্তি অত্যন্ত অভাব ও দুঃখের মধ্যে জীবন কাটাইতেছেন। এবং (২) ারাত্মক যন্ত্রাদি আবিষ্কারের ফলে সারা পৃথিবীর মানুষ ধ্বংসেরআশঙ্কায়জীবন কাটাইতেছেন। বিজ্ঞানের এই নীতি র্জিত আবিষ্কারাদির কথা ভাবিয়া, তাহাতে বৈজ্ঞানিক-গণের মনে প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গী আনিবার উদ্দেশ্যে, স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—

জড়বিজ্ঞানের সফলতা লাভের জন্য, তাহার কর্তব্য হইতেছে ধর্মের নিকট হইতে আশীর্বাদ সংগ্রহ করা অর্থাৎ র্মীয় নীতির পথে জড়বিজ্ঞানের আবিষ্কারাদি পরিচালিত করা কর্তব্য।

ধর্ম ও বিজ্ঞান মিলনের পথে।

১। সৌভাগ্যক্রমে, ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে পূর্বোক্ত ব্যবধান ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। গত ১০০।১৫০ বৎসরে, বৈজ্ঞানিকগণ, আকাশে অনেকপ্রকার নক্ষত্রাদি আবিষ্কার করিয়া ও অন্যান্য জ্ঞান লাভ করিয়া, ধর্ম সম্বন্ধে, অর্থাৎ ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে, তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গীর কতক-পরিমাণে পরিবর্তন করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহারা পূর্বে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণাভাবে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিতেন। ঐ সকল আবিষ্কারের ফলে, কোন কোন বৈজ্ঞানিক, ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়াও, তাঁহার অস্তিত্বের সম্ভাবনা স্বীকার করিতে আরম্ভ করিলেন। এডিংটন, জেম্‌স্ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ এই প্রকার মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

২। এই অবস্থায়, এই বর্তমান বিংশ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে, বৈজ্ঞানিকগণ গ্রহবিজ্ঞানের (Astronomy-র) সাহায্যে কতকগুলি অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহারা বিশেষ শক্তিসম্পন্ন দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে, (১) এই, বিশ্বের মধ্যে অসংখ্য শক্তিশালী সূর্য-তারকা দেখিতে পাইয়াছেন, (২) তাহাদের ভীষণ গতিতে পূর্বনির্দিষ্টপথে বিচরণ করিতে দেখিয়াছেন, এবং (৩) এই বিশ্বের কল্পনাতীত অসীমত্ব দেখিতে পাইয়াছেন।

উপরোক্ত অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের বিবরণ।

আলোকবর্ষ—উক্ত সূর্য-তারকাগুলির বিরাট গতি ও দূরত্ব বুঝিতে হইলে, সাধারণ মাইলের গতিতে তাহা বুঝান কঠিন। সেই দূরত্ব বুঝাইবার জন্য "আলোক-বর্ষের" অবতারণা করা হইয়াছে। আলোকের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০০ মাইল। একবৎসর ক্রমাগত চলিলে, অলোক ৫,৮৮০০০ মিলিয়ন মাইল গমন করিতে পারে। মোটামুটি হিসাবে আলোকের একবৎসরের গতির দূরত্ব ছয় মিলিয়ন মিলিয়ন মাইল, অর্থাৎ ষাটলক্ষ কোটী মাইল। সুতরাং এক আলোকবর্ষ বলিলে, ছয় মিলিয়ন মিলিয়ন মাইলের অথবা ষাটলক্ষ কোটী মাইলের দূরত্ব বুঝায়।

(১) এই বিশ্ব কল্পনাতীত বিরাট। বিজ্ঞান আজিও তাহার প্রকৃত পরিমাণ বা সীমারেখা জানিতে পারে নাই। আকাশের অসংখ্য সূর্য-তারকার দলগুলি, ক্রমাগত একদল অন্যদল হইতে ভীষণ বেগে সরিয়া যাওয়ার ফলে, বৈজ্ঞানিকগণ বিশ্বের ক্রমবর্ধমান অসীম পরিমাণ কিছু-কিছু দেখিতে পাইতেছেন।

(২) আকাশে রাত্রে যে ছায়াপথ (galaxy) দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে আমাদের এই দৃশ্যমান সূর্য আছে। সেই সঙ্গে, সেই ছায়াপথে, ঐ প্রকার শক্তি ও জ্যোতিঃসম্পন্ন অন্ততঃ দুইশত কোটী সূর্য আছে। তাহারা সকলে ঐ ছায়াপথ-রূপ বিরাট মালার মধ্যে অনবরত ঘুরিতেছে।

(৩) ঐ ছায়াপথের ব্যাসরেখা (diameter) লম্বায় একলক্ষ "আলোকবর্ষ"। পূর্বে বলা হইয়াছে একটি আলোকবর্ষের দূরত্ব ষাটলক্ষ কোটী মাইল।

(৪) আমাদের এই সূর্য অন্যান্য সূর্যের সঙ্গে ঐ

ছায়াপথ বা মালায় একবার ঘুরিয়া আসিতে ২৫ কোটী বৎসর সময় লাগে।

(৫) আমাদের এই পৃথিবী প্রায় ৪০০ কোটী বৎসর পূর্বে সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং সে আমাদের সূর্যের সহিত ঐ ছায়াপথে বা মালায় এপর্য্যন্ত ষোলবার ঘুরিয়া আসিয়াছে।

(৬) আমাদের এই বিরাটছায়াপথেরন্যায় অন্তরীক্ষে আরও কোটী কোটী ছায়াপথ আছে। তাহাদের প্রত্যেকটি ঐপ্রকার কোটী কোটী সূর্য সহ মালার ন্যায় ঘুরিতেছে।

(৭) এই প্রকার বহুকোটী ছায়াপথ (galaxy) এক একটি আরও বিরাট ছায়াপথের (metagalaxy-র) ভিতর ও অধীন হইয়া ঘুরিতেছে। বৈজ্ঞানিকগণ এ পর্য্যন্ত কয়েকশত ঐ মেটাগ্যালাক্সী দেখিতে পাইয়াছেন। আরও কত গ্যালাক্সী বা মেটাগ্যালাক্সী এই বিশ্বের সীমাহীন অনন্ত আকাশে আছে বা ঘুরিতেছে, তাহা বৈজ্ঞানিকগণ আজিও জানিতে পারেন নাই।

(৮) সর্বাপেক্ষা দূরের যে বস্তু বৈজ্ঞানিকগণ দেখিতে পাইয়াছেন, তাহা এই পৃথিবী হইতে প্রায় ৫০০ কোটী "আলোক বৎসর" দূরে অবস্থিত আছে।

(৯) এই সকল ছায়াপথগুলি ঘুরিতেছে বটে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কোনটিই অন্য কোনটির প্রতি ধাক্কা মারিতেছে না। তন্মধ্যে, এই সকল অনন্ত কোটী সূর্য-তারকাও ঘুরিতেছে বটে, কিন্তু তন্মধ্যে কোনটি অন্য কোনটির প্রতি ধাক্কা মারিতেছে না।

(১০) এই সকল ছায়াপথগুলি ও সূর্য-তারকাগণ অসীম বেগে চলিতেছে।

(১১) এই সকল ছায়াপথগুলি ও সূর্য-তারকাগণ পূর্বনির্দিষ্ট কক্ষপথে চলিতেছে।

উপরোক্ত অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফল

বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে কেহ কেহ বলিতেছেন যে, (১) এই কল্পনাতীত অসীম বিশ্বে অনন্ত কোটী সূর্য্য তারকাগণ (২) পূর্ব নির্দিষ্ট পথে, (৩) অসীমবেগে চলিতে থাকায়, ইহা প্রমাণিত হইতেছে যে, ইহাদের পশ্চাতে একটি শক্তি আছে, এবং সেই শক্তিই তাহাদিগকে সৃজন করিয়াছেন ও চালিত করিতেছেন। ইহা হইতে, কয়েকজন বিখ্যাত পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ধর্মে উল্লিখিতঈশ্বর নিশ্চয়আছেন। তাঁহারা মনেকরেনযে,(১) এই সকল অসংখ্য সূর্য-তারকা ও ছায়াপথগুলি, (২) পূর্বনির্দিষ্ট পথে পরিচালিত হওয়া, এবং (৩) অসীম বেগে ধাবিত হওয়াই—ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, মানুষের দেহের ভিতর অসংখ্য জীবাণুর বাস ও ক্রিয়া এবং বিবিধ গ্রন্থি-গুলির নানাপ্রকার দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক ক্রিয়া চিন্তা করিলেও ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস আসে।

ধর্ম ও বিজ্ঞান মহামিলনের পথে

১। একদিকে বৈজ্ঞানিকগণ উপরোক্তভাবে, ও উপরোক্ত কারণগুলির জন্য ধর্মের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছেন এবং ধর্মের চরমবস্তু ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, অপরদিকে ধর্মানুশীলনকারী-গণের মধ্যে অনেকে আর পূর্বের ন্যায় প্রত্যেক ধর্মশাস্ত্রের আক্ষরিক সত্যের উপর বিশ্বাস, এবং শাস্ত্রবাক্য বিষয়ে পূর্বের ন্যায় ভীতি পোষণ করিতেছেন না। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এখন ধর্মশাস্ত্রের তত্ত্ব ও অনুষ্ঠাননগুলির প্রতি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ব্যবহার করিতেছেন। ইহার ফলে ধর্ম ও বিজ্ঞান ক্রমশঃ নিকটবর্তী হইতেছে। এখন অনেকের ধারণা হইয়াছে যে, ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য নাই, এবং বিজ্ঞান হইতেছে ধর্মের একটি ভিত্তির স্বরূপ। তথাপি এখনও বহু পূর্ব দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন ধর্মানুশীলনকারী আছেন, এবং এখনও সকল বৈজ্ঞানিক (১) ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই, এবং (২) হিন্দুধর্মে ঈশ্বরের যে প্রকৃত স্বরূপ ও ক্রিয়াদি বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা উপলব্ধিকরিতে পারেন না বলিয়া ধর্মের সহিত বিজ্ঞানের প্রকৃত সম্বন্ধ জানিতে পারেন নাই।

২। ধর্মের সহিত বিজ্ঞানের প্রকৃত সম্বন্ধ জানিতে হইলে ধর্মে ঈশ্বরের স্বরূপ ও সৃষ্টি বর্ণনা জানা আবশ্যক, সেইজন্য এক্ষণে হিন্দুধর্মের সারতত্ত্ব ও অনুষ্ঠানগুলির সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি। সেই আলোচনা হইতে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, ধর্ম ও বিজ্ঞানের মহামিলনের এখনও কিছুদিন দেরী আছে। তবে, যেভাবে বিজ্ঞান মানুষ ও বিশ্ব সম্বন্ধ জ্ঞানে অগ্রসর হইতেছে, এবং যেভাবে ধর্মানুশীলনকারীগণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করিতে-ছেন, তাহাতে আশা করা যায় যে, হয় এই বিংশ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে, অথবা একবিংশ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমার্ধে, ধর্ম ও বিজ্ঞানের মহামিলন হইবে। তখন ধর্ম বিজ্ঞানের ভিত্তি স্বীকার করিবে, এবং ধর্ম, নীতি ও বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া, এই জগতের সকল মানবের অশেষ কল্যাণ সাধন করিবে। [ক্রমশঃ]

মেঘদূত-কথা

শ্রীসুধীর গুপ্ত

(১)

নব-রত্ন-শ্রেষ্ঠ ছিলে 'বিক্রম'-সভাতে,
যুগ যুগ পূর্বে তুমি কবি কালিদাস ;
শিপ্রা-তটে সুরে সুরে পরাণ মাতাতে,
দিব্য কাব্য-কলরবে আকুলি' আকাশ।
ব্যাকুল বাতাসে, তব কাব্য-মন্ত্র-পাতে,
স্থূলতার যত মোহ করিতে বিনাশ।
তোমারে ভারতী বীণা দিল নিজ হাতে
তাই বুঝি থামিছে না তা'রও কল-ভাষ।
কত যুগে কত কবি রচে বাণীরাজি
তব রেশে তাহাদের বাণী ওঠে বাজি' ;
আজি তাই না থেকেও আছ কায়াহীন,
কাব্য-কবিতার মাঝে হ'য়ে অবলীন।
'রঘুবংশ,' 'শকুন্তলা,' আছে 'মেঘদূত,'
'কুমার-সম্ভব'ও আছে অপূর্ব অদ্ভুত।

(২)

অভিনব 'উজ্জয়িনী'-হর্ম্য আলো ক'রে
স্বর্ণোজ্জ্বল গুপ্ত-যুগে কবি-কুল-পতি
বাণী-পুত্র কালিদাস, ছিলে দেহ ধ'রে ;
বিক্রমাদিত্যের সভা লভিত আরতি।
সূর্য-দীপ্তি সম তব প্রতিভা মহতী—
মুহুর্মুহু ভুবনেরে দিত শুধু ভ'রে ;
প্রকৃতিও লভি' শুদ্ধ সংগীত-সংগতি
ধন্য হোতো ; নর-চিত্ত-ভূমিতে তা' ঝ'রে
মোহিত করিত সবে আনন্দের ঘোরে।
মর-দেহ ধ্বংস করি' নিষ্ঠুরা নিয়তি
নিলো তোমা সুর-স্বর্গে পৃথ্বী হ'তে হ'রে ;
মানিল না প্রেম-সিক্ত মর্ত্যেরও মিনতি।
মর দেহাতীত যাহা ক'রে গেলে দান,
বিশ্ব লভে নিত্য তা'রই অমেয় সন্ধান।

(৩)

বর্ষে বর্ষে আষাঢ়ের ধূম-জ্যোতি মেঘে
যে ছন্দ বাজিয়া ওঠে মৃদঙ্গের মত,
কে জানিত পূর্বে তব, তা'রই দোলা লেগে
দুটি ভিন্ন সুর শুধু জাগে অবিরত
প্রকৃতির বুকে আর মানব অন্তরে!
যদিবা জানিত কেহ, পারিত বুঝিতে,
'মন্দাক্রান্তা'-তালে তা'রে মল্লার-মন্তরে
'মেঘদূত' সম ভাষা কে বা পারে দিতে
তুমি বিনা কালিদাস? বিশ্ব-দূত তুমি।
যে-মেঘ নিসর্গ মাঝে আনে নিত্য বহি'
অপূর্ব রসের বার্তা, স্পর্শে যা'র ভূমি
কাঁপিয়া ফুলিয়া ওঠে, কে জানিত দহি'
যাবে চিত্ত কণ্ঠাশ্লিষ্ট প্রেমিকেরো তায়,
বিরহের কল্প-স্বর্গ জাগিবে ধরায়!

(৪)

হৃদয়ের 'রামগিরি'-সানুদেশে বসি'
অভিশপ্ত যক্ষ মোর তপ্ত আঁখি-জলে
বক্ষ-ফাটা বেদনায় ব্যাকুল বাদলে
বিলাপ করিছে শুধু। অবলুপ্ত-শশী ;
মসীময়ী অন্ধকারে ক্ষণে ক্ষণে শ্বসি'
ওঠে ওই পুবালী বাতাস ; বিরহীরে
বারে বারে ফেলে আরও ব্যর্থতায় ঘিরে।
দূরে-দূরে-বহুদূরে যেথায় রূপসী
মূর্তিমতী ভালোবাসা, মিলন-আকুল
একাকিনী বসি' আছে স্বপনের ফুল,
সাধ যায় ছুটে যাই—উড়ে যাই চ'লে।,
পারি না—পারিনা হায় দেহ আছে ব'লে।
স্থানে-কালে বাঁধা এই দেহে বার বার,
দেহাতীত ক'রে তোলে অতনু আমার।

পতিতা ও পতিতপাবন

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

পনেরো

"কিন্তু নাটকের অবতারণার আগে বিষ্কম্ভক চাইই চাই, যাকে সাহেব পুরাণে বলেছে 'প্রোলোজ'। অর্থাৎ গুরুদেবের জীবনকাহিনী। সংক্ষেপেই বলতে হবে (হাতঘড়ির দিকে চেয়ে) ব্রহ্মকুণ্ডে স্নানযাত্রা—মাত্র সাড়ে তিনঘণ্টা সময়। তাই খবর্দার—জেরা করিস নি—শুধু শুনে যা মহাপুরুষের 'শ্রুৎকর্ণরসায়ন' কথা।

"তুই অবিশ্বাস করলে কী হবে মহাপুরুষদের জীবনে কৃপার অবতরণ হবার সঙ্গে সঙ্গে ঘটেই ঘটে নানা, অবিশ্বাস্য অঘটন যার ফলে তাঁদের সাধনার প্রগতি হয় দ্রুত—অন্ধকার থেকে আলোকের উর্ধ্বলোকে। আমি সেসব আশ্চর্য কাহিনী থেকে বলব না আরো এই জন্যে যে, আমার মুখে শুনলে তোর সংশয় হয়ত আরো বেড়েই যাবে। তাই যদি শুনতেই হয়—তাঁর মুখেই শুনিস। যদি শুনতে চাস অবিশ্যি।

"গুরুদেব বিবাহ করেন মাত্র কুড়িবৎসর বয়সে। বিহারী 'রইস' তো—ওদের বিয়ে কম বয়সেই হয়। গুরুদেব প্রায়ই হেসে বলেন: 'আমাদের পরিবারে শুধু অরক্ষণীয়া নয় অরক্ষণীয়কে নিয়েও সবাই গালে হাত দিয়ে ভেবে আকুল হ'ত—হা হা হা।

"কিন্তু লীলাময়ের লীলা কে বুঝবে বল্। হ'ল কি, তাঁর ষোড়শী স্ত্রী আবাল্য পরমহংসদেবের ধ্যান করতেন—বিবাহ স্বামী সন্তান কিছুই চাইতেন না। বাপ মা জোর ক'রে বিবাহ দেবার ফল হ'ল অশুভ: একটি মেয়ের অন্নদানের পরে তিনি গুরুদেবকে সাফ ব'লে দিলেন তাঁর সঙ্গে দেহ-সম্বন্ধ রাখবেন না, তবে স্বামীর ঘরণী হ'য়ে সেবা করতে রাজী আছেন। গুরুদেব বিষম ঘা খেয়ে অভিমানে স্ত্রীকে ছেড়ে সোজা বৃন্দাবনে গিয়ে এক বৈষ্ণব গুরুর কাছে দীক্ষা নেন।"

অসিত বলল: "রোসো ভীমদা, তোমার গুরুদেব তাহ'লে বৈষ্ণব?"

"গুরুদেব কোনো লেবেল তথমা মানেন না। নিষ্ঠা মানেন কিন্তু আচারী নন। গুরু মানেন, কিন্তু গুরুবাদী নন। তিনি উঠতে বসতে আমাদের বলেন: 'প্রতি যুগেরই একটি ধর্ম আছে—যাকে বলে যুগধর্ম—না থেকেই পারে না। এ-যুগের ধর্ম ওরফে মহাবাণী হ'ল পরমহংস-দেবের যত পথ তত মত, তাই মতুয়ার বুদ্ধি কোরো না—কি না বোলো না—"আমার মত ছাড়া আর সব মতই ভুল।" তাই তিনি নানা শিষ্যকে নানা মন্ত্র দিতে দ্বিধা করেন না যার ইষ্ট কৃষ্ণ তাকে হরিনাম, যার ইষ্ট শিব তাকে শিবনাম, যার ইষ্ট কালী তাকে মাতৃনাম···পরমহংস-দেবের তিনি বিষম ভক্ত, বলেন—এ-যুগের তিনিই যুগাবতার, যেমন প্রাক-রামকৃষ্ণ যুগের যুগাবতার ছিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ। গুরুদেব পরমহংসদেবকে আরো ভাল-বেসেছিলেন নিজে রসিক ছিলেন ব'লে। ব্রাহ্মদের 'নিরাকারী' গোঁড়ামি নিয়ে প্রায়ই একগাল হেসে উদ্ধৃত করেন পরমহংসদেবের বিখ্যাত উপমা ব্রাহ্মরা যেন সানাইয়ে নিরাকারের এক পোঁ ধরে আছে, হিন্দুরা বেপরোয়া তুলছে রকমারি 'আকার'-এর বোল পড়ন তাল আলাপ। মর! একঘেয়ে হব কী দুঃখে? আমি ঝোলে ঝালে অম্বলে সবতাতেই আছি।'

"দেবপ্রয়াগে তাঁর আশ্রম গড়ে ওঠার সাত বৎসরের মধ্যেই সাতটি শিষ্য তাঁর কাছে এসে মন্ত্র নেয়। বছর দুই বাদে আমরা এসে জুটি। গুরুদেব মাঝে মাঝে হেসে বলেন 'আগে আমার বাহন ছিল সপ্তরথী, এখন—নবরত্ন।'

অসিত হেসে শুধায় "সপ্তরথীর নাম বলবে না?"

"প্রসাদ, দিবাকর, বিষ্ণুদাস, রণধীর, পিণাকী, রঘুবীর, চন্দন। আমার নাম করণ হ'ল—গুরুদাস, মা-র—কৃষ্ণময়ী। সপ্তরথীর মধ্যেও দুটি দল ছিল: প্রসাদকে নেতা করে দল গড়ল চতুর্বীর—দিবাকর, বিষ্ণুদাস, রণধীর ও পিণাকী—গুরুদেব এদের উপাধি দিয়েছিলেন পঞ্চপ্রবীর—কেন—ক্রমশঃ প্রকাশ্য। রঘুবীর ও চন্দন রইল একান্ত গুরুদেবের অনুগত। পঞ্চপ্রবীর ওদের ঠেশ দিয়ে বলত 'গুরুর ন্যাওটো'। ওরা পিঠ পিঠ জবাব দিত গুরুর প্রসাদের ন্যাওটো হওয়ার চেয়ে খোদ গুরুর ন্যাওটো হওয়া ঢের ভালো। কিন্তু এবার একটু পেছিয়ে যেতে হবে—সাহেব পুরাণে বলে জানিস তো: 'You mustn't go ahead of your story.'

একটু থেমে ভীম সুরু করে: "তুই জানিস আমি কিরকম উড়নচণ্ডী ছিলাম—টাকা আসতে না আসতে সব ফর্সা! তাই তুইই আমাকে বলেছিলি বৌ-এর নামে অন্তত ত্রিশ হাজার টাকার লাইফ ইনশিওরেন্স করে রাখতে। বলতিস প্রায়ই হাসতে হাসতে: লোক-খাইয়ে ফতুর আমি হবই হব—তাই বৌ-এর একটা হিল্লে করে রেখে যাওয়াই চাই। আমি সচরাচর তোর কোনো বেল্লিকি ঠাট্টায়ই কান দিই না বটে, কিন্তু তোর এ-মোক্ষম তীরন্দাজিটি লক্ষ্যভেদ করেছিল। ফলে আমি ভাগলপুরে বৌ-এর নামে কুড়ি হাজার টাকার বীমা ক'রে অতিকষ্টে কোনমতে মাস মাস দক্ষিণা জোগাতাম—কখনো কখনো এজন্যে ধার করতেও হ'ত। এসবই তুই জানিস। যেটা জানিস না সেটা এই যে, আমি বোকা হ'লেও বুদ্ধি ধরি, যাকে সাহেবেরা বলেন: I may be a fool, fut not a dammed fool: তাই কাকাকে ঘুণাক্ষরেও বলিনি এ-বীমার কথা। তাঁর 'পরে আটচালা দুটির ও মেয়েদের ভার চাপিয়ে বিশহাজার টাকা নিয়ে হিমালয়ে পাড়ি দিয়েছিলাম গুরুগৃহে—মাকে নিয়ে। মা-র সত্যিই গুরুভক্তি হয়েছিল। কিন্তু সংসারে কোন কিছুই তো নিখুঁৎ নয়রে দাদা। তাই গুরুদেবের কাছে দীক্ষা নেবার পর তাঁকে টাকাটা প্রণামী দিতে যেতেই মা বাগড়া দিলেন। বললেন শেফালির বিয়ে এখনো বাকি, তাছাড়া কার যে কথা কী হয় কে বলতে পারে? সাততাড়াতাড়ি এই হাতের পাঁচটা খুইয়ে কাজ নেই।

"আমি রাগ ক'রে বললাম 'মা, আর যে-অপরাধই করো না কেন মা, ভাবের ঘরে চুরি কোরো না কোরো না কোরো না। মুখে বলছ—আমাদের যাকিছু আছে সবই গুরুদেবের। কিন্তু এদিকে আখেরের চিন্তা দেখি বেশ টনটনেই রয়েছে। এর নাম আর যাই হোক আত্ম-সমর্পণ নয়।' মা ধমক খেয়ে খুব কাঁদলেন। আমারো মন বিষম খারাপ হ'ল। হঠাৎ রাত্রে শিয়রে স্বয়ং গুরুদেব! ধড়মড় ক'রে উঠে বসতেই তিনি আমার মাথায় হাত রেখে বললেন যার মন সরল তার কোনো ভয় নেই। কুড়ি হাজার টাকা এখন তোমার কাছেই থাক। আমাদের আশ্রম ছোট, খরচেরও সঙ্কুলান হয়ে যাচ্ছে ঠাকুরের কৃপায়।' আমি বললাম 'মা নালিশ করেছেন নাকি গুরুদেব।' গুরুদেব বললেন হেসে না: আজ যখন সে এসেছিল প্রণাম করতে তখন তার মাথায় হাত দিতেই টের পেলাম সে কী চায়। তুমি তাকে বোলো মা ভৈঃ। সব ঠিক আছে।'

পরদিন সকালে উনিশ হাজার টাকা গুরুদেবের কথা-মত দেবপ্রয়াগের পোষ্ট অফিস ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে ঘরে ফিরে ধ্যান করতে বসলাম। কিন্তু ধ্যান করব কী? মন বিষম খারাপ হ'ল। ধর্মের নামে এ কী ভণ্ডামি করছি? যোগী যোগ করতে এসেও করবে পরিণাম চিন্তা? গুরুদেব অন্তর্যামী—কাউকে জোর করেন না, তাই চলো বললেন টাকাটা আমার নিজের নামেই জমা রাখতে! কিন্তু আমার কি উচিত ছিল না তাঁকে বলা যে, যদি জমা রাখতো হয় রাখব তাঁরই নামে—আমার বা মা-র নামে নয়, যোগপন্থীকে হ'তেই হবে নিঃস্ব…এই ধরণের সে যে কত আত্মধিক্কার! ধ্যান হ'ল না। গেলাম গঙ্গায় স্নান করতে সাড়ে দশটায়—বিষণ্ণ মনে।

"স্নান ক'রে নদীর পাড়ে একটি গাছতলায় ব'সে এক-দৃষ্টে চেয়ে রইলাম ভাগীরথীর দিকে। মনের ভার একটু হাল্কা হ'য়ে এল। কী সুন্দর! মরি, মরি। সেদিন কী একটা পার্বণের শুভ তিথি ছিল মনে নেই! বহু স্নানার্থী এসে কলোচ্ছল গঙ্গাজলে নেমে তর্পণ রত। কয়েকজন ধর্মার্থীকে পাণ্ডারা ফুল হাতে গুঁজে দিয়ে মন্ত্রপাঠ করাচ্ছে।

ডান দিকে আমার আসন থেকে আটদশ হাত দূরে আরো কয়েকটি পুরুষ যাত্রীরা তর্পণ করছে ফুল বেলপাতা নিয়ে।

"হঠাৎ এক সাতাশ আটাশ বৎসরের শ্রীমন্তীনীর আবির্ভাব। সঙ্গে এক অনিন্দ্যকান্তি আট নয় বৎসরের শিশু। দুজনে হাঁটুজলে নামতেই ছেলেটি পরমানন্দে গান ধ'রে দিল। মা অঞ্জলিতে গঙ্গাজল নিয়ে সূর্যের দিকে চেয়ে তর্পণ করে, আর ছেলে গান গেয়ে চলে হাততালি দিয়ে। তার সে অপরূপ গান শুনবামাত্র আর সন্দেহ রইল না যে, এইই সেই শান্তনু—রঘুনাথজির মন্দিরে যার গান শুনতে রোজ ভিড় জমে—যার উপাধি রটে গেছে কিন্নরকুমার। মা-র মুখে দিনের পর দিন শুনে এসেছি তার রূপ গুণ—বিশেষ ক'রে অপরূপ কণ্ঠের কথা। দুই আর দুয়ে চার—সিদ্ধান্ত : ঐ শ্রীমন্তিনীই তার মা কুন্তী যাকে নিয়ে গোল বেধেছে—এ-নাটকের নায়িকা।

"আমি মুগ্ধ নেত্রে ছেলেটির দিকে চেয়ে শুনি তার অপরূপ কীর্তন। সে হাঁটুজলে যে-ই দুলে পড়ে—অমনি মা তার হাত চেপে ধরে। তবে নাটকের পাট দিচ্ছি যখন তখন শোন গানটি—যেটি আমি পরে তার কাছেই শিখেছিলাম।" ব'লেই ভীম ধ'রে দেয় নীলকণ্ঠের বিখ্যাত কীর্তন :

সজল জলদাঙ্গ সুত্রিভঙ্গ বাঁকা তরুমূলে
হেরিলে হরে জ্ঞান, মন প্রাণ পড়ে পদতলে।
নবীন নটরাজ কে বিরাজে ব্রজমণ্ডলে ?
সাজ হেরি লাজে দ্বিজরাজ নভোমণ্ডলে।
উচ্চ শিখা তুচ্ছ করি' পুচ্ছ শিখা বামে হেলে
তুচ্ছ করি' জাতি ধর্ম মূর্ছা করি' নারীকুলে !
ভুবন করি' আলো বনমালা দোলে দেখ গলে !
বাঁশি ধরি' হাসি' হরি নাচে মরি, হেলে দুলে।
(নীল) কণ্ঠ ভণে : 'বনে বনে কে অচেনায় চিনিতে পারে'
(যে) চিনিতে পারে, জিনিতে পারে, কিনিতে পারে বিনা মূলে।

গাইতে গাইতে ফের ভীমের চোখের জল গাল বেয়ে নামে সরু রেখায়। কোঁচায় মুখ মুছে অসিতের দিকে চেয়ে বলে : "কিন্তু এ কিছুই হ'ল না। গানটিকে আমি মার্ডার ক'রে বসলাম, হায় হায়! আহা, শান্তনু যখন হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে এ-কীর্তনটি গাইছিল তখন কেমন যেন আশপাশের হাওয়াই গেল বদলে। সবাই শুনছিল মন্ত্রমুগ্ধের মতই। ভুলব কি কোনদিন সে-গান আর তার অপরূপ রেশ ? সকাল বেলার সূর্যের সোনার আলো। সামনে মা গঙ্গা নেচে চলেছেন যেন গানের সঙ্গে তাল দিয়ে, সবার ওপর, গাইছে একটি কোকিলকণ্ঠ বালক, মাঝে মাঝে হাততালি দেয়, আবার ট'লে পড়তেই মা স্নিগ্ধ হেসে তাকে চেপে ধরে—সব জড়িয়ে যেন একটি নিটোল ছবি ! এক একটা পরিবেশ যেন এক একটা গানের ফ্রেমমতন হয়ে জ'লে ওঠে চক্ষের নিমেষে। সে কি ভুলবার ভাই ?" একটু থেমে ফের চোখ মুছে : "আজো এ-গানটির সুর ভাঁজতেই মনে পড়ে গেল সেই অবিস্মরণীয় পরিবেশের কথা। আবার ভাগীরথীতে ডুব দিতে না দিতে মনে প'ড়ে যায় গানটির কথা : যেন এবলে আমায় দেখ্, ও বলে আমাকে !

অসিত আঙুল তুলে শাসিয়ে বলে : "কিন্তু মনে রেখো—এখনো পর্যন্ত তুমি কুন্তী বা শান্তনু কারুর কথাই বলোনি।"

ভীম হেসে বলে : "ওরে বেল্লিক, জানিস না কি—আর্টের একটি শ্রেষ্ঠ বাহন হ'ল উদ্বেগ—suspense : তোর মন আকুলি বিকুলি করছে কি না বল্—কে এরা জানতে ? তৃষ্ণা না জাগলে জল জোগানো বৃথা। তাই এবার বলছি এদের কথা, শোন্। তবে এগুবার আগে একটু পেছিয়ে যেতে হবে।"

ক্রমশঃ

কঠোপনিষদের সাধন পথ

শ্রীঅরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

সপ্তম মন্ত্র (১।২।৭)

মন্ত্র— শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্য :
শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ।
আশ্চর্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা—
শ্চর্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ ॥

অর্থ—যিনি অনেকের শ্রবণের জন্যও লভ্য নন, যাঁহাকে শ্রবণ করিয়াও অনেকে জানেন না, ইহার বক্তা আশ্চর্য্য (দুর্লভ), ইহার লব্ধাও কুশল নিপুণ ব্যক্তি। কুশল আচার্য্য দ্বারাও উপদিষ্ট জ্ঞাতা ও আশ্চর্য্য দুর্লভ।

ব্যাখ্যা—সাম্পরায়ের সাহায্যে যেখানে আসিয়াছি, সেখানে ইহলোক পরলোকের সীমানা আর দেখা যায় না; তাহাদের উর্দ্ধে যে আত্মার বিস্তৃতি তাহাই গগনপ্রায় নয়নে ভাসিতে থাকে। "ও দেশের কথা এ দেশে কহিলে লাগিবে মরমে ব্যথা।" সেইজন্য একেবারে নিসাড় হইয়া যাইতে হইবে। প্রেয় এবং শ্রেয়ের বিচারের উর্দ্ধে উঠিয়াছি। এখন এদেশের উপযোগী করে কান পেতে রই।

কর্ণ বাহিরের খবর শোনায়। কর্ণ দিয়াই ত ইহলোককে শোনা যায়। সেই কর্ণকে ভিতরের দিকে কার্য্যকুশল করিতে হইবে। ইহলোক ছিল বহিঃপ্রকরণের ক্ষেত্র, পরলোক হইল অন্তঃকরণের ক্ষেত্র। এখন আর "করণ" পর্য্যন্ত থাকিবে না, ইহা একেবারে যাত্রার শেষ অংশ, ইহাকে বলা চলে পরাগতির পথে বা সন্ধানে। ইহলোক বিষয়কে লইয়া লিপ্ত, পরলোক পদার্থ, যাহাতে ভগবানের 'পদ" অর্থ রূপে লাভ হয়। এখন একেবারে পরমার্থের চরমটানে চলিতে হইবে, ভক্ত ও ভগবানের ভেদটুকুও স্তিমিত হইয়া আসিবে, তবে প্রকৃষ্টতম ধামে পৌছানো হইবে। সে পথে কর্ণ পূর্ণমাত্রায় হইবে শ্রবণ। শ্রেয়ের পথে লওয়ার সঙ্গে আশ্রয় পাওয়া যায় তাহা আমরা দেখিলাম (দ্বিতীয় মন্ত্রের ব্যাখ্যার শেষ কথা)। সেই আশ্রয়ই গুরু বা জীবন দেবতা রূপে প্রত্যক্ষ হইতে থাকেন। ভিতরের আচার্য্যের পদধ্বনি শোনা যায়। তিনি জীবনের ধাপে ধাপে আরো কাছে এসে অন্তরতম প্রদেশে তাঁর বাসস্থান স্থিরীকৃত করেন, সদ্‌গুরু রূপে প্রমাণিত হইয়া যা'ন। এখন সেই সদ্‌গুরুর (অব্যক্ত আত্মার) অব্যক্ত বাণী শ্রবণে পশিবার কথা। মন যেদিন বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গত রক্ষা করে চলতে শিক্ষা করেছে তখন নির্মল হয়েছে। বুদ্ধি যোগ নিষ্পন্ন হইলে উজ্জ্বল হইয়াছে চিত্তের দুয়ার। এক্ষণে একনিষ্ঠ হইয়া যদি সদ্‌গুরুকে শ্রবণ করিতে পারি তবেই সেই চিরসুন্দরের সঙ্গ লাভ করে আপনহারা হইতে পারিব।

তখন সেখানকার বাতাসের কথা শোনা যাইবে, তারার রাগিণী ধ্বনিত হইবে, অন্তর আকাশের সূর্য্যচন্দ্র যে বীণা ও বাণী শুনাবে তাহাতে হৃদয় ভরপুর হইবে। সবই যেন অব্যক্তের প্রেরণা, যাহা নিবিড়তর অব্যক্তের দিকে আকর্ষণ করিবে। কয়জন এই আহ্বান পাইবেন? আবার শ্রবণে আসিলেও সেই অব্যক্তের ভাষা ও ভাব কয়জন ধরিতে পারিবেন? ভাষা ত অনেক রকম শোনা যাইতে পারে; কিন্তু তাহার ভাব গ্রহণ সেই করিতে পারিবে, যাহার হৃদয়ে সেই ভাষা সঞ্চিত হইয়াছে, শুনিয়া শুনিয়া, ধরিয়া ধরিয়া ও বুঝিয়া বুঝিয়া। এতো শেখানো বুলি নয়, শাস্ত্রের কথা দিয়া ইহার ভাব অন্বেষণ করিলে চলিবে না। যে গান রচিত হয় নাই, যে শাস্ত্র আজও মানুষের অন্তরেই নিবদ্ধ রহিয়াছে, যে বাণীর উৎস নিজের বুকেই ভেসে উঠবে নিজের অশ্রুজলে ও হাসিতে, সে তো

শুনেও ধরা সহজ নয়, যাঁহারা অমৃতের কূলে পারাপার হতে পারবেন, তাঁহারাই ঢেউএর মুখে সেই উচ্ছ্বাসের ধ্বনি পাইবেন, যাহা অন্তরে পূর্ব্ব হইতেই তরঙ্গিত হইয়াছে। ইহাই হইবে "বেদ"। যাহাকে কাহারও পক্ষে বাহিরে "বেত্তি" (বা জানি) বলা চলে না। যাহা অন্তর বাহির পার হইয়া কোথায় যে কথা বলে, ভাব জানায়, তাহার কূল পাই না; তাহা অন্তর বাহির দ্বারা অপ্রকাশ, সেখানে আত্মার চৌকী পাতা আছে, তোমার আমার সব জগদ্বাসীর জন্য, যে কেহ জুড়াইতে চাহিবে।

যে বক্তা সে দেশের বার্ত্তা বহন করে এখানে দিবে, তাহাকে আশায় আশায় বিচরণ করিতে হইবে (তাই তাহাকে আশ্চর্য্য বলা হইয়াছে এই মন্ত্রে), যদি আত্মা নিজেকে কোন শুভ মুহূর্ত্তে প্রকাশ করেন, তাঁর আপন করা ভাষায়, আপন-ভোলা ভাবের মধ্য দিয়া। যে শুনিবে, সেও সুনিপুণ আধ্যাত্মিক জীব হওয়া চাই, কেবলমাত্র ইহলোক বা পরলোকের আনন্দকে আলগোচে পান করিতে চাহিলে হইবে না। এ আনন্দ সাগরে ডুব দিয়া নিজকে ভুলিয়া গিয়া নিজকে অখণ্ডভাবে পাইতে হইবে। জ্ঞান আত্মা (বুদ্ধি যোগের পরিণত অবস্থার নাম) অনুগত হইয়া থাকিবে, অব্যক্ত আত্মা তাহাকে পথের কথা শুনাইবে, তাহাদের উভয়ের মিলিত স্বরূপ "অণু" বা জীবাত্মা প্রতীক্ষায় থাকিবে, কি করিয়া মহৎ আত্মার সহিত যুক্ত হইয়া (১।২।২৩ পরে দেখুন) পরমাত্মার "তনু"তে সমন্বিত হইবে (১।৩।১৩ দ্রষ্টব্য)। জীবাত্মার অব্যক্ত ও ব্যক্তের সহজ মিলনে উপদেষ্টা ও শ্রোতা একত্র হইয়া, আমাদের প্রতি কি করুণা করিবেন ? যমরাজ ও নচিকেতা উভয়ের প্রসাদ কি আমরা লাভ করিতে পারিব ? আচার্য্য দেবতার ন্যায় দরদী হওয়া চাই ; এবং শ্রোতার অন্তরে ইহলোক বা পরলোকের ভাব ও ভাষার গুঞ্জন ধ্বনি পর্য্যন্ত যেন আর না থাকে। এমন নীরবতায় এমন মধুবর্ষণ কোন আকাশে গেলে হৃদয়ভার পাওয়া যায় ?

এই মন্ত্রে আভাস দেওয়া হইল যে অব্যক্ত আত্মাকে সাধক স্বীয় স্বভাবে শ্রবণ করেন। পরের মন্ত্রে জানিব তিনি সাধকের সত্তার বহির্ভূত হইয়াও তাঁহার মধ্যে যথাযথ স্পন্দনের তরঙ্গ সৃষ্টি করিতে পারেন।

ক্রমশঃ]

স্বপ্ন

অরবিন্দ ভট্টাচার্য

কোথায় সুড়ঙ্গপথে এতক্ষণ শান্ত হয়ে ছিল
অসহায় নজরবন্দীরা। অন্ধকার চাপ চাপ রক্তের মতন
এ'খানে ও'খানে, ক্ষীণ প্রাণ-প্রদীপের নীচে কি পড়িল
ইচ্ছার ত্রিশূলে গাঁথে অসমাপ্ত নশ্বর জীবন।
চের-চোল-চালুক্যের সভ্যতার আকণ্ঠ তিয়াসা,
মোগল-শিখের শৌর্য্য, হুরীদের প্রেম, ভালবাসা

মূর্ত্ত হয় অনবদ্য রঙে, যবে উত্তেজনা গাঢ় হয়ে এলে
রক্তের ছোঁয়াচ লাগে কল্পনায়—আকাশের ছায়া পথ
মেলে।

জ্যোৎস্না গুহ

ভারতের বুকে তখন নব ইতিহাসের চেতনা। । যেমন ব্যথায় রাঙ্গা তেমন আলোয় উজ্জ্বল। র্থান্বেষীর কুটিল চক্রান্তে ভারত দ্বিধা বিভক্ত লো। মুসলমান রাষ্ট্রে যে হিন্দুর দেশ পড়ল দের বুকে ত্রাস চোখে ভয় এই নিয়েই তারা ঃ বাড়ী ফেলে ছুটে আসতে লাগল ধর্ম নিরপেক্ষ ষ্ট্র ভারতে। দ্বিখণ্ডিত ভারতের পূর্ব বাংলাও র ব্যতিক্রম নয়। পশ্চিম বঙ্গের আকাশ তাস তাদের ক্রন্দনে ভারী হলো। "ওগো দুটি ত দেবে, একটু ফ্যান। একটু আশ্রয়, একটু থা গোঁজার ঠাঁই।" ক্ষুধা। একটা অরণ্যচর াগৈতিহাসিক দানবের ধারালো দাঁত দিয়ে ক্ষত ক্ষত করে দিচ্ছে তাদের। ভাত চাই, খাদ্য ই। রক্ত মাংস হাড়ের ভিতরে বিষাক্ত যন্ত্রণা। াও দাও আমাদের থাকতে দাও, তোমাদের শে।" আজ তারা উদ্বাস্তু, এর বেশী পরিচয় ার তাদের নেই।

পশ্চিম বঙ্গের কর্ম্মচঞ্চল সহর কলকাতা। য়ার-কণ্ডিশণ্ড রুমে, সেক্রেটারিয়েট ভবনে বসে হ্যাবিলিটেশন অফিসার সুজিত চ্যাটার্জি নিজের াজে ডুবে আছে। খুট্ করে দরজা খোলার ব্দ হলো, সুজিত চোখ তুলে চাইলে। বেয়ারা গিয়ে এসে এক খানা কার্ড হাতে দিতে, কার্ড-না চোখের সামনে ধরে নামটা পড়ল রূপশ্রী ানার্জি। একটু ভাবল না এ নামটি পূর্ব্বে নেছি বলে মনে হলো না। কার্ডখানা টেবিলে খে, বেয়ারাকে ইঙ্গিত করল, নিয়ে আসতে। য়ারা দরজা খুলে সসম্ভ্রমে এক পাশে সরে ড়াল। রূপশ্রীর দেহলাবণ্যে এবং দামী বিলিতী ণ্টের সৌরভে, ঘরের বাতাসে নববসন্তের আকুল াহ্বান যেন আকুলিত হয়ে উঠল। সুজিত মুগ্ধ বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকাল। রূপশ্রী তার দেহরেখায় ছন্দময় হিল্লোল তুলে এগিয়ে এসে চকিত দৃষ্টিতে চারদিক তাকিয়ে পদ্মকলির মত দুখানা হাত যুক্ত করে নমস্কার জানাল সুজিতকে। স্মিতহাস্যে সুস্মিত নমস্কার বিনিময়ের পরে, সম্মুখের চেয়ার দেখিয়ে বলল, "বসুন।" রূপশ্রী তার দামী সিল্কের শাড়ির ফস্-ফস্ আওয়াজ তুলে, নেহাৎ আগোছাল ভাবে বসল। কোলের উপর রাখল ভ্যানিটি ব্যাগটি। চঞ্চল দুটি আঁখির তারায় দুষ্টু হাসির খেলা। সুজিত যথাসম্ভব অফিসারি মেজাজ বজায় রেখে বলল, "আপনার জন্যে আমি কি করতে পারি।" লীলায়িত ভঙ্গীতে রূপশ্রী তার সুন্দর দুখানা হাত সম্মুখবর্তী টেবিলে লম্বাভাবে ছড়িয়ে দিয়ে, বিলোল কটাক্ষে তাকিয়ে বলল, "আচ্ছা, সুজিত দা, শিলং-এর রুমকীকে তোমার মনে পড়ে?" সুজিত যেন তার হারানো স্বপ্নকে ফিরে পায়। বিস্মিত কণ্ঠে বলল, "তুমি, তুমি রুমকী! বাব্বা, কি বদলে গেছ।" "সে প্রশ্ন আমারও। বদলানো বলে বদলানো।" হা-হা করে দরাজ গলায় হেসে সুজিত বলল, "খুব বদলেছি বুঝি।" "তা আবার বলতে।" আবার সুজিত হো-হো করে হাসে। রূপশ্রীর চোখে কৃত্রিম তিরস্কার, "কি হচ্ছে বলতো? লোক জড়ো হয়ে যাবে যে—" "যাক এত দিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা, হলোই বা লোক জড়ো।" "তার পরে তোমাদের খবর কি বলো।" রূপশ্রীর চটুল উজ্জ্বল চোখে নেমে আসে ছায়া। হঠাৎ যেন ওকে অনেক বয়স হয়েছে মনে হয়। স্থিরদৃষ্টিতে সুজিতের দিকে তাকিয়ে বলল, "তাই বলতেই তোমার কাছে আসা।" সুজিত ওর পরিবর্তন লক্ষ্য করে বলল, "কি ব্যাপার বলতো?"

"তোমার বাবা মা রন্টু মন্টু সবভাল আছেন তো ?" রূপশ্রী একটু চুপকরে থেকে উদাস কণ্ঠে বলল, "বাবা মারা গেছেন।" "কবে।" "এই কয়েক বছর আগে," "কোথায় আছ তোমরা।" "যাদব-পুর—বলতে পার জবর দখল কলোনী।" "ওঃ" কথা যেন থেমে যায়। নীরব নিস্তব্ধতা নেমে আসে ঘরে। রোদের লুকোচুরী খেলা চলে নিঃশব্দে। সে নিঃশব্দতা ভঙ্গ করে টেলিফোন বেজে উঠল। ফোন তুলে সুজিত ব্যস্ত কণ্ঠে বলল, "হ্যাঁ স্যার, এখুনি পাঠাচ্ছি ফাইলটা। ফোন রেখে সুজিত সহাস্যে বলল "রুমকী, তোমাকে একটু অপেক্ষা করতে হবে, ভাবী জরুরী কেস্। দিল্লীর থেকে রি-হ্যাবিলিটেশন মিনিষ্টার জানতে চেয়েছেন, উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন ব্যবস্থা কতদূর অগ্রসর হলো, শীঘ্র জানাও। এবং ওদের অভাব অভিযোগের পূর্ণ বিবরণ দাও।" হেসে সুজিত বলল, "মানে ডিটেলস্ ওদের সম্বন্ধে জানতে চেয়েছেন। কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। ওরা, মানে উদ্বাস্তুরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকবে। যাকগে কাজটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেলি। তারপরে তোমাদের বিষয় সব শুনবো।"

এই অবসরে রূপশ্রী ভ্যানিটি ব্যাগটি খুলে, প্রসাধন সামগ্রী বের ক'রে, রূপটাকে আরও একটু ঝালিয়ে নেয়। ছোট্ট আয়না মুখের সামনে ধরে, পাউডারের নরম পাফ্ টি মুখে বুলোয়। আইব্রো পেনসিলটা দিয়ে ভ্রূটা আরও একটু উজ্জ্বল করে। স্বেচ্ছাচারী চুলগুলোকে চিরুনীর সাহায্যে শাসন করল। তারপরে লিপষ্টিক্ বুলিয়ে ঠোঁট দুটিকে সরস করে নেয়। আয়নার বুকে নিজের প্রতিবিম্বকে একটু মিষ্টি হাসি উপহার দিয়ে জিনিষগুলি যথা-স্থানে রেখে, অপেক্ষা করে সুজিতের আর্জেন্ট ফাইলটা শেষ হওয়ার। সুজিতের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হয়। এযেন ক্ষণপূর্বের সে সুজিত নয়। সিরি-য়াস্ কাজের সুস্পষ্ট ব্যঞ্জনায় মুখপ্রদীপ্ত। মনে হয়না রূপশ্রীর উপস্থিতি ওর মনে আছে। ওর এই রূপ রূপশ্রীকে মুগ্ধ করে। শ্রদ্ধায় অন্তর ভরে যায়। "এই না হলে আর এত সুনাম হয়? উদ্বাস্তুদের বেদনা ও অন্তর দিয়ে অনুভব করে। অথচ ওদের দেশ পশ্চিম বঙ্গে। দেশ ঘর হারানোর ব্যথা ওকে কোন দিন পেতে হয়নি। পেতে হয়নি অভাবের জ্বালা। তবু ও অনুভব করে এর বাস্তব ভয়ঙ্কর রূপ। তাই উদ্বাস্তুদের এত শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস অর্জন করতে পেরেছে। উদ্বাস্তু নামে চিহ্নিত লোকগুলির অধিকার যে, এদেশের উপর পূর্ণ মাত্রায় আছে, সে কথাটাই সুজিতদা সকলকে বোঝাতে চায়। তারা যে আজকাল মানুষ নামের অযোগ্য হয়েছে তার জন্য ভারত-বাসীর অনেক খানি দায়-দায়িত্ব আছে। টাকা দিয়ে তাদের মনুষ্যত্ব আজ আর ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। শীর্ষ স্থানীয়েরা অবশ্য ভাবেন টাকা দিয়ে সব হয়। কিন্তু সবই পাওয়া যায়কি? নীতিভ্রষ্ট মানুষ আর হালভাঙ্গা নৌকো তলিয়ে যাবেই। তলিয়ে যাওয়ার আলোড়নের আঘাত হানবে সমাজের সকল স্তরে। আজ গোটা কয়েক টাকা ছড়িয়ে দিলেই কি সব সমস্যার সমাধান হবে? তা হবে না। তাই এদের ক্ষতিপূরণ কেউ করতে পারবে না। দেশের আত্মা যখন তার অর্দ্ধাংশকে অস্বীকার করল, তখনই উপেক্ষিত অংশের মৃত্যু ঘটেছে। আজ মৃতদেহে জীবন সঞ্চারের বৃথা প্রয়াস।

উদ্বাস্তু বহিরাগত বলে যাদের অবহেলা করেছে, অপমান করেছে, একদিন 'অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান...।" প্রায় একঘণ্টা, ফাইলটা শেষ করে সুজিত টেবিলের উপর কলিংবেলে চাপ দিতে বেয়ারা ছুটে আসে। ফাইলটা যথা-স্থানে পৌঁছে দিতে চাপরাসীকে নির্দেশ দিয়ে সুজিত একটু হেসে রূপশ্রীকে বলল, "এবারে তোমাদের কথা শুনবো।" দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট কামড়ে রূপশ্রী বিষণ্ণ একটু হেসে, যেন বিশেষ একটি ঘটনা বলার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে নেয়। তারপরে বলতে লাগল—শিলং-এর বাবার হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিক্ কোম্পানীর চাক-রীটা একটা মিথ্যা অভিযোগ চলে গেল। দাদার সঙ্গে বাবার "বস্" বিপিন বাবুর ছেলে ভবানী পড়তো। কি নিয়ে ওদের মধ্যে খুব ঝগড়া হয়। সেই থেকেই একটা অসন্তোষ ধোঁয়াতে থাকে। একদিন দাদাকে ভবানী বিদ্রূপ করে বলল, "একটা কেরাণীর ছেলের আবার এত জেদ?" দাদা বাড়ী এসে বাবাকে সে কথা বলতে, বাবা রেগে আগুন হন—তখুনি চান রেজিগনেশন দিতে। মা

ধীর স্থির প্রকৃতির মানুষ, গম্ভীর ভাবে বললেন, "পাগলামী করোনা। চাকরী ছাড়া মানেই তিনটে ছেলে মেয়ে নিয়ে উপোস করে মরা।" কিন্তু তখন ছাড়লেই মানের সঙ্গে আসতে পারতেন। এ ঘটনার প্রায় একমাস পরে কোম্পানীর ম্যানেজার বাবাকে ডেকে পাঠালেন। ম্যানেজার সাহেবের ডাক শুনে বাবার পিলে চমকে উঠল। বাবার মত নীচস্থ লোককে বড় একটা তিনি ডাকেন না। ডাকলেই দুর্গা নাম জপতে হয়। ম্যানেজার সাহেব একটা কাগজ বাবার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "এরপরও আপনাকে আর রাখা চলে কি?" কাঁপতে কাঁপতে বাবা, কাগজটা পড়ে দেখলেন; বিপিনবাবুর দীর্ঘ নোট। তাতে শিগ্‌গিরই যে একটা "ফ্রড" হয়ে গেছে সেটার সঙ্গে বাবার নাম বিশেষ ভাবে জড়িত। বাবা এই সবৈব মিথ্যা অভিযোগে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। শুধু বললেন, "স্যার, এ অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা।" কিন্তু প্রমাণ অভাবে বাবার চাকরীটি গেল। সুজিত, শুষ্ক ঠোঁঠ জিব দিয়ে ভিজিয়ে বলল, "তারপর।" রূপশ্রীর মুখে একটু বিষণ্ণ হাসি। "তারপরে আমরা শিলং থেকে চলে এলাম আমাদের পূর্ববঙ্গের দেশের বাড়ীতে। বাবা, অনেক ধরাধরি করে একটা প্রাইমারী স্কুলে চাকরী জোগাড় করলেন। কোন প্রকারে পাঁচটি প্রাণীর খাওরা পরা চলতে লাগল। বাবার কাছে বাড়ীতে আমরা পড়তে লাগলাম। দাদার খুব স্কুলে পড়ার ইচ্ছা ছিল, ইচ্ছা ছিল লেখাপড়া শিখে আরো অনেক বড় হওয়ার। গরীবদের অনেক ইচ্ছাই দীর্ঘশ্বাসের তলায় চাপা পড়ে যায়; দাদারও গেল।" রূপশ্রীর মুখে ম্লান হাসি। সুজিতের তা দেখে মায়া হয়, তাকিয়ে থাকে। রূপশ্রী ফিক্ করে হেসে বলল, "এত কি দেখছ বলতো?" "তোমাকে," "আমাকে? কেন বলতো?" আবার দু-জনের হাসি। সুজিত মনে করিয়ে দেয় "বলো তারপরে?" রূপশ্রীকে হঠাৎ গম্ভীর দেখায়, বলল, "তারপরের ঘটনাও বলতে হবে? হোক তা যতই নিন্দনীয়।" "না না তোমার বলতে সঙ্কোচ হয়, এমন কিছু আমি শুনতে চাই না।" রূপশ্রী সোজা-সুজি সুজিতের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "কিন্তু, আমার যে বলতেই হবে সুজিতদা। না-না তোমাকে না শুনিয়ে আমার উপায় নেই।" বড় ক্লান্ত দেখায় রূপশ্রীকে। সুজিত বেয়ারাকে ডেকে দু-কাপ চায়ের অর্ডার দেয়।

চায়ের সঙ্গে চলে গল্প, "প্রাকৃতিক নিয়মেই দিনগুলি চলে যেতে লাগল। আমাদের সংসারও ঠিক চলা নয়—খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে দিনের সঙ্গে তাল রেখে চলতে লাগল। কিন্তু মুস্কিল হলো, যুদ্ধ শেষে দেশ ভাগ হয়ে। আমাদের দেশ পড়ল, পাকিস্থানে। বাবা তাঁর মাইনে কোন দিনই ঠিক মতন পেতেন না। এখন হিন্দুরা দেশ ছেড়ে অনেকেই ভারতে চলে আসতে, স্কুলটি প্রায় উঠে যাওয়ার দাখিল হলো। দাদাকে কিছুদিন আগেই বাবা গ্রামের জমিদার দীনবন্ধু বাবুর হাতে পায়ে ধরে, তাঁর সেরেস্তায় একটি মহুরীর কাজ জুটিয়ে দিয়েছিলেন। দাদা যেদিন প্রথম কাজে গেল সেদিন যত কাঁদলো দাদা, তার চেয়ে বেশী কাঁদলেন মা। বাবা, ওদের কান্না দেখে রেগে গেলেন, বললেন "একি কাঁদবার সময়, কোন রকমে বেঁচে থাকতে হবেতো। যা-দেশের অবস্থা, অনেক কাঁদতে হবে। এই সামান্য কারণে চোখের জলের অপব্যায় করো না। আর কান্নার হয়েছে কি? ছেলের ছোট চাকরী হলো এই তো? আরে সকলেই কি লাটগিরি পায় নাকি। যত সব...।" মা, আঁচল দিয়ে দাদার চোখ মুছিয়ে বললেন, "কাঁদিসনে বাবা, সকলেই কি সবকিছু পায়।" বাবা, ক্রুদ্ধদৃষ্টি হেনে বললেন, "দেনায় তলিয়ে গেছি, জিনিষ-পত্র অগ্নিমূল্য, তাও সব কিছু পয়সা দিলেও পাওয়া যাচ্ছে না। আমি দীনবন্ধু বাবুর কত হাতে-পায়ে ধরে, ছোঁড়ার জন্যে কাজটা জোগাড় করলাম, আর কিনা তা নিয়ে মায়ে পোয়ে কান্নাকাটি চলছে!" পরের দিন দীনবন্ধু বাবুর সেরেস্তার কাজে যোগ দিল রন্টু, বৃদ্ধ, প্রৌঢ় নানা বয়সের মহুরীর সঙ্গে জমিদারীর আয়-ব্যয়ের হিসাব মেলাতে। সুজিত বলল, "আহা, রন্টুর কথা শুনে ভারী কষ্ট হলো। ছোট বেলায় ওর পড়াশুনায় বেশ মন দেখেছি।" রূপশ্রী ছোট্ট একটি হাই তার সুন্দর হাতের আড়ালে শেষ করে বলল, "গরীবের আবার লেখাপড়ায় মন।" সুজিত প্রশ্ন করল, "আচ্ছা, এত দিন

পরে আমায় খোঁজ পেলে কি করে?" "সংবাদ পত্রে তোমার নানাবিধ গুণাবলীসহ সংক্ষিপ্ত জীবনীও বেরিয়েছিল যে। ঐ সূত্রধরেই তোমার কাছে এসেছি। কাগজে তোমার বাবার নাম, এবং শিলং কন্‌ট্রোলার অফিসে সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট ছিলেন তা পর্য্যন্ত লেখা ছিল। তা না হলে তুমি যা বদলেছ, কিছুতেই চিনতে পারতাম না।" সুজিত হেসে বলল,—"সেটা তোমার বা আমার দোষ নয়; দোষ যদি কারুর থাকে তা সময়ের।"—"তা বলতে পার" বলে, রূপশ্রী কৌতুক করার লোভ সামলাতে পারে না। বলল, "যাই বলো, কলকাতার জল-হাওয়ার তুমি একটি জীবন্ত বিজ্ঞাপন। সুন্দর পেশল দেহটি বাগিয়েছ বেশ।" সুজিত হেসে বলল, "দিলে তো নজর! যাক ওসব কথা, তুমি পরের ঘটনা বলো।"—"পার্টিশনের পরও আমরা দেশেই থেকে গেলাম। কিন্তু দেশের অনেক হিন্দুই পালাতে লাগল। বাবার স্কুলটিও ছাত্রাভাবে বন্ধ হয়ে গেল। দাদার চাকরীটি অবশ্য তারপরেও কিছুদিন ছিল। তাই কোন রকমে আধ পেটা খেয়ে দেশেই পড়ে রইলাম। একদিন শুনছি, বাবাকে মা বলছেন, "বলি, রুমকীর দিকে ইদানীং তাকিয়ে দেখছ? মেয়ের দিকে যে আমি আর তাকাতে পারিনা।" বাবা একটুতেই রেগে যান, বললেন, "দ্যাখ, যা বলবে এক কথায় বল, হেয়ালী আমি দু-চক্ষে দেখতে পারি না। কি হয়েছে রুমকীর? সে কথা খোলসা করে বল।" মা বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বললেন, "মরণ আর কি! দুটো সুখ-দুঃখের কথা বলে যে হালকা হবো, তারই কি জো আছে? বলি, চোখের মাথা খেয়েছ নাকি? মেয়ে যে মর্ত্তমান কলার মত বেড়ে উঠেছে। আধপেটা খেয়েই এই, পুরো খেলে কি হতো? ভয়ে আমার বুক শুকিয়ে যাচ্ছে। এখনও চেষ্টা চরিত্তির করে, এ দেশ থেকে মেয়ে নিয়ে পালিয়ে যাই, চল।" এই দেশ। যে দেশ কিছু দিন আগেও, জননী জন্মভূমি ছিল, সুখে-দুঃখে কত বড় আশ্রয়। আজ তার চোখ বিমাতৃসুলভ নির্দয়তায় ক্রূর কুটিল। তার বিষদৃষ্টি থেকে যতদূর সম্ভব পালিয়ে বাঁচতে হবে। বাবা বললেন "কোথায় যেতে চাও শুনি?" "কেন, কলকাতায়," "কোলকাতায় গিয়ে কোথায় মাথা গুঁজবো? না বায়ুভূত হয়ে হাওয়ায় ঘুরে বেড়াব?"—"তা তুমি যাই বল, এখানে ঐ সোমত্ত মেয়ে নিয়ে একদণ্ডও থাকতে ইচ্ছে হচ্ছে না। আর অভাগীর রূপ নয় তো আগুন।" আড়াল থেকে মার কথা শুনে, প্রথম সে দিন নিজের দিকে বেশ ভয়ে ভয়ে তাকালাম। লজ্জায় চোখ বুঁজে এলো। না না, আমাদের গরীবের ঘরে এত রূপ কেন! এ আপদ এখন সামলাই কি করে। মার চোখে আতঙ্কের ছাপ, এবার বাবারও দুশ্চিন্তার কারণ হবে, একি করলেন ভগবান! এই রূপের জন্যে সে দিন প্রাণভরে ভগবানকে অভিসম্পাত দিয়েছিলাম।" সুজিত অভিভূত হয়ে শুনছিল। বলল, "তারপর।" "তারপর দাদার চাকরীটিও গেল কারণ দীনবন্ধুবাবুরা সকলে কলকাতায় যাচ্ছেন, দেশের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে, জায়গা-জমি বিক্রি করে। বাবা বললেন মাকে, "তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হলো। দেশে থাকার আর কোন উপায় রইল না। চল, ছেলে মেয়ের হাত ধরে কলকাতায়, যা হোক একটা হবেই উপায়।" মা, তাঁর গৃহস্থালির হাঁড়ি-কুঁড়ি, ডালা-কুলো, কৌটো-বাটার দিকে তাকিয়ে মমতায় কাঁদছেন, এসব কিছুই নেওয়া যাবে না। এর প্রতিটি জিনিষ তাঁর বাৎসল্য-রসে সিক্ত। এদের ফেলে যাওয়া মানে, নিজের পুত্র-কন্যা ফেলে যাওয়ার দুঃখ। মার অবস্থা দেখে আমার কষ্ট হলো। তবুও সব কিছু ছেড়ে আসতে হলো।

একদিন গভীর অন্ধকার রাত্রে আমরা আমাদের বহু পুরাতন ভাঙ্গা ঘরটিতে একটি মরচেপড়া তালা ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। সঙ্গে যৎসামান্য গুটিকতক জিনিষ। যাত্রার আগে মা আমাকে মোটা ধূসর রঙের একটা চাদর হাতে দিয়ে বললেন, "মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত বেশ ভাল করে জড়িয়ে নাও।" আমি অবাক হয়ে বললাম, কেন? কি বিশ্রী দেখাবে বলতো? মা চাপাস্বরে বললেন, "ঐ-জন্যেই তো বলছি। আয় তো আমার কাছে" বলে, কি যেন কালো ধুলোর মত খানিকটা আমার মুখে মাখিয়ে দিলেন। আমি রেগে গেলাম, কি মাখালে? মা হাসলেন। মরা মানুষে যদি হাসে ঠিক সেই রকম। বললেন, "দুষ্টু লোকের নজর যাতে না

লাগে, সেইজন্যে ঐ সব করতে হয়।" যাই হোক, আমাদের যাত্রা কালে অন্ধকার ভেদ করে একটু চাঁদের মরা আলো পড়ল আমাদের কুঁড়ে ঘরখানার উপর, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘরখানা যেন কাঁদছে। ওকে যে আমরা এত ভালবাসতাম, তা বোঝা গেল ছেড়ে আসার সময়। বুকটা মুচড়ে মুচড়ে কান্না আসতে চায়। বেদনার সে এক অসহ্য যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা। ঘরখানার ভাঙ্গা চোরা কুশ্রী রূপটা এতদিন আমাদের সকলেরই বিরক্তির কারণ ছিল। কিন্তু আজ সে যে এমন করে কাঁদাবে, তা কেউ কি ভেবেছিলাম। সকলের চোখ ভেজা, ফিরে ফিরে তাকাচ্ছি। বাবা যেন জীবন যুদ্ধের নির্ভিক সৈনিক। বাঁচতে হবে, বাঁচাতে হবে এই একটিই তাঁর সঙ্কল্প। আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এগিয়ে চল। পিছন ফিরে তাকানো মানুষের ধর্ম নয়। তাকে এগিয়ে যেতে হবে অগ্রগতিই তার জীবনের লক্ষ্য। প্রতিকূল অবস্থায় হতাশ হলে চলবে না। প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করার নামই তো জীবন, মুছে ফেল চোখের জল। বিপদের সঙ্গে সংগ্রামী মনোভাব নিয়ে এগিয়ে চল।" সেদিন বাবার কথায় আমরা নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলাম।" সুজিত বলল, "তোমাদের উপর দিয়ে যে ঝড় বয়ে গেছে, কাগজের কল্যাণে আমরাও কিছু কিছু জানতে পেরেছি।"

লাস্যময়ী রূপশ্রী বলল, "না, কিছুই জানতে পারনি। এ ব্যথা কি কাগজের বুকে প্রকাশ পায়? পায় না। এ ব্যথা সন্তান হারা পিতা মাতার বক্ষের সমতুল্য। দেশ, গৃহ, সমাজ, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য হারানোর যে কি ব্যথা তা কি করে তোমাকে বোঝাব। তোমরা কিছু রিফিউজি ক্যাম্প এবং ডোল দিয়ে এই দায় থেকে নিজেদের মুক্ত করতে চাও কিন্তু তা হয় না। রাহুর প্রেমের মতই দুর্বিষহ যন্ত্রণায় ছটফট করবে ভারতচন্দ্রমা। যেদিকে তাকাবে সেইদিকেই ঐ ছিন্নমূল মুখগুলি তাকে পাড়িত করবে।" অপরাধী গলায় সুজিত বলল, "পথে আর কোন অসুবিধা হয়নি তো?" "হয়েছিল বৈ কি। ষ্টেশনে আসার পথে, আমার রূপ যৌবনে প্রলুব্ধ হয়ে দুজন মুসলমান গুণ্ডা আমাদের আক্রমণ করলে। বাবার তখন মনে অপরাজেয় শক্তি। ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে রুখে দাঁড়ালেন। ভগবান সে দিন আমাদের মান ইজ্জত রক্ষা করলেও বাবার একখানা পা দুর্বৃত্তদের লাঠির আঘাতে হাঁটুর থেকে ভেঙ্গে ঝুলতে লাগল। কিন্তু সেদিকে তাকানোর সময় নেই কারুর। বাবার বেহুঁস দেহটা দাদা কাঁধে নিয়ে ছুটতে লাগল। যাহোক আমরা গাড়ীতে উঠতে পারলাম। বাবার পাখানা দাদা তার ধুতির খানিকটা ছিঁড়ে বেঁধে দিলে। অসহ্য যন্ত্রণায় বাবা অচৈতন্য হয়ে পড়ে রইলেন। মা মুখে আঁচল পুরে ঘুরে বসে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলেন। সে সময়কার অবস্থা আমি তোমাকে ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারবো না সুজিতদা।

শেয়ালদা এসে পৌঁছোলাম আমরা। আশ্রয় পেলাম আর পাঁচটা রিফিউজির সঙ্গে, ষ্টেশনের একপ্রান্তে। বাবাকে দাদা হাসপাতালে ভর্তি করে দিলে। য' দুচার টাকা সঙ্গে এনেছিলেন মা, তা চিকিৎসা এবং আমাদের খাওয়ার খরচ চালাতে নিঃশেষ হয়ে গেল। দু-মাস বাদে বাবা হাসপাতাল থেকে ফিরে এলেন খোঁড়া অবস্থায়। হাঁটুর নীচের অংশটা বাদ দেওয়া হয়েছে। আমাদের দেখে বাবা হাসলেন, কি মর্মান্তিক সে হাসি। হাসতে হাসতেই বললেন, "সেদিন ব্যাটাদের খুব জব্দ করেছি। যা ঠেঙ্গিয়েছি কিছুদিন ওদের মনে থাকবে, বলে নিজের খোঁড়া পা-খানার দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। আমি আর সেখানে দাঁড়াতে পারলাম না। এদিকে আমাদের তখন প্রায়ই উপোস যাচ্ছে। ক্ষুধা তার দাবী সরবে ঘোষণা করছে। ইচ্ছা হচ্ছে নিজেদের হাত-পা খানিকটা কামড়ে খাই। বাবার বয়স হয়েছে, তার উপর অসুস্থ। তিনি ক্ষুধার তাড়নায় শয্যা নিলেন। কণ্ঠস্বর হলো ক্ষীণ, চোখে অস্বাভাবিক লোভের প্রকাশ। দোকানে খাদ্য সামগ্রী থরে থরে সাজানো, বাবা লোলুপ দৃষ্টি মেলে সেদিকে তাকিয়ে থাকেন। ছোট শিশুর মত ঝোল টানেন জিবে। ন্যায় নীতি তখন আমাদের পেটের ক্ষুধার আগুনে পুড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। দাদা ছোড়দা পকেট কাটতে সুরুকরল প্রথম যেদিনছোড়দা পকেট কেটে চার টাকা এনে মার হাতে দিল, মা জ্বলন্ত অঙ্গারের মত ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। ছোড়দা কুড়িয়ে আনলো। বাবা শত ছিন্ন ময়লা বিছানাটার উপর

আধ শোয়া অবস্থায় ছিলেন, উত্তেজনায় উঠে বসলেন। আদেশের সুরে বললেন, "যা মণ্টু চাল ডাল, সব কিছু কিনে নিয়ে আয়। আঃ অনেক দিন পরে রাইসের সঙ্গে দেখা হবে।" মাকে বিদ্রূপ করে বললেন, "অমন করে হাত গুটিয়ে বসে আছ কেন? উঠো ধর্ম্মপুত্রী, উনুনটা জ্বালাও। মণ্টুর আর ফিরে আসতে কতক্ষণ লাগবে। ততক্ষণে উনুনটা জ্বলে উঠবে।" বাবা খোঁড়া পা-খানা আনন্দে নাচাতে লাগলেন। সেদিন, অনেক দিন পরে আমরা পেট ভরে খেলাম। কিন্তু মা সেই চোরা টাকার অন্ন মুখে তুলতে পারলেন না।" রূপশ্রী একটু দম নিয়ে সুজিতকে বলল, "আচ্ছা সুজিতদা, তুমি তো রিহ্যাবিলিটেশন অফিসার, কর্ত্তব্যের খাতিরে উদ্বাস্তু নামক জীবগুলিকে দেখতে শেয়ালদা ষ্টেশনে দু-একবার গেছ নিশ্চয়।" "তা যেতে হয়েছে বৈকি।" "আচ্ছা সেখানে ভাঙ্গা তোবড়ানো রংচটা টিনের বাক্সের ওপর কোন যুবতীকে ছিন্নবস্ত্রে নিজের অনাবৃত যৌবনকে ঢাকবার মিথ্যা প্রয়াসে ব্যস্ত দেখে থাকবে। সে যে আমি নয়, হলপ করে বল্‌তে পার?" সুজিত অস্বস্তিতে নড়ে-চড়ে বসে। রূপশ্রীর অধরে তীক্ষ্ণ হাসি। তীব্র জ্বালাভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রূপশ্রী বলল, "এইখানেই শেষ নয়। বহুলপ্রচার কাগজের রিপোর্টারদের এই-দৃশ্য ক্যামেরায় বন্দী করে জনগণকে দেখাবার সেকি উৎসাহ। কেউ বলছেন, আঃ ঢেকো না, যেমন আছে ঠিক তেমনি থাক। খুট করে শব্দ হলো, বুঝলাম রিপোর্টার মহাশয়ের কার্য্যসিদ্ধি হয়েছে। তার উপর আছে, নির্লজ্জ পথিকের আদিম প্রবৃত্তির কৌতূহল। কোথায় ছিদ্রপথে দেখা যাচ্ছে শরীরের একটু অংশ, তা দৃষ্টি দ্বারা লেহন করছে।" সুজিত উত্তপ্ত কণ্ঠে বলল, "রাস্কেল। রণ্টু সণ্টু ওগুলোকে চাবকাত না কেন?" "কত চাবুক মারবে? এত নিত্যদিনের ব্যাপার। কিছু দিন এরকম চলার পরে, দাদা একটা সুখবর আনলে। তখন রাত প্রায় দশটা। ক্ষুৎপিপাসায় কাতর উদ্বাস্তুরা সকলে ঘুমোচ্ছে। আমাদের একটু করে মুড়ি আর জল চলছিল ক'দিন থেকেই। বাবার চোখে ঘুম নেই। দাদা কাছে বসে ফিস্‌-ফিস করে বলল, "যাদবপুরে একটা জায়গার খোঁজ পেয়েছি। অবশ্য লোক বসতির অযোগ্য।" বাবা, উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে উঠে বসলেন, ভীত শ্বাপদের মত চারদিক তাকিয়ে অত্যন্ত নিম্ন-স্বরে বললেন, "জায়গাটা কার জানিস কিছু?" "না। ঘন জঙ্গলের মধ্যে একটুকরো সিমেণ্ট করা জমি পড়ে আছে। হয়তো বহুকাল আগে কিছু কাজের জন্যে তৈরী হয়েছিল। এখন জমিটুকু জঙ্গলে ঢেকে ফেলেছে। সামনে একটা পানাভরা পুকুরও আছে। ধারে কাছে বসতি নেই।" দাদার একথা শুনে বাবা যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। বললেন, "রাত তিনটের সময় বের হবো। কেউ দেখলে বলবি, আমরা এক আত্মীয়ের বাড়ী যাচ্ছি।" মার ঘুম ওদের ফিস্‌ ফিসানীতে ভেঙ্গে গেল। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে বাবাকে বললেন, "কিগো?" বাবা সব কিছু বললেন। মা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, এও আমার কপাল ছিল। পরের জমি টের পেলে ঘাড় ধরে বের করে দেবে।" বাবা বিরক্ত হলেন, মার এই উক্তি শুনে। অধীর আগ্রহে সময়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন। রাত্রি তখন আড়াইটে। নিঃশব্দে বাবা মাকে ঠেলে বললেন "ওদের তোল। এবার রওনা হতে হবে।" আমরা যেন সব বোবার দল। কারুর মুখে শব্দ নেই। দাদা, মাথায় নিল ভাঙ্গা বাক্সটা। ছোড়দা চটজড়ানো বিছানাটা, বাবা জলের কুজো, মা হ্যারিকেন আর পাখা। আমার হাত দুখানা নিযুক্ত রইল, নিজেকে সামলাতে। মা কাছে এগিয়ে এসে বললেন, "কোন দিকে যদি মেয়ের খেয়াল থাকে, ছেঁড়া জামা দিয়ে যে গা বেরিয়ে রয়েছে?" নিজেই ঢাকবার অযথা চেষ্টা করে, বিরক্ত হয়ে আমার উপর রেগে গেলেন। "এই সেদিনের জামাটা এর মধ্যে এমন করে ছিঁড়েছিস? একটু যত্ন নেই জিনিষের।" অথচ মা নিজেও জানেন, ব্লাউজটার বয়স বোধহয় কম করেও দেড় বছর। একটি ছাড়া দুটি নেই, আর কত দিন চলতে পারে। যাক্‌, আমরা এসে গেলাম, দাদার নির্দিষ্ট জমিতে। পূবের আকাশ তখন ফর্সা হয়ে এসেছে। দু-চারটে পাখী কলস্বরে নতুন দিনকে স্বাগত জানিয়ে নীল আকাশে উড়ে গেল। বাবাকে বড় ক্লান্ত দেখাল। খোঁড়া পায়ে এতখানি রাস্তা হেঁটে এসেছেন। হাতের কুঁজোটা সেই জঙ্গলে ঢাকা সিমেণ্টের

উপর রেখে বসে পড়লেন। দাদা, ছোড়দাও মাথার বোঝা নাবিয়ে, জায়গাটা পরিষ্কার করতে লেগে গেল। এতক্ষণে যেন মার চোখে একটু খুশী ঝিলিক দিল। খুশী গলায় আমাকে বললেন, "ছাখ কেমন অযত্নেও লাউ-কুমড়োর গাছগুলি বেড়ে উঠেছে। কত রকমের শাক-পাতা। আম গাছটা ঝেঁপে বোল এসেছে। কচি আমের অম্বল খেতে বেশ।" আমার কিন্তু এতসব লোভের বস্তু দেখেও, জায়গাটা পছন্দ হলো না। আমরা যেন কোন্ আদিম যুগে চলে এসেছি। সভ্যতার আলো এসে এখনও পৌছায়নি। সকলের এত আনন্দের মাঝে নিজেকে ব্যতিক্রম মনে হলো। চেষ্টা করলাম নিজেকে মানিয়ে নিতে।

বাবা, দাদাদের কাজে উৎসাহ দিচ্ছেন। আজ যেন তিনি জয়ী। পেয়েছেন বাসস্থান, ভাতের ব্যবস্থাও ক্রমশঃ হবে নিশ্চয়। মা বললেন, "পরিষ্কার তো হলো, কিন্তু মাথার উপর একটু আচ্ছাদন না হলে তো বাস করা যাবে না।"

এ কথাটা যেন এতক্ষণ মনেই ছিল না কারুর। তাই তো! মা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে নিজের হাতের সোনা বাঁধানো লোহা গাছা, দাদার হাতে দিয়ে বললেন, "যা স্যাকরার দোকানে নিয়ে সোনাটুকু খুলে বিক্রি করে ঘরখানা তৈরীর মত জিনিষ কিনে আন।" এত সহজে সমস্যার সমাধান হতে দেখে সকলেই খুশী। হলো আমাদের একখানা খড়ের ঘর। না, ঘরামীর দরকার হয় নি। দাদারা নিজেরাই তৈরী করল। সে তো আর ঘর নয়—কোন রকমে মাথা গোঁজার আশ্রয়। মার মধ্যের গৃহিণী, গৃহ পেয়ে আবার ঘরকরণায় মেতে উঠলো। পানাভরা এঁদো পুকুরটাই আমাদের জলের প্রয়োজন মেটাত। বঁড়শী দিয়ে ছোড়দা মাছ ধরতো মাঝেমধ্যে। আর জঙ্গল থেকে শাক পাতা মা তুলে এনে সেদ্ধ করতেন। চলছিল এই প্রকার। কিন্তু এও বেশীদিন নয়। নীরব উপেক্ষায় যে জমি এতদিন পতিত হয়ে ছিল, সেও প্রাণের স্পর্শ পেয়ে মূল্যবান্ হলো। মহৎ ইচ্ছার ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতায় কয়েকদিনের মধ্যেই, উদ্বাস্তু কলোনীতে পরিণত হলো। কি করে টের পেলে জানি না, ব্যাঙের ছাতার মত ছোট ছোট চালাঘরে জায়গাটা ভরে গেল। জঙ্গল সাফ্ হয়ে গেল। আমার ভালই লাগল। প্রতিবেশীদের ভালবেসে, হিংসে করে, সময়েতে ঝগড়া-কোঁদল করে, কলোনীর দিনগুলো কেটে যেতে লাগল। ভগবান্ও বোধহয় আমাদের উপর একটু প্রসন্ন হলেন। এত দিনে দাদা একটা কাপড়ের দোকানে হিসেব লেখার পঁচিশ টাকা মাইনের কাজ পেল। ছোড়দাও বসে নেই। এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের দুখানা গাড়ী ধুয়ে দশ টাকা পেত। এই পঁয়ত্রিশ টাকায় আমাদের কোন রকমে দিন চলে যাচ্ছিল। বাবার কাছে আমি আবার পড়তে লাগলাম। প্রায় বছর খানেক পরে দাদাকে আমি বললাম, আমি প্রাইভেটে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে চাই। দাদা শুনে খুব খুশী।' নিজের তো কিছু হলো না, যদি বোনের হয় তাতেও অনেকটা আত্মতৃপ্তি। কিন্তু বাবা শুনে হাসলেন। বিদ্রূপ করে বললেন "কুঁজোর চিৎ হয়ে শুতে সাধ হয়।" শেষ পর্য্যন্ত পরীক্ষা দেওয়া ঠিক হলো। কিন্তু ফিসের টাকার জোগাড় হবে কি করে? হঠাৎ কানে হাত দিয়ে মনে হলো এখনও মাকড়ী দুটো আছে। আশ্চর্য্য লাগল, এত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও এ দুটো টিকে রইল কি করে! খুলে দাদার হাতে দিয়ে বললাম, এই দুটো বিক্রি করেই আমার ফিসের টাকা হবে নিশ্চয়।

পাশ করলাম থার্ড ডিভিসনে। একটু মুশরে পড়লাম।

দাদা হেসে বলল, "পাগল নাকি। পাশ করেছিস এই কত—আবার ডিভিসন! তাছাড়া ডিভিসনের দাম দু-দশদিন তারপরে শুধু পাশ—ব্যস, তা তো হয়েছিস। এবারে টাইপটা শিখে নে।" আমি বললাম "শিখতে টাকা লাগবে না?"—"সে হয়ে যাবে।" পরে জানতে পেরেছিলাম, অবসর সময়ে দাদা বিড়ি বেঁধে আমার পড়ার খরচ চালাত।

কিন্তু ভগবানের প্রসন্নতা আমাদের উপর বেশী দিন রইল না। কিছু দিনের মধ্যেই নিরন্ধ্র অন্ধকারে আমাদের জীবন ঢেকে ফেলল। বাবার শরীর কিছু দিন যাবৎই খারাপ যাচ্ছিল। এখন প্রায় শয্যাগত হয়ে পড়লেন, ঘুষঘুষে জ্বর সর্দিকাসী। মা বললেন দাদাকে, "এবার তোর বাবাকে হাসপাতালে না নিয়ে গেলে চলছে না।" দাদা বলল, সে কথা আমিও ভেবেছি। পরশু নিয়ে যাবো।" দাদার কাঁধে ভড় দিয়ে বাবা, অতিকষ্টে হাসপাতালে

গেলেন। ডাক্তার দেখে বললেন, "মশাই, রোগ আপনার সিরিয়াস। সব কিছু এক্জামিন না করে কিছু বলতে পারি না। তাতে সময় এবং অর্থ দুয়েরই প্রয়োজন।" সময় যদি বা আছে—কিন্তু অর্থ কোথায়? দাদাকে একটু আড়ালে ডেকে ডাক্তার বললেন, "আমার মনে হয় টি, বি। এখানে সে চিকিৎসা সম্ভব নয়।" সে দিন বাবার চোখে নৈরাশ্যের যে ঘনীভূত রূপ দেখেছিলাম, তাতে আমার জীবনের মূল শুদ্ধ নাড়িয়ে দিল। পথের পরিশ্রমে বাবা অস্থির হয়ে পড়লেন। শুয়ে হাঁপাতে লাগলেন। মা তা দেখে ব্যাকুল হয়ে দাদাকে বললেন, "রমেশবাবুকে ডেকে নিয়ে আয়, রন্টু।" রমেশবাবু আমাদের কলোনীরই একজন। হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসা করেন। একটাকা দক্ষিণা দিলেই তাকে আনা যায়। তাই অসুখ বিসুখে আমরা ওকেই ডাকি। একেবারে যে ভাল হয় না তা নয়। রমেশবাবু বাবাকে পরীক্ষা করে বললেন, "হার্টের অবস্থা খুব দুর্ব্বল"—মোটেই নড়াচড়ার শক্তিও তখন ছিল না বাবার। দাদার চোখে দেখলাম একটা হিংস্র আলো। এই ঘটনার পরের দিন, দাদা রাত্রে আর দোকান থেকে ফিরল না। সারারাত মা ঘরবার করে কাটালেন। সকালবেলায় দাদা এল না, এল পুলিশ। দাদা নাকি সেই কাপড়ের দোকানের মালিককে ছোরা মারার অপরাধে গ্রেফ্তার হয়েছে। মামলা চলল কিন্তু একতরফা। দাদার পুরো পাঁচ বছর জেল হলো। দাদার আয়েই সংসার চলতো, এখন একেবারেই অচল হয়ে পড়ল। ছোড়দার দশ টাকাই একমাত্র ভরসা। আবার ক্ষুধা তার বীভৎস রূপ নিয়ে দেখা দিল। বাবার অবস্থাই হলো শোচনীয়। একে অসুস্থ, তার উপর পথ্য পাচ্ছেন না। কষ্টে তাঁর রুগ্ণ চোখ দিয়ে যখন জল গড়িয়ে পড়ত, তখন তা দেখে, মানুষ হওয়ার অপরাধে নিজেকে নিষ্ঠুর ভাবে পীড়ন করেছি। কত জায়গায় চাকরীর জন্যে চেষ্টা করেছি। কিন্তু সব জায়গায়ই শুনেছি, "নো ভেকেন্সি", কোথায়ও স্থান পাইনি। দু একজন দয়াপরবশ হয়ে যদি বা পরীক্ষার সুযোগ দিয়েছেন, কিন্তু স্পিড কম বলে হেসে বলেছেন, "এত কম স্পিডে কাজ দেই কি করে বলুন তো।" এই চলেছে দিনের পর দিন।

একদিন রাত্রি তখন গভীর, নিঃশব্দ রাত্রির স্তব্ধতা ভেদ করে একটা গোঁঙানী শোনা গেল। মা আঁৎকে উঠে আমাকে ঠেলে বললেন, "তোর বাবার গলা না?" মার ভীতি ব্যাকুল চোখের দিকে তাকিয়ে আমি ভয়ে পাথর হয়ে গেলাম। আমরা ছুটে যখন বাবার শয্যাপার্শ্বে গেলাম তখন বাবার প্রায় শেষ অবস্থা। দৃষ্টি ঘোলাটে, বাক্‌শক্তি রহিত। কিন্তু সেই ঘোলাটে দৃষ্টি দিয়ে বাবা যেন কি খুঁজছেন। মা বুঝতে পেরে, গীতাখানা এনে বাবার কপালে ছোঁয়ালেন। সব খোঁজা, সব চাওয়া-পাওয়া শেষ হয়ে গেল। দুটি চোখ চির-নিদ্রায় নিমীলিত হলো। বাবা সেই পরম জ্যোতি-র্ময় পুরুষের বাণী "মামেকং শরণং ব্রজ" পাথেয় করে মহত্তর জীবনের পথে যাত্রা করলেন।

আমরা যে বাবা মারা যেতে খুব কেঁদেছিলাম, তা নয়। বরং মনে একটু স্বস্তি পেয়েছিলাম। দাঁড়িয়ে থেকে মৃত্যুপথযাত্রীর ক্ষুধার কষ্ট আর সইতে পারছিলাম না। নিজেদের অক্ষমতার গ্লানি বহন করা দুঃসাধ্য হয়েছিল। এমন কি মার চোখেও এতটুকু জল দেখলাম না। তিনিও বোধহয় আর এ দৃশ্য সহ্য করতে পারছিলেন না।

সুজিত দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, "কাকাবাবু শেষ পর্য্যন্ত বিনা ওষুধপথ্যেই মারা গেলেন।" রূপশ্রী একটু ভাবল, তারপরে সহজ গলায় বলল, "এ তো কিছুই নতুন নয় সুজিতদা, আমরা, মানে গরীবরা প্রায় সকলেই এভাবেই মরি। মৃত্যুকালে যাকে তোমরা ভগবান বল, তাঁর কাছে শেষ নালিশ জানিয়ে যাই—আমাদের জীবন নিয়ে ছিনি-মিনি খেলার অপরাধে তোমাকেও অনেকখানি নেবে আসতে হবে। বলির পশু যেমনি করে জানায় ঠিক তেমনি করে!" সুজিত যেন আর শুনতে পারে না এই যন্ত্রণাদায়ক উপাখ্যান। কিন্তু তবুও শুনতে, জানতে ইচ্ছা হয়। রূপশ্রী বলল, সুজিতদা, একটু জল দিতে বল। জল খেয়ে, সিক্ত ঠোঁট সুগন্ধি রুমালে মুছে আবার গল্পের ছিন্নসূত্র হাতে তুলে নেয়। "মা যে শেষ পর্য্যন্ত এই করবেন তা আমার স্বপ্নের অগোচর। কারণ আমরা গরীব হতে পারি, তবু ভদ্রলোক এবং ব্রাহ্মণ। বর্ণের আভিজাত্যটুকু কিছুতেই যেতে চায় না। একদিন শুনি আমাদের কলোনীর ফেলুর মা, মাকে অতি

নিম্নস্বরে বলছে, "দিদি, কাজ চেয়েছিলে তা একটা খোঁজ পেয়েছি। কিন্তু রান্নার কাজ নয়—বাসন মাজা ঘর মোছার কাজ। তবে জাতে ব্রাহ্মণ তোমাদেরই স্বঘর।" মার-কণ্ঠ আগ্রহে সতেজ, বললেন, "মাইনে দেবে কত?" "দশ টাকা।" মা মিনতিমিশান সুরে বললেন; "কালই তুমি নিয়ে যেও আমাকে।" আমি যে শুনতে পেয়েছি তা আর মার কাছে প্রকাশ করলাম না। বরং হিংসে হলো, যা হোক মা তো একটা কাজ জোগাড় করে নিলেন। কিন্তু আমি? ইদানীং ছোড়দার মেজাজ ভারী খিটখিটে হয়েছে। বোধহয় অভাবে। প্রায়ই আমাকে শোনায়, এতখানি গতর নিয়ে বসে থাকতে লজ্জা হয় না? রাত্রে মা গামছা পরে, কাপড়খানা সোডা দিয়ে কেচে দিলেন। খুব উৎসাহ মনে হলো। আমি নীরব দর্শক। মতামত প্রকাশ করবার জোর কোথায়। মা কাজে যাওয়ার আগে হেসে বললেন,"আমাদের আবার মান মর্য্যাদা কি রে? কোন রকমে প্রাণটুকু বাঁচিয়ে রাখা নিয়ে কথা।" আমি ভাবলাম মা ভদ্রলোকের খোলসটা ঝেড়ে ফেলতে পেরে বেঁচে গেছেন। যে ভূয়া মান আমাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না তা দিয়ে আমি কি করব? মা এক বড় ডাক্তারের বাড়ী কাজ পেয়েছেন।

প্রথম মাসে মাইনে পেয়ে মা নোট খানা দেখে ভারী খুশী—যেন প্রথম পুত্রমুখ দর্শন করছেন। নোটখানা কপালে ছুঁইয়ে বাক্সে রেখে দিলেন। বললেন, "কাল স-পাঁচ আনার পূজো মার বাড়ী দিয়ে আসব।"

আবার গতানুগতিক দিন চলতে লাগল। মা, ক্ষুধার আগুনে পুড়ে, সব সংস্কারমুক্ত হয়েছেন। এখন সবজী-পাতি গৃহস্থের চোখের আড়ালে নিয়ে আসতে কোন নীতিতেই আর আটকায়না। সত্যিই তো আমাদের বাঁচাতে হবে।

একদিন খেতে বসে মা আমাকে বললেন, "ডাক্তারবাবু মানুষ নয়,দেবতা।"আমি উৎসুকচোখে তাকালাম, মা একটু জল খেয়ে গলার ভাত নাবিয়ে বললেন, "আমার দুঃখের কথা শুনে বললেন, "তোমার মেয়ের একটা কাজ হতে পারে, একটু ইতঃস্তত করে বললেন, "দেখতে কেমন মেয়ে?" আমি বলেছি সে মেয়ে রাজার ঘরে মানায় বাবা। একটু চুপ করে থেকে ডাক্তার বাবু বললেন, "আমার এক মাড়োয়ারী পেশেণ্ট আছে তার পার্ক ষ্ট্রীটে মস্ত বড় হোটেল, একজন মেয়ে টাইপিষ্ট চায়।" কালই ডাক্তারবাবুর চিঠি নিয়ে সন্টুর সঙ্গে তোকে যেতে বললেন। দেরী হলে কাজ নাও হতে পারে।" দেরী হবে কেন, আমাদের যেমন করেই হোক বাঁচতে হবে।

পরের দিন ঘুম তাড়াতাড়ি ভেঙ্গে গেল। পৃথিবীর সদ্য জাগ্রত চোখের সামনে একি রহস্য। মায়াচ্ছন্ন পৃথিবীর এখনও যেন ধ্যান ভাঙ্গেনি। রাতের পুঞ্জ পুঞ্জ রহস্য যেন এখনও তার চোখে। নীল আকাশের নীচে স্পন্দিত দু চারটে নক্ষত্র যাই যাই করছে। তার নীচে শান্ত পৃথিবী। পূর্ব্বদিগন্তে ঊষার আগমনে আকাশের বক্ষ লাল হয়ে উঠেছে। গাছ গাছালির চোখে তখনও ঘুমের আবেশ। দু-চারটে পাখী ঘুমভাঙ্গা চোখে ডেকে উঠল। এমন করে পৃথিবীকে কোন দিন দেখেছি বলে মনে হয় না। কারণ দেরীতে ঘুমভাঙ্গার বদনাম আমার চির কালের। একটু ফর্সা হতেই মুখধুতে পুকুরে গেলাম। সেখানেও যেন আর এক বিস্ময় আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। নিস্তরঙ্গ জলে আমার পূর্ণদেহের ছায়া পড়ল। হঠাৎ যেন নিজেকে আবিষ্কার করলাম। বিধাতা আমার বেলায় যতই কৃপণ হোন, রূপ দিতে কার্পণ্য করেন নি। দুই হাত ভরে প্রয়োজনের অতিরিক্ত দান করেছেন। জলের ছায়ায় নিজের মুখ খানা দেখে—নিজেই প্রেমে পড়লাম। চোখ যেন আর ফেরাতে ইচ্ছা হয় না। সদ্য জাগ্রত ঈষৎ স্ফীত চোখের পল্লবে এ কোন অজানা রহস্যের ইঙ্গিত। কাকে ভোলাতে চায়? নিজেই ভুলে গেলাম। কতক্ষণ যে বসে ছিলাম জানি না। মা বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, "ওমা, তুই ঘাটে বসে আছিস? আর আমি এখান সেখান খুঁজে বেড়াচ্ছি। আয়, তাড়াতাড়ি চান করে নে—যেতে হবে সে কথা মনে আছে?" আমার যেন মার কথায় তন্দ্রা ভেঙ্গে গেল। তাই তো। এ-তো ভাব-বিলাসের সময় নয়, বাস্তবের মুখোমুখী দাঁড়াতে হবে। আমি আর ছোড়দা তাড়াতাড়ি স্নান করে খেয়ে নিলাম। একখানা কালোপাড়ের তাঁতের শাড়ি, আর একটি কালো ভয়েলের ব্লাউজ কোন জায়গায় যাওয়া আসার

জন্য বাক্সে তোলাই থাকে। সেগুলি বার করে পরলাম। শুকনো গামছা দিয়ে মুখ খানা ঘষে মুছে ফেললাম। ক্রিম পাউডার আমাদের নেই তা মাখার কথা আমার কল্পনায়ও আসলে না। পায়ে অতি শস্তাদামের এক জোড়া ধুলো মাখা চটি। দুই ভাই বোন বেরিয়ে পড়লাম। যাওয়ার সময় মা ডাক্তারবাবুর একখানা পরিচয় পত্র হাতে দিলেন। খামে আঁটা চিঠি। কি লিখেছেন, কিছুই বুঝা গেল না। মা, "দুগ্যা দুগ্যা" করে আমাদের যাত্রার শুভকামনা করলেন।

কম্পাউণ্ডওয়ালা বেশ মস্ত বড় হোটেল। বাড়ীটি ত্রিতল। ম্যানেজার অমর সিং দোতলার পূবদিকের মাঝারি সাইজের একখানা ঘরে বসেন। তার কাছেই আমাদের যেতে হবে। ঘরটির যতই নিকট হতে লাগলাম, পা এবং বুক কাঁপতে লাগল। শুকনো ঠোঁট জিব দিয়ে ভিজিয়ে নিলাম। সে এক অস্বস্তিকর অবস্থা। ইতিপূর্ব্বে চাকরীর খোঁজে অনেক জায়গায় যেতে হয়েছে, তবে এমন চিঠি পত্র আঁট ঘাট বেঁধে আর কোথায়ও যাইনি। যাই হোক ঘরে এসে ঢুকলাম। ঝকঝকে মোজাইক করা ঘরটার মাঝখানে কার্পেট বিছানো, তার উপরে দামী কাঠের টেবিল ও চেয়ার। টেবিলের উপর প্রয়োজনীয় নানা কাগজ পত্র। দরজাটিকে সম্মুখে রেখে চেয়ারে বসে আছেন অমর সিংজী। সব কিছু দেখে মাথাটা ঝিম ঝিম করতে লাগল। ম্যানেজার অমর সিং কেবল যে কদাকার তাই নয়, অদ্ভুত। মানুষের দেহ যে এত বিরাট হয়, ইতিপূর্ব্বে আমার দেখা ছিল না। তবে রং কালো নয় পোড়া তামাটে, লালের কাছ ঘেষে। মাংসের চাপে চোখ দুটো কুঁৎ কুঁৎ করছে। কিন্তু সেই কুঁতকুঁতে চোখে কি ভয়ঙ্কর লালসার দৃষ্টি। দৃষ্টিতে যেন কামনার লালা ঝড়ছে। মনে হলো আমি যেন আফ্রিকার জঙ্গলে দাঁড়িয়ে আছি। আর সম্মুখে হিংস্র কোন বিরাটকায় জানোয়ার, বাঘের চেয়েও ভয়ঙ্কর। আর তার অতিনিকট সান্নিধ্যে শিকার দাঁড়িয়ে। আমাকে যেন সে পারলে এখনই দলে পিষে শেষ করে ফেলে। অস্থির হাতের থাবা বারংবার খুলছে আর বন্ধ করছে। অস্থিরতার ব্যঞ্জনায় চেহারটা আরো বিকট দেখাচ্ছে। আমি ভীত হরিণীর মত ছোড়দার সার্টের ঝুলন্ত কোণটা মুঠো করে ধরলাম। ছোড়দার মুখ দেখে মনে হলো, সে-ও এই পাঞ্জাবী ভদ্র লোকটিকে তেমন সুনজরে দেখছে না। ম্যানেজার হাতের ইঙ্গিতে আমাদের বসতে বললেন। ছোড়দার দেওয়া চিঠিখানা অমর সিং মনোযোগ দিয়ে পড়লেন। বোধ হয় আমার সম্বন্ধে ডাক্তারবাবু অতিরঞ্জিত করে কিছু লিখেছিলেন। কারণ দুটো একটা মামুলি জিজ্ঞাসাবাদের পরে বললেন, "কাল থেকেই আপনি কাজে যোগ দিন। "মিস্ পিয়ারসন্ রিসেপশনিষ্টকে বেয়ারাকে ডেকে আনতে বললেন। বেয়ারা সেলাম দিয়ে চলে গেল। মিস্ পিয়ারসন্ আসতে গম্ভীর গলায় বললেন, "কাল থেকে এই মেয়েটি ললিতা বোসের জায়গায় কাজ করবে। প্রয়োজনীয় সব কিছু আপনি দেখিয়ে বুঝিয়ে দেবেন।" তারপরে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনাকে এখানেই থাকার ঘর দেওয়া হবে, যাতে সব সময়ই আপনাকে পাওয়ার সুবিধা হয়। আপনার কোন অমত নেই তো?" আমি ছোড়দার মুখের দিকে তাকালাম। ছোড়দাই ম্যানেজারকে বলল, "না, অমতের কি আছে।" সেই বিভীষিকাময় পুরুষ তখন বলল, মাইনে পাবেন দেড়শো, ফ্রি বাসস্থান আর খাওয়া তো আমাদের হোটেলেই খাবেন।" কি শুনছি! যেন বিশ্বাস হতে চায় না। আমার দাম এত। পঞ্চাশ টাকা মাইনের জন্য কত অনুনয় বিনয় করেছি। কিন্তু কোন জায়গার থেকে এতটুকু আশার ইঙ্গিতও পাই নি। এমন কি দু মিনিট দাঁড়িয়ে দু-টো কথা বলার সুযোগ দিতে চায়নি। আর এক কথায় দেড়শো! তার উপর খাওয়া থাকা ফ্রি। সত্যিই ডাক্তারবাবু দেবতা। তা না হলে তার একখানা চিঠিতেই এই পর্বত প্রমাণ মানুষটির হৃদয় হতে এমন করুণার ধারা প্রবাহিত হয়! হোক কুৎসিত, তবু দয়ালু যে, তা নিঃসন্দেহ। লঘুপক্ষ পাখীর মত যেন হাওয়ায় ভেসে চলে গেলাম বাড়ী। সবচেয়ে আনন্দ আমি আর বেকার নই। সামনের মাসেই দেড়শো টাকা মাইনে ঘরে আনবো। একসঙ্গে এতগুলি টাকা জীবনে কখনও চোখে দেখিনি। কেমন না জানি দেখতে। কল্পনার সিঁড়ি বেয়ে অনেক উঁচুতে উঠে গেলাম।

কিন্তু বাবা আর দাদার ম্লান মুখ আমার রঙ্গিন কল্পনার সব রং মুহূর্তে মুছে দিল। দাদা যে অপরাধ করেছে, তা বাবার বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু হতে যাচ্ছে দেখে মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়েই। চোখে নেমে আসা পাতা দু-টির চাপে চোখের কূলে কূলে ভরা জল গাড়িয়ে পড়ল। চকিতে চারি দিকে তাকিয়ে মুছে ফেল্লাম। দু-দিন যেতেই বুঝতে পারলাম, আমার প্রয়োজন হোটেলের চেয়ে, তার ম্যানেজারের বেশী। আর আমার প্রয়োজন বেঁচে থাকা। এই দুই প্রয়োজনের দুর্বারগতিতে ভেসে গেল, যতকিছু যুক্তিতর্ক ন্যায়নীতি খড় কুটোর মত।" স্বচ্ছল জীবন যাদের কাছে স্বপ্ন তাদের কাছে স্বচ্ছল সমৃদ্ধ জীবনের আবেদন যদি অন্যায় নীতি গর্হিত পথ বেয়ে এসে হাতছানি দিয়ে ডাকে, তার প্রলোভন এড়ান বড় সহজ নয়। অভাব যেন কোন্ ঐন্দ্রজালিক উপায়ে আমাদের জীবন থেকে অপসারিত হলো। অমর সিং-এর দরাজ হাতের দানে, শিগগিরই আমাদের ঘরের চালে টিন উঠল। মাকে বললাম আর কেন, এইবার চাকরী ছেড়ে দাও। আমার একটা প্রেস্‌টিজ্ আছে তো। আবার সুপ্ত ভদ্রলোকী সম্ভ্রম আমার মনে জেগে উঠেছে। অর্থের হাত ধরেই আসে অহঙ্কার। অর্থ যখন এসেছে, তাকে অস্বীকার করবো কি করে। মা কিন্তু রাজী হলেন না চাকরী ছাড়তে। বললেন, "টাকা কি কারুর বেশী হয়। দশ দশটা টাকা কি কম হলো।" বুঝলাম মা স্বাধীন ভাবে খেটে খাওয়ার স্বাদ পেয়েছেন। তবে মার কপাল ভাল বলতে হবে, সম্প্রতি তিনি রাঁধুনীতে প্রমোশন পেয়েছেন। ছোড়দাও অনেক দিনের চেষ্টায় ষ্টেটবাসে কনডাক্‌টারের কাজ পেয়েছে। এখন ক্ষুধার ভয়ঙ্কর রূপ আমাদের চোখে নিষ্প্রভ। এখন কলোনীর লোকেরা আমাদের হিংসে করে। জান তো, হিংসে করলে কি আনন্দ? সেটুকু আমরা রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করি। আমাদের অনুপাতে বেশ প্রাচুর্য্যের মধ্যেই দিনগুলি কাটছিল। কিন্তু সম্প্রতি গোল বাঁধিয়েছে, হোটেলের প্রোপ্রাইটার মহামায়া প্রসাদের ছেলে, সদ্য আমেরিকা ফেরৎ লীলা প্রসাদ। সে আমার রূপের ছটায় আকৃষ্ট হয়ে, ব্যগ্র কামনায় পতঙ্গের মত ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সে শেয়ারে নয় সম্পূর্ণ ভাবে চায় আমাকে। ম্যানেজার তাতে যে রাজী নয় বুঝতেই পারছ। কাজেই আমার চাকরী আর আগামী মাস থেকে থাকছে না। বেশীদূর গড়াবার আগেই ম্যানেজার অমরসিং আমাকে সরিয়ে দিতে চান। আর আমিও ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, সুজিতদা, জীবন নিয়ে এই টাগ-অব-ওয়ার খেলায়। শান্ত সুন্দর একটু জীবন চাই আর চাই একটি চাকরী।" রূপশ্রীর হতাশ ক্লান্ত চোখের দিক তাকিয়ে, সুজিত কি এতক্ষণ একটা দুঃস্বপ্ন দেখছিল? রূপশ্রী আসতে স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। অস্পষ্ট গলায় বলল, "চাকরী"। রূপশ্রী ব্যগ্র কণ্ঠে বলল, "হ্যাঁ সুজিতদা, যা হোক একটা চাকরী তোমার অফিসে আমাকে জোগাড় করে দাও।" "আচ্ছা, চেষ্টা করবো" বলে, সুজিত বলল, পরশু তুমি আমার সঙ্গে দেখা করো। কিন্তু কি কাজ চাও বলতো? টাইপের হাত ঠিক আছে তো? "কোথায় আর ঠিক আছে," বলে রূপশ্রী বিলোল কটাক্ষে তাকাল। সে দৃষ্টির আকস্মিকতায় অনেকগুলি বছর অতিক্রম করে সুজিত এসে দাঁড়াল তার ষোড়শবর্ষের সীমানায় তখন রূপশ্রীর বয়স ছিল বারো। শিলং-এর একটি বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় আটকে পড়েছিল রূপশ্রী সুজিতদের বাড়ীতে। তাকে পৌছে দেবার জন্যে এমনিই কাতর মিনতির মধ্যে বিদ্যুৎ খেলেছিল চোখে রূপশ্রীর। আর সেই বিদ্যুতালোকেই দেখতে পেল সুজিত নিজের রাঙ্গানো মনখানাকে। কেমন একটা মদির ভঙ্গীতে গ্রীবা হেলিয়ে রূপশ্রী বলল, "আচ্ছা চলি সুজিত দা। তোমার অনেক সময় নষ্ট করে দিলাম।" উঠে দাঁড়ল রূপশ্রী নয়নে তার যূথবদ্ধ হরিণার চঞ্চলতা। সুজিত বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে একটু হাসল। সে হাসিতে তার মনের অনেক না-বলা-কথা প্রকাশ পেল। ব্যাগটি বাঁ-হাতে বুকে চেপে আগোছাল শাড়ি একটু ঠিক করে বেরিয়ে গেল রূপশ্রী। ঘর খানা তার প্রাণের স্পর্শে এখনও বিভোর। সুজিত তাকিয়ে থাকল ওর গমন পথের দিকে। তারপর আবেগোদ্বেল হৃদয়ে স্মৃতির ঘন যবনিকা ঠেলে, সুজিতের চোখে আবার যেন স্পষ্ঠ হয়ে ভেসে উঠল, বাল্যের সেই দিনগুলি।

ছোট বেলাটা কেটেছে তার শিলং-এ। বাবা সেখানে চাকরী করতেন। ওদের বাড়ী ছিল। থাবান হরিসভার'কাছে। রুমকীদের বাড়ী ওদের ছু-চার খানা বাড়ীর পরেই। আসা-যাওয়া ছু-বাড়ীর লোকের মধ্যে ছিল যথেষ্ট। রুমকী তো বলতে গেলে ওদের বাড়ীতেই থাকতো দিনের অনেকটা সময়। মা, ওকে খুব স্নেহ করতেন। ওরা ছিল পাঁচ ভাই, বোন ছিল না। সকলেই ওকে ভাল-বাসত। ওর স্বভাবের কৌতুকপ্রিয়তা সকলকে আনন্দ দিত। মার কাছে কাছে ছায়ার মত ঘুরে বেড়াত। একদিন 'ও' না এলে ডাকতে পাঠা'তেন। আমাদের বাড়ী কিছু ভাল রান্না হলে, রুমকীরও ভাগ থাকতো। মা, কথায় কথায় বলতেন, "মেয়েটা আমাকে জ্বালাবে দেখছি। এর পর ওকে ছেড়ে দেশে গিয়ে থাকবো কি করে।"

একদিন শুনি বাবাকে মা বলছেন, "আমার ইচ্ছে করে বিয়ে—" বাবা শুয়ে বই পড়ছিলেন, বইখানা মুড়ে পাশে রেখে বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, "তোমার আবার বিয়ে করতে ইচ্ছা করে?" মা কোপ কটাক্ষ হেনে, বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বললেন, "না, তোমার আর এ-দোষ কোন দিন যাবে না— কথাটা পুরো না শুনেই মন্তব্য করার।" বন্ধ বইখানা চোখের সামনে খুলে বাবা বললেন, "ও:, পুরো বলা হয়নি বুঝি? যাক্ আমার তো পিলে চমকে গিয়েছিল। তা কি যেন বলছিলে, বল।" মা, মুখখানাকে যথাসম্ভব সরস ক'রে বললেন, "আমার ইচ্ছা করে সুজিতের সঙ্গে রুমকীর বিয়ে দিতে। কেমন মানাবে ছুটিতে। আর যাই বল, মেয়েটা বড় হলে ডাকের সুন্দরী হবে। সবে তো বারো বছর বয়স, এখনই যেন রূপের জোয়ার এসেছে অঙ্গে। আর আমার মনে হয় তোমার ছেলেও ওকে ভালবাসে।" মার চোখ কৌতুকে উজ্জ্বল। তিনি বললেন, "একদিন দেখি রুমকীর মুখের পানে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। আমাকে আসতে দেখেই মুখ নীচু করল।" বাবা, রুষ্টস্বরে বললেন, "ছেলেটা তো ভারী বাঁদর হয়েছে। আর তুমিও বোধ হয় উস্কানী দিচ্ছ।" মা, হাসিতে চোখ নাচিয়ে বললেন, "আমি দেব কেন, যে দেবার সেই দিচ্ছে।" বাবা, ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, "কে, সে লোকটা শুনি?" মা, হা-হা করে হেসে বললেন, "মরণ আমার, তাও জান না! ওগো, বয়স—বয়সই জানিয়ে দেয় সকলকে। নিজের সে বয়স না হয় হারিয়ে গেছে, কিন্তু একদিন তো ছিল।" বাবা যেন তার হারানো দিনগুলিকে ফিরে পাওয়ার মিথ্যা প্রয়াসে, হতাশ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে, মাকে বললেন, "ও: এই কথা। সে দেখা যাবে যখন বিয়ের বয়স হবে।" মা, চতুর গৃহিণীর মত বললেন, "এখনই পাকা করে রাখা ভাল। আমরা তো তোমার পেন্‌সেন হলেই চলে যাব কলকাতায় আর তার তো বড় একটা দেরীও নেই।"

সুজিতের মনের অবস্থা তখন যুবক মাত্রেই বুঝতে পারবে। কেমন এক অনাস্বাদিত পুলকে দিশেহারা ভাব। কিছুদিন বাদে বাবার পেন্‌সন্ হতে ওরা চলে এল কলকাতায়। সেই থেকেই রুমকীদের সঙ্গে ছাড়া-ছাড়ি। সে এখন থেকে দশ বছর আগের কথা। প্রথম প্রেম শুনেছি, অমর। বোধ হয় সে কথা সত্যি। কারণ, এত-গুলি বছরের নানা ঘটনার তলায় চাপা পড়েও সে মরেনি। সুপ্ত মনের মণিকোঠায় আজও দেখছি তা উজ্জ্বল আছে। বিস্মৃতির ধুলোয় সে মণি আবৃত হলেও অনুকূল হাওয়ায় ধুলো সরে গিয়ে আবার পূর্ব্বমহিমায় দীপ্ত হয়ে উঠেছে। তার দ্যুতি তার মনের সবটুকু স্থানে ছড়িয়ে পড়েছে।

সুজিতের মন আর সেদিন কাজে বসল না। পাঁচটা বাজতেই উঠে পড়ল। রাত্রে শুয়ে ভাবল "কি করে আবার রুমকীকে তার হৃতসম্মানে ফিরিয়ে আনা যায়। চাকরী? না, চাকরীতে ওর মন ভরবে না। একবার যে অনেক টাকার স্বাদ পেয়েছে, সে আর ফিরে যেতে চাইবে না অভাবের জীবনে। তবে কি উপায়ে ওকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা যায়।" চিন্তার সঙ্গে তালমিলিয়ে রাত্রির প্রহর অতিবাহিত হতে লাগল। মনে পড়ল সুজিতের, মাকে। তিনি জীবিত থাকলে হয়তো এ সমস্যার উদ্ভবই হ'তো না। তাঁর ইচ্ছা ছিল আমার সঙ্গে রুমকীর বিয়ে দেওয়ার। ঘটনা-চক্রে তা আর হয়ে উঠেনি। কিন্তু তাঁর ইচ্ছাকে এখন কি আমি রূপ দিতে পারি না? নিশ্চয়ই পারি। আমি রুমকীকে বিয়ে করবো। তাকে ফিরিয়ে আনব সংসারের কল্যাণময় পরিবেশে কল্যাণী-রূপে।

আনন্দে উত্তেজনায় সুজিত বিছানায় উঠে বসে। ঘুমোতে ইচ্ছা হয় না এই মধুর চিন্তা ছেড়ে। পরশু দিনটা বড় বেশী দূর মনে হয়। নিজের বোকামীতে নিজেই বিরক্ত হয়। কাল আসতে বললে দোষ কি ছিল? যাই হোক দূরের পরশু নিকট হলো। আজ সেই পরশু। সুজিতের রোজের চেয়ে অফিস যাওয়ার পোষাক পরিচ্ছদে আজ একটু বিশেষ যত্ন লক্ষিত হলো। গুন্ গুন্ করে কণ্ঠে এল গান। ক্ষিপ্রহস্তে দামী টাইয়ের ফাঁসটা বেঁধে ফেলল। আজ সময় যেন নতুন রূপে, গন্ধে ভরে ওর হাতে ধরা দিয়েছে। সবই মধুময় মনে হচ্ছে। তাড়াতাড়ি জুতোর ফিতেটা বেঁধে সুজিত নিজের মনেই বলল, "নাঃ, বড্ড দেরী হয়ে গেল. রুমকী যদি এসে পড়ে? সে দিন কখন এসে ছিল? তা প্রায় বারোটা। আজ হয় তো চাকরীর আশায় একটু তাড়াতাড়িই আসবে।"

অফিসে যখন পৌঁছল সুজিত, তখন বেলা দশটা। সেইথেকে ঘড়ির দিকে আরদরজার দিকে তাকাচ্ছে। কিন্তু কোথায় রুমকী? সুজিত অধৈর্য্য হলো। "নাঃ, অনেক বেলা হয়েছে। আজ বোধ হয় আর এলো না।" হতাশ হয়ে নিজেকে কাজের মধ্যে ঢেলে দিতে চেষ্টা করল। ঠিক সেই সময়ই রুমকী দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল। বেয়ারা সেলাম দিয়ে পাশে সরে দাঁড়ল—"যাইয়ে মেমসাব।" সুজিত উত্তেজনায় উঠে দাঁড়াল। "আরে এত দেরী করলে কেন?" রূপশ্রী ধীরে সুস্থে চেয়ারে বসে, হেসে বলল "কেন, ভেকেন্সি ফিলাপ হয়ে গেছে নাকি?" সুজিত অর্থপূর্ণ একটু হাসি হেসে বলল, "না, এ ভেকেন্সিতে তোমার ছাড়া কারুর অধিকার নেই।" বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রূপশ্রী বলল, "ব্যাপার কি বলতো? বেশ একটু গোলমেলে ঠেকছে।" সুজিত চিন্তা করতে লাগল কি ভাবে কথাটা বলা যায়। কিন্তু কিছুতেই ঠিক মনের মত হচ্ছে না। তারপর মরিয়া হয়ে বলে ফেলল, "জানি না পোষ্টটা তোমার পছন্দ হবে কি না।" রূপশ্রী আগ্রহ-ব্যাকুল কণ্ঠে বলল, "আরে না না আমি যে কোন পোষ্টেই রাজী।" সুজিতের চোখে কৌতুক। বিনা ভূমিকায় বলল, "আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই রুমকী। আমার সংসারের সর্ব্বময় কর্ত্রীর পদই তোমার জন্য নির্ব্বাচন করেছি। আমি তোমার কাছে নিজেকে ছেড়ে দিলাম—তুমি আমাকে গ্রহণ করে, নিজে সার্থক হয়ে আমাকে সার্থক করো।" রূপশ্রী বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। যেন এমন দুর্বোধ্য কথা এর আগে আর কখনও শোনেনি। তারপরে সুজিতের পায়ের কাছে বসে পড়ে, অস্ফুট কণ্ঠে বলল, "তুমি আমাকে এই নরককুণ্ড থেকে উদ্ধার করে বিয়ে করবে?" বিস্ময়ের ঘোর একটু স্তিমিত হলে, রুমকী সুজিতের পায়ের উপর মাথা রাখল। সুজিত বিচলিত হয়ে ডাকল, "রুমকী ছিঃ, উঠো।" রুমকী আবেশ মিশ্রিত আকুল কণ্ঠে বলল, "আর একটু থাকতে দাও—আমার জীবনে এতবড় সৌভাগ্য আরতো আসবে না।" রূপশ্রী যখন উঠে বসল, এ যেন সে রূপশ্রী নয়, আর কেউ। অভূতপূর্ব্ব এক প্রশান্তি তার মুখে, স্বর্গীয় জ্যোতির আভায় মুখ উদ্ভাসিত। দু-চোখে তার জল এল। হৃদয় ভেঙ্গে চূরমার হয়ে যেতে চাইল। তবু সে বলল, "তুমি যে আমার ধ্যানের দেবতা। তোমাকে এই অপবিত্র দেহ দেব কি করে? তুমি আমার জীবনে মঙ্গলময় শিব—তোমাকে পতিরূপে কামনা করেছি জন্মে জন্মে। তোমাকেই মনের মাধুরী মিশিয়ে কত রূপে গড়েছি। আমার সে স্বপ্নকে তুমি ভেঙ্গে দিও না। তুমি আমার প্রাত্যহিক জীবনের অনেক উর্দ্ধে। আজ তোমাকে উচ্ছিষ্ট দেহ দিয়ে ধুলায় নাবিয়ে আনতে পারবো না; না-না, সে লোকসান আমার সইবে না। আমার সব গেছে, শুধু এই

মহাসম্পদটুকু অবলম্বন ক'রে বেঁচে আছি। "রূপশ্রী দু-হাতে মুখ ঢেকে ফুলে ফুলে কাঁদে। সুজিত দর্শকের ভূমিকায় স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। রূপশ্রীর ক্রন্দনাবেগ একটু প্রশমিত হলে, অশ্রুবর্ষণসিক্ত চোখে তাকিয়ে আত্মগত ভাবে ফিস্-ফিস্ করে বলল, "তোমার প্রেমাগ্নিতে আমার যত কিছু মালিন্য, যত কলুষ, যত অশুচিতা, পুড়ে ছাই হয়ে যাক।" সুজিত রূপশ্রীর কোমল হাত দুটি নিজের হাতে তুলে নেয়। তাকিয়ে থাকে বিস্ময় বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে রূপশ্রীর নিবেদনের অপূর্ব্ব শ্রীময়ী ভঙ্গীটির দিকে। ওর শিশিরসিক্ত পূজার পুষ্পের মত মুখখানার দিকে তাকিয়ে ভাবে, "যে নদীটি দুর্বার প্রাণের গতিতে, পাহাড় পর্বত খানা খন্দ, শুচি-অশুচি স্থানের উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল, সে আজ মহাসমুদ্রে মিশে গেছে। আর কিছুকাল পূর্ব্বের সত্তায় তাকে দেখা যাবে না। উদ্বাস্তু জীবনের ক্ষতির পরিমাপ, আর কিছু দিয়েই করা সম্ভব নয়। এই ভুলের অভিশাপ বুকে নিয়ে শুধু জ্বলবে, আর জ্বলবে তারা।

———

ব্রহ্মসূত্র কাব্যানুবাদ

পুষ্পদেবী, সরস্বতী, শ্রুতিভারতী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

সর্ব্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ ২।১।৩০

শঙ্কর কন পরমেশ্বর সর্ব্ব শক্তি ময়
"অদর্শনাৎ" শ্রুতিবাক্যেতে এই কথা জেনো কয়
ছান্দোগ্যতে এই কথা আছে
সর্ব্বকর্ম সর্বকাম আছে
সর্বমিদং অভ্যাত্তঃ অবাকী ও অনাদর
সবের মাঝারে আনন্দময় সত্য সে শঙ্কর।
সকল কর্ম করেন সেজন সকল পূর্ণময়
সকল প্রাপ্তি তবু মৌনতা আগ্রহ নাহি রয়
তিনি যাহা চান সত্য তা হয়
সংকল্পতে সত্যই রয়
তাহার শক্তি বিবিধ এবং সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ জন
তিনি জ্ঞান তিনি বল তিনি ক্রিয়া তিনিই সকল হন।

বিকরণত্বান্নেতি চেৎ তদুক্তম্ (২।১।৩১)

যদি কেহ ভাবে ইন্দ্রিয় হীন ঈশ্বর কিবা করে ?
এর উত্তর দিয়েছি আগেই সকলি সেজন পারে
অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা
অনন্ত সেই যে সবার বিধাতা
তাঁহার প্রকৃতি বলেছে শ্রুতিতে শুধুই যে অনুমান
সর্ব্বত্র তার হস্ত দৃষ্টি সকল স্থানেতে কান।

ন প্রয়োজনবত্ত্বাৎ (২।১।৩২)

বিপক্ষ কহে জগৎ কর্ত্তা ঈশ্বর নহে কভু
কার্য্য থাকিলে থাকিবে কারণ ঈশ্বর নহে প্রভু
লোকে করে কাজ ফল লাভ তরে
পূর্ণ সেজন কেন কাজ করে
আপ্তকাম সে নিজে ভগবান কামনা যাহার নাই
কেন সাধ করে সৃজে সংসার ভাবেযে সকলে তাই।

"লোকবত্তু লীলা কৈবল্যম" ২।১।৩৩

শিশুরা যেমন নিজে খেলা করে বিনা কোন প্রয়োজনে
শিশু ভোলানাথ তেমনি সৃষ্টি করেছেন নিজ মনে—

বৈষম্য নৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি ২।১।৩৪

শ্রুতি বাক্যেতে কহে কর্মের অপেক্ষা আছে বলে
বৈষম্যে নৈর্ঘৃণে ন বৈষম্য নিষ্ঠুরতা নাই বলে
সুখ দুখ দুই জগতেতে আছে
সুখেতে ভুলিয়া হরি ভুলে আছে
অসাধু কর্ম করে যদি কেহ নাহিক পরিত্রাণ
সবদিকে তাঁর সমান দৃষ্টি সেই জন ভগবান্।

ন কর্ম্মাবিভাগাৎ ইতি চেৎ ন অনাদিত্বাৎ ২।১।৩৫

———

[ক্রমশঃ

বিচিত্র বিশ্ব

শ্রীপরিমল ভট্টাচার্য্য

মায়া বন্ধন

সময়টা গ্রীষ্মকালের শেষ—বসন্তের সুরু। দক্ষিণেশ্বরে তখন একটা ফিল্ম ষ্টুডিও ছিল। প্রায় বছর পনের আগেকার ঘটনা। রাত্রে সুটিং হচ্ছে। একজন খ্যাতনামা অভিনেত্রীর সময়ের অভাবের জন্য পরিচালক মশাই এই ব্যবস্থা করেছেন। ষ্টুডিওর ভেতরে একটি বিরাট বড় পুকুর। তার চার দিক ঘিরে নানান ফল ও ফুলের বাগান। বিশেষকরে পূর্বদিকটাতে বেশ একটা ঘন জঙ্গলের আবহাওয়া। বড় একটা ওদিকে কেউ যায়না। একমাত্র বিশেষ একটি প্রাকৃতিক নিয়মের তাগিদ ছাড়া, তাও দিনের বেলায়। কিছুক্ষণ দিব্যি সুটিং চললো। গরমটা সেদিন একটু বেশী থাকায় অল্প পরিশ্রমে কষ্ট হচ্ছিল বেশী। রাত যখন প্রায় একটা, চিত্র পরিচালকমশাই তখন সবাইকে ঘণ্টা খানেকের বিশ্রাম দিলেন। বেল বাজতেই কলাকুশলী ও শিল্পীরা সব বাইরের খোলা হাওয়ায় এসে দাঁড়ালেন। বেশ ফুর ফুরে প্রথম বসন্তের হাওয়া দিয়েছে তখন।

পুকুরঘাটের ঠিক সামনের বড় হলঘরটার বারান্দায় বেঞ্চিতে কয়েকজন বসে গল্প সুরু করলেন। একজন বিখ্যাত অভিনেতা ও সহকারী পরিচালক মশাই দুজনে এসে একেবারে পুকুর ঘাটের দুইপাশের দুই বাঁধান বেঞ্চিটার উপর টান্ টান্ হয়ে শুয়ে পড়লেন। সিগারেট খেতে খেতে নানা গল্প চলতে লাগলো দুজনের মধ্যে। শেষে একসময় ষ্টুডিও ফ্লোরে কাজ আরম্ভ হওয়ার বেল বাজলো। সবাই ধীরে ধীরে চলে গেলেন ভেতরে।

শুধু পুকুর ঘাটের বেঞ্চিতে অন্ধকারে শুয়ে রইলেন সেই বিখ্যাত অভিনেতা। সহকারী পরিচালককে বলে দিলেন সময় হলে আমাকে ডেকো। বসন্তের হাওয়ায় একটু ঘুমিয়ে নি।

সবাই চলে যেতে স্থানটি বেশ নির্জন হয়ে গেল।

অভিনেতা ভদ্রলোক কিঞ্চিৎ কাৎ হয়ে উঠে বসে সিগারেট ধরিয়ে নানান এলোমেলো কথা চিন্তা করতে লাগলেন। মুখে একটা রবীন্দ্র সঙ্গীতের কলি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গাইছিলেন। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলেন অগণিত তারা জল জল করছে। শিল্পী মানুষ, বেশ ভাল লাগছিল। সামনেই একটা ঝাঁকড়া হাসনুহানার গাছ, বেশ মিষ্টি গন্ধ আসছে।

একসময় গানটা গাওয়া বন্ধ করলেন। ভাবলেন এবার একটু সত্যি সত্যি ঘুমিয়ে নেওয়া যাক্। মাথায় হাত রেখে শোওয়ার উদ্যোগ করতেই একটু দূরে হঠাৎ নজরে পড়লো পূব দিকের পুকুর পারে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। ভাল করে লক্ষ্য করতে লাগলেন ভুল দেখছেন কিনা। না, ভুল নয়। নিশ্চয়ই কেউ দাঁড়িয়ে আছে। ভাবলেন কেউ হয়তো প্রাকৃতিক নিয়ম রক্ষে করতে গিয়ে থাকবে।

একটু জোরেই ভদ্রলোক ডাকলেন ওখানে কে রে? উত্তর নেই। ছায়ামূর্ত্তিটা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আবার ডাকলেন ভদ্রলোক বলি ওখানে দাঁড়িয়ে কেরে এতরাতে? একটা আলো হাতে করে নিয়ে যেতে পারোনি। এদিকে আয় তোর শ্রীমুখখানা ভাল করে দেখি।

অভিনেতা ভদ্রলোক জীবনে ভয়ডর বলতে কিছু জানতেন না। বিশ্বাসও করতেন না পৃথিবীতে মৃত্যুর

পর মানুষের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব। অতএব ভদ্রলোক পকেটের দেশলাইটা হাতড়ে বার করলেন। দেখা গেল ধীরে ধীরে ছায়ামূর্ত্তিটা এই শান বাঁধানো ঘাটের দিকেই আসছে। ভদ্রলোক খুবই উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। ছায়ামূর্ত্তিটা একেবারে হাঁসনুহানা গাছটার ডালখানা ঘেঁসে দাঁড়াল। ভদ্রলোক তখনও ভাল করে বুঝতে পারছেন না লোকটি কে, তবে দেখা গেল গায়ে ছেঁড়া একটা গেঞ্জি, পরণে একটা খাঁকি রংয়ের হ্যাফ্ প্যাণ্ট।

ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন কেরে জগা? অর্থাৎ জগন্নাথ কিনা। জগন্নাথ আমাদের ষ্টুডিওর ইলেট্রিক্ মিস্ত্রী। দেশ উড়িষ্যায়। কোন উত্তর এলনা। ছায়ামূর্ত্তিটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়েই রইল।

ভদ্রলোক ফস্ করে একটা দেশলাই কাঠি জেলে মুখের দিকে এগিয়ে ধরলেন। কয়েক মুহূর্ত্তের আলোতে মুখখানা দেখে ঠিক যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। দমকা হাওয়ায় কঠিটা নিভে গেল। ভদ্রলোক তবু জিজ্ঞাসা করলেন—কে তুই? ঠিক্ করে বল।

খুব ধীরে ধীরে জবাব দিল ছায়ামূর্ত্তিটা—বাবু আমি জলধর—এই বাগানের পুরনো মালী। আমাকে চিনতে পারছেন না?

তুইতো মরে গেছিস্ আজ অনেকদিন হল!

হাঁ্যা বাবু। ভয় পাবেন না আজ বড় মন কষ্ট পেয়ে আপনার কাছে একটা নিবেদন করতে এসেছি।

এবার মনে হল অভিনেতা ভদ্রলোক কিছুটা ভয় পেয়েছেন। একটা সিগারেট ধরাবার নিস্ফল চেষ্টা করছেন বার বার। যদিও তাঁর দৃষ্টি রয়েছে ছায়ামূর্ত্তিটার দিকে অপলক ভাবে।

জলধর বললো ধীরে ধীরে—আজ সন্ধ্যার সময় দেশ থেকে আমার পরিবার জগন্নাথকে চিঠি লিখে কিছু টাকা পাঠাতে বলেছে। জানেনতো ও আমার জ্ঞাতি ভাই। আমিই এখানে এনে কাজে লাগিয়েছিলাম। আমার বড় খোকার বাড়াবাড়ি অসুখ। টাকার অভাবে ছেলেটার চিকিৎসা হচ্ছেনা। আমি আর সহ্য করতে পারছি না বাবু—তাই আপনাকে অনুরোধ, কিছু টাকা যদি বাবু আমার পরিবারকে সাহায্য করেন, তাহলে আমার বড় খোকা বেঁচে যাবে। আমি শান্তি পাব। এর আগেও তো বাবু আপনি অনেকবার আমাকে টাকা সাহায্য করেছেন।......ভদ্রলোক উত্তরে কি যেন একটা বলতে যাচ্ছিলেন। এমন সময় দূর থেকে ডাক এল—দাদা চলে আসুন—সেট রেডি।

সহকারী পরিচালক মশাই এগিয়ে এলেন ঘাটের দিকে। মুহূর্ত্তের মধ্যে ছায়ামূর্ত্তিটা মিলিয়ে গেল। অভিনেতা ভদ্রলোকটিকে ওরকম ভাবে চুপচাপ করে বসে থাকতে দেখে বললেন কি হল? আপনি ঘুমোন নি? সেই থেকে এই অন্ধকারে জেগে বসে আছেন? চলুন—এবার আপনার ডাক পড়েছে। এক কাপ গরম চা খেয়ে ক্যামেরার সামনে দাঁড়াবেন। কোন উত্তর বা উৎসাহ না পেয়ে সহকারী পরিচালক মশাই যেন একটু ভড়্কে গেলেন।

অভিনেতা ভদ্রলোক সিগারেটা ধরিয়ে একটা টান মেরে বললেন—পরিতোষ, চট্ করে একবার ফ্লোর থেকে জগন্নাথকে ডেকে নিয়ে আয়তো। বলবি, জরুরী দরকার। ......আর ডিরেক্টর সাহেবকে বল্‌বি আমি মিনিট দশেক পরেই আসছি।

পরিতোষবাবু তৎক্ষণাৎ ছুটে গেলেন ডাকতে। একটু পরেই জগন্নাথ এসে হাত জোড় করে দাঁড়াল কি বলছেন বাবু?

তোর দেশ থেকে কোন চিঠি এসেছে?

হাঁ্যা, বাবু—আজই এসেছে, আমার পকেটেই আছে। জলধরের পরিবার লিখেছে। বড় খোকার খুব অসুখ বোধহয় বাঁচবেনা। অনেক টাকার দরকার, পাঠাতে লিখেছে। তা আমি গরীবলোক, এত টাকা কোথায় পাব। তাছাড়া এ মাসের মাইনে এখনো পাইনি। কি যে করি তাই ভাবছি। তবে চাঁদা করে নিজেরা গোটা কুড়ি টাকা জোগাড় করেছি তাই কাল পাঠাব ভাবছি। কেন বাবু, কি হয়েছে?

অভিনেতা ভদ্রলোক কেমন একটা অসহায় ভাব বোধ করলেন।

শুধু বললেন কিছু হয়নি, এমনি জিজ্ঞাসা করছিলুম, সুটিং শেষ হলে আমার সঙ্গে দেখা করবি। যেন ভুল না হয়।

কথাটা শুনে জগন্নাথ মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল আর

দাঁড়াল না। কাজ ফেলে এসেছে সেদিকেই ছুটে গল।

পরিতোষবাবু অত্যন্ত বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন কি ব্যাপার বলুনতো।

বোসো এখানে। -পরিতোষবাবু পাশে বসলেন। আনুপূর্বিক সব ঘটনাটা খুলে তাকে বললেন অভিনেতা ভদ্রলোক। পরিতোষবাবু সব শুনে উত্তরে বললেন জলধরকে আজও আমরা ভুলতে পারিনি এ কথা হয়তো সত্য কিন্তু ভাবতে বিস্ময় জাগছে যে সে আজও আমাদের ভুলে যায়নি এবং সর্বদাই কাছাকাছি আছে। রহস্যময়ীর ভাণ্ডারে কত না বিস্ময় লুকিয়ে আছে কে জানে? চলুন দাদা, ফ্লোরে যাওয়া যাক।

হ্যাঁ চল।

ভোরবেলা সুটিং শেষ হলে কথামত জগন্নাথ এসে সামনে দাঁড়াল—এই যে বাবু চিঠিখানা। আপনিও যদি কিছু সাহায্য করেন।

অভিনেতা ভদ্রলোক কোন উত্তর দিলেন না। শুধু পাঁচখানা একশো টাকার নোট জগন্নাথের হাতের মুঠোয় গুঁজে দিয়ে বললেন—টাকাটা আজই জলধরের পরিবারকে তার করে পাঠিয়ে দিস্। যেন ভুল না হয়। ছেলেটার সুস্থ হওয়ার সংবাদ এলে আমাকে জানাস্

জগন্নাথ অবাক হয়ে বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। এতগুলো টাকা সে সাহায্য পাবে—ভাবতেই পারেনি। অভিনেতা ভদ্রলোক গাড়ীতে উঠে ষ্টার্ট দিলেন। ভোর হয়ে গেছে। রাতটা স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে কেটে গেল। পাশে বসে পরিতোষবাবু শুধু —বললেন দাদা, আজকের সব উপার্জনটাই দিয়ে দিলেন, —নিজের জন্যে কিছুই রাখলেন না?

একটি অতৃপ্ত আত্মার শান্তির জন্য যদি জীবনের যাবতীয় সঞ্চিত ধনও বিলিয়ে দিতে হয়—তাও আমরা দিতে পারি—নইলে জাত শিল্পী হওয়া যায় না পরিতোষ।

গাড়ীটা ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল গেটের দিকে। জগন্নাথের ডান হাতখানা তখনও তার নিজের কপালে নমস্কারের ভঙ্গীতে ঠেকানো।

প্রেতাত্মার আশীর্বাদ

ঘটনাটা গজেনদার মুখে শোনা। একসঙ্গে দুইবন্ধুতে এক বিখ্যাত বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে, প্রায় বছর দশেক চাকরী করেছি। তারপরে ছাড়াছাড়ি। বর্ত্তমানে গজেনদা বোধহয় আমেদাবাদের কোন এক কাপড়ের কলের প্রধান হিসাবরক্ষক। কিন্তু অল্প বয়সেই বিবাহ করেছিলেন তিনি। তার মানে ধরুন যখন২৪।২৫ বছর তখন বিবাহ হয়েছিল পাড়াগাঁয়ের দিকে, ছোট লাইনের শেষ ষ্টেশন আমতা থেকে প্রায় মাইল সাতেক দূরে। দামোদর নদের বাঁধের উপর দিয়ে কাঁচা রাস্তা। গ্রামের নামে বালিচক। গজেনদার ভাষায় পড়ন্ত জমিদার-বংশের সর্ব কনিষ্ঠা রাজকন্যার তিনি নাকি পাণিপীড়ন করেছিলেন। যাইহোক সেটা ফাগুন মাস। নব বরবধূ দ্বিরাগমনে গিয়েছেন। জমিদার বাড়ীতে বিবাহ উপলক্ষে আনন্দস্রোতে তখনও তেমন ভাঁটা পড়েনি। নতুন মেয়ে-জামাই যখন গিয়ে পৌচেছেন তখন সন্ধ্যা উত্তরে গেছে। আদর আপ্যায়নের কোন ত্রুটি নেই। একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি। গজেনদার শ্বশুর জীবিত নেই। বিবাহের আট বছর আগে হঠাৎ কলকাতায় এসে কলেরা হয়ে তিনি মারা যান। তাঁরই ব্যবহৃত সুসজ্জিত কক্ষে মেয়েজামাইকে শুতে দেওয়া হয়েছে।

ঘরে শ্বশুর মশায়ের প্রৌঢ় বয়সের একখানি ফটো বড় করে বাঁধান। একপাশে দামী খাট, পাশে চেয়ার-টেবিল আরামকেদারাটা একটু দূরে। তারি পাশে সেকেলে ধরনের একটি সিন্দুক। রাতে শুতে এসে খাটে বসে গজেনদা নববধূকে জিজ্ঞাসা করলেন—এটা তোমার বাবার ফটো—না? নববধূ মৃদু হেসে জবাব দিলেন-হ্যাঁ।

গজেনদা যেন একটু রাগতঃ ভাবেই জবাব দিলেন—তা টাঙ্গাবার আর জায়গা পাও নি। একেবারে জামাইয়ের মুখোমুখি, বালিশটা এপাশে করে নিলুম। নানান গল্পগুজবের মধ্যিখানে সিন্দুকটার দিকে নজর পড়তেই গজেনদা জিজ্ঞাসা করলেন—বলি এটাতে কিছু ক্যাশ-ট্যাশ আছে—নাকি তুমিই বাপের লাষ্ট ফার্দিং? সলজ্জ উত্তর এল—বর পণে কিছু কমতি পড়লে বাধ্য হয়েই সিন্দুক খুলতে হত। তবে তোমার বাপ-মায়ের আশীর্বাদে

বাবা মারা যাবার পর এই আট বছরেও ঐ সিন্দুক একবারও আর খোলা হয়নি। চাবিও খুঁজে পাওয়া যায়নি। মাও জানি না কি কারণে অন্য কোন উপায়ে এটাকে খুলতে দেননি। দাদা দু'বার চেষ্টা করেছিলেন মা প্রতিবারেই বাধা দিয়েছেন।

গজেনদা উৎসাহ ভরে বললেন—তাহলে ত আমাকে একবার চেষ্টা করে দেখতে হয়!

নববধূর উত্তর—তাহলে শুয়ে শুয়ে পান চিবিয়ে আর সময় নষ্ট কোর না ঘরের দরজা বন্ধই আছে, সারা রাত ধরে চেষ্টা কর—কেউ বাধা দেবে না।

গজেনদা—ছ্যা:—ও ভাবে ছিনতাই করে নেব কেন? শাশুড়ীকে সন্দেশের ভেতর শেকড় খাইয়ে বশ করে চাবিটা হাতিয়ে নেব। ও-চাবি নিশ্চয়ই শাশুড়ীর কাছে আছে। দুজনেই হেসে ফেললো।

নিচে একতলার কলকোলাহল মিটে যেতে শাশুড়ী ঠাকুরণ একবার দরজার বাইরে থেকে বলে গেলেন মিনু, জামাইকে বলিস্ বাইরে যাবার দরকার হলে যেন পাশের ঘর থেকে সন্তুকে ডেকে নেয়। পাঁড়াগাঁ, এত অন্ধকারে ওর চলাফেরা করা অভ্যেস নেই। নববধূ দুজনেই মট্‌কা মেরে পড়ে রইলেন। শাশুড়ী ঠাকুরুণও আর উত্তরের অপেক্ষায় দাঁড়ালেন না।

মাঝ রাত। বক্‌বক্ করতে করতে এর সময় দুজনেই ক্লান্তিভরে ঘুমিয়ে পড়েছেন। কিসের একটা খস্‌খস্ শব্দে গজেনদার ঘুম ভেঙ্গে গেল। আধবোঁজা চোখে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলেন। দেয়ালে টাঙান মেজের বাতির কম আলোয় দেখা গেল একটা অস্পষ্ট চেহারার মানুষ ঘরের ভেতর চলে বেড়াচ্ছে। মুখখানা ভাল করে দেখা যাচ্ছেনা। গজেনদা একলাফে বিছানায় উঠে বসে পাশে ঠেলা দিয়ে নববধূকে ডেকে দেখালেন। অস্পষ্ট চেহারার মানুষটি তখন সিন্দুক খোলবার চেষ্টা করছে। গজেনদা নববধূর হাত ধরে বিছানা থেকে নেমে সন্তু সন্তু বলে চেঁচাতে লাগলেন। ঠিক সেই মুহূর্তেই দেখা গেল অস্পষ্ট চেহারার মানুষটি এদিকে মুখ ঘুরিয়ে ইসারা করছে চীৎকার না করতে। নববধূর চিনতে পেরে চেঁচিয়ে উঠলো—একি—এ যে বাবা? গজেনদা হতবাক্ হয়ে কয়েক মুহূর্তের জন্য শ্বশুরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। দেখা গেল সেই অশরীরী মানুষটী হাত তুলে আশীর্বাদ করবার ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে। মুখে ম্লান হাসি।

এদিকে দরজায় সন্তুর ঘন ঘন করাঘাত। গজেনদার চীৎকারে বাড়ীর সবাই উঠে পড়েছে। গজেনদা তৎক্ষণাৎ দরজা খুলে দিয়ে সস্ত্রীক ঘরের বাইরে। এমন ভয়াবহ কাণ্ড তার জীবনে আর দ্বিতীয়টী ঘটেনি। খোলা দরজা দিয়ে প্রথম ঢুকলো সন্তু। আচমকা সিন্দুকের কাছে বাবাকে সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সন্তু একলাফে ঘরের বাইরে। হঠাৎ সন্তুর চীৎকার ও নিচে দৌড়ে পালানোর ফলে হল এই যে বাড়ীর অন্যান্য আত্মীয় স্বজনরা কোন কিছু বুঝে উঠার আগেই সন্তুকে অনুসরণ করে তারাও নিচে নেমে গেলেন ঝড়ের বেগে। দোতলার বারান্দা মুহূর্তের মধ্যে ফাঁকা হয়ে গেল। কিন্তু যিনি পর মুহূর্তেই ঘরে ঢুকলেন তিনি এ বাড়ীর গিন্নী, অর্থাৎ গজেনদার শাশুড়ী। ঘরে ঢুকে তিনি স্বামীকে চিনতে পেরে অস্ফুট স্বরে বললেন—তুমি?......এ ঘটনার প্রায় মিনিট পনেরো পরে উপরে কোনরকম সাড়াশব্দ না পেয়ে সবাই উঠে এল। প্রথমে ঘরে ঢুকলো গজেনদার বড় শ্যালক সন্তু, পিছনে গজেনদা মালকোঁচা মারা। ঘরের দৃশ্য দেখে সবাই আঁতকে উঠলো। মেঝের উপরে অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে আছেন গজেনদার শাশুড়ী এবং আরও আশ্চর্য্যের বিষয় সিন্দুকটী প্রায় সম্পূর্ণ খোলা। চোখে মুখে জলের ঝাপ্টা মেরে অনেক কষ্টে শাশুড়ীর জ্ঞান ফেরান গেল। গজেনদা ওরি ফাঁকে শ্বশুরমশাইয়ের ছবিটার দিকে আড়-চোখে তাকাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু কি জানি কেন ভালো করে আর শ্বশুর মশাইয়ের মুখখানা মনে করতে পারলেন না। জ্ঞান ফিরতেই শাশুড়ী অর্থাৎ সারদা দেবী উঠে বসলেন। ভালো করে চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখে নিলেন। ছেলে মেয়ে, আত্মীয়-স্বজনরা হুমড়ি খেয়ে পড়লো ঘটনাটার বিশদ বিবরণ নেবার জন্যে।

দেখা গেল সারদা দেবী যেন অনেক অনেকখানি সামলে উঠেছেন। মেয়েজামাইকে কাছে ডেকে বললেন—বিশ্বাস করবে কিনা জানিনা বাবা—তোমার শ্বশুর নিজে হাতে সিন্দুক খুলে তোমাদের জন্য গয়না আর টাকা ঐ বিছানার উপর সাজিয়ে রেখেছেন। তোমরা তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা কর। সিন্দুকের বাকি গহনা সন্তু আর

নন্তুর বৌ-এর জন্য দিয়ে গেছেন।

সারদা দেবীর কথামত সবাই এগিয়ে গেল বিছানার দিকে। আশ্চর্য্য! পর পর কয়েকখানি দামী গহনা সাজান আর নগদ টাকার বাণ্ডিলও রয়েছে খানকয়েক।

শরীর একটু সুস্থ হলে, সারদা দেবী ধীরে ধীরে পূর্বের কিছু কিছু সত্য ও অলৌকিক ঘটনার কথা জানালেন।

কলকাতায় স্বামী যেদিন মারা যান হঠাৎ, ঠিক সেই-দিনই দুপুরের কিছু পরেই উনি ছাদে উঠেছিলেন শুকনো কাপড়-জামা তুলে আনতে। তখন গ্রীষ্মকাল, বেলা প্রায় তিনটে হবে। আশ্চর্য্য হয়ে দেখলেন ঠিক চিলে-কোঠার পাশে যেখানে সূর্য্য পশ্চিমে হেললে বেশ খানিকটা ছায়াপড়ে—ঠিক্ সেইছায়াচ্ছন্নজায়গায়ম্লানমুখে স্বামী দাঁড়িয়ে আছেন, এবং যেন কিছু বলতে চাইছেন। প্রথম কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য সারদা দেবী ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারেন নি। স্ত্রীকে দেখতে লুকিয়ে বাড়ীতে পালিয়ে আসার বয়স তখন আর নেই। অবাক হয়ে তিনি স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। স্বামী সৌরেন-বাবু অনেক কষ্টে অস্ফুটভাবে বললেন—অমন করে কি দেখছ, আমি আর বেঁচে নেই। কথাটা শেষ হতেই সৌরেনবাবুর প্রেতদেহটি হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

সারদা দেবী ভীষণ একটা চীৎকার করে সেখানেই আছড়ে পড়লেন। তার কিছুক্ষণ পরেই কলকাতা থেকে লোক এল সেই নিদারুণ দুঃসংবাদ নিয়ে যে সৌরেনবাবু অকালে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছেন।

এর পর আরও কয়েকবার তিনি স্বামীকে সামনা-সামনি দেখেছেন এবং স্বামীর সঙ্গে তিনি কখন কখন বৈষয়িক আলোচনাও করেছেন। প্রথম প্রথম সৌরেন-বাবু দিনের বেলাতেই দেখা দিতেন যাতে স্ত্রী ভয়টা কাটিয়ে উঠতে পারেন। সিন্দুকের তালা না খোলার নির্দ্দেশটা সৌরেনবাবুই সারদা দেবীকে দিয়েছিলেন, সেই কারণে সারদা দেবীর যতই আর্থিক প্রয়োজন থাকুক, সিন্দুক তিনি খুলতে দেননি। এমনকি সিন্দুকের চাবিটী সৌরেনবাবুর পছন্দমত একটা গোপন জায়গায় লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। স্থানটি একমাত্র সারদা দেবী ছাড়া আর কোন জীবিত লোক জানতেন না। কথাগুলো বলবার সময় অঝোরে কাঁদতে লাগলেন তিনি। বললেন মেয়ে জামাইকে নিজে হাতে সোনা আর টাকা দিয়ে আশীর্বাদ করবেন বলে আজ দেখা দিয়েছিলেন।

এই কথা শোনার ওর আর কারও পক্ষে চোখের জল ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হল না। এমনকি গজেনদার মত লোকও মর্ম্মাহত চিত্তে শুধু বললেন, "এমন অবিশ্বাস্য ঘটনাও পৃথিবীতে ঘটতে পারে নিজে চোখে না দেখলে বোধহয় বিশ্বাস করতুম না। মায়ার বাঁধন যে এত শক্ত কে জানতো?…সারদা দেবী শেষে বড় ছেলের উদ্দেশ্যে বললেন—সন্তু, বাড়ীর কাজকর্ম্ম মিটে গেল আমায় বাবা কাশীতে থাকবার বন্দোবস্ত করে দে। শেষ জীবনটা আমি ওখানেই কাটাব। আত্মঘাতী হতে উনি নিষেধ করেছেন, নইলে বড় দীঘির কালো জলে আমি এখুনি প্রাণ বিসর্জ্জন দিতুম।

উনি বলেছেন—কর্ম্ম ক্ষয় না হলে মানুষের মৃত্যু হয়না। আমাকে সেই কর্ম্ম ক্ষয় করতেই কাশীতে যেতে হবে। ওখানে আমি ওঁকে আর আমার শ্রীবিশ্বনাথকে দুজনকেই কাছে পাব। যাও বাবা, তোমরা যে যার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ো। যেটুকু রাত আছে, বিশ্রাম করে নাও। আমি আজ এই ঘরেই রাত কাটাব। মিনু আর গজেনকে ওদিকের বড় ঘরটায় শোয়ার ব্যবস্থা করে দাও শিবুর মা।

গজেনদা এ কথার প্রতিবাদ করে বললো—আমাদের জন্যে আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না। বাকি রাতটা আমি লাইব্রেরী ঘরেই কাটিয়ে দিতে পারব। বলে বিছানার উপর থেকে একটা বালিশ বগলদাবা করে গজেনদা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। মাত্র ১০ মিনিটের মধ্যেই অতবড় বাড়ীটা আবার নিঃঝুম হয়ে গেল। কৃষ্ণ-পক্ষের অন্ধকার যেন বাড়ীটাকে একেবারে সাঁড়াশীর মত চেপে ধরে রইল।

জানিনা সে রাতে কারও ঘুম আর এসেছিল কিনা, তবে গজেনদা যে একবারও চোখের দুটি পাতা এক করতে পারেন নি একথা আমি হলপ করে বলতে পারি।

———

অসংসারী [উপন্যাস] শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

* * * * * * *

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

সদাশিবের বাড়ীতে দু'ঘন্টা একেবারে চুপচাপ। সন্ধ্যার একটু আগেই সদাশিব নিজের ঘরে গিয়ে দেখে গৌরী তখনও খাটের ওপোর শুয়ে আছে। কোনরকম ভণিতা না করেই শিববাবু তাকে বলে, আজ রাত্তিরের মধ্যে তৈরী হয়ে নাও, কাল বিকেলের গাড়ীতে তোমাকে তোমার বাপের বাড়ী রেখে আসবো। যে কাণ্ড আজ হোল এবং যে সব কথা লোকের মুখে শুনলুম, তাতে আর তোমাকে দিল্লীতে রাখতে পারবো না।

গৌরী কোন জবাব দিলে না। সে যেন কিছু শুনতেই পায়নি, এমনই ভাবে পূর্ব্ববৎ শুয়ে রইলো।

কাল যাওয়ার জন্য তৈরী থেকো। অনেকটা আদেশের ভঙ্গীতে কথাগুলো বলে শিববাবু ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। গৌরী তাতেও কোন সাড়া দিলে না। একটু পরে সদাশিব পুনরায় ঘরে ঢুকে জামা কাপড় পরে বোধহয় যেন কোথায় বেরোবার জন্য প্রস্তুত হয়ে নিলে।

গৌরী শুয়ে শুয়েই প্রশ্ন করলে—তাহলে কাল আমায় যেতেই হবে।

হ্যাঁ।

সত্যি মিথ্যে কোন অনুসন্ধানই তুমি করবে না?

অনুসন্ধানের কিছুই নেই। চরিত্রহীন ও ভ্রষ্টাকে আমি স্থান দিতে পারব না।

তোমার বন্ধু সমীরকে?

সমীর ছিল প্রাণের বন্ধু। কিন্তু সেদিন যখন দেখলুম রেণু রয়েছে তার কাছে, তখন তার বাড়ী থেকে জলস্পর্শ না করেই চলে এসেছি।

তাহলে আমাকে বিনা অপরাধেই তাড়িয়ে দেবে?

বিনা অপরাধে নয়, মেয়েদের জীবনের সবচেয়ে ঘৃণিত যে অপরাধ, সেই অপরাধেই তোমাকে তাড়াব।

সত্যি মিথ্যে খোঁজও করবে না?

কার কাছে খোঁজ করবো, প্রবোধের স্ত্রীর কাছে?

গৌরী একটু বিব্রত বোধ করলে। মুখে বলে, তোমার দয়া।

বেশ, তাই হবে। দৃপ্তকণ্ঠে কথাগুলো উচ্চারণ করে সদাশিব ঘর থেকে বেরিয়ে এল। গৌরী দ্রুতগতিতে উঠে এঘরে এসে শিববাবুকে কি যেন বলতে যাবে, এমন সময় দেখলে চোরের মত রামরূপ দরজার কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

সদাশিব রামরূপকে দেখেই বল্লে, কি মনে করে শয়তান। এ বাড়ীতে ফের আসতে তোর লজ্জা করে না?

রামরূপ ঘাড় হেঁট করে বল্লে, আমার টাকাকড়ি সমস্ত আজ পর্য্যন্ত চুকিয়ে দিন।

টাকা? একপয়সা দেবনা, নালিশ করে আদায় করগে যা।

এবার রামরূপ মুখ তুলে দেখলে, বল্লে, আমার কি কসুর আছে বলুন।

কসুর? সদাশিব গর্জে উঠলো। ভদ্রলোকের বাড়ীতে —তুই কি ভেবেছিস্ কি?

রামরূপ মরিয়া হয়ে এসেছে। সমশ্রেণীর আরও কয়েকজন ছোকরাকে ও সঙ্গে করেই এসেছিল, তারা পেছনে বাড়ীর হাতার মধ্যেই দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু ঘর

থেকে তাদের দেখা যাচ্ছিল না। রামরূপ জানে যে যে-সব ব্যাপার হয়েছে তাতে ওর মাইনে পাওয়ার আশা কম, অথচ প্রায় একমাসেরই মত মাইনে ওর পাওনা হয়েছে। ওর বন্ধুরাই ওকে জোর করে ঠেলে পাঠিয়েছে এবং হয়ত পেছনে এমন কেউও থাকতে পারে যার স্বার্থ হচ্ছে বাঙ্গালী-বাড়ীর কুৎসা প্রচার করা। তাদের বলেই রামরূপ বলীয়ান্, তাই সে মুখ তুলে বল্লে, আমার কি কসুর আছে, মায়িজী আমাকে বল্লে, মেমসাব বলে ডাকৃবি, তারপর বল্লে আমার গা হাত পা দলাই-মলাই করে দে, তারপর—

গৌরী পেছন থেকে ভ্রূকুটী করছে। নিজের চুড়ীতে হাত দিয়ে বিছাপদক পরার জায়গায় হাত দিয়ে ইসারা করছে, কিছু বলিস্ নি' চুড়ি ভাঙ্গিয়ে বিছাপদক গড়িয়ে দেব।

সদাশিব বল্লে, তারপর?

রামরূপ সামলে নিয়ে বল্লে, তারপর আর কিছু নয়। কিন্তু পাশের বাড়ীর দিদিমণিরা এসে তাই দেখেই—

হোল, শুনলে এখন, গৌরী এগিয়ে এসে বল্লে। একটা বাচ্চা ছেলে, সেদিন ভয়ানক গা হাত পা কস্কস্ করছিল, তাই ওকে দিয়ে একটু গা টিপিয়ে ছিলুম, আর অম্নি সমস্ত পাড়াশুদ্ধ ঢি ঢি পড়ে গেল!

তুই মায়িজীর ঘরে বসে সিগারেট খেয়েছিস্?

কই না ত বাবু, কবে? রামরূপ যেন আকাশ থেকে পড়লো।

কাল শনিবার, দুপুরে। আমি যখন অফিস থেকে ঘরে ঢুকেছি, তখনও সিগারেটের গন্ধ ছিল ঘরে।

নেহি বাবু, কাল দুপুরে আমি বেলা বারো বাজে চলে গিয়েছি।

কোথায় গিয়েছিলি?

ঐ ওদিকে, আমার সব দেশোয়ালী দোস্ত আছে, তাদের কাছে।

গৌরীর দিকে চেয়ে সদাশিব জোরের ওপোরে প্রশ্ন করলে, তাহলে ঐ সিগারেট কে খেয়েছে, সেকথা বল্‌তে হবে তোমাকে।

গৌরী বেশ একটু লঘুভাবে বলে, বা রে সিগারেট কে খেয়েছে তা আমি কি করে বল্‌বো? কোথায় থেকে হাওয়ায় উড়ে, কিম্বা সমীর যখন ছিল, সেই আমলের কোন টুকরো হয়ত ঘরের কোণে-টোনে কোথাও পড়েছিল।

প্রবোধের স্ত্রীর কাছে আমি খবর নেব সে কি দেখেছে। জোর করে শিববাবু কথাগুলো উচ্চারণ করে বাইরে যাওয়ার জন্য পা বাড়ালে।

রামরূপ বল্লে, আমাকে কি আর রাখবেন? না-রাখবেন ত মাইনে চুকিয়ে দিন।

তোমাকে আমি রাখবো না।

তাহলে টাকা চুকিয়ে দিন।

গৌরী খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে সদাশিবকে আড়ালে ডাকলে।

সদাশিব বিরক্ত হয়ে বল্লে, কি বলবে বলনা, আবার আড়ালে কেন?

দরকার আছে, শোনোই না, যেন কিছুই হয়নি, এইভাবে গৌরী সদাশিবকে ভেতরের রোয়াকে নিয়ে গেল। বল্লে, রামরূপকে এখুনি ছাড়ালে লোকেও সন্দেহ করবে, আর ওরও রাগ হলে ও নতুন নতুন যা-তা বানিয়ে বানিয়ে বল্‌তে থাকৃবে। তার চেয়ে কিছুদিন রেখে—আর বাস্তবিক আমি কিছু দুষ্য ভেবে ওকে দিয়ে পা টেপাই নি।

আচ্ছা, সদাশিব নিতান্ত বিরক্ত ভাবে কথাটা উচ্চারণ করে এঘরে আসতে আসতে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বল্লে, মায়িজীর বদলে মেমসাব বলতে ওকে শিখিয়েছিলে কেন, তার কৈফিয়ৎ দিতে পার?

গৌরী একটু ঘাবড়ে গিয়ে বল্লে, সে ত ওই শিখিয়েছে। বল্লে, এখনকার দিনে আর কেউ মায়িজী বলেনা, সব মেমসাব বলে। তাই আমিও বলেছিলুম, বেশ তোর যা ইচ্ছে হয় তাই বলিস্।

রামরূপের দিকে চেয়ে সদাশিব বল্লে, কি রে, মেমসাব বলতিস কেন? তোর মনে নিশ্চয়ই কু এসেছিল।

নেই সাব। আমি—

আবার সাব, সদাশিব ধম্‌কে উঠলো।

রামরূপ সপ্রতিভের মত উত্তর দিলে যে ছেলেবেলা থেকেই সে বাবুদের বাড়ী কাজ করছে, এবং সাব, মেমসাব বলতেই সে অভ্যস্ত, অতএব এখানেও সে মেমসাব বলেছে।

প্রসঙ্গটা চাপা দিয়ে সরল করার উদ্দেশ্যে গৌরী বল্লে, বাবা রামরূপ, এখন আর বাজে কথার দরকার নেই। তুই চট করে স্টোভটা ধরিয়ে বাবুকে চা তৈরী করে দে। ওঃ, আজ সারাদিন ধরে কি কষ্টই পোয়াতে হোল। সদাশিবকে বল্লে বিচার-টিচার পরে কোরো, এখন একটু বোসো, চা-টা খেয়ে তবে বেরিও।

সদাশিব বল্লে, আর চা খেতে হবে না, আমি এখুনি বেরুবো, বলে বাইরের দিকে পা বাড়াতেই গৌরী খপ করে সদাশিবের হাতটা ধরে বল্লে, আমার মাথা খাও, এখন বেরিও না গো; আর আজকেই ত শেষ দিন, কালই ত চলে যাচ্ছি, তোমার কষ্ট যে আর দেখ্‌তে পারি না!

হুঁ, সদাশিব অসহায়ভাবে ডেক চেয়ারে বসে পড়লো। রামরূপকে তাড়া দিয়ে গৌরী বল্লে, নে, নে, চট্‌পট্ চা-টা তৈরী করে দে, হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন?

রামরূপ চট করে একবার বাইরের দিকে বেরিয়ে তার দোস্তদের ইসারা করে চলে যেতে বলেই আবার ঘরে ঢুকলো এবং বিনা বাক্যব্যয়ে রান্নাঘরে গিয়ে ষ্টোভ ধরাতে বসে গেল।

গৌরী হতাশভাবে নেওয়ারের খাটখানার ওপোর বসে বল্লে উঃ, মানুষের গ্রহ যে কখন কোথা দিয়ে কি সর্ব্বনাশ করে—

প্রায় কাঁদো কাঁদো স্বরে সদাশিব বল্লে, হাঁ গো, একটা সত্যি কথা বল্‌বে?

বল। আমি কি কখনও তোমার কাছে মিথ্যে কিছু বলেছি। খুব মিষ্টি করে গৌরী উত্তর দিলে।

সত্যি, সত্যি করে বলত, এ সব ব্যাপার কি? তুমি কি সত্যিই আমাকে পছন্দ কর না! আজ সকাল থেকে যা শুন্‌ছি, সেগুলো কি?

ওপোর দিকে চেয়ে গৌরী বল্লে ভগবান সাক্ষী, এর বেশী নিজের মুখে নিজে আর কি বল্‌বো? তার চেয়ে এক কাজ কর, চাকরী ত অনেকদিন হোল, এবার দিনকতক ছুটী নিয়ে চল একটু তীর্থ করে আসি।

ভগবান কিসের সাক্ষী সে প্রশ্ন না করে শুধু মাত্র ভগবানের নাম শুনেই সদাশিবের বুকের গুরুভার যেন অনেকটা লাঘব হয়ে গেল। বল্লে, তীর্থ কি আর আমাদের বরাতে হবে, তীর্থের খরচ কত? তারপর তোমার শরীরে এত ঝাঁকানি সহ্য হবে কি?

তোমার সঙ্গে তীর্থে যাব তাতে আবার কষ্ট কি, তুমি সঙ্গে থাক্‌লে কষ্টকে আর কষ্ট বলে মনে হয় কি? গৌরী যেন কথাগুলো কত আগ্রহ সহকারে উচ্চারণ করলে।

একটা থালার ওপোর দুবাটী চা নিয়ে রামরূপ ঘরে এসে ঢুকলো। দুজনের কাছে দুবাটী চা দিয়ে রামরূপ ঘরের আলোটা জেলে দিলে, তারপর সোজা ওঘরে গিয়ে সেখান থেকে মশলার কৌটোটা এনে সদাশিবের ডেক-চেয়ারের হাতলে রেখে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

চা খেতে খেতে সদাশিব বল্লে, যাই বল, রামরূপ কিন্তু বেশ কাজের লোক। দেখ, মশলার কৌটোটা কেমন হিসেব করে নিয়ে এসেছে।

ছেলেটা ভালো, তবে বড় বোকা গোছের, আহা, ছেলেমানুষ ত! আরও দু'এক চুমুক খেয়ে গৌরী বল্লে, এই চা খাওয়াটা আবার ছেড়ে দেব। এ তোমার ঐ অনামুখো বন্ধু সমীরই আমাকে নতুন করে ধরিয়েছিল। চা খেতে বস্‌লেই ঐ হতভাগার কথা মনে পড়ে বলেই এবার থেকে চা খাওয়া বন্ধ করতে হবে। ওঃ, কি কালসাপই যে বন্ধু সেজে এসেছিল!

একথায় সদাশিব আর কোন মন্তব্য করলে না। গৌরী চা-পান শেষ করে মেঝের ওপোর বাটীটা নামিয়ে রেখে বল্লে, তুমি কি নীরোদবাবুদের বাড়ীতে যাবে নাকি?

না, কেন? সদাশিব যেন বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলে।

প্রবোধের বউয়ের কাছে ভজাভজি করতে।

না, এ নিয়ে আর লোক হাসিয়ে কি লাভ? তুমি যখন ভগবান সাক্ষী করে আমার কাছে বলেছ তখন কি আর ভগবানের ওপোর কোন মানুষের সাক্ষী দাঁড়ায়?

তাহলে কালকে আমায় দেশে নিয়ে যাবে ত?

ও রাগের মাথায় কি একটা বলেছি, তাই বুঝি মজা পেয়ে গেছ? মিটি মিটি হেসে সদাশিব কথাগুলো বল্লে।

না না, তা নয়, অনেকদিন দেশে যাইনি, তাই বলছি। চলনা, যদি আবার একটা রান্নার লোক পাই।

সে জন্যে যেতে হবে কেন, চিঠি লেখ না, সদাশিব সরলভাবে উত্তর দিলে।

তাও হয়; তবে তাই লিখি, যদি কোন লোক-টোক মেলে, গৌরী চিন্তিতভাবে উত্তর দিলে। বল্লে, রেণুর

মত একটা মেয়ে যদি থাকে, তাহলে সারাদিন বাড়ীতেই রইলো, গা-হাত পা টেপা থেকে সমস্ত কাজই করবে, অথচ পাড়ার লোক কেউ একটা কথাও বলতে পারবেনা।

হ্যাঁ। সদাশিব ধীরে ধীরে জামার বোতামগুলো খুলতে লাগলো।

কি, আজ আর বেরুবেনা, গৌরী প্রশ্ন করলে।

না, কোথায় আর যাবো? বিশেষ করে যে সব ব্যাপার হয়েছে আজ, তাতে করে আর বেরুতে ইচ্ছে হচ্ছে না। লোকেরা কে কি বলবে তার ঠিক নেই।

হুঁ, সবই গ্রহের ফের আর ত কিছু নয়। তবে নাও, সন্ধ্যা আহ্নিক সেরে নাও। বলে গৌরী বিছানা থেকে উঠে যা বড় একটা করে না, তাই করলে, অর্থাৎ সদাশিবের জামাটা হাতে করে নিয়ে যেন ওঘরে যথাস্থানে ঝুলিয়ে রাখার জন্য চলে গেল। সদাশিব হাস্তামনে হাতমুখ ধুয়ে পুজোআহ্নিক সারবার জন্যে বাড়ীর ভেতর চলে গেল।

গৌরী রান্নাঘরে ঢুকতেই রামরূপ হাসি হাসি মুখে নিজের ডানহাতের কনুয়ের ওপোর হাত দিয়ে ইঙ্গিতে বিছাপদকের কথা স্মরণ করিয়ে দিতেই গৌরী পেছন ফিরে বাইরের দিকে তাকিয়ে নিয়ে ঘাড় নেড়ে সায় দিলে, অর্থাৎ হবে, সব হবে, ব্যস্ত হোয়োনা। তারপর রান্নাঘরে একটু এদিক ওদিক করে নিজের শয়নকক্ষে চলে গেল।

বিছানায় বসে বসে গৌরীর চোখ ফেটে জল এসে গেল। হায়রে, এই তার স্বামী! মানুষ বল্লেও হয়, পুতুল বল্লেও হয়। পাল পাল ছাগলকে হাঁটিয়ে কসাইরা সহরের শেষ সীমায় অবস্থিত গোখানার নিয়ে যায় কাটার জন্যে, ছাগলগুলো কতখানি সরল বিশ্বাসে কসাইদের নির্দেশ অনুসারে পায়ে হেঁটে বেশ যেন আনন্দ করতে করতে যায়, মনে করে বুঝি কোন ভালো জায়গায় চরতে যাচ্ছে, ঠিক যেন বরযাত্রী। কিন্তু মানুষ যদি এই রকম ছাগলের মত সরল বিশ্বাসী হয়, তাহলে সেই শিশু-মানুষের জন্য অনুকম্পা জাগে, তাকে দয়া করা চলতে পারে, কিন্তু সেই লোককে স্বামী বলে মেনে নিয়ে তার নির্দেশ অনুসারে সংসার করা,—ওঃ, এ, যেন জীবন্ত সমাধি! খবরের কাগজে পড়তুম, সরোজিনী নাইডুর কথা, এখন পড়ি বিজয়-লক্ষ্মী পণ্ডিতের কথা, নেতাজীর সঙ্গে ছিল লক্ষ্মী স্বামীনাথন্। আর বাঙ্গালীদের মধ্যে, সরোজিনী নাইডু বাঙ্গালী, সুচেতা কৃপালনী বাঙ্গালী, অরুণা আসফআলি বাঙ্গালী, বীণা দাস বাঙ্গালী, সমীরের কাছে শুনেছি চট্টগ্রামের বাঙ্গালীমেয়ে প্রীতি ওয়াদ্দেদারের কথা, প্রতিভা সেনগুপ্তের কথা। আমি তাদের চেয়ে কোনো অংশে কম নই, কিন্তু এমনই ঘরে জন্মেছি, আর এমনই লোকের হাতে পড়েছি, যে খালি উদয়াস্ত কড়াক্রান্তির হিসেব করে টেনে-টুনে সংসার চালিয়েই যাচ্ছে, অথচ কার জন্যে এত সব সঞ্চয়! মাঝে মাঝে মাতৃত্বের জন্য গৌরীর মনটা হাহাকার করে কেঁদে ওঠে। বয়স হয়ে যাচ্ছে, ভবিষ্যৎ শূন্য, মহাশূন্য। অন্যান্য সংসারে যখন আসবে জামাই এবং পুত্রবধূ তখন আমার সংসারে সেই পুরাতন বুড়োবুড়ি এবং তারপর একজনের মৃত্যু। যদি বিধবা হই বৃদ্ধ বয়সে কেউ নেই, নিজেও কিছু জানি না, টাকা পয়সা থাকলেও পরের হাতে সর্ব্বস্ব, এবং তারপর একদিন মৃত্যু। আশাহীন, উৎসাহহীন, জরাগ্রস্ত, অবসন্ন জীবন! 'ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন, চরণতলে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন',—ওঃ, ঐ সমীর! জীবনের কি উত্থান-পতনটাই না ওর ওপোর দিয়ে গেছে। আর এখনও দেখ, রেণুকে ও ভালবাসে, কি রকম জোরের ওপোর রেণুকে নিয়ে ও সরকারী বাংলোয় একা বাস করে। কি তীক্ষ্ণ ওর বুদ্ধি। রামরূপ যেমনই গেছে গোয়েন্দাগিরি করতে, অমনি এক নিমেষে ওর ঘাড় ধরে টানতে টানতে এনে হাজির করেছে। রেণুর কথা জোর করে সকলের সামনে বলতেও কিছুমাত্র গ্রাহ্যই করলে না, বল্লে, ও আমার বোন। আর সদাশিব? সদাশিব তো সদাশিব। কে একটু অপবাদ দিলে, অমনি যাও চলে দেশে, কি না পালিয়ে বাঁচবে। বউকে তাড়িয়ে দিয়ে সকলকে দেখাবে, দেখ আমি কত ভালো। আবার একটা ধাপ্পা দিতেই অমনি জল। উঃ, এত বোকাও পুরুষমানুষ হয়! রামরূপ যে রামরূপ, সেও ওর চেয়ে চালাক আছে। গৌরীর চোখ ফেটে জল এল। হা ভগবান, তুমি যদি এইভাবেই নীরবে রোগে ভুগিয়ে ঘরের ভিতর তিলে তিলে নিঃশেষ করার জন্যই আমাকে তৈরী করেছিলে, তাহলে কেন আমার মধ্যে এই কর্ম্মের ক্ষুধা

দিলে, নিজের ওপোর এতখানি আত্মবিশ্বাস কেন দিলে, এবং সর্ব্বোপরি কেন আমায় সন্তান না দিয়ে সংসারে রেখেও সংসারী করলে না। ভগবান সাক্ষী, আমি সত্যি বলছি ভগবান সাক্ষী, আমার অন্তরের আকুলতার একমাত্র সাক্ষী ঐ ভগবানই—

কি, শুয়ে আছ বুঝি, সদাশিব পুজো-আহ্নিক সেরে ঘরে এসে ঢুকে এই মামুলী প্রশ্ন করলে।

গৌরী বল্লে, দেখ একদিন আমি ডালের সঙ্গে ভাত মেখে থাবা থাবা করে খাচ্ছিলুম এমন সময় আমাদের পাড়ার একটা মেয়ে এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, কি ভাত খাওয়া হচ্ছে বুঝি, তখন আমি তাকে পাল্টা প্রশ্ন করেছিলুম, কেন সন্দেহ আছে, তা তোমাকেও, আজ আমার সেইরকম পাল্টা প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হচ্ছে।

সদাশিব অপ্রস্তুত হয়ে বললে, না, তাই জিগ্যেস কচ্ছি যে, আবার শরীর-টরীর খারাপ হোল না কি?

কই, তা ত জিজ্ঞাসা কর নি, গৌরী সহাস্যমুখে উত্তর দিলে।

না না, ঐ হোল আর কি? একটু থেমে সদাশিব বললে, তোমার সঙ্গে কথা কওয়া যায় না, সব তাতেই হেঁয়ালি।

ঐ ত রোগ, ঐখানেই ত গোলমাল। যে বামুন ঠিকুজি মিলিয়ে বলেছিল, রাজযোটক মিল, তার সঙ্গে এক-একবার বোঝাপড়া করতে ইচ্ছে হয়, রাজযোটক মানে কি?

সদাশিব সরল ভাবেই বল্লে, রাজযোটক মানে সব-দিক দিয়েই মিল।

গৌরী সহাস্যমুখে বললে, বোধ হয় তা নয়। রাজ-যোটক মানে রাজায় রাজায় যেভাবে মিল হয়, অর্থাৎ যুদ্ধ-ক্ষেত্রে। আচ্ছা বল্‌তে পার, কোন সময় কোন রাজার সঙ্গে কোন রাজার কি মনের মিল হয়েছে? কখনও না। হয় কোনো একজন শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য দুই রাজায় মিতালী করেছে, না হয়ত একজনের কাছে লড়াই করে হেরে গিয়ে তার বশ্যতা স্বীকার করে তার সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করেছে। রাজাদের বিয়ে পর্য্যন্ত দেখ, তারা যুদ্ধ করে অপর রাজাকে বধ করে তার রাজ্যশুদ্ধ উৎখাত করে তার মেয়েকে জোর করে বিয়ে করে নিজের অন্তঃপুরে এনে পোরে। ভাবী শ্বশুরকে বধ করে তবে তার মেয়েকে বিয়ে করে রাজারা। কাজেই রাজযোটক মিল কথাটা বড় সাংঘাতিক কথা।

যাক্ গে, ওসব বড় কথায় আমার দরকার নেই, তার চেয়ে আমার অফিসের অনেক কাজ আছে; বিকেলে করব বলে মনে করেছিলুম, কিছুই করা হয় নি, এখন ও ঘরে গিয়ে সেগুলো সারা যাক্, বলতে বল্‌তে দোয়াত কলম হাতে নিয়ে অফিসের ফাইলগুলো বগলদাবা করে কোমরের কাপড়টা আঁটতে আঁটতে সদাশিব ও ঘরে চলে গেল। গৌরী চীৎ হয়ে শুয়ে শুয়ে সরকারী বাংলোর ঢালাই করা সিলিং-এর দিকে চেয়ে রইলো।

খাওয়াদাওয়ার পর সারারাত কেটে গেল। পরের দিন সকালটাও যথারীতি শেষ হোল। অফিসের ফাইল এবং খাবারের কৌটো নিয়ে সোমবারের ধোপদোরস্ত কাপড় ও গলাবন্ধ কোট পরে সদাশিব অফিসে চলে গেল। গৌরী রান্নাঘরে গিয়ে রামরূপকে বললে, দেখ রামরূপ, তুমি চটপট্ খেয়ে নিয়ে আগে যেমন বাইরে যেতে, এখন দিনকতক তেমনিভাবে বাইরে যাবে, কারণ মনে রেখ, অনেকেই এ বাড়ীর দিকে এখন থেকে নজর রাখবে, বুঝলে।

রামরূপ মনে মনে অসন্তুষ্ট হলেও মুখে বললে, জী মেমসাব। তারপর ইতস্ততঃ করে বললে, আমার সে কথাটা মনে আছে?

আছে রে, বাপু আছে। কিন্তু তুমি বড় শয়তান আছ। কালকে কি বলে তুমি সব বলে দেওয়ার জন্য ব্যস্ত হচ্ছিলে?

কী করবো মেমসাব? বাবু যে—

ওরে বোকা, সব কথা বলে দিলে যে মার খেয়ে তোর গতর চূর্ণ হোত।

ইস্। আমি কি একা ছিলুম না কি? আমার কতগুলো সাথী বাইরে ছিল তা জানেন? সগর্ব্বে রাম-রূপ উত্তর দিলে।

তাই নাকি? জোর করে হেসে উঠলো গৌরী। একটু থেমে বললে, বন্ধু নিয়ে গুণ্ডামি করতে আর হবে

না। কিছুদিন অপেক্ষা কর, তোমাকে যা দেব বলেছি, তাই দেব।

উৎসুক হয়ে রামরূপ বললো, মেমসাব, গা-হাতপা দলাইমলাই করতে হবে না।

মুখ টিপে গৌরী বললে, এখন না, দিনকতক পরে।

বিরসবদনে রামরূপ বললে, আচ্ছা।

বেলা বারোটা নাগাদ রামরূপ চলে গেল। দরজা বন্ধ করে সমস্ত জানালাগুলো খুলে গৌরী আজ কাগজ কলম নিয়ে চিঠি লিখতে বসলো। সমীরকে চিঠি না লিখলে সে কিছুতেই তৃপ্তি পাচ্ছে না। রেণুর দিদিমার কথাগুলো তার আর একবার মনে পড়লো, ডুবেছি না ডুবতে আছি দেখি পাতাল কতদূর।

কাল সারাটি রাত এবং আজ সমস্ত সকাল ধরে গৌরী ভেবেছে সমীরকে চিঠি লেখা উচিত কি না এবং সেই সঙ্গে আরও ভেবেছে, কি লিখবে, কেমন করে লিখবে, কি ভাবে আরম্ভ করবে, কি ভাবে শেষ করবে। মনে মনে তার অন্ততঃ দশবার লেখা হয়ে গেছে সেই চিঠি।

বহুদিন পূর্বের কথা মনে পড়ে গেল। কে একজন লোক হয়ত বা পরিহাসচ্ছলেই বলেছিল যে, হিন্দু বিবাহ মানে জেলখানা, বিনাঅপরাধে সশ্রম কারাদণ্ড। সত্যি কথা,—জানি না, চিনি না, ভালো কি মন্দ বুঝি না, এমন একজন অচেনা লোকের সঙ্গে জীবন ভোরের চুক্তি। আরে বাপু, একটা সেলাইয়ের কল, কি একটা রেডিও কিনতে হলে তার জন্য পাঁচটা দোকান ঘুরে, দশটা মেশিন এনে বাড়ীতে দুমাস ধরে ট্রায়াল দেওয়া হয়, আর সে মেশিনগুলো কি রকম, —না ইচ্ছে হলে বদলে ফেলা যায়, দান করা যায়, ফেলে দেওয়া যায়, ব্যবহার না করে চাপা দিয়ে ফেলে রাখা যায়। কিন্তু এমন যে বিয়ে, তার কোন ট্রায়াল নেই, বদল নেই, একটা বর একবার পাওয়া হয়ে গেলে আর কোন নতুন বর পাওয়া যাবে না। জেলখানার কয়েদীর যেমন নিজের ইচ্ছা বলে কিছুই নেই। পরের ইচ্ছায় পাথর ভাঙ্গো, ঘানি ঘোরাও। হিন্দু মেয়েদের বিয়ের পর দিন থেকেই ঠিক সেইরকম স্বামীর হুকুম মতই সব কিছু করতে হবে। গৌরীর স্কুলের এক সহপাঠীর কথা মনে পড়ে গেল। সে ছিল এক রেল অফিসারের মেয়ে। বিয়ের অনেকদিন পরে একবার তার সঙ্গে গৌরীর দেখা হয়েছিল। গৌরী তাকে বলেছিল, কিরে, তুই রেল অফিসারের মেয়ে, রেল অফিসারের বউ, রেলের পাশ নিয়ে খুব ত ঘুরে বেড়াস। সে দুঃখ করে বলেছিল, রেল চড়া প্রায় ছেড়েই দিয়েছি। গৌরী জিজ্ঞাসা করেছিল কেন? রেল গাড়ীর অপরাধ? সে বলেছিল, বাবার সঙ্গে বরাবর ফার্স্ট ক্লাসে চড়েছি, এখন স্বামী মহাশয় থার্ড-ক্লাসের বেশী পাশ পান না, কাজেই বিরক্ত হয়ে রেলচড়া বাদ দিয়েছি। জন্মে অবধি ফার্স্ট ক্লাসে চড়ে আর থার্ড-ক্লাসে চড়া যায় না। সত্যি, দেশের এমনই নিয়ম, যতই বড়লোক হও, বিয়ের পরেই স্বামী গরিব হলে তার সঙ্গে নুনভাত খাও, আর তার মন রেখে চলো, তা তার মন রাখতে ইচ্ছে হোক, আর নাই হোক। সদাশিব প্রথম প্রথম গৌরীকে বলতো, দেখ, আমাদের দেশে চিরদিনই লোক প্রার্থনা করে, ভার্য্যাং মনোরমাং দেহি চিত্তবৃত্যনুসারিণীং, অর্থাৎ সুন্দরী বা শিক্ষিতা বা ধনী কন্যা চাইনা, চাই মনোরমা, অর্থাৎ যে স্বামীর মন জুগিয়ে চলতে পারবে এবং যে স্বামীর চিত্তবৃত্তিকে অনুসরণ করে চলতে পারবে। গৌরী একদিন বিরক্ত হয়ে বলেছিল, এ সমস্ত শাস্ত্রকার পুরুষ মানুষ, তা না হয়ে তারা মেয়েমানুষ হইলে, এই শ্লোকটাই হোত এইরকম যে, স্বামীং মনোরমং দেহি এবং এমন স্বামী যে স্ত্রীর চিত্তবৃত্তিকে অনুসরণ করে চলতে পারবে। এই কথা বলার পর আর একদিনও সদাশিব ঐ স্বার্থবাদী শ্লোকটাকে উচ্চারণ করেনি। দাঁত দিয়ে ঠোঁট দুটো চেপে ধরে গৌরী মনেমনে বল্লে, এবার আমি এই অত্যাচারের শেষ করে দেব, আমার জীবন রূপ কারবারের অংশীদার বদলাব। বদনাম যখন হয়েইছে এবং সংসারে ছেলেমেয়ে বলে কোন পিছুটান যখন কিছুই নেই, তখন এই হতভাগ্য দাসত্ব জীবন শেষ করে এই হিন্দু ব্রাহ্মণত্বের সনাতন প্রথাকে দুপায়ে মাড়িয়ে ডিঙ্গিয়ে আমি আমার মনোমত সঙ্গীকে জোর করে জুটিয়ে নেব, সুখী হব। বদনাম মানে এই ত? লোকে আর কি করবে আমার? ঐ ত রেণু! ঐ কানী, নিরক্ষর, হত-কুৎসিত মেয়েটা, ওরও যদি সমাজে স্থান থাকে, তাহলে আমিও আমার স্থান করে নেব। বড় বড় নামকরা

মেয়েদের ত কত রাশি রাশি বদনাম শুনতে পাই, কিন্তু তাতে ত তারা কেউ মরে যায়নি। এবার দেখবো নিজের জোরে, নিজের চেষ্টায়, নিজের ইচ্ছা অনুসারে চলে, দেখবো, বাঁচি কি মরি।

ঠিক সেই সময়েই রেণু সমীরকে ভাত দিয়ে কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলেছে—দাদা, আপনি আমায় অন্যকোন হুকুম আর করবেন না। আমি হিন্দু বিধবা আমাকে আপনি স্নেহ করেন বটে, কিন্তু সেজন্য আমি আপনাকে লোক-সমাজে খেলো করতে পারবো না। একসময়ে যে লোকের বাড়ী ঝি-রাঁধুনীর কাজ করেছে, তাকে বিয়ে করে আপনাকে নীচে নাম্‌তে আমি দেব না। আইন যাই-থাক্, আমার বাবা লোকের গুরু ছিলেন, পুরোহিত ছিলেন, তাঁর মেয়ে হয়ে আমি কখনো এরকম শাস্ত্রছাড়া কাজ করতে পারবো না। তার চেয়ে আপনি বিয়ে করুন, আপনার সংসারে আমি ঝি-রাঁধুনী হয়েই থাক্‌বো, তাহলে আর আপনার কোনো বদনামও হবে না, আর আমিও আপনার সুখে সত্যি সুখী হতে পারবো।

সমীর কাল রাত থেকেই নতুন করে জেদ ধরেছে রেণুকে বিধবা বিয়ে করবার জন্য। সে বলছে, তোকে বিয়ে করে যদি আমি নেমন্তন্ন করে পাড়ার লোকগুলোকে খাইয়ে দিতে পারি, তাহলে আর কোন শা—কিছু বল্‌তে পারবে না, কারণ স্পষ্ট দেখলি ত, মানুষ, মানুষ! তারা তোর দেবত্বের কোন মূল্যই দেবে না। আর মানুষের মধ্যেই যখন বাস করতে হবে, তখন মানুষের হিসাবমতই বাস করা ভালো, দেবতা হয়ে অযথা নিন্দে কুড়িয়ে কোন লাভ নেই।

কাল রাত থেকে আজ দুপুর পর্য্যন্ত রেণু সমীরের এই জেদটাকে ঠেকিয়ে আসছে। সমীর বলছে, বিয়ে করলে সেই নতুন বউ এসে তোকে সন্দেহ করে অশান্তি করবে, হয়ত শেষ পর্য্যন্ত তোকে তাড়িয়ে তবে ছাড়বে। তখন?

তখন চলে যাবো। বুঝবো যে দাদাকে সংসারী করে এলুম, হাসিমুখে রেণু উত্তর দিলে।

আর নিজে, সমীর প্রশ্ন করলে।

গম্ভীরমুখে রেণু বল্লে, আপনি কি ভুলে গেছেন দাদা বৃন্দাবনে কত বৈষ্ণবী দুবেলা পেটভরে খেয়ে বেঁচে আছে। যদি কোথাও জায়গা না হয়, তাহলে সে জায়গা ত কেউ কেড়ে নেবেনা। একটু থেমে বল্লে, দাদা, ধর্ম্মের জয় সর্ব্বত্র। যদি সৎপথে চলি, তাহলে স্বয়ং ভগবানও আমাকে দুঃখ দিতে পারবেন না।

খেয়ে উঠে জলের ঘটি নিয়ে আঁচাতে গিয়ে সমীর বল্লে, যা খুসি তোমার।

উৎফুল্ল হয়ে রেণু বল্লে, তাহলে বিয়ে করবেন ত দাদা? জলের ঘটিটা রাখতে রাখতে সমীর রহস্য করে বল্লে, এ জীবনে প্রজাপতি আর প্রজাপতি হওয়ার ফুরসৎ পাবে না, তাকে শুঁয়োপোকা হয়েই থাকতে হবে।

কিরকম? কে আবার কি কথা, রেণু সপ্রশ্ন নেত্রে চেয়ে রইলো।

সমীর বল্লে, ও, তুই বুঝি জানিস্ না যে, ডিমথেকে যে জিনিষটা শুঁয়োপোকা হয়ে জন্মায়, বড় হয়ে তারই কাঁটা ঝরে নিয়ে ডানা বেরোয় এবং তারপর প্রজাপতি আকারে সে উড়তে থাকে।

যান, তা বুঝি আবার হয়? অবিশ্বাসের সুরে রেণু উত্তর দিলে।

হ্যাঁরে বোকা, তাই হয়, বল্‌তে বল্‌তে সমীর নিজের ঘরে গিয়ে পান খেয়ে সিগারেট মুখে দিয়ে খাটের ওপোর আড় হয়ে শুয়ে খবরের কাগজ পড়তে সুরু করলে।

আহারাদি শেষ করে রান্নাঘরের কাজ চুকিয়ে রেণু এসে এ ঘরে ঢুকে দেখলে সমীর তখনও জেগে আছে। দেখেই প্রশ্ন করলে, দাদা এখনও ঘুমোন নি।

না, কাগজ পড়ছি।

রেণু বল্লে, দাদা, পিসিমাকে টাকা পাঠাবার কি করলেন।

সমীর বল্লে. পাঠাই নি, ভাবছি দুদিনের ছুটি নিয়ে একবার কাশীতে যাব, গিয়ে সব দেখে শুনে যা হয় একটা ব্যবস্থা করবো।

আনন্দে রেণু বল্লে, তাই করুন দাদা, তাই করুন। আহা বুড়ো মানুষ, মনে বড় ব্যথা পেয়ে গেছেন। যিনি আপনাকে মায়ের মত মানুষ করেছেন, তিনি যদি একটা অন্যায়ই করেন, আর অন্যায়ই বা এমন কি, আমি যদি আপনার পিসিমা হতুম, তাহলে ঐরকম চিঠিপত্র

পেয়ে আমিও ঠিক ঐরকমই করতুম। তিনি ত আর বুঝতে পারেন নি যে আপনি কত মহৎ, কত উদার।

আমি মহৎ, আমি উদার? ওরে রেণু, এটা মনে রাখিস, আমি মহৎও নই, উদারও নই, শুধু তোর পাল্লায় পড়ে, তোর ছোঁয়াচ লেগে আমাকে বাধ্য হয়ে মহৎ হতে হয়েছে।

সলজ্জকণ্ঠে রেণু প্রতিবাদের সুরে বল্লে, কি যে বলেন দাদা, আপনি যদি মহৎ না হতেন তাহলে কি আর আমি থাকতে পারতুম। কোথায় ধুলোর মধ্যে মিশিয়ে যেত আমার ধর্ম্ম কর্ম্ম। আমি বলি দাদা, আপনি একবার সময় করে কাশীতে যান, সেখান থেকে পিসিমাকে এখানে নিয়ে আসুন, বিয়ে-থাওয়া করুন, সংসার করুন। আমার জন্য আপনি একটুও ভাববেন না, যা করলে আপনার সংসারে সুখ শান্তি হবে, আমি হাসিমুখে আমার দাদা-বৌদির জন্য তাই করবো।

সাধু বৎসে, সাধু, সমীর হাসিমুখে উত্তর দিয়ে খবরের কাগজটা পাশে সরিয়ে রেখে সটান লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লো। বল্লে, কটা বাজলো দেখ ত রে?

রেণু টেবিলের টানা থেকে তার হাতঘড়িটা বার করে দেখে বল্লে, দুটো বাজতে দশ মিনিট।

সমীর বল্লে, ঠিক আড়াটার সময় আমাকে ডেকে দিবি, তিনটের সময় অফিস পৌছুতে হবে।

রেণু বলে, আচ্ছা তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল।

সন্ধ্যের পর সমীর বাসায় ফিরে এসে ঘরে ঢুকতেই রেণু একটা বেগুনি রঙের মোড়া খাম এনে সমীরের হাতে দিয়ে বল্লে, দাদা, বিকেল ঘর ঝাঁট দেওয়ার সময় দেখি, এখানা জানালার ধারে পড়েছিল। বোধ হয় আপনাকেই কেউ দিয়ে গেছে, তাই মনে করে তুলে রেখেছিলুম।

সমীর সাইকেলটা ঠিকভাবে ষ্ট্যাণ্ডে রেখে জামা প্যাণ্ট না খুলেই খামটা হাতে করে নিয়ে দেখলো তার উপরে পরিষ্কার গোটা গোটা লেখা আছে শ্রীসমীর কুমার মুখোপাধ্যায়। কিন্তু কোন ঠিকানা নেই। স্পষ্ট বুঝলে, চিঠিটা কেউ হাতে করে দিয়ে গেছে, ডাকঘরের কোন ছাপ নেই। ডাকটিকিটও নেই।

মনে মনে একটু কৌতূহলী হয়ে কোনরকম দেরী না করেই সে খামটা ছিঁড়ে পড়তে বসলো, দীর্ঘ এক চারপৃষ্ঠাব্যাপী পত্র। শেষের দিকে দেখলো নাম লিখেছে তোমারই প্রতীক্ষারত গৌরী।

এক মুখ বিরক্তি নিয়ে সমীর চিঠিটা আদ্যোপান্ত পাঠ করলে। রেণু একটু অপেক্ষা করে বললে, কার চিঠি দাদা, পিসিমার না কি?

না, সংক্ষেপে উত্তর দিলে সমীর।

তবে?

এ অন্য ব্যাপার, বাড়ীর কিছু নয়।

রেণু নিজের কাজে মন দিতে অন্যত্র চলে গেল।

সমীর চিঠিখানা আর একবার সমস্তটা পড়লো। তার চোখ মুখ কেমন যেন কঠিন হয়ে উঠলো, এ চিঠির মানে কি? গৌরী কি এত নীচ, এত ছোট, এতই ক্ষুধার্ত্ত সে? মনে মনে রেণুর সঙ্গে তুলনা করে গৌরীকে সমীরের মানুষ বলে মনে করতেও আর ইচ্ছা হোল না। কিন্তু এর উত্তরে সে কি বলবে? ভাবতে ভাবতে সে তার জামা প্যাণ্ট খুলে লুঙ্গি পরলে, কাঁধের ওপোর তোয়ালে ফেল্লে এবার কলঘরে চলে গেল। হাতমুখ ধুয়ে বেরিয়ে এসে রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে সমীর বল্লে, চিঠিটা কখন পেলি রে?

রেণু বল্লে, বল্লুম ত, বিকালে ঘর ঝাঁট দেওয়ার সময় দেখি, জানালার তলায় পড়ে আছে একটু থেমে বল্লে, কেন দাদা, কি আছে ওতে, কে লিখেছে?

সমীর একবার ভাবলে, সবটা খুলে সে বলে, কিন্তু পরক্ষণেই মনের ভাব চেপে রেখে গম্ভীরভাবে বলে, ও আমার অফিসের ব্যাপার। সমীর চাইছিল, প্রসঙ্গটাকে একেবারে চাপা দিতে।

আহারাদি শেষ করে রাত্রি প্রায় ৯টার সময় সে আর একবার বসলো চিঠিখানা নিয়ে। আর একবার কে সবটাকে পড়লে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, প্রতিটি অক্ষর, প্রতিটি যুক্তি। কেবলই মনে হতে লাগলো, রেণু এক হিন্দু ব্রাহ্মণের মেয়ে, গৌরীও আর এক হিন্দু ব্রাহ্মণের মেয়ে। রেণু নিরক্ষর। বর্ত্তমান জগৎ, বর্ত্তমান সাহিত্য, বর্ত্তমান সংবাদ পত্রের সঙ্গে তার কোন যোগ নেই, সে আছে অন্ধকারে। আর গৌরী সমস্ত লাইব্রেরী

যে দু'তিনবার করে পড়ে শেষ করে ফেলেছে, সে শিক্ষিতা! একটা জায়গা পড়তে গিয়ে সমীরের ভয়ানক রাগ হয়ে গেল। গৌরী কি মনে করে সমীর চরিত্রহীন, অতএব সমীরের পক্ষে বন্ধুর স্ত্রীকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়াটা শক্ত নয়। উঃ, এতবড় শয়তানী! শেষকালে সে বলছে কি না যে, রেণু কাছে থাকলেও গৌরী আপত্তি করবে না, শুধু সদাশিবের কাছ থেকে তাকে মুক্তি দিতে হবে। সে বাঁচতে চায়, সে মানুষ হতে চায়, মনের মানুষকে সে জোর করে দখল করতে চায়। কি স্পর্দ্ধা এই স্ত্রীলোকের! ভাবতে ভাবতে সমীরের মনে হোল, এ স্ত্রীলোকটি শুধু চরিত্রহীনই নয়, এ খুন করতেও পারে!

কিন্তু এর প্রতিকার কি? ঘড়িতে দেখলে, রাত্রি তখন সাড়ে নটা। ভাবলে, এই হচ্ছে উপযুক্ত সময়। সদাকে ডেকে নিয়ে নিজের বাড়ীতে এনে চুপিসাড়ে চিঠিটা পড়িয়ে বলে দেবে সাবধান হতে, এবং তারপর চিঠিখানা পুড়িয়ে শেষ করে ফেলবে। না কি, আর কি করা যেতে পারে। এর চেয়ে যদি গৌরীকেই আলাদা ডেকে সাবধান করে দেয়! মুহূর্ত্তেই কপালের শিরাগুলো ওর ফুলে উঠলো। কক্ষনো নয়, শয়তানীকে সদুপদেশ দেওয়ার জন্য নিরালায় ওর সঙ্গে দেখা করলে ঐ গৌরীই যে কোনো রকম অঘটন ঘটিয়ে বসতে পারে। এর উপযুক্ত ওষুধ হচ্ছে সদাশিব।

রেণুর ঘরের কাজ তখনও শেষ হয় নি। সমীর রেণুকে ডেকে বললে, দরজাটা বন্ধ করে দে, আমি এখুনি আসছি বলেই চিঠিখানা খামে ভরে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লো।

সদাশিবের বাড়ীতে সমস্ত অন্ধকার, তারা বোধহয় সমস্ত কাজ কর্ম্ম চুকিয়ে শুয়েছে। রাস্তায় একটুখানি ইতস্তত করে সমীর আবার ফিরে এলো। দরজায় ঘা দিতে রেণু দরজা খুলে দিয়ে বললে, কোথায় গেছিলেন দাদা?

এমনি একটু—সমীর উত্তর দিলে।

রেণু আর কোন বাক্যব্যয় না করে ভেতরে চলেগেল কিন্তু তার মনে কেমন একটা খটকা লেগে গেল। দাদা যেন তাকে এড়িয়ে কি একটা জিনিষ গোপন করে চলেছে। যাক্, আপন দাদা ত নয়, পাতানো দাদা, অজ্ঞাতেই রেণুর দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়লো।

রাত্রি বোধ হয় দুটো কি আড়াইটে, সমীরের দরজায় টুক্ টুক্ করে শব্দ হোল। সমীরের ঘুম যে খুব সজাগ সেটা সবাই জানে; বোধহয় বিপ্লবী দলের লোকদের সকলকেই ঘুমের মধ্যেও সজাগ থাকার অভ্যাসটা করতে হয়। ঘুম ভেঙ্গে সমীর কান খাড়া করে রইলো। বাইরের দরজায় আবার শব্দ. টুক্ টুক্ টুক্।

তড়াক করে বিছানা থেকে উঠেই সমীর সুইচ্ টেনে আলো জ্বাললে। অল্প খোলা জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলে, সাদা কাপড় মোড়া কে একজন তার রোয়াকে তারই দরজায় হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

সমীর জানালা দিয়ে প্রশ্ন করলে কে? সে যেন অনেকটা আন্দাজ করে নিয়েছে।

চাপা কণ্ঠে বাইরে থেকে উত্তর এলো, দরজাটা খোল।

মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত যেন একটা বরফের টুকরো চলে যাচ্ছে সমীরের এমনই মনে হোল। কেন? সমীর প্রশ্ন করলে।

চাপা কণ্ঠে পুনরায় অনুরোধ এল, আগে দরজাটা খোলত।

যন্ত্রচালিতের মত সমীর নিঃশব্দে দরজাটা খুলে সরে দাঁড়ালো। একটা মোটা চাদরে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত অবস্থায় গৌরী ভেতরে ঢুকে এসে নিজেই দরজাটা বন্ধ করে দিলে। প্রথম প্রশ্ন হোল, রেণু কোথায়?

অস্ফুট কণ্ঠে সমীর উত্তর দিলে, ও ঘরে।

মাঝের দরজার দিকে দৃষ্টি দিয়ে গৌরী বললে, দরজা কি বন্ধ?

হ্যাঁ।

তবে কি ও দরজা বন্ধই থাকে?

হ্যাঁ, নিয়মিত ভাবে। ও যে আমার বোন, সত্যিই বোন।

বেশ ভালো। তাহলে বোসো, অনেক কথা আছে। বলেই গৌরী সামনের চেয়ারে বসে পড়লো, বললো, আলো নিভাও, দরজায় ছিটকানী দাও।

সমীর দাঁড়িয়েই রইলো। স্পষ্টস্বরে বললে, না আলো থাক, দরজাও খোলা থাক্।

তুমিত এরকম কাপুরুষ ছিলে না। গৌরী ওর মুখের দিকে মধুরভাবে দৃষ্টিপাত করে কথাগুলো উচ্চারণ করলে।

উত্তরে সমীর বললে, না, আমি কাপুরুষ নই, আমি পুরুষ এবং তুমি পরস্ত্রী, তাই আলো জ্বলবে এবং দরজাও খোলা থাকবে।

ও, তাই নাকি? আচ্ছা বেশ আমার চিঠিটা পড়েছ ত?

পড়েছি।

তার উত্তরটা নিতে এলুম।

যথাসময়ে জানিয়ে দিতুম।

আমি জানি যে, তুমি এর কোন উত্তরই সোজাসুজি হয়ত দেবে না, সেই জন্যই—

বাধা দিয়ে সমীর বললে, তাই যদি জানতে তাহলে এরকম চিঠি না লিখলেও পারতে।

কিন্তু না লিখে আমার উপায় ছিলনা। আমি ত বলেই দিয়েছি, আমি জীবনে পরিবর্ত্তন চাই।

কিন্তু আমি যে এরকম পরিবর্ত্তন চাইনা।

চাওনা?

না।

রোষকষায়িত লোচনে গৌরী বললে, তাহলে লুকিয়ে লুকিয়ে আমাকে নষ্ট করতে এসেছিলে কেন? কাঙ্গালকে ধনাগার দেখিয়ে—রাগে ফুলতে ফুলতে গৌরী তার বাক্য আর শেষ করতে পারলে না।

ধনাগার দেখানোয় কাঙ্গালেরও হাত ছিল অনেকখানি, কই রেণুকে ত এপথে আনতে পারিনি?

ওর কাছে হেরে গেছ? তাহলে তুমিও হারো?

হারিনি, শ্রদ্ধায় বশ্যতা স্বীকার করেছি।

ও, এতদূর? তা বেশ। তাহলে আমার চিঠির জবাব দিতে তোমার কোন সমস্যাতেই পড়তে হবেনা! তাহলে সেই জবাবই দাও।

জবাব এই যে তুমি পরস্ত্রী, বন্ধুপত্নী। নিজের ঘরে ফিরে যাও, আমি তোমার কোন অনিষ্টই করবো না। কেউ জানবেনা তোমার এই অন্যায় অভিসার। মন থেকে সমস্ত গ্লানি সরিয়ে ফেলে সুখী হও।

একরাশ কলঙ্ক নিয়ে স্বামীর কাছে সন্দেহভাজন হয়ে তারই সংসার করতে হবে?

ও সন্দেহ আস্তে আস্তে কেটে যাবে।

জানি, 'আজিকার দুঃখসুখকে স্মরিবে কাল, শতবর্ষ পরে' কিন্তু সমস্যাটা আমার আজকের, শতবর্ষ পরের নয়।

তা আমি কি করতে পারি?

আমাকে অপমৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারো।

অপমৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানো নয়, বেশী করে অপমৃত্যু ঘটানো। সেটা আমি চাইনা।

গৌরীর দুটো চোখে জল টল টল করছে। বললে, তোমার কি দয়ামায়া বলে কিছু নেই?

আছে এবং আছে বলেই তোমাকে শেষ করতে চাই না, পারবো না।

আমি শেষ হব, শেষ হতেই চলেছি, পারো যদি, বন্ধু যদি হও, তাহলে আমাকে রক্ষা কর।

চল, তোমাকে সদার কাছে নিয়ে যাই।

সে ঘুমুচ্ছে, অঘোরে ঘুমুচ্ছে।

এঁ্যা, সমীর চমকে উঠলো, তার মানে—তবে কি—

মধুর হাসি হেসে গৌরী বললে, ভয় নেই, পতিঘাতী নই। রাত্রে সে বললে, শরীরটা খারাপ লাগছে, সেই অজুহাতে আমার ঘুমের ওষুধ থেকে দু'ডোজ ব্রোমাইড মিকশ্চার তাকে একসঙ্গে খাইয়ে দিয়েছি।

মেঝের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে সমীর বললে, কিন্তু রেণু'ত ব্রোমাইড খায়নি—

ও মড়ার মত ঘুমোয় আমি জানি, আর যদিই এখন তোমার কাছে এসে ওর ঘুম পাৎলা হয়ে থাকে, তাহলেও ও ত বোন, ওর চটবার কি আছে?

অন্যায় সহ্য করতে ও পারেনা, হয়ত চেঁচিয়ে উঠবে।

ভালই হবে, লোকে জানবে, আমি তোমার ঘরে নিয়মিত ভাবে আসি, স্বামী আমায় তাড়িয়ে দেবে, তখন কি তুমি আমায় ফেলতে পারবে?

তবে স্বামীকে ব্রোমাইড খাইয়েছ কেন?

ভুল হয়েছে। কিন্তু ভুলই বা কেন, জেগে থাকলে কি এতদূর এসে পৌঁছাতে পারতুম?

না পারলেই ছিল ভালো।

তাত বলবেই। বড়শীতে ন্যাটা মাছ গাঁথতে বড় সুখ হয়, কিন্তু তোমার ছিপে টোপ খেয়েছে হাঙ্গরে। হয় তুমি তাকে বধ কর, নইলে সে তোমায় বধ করবে।

ভয় দেখিয়ে কাজ হাসিল করতে চাও ?

মোটেই নয়। ভয় বলে কোনো বস্তু যে ভগবান তোমায় দেননি তা আমি জানি এবং জানি বলেই ত মরেছি। এখন বল তোমার বক্তব্য।

বহু পূর্ব্বেই বলে দিয়েছি, তুমি পরস্ত্রী, বন্ধুপত্নী।

সেই বন্ধু যদি পত্নীকে তাড়িয়ে দেয়, তাহলে কি পথে পড়ে-থাকা বেওয়ারিশ মাল তুমি কুড়িয়ে নিতে রাজী আছ ?

পথে পড়ে থাকা বেওয়ারিশ মাল রাজার প্রাপ্য। কুড়ানো মাল নিয়ে সমীর তার বাক্স ভর্ত্তি করেনা।

গৌরীর চোখ দিয়ে আগুন বেরিয়ে এল। কিন্তু ভাষায় আগুনের কণাটুকুও প্রকাশ পেলে না। মুখে-বললে, বাক্সোয় না রাখলেও পাপোষ করে পায়ের তলায় ফেলে রাখবে কি ?

না, স্পষ্টভাবে সমীর উত্তর দিলে।

এতদূর ? আচ্ছা। গৌরী উঠে দাঁড়ালো। দরজাটা খুলে চৌকাঠের বাইরে একটা পা দিয়ে আর একবার এদিকে ফিরে বললে, এত স্পর্দ্ধা থাকবে না। একদিন এই আমার কাছেই তোমাকে ক্ষমা চাইতে হবে, কারণ আমি যে তোমায় ভালোবাসি।

সমীরের মুখের ডগায় অনেক রকম উত্তরই এলো। একবার মনে হোল বলে, এখনই ক্ষমা চাইছি, আবার মনে হোল, বলে, যখন চাইবার হবে তখনই চাইবো, কিন্তু কোন কিছু বলবার পূর্ব্বেই ঐ উন্মাদ অভিসারিকা নিস্তব্ধ রাজপথ অতিক্রম করে নিজের বাসার দিকে দ্রুতপদে চলে গেল। এর সাক্ষী আর কেউই রইল না, মাত্র একটা পেঁচা তার কর্কশকণ্ঠে আকাশটাকে ফেরফার চিরে দিয়ে সদাশিবের বাড়ীর ওপোর দিয়ে উড়ে এধারে সমীরের বাড়ীর ওপোর দিয়ে চলে গেল। সমীরের সমস্ত শরীর ভয়ে কণ্টকিত হয়ে উঠলো। সে তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে আলো নিভিয়ে যেন বিছানার মধ্যে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচালো।

বাকী রাতটুকু সমীর আর চোখ বুজতে পারলেনা। কতরকম এলোমেলো চিন্তা, কি যেন একটা অব্যক্ত আতঙ্ক, ভবিষ্যতের কতরকম ভয়াবহ কল্পনা, সমস্ত মনটা একেবারে এলোমেলো হয়ে গেল। সূর্য্যের আলো চোখে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সমীরের মনে হোল যেন সে সারারাত ধরে একটা ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিল। বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গেই তার মাথাটা টলে গেল। একবার জেলখানার মধ্যে আইন ভঙ্গ করার অপরাধে তাকে দশঘা বেত লাগিয়েছিল। বেত খাওয়ার পরই সে ঘুমিয়ে পড়েছিল, সেই নিদ্রাভঙ্গের পরেও এই-ভাবে তার মাথা টলেছিল এবং সর্ব্বাঙ্গে নিদারুণ ব্যথা সে অনুভব করেছিল। আজ এতকাল পরে এই সকালে সমীর পুনরায় সেই অনুভূতিই ভোগ করলে, গৌরী যেন তার সর্ব্বাঙ্গে বেত্রাঘাত করে গেছে।

ঘরের দরজা না খুলেই সমীর তার বালিশের তলা থেকে চিঠিখানা বার করলে, এবং দেশলাইটা জ্বেলে সেই আগুনে চিঠিখানার একটা কোণ লাগিয়ে দিতে গিয়ে আবার যেন কি ভেবে জলন্ত কাঠিটা ফেলে দিলে। একমিনিট পরেই আবার দেশলাই জ্বাললে, কিন্তু সেটাও পূর্ব্বের মত নিবিয়ে দিয়ে চিঠিখানা হাতে নিয়ে উঠে নিজের বড় সুটকেশটা খুলে তার সব তলায় যেখানে সে টাকার খাম রাখে সেইখানে চিঠিখানা গুঁজে রেখে বাক্সটা বন্ধ করে উঠে পড়লো। তারপর ঘরের দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে গেল। প্রাতঃকৃত্য শেষ করে নিজের ঘরে ঢুকে সে আবার সন্তর্পণে সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করে চিঠিখানা বার করে আর একটা দেশলাই জ্বলছে এমন সময় রেণু এসে দরজায় ঘা দিয়ে বললে, দাদা, চা এনেছি। এখন দরজা বন্ধ করলেন কেন ?

যাচ্ছি, যেতে দেরী হবে। ভেতর থেকে কথাগুলো বলেই খুব তাড়াতাড়ি চিঠিটাতে সমীর অগ্নিসংযোগ করলে। তার রাত্রের জলখাওয়ার গেলাসে খানিকটা জল ছিল। সেই গেলাসের ওপোর সে সেই জলন্ত চিঠিটাকে ধরলে। চিঠিটা নিঃশেষে পুড়ে তার ছাই-গুলো সমস্তই ঐ জলের গেলাসের ভেতর পড়লো। কুঁজো থেকে আরও একটু জল ঢেলে গেলাসের সমস্ত জলটা ভালোকরে গুলিয়ে নিয়ে সে বাইরের দরজা খুলে ঐ ছাই-গোলা জলটা বাইরের মাঠে ফেলে দিয়ে ঘরে এসে আরও একটু জল নিয়ে গেলাসটা ধুয়ে আর একবার বাইরে গিয়ে জল ফেলে দিয়ে ভেতরে এসে বাড়ীর দিকের দরজা খুললে। যেন কিছুই হয় নি, এমন ধারা একটা

দাম্ভভাব মুখে এনে সমীর ডাক দিলে, কই রে রেণু, চা নিয়ে আয়।

রেণু চা ও খাবার এনে টেবিলের ওপোর রেখে চুপ করে দাঁড়িয়ে র'লো। সমীর খাবার খেতে খেতে বল্লে, কি রে অমন করে দাঁড়িয়ে আছিস্ যে, কিছু বল্‌বি না কি?

মাথা হেঁট করে রেণু বললে, না। একটু থেমে বললে, যদি আপনার মনে কোন কষ্ট দিয়ে থাকি, তাহলে ক্ষমা করবেন দাদা।

কেন, একথা কেন? হঠাৎ আজ সকালে এ কথা বল্‌ছিস্ কেন রে?

এম্‌নি বল্লুম। ছোট মুখে বড় কথা অনেক ত বলি, তা সে সবগুলো ছোট বোন বলে নিজগুণে মার্জ্জনা করে নিতে পারবেন না?

কেকটা গলাধঃকরণ করে চা দিয়ে গলাটা ভিজিয়ে নিয়ে সমীর বললে, ব্যাপার কি বল্‌ত? আমি ত তোকে কিছু এমন বলি নি যে এ কথা উঠ্‌তে পারে!

রেণু ঘরে থেকে বেরিয়ে গেল। একটু পরে ঘরে এসে দেখে সমীরের প্রাতঃরাশ শেষ হয়ে গেছে, সে বেরোবার উদ্যোগ করছে। উচ্ছিষ্ট পাত্রগুলো তুল্‌তে তুল্‌তে রেণু বললে, আপনার কি হয়েছে দাদা? কাল রাত্রে খাওয়ার পর বেরিয়ে গেলেন, আজ সকালে মুখ ধোয়ার পর দরজা বন্ধ করলেন, আপনার চোখ দুটো অমন লাল হয়ে রয়েছে, অপনার কি কোন—

কিছু হয় নি রে, কিছু হয় নি, একটু ব্যস্ত আছি। বলে বিনা ভনিতায় রেণুর পিঠে একটা ফুলো চড় মেরে সমীর বললে, ও সব নিয়ে তুই মাথা ঘামাস্ নি, তুই আমার যে-বোন সেই-বোনই আছিস্, তোর কোন ভয় নেই।

রেণুর মন থেকে একটা গুরুভার নেমে গেল।

[ক্রমশঃ

১৭০০ খ্রীষ্টাব্দের বাঙলা সম্বন্ধে ফাঁসোয়া মার্তাঁ।

৺ মার্তাঁ লিখেছেন—সুবৃহৎ বাঙলা অঞ্চলে এমন উৎকৃষ্ট পণ্য আছে যা ইউরোপ ও এশিয়ার অন্যান্য অংশে রপ্তানী হয়। এখানে জীবন ধরণের উপযোগী খাদ্যদ্রব্যের প্রাচুর্য্য আছে এবং তা থেকে যথেষ্ট পরিমাণ খাজনা ওঠে। তা সত্বেও লোকেরা এখানে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করে। মুদ্রার বিরলতা চোখে পড়বার মত। এই দুষ্প্রাপ্যতার কারণ হিসাবে বলা হয় যে মোগলদরবারের বহু প্রধান অভিজাত তাঁদের রাজত্বের অন্য অংশে সৈন্য মজুত রাখবার জন্য ঐখানকার রাজস্বের একটা বড় অংশ ব্যয় করতে বাধ্য হন।

একথা বর্তমান কালেও কতখানি অপরিবর্ত্তিত রয়েছে, তা অবশ্যই ভাববার বিষয়। অনিরুদ্ধ রায়

খ্রীষ্টপূর্ব ৩২০ সাল আন্দাজ চালের দর কত ছিল?

ত্রৈমাসিক পত্রিকা স্থাউহাকের (মাঘ চৈত্র ১৩৭৫) সংখ্যায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন দত্তের গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে উপরোক্ত বিষয়ে।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, শুক্রনীতিসার প্রভৃতি আলোচনার দ্বারা লেখক প্রমাণ করেছেন যে টাকায় তখন ২৬মণ চাল পাওয়া যেত।

অর্থাৎ তখনকার একটাকার মালিক এখনকার দু হাজার আশী টাকার মালিকের সমান।

একে কালানুপাত বললে বোধ হয় ভুল হবে না। মিতালি চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা—৬

ভারতের জাতীয় পতাকা ও ম্যাডাম ভিকাজী কামা

এনাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় আছে বেৌমী রস নামে এক মহিলা অ্যামেরিকার জাতীয় পতাকার প্রাথমিক রূপটি দেন। ভারতের জাতীয় পতাকারও প্রাথমিক রূপ দেন এক মহিলা দেশপ্রাণী ম্যাডাম ভিকাজী কামা। ১৮৬১ সালে ম্যাডেম কামার জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম ৺ মোরারজী ফ্র্যামজী প্যাটেল। তিনি ১৯০১ সালে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য লণ্ডন যান। কয়মাস পরে সেখান থেকে তিনি প্যারিসে যান। প্যারিসে তিনি দীর্ঘকাল বাস করেন ও বিদেশে ভারতের স্বাধীনতার আন্দোলন পরিচালনা করেন। তিনি বীর সাভারকর, শ্যামজী কৃষ্ণ বর্মা, মুকুন্দ দেশাই, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি দেশত্যাগী বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

১৯০৭ সালে জার্মানিতে যে সোসিয়েলিষ্ট কংগ্রেস হয় তাতে ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলিত করেন।

নিশ্চয়ই ইহা ভারতের এক মহীয়সী নারীর সুমহান গৌরবময় কৃতিত্ব।

অমিত ঘোষ, কলিকাতা—২৬

গল্প সাহিত্যে ভারত

সম্প্রতি অ্যামেরিকার কেনিয়ন রিভিও পত্রিকায় নানা দেশের গল্প সাহিত্য সম্পর্কে তদ্দেশের গল্প লেখকগণ আলোচনা করেছেন।

ভারতের গল্প সাহিত্য সম্বন্ধেও শ্রীগণক্য সেন রচিত একটি সুন্দর নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। অনেক অজানা তথ্য প্রকাশিত হয়েছে এ নিবন্ধে। বিশেষ করে ভারতের লেখকেরা যে চিরকাল দারিদ্র্য পীড়নের নিপীড়িত এ সত্যটি সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। কিন্তু বাঙলা দেশের গল্প সাহিত্য সমগ্র ভারতের মানুষকে কিভাবে প্রভাবিত করেছে তার উল্লেখ তিনি করেন নি। বঙ্কিম চন্দ্রের 'আনন্দ মঠ' যে এককালে আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষকে প্রবুদ্ধ করেছিল একথাটা তিনি বেমালুম বাদ দিয়ে গিয়েছেন।

বিদেশের সাহিত্য আলোচনায় আসরে, দেশের মহান্ সাহিত্যের প্রতি এমন অবহেলা সত্য সত্যই মর্মান্তিক ব্যাপার।

ত্র্যম্বক সেন, বীরভূম

যক্ষিণী তুমি হেসো না

মঞ্জরী উকিল

যক্ষিণী, তুমি ঐ হাসি আর হেসোনা
আজকে ছড়ানো ঘাসের আস্তরণে—
কাগজের ঠোঙা, চিনা বাদামের খোসা—

চারিদিক ঘুরে সর্পিল কালো পথ
অজগরমুখী গাড়িরা ক্রুদ্ধ ছুটছে
ছিটকে ফেলেছ কাল-চক্রের বৃত্তে
চাকরী হলনা, পত্র নাকচ পকেটে কয়েক পয়সা
নীল তারাময় মৃদু রহস্যে কাছে দূরে তুমি হাসছ।

সামনে বিশাল পান্থশালার দ্বারদেশে আছে চৈত্য
অন্তরে নেই নির্বাণ, আছে বাসনার দাহ দীপ্তি

সম্মুখ ভাবে বিশাল-ফাঁকায় নেই কোনও জল্পনা
বিস্তৃত শুধু সাদা দেওয়ালে অকথিত জিজ্ঞাসা!

দূর-যৌবনে কোন ইতিহাসে সেই হাসি তুমি হাসলে
পাগল করলে, মাতাল করলে, ধরায় রইলে অধরা
কখন চাঁপার আঙুলি-ফাঁদে পদ্মকলিকে বাঁধলে
কখনও হাঁটলে রসনা দুলিয়ে হৃদয়-পদ্ম মাড়িয়ে
অশোক-কাননে দোহদ করলে, বকুলে ছিটোলে মদিরা
কোমল-কদলী উরুতে তোমার চীন-অংশুক দুলদে,
দরদ জোগাল স্বর্ণ-কেয়ূর দূর দক্ষিণ মুক্তা
যবন-বণিক পালকীতে পুরে রোমক আসব পিয়াল।

স্বপ্ন দেখেছি ঘোর অরণ্যে সার্থ-বাহী যে যাত্রী
গভীর রাত্রি পার করে তারা তোমার পূজাই করল,
অনাবৃষ্টির দুর্বৎসরে সেই সব কৃষকেরা
ফসল পাবার আশায় তোমাকে বৃক্ষকা-রূপে স্মরে

পুণ্য স্থানের প্রহরী-রূপিণী বন্দিতা সেথা তুমি
সহকার শাখা অবহেলে ধর, অতি আভঙ্গ ভরে
মেখলা তোমার নিপিষ্ট হয় পুষ্পিত-যৌবনে
পত্র পুষ্প ফল ও কোরকে সাজানো কল্পতরু

ও দেহ তোমার মৃত্তিকা ভেদি' উঠেছে স্বর্গ পানে
পাতালে গোপন রস সঞ্চয় শিরে তারকার মালা
শেষ-অগ্নির নীল শিখা তুমি নীল বারুণীর জ্বালা

আমার জীবনে জাগিয়ে তুললে এ কী দাহ আর দীপ্তে
হেসোনা, হেসোনা বলে দাও আজ কবে হবে এর তৃপ্তি?

বন্দরের বন্ধন

অরুণকুমার দত্ত

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

চার

সেদিন বারবিকিউয়ে সভা জাঁকিয়ে বসেছিলেন চক্কোত্তি মশায়। কোণের গোটা টেবিলটাই তাঁর দলের লোকেরা দখল করেছিল। জন পাঁচ ছয়ত হবেই।

শঙ্কর কাজ শেষ করে লাঞ্চ খেতে আসতেই চক্কোত্তি মশাই গুরুগম্ভীর গলায় বলে উঠলেন—আমাদের দলে আর একজন বাড়ল। তারপর শঙ্করের সঙ্গে অন্যসকলের পরিচয় করিয়ে দিলেন।

বুঝলেন মিত্তির, আমি হলাম, এডিনবরার পুরোনো ঘুঘু। এখানে অনেক বছর ধরে আছি। খুব হুঁশিয়ার হয়ে এদেশে থাকবেন। একমনে পড়াশুনো করে পাশটি করেই ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাবেন। চারদিকে চাকা ঘুরছে। ভুলে একবার পা দিয়েছ কি মরেছ। পা আটকে গেলেই গেল। আর দেশে ফিরতে পারবে না। বনবন করে চাক্রের ফেরে ঘুরতে হবে। গোরখপুরের এক শান্ত ছেলে উপাধ্যায় মাইনিং পড়তে এডিনবরায় এসেছিল। লম্বা চেহারা, রংটা ফরসার দিকে। সে মজলিসের এককোণে বসেছিল। মাস ছয়েক হলো এসেছে। কিন্তু এখনও এদেশে মন বসাতে পারেনি।

প্লেট করে সকলকে 'ভিল' দিয়ে গেল ওয়েট্রেস। চক্কোত্তি মশায়ের ফরমাস মত।

উপাধ্যায় চমকে উঠে ফিস্‌ফসিয়ে বলল—ইয়ে ক্যা বীফ্ হ্যায় চকরবরতি জি।

—আরে বাবা খেয়ে নাও। বিদেশে কোন নিয়ম নেই। কালুবাবুরা যখন এদেশে প্রথম আসে, তখন এটা খাবনা, এটা করবনা ওসব অনেক কিছু বলে থাকে। যখন ফিরে যায় তখন আর তাদের চেনা যায়না।

শঙ্কর এডিনবরায় এসে এতদিনে একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছিল এখানকার ভারতীয় ছাত্র সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিকাংশই ডাক্তার। আর অজান্তে তাদের মধ্যে একটা গ্রুপিং হয়ে গেছে।

অচিকিৎসক ছাত্রদের মনে একটা ধারণা বদ্ধমূল রয়েছে যে ডাক্তাররা নিজেদের খুব বড় মনে করে। চক্কোত্তি মশায়ের আড্ডায় তাদের দুজনকে ছেড়ে দিলে আর কোন ডাক্তার ছিলনা।

এই রকম আবহাওয়া শঙ্করের খুব খারাপ লাগছিল।

কিছুক্ষণ পরে বারবিকিউয়ে শরৎ চৌধুরীর সঙ্গে আর একজন ভদ্রলোক ঢুকলেন। শঙ্করের সঙ্গে পরে সে ভদ্রলোকের একদিন আলাপ হয়েছিল। তার নাম প্রেমমঙ্গল সিং। রাজস্থানে আদিনিবাস। পরে বিহারে সেটল করে। এফ, আর, সি, এস পড়তে এসেছেন।

তারা কিন্তু চক্কোত্তি মশায়ের দঙ্গলকে উপেক্ষা করে অন্যদিকে চলে গিয়ে কফি খেতে বসল।

ঢাকার নজরুল ইসলাম কেমিক্যাল ইনজিনীয়ারিং পড়তে এসেছিল। বাংলাভাষী এডিনবরায় বেশী ছিলনা তাই সেও চক্কোত্তি মশায়ের আড্ডায় ভীড়ে গিয়েছিল।

সে ইতিমধ্যে মুখ তুলে বলল, দাদা আসছে শনিবার ব্রিটিশ কাউনসিলের হলে একটা ককটেল পার্টি আছে এডিনবরায় নতুন বিদেশী অতিথিদের অভ্যর্থনা করার জন্যে। আপনাদের সকলেরই আসা চাই।

লাঞ্চের পরে শঙ্কর গিয়ে ঢুকল বারবিকিউয়ের পাশের এক মেডিক্যাল লাইব্রেরীতে। নাম 'ডোনাল্ড ফেরিয়াস লাইব্রেরী'।

এখানে বসে বিনাপয়সায় ডাক্তারি বই ও জার-

নাল পড়া যায়। মাটির নীচে বেসমেণ্টে রিডিং-রুম। ম্যাকিনটশটা খুলে সেখানে বসল।

সামনে আরও দু চারজন ইতস্ততঃ ছড়িয়ে বসেছিল। উজ্জ্বল ইলেকট্রিকের আলোয় চারদিক আলোকিত।

শঙ্করের লাইনের একেবারে শেষপ্রান্তে একজন বসেছিল। চেনা চেনা লাগল। তার মনে হল এ যেন তাদের মেডিক্যাল কলেজেই পড়ত। কয়েক বছরের সিনিয়ার ডাঃ হেমেন বড়ুয়া।

সাহস করে কাছে গিয়ে ডাকল। ঠিক তাই। হেমন বড়ুয়ার বাড়ী গৌহাটি। সে অসমীয়া হলেও তরতর করে বাংলা বলতে পারে। বই বন্ধ করে সে বলল—বাইরে চলুন কথা হবে।

তার সঙ্গে শানাই-পোদ্দার বলে একজন কলকাতার ছেলে বসেছিল। সেও ডাঃ বড়ুয়ার সঙ্গে উঠে এল।

তারা উঠে ফের বারবিকিউয়ে এল। তিনকাপ কফির অর্ডার দিল শঙ্কর।

—দাদা কি করতে এসেছেন? শানাইবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

এম, আর, সি, পি,। শঙ্কর ঢোক গিলে জবাব দিল!

আরে পালিয়ে যান। পালিয়ে যান। আমি আজ দুবছর ধরে এডিনবরায় বসে বসে পড়ছি। বার তিনেক এম, আর, সি, পি পরীক্ষা দিলাম। কোন লাভ নেই। এত পরিশ্রম, এত অধ্যবসায় সবই বিফলে গেল।

জাহাজ ভরে ভরে এত ডাক্তার আসছে দেশ থেকে। কি করবে এরা? আরে পরেশদাকে জানি কলকাতা থেকে এম, এস পাশ করে এলেন। ফাইনাল এফ, আর, সি, এস, করতে না পেরে হায় হায় করে কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে দেশে ফিরে গেলেন। আর কি অন্ধকার জায়গাটা। বছরের দশমাসত ঠাণ্ডা। ফগ আর স্নো। শীতকালে যখন সূর্য্য উঠবে, তখন মনে হবে আমাদের দেশের পূর্ণিমার চাঁদ, এর চেয়ে অনেক উজ্জ্বল। দু'পা বাইরে বেরোন দেখবেন ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। আর খাওয়ার মধ্যে খালি ফিস এণ্ড চীপস। যত সব অখাদ্য,, সস্তার খাওয়া ল্যাণ্ডলেডিরা দেবে। এদেশে মানুষে থাকে!

শঙ্কর রীতিমত নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছিল এইভাবে এই পরিবেশে থেকে তাকে পড়াশুনা করতে হবে বলে।

সে প্রসঙ্গটা পাল্টাবার জন্য ধরা গলায় বলল—আপনারা আছেন কোথায়?

—মিসেস ফক্সেল গোলে। যত সব চোখা জায়গা—শানাই বাবু বললেন।

—সে আবার কি?

আরে এই সামনেই লরিষ্টোন পার্কে মিসেস ফক্সের বাড়ী। সব ইন ডিয়ান, পাকিস্তানী টেনাণ্টস ভর্ত্তি। ওসব ল্যাণ্ডলেডর ঘড়ি ধরে খাওয়া আমাদের আর পোষায়না। সেজন্যে খালি ঘরের ভাড়া হপ্তায় দু'পাউণ্ড দিই। নিজেরাই পালাকরে রাঁধি। প্লেট ধুয়ে রাখি। যখন খুসি খাই। একদিন রাঁধলে এই ঠাণ্ডার দেশে তিনদিন চলে-যায়। এতক্ষণে হেমন বড়ুয়া কথা বললেন।

কি রান্না করেন?

কেন? এই ভাত আর টিনড্ ফুড থেকে, ভেজিটেবল কারি বা মিটকারি গরম করে নিই। এক ঘণ্টার মধ্যেই সব হয়ে যায়। মধ্যে মধ্যে ব্রেডও দোকান থেকে কিনে নিয়ে আসি। ডিম আর দুধ ত বাড়ীতেই দিয়ে যায়। ডাঃ বড়ুয়াই বলতে থাকেন।

শঙ্কর মনে মনে ভাবে তাহলে এত সস্তাতেও বিলেতে থাকা যায়। তার মনে পড়ল তার এক দূর সম্পর্কীয় কাকা গ্লাসগো থেকে ইনজিনীয়ারিং পাশ করে এসে বলেছিলেন—আমাদের দেশে যেসব দেশী সাহেবদের বড় বড় পোষ্ট অধিকার করে, স্রাগ করে ইংরাজীতে কথা বলতে দেখ, তারাও বিলেতে থাকবার সময় ওইভাবে নিজেদের হাতে রান্না করতেন, প্লেট ধুতেন। বিলেতে পয়সা ফেললেও লোক পাওয়া যায়না। নিজের গাড়ী নিজেকেই ড্রাইভার করতে হয় সকলকে। সোফেয়ার পাওয়া যায়না বিলেতে।

রাতে বাড়ী ফিরে শঙ্কর আর ঘুমাতে পারল না। বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করে ছটফট করতে লাগল।

ডাঃ গ্রেভাল চলে গেছে। ঘরে সে একা। তার বড় নিঃসঙ্গ, অসহায় মন হতে লাগল। বাইরে আকাশটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। কার্টন

হিলের চিরসবুজ পাইন, পপলার আর সিলভার-বার্চ গাছগুলো থেকে সরসর করে হাওয়ার শব্দ ভেসে আসছে। তার মনে হল রাত্রি যেন ডাকছে, তার নিজস্ব ভাষায়, বোবাকান্নায়। চারিদিকে নিরুৎসাহের বাণী শুনে শুনে, আর চারপাশের ছেলেদের চোখের নিষ্প্রভ দৃষ্টি দেখে শঙ্করও কেমন যেন নিস্তেজ হয়ে গেছে।

যে আশা উৎসাহ নিয়ে সে এডিনবরায় ছুটে এসেছিল সেটায় যেন কেমন ভাটা পড়ে গেছে। রাতের কান্নার সঙ্গে তার অন্তরের আর্তনাদ যেন এক হয়ে মিশে গেছে। শঙ্কর ভাবল বাড়ী ফিরে যাবে। বাড়ীর জন্য বড় মন কেমন করতে লাগল।

হুগলীজেলার ইটাচুনা গ্রাম পুকুরের পাশে একসার কলাগাছ। বাঁশের ঝাড়। নারকোল গাছ হেলে পড়েছে। পুকুরের জল তার ছায়াটা ভেঙ্গে ভেঙ্গে যাচ্ছে। হরা পাগলার ওঁয়া ওঁয়া চীৎকার এক প্রান্ত থেকে ভেসে আসছে। নতুন কলেজ বিল্ডিংটার মাথা দূর থেকে দেখা যাচ্ছে। কালো কালো একসার মুখ। ক্ষীণ তাদের স্বাস্থ্য। কিন্তু সেখানে কত সুখী ছিল শঙ্কর। তার গাল-ভরা হাসি ছিল। পায়ে পায়ে ম্যানার্স আর কালচারের নিষেধাজ্ঞা নিয়ে ঠোক্কর খেতে হতনা।

এমন সময় উপ্‌স্ হেল্প মি…বলে একটা অস্ফুট আর্তনাদ শুনে শঙ্কর চমকে উঠল। তার স্বপ্নের জাল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। মনে হল দরজার বাইরের করিডোরে যেন কেউ সিঁড়ি থেকে পা পিছলে পড়ে গেছে।

তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এসে করিডোরের আলোটা জ্বালে। ফিউজড্ বাল্ব জ্বলে না। আলো-আধারির অস্পষ্টতার মধ্যে সে দেখে কে একজন মেয়েছেলে সিঁড়ির মুখে পড়ে আছে। কাছে গিয়ে দেখে শার্লি ম্যাকডোনাল্ড।

কি হল! কি ব্যাপার?

—পা পিছলে পড়ে গেছি সিঁড়ি থেকে। উঠতে পাচ্ছি না।

শঙ্কর তাকে তুলে ধরে কিন্তু শার্লি নেতিয়ে শঙ্করের কোলে পড়ে যায়। শঙ্করের সারা দেহে যেন হাজার ভোল্টের ইলেক্‌ট্রিকের শিহরণ বয়ে যায়।

…ইটাচুনা গ্রামের স্কুলের হেডপণ্ডিতের ছেলে শঙ্কর। সারা জীবন তাকে সংযম আর সামাজিক অনুশাসনের দাগ দেওয়া লাইনের ভেতর দিয়ে চলতে হয়েছে। ভোরে উঠে সূর্য্য দেখে 'প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্' শ্লোক আওড়াতে হত। তারপর ভাই-বোন মিলে পড়তে বসা। দুপুরে স্কুল। সেখান থেকে ফিরে খেলার মাঠ। তারপর ঘড়িধরে বাড়ী ফিরে বই খুলে বসা, ঘরে সন্ধ্যার শাঁখের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে। কলকাতার মেডিক্যাল কলেজ ছাড়া কো-এডুকেশনের কোন সুযোগই হয়নি। সে সুযোগেরও কোন সুবিধে ছিলনা।

—আমাকে তুলে ঘরে নিয়ে চল। বাঁ পায়ের গোড়ালিটা মুচকে গেছে।

একমুহূর্ত্তে শঙ্কর পুরুষ হয়ে যায়। তার ডাক্তারি সত্ত্ব ফিরে আসে। সে শার্লিকে পাঁজা-কোলা করে তুলে নিজের ঘরে নিয়ে এসে বিছানায় শুইয়ে দেয়।

পা-টা পরীক্ষা করে শঙ্কর বুঝতে পারে আঘাত মোটেই গুরুতর নয়। ফ্র্যাকচার ত হয়ইনি একটু মুচকে গেছে বড়জোর।

হঠাৎ শঙ্কর লক্ষ্যকরে শার্লি তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

শঙ্কর ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাতেই মুচাক হেসে শার্লি বলে ডাঃ মিত্র। তুমি বড় নাইভ (naive)। যাকে বলে স্কোয়ার। এজ এ ডকটর না হলেও এজ এ ম্যান।

তার মানে?

কাল সন্ধ্যে পাঁচটার সময় নর্থ ব্রিটিশ হোটেলের নীচে অপেক্ষা ক'র। আমি বুঝিয়ে দেব। বলেই তড়াক করে বিছানা থেকে লাফিয়ে নীচে নেমে গুড নাইট বলে সে বেরিয়ে যায়।

একটু পরেই টক্‌টক্ শব্দ হতেই শঙ্কর দরজা খুলে দেয়।

হাসিমুখে হেম দত্ত ঘরে ঢোকে। সে শঙ্করের রুমের বিপরীত দিকে থাকে। তার বাড়ী হাফ-লংয়ে। সোস্যাল সায়েন্সে এম, এ পড়তে এসেছে।

কি ব্যাপার মিত্র। ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলায় সে বলল। সিন্থিং সিঙ্গিং ড্রিঙ্কং ওয়াটার। যাকে ইংরাজীতে বলে ডার্ক হর্স। বলেই ধপ করে শঙ্করের খাটে বসে পড়ে।

কেন। কি হল?

কি আবার হবে? এতক্ষণ ধরে তোমার ঘরে মেমসাহেবের কণ্ঠস্বর শুনছিলাম। ঘর থেকে বেরিয়ে গেল তাও দেখলাম।

শঙ্কর তখন ভেঙ্গে ভেঙ্গে সব ঘটনাটা খুলে বলল।

সব শুনে হেম দত্ত বলে—মিত্র, তুমি এমন একটা সুযোগ পেয়েও ছেড়ে দিলে। আরে আমি এতদিন ধরে ওয়েট করছি কিন্তু এপর্য্যন্ত একটাও চান্স পেলাম না।

কেন, চান্স নেওয়ার কি আছে এতে?

তখন গম্ভীর হয়ে যায় হেম।

মিত্র, তুমি কিছুই বুঝলেনা। শার্লি যে পড়ে-গিয়েছিল সেটা একটা-ছুতো। আসলে তোমাকে ওর ভাল লেগেছে। তোমাকে কাল যে নর্থ-ব্রিটিশ হোটেলের নীচে ওয়েট করতে বলেছে, তাকে বলে ডেটিং। এভাবে এদেশের মেয়েরা স্বামী পাকড়াও করে।

শঙ্কর, তুমি খুব ভালমানুষ, সেজন্যই বোধহয় শার্লির তোমাকে ভাল লেগেছে। আমি দেখেছি ও একটু আলাদা ধরনের মেয়ে। সকলের সঙ্গে যেচে আলাপ করে না।

শঙ্কর ভয় পেয়ে গিয়ে বলে, না না আমি ওসবের মধ্যে নেই। আমাকে মা গীতা ছুঁইয়ে শপথ করিয়ে নিয়েছেন পাশ করে সোজা দেশে ফিরে যাব। ডাইনে, বাঁয়ে আর কিছু দেখব না। মদ খাবনা। বীফ স্পর্শ করবনা।

তা হয়না শঙ্কর। এদেশে মেয়েরা কখনও যেচে নিজে থেকে ডেট্ করেনা। শার্লি এতদূর যখন করেছে তখন তোমাকে যেতেই হবে। তারপর যা হবে আমি আছি। আর গার্লফ্রেণ্ড নিয়ে ঘুরলেই যে তাকে বিয়ে করতে হবে তার কোন মানে নেই।

সে রাত্তিরে আর শঙ্করের সাপার খাওয়া হলনা। [ক্রমশঃ

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

নিউইয়র্ক

নিউইয়র্কের বিমান ধরাতে পঞ্জার সাহেব কোম্পানীর গাড়ীতে বষ্টন বিমান বন্দরে পৌছে দিয়ে গেল। সঙ্গে ছিল শ্রীমান্ ভুঁইয়া। তারপর বিমান বন্দরে এসে যোগ দিল শ্রীমান আগরওয়ালা। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর আমি যখন বিমানে উঠতে যাব গভীর করমর্দন করল পঞ্জার সাহেব। আর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম জানালো শ্রীমান্ আগরওয়ালা ও ভুঁইয়া। তাদের আমি স্নেহালিঙ্গন দিলাম। অপেক্ষমাণ বিমান যাত্রীরা অবাক হ'য়ে চেয়ে দেখে, এরা করে কি? কোথাকারই বা লোক এরা?

ঝির ঝির ক'রে বৃষ্টি পড়ছে—ইলসেগুঁড়ির এক ক্ষুদ্র সংস্করণ। হেঁটে গিয়ে পোর্টফোলিও ব্যাগটা হাতে নিয়ে চড়লাম National Air Line-এর বিমানে। সেদিন বিমানটা নির্দিষ্ট সময়ের কিছু পরে ছেড়েছিল। ফলে কেনেডী বিমান বন্দরে পৌছতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হওয়ায় কর্তৃপক্ষ তৎক্ষণাৎ বিমান বন্দরে অবতরণ করতে দিল না। তাই বিমানটাকে বৃহত্তর নিউইয়র্ক মহানগরীর উপর কয়েকবার পাক মারতে লাগলো যতক্ষণ না নামার নির্দেশ আসে। লাভ হ'ল এই যে বৃহত্তর মহানগরীর শোভা ও বিন্যাস শ্যেন দৃষ্টি দিয়ে দেখার সুবর্ণ সুযোগ মিলে গেল। বিমানে আসার সময় আমার সহ-আসীনা যে মেয়েটার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল সে হ'ল 'সুশী'। সে তার বাপ-মাকে ছেড়ে চলেছে ওয়াশিংটনে কাজ করতে। ভারতবর্ষ থেকে ওর কলম-বন্ধু তাকে চিঠি দিয়েছে।

আমায় ভারতীয় জেনে চিঠিখানা খুলে পড়াতে লাগলো। তার চিঠির প্রতি নির্বিকার অনীহা তার কাছে প্রকাশ করলাম না, নীরবে প'ড়ে গেলাম। পাঠ শেষে প্রশ্ন করলাম 'কবে যাচ্ছ আমাদের দেশে?' সে বলে 'যাবার তো ইচ্ছে খুব। তবে রোজগার ক'রে কিছু টাকা জমিয়ে একদিন নিশ্চয়ই যাব।'

আমি তাকে আমার ছাপানো ভিজিটিং কার্ড একটা দিলাম। আর বললাম 'এই সব পত্রালাপ আন্তর্জাতিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা বিনিময়ে প্রচুর সাহায্য করে ও বিভিন্ন জাতির মধ্যে হৃদ্যতা বাড়িয়ে তোলে। 'আমি তোমায় আমাদের মধ্যে কোনদিন পেলে অত্যন্ত খুশী হব।'

নিউইয়র্কের মাটী স্পর্শ করার পর আমরা যে যার মালপত্র নিয়ে বিমান থেকে বেরিয়ে বিমান বন্দরে এলাম। পঞ্জার টেলিফোনে ব'লে দিয়েছিল 'মেটকাফ এণ্ড এডীর' প্রতিনিধি রস্ হোল্ট (Ross Holt) এসে আমার সঙ্গে বিমান বন্দরে দেখা করবেন। হোল্ট সাহেব গাড়ী নিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। মালের কাউন্টার থেকে ভারী ব্যাগটা নিতে বেজায় দেরী হ'য়ে গেল। যাই হ'ক হোল্ট বড় ব্যাগটা ও আমি ছোটটা নিয়ে গাড়ীতে চড়লাম। প্রথম বললাম—

—অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছে আপনাকে!

—কী করবেন আপনি, বিমান যদি আসতে দেরী করে।

—থাকার কিছু বন্দোবস্ত হয়েছে? আমরা এখন যাচ্ছি কোথায়?

—আমাদের দুজন ইঞ্জিনিয়ারের জন্য টিউডর (TUDOR) হোটেলে একখানা পাকাপাকি ঘর ভাড়া করা আছে। তারা শুক্রবার বৈকালে যে যার বাড়ী চলে যায় আর আসে সোমবার সকালে। ওরা শুক্রবার

কাজের পর যে যার বাড়ী চলে গেছে। শুক্রবার রাতথেকে ঐ ঘরটী খালি থাকবে শনি ও রবিবার। আপনি তো রবিবার সকালে চলে যাচ্ছেন। আমাদের ঘর এখন ফাঁকা যাচ্ছে। আপনার যদি পছন্দ হয়তো শুক্রবার থেকেই সেখানে থাকতে পারেন। তবে এটি সহরের কেন্দ্রে। অতএব যাতায়াতের বহু সুবিধে রয়েছে।

আমার থাকা তো মাত্র রাতের বেলায়। তখন এত বাছাবাছিতে লাভ কি? অন্যরা যখন থাকতে পারে তখন আমিইবা কেন পারবো না। সেইখানেই যাওয়া যাক। না দেখেই আমার পছন্দ বলে দিলাম।

তবে মনে মনে যে একটা হিসেব করিনি এ কথা ঠিক নয়। ভেবে দেখলাম অযথা কেন ঘরভাড়া দিয়ে অর্থব্যয় করা? ওদের তো এ ঘরভাড়া দিতেই হচ্ছে। আমি গ্রহণ করে এদের ধন্য করছি ও ধন্য হচ্ছিও। ওদেরও খরচ নেই আমারও খরচ নেই। শুধু একটু বন্দোবস্ত করা মাত্র।

এই রকম কথাবার্তার মধ্য দিয়ে গাড়ী করে আমরা সহরের দিকে এগিয়ে চলেছি তো চলেছি। সহরতলী ছাড়িয়ে একজায়গায় দেখলাম এক বিরাট সাইনবোর্ড

If You Have Not Visited Macey

You Have Not Visited New York।

এখানে দেখলাম পথে, বিশেষ করে ভিড় যেখানে, সেখানে মেয়ে পুরুষ বেশ মার্জিত রুচিতে সুসজ্জিত। কথায় কথায় হোল্ট বললেন এখানের অনেক রেস্তোঁরায় শুধু সার্ট পরলে বা গলায় টাই না লাগানো ভদ্রলোকদের পরিবেশন করেনা। চোস্ত মার্কিনী কায়দায় সজ্জিত হতে হবে। তবে একথা বলা যেতে পারে যে দিনের নিউ-ইয়র্ক বেশভূষা সম্বন্ধে সুসচেতন কিন্তু রাতের বেলা এত নিয়মতান্ত্রিকতার বালাই নেই। খুশী মত জামাজুতো পরতে পারো ও চলে যেতে পার রাতের অভিসারে।

—জানলাম তোমার কাছ থেকে এ সহরের আচার ব্যবহার। অতএব আমি সবসময়েই আমার সার্ট, টাই ও কোটে সুসজ্জিত হয়ে থাকবো। অতএব কোন বিপদের সম্ভাবনা নেই। উপরন্তু আমার স্থিতিও তো ক্ষণস্থায়ী। কলকাতার Bengal Clubএর হোটেলেরও ঐ একই নিয়ম। ডাইনিং হলে কোট পরে যেতে হবে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য দপ্তরের রাজগোপালন সাহেব এসেছেন কলকাতায়। ভিনসেন্ট সাহেব তাকে 'বেঙ্গল ক্লাবে' নিমন্ত্রণ করেছেন দুপুরের লাঞ্চে। তিনি তো এসেছেন বুশসার্ট পরে দিল্লী-থেকে। কী করা যায়! ঐ বুশসার্টের ওপর ভিনসেন্ট সাহেবের ডোরাকাটা কোট চড়িয়ে এলেন রাজাগোপালন খাবার হল ঘরে। আমার মনে পড়ে গেল বিংশশতকের প্রথমে এক মহা উপন্যাসের (শ্রীশ্রীরাজলক্ষী) উপনায়ক শেয়ালমারার চেহারার সঙ্গে অদ্ভুত মিল।

এই রকম কথায় বার্তায় আমরা পৌছে গেলাম আমাদের গন্তব্যস্থান,—460 West 42nd Street অর্থাৎ Tudor Hotel-এ। দুজনেই আমরা গেলাম আমার জন্য নির্দিষ্ট ঘরে। তিনি সব আমায় দেখিয়ে দিয়ে গেলেন। ঘরের ভেতর কী বেজায় গরম। ঘরের শীতাতপ নিয়ন্ত্রক যন্ত্রটী চালিয়ে দিলাম ঘরটী কিঞ্চিৎ শীতল করার জন্য। জানালা খোলার জো নেই। সংলগ্ন বাথরুমের কলের জলও কবোষ্ণ।

'বস্' বিদায় নিয়ে গেলেন। তবে কথা রইল যে শনিবার অর্থাৎ কাল সকাল ৯টায় আসবেন ও আমায় একটা Sewage Treatment Plant দেখাতে নিয়ে যাবেন। অর্থাৎ সকাল ন'টা থেকে দশটা লাগবে যেতে, Sewage Treatment Plantএ ১ ঘণ্টা ও ফিরতেও ১ ঘণ্টা যার অর্থ হচ্ছে তিন ঘণ্টা সময়। সরকারী কাজে বেলা বারোটা পর্যন্ত, তারপর কেনাকাটার ব্যাপারে এক ঘণ্টা বা ততে খিক।

রাতের বেলা ঘরে ব'সে টেলিফোন করলাম বাগচী সাহেবকে। শ্রীমতী রুবি দেবী ধরেছিলেন টেলিফোন। টেলিফোন কর্তাকে দিতে উনি গলার স্বরে চিনে ফেললেন ও তাঁকে বললাম সময় আমার আগামীকাল মাত্র একদিন। রবিবার সকাল ৮া৽টায় বিমান বন্দরে যেতে হবে। অতএব সময় অল্প। তার মানে আমরা শনিবার সকাল ৯টার সময় বেরুচ্ছি ও তারপর ঘুরে 'মেটকাফ এণ্ড এডী'র পরিকল্পনায় ময়লা পরিশোধনাগার দেখে আমরা কিছু কেনাকাটা করব। আপনি আসুন কাল সকাল ৯টার সময় Tudor Hotelএ। আমরা সকলে বেরুবো। সারা শনিবার ব্যস্ত থাকতে হবে।

বাগচী সাহেব রাজী হয়ে গেলেন ও কাল সকাল ৯টায়

আসবেন, বললেন। রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী নিখিলানন্দকে টেলিফোন করার ইচ্ছে ছিল। বর্তমানে ওঁরা একটু বেশী ব্যস্ত হয়েছেন তাই আর সংযোগের চেষ্টা করলাম না। প্রায় বিশবছর আগে যখন নিউইয়র্ক গিয়েছিলাম তখন তাঁর 'The Gospel of Ramkrishna' বইটী বেরিয়েছিল। স্যানফ্রানসিস্‌কোতে যে লোক অসুস্থ থাকার জন্য দেখা করতে পারেন না তিনিই কিনা তার পরদিন সকালে দেড়ঘণ্টা বক্তৃতা করতে পারেন! অতএব ওঁদের বহু স্বামীজির সঙ্গে অন্তরের প্রীতি থাকলেও প্রীতি ভিক্ষে করে হয়না। দু'তরফে বিনিময়েই তা সম্ভব তবুও আমি গিয়েছিলাম মেরী লুইসের সঙ্গে দেখা করব বলে স্যানফ্রানসিস্‌কোতে ওঁদের প্রার্থনা সভায়।

রাত্রে এত গরম যে ঘরের Air cooler চালিয়েও বিশেষ ঠাণ্ডা হ'ল না ঘর। কি আর করি। সামান্য-মাত্র পরিচ্ছদে নিজেকে আবৃত করে শুয়ে পড়লাম। ঠাণ্ডা জলে একবার স্নান করে নিলাম।

সকাল হ'ল। তৈরী হয়ে নিয়েই কাছে এক অটোম্যাটে আসকে পিটে (প্যান কেক্‌) ও মেপেল রস ও অন্যান্য খাদ্য কিছু খেয়ে নিয়ে ফিরে এলাম হোটেলে। মাম্রা সভ্যতার উপর দেখাটাও কিছু এগিয়ে নিলাম। বাগচী সাহেব ৯টার কয়েক মিনিট আগে এসে হাজির। আমি Rossকে বলে দিয়েছিলাম আসবে যখন তোমার ছেলেমেয়েদের নিয়ে আসবে। শনিবার, আজতো সবারের ছুটী আমরা ঘুরে আসব সবাই। ৯টা যখন বেজেছে টেলিফোন এল সে নীচে এসে গেছে। আমরাও নীচে গেলাম। আজ আর কোট নিলাম না, বেজায় গরম।

বাগচী সাহেবের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম। Ross তার দুই ছেলেকে নিয়ে এসেছে। মেয়ে দুটীকে নিয়ে আসেনি। আমরা সবাই মিলে বেরিয়ে পড়লাম। Mamaroneck Sewage Treatment Plant নিউইয়র্কের উপকণ্ঠে 'ওয়েষ্ট চেষ্টার কাউন্টি'তে (West Chester County)। এখানে পূর্ণ পরিশোধন করা হয়না। Sludge দূরে অন্য একটি ময়লাকলে নিয়ে গিয়ে পরিশোধন করে। এটী একটী Parkএর খুব কাছে; অধিবাসীদের বেজায় আপত্তি প্রথমে ছিল, অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে যদিও রেখেছে এই ময়লা কলটী। এখানে Exhaust বেরুবার সময় তাতে Ozone দেওয়া হয় দুর্গন্ধ নাশ করার জন্য। বিশেষ কোন গন্ধ ভেতরেও নেই বাইরের তো কথাই নেই।

সেখান থেকে ফিরে সহরের এক হোটেলে উঠে সবাই মিলে Ice Cream ও Pie খেলাম। তারপর Maceyতে কিছু জিনিষ কেনার ইচ্ছে ছিল কিন্তু হলনা। মাত্র কয়েকটা টাই কিনেছিলাম। আর চারটে চকলেটের বাক্স Ross-এর ছেলেমেয়েদের জন্য কিনলাম। ছেলে দুটীর হাতে দিয়ে দিলাম তাদের বোনেদের দেবার জন্য। সেখান থেকে আমরা ঠিক করলাম Empire State Buildingএ ওঠা যাক্‌। ২৫ সেণ্ট করে ভাড়া দিয়ে লিফ্টে করে উঠতে হয়।

এম্পায়ার ষ্টেট বিল্ডিং

যে যেখান থেকে যে যানবাহনে আসুন না কেন সিকিমাইলের বেশী উঁচু এই পৃথিবীর উচ্চতম অট্টালিকার চৌম্বক আকর্ষণ যে আছে এ কথা অনস্বীকার্য। এটীর আঙ্গিক ও পরিকল্পনায় একটি রুচির ও সৌন্দর্যের পরিচয় আছে। ইণ্ডিয়ানার শ্বেত মর্মরের বহিরাবরণ ষ্টেনলেশ্‌ ইস্পাত ও কাঁচের সমন্বয়ে এক অপরূপ আকৃতি ধারণ করেছে। ১৪৭২ ফুট উঁচু এই বিরাট হর্ম্য। এখানের লবীতে মারবেলের আবরণ ইতালী, জার্মানী, বেলজিয়াম, ফ্রান্স থেকে আমদানী করা হয়েছিল।

বাগচী সাহেব আমাদের সবাইএর মাথাপিছু ২৫সেণ্ট দিয়ে টিকিট করেছিলেন। আমরা আধ মিনিটে ৮৬তলায় উঠে গেলাম। সেখান থেকে বেরিয়ে আমরা ১০১০ফুট উঁচুতে পর্যবেক্ষণ চাতালে এলাম। চারিদিকের দিগন্ত রেখায় ৪০।৫০ মাইল দূরের দৃশ্য, নির্মল ও উজ্জ্বল দিনে ৮০ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত দৃশ্য দেখা যায়। রাত্রে উজ্জ্বল আলোয় এর রূপ আরও মোহনীয় হয়ে ওঠে যেন এক স্বপ্নপুরীর মত প্রতীয়মান হয়। কাঁচ দিয়ে ঘেরা পর্যবেক্ষণ চাতাল থেকে নিউজার্সি, পেনসিলভেনিয়া, কানেটিকাট ও ম্যাসাচুসেট রাষ্ট্রের ভূমি দেখা যায়। দর্শকরা যদি আরও উঁচুতে উঠতে চান তাঁরা ৮৬ তলা থেকে ১২০ তলা পর্যন্ত লাইন দিয়ে লিফ্‌ট করে উঠে যান। তখন আপনি ১২৫০ ফুট উঁচুতে পৃথিবীর মানুষের গড়া উচ্চতম

আরোহণ করেছেন। এটী ভিতর থেকে আলোকিত হয় সাড়ে ১২কোটী প্রদীপের সমদীপ্ত শিখায়। ার প্লাবন আনতে ১০০০ ওয়াটের আয়োডিন কোয়া-বাত্তি ব্যবহার করা হয়। এই সর্ব্বোচ্চ চাতালেই য়। এর উপরও ২২২ ফুট উঁচু ৬০টন ভারী টেলি নর সঞ্চারক দণ্ড উদ্যত আছে ৮০লক্ষ দর্শক ও াদের মধ্যে টেলিভিশনের তরঙ্গ ছড়াতে। Engi-ing News Record এ পায় বিশ বছর আগে যখন টেলিভিশন স্তম্ভ তোলা হয় তখন কর্মীদের অভিজ্ঞতার নীতে লেখা আছে যে ভীষণ জোরে বাতাস বয় ও পথীরাও অতি বেগে উড়ে যায়। প্রায় তিন কোটী দেখতে এসেছেন এখানে। সেই সঙ্গে এসেছিলেন ণ্ডর রাণী এলিজাবেথ II ও তাঁর স্বামী ফিলিপস্, ্যাণ্ডের রাজরাণী, গ্রীসের রাণী Frederika, ডনের রাজকুমারী, পণ্ডিত নেহেরু ও আপনাদের বন্ধু ও বিনীত আমি। এটী বর্তমান পৃথিবীর অষ্টম র্য। বিশলক্ষ বর্গফুট ভাড়া দেওয়ার স্থান এখানে; কোটী সত্তর লক্ষ ঘনফুট আয়তনে। নির্মাণে যাটহাজার ইস্পাত, ৬০ মাইল জলের পাইপ, ৩৫০০ মাইল টেলি-নের তার, ৭ মাইল লিফটের চোঙ্গা (Shaft), ৬৫০০টী লা। এই বিরাট হর্ম্ম্যটীর মোট ওজন হ'ল ৩,৬৫,০০০ যার নির্মাণে লেগেছিল ১৬,০০০ লোক। সিঁড়ি ১০২ তলা উঠতে ১৮৬০টী ধাপ আছে। মাসে এ তে ২০ লক্ষ Kilowalt বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহৃত । ২০০ মেম ও নিগ্রো দাসী এটীকে পরিষ্কার রাখতে হয়েছে। দিনে গড়ে ৩৫,০০০ লোক দর্শনার্থী আসে এই হর্ম্যতলে।

এম্পায়ার ষ্টেট্ বিল্ডিং থেকে Panam-এর বাড়ীর আরশোলার মত ধারে ধারে এক Air Taxi নামতে লাম অর্থাৎ একটা Helicopterকে। লোক নেমে ছাদে! কিছুক্ষণ বাদে আবার উড়ে গেল হেলি-কপটার যাত্রী নিয়ে।

বেলা প্রায় আড়াইটে (২৷) বাজলো যখন Rossকে বললাম 'ছেলেমেয়েদের নিয়ে তুমি বাড়ী যাও। বাগচী সাহেব ও আমি একটু দেখে ওঁদের বাড়ী যাব। কেমন?'

এখন আমি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল বাগচী সাহেবের উপর। তিনি আমার নিয়ে চললেন। Paul Guggenheim সংগ্রহশালায়। এই বাড়ীর পরিকল্পনা Frank hloyd Wright-এর এর। নবীনত্ব কিছু নেই। সিঁড়ির বদলে Roup দিয়ে উঠতে ওপরে। রোমের Vatican Cityতে আমি দেখেছি এমন Ramp যে একটা দিয়ে উঠেছে আর একটা দিয়ে নামছে। এখান থেকে নিউইয়র্কের Metropoliotan Museum of Art দেখতে গেলাম। একতলা দেখতেই পাঁচটা বেজে গেল। বেরিয়ে আসতে হ'ল অপূর্ণ বাসনা নিয়ে। এখন কি করা যায়? আবার একটা দোকানে যাওয়া হ'ল, একটা সার্টও কেনা হ'ল। তারপর ঠিক হ'ল যাওয়া যাক Southern Feryর দিকে। এবার Undelground ট্রেনে চললাম Southern Ferryতে: সেখান থেকে জাহাজে ক'রে Statue of Liberty দেখে যাওয়া আমার ইচ্ছে। Statue of Libertyতে যাবার ফেরী ৬টায় বন্ধ হ'য়ে গেছে। দূর থেকেই দেখা গেল। এখানে Soconyর এক বিরাট বাড়ী।

তখন সন্ধ্যে প্রায় সাড়ে ৬টা। Southern Ferry থেকে ফিরতি ট্রেনে চড়ে টাইমস্ স্কোয়ারে (Times Square) এলাম। এখানে বিভিন্ন স্তরে স্তরে সুড়ঙ্গ ট্রেণ চলে। টাইমস্ স্কোয়ারে বদল ক'রে আর একটী ট্রেণ ধ'রে চললাম Flushing এর দিকে। এখানে এক সময় বেজায় ভিড় থাকতো যখন Newyork এ world fair হ'য়েছিল। এবার হবে Montrealএ।

এম্পায়ার ষ্টেট বিল্ডিং থেকে যে সব বহুতল বাড়ী দেখা যায় তাদের মধ্যে প্রধানগুলির তালিকা নী… দেওয়া হল।

নিউইয়র্কের বহুতল বাড়ীর তালিকা

সংখ্যা	উচ্চতল বাড়ীর নাম	ঠিকানা	উচ্চতা (ফিট)	কততল
১।	এম্পায়ার ষ্টেট বিল্ডিং	পঞ্চম এভিনিউ ও ৩৪ নং ষ্ট্রীট,	১২৫০	
২।	ক্রাইসলার	লেক্সিংটন্ এভিনিউ ও ৪২নং ষ্ট্রীট	১০৪৬	
৩।	ষাট ,দওয়াল টাওয়ার	৭০ নং পাইন ষ্ট্রীট	৯৬৫	
৪।	৪০ ওয়াল ষ্ট্রীট	৪০ নং ওয়াল্ ষ্ট্রীট	৯২৭	
৫।	আর, সি, এ	৩০নং রকফেলার প্লেস্	৮ ০	
৬।	চেস, ম্যানহাটান	১নং চেস ম্যান্হাটন্ প্লেস্	৮১৩	
৭।	প্যান এমেরিকান	২০০নং পার্ক এভিনিউ	৮০৮	
৮।	উলওয়ার্থ	২৩৩ বে	৭৯২	
৯।	সিটি ব্যাঙ্ক ফার্মার ট্র ষ্ট	২০নং এক্সচেঞ্জ প্লেস	৭৪১	
১০।	ইউনিয়ন কারবাইও	২৭০ নং পার্ক এভিনিউ	৭০৭	
১১।	মেট্রোপলিটন লাইফ	১নং ম্যাডিসন, এভিনিউ	৭০০	[illegible]
১২।	৫০০ ফিফ্থ এভিন্যু	পঞ্চম এভিনিউ ও ৪২নং ষ্ট্রীট	৭০০	[illegible]
১৩।	কেম ব্যাক Ny ট্রাষ্ট	২৭৭নং পার্ক এভিনিউ	৬৮৫	[illegible]
১৪।	চেনিন	১২২নং ই ৪২ ষ্ট্রীট	৬৮০	[illegible]
১৫।	লিংকন	৬০নং ই ৪২ ষ্ট্রীট	৬৭০	[illegible]
১৬।	আরভিং ট্রাষ্ট	১নং ওয়াল ষ্ট্রীট	৬৫০	[illegible]
১৭।	জেনারেল ইলেকট্রিক	৫৭০নং লেকসিংটন এভিনিউ	৬৪১	[illegible]
১৮।	ওয়াল্ডর্ফ-এষ্টোরিয়া	পার্ক এভিনিউ ও ৫০তম ষ্ট্রীট	৬২৫	[illegible]
১৯।	১০ই ৪০তম ষ্ট্রীট	১০ই ৪০তম ষ্ট্রীট	৬২০	[illegible]
২০।	নিউইয়র্ক লাইফ	৫১ ম্যাসিডন, এভিনিউ	৬১৫	[illegible]
২১।	সিংগার	১৪৯ বে	৬১২	[illegible]
২২।	১৩০১ এভিন্যু অব আমেরিকা	১৩০১ এভিন্যু অব আমেরিকা	৬০৯	[illegible]
২৩।	নেলসন টাওয়ার	৪৫০নং সপ্তম এভিনিউ	৬০০	[illegible]

্র ধারণা :

মান থেকে নামবার সময় ওপর থেকে বহুতল কা সম্বলিত নিউইয়র্ক দেখলে মনে হয় যেন কাঠের নানা রকমের শিশি বোতল ঠাসা একটা অঞ্চল। দুই বাড়ীর মধ্যে বেশ চওড়া চওড়া রাস্তা আছে ীর্ঘাঙ্গী বাড়ীর তুলনায় এরা প্রায় নগণ্য। এখানে লে গেছে উত্তর দক্ষিণে ও পূর্ব পশ্চিমে। উত্তর র রাস্তাগুলো হ'ল avenue এবং পূর্ব পশ্চিমের রাস্তা ট। যেমন হাওড়াতে রোড আছে, লেন আছে ন আছে কিন্তু 'ষ্ট্রীট' নেই। উত্তর দক্ষিণে লম্বা avenue-এর পূর্বাঞ্চলের রাস্তার উপর বাড়ীর । অমুক ষ্ট্রীট ইষ্ট ও পশ্চিম দিকে অবস্থিত হ'লে ষ্ট্রীট ওয়েষ্ট আখ্যা দেওয়া হয়।

ানহাটান দ্বীপে এর বিরাট পার্কটা অত ঘন বসতির একটু দম নেওয়ার জায়গা। তবে সাধারণ য়র্কবাসীরা এটাকে গতির, ভিড়ের, ব্যবসা-বাণিজ্যের াঘাত মৃত্যুর সহর ব'লে মেনে নিয়েছে। এই ঘন-পূর্ণ ইট কাঠ, কাচ ও কংক্রীটের জংগলে মানুষ জন্ম বেঁচে থেকে, কাজ করে, ঘুমোয়, খায়, খেলে ও াদায় নেয়।

হাস :

তিনশতকে এই নগণ্য সমুদ্রকূলবর্তী গ্রাম আজ এক । সহরে রূপান্তরিত হয়েছে। বিশেষ করে তিন-। এর ধারণাতীত প্রবৃদ্ধি বিংশ শতাব্দীতেই বিশেষ সূচিত হয়। তাই এক অর্থে নিউইয়র্ক হল আমে-র বিকাশ ও উন্নয়নের প্রতিমূর্ত্তি। নিউইয়র্ক রাষ্ট্রকে য় Empire State ডাচেদের নিউ আমস্টারডাম্ w Amsterdam) চল্লিশ বছর বাদে হল ইংরেজের ইয়র্ক। ১৬২৫ খ্রীষ্টাব্দে ডাচ ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী র 'ফার'(Fir) বিক্রীর কেন্দ্র স্থাপন করে এই ম্যানহাটান ।। ডাচ সরকার এই কোম্পানীকে দেলওয়ার ও ন নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল উন্নয়নের ক্ষমতা দেন। অঞ্চলকে নিউ নেদারল্যাণ্ড বলা হয়। ম্যানহাটান র ডগায় দুর্গ গড়ে উঠল। বসলো ডাচেদের বৈশিষ্ট্য ামিল। গৃহ নির্মিত হ'ল এবং প্রায় দুশো লোক এখানে বাস করতে লাগলো। ১৬২৬ খ্রীষ্টাব্দে পীটার মিনুইট (Peter Minuit) স্থানীয় রেড ইণ্ডিয়ানদের সাথে কথাবার্তা ক'য়ে ষাট গীল্ডারে (অর্থাৎ ২৪ ডলারে) 'মানহাতী'স্ দ্বীপ ক্রয় করলেন। খুব তাড়াতাড়ি গড়ে উঠল এক গির্জা, ৩০০ বাড়ী ও বিরাট এক সরাই-খানা। সেটী নাকি উত্তরকালে নিউ আমস্টারডাম্ পৌরসভার অফিসে রূপান্তরিত হয়।

১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর ইংরেজ পাঠালো চারিটি যুদ্ধ জাহাজ ও ডাচেদের আত্মসমর্পণ করতে বললো, কেননা এই দ্বীপ নাকি ইংরেজ আগেই আবিষ্কার করেছিল। প্রায় সপ্তাহ খানেক প্রতীক্ষা চালিয়ে বিফল মনোরথ হয়ে আত্মসমর্পণ করেন ডাচেরা। রাজা চার্লসের ভাই জেমসের সম্মানার্থে ডিউক অব ইয়র্কের নামানুসারে ম্যান-হাটান দ্বীপের ডগায় আমসটারডাম দুর্গের নাম বদল হল জেমস্ দুর্গে। পরের ১৬ মাসের জন্ম এর নাম হল (১৬৭৩-১৬৭৪) উইলেম্ হেণ্ডরিক দুর্গ। তখন নিউইয়র্কের নাম বদলে হয় 'নিউ অরেঞ্জ' পরে সন্ধির সর্ত অনুসারে এই স্থানটী ইংরেজকে ফেরৎ দেওয়া হয় তখন এই স্থানের নাম হল 'নিউইয়র্ক'। যদিও ডাচ্ শাসন চলেগেল তবু ও ডাচ প্রভাব দূর হল না। আজও তার কিছুটা বর্তমান। আজও 'ফাদার নিকার বোকার'—বলতে নিউইয়র্কেই বোঝাযায়। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে এখানে ২৩,০০০ লোক বসবাস করতো। এটী সাত বছর শত্রু হস্তে আমেরিকান বিদ্রোহের সময় বৃটিশের সদর দপ্তর হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ১৭৮৪ থেকে ১৭৯৬ সাল পর্যন্ত এটী রাষ্ট্রের রাজধানী ছিল। এবং যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী রূপে ১৭৮৫ থেকে ১৭৯০ সাল পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়েছিল। এইখানেই জর্জ ওয়াশিংটন ১৭৮৯ সালের এপ্রিল মাসে প্রেসিডেণ্ট হিসেবে মনোনীত হন। তিনি এখানে ১৭৯০ সালের আগষ্ট মাস পর্যন্ত ছিলেন যখন আবার রাজধানী ফিলাডেলফিয়ায় স্থানান্তারিত করা হয় এবং অবশেষে ওয়াশিংটনে চলে আসে তার কাহিনী আগেই ওয়াশিংটন-পর্বে বলা হয়েছে।

১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দের সমসমকালে নিউইয়র্কের অসাধারণ উন্নয়ন পর্বের সূত্রপাত হয়। ১৮৫০ সালে নগর অঞ্চল 42nd ষ্ট্রীট পর্যন্ত এগিয়ে যায় ও ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে বৃহত্তর নিউইয়র্ক স্থাপনের পর ব্রুকলীন, কুইনস্ ও স্ট্যাটেন দ্বীপ

(বর্তমানে রিচমণ্ড), ম্যানহাটান ও ব্রংকেসর সঙ্গে যুক্ত হয় ও জনসংখ্যা প্রায় ৩১ লক্ষে দাঁড়ায়। নিউইয়র্কের উন্নয়নের মূল কারণ বিশ্লেষণে দেখা যায় ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে কাটা 'ইরি খাল' ও '৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে মহানগরীর বিস্তৃতি বৃদ্ধি। নিউইয়র্কের অধিকাংশ লোক ভাড়া বাড়ীতে থাকে ও ইচ্ছামত এখান থেকে ওখানে উঠে যায়। এই মহানগরী বিভিন্ন জাতির সমাবেশে গড়ে উঠেছে।

বিস্তৃতি :

নিউইয়র্ক মহানগরী যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে জনবহুল নগরী। গত একশো বছর ধরে এটী আর্থিক ও ব্যবসায়িক কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। এটী যুক্তরাষ্ট্রের মুখ্য বন্দর ও সবচেয়ে ব্যস্ত বিমান বন্দরের অধিকারী। এখানে যেমন উত্তুঙ্গ প্রাসাদ শ্রেণী ধনিক ও কৃতিমানদের উদ্ধত কর্ম-চঞ্চলতার বিকাশ স্থল তেমনি এখানের বস্তি অঞ্চলের দারিদ্র্য-দুঃখও এখানে বিশেষ সইতে হয়। পৃথিবীর উচ্চতম প্রাসাদ আরও উচ্চতর হয়েছে কিন্তু দারিদ্রের মান কি সে পরিমাণে উন্নত হয়েছে? দ্বীপকেন্দ্রিক মহানগরীর বিস্তৃতি ৩১৯'৮ বর্গ মাইল সর্বাধিক দৈর্ঘ্যে ৩৬ মাইল ও প্রস্থে ১৬½ মাইল। মহানগরী পাঁচটী বরোতে (Burrough) বিভক্ত যেমন ব্রংক্স, ব্রুকলীন্, ম্যানহাটান, কুইনস্ ও রিচমণ্ড।

	বিস্তৃতি (বর্গমাইল)	দৈর্ঘ্য (মাইল)	প্রস্থ (মাইল)	লোকসংখ্যা (১৯৬০)
The Bronx	৪৩'১	৮'৩	৮	১৪,২৪,৮১৫
Brooklyna	৭৮'৫	১১'৬	১০'৯	২৬,২৭,৩১৯
Manhatton	২২'৬	১৩'৪	২'৩	১৬,৯৮,২৮১
Queens	১১৪'৭	১৬'৮	১৩'৪	১৮,০৯,৫৭৮
Richmond	৬০'৯	১৩'৯	৭'৩	২২১,৯১১

মেট্রেপলিটান নিউইয়র্কের বিস্তৃতি ১,৯১'৫ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা প্রায় দেড় কোটী। মূল নিউইয়র্ক মহা-নগরী ছাড়াও সন্নিকটস্থ অঞ্চল এর মধ্যে নেওয়া হয়েছে।

ম্যানহাটানের অনেক জায়গা ভরাট করে তোলা হয়েছে—কোথাও বা ময়লার গাদ দিয়ে কোথাও বা লণ্ডনের বোমাবিধ্বস্ত বাড়ীর রাবিশ দিয়ে। যুদ্ধের সময় সমরোপকরণে যুক্তরাষ্ট্র থেকে গেছে কিন্তু ফেরার সময় জাহাজে কিছু ভার দিতে পণ্যের বদলে বাড়ীভাঙ্গা রাবিশ নিয়ে এসে নিউইয়র্কের ম্যানহাটান দ্বীপের ডগায় ভর্তি করে দিয়েছে।

লোকসংখ্যা :

মহানগরী যখন বৃহৎ আকার ধারণ করে তখন তার লোক সংখ্যা সমানানুপাতিক ভাবে বাড়ে না। বৃহতের বৃদ্ধি নানা অসুবিধে ঘটায়। ফলে লোকসংখ্যার বৃদ্ধি হয় অতি মন্থর গতিতে অথবা অবক্ষয়ে। নিউইয়র্কের দশাও আজ তাই নীচের লোকসংখ্যার বৃদ্ধির হার থেকে স্পষ্টই বোঝা যাবে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হয় নাই ক্রমশঃ হার নেমে গেছে।

খ্রীষ্টাব্দ—	লোকসংখ্যা	পূর্বের বছরের উপর বৃদ্ধির হার
১৯০০	৩,৪৩৭,২০২	
১৯১০	৪,৭৬৬,৮৮৩	৩৮'৭%
১৯২০	৫,৬২০,০৪৮	১৭'৯ „
১৯৩০	৬,৯৩০,৪৪৬	২৩'৩ „
১৯৪০	৭,৪৫৪,৯৯৫	৭ '৬ „
১৯৫০	৭,৮৯১,৯৫৭	৫ '৯ „
১৯৬০	৭,৭৮১,৯৮৪	—১'৪ „

এখানে প্রতি বর্গমাইলে জনসংখ্যার চাপ গড়ে ২৪,৩৩৬ জন ও ম্যানহাটান অঞ্চলে প্রতি বর্গমাইলে ৭৫,০৭২ জন। এখানে নানা ইউরোপীয় দেশ থেকে লোক এসেছে, তারা মোট লোকসংখ্যার পাঁচ (৫) ভাগের এক ভাগ। এখানের নিগ্রোদের সংখ্যা ১,০৮৭,৯৩১ যারা গত দশ বছরে শতকরা ৪৬ ভাগ বেড়েছে।

পৌরশাসন :

এখানে পৌরশাসন 'মেয়র-কাউন্সিল' পদ্ধতিতে চলে। মেয়র হলেন মহানগরীর Chief executive officer। তিনিই পৌরবিভাগের প্রধানদের নিয়োগ করেন, নিয়োগ করেন বিভিন্ন কমিশন, ফৌজদারী আদালতের ও পরিবার আদালতের (Family court) জজেদের। মেয়রের City Conneil থেকে পাশ করা আইনে ভেটো দিয়ে দিতে পারেন। কর্মকর্তা হিসেবে তাঁর আয়ু চার বছর। বিভাগীয় প্রধানরা মাইনে পান বছরে ৪০,০০০ ডলার।

মেয়র মাইনে পান বছরে ৫০,০০০ ডলার। বরোর সভাপতিরা পান বছরে ৩৫,০০০ ডলার।

এখানের ১৯৬২-৬৩ সালের বার্ষিক আয় ব্যয়ের আনুমানিক হিসাবে ব্যয় ধরা হয়েছিল ২,৭৮৪,৭৩১,২২২

ডলার অর্থাৎ ছ হাজার কোটি টাকারও বেশী। তার মধ্যে শতকরা একুশ ভাগ (২১%) শিক্ষা ও গ্রন্থাগারে, দেনা শোধে সতেরো (শতকরা ১৭) ভাগ, সামাজিক সেবা-ক্রমে পনেরো (শতকরা ১৫) ভাগ; জনগণের নিরাপত্তায় বারো (শতকরা ১২) ভাগ, পেন্‌সন্ ইত্যাদিতে দশ শতকরা ১০) ভাগ ; হাঁসপাতালের জন্য ছয় (শতকরা ৬) ভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার জন্য ছয় (শতকরা ছয়) ভাগ, পরিচালনা খাতে চার (শতকরা ৪) ভাগ, ও বিবিধখাতে নয় (শতকরা ৯) ভাগ।

এর মূখ্য আয় হ'ল নাগরিক সম্পত্তির উপর কর যাতে শতকরা ৪১ ভাগ ওঠে, প্রাদেশিক সরকারী সাহায্যে শতকরা ১৮ ওঠে, বিক্রয়কর শতকরা ১২, যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য শতকরা ৬ ও অন্যান্য বিশেষ পৌরকরে শতকরা ১৩।

নিউইয়র্কের পরিবহন ব্যবস্থা :

এটা সমুদ্রের ধারে ব'লে নৌবন্দর তো বটেই তবে Newyork State Barge Canal System দিয়ে St Lawrence 'সী-ওয়ের'সঙ্গে সংযুক্ত। এখানে ৯টা রেলওয়ে, ১৭০টা নৌ কোম্পানী, ৪১টা স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিমান কোম্পানী ও ৫০০টা লরী মালবহন কোম্পানী আছে। এরা কত যাত্রী ও মালবহন করে তার পরি-সংখ্যান থেকে বোঝা যাবে কত বিরাট এর পরিবহন পরিচালনা পর্ব। ১৯৬০ সালে ১৭ কোটি যাত্রী, ৬৩'৪৭ লক্ষ টন মালবহন, ৯'২৪ লক্ষ নৌযাত্রী, ২৬,৩৪২টা জাহাজ চলাচল। ৮লক্ষ বিমানের ওঠানামাতে ১কোটী ৬৩লক্ষ যাত্রী ও ৫০কোটী ৫৯লক্ষ পাউণ্ড বিমানবাহী মাল চলাচল করেছে।

এখানে রয়েছে সর্ববৃহৎ বাসের টার্মিনাল। এখানে রয়েছে ৬০টা সেতু ও ৪টা সুড়ঙ্গ পথ। Newyork Port Authority ৪টা সেতু ও ৬টা সুড়ঙ্গ, Triborough Bridges and Tunnel Authorityর ৬টা সেতু ও ২টা সুড়ঙ্গ ও City Department of Public Works ৫০টা সেতুর রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের কাজ করেন ও কিছু শুল্কও আদায় হয়। এখানে ২৪টা পারাপারের ফেরী আছে। পৌরসংস্থা নগরের ২৩৬'৭ মাইল দীর্ঘ সুড়ঙ্গপথে (Subway)তে যান চলাচলের ব্যবস্থা পরিচালনা করেন। এখানে সাতটা Television প্রচার কেন্দ্র আছে। [ক্রমশঃ

"নন্দী হিল"-এ একদিন

(ভ্রমণ)

রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

এ যেন ধরার বাঁধন থেকে অনেক দূরে, এখানে রোগ নেই, শোক নেই, শুধু হাসি শুধু গান, শুধু খেলা আর প্রাণ। উপরের নীলাকাশের তলে আমরা ক'জন, আর রবি-বিনয়-রথীন বা দীপক-মুখার্জীবাবু ও বৌদি নই কটি নাম, আজ একটি নামে, ক'টি পরিবারের বিচ্ছিন্ন ক'জন মানুষ আজ একটি পরিবারে পরিণত হয়েছে। নানা-দিকে প্রবাহিত শাখানদী, উপনদী আজ একটি বড় নদীতে মিলে একটি নদীতে পরিণত হয়েছে। নন্দী হিলস্-এর সবুজ ঘাসে ঢাকা আস্তরণের উপর বসে আজ আমরা নিজেদের হারিয়ে ফেলেছি। নন্দী হিল। পৃথিবীর অন্তে স্বর্গ কোথায় তা জানিনা, আজ মনে হচ্ছে, কোথা নয় কোথা নয় শুধু এইখানে, নন্দী হিলস্-এ।

দুপাশে কৃষ্ণচূড়ার গাছ, লাল মাটি, কোথাও বা টিলা, বাস ছুটে চলেছে। আগে থেকেই রিজার্ভ করে রেখে-ছিলাম। সকাল ৯টায় বাঙ্গালোরে বাসট্যাণ্ড থেকে অনেকগুলি মানুষকে নিয়ে বাসটি যাত্রা করেছিল। মাঝে উঠেছে আরো অনেক লোক। কখনো উঁচু, কখনো নীচু, কখনো ডাইনে কখনো বাঁয়ে বাস চলেছে ছুটে। শহর থেকে এসেছে গ্রামের পথে। দুপাশে খোলা মাঠ, কোথাও বা গাছের সার, উঁচু পাহাড়। H, A, C-র চত্বর পার হয়ে চলে গেলাম। দুপাশে গভীর ঝাউবন, সবুজে ছাওয়া। বাস থামতেই দুটি ছোট ছেলে ছুটে এল,আলুসিনা আম্রা—ছাড়ানো কাঁঠালের কোয়া, কেউ কেউ কিনল বটে। বাস আবার ছুটে চলল পাহাড়-কাটা পথ দিয়ে।

বাসের যাত্রীদের দিকে চোখ পড়ল। তরুণ মন কিন্তু আগে দেখল নারী যাত্রীদের। রথীন আমার দিকে ফিরে মিটি মিটি হাসছে। মেয়েগুলির অঙ্গশ্রী বড় ভালো লাগলো। সাধারণত: এরা ঘন কালো। শ্যামলাও আছে। কালো মুখে ঘন কালোর উপর টানা চোখে কাজল আঁকা। মাথায় ফুল। মুখে হাসি। আবার সুঠাম গৌরাঙ্গী তন্বীও আছে। সরু টানা ভুরু, পায়ে অলঙ্কার, আঙুলে আঙটি।

তারাও দেখছে—চারিদিকে মাঠ, কখনো পাহাড়, মাঝে পাহাড়-কাটা রাস্তা। দূরে এক উপত্যকা। গাড়ী উঠছে উঁচুতে, একটু একটু করে স্পীড় কমে আসছে, পাশে গভীর খাদ, ইউকালিপটাস গাছ। গাড়ী চলেছে এঁকে বেঁকে ধীরে ধীরে। বুকের ভেতরটা ধুকপুক করছে। উপরে উঠছি, কত কত উপরে! ১০০০, ২০০০, আরও আরও। গাড়ী বেঁক নিল, ৩৮০০ ফিট উপরে, সরু পিচঢালা রাস্তা, সাদা রঙ নিয়ে পথনির্দেশ আঁকা, লেখা আছে—Sound, Horn, over Taking Poihi-bited, নীচে, কত নীচে পৃথিবী, ৪০০০ ফিট নীচে। যে রাস্তা দিয়ে বাসটা এসেছে মনে হচ্ছে সেটা দূরে পড়ে আছে ঘুমন্ত মৃত এক অজগরের মত! পায়ে পায়ে গাড়ী উঠছে, পাশে লেখা, Safety save, ৪৮৫০ ফিট নীচে ফেলে এসেছি হারানো পৃথিবী। বড় পাথরের একটি গেটের ভেতর দিয়ে গাড়ী ঢুকল, দুপাশে পাথরের দেওয়াল। তার মাঝ দিয়ে পথ। চৌকো চৌকো পাথরের গড়া দেওয়াল। ঠিক যেন দুর্গ, ভেতরে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। বাস গিয়ে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে আছে আরও কতকগুলি বাস। সমনেই টিকিট ঘর, লম্বা লাইন।

সুন্দর বৃক্ষচ্ছায়াচ্ছাদিত পথ, এগিয়ে চললাম।

বাঙ্গালোর থেকে ৩৭ মাইল বাসে বা রেলে, "নন্দী-হিল'স" একটি ছোট, পরিচিত গ্রীষ্মাবাস। সমুদ্র থেকে ৪৮৫০ ফিট উপরে। সুন্দর সাজানো, ঝকঝকে। মহী-শূরের রাজধানী ঐতিহাসিক বাঙ্গালোর থেকে দূরে।

পাথরের গড়া জলাধার অমৃত সরোবর পার হয়ে

এগিয়ে চললাম। চার পাশে নানা জাতের গাছ। খাঁজ কেটে কেটে পাথরের ধাপ নীচে নেমে গেছে। অনেক নীচে জল। কলক কিছু নেই। শুনলাম এটি চোলরাজাদের তৈরী। হবেও বা। পার হয়েই এলাম টিপুর গ্রীষ্মাবাসের সামনে। আবাসটি একটু নীচে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে হল।

ক্যামেরা নিয়ে এদিকে ওদিকে রথীন, বিনয়, নন্তু এগিয়ে গেল। টিঙ্কু তখন ব্যস্ত তার চেয়েও ছোট একটি বানর নিয়ে। প্রিয়বাবু (চক্রবর্তী) দেখছেন বাহকের কাঁধে টিফিন কেরিয়ারটা ঠিক আছে কিনা! আমি দেখছি ইতিহাসের পুরানো পাতা। হায়দার, টিপু স্বাধীনতা, সংগ্রাম।

পাশেই কতগুলি ধাপ (২১৬০টি) নীচে নেমে গেছে। টিপুর গ্রীষ্মাবাস এটি। ছোট্ট বাড়ী। দোতলা, নীচের ঘরটি যেন স্বাভাবিক তাপনিয়ন্ত্রিত। ছোট্ট বানরটি তখন টিঙ্কুকে ছেড়ে পাশের গাছটিতে উঠেছে। গাছ, গাছ, আর গাছ। নানা ধরনের নানা জাতের গাছ এনে এখানে জড়ো করা হয়েছে, বেশ পরিকল্পিত ভাবেই সাজানো।

যাবার পথেই পড়ল অতল গঙ্গা। উপরে উঁচু পাথর, তলায় কিছুটা জল। ছোট্ট তিনটি সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠলাম। দুপাশে গাছ, মাঝে সরু পথ। পথ শেষ হয়েই বড়ল প্রাঙ্গণ। 'উঃ, মাগো' বলে বৌদি বসে পড়লেন। লাফাতে লাফাতে টিঙ্কু এগিয়ে চলেছে। সমস্ত দলটা পেছনে চলেছে। হঠাৎ পেছনে আস্তে একটি হাতের ছোঁয়ায় থমকে দাঁড়ালাম। দুটি মেয়ে, দুটি ছেলে, দক্ষিণী নয়, বাঙ্গালীও নয়, ইংরাজীতেই বলল—আপনারা কোন্ ভাষায় কথা বলছেন? বলল সামনের ফরসা ছেলেটি। মুখ ফিরিয়ে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াই, বললাম —বাংলা। ছেলেটির মুখে মৃদু হাসি জাগল।—" ওঃ! তাই এত সুন্দর!" নিজের ভাষায় মেয়েটিকে কি যেন বলল। পরস্পর পরস্পরকে হাত জোর করে দাঁড়ালাম, আরও একটি শাখানদী এসে মিলে গেল। ছেলেটিকে বললাম —বাংলা তোমার ভাল লাগে?—খু-উব। কলকাতায় জ্যোতিষ ঘোষ আছেন, তার সঙ্গে আমার পত্রালাপও হয়েছে।

জ্যোতিষ ঘোষ! বঙ্গভাষা প্রসার সমিতির সম্পাদক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ কি? দূর থেকে তাঁকে প্রণাম জানালাম। খাতাটা এগিয়ে দিয়ে ছেলেটিকে বললাম তোমার নাম ঠিকানাটা দাও। সে লিখেদিল—Dinesh D Dedhia, বোম্বের লোক, ব্যবসা সূত্রে বাস মাদ্রাজে।

হনুমান মন্দিরের সামনে একটি গ্রুপ ছবি তুলে মন্দিরের ভেতরেপ্রবেশ করলাম। উঁচু টিলার উপর মন্দির। পাথরের গড়া দেওয়াল, পাথরের দরজা। ভেতরে পাথরে গড়া ঠাণ্ডা থাম। পাথরের মেঝে। অনেকগুলি মন্দিরের সমন্বয় এটি। প্রথমেই পড়ল যোগেশ্বর মন্দির, শিব ও পার্ব্বতী। অন্ধকার, উঃ, কী নিশ্ছিদ্র অন্ধকার! সেই অন্ধকারে দেবীর অঙ্গে জ্বলছে একখণ্ড হীরা। জ্বল জ্বল করছে। দেওয়াল ছুঁয়ে ছুঁয়ে বৌদি এগিয়ে এলেন, পায়ে-পায়ে এসে দাঁড়ালেন মুখার্জীবাবু (দাদা), সকলের পিছনে দাঁড়াল দীনেশ ওর বন্ধু ও মেয়ে দুটি। সমস্ত স্থানটি জুড়ে কেমন যেন একটা অপার্থিব ভাব বিরাজ করছিল। ছোট্ট দরজা, মাথায় ঠেকে যায়। হাত বাড়ালেই হাতে লাগে ঠাণ্ডা দেওয়াল, ভেতরে জ্বলছে একটি ছোট্ট প্রদীপ আর দেবীর গায়ের হীরা। মন্দিরের পাশেই একটি কুণ্ড। গায়েই হনুমানজীর মন্দির। মন্দিরটি কত পুরানো তা ঠিক করতে পারলাম না, তবে অনেক পুরানো।

মন্দিরের বাইরে টিলার উপর থেকে দেখা যাচ্ছে দূরে শহর। ঠিক যেন একখানি ছবি,তাতে আঁকা শহর, গ্রাম।

সমস্ত দলটি নিয়ে আবার এগিয়ে চললাম। শনক আশ্রমের নীচে, বড় একটি পাহাড়, তলায় গুহা। এটিই শনক আশ্রম; ভেতরে একটি পাথরের আসন, পাশেই একটি ছোট জানালা। শনক মুনির আশ্রম এটি। প্রায়-সামনেই ক'টি সিঁড়ি ভেঙে নীচে নামলে দেখা যায় নদীর উৎস মুখ বলে কথিত স্থানটি, অল্প একটু জল। পাশে পাথর কেটে ছোট ছোট দুটি ঘরে নন্দী (ষাঁড়)।

এসে দাঁড়ালাম কালো বড় ষাঁড়টির সামনে। ধ্যান-গম্ভীর মুখে সে বসে আছে, অতীতের স্মৃতি নিয়ে। তার চোখের কালো তারায় ঝকমক করছে বর্তমান আর ভবিষ্যতের মায়া। একখণ্ড প্রকাণ্ড বড় পাথর কেটে গড়া 'বুল'। নন্দী। এরই নামে পাহাড়টির নাম 'নন্দী হিল'।

মাথার উপরে তখন সূর্য্য এসে দাঁড়িয়েছে। দীনেশ বলল এস খাওয়া যাক। চক্রবর্তী সায় দিয়ে বললেন

হ্যাঁ হ্যাঁ বসা যাক। একটি পরিষ্কার জায়গা দেখে বসে-পড়লাম। দুপাশে ঝাউ গাছ। সবুজ ঘাসের আস্তরণ, দূরে পাহাড়টা আকাশের সঙ্গে গলাগলি করে দাঁড়িয়ে আছে। এক একটা খবরের কাগজ পেতে বসে পড়লাম। টিফিন কেরিয়ারটা খোলা হল, দীনেশ হোটেল থেকে নিয়ে এল ইডলি বড় দোসে। হাসি ঠাট্টার ভেতর আমরা মধ্যাহ্ন ভোজন সাঙ্গ করলাম। নন্দুদা কফির অর্ডার দিয়ে এল। এবার সুরু হল গল্প। লাণ্টু টিঙ্কু ছোট্ট একটি পাঞ্জাবী ছেলেকে নিয়ে মেতে উঠেছে। বিনয় মেয়েটিকে এতক্ষণে জিজ্ঞেস করল—ওই ভদ্রলোক কে? তোমার ভাই বুঝি? মেয়েটির মুখটি একটু লজ্জারাঙা হয়ে গেল, মাথা নিচু করে বলল, না, আমার স্বামী, দীনেশ ওর বন্ধু।"

বিনয় একটু লজ্জায় পড়ে গেল। বোঝাতে চেষ্টা করল আমরা মাথায় সিঁদুর দেখে সধবা কি কুমারী বুঝি, তোমার সিদুর না থাকায় বুঝতে পারিনি।

দুপুর গড়িয়ে আসছে, নন্দী হিলসের গাছগুলির পাতা কাঁপছে, একে এ ঠাণ্ডা জায়গা, তাতে একটু একটু করে ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। বেলা সবে ৩টা সাড়ে তিনটা। আবার সকলে উঠলাম। ঝাউ-এর ফাঁক দিয়ে চললাম এগিয়ে। পৃথিবীর কথা ভুলে গেছি সে কত দূরে তাও। সবুজ গাছের ফাঁক দিয়ে পাহাড় হাতছানি দিচ্ছে। চারিদিকে গাছে গাছে ফুল ফুটেছে, বড় গাছের পাতার ফাঁকে পাখী ডাকছে, আমরা এসে দাঁড়ালাম একটি পাঁচিল ঘেরা জায়গায়। জায়গাটির নাম—Tipu's Drop, জায়গায় জায়গায় ফাঁক। টিপু এখান থেকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিতদের নীচে ফেলে দিতেন। নীচের দিকে তাকালাম, উঃ, মাথা ঘুরে যায়। ওখানে পড়লে সারা শরীরের আর কিছু থাকবে না।

হাত ঘড়িটার দিকে চোখ পড়তে চমকে উঠি, পৌনে চারটে। ওরে বাবা। এবার আবার পৃথিবী ডাক দিচ্ছে। চারটের বাস চলে যাবে। ছোট্ ছোট্।

কোনরকমে তাড়াতাড়ি নেমে আসছি। শেষ সিড়িটাতে দাঁড়িয়ে দেখি বাসটা ভরে গেছে। দীনেশরা দৌড়ে গিয়ে কোনরকমে ঠেলাঠেলি করে উঠে পড়ল। মোটা শরীর নিয়ে বৌদি এগোতে পারলেন না, বিনয়ের প্যাণ্টের ক্রিজ ভেঙে যাবে। রথীন আর আমি কি করি। অত ভীড়ে চক্রবর্তীও এগোতে নারাজ। চোখের সামনে দিয়ে বাসটা চলে গেল! আর বাসও নেই। এক গাড়িওলাকে ধরি—যাবে নাকি? সে বলল—'পাঁচটার পর', অতক্ষণ দেরী করতে মন সায় দিল না। বাসওলা পাশে দাঁড়িয়ে ছিল বলল চিকবালপুর অবধি যাব ৩০ টাকা নেব।

৫টার পর?

—জী সাব।

আস্তে আস্তে সকলের চোখে নেমে এল চিন্তার কালো ছায়া। ফিরে যাব কি করে! "সাব"। পিছনে ফিরে তাকালাম। একটা লোক, এক মুখ খোঁচা খোঁচা দাড়ি, ময়লা ছেঁড়া জামা, পিঠে আমাদেরই বোঝা। দ্রষ্টব্য স্থানগুলি চিনিয়ে দেওয়া আর আমাদের বোঝাগুলি বহন করা ছাড়া ওর যে অন্য ভূমিকা আছে ভাবিনি। খানিকটা আগেই ও আমাদের খাদ্যাবশিষ্টগুলি নিয়ে খাচ্ছিল। ও কি বলে, সবাই উৎসুক। 'পথ আছে।' পথ! ফিরে তাকাই। পথ আছে, পিছন দিয়ে একটা সিড়ি নেমে গেছে, আমার সঙ্গে চলুন, বাসে উঠিয়ে দেব। —কতক্ষণ লাগবে, বৌদি জিজ্ঞেস করেন। "আধঘণ্টা" 'আর চল মুসাফির, চল মুসাফির, চল মুসাফির চল', ভাঙা গলায় আনন্দে গেয়ে উঠি। পথ পেয়েছি চল মুসাফির। চলেছি। ও চলেছে সামনে, আমরা পিছনে। টিঙ্কু ওর কাধে।

Tipu's Drop এর ওপাশে পথ। লেখা আছে গোপন পথ। বোধ হয় এটা ছিল রাজা-মাহারাজাদের গোপন পথ। বিনয়ের সঙ্গে চলেছে লাণ্টু। সকলেই ক্লান্ত, সকলেই শ্রান্ত তবুও উপায় নেই ফিরতে হবে। কিছুটা সিড়ি তারপর সোজা। আবার সিঁড়ি। ক্লান্ত দেহ, খাওয়াও তেমন কিছু হয়নি, তবুও চলেছি। ফিরে চল, ফিরে চল, ফিরে চল, আপন ঘরে। ফিরে চলেছি আমরা পাথরে গড়া সিঁড়ির পর সিঁড়ি ভেঙে। বসছিনা, বসলে পা ধরে যায়। ১০০, ২০০, ৩০০, জোর গলায় ঘোষণা করছি। ৫০০, ৬০০, ৭০০, নাঃ, পা আর চলেনা। ডিম ধরে এসেছে। আরও কত, আরও কত। হঠাৎ গলা থেকে বেড়িয়ে এল "দুর্গম গিরি কান্তার মরু—।"

গলা ছেড়ে সবাই গান ধরি, আর সিঁড়ি ভাঙি। বৌদি পড়েছেন পিছিয়ে "চলে আসুন" চীৎকার করে ডাকি। "আর কত।" সবে ১০০০ হল, আরও ১৫০০ হাজার সিড়ি। গলা চড়িয়ে উত্তর দি। নীচে দুধারে গভীর খাদ। একটা গাছের ডাল ভেঙে নিয়েছি। তাতে ভর করে চলেছি। টিঙ্কুকে কাঁধে চড়িয়ে গাইড এগিয়ে গেছে। দূর থেকে ডাকছে—আইয়ে। উত্তর দি—আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী। বিনয়দা আন্টুকে নিয়ে এগিয়ে গেছে। এত পরিশ্রম ওর সয়না, বোধ হয় রেগেই গেছে। দাদা দাঁড়িয়ে গেছেন বললেন—"প কাঁপছে।" বৌদি এসে আমার কাঁধ ধরেন। নন্টু বলে চলে আসুন। গলা ছেড়ে বলি—১৫০০ হাজার। বৌদি বলে "আরও ১৫০০।" পা কাঁপছে তবু চলেছি, গলা শুকিয়ে আসছে তবু চলেছি। সামনে সন্ধ্যা। ফিরতে হবে, তাই চলেছি মম চিত্তে গীতি নৃত্যে কে যে নাচে, তাতা থৈথৈ তাতা থৈ থৈ।

গলায় গান, কাঁধে বৌদির হাত, হাতে ভাঙা ডাল। সিড়ি ভাঙছি, ভাঙছি আর ভাঙছি। ২000 হাজার রথীন চীৎকার করে উঠল। 500 more? দাদা উত্তর দিলেন। বৌদির কষ্ট যেন সবচেয়ে বেশী। আর পারি না ভাই, তবুও যেতে হবে। ডালটা বৌদির হাতে দি। উনি হেসে ধরলেন। নামছি, নামছি, নীচে, ঐ ঐ নীচে সেই পরিচিত পৃথিবী।

আঃ! পৃথিবী, লাল মাটী, আঃ, দুহাতে ভরে নিলাম কিছুটা মাটী। কোথায় বাস? গাইডকে পুছি। একটু দূরে। কত দূরে? 'একটু' আবার পথ! আবার! উঃ, ভগ্ন দেহ ক্লান্ত শ্রান্ত। আবার হাঁটা। মাঠ ছেড়ে এলাম গ্রামে। দুচারটে বাড়ী চোখে পড়ল। একটী বৃদ্ধা বসেছিল, তার ভাষায় কি বলল জানিনা। গাইডকে বলি 'আর কত দূর' 'ঐ' আবার হাঁটা ১½ মাইল তখন চলে এসেছি, আর কত? 'থোরা' আরও এক মাইল কি তার কিছু বেশী পথ পার হয়ে এলাম নন্দীগ্রাম। বাস এখানেই পাওয়া যাবে। ছটায় বাস। ছাড়তে দেরী আছে একটু। ততক্ষণ বসি না! বৌদি ক্লান্ত দেহ নিয়ে বসে পড়লেন সামনের দোকানের বেঞ্চিতে।

আমি বসতে পারলাম না, সামনের ঐ মন্দিরটা। উঁচু চূড়া উঁকি দিচ্ছে। রথীনকে বলি চল দেখে আসি।

প্রকাণ্ড মন্দির। সুন্দর কারুকার্য্যময় পাথরে গড়া মন্দির। কই সরকারী বই তো এর কথা লেখেনি। তাই দর্শকও কম। মন্দিরের সামনে দুটি প্রকাণ্ড বড় পাথরের ঢাকা। তার অর্ধেকটা মাটীতে প্রোথিত। সামনের মন্দিরের পাথরের স্তম্ভে নানা রকম মূর্ত্তি খোদাই করা। নৃত্য ছন্দে আঁকা! মন্দিরটী অনেকগুলি মন্দিরের সমষ্টি কেন্দ্র। পশ্চাতে একটী প্রকাণ্ড কুণ্ড। চারিপাশে উঁচু পাঁচিল। পাঁচিলের মাথায় নানা মূর্ত্তি। মন্দিরদ্বারে কিন্তু গোপুরম্ চোখে পড়ল না। পূজারী বললে এটী ভোগনন্দীশ্বর মন্দির। চোল, পল্লব রাজাদের সময় ও শেষে রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের সময় তৈরী। তন্ময় হয়ে মন্দিরটী দেখছিলাম। সে কতক্ষণ! হঠাৎ কানে এল বাসের শব্দ। যাঃ! ছুটে চলি। দ্বারের কাছে এসেছি দেখি দাদা আসছেন—"কী, কোথায় ছিলে? বাস চলে গেল।" মুখে বিরক্তি। কি যে কর!" "বাস চলে গেল!" —না যাবে না! আমাদের জন্য গাড়ী দাঁড় করিয়েছে। এখানকার পুলিশকে বলে খুঁজিয়েছি।" তাই তো! তন্ময় হয়ে কতক্ষণ ছিলাম। সবাই চলে গেছে। দাদা আমাদের জন্য নেমে পড়েছেন। চাওলাকে আবার চা দিতে বলি। আরে ঐ তো আর একটা বাস। জয় মা কালী। চা খাওয়া হল না, চল চল। চা পড়ে রইল, বাসে উঠলাম।

———

রবীন্দ্র সাহিত্যে নারী

লীলা বিদ্যান্ত

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

মেয়েদের প্রতি কবির শ্রদ্ধা ফুটে উঠেছে তাঁর হাতে আঁকা মেয়েদের অসংখ্য ছবিতে। যোগাযোগ উপন্যাসে কুমুর বর্ণনায় কবির মুগ্ধ মনোভাব ক্ষণে ক্ষণে কি সুন্দর হয়েই না ফুটে উঠেছে। মেয়েদের এমন মহীয়ান্ করে শুধু বাংলা সাহিত্যে কেন, কোন দেশের কোন সাহিত্যেই দেখানো হয়নি। মেয়েদের রূপ বর্ণনা আমরা সাহিত্যজগতে এসে অনেক পেয়েছি, কিন্তু তার সঙ্গে কবির হাতে আঁকা ছবির তুলনাই হতে পারে না। কবির বর্ণনায় দেহ দেহাতীতের সন্ধান দিয়েছে, সীমার মাঝে যে অসীমকে কবি সর্বত্র দেখেছেন সেই অসীমকেই কবি দেখেছেন নারীর দেহের রূপের মধ্যে। আর সবাই নারীর রূপের বর্ণনা দিয়েছেন, কবির বর্ণনায় পেয়েছি অরূপের সন্ধান। কবি যেন নারীর মধ্যে দেখেছেন

"অরূপ তোমার রূপের আলোয়
হৃদয় ভরপুর।"

বাংলা দেশের সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণনায় নারীকে আমরা দেখেছি, তারাও ঠিক রূপের সীমানা পার হয়ে অরূপের রাজ্যে পা বাড়াতে পারেনি। তাদের বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্র অনেক কথা বলেছেন, অনেক যায়গা নিয়ে অনেক বর্ণনা দিয়েছেন, কিন্তু সে সমস্তই তার স্থূল রূপের বর্ণনা। স্থূলকে অতিক্রম করে সূক্ষ্ম, রূপকে অতিক্রম করে অরূপকে সেখানে আমরা খুব কমই পেয়েছি।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের নায়িকা সবাই সুন্দরী মেয়ে, প্রফুল্লর রূপ দেখে ভবানী পাঠক তাকে দস্যুদলের নেত্রী করবার জন্যে নির্বাচন করলেন। রূপ না থাকলে নেতৃত্ব করবার মত ব্যক্তিত্ব থাকে না। রূপ নারীকে ব্যক্তিত্ব দান করে।

দুর্গেশ নন্দিনীর আয়েষা ও তিলোত্তমা সুন্দরী মেয়ে। একজন পূর্ণ বিকশিত সৌন্দর্য্যে ঢলঢল, আর একজন বিকাশোন্মুখ মুকুলের মাধুর্য্যে অপরূপ। বঙ্কিমচন্দ্র বয়সভেদে নারীর এই দুই রূপের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন।

বন্য প্রকৃতির মধ্যে প্রতিপালিতা সুন্দরী নারীর আরণ্য-সৌন্দর্য্য বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনাকে মুগ্ধ করেছিল। নারীর আরণ্য সৌন্দর্য্যের বর্ণনা পেয়েছি কপালকুণ্ডলার বিপুল এলোচুলের পটভূমিতে তার অপরূপ ছবিতে।

কিন্তু এত সমস্ত সৌন্দর্য্য বর্ণনা সত্বেও আমাদের মন পূর্ণ তৃপ্তি পায়নি। রূপ সৌন্দর্য্যের জগতে আমরা নারীর সম্পূর্ণ রূপকে উপলব্ধি করতে পারিনি। আমরা সেই সম্পূর্ণতা পেলাম রবীন্দ্র-

কাব্য জগতে। এখানে নারী অপূর্ব মহিমায় উদ্ভাসিতা। সে তার রূপ নিয়ে পার হয়ে গেছে রূপের সীমানা। সে ব্যাপ্ত হয়ে গেছে ভাবরূপে, যেখানে যা কিছু সুন্দর তার মাঝে।

'শাজাহান' কবিতায় কবি লিখেছেন—সুন্দরী প্রিয়া আজ কোথায় আছে? সে আছে

"যেথা তব বিরহিনী প্রিয়া
রয়েছে মিশিয়া
প্রভাতের অরুণ আভাসে
ক্লান্ত সন্ধ্যা দিগন্তের করুণ নিশ্বাসে
পূর্ণিমায় চামেলীর দেহহীন লাবণ্য বিলাসে
ভাষার অতীত তীরে।
কাঙ্গাল নয়ন যেথা—
দ্বার হতে আসে ফিরে ফিরে।"

রবীন্দ্রনাথের নারী-রূপের বর্ণনায় আমরা যেন নারীকে সমগ্র বুঝে নিয়েছি এমন মনে করতে পারিনা, মনে হয় যেন অনেক খানি না বোঝার আকুতি, না বলার বেদনা থেকে গেল। সংস্কৃত আলংকারিক শ্রেষ্ঠ রচনার লক্ষণ বলতে গিয়ে বলেছেন তার ধ্বনি বা ব্যঞ্জনার কথা। শ্রেষ্ঠ কবি যতখানি বলেন তার চেয়ে না বলার আভাস থাকে অনেক খানি বেশী। তাই আমরা দেখি অন্য রূপকার সাহিত্যিক যেখানে রূপ বর্ণনা করেছেন, রবীন্দ্রনাথ সেখানে নারীর রূপের বিশাল ব্যঞ্জনা দেখিয়েছেন।

এই রকম ছবি দেখেছি আমরা যোগাযোগ উপন্যাসে কুমুর রূপে। কবি কিন্তু নারীকে আভরণে সুন্দর দেখেননি, সাজে সজ্জায় নারীকে তাঁর ভাল লাগেনি। সাজ এবং আভরণ রূপকে প্রকাশ না করে তাকে আচ্ছন্ন করে এই ছিল কবির মত। তাই চিরকুমার সভায় অক্ষয় বলছে পুরবালাকে—আমি ভাবলাম সাজেও যখন একে মানিয়েছে, তখন সৌন্দর্য্যে না জানি কত শোভা হবে। কবি লিখেছেন—

"বিনা সাজে সাজি দেখা দিয়েছিলে কবে
আভরণে আজি আবরণ কেন তবে?
নিজের রূপ কি নিজে চুরি করি লবে?"

আভরণ, সাজসজ্জা রূপকে চুরি করে নেয়, তাকে ঢেকে ফেলে। কবি লিখেছেন—

"তুমি অলকে কুসুম না দিয়ো
শুধু শিথিল কবরী বাঁধিয়ো
তুমি না কহিয়া কিছু—
আপনার কাজ—
নিদয়া নীরবে সাধিয়ো
কাজল বিহীন সজল নয়নে
হৃদয়-দুয়ারে ঘা দিয়ো।"

সচেষ্ট রূপ-সজ্জার চেয়ে অনায়াস মাধুরীই নারীর মধ্যে কবিকে মুগ্ধ করেছে। কবি কল্পনা বিলাসী, নারীরূপের মধ্যে কবির কল্পনা যেখানে বাধা পায়নি সেখানে কবি আপন মনের মত রূপ আপনার মধ্যে দেখতে পেয়েছেন। সাজে সজ্জায় কবির চোখে দেখা দিয়েছে অবাধ কল্পনার বাধা।

ঠিক এই কারণেই কবি অভিনয়ের বেলায় বিস্তৃত নিখুঁত বাস্তবের অনুকারী মঞ্চ-সজ্জার বিপক্ষে ছিলেন। তিনি বলেছেন এরকম বাস্তবের অনুকৃতিতে দর্শকের কল্পনা বাধা পায়। সাজ-সজ্জা দিয়ে সমস্ত সুসম্পন্ন করে তুলতে চেষ্টা করলে কল্পনার জন্যে যথেষ্ট জায়গা রাখা হয় না। তাই সাজের ত্রুটির মধ্যেই সৌন্দর্য্য দেখতে পাওয়া যায়। সজ্জার অসম্পূর্ণতার রন্ধ্র দিয়েই রূপকে ছাড়িয়ে অরূপের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত হতে বাধা পায় না।

যোগাযোগ উপন্যাসে আমরা কুমুর এমনি ভূষণহীন রূপের অপরূপ বর্ণনা পাই—এখানে মনে পড়ে যায় ভূষণ-বিহীন রূপের পূজারী সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যেও একজন ছিলেন। তিনি হলেন ভবভূতি। রামচন্দ্র সীতার রূপ মনে করে রেখেছেন কোন্‌রূপে? না—

"নিরাভরণ সুন্দর শ্রবণ পাশসৌম্যং মুখম্।"

সীতার সেই নিরাভরণ সুন্দর মুখ খানি শ্রীরামচন্দ্রের মনে পড়ছে, যেখানে তার কানে নেই কোন আভরণ, মুখে নেই প্রসাধনের প্রলেপ, সেই সহজ সুন্দর সৌম্য প্রশান্ত মুখখানি বিরহীর প্রাণকে বেদনায় উদ্বেল করে তুলেছে। সাজে এনে দেয় এক চটুল চপলতা, মুখের সৌম্যতাকে দেয় নষ্ট করে। 'যোগাযোগ' উপন্যাসে কুমুর বর্ণনা দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ—কুমু সবে স্নান করে এসেছে, তখনো জামা পরেনি, শুধু ভেতরে একটা সেমিজ। মাথার উপরে ভিজে চুল ঘিরে শাড়ীর

লাল পাড়টি। কখনো বা—কুমু কাপড় ছেড়ে একখানি সাদাসিধে কালো ডুরেশাড়ী পরে এসেছে —মনে হচ্ছে যেন ওর দেহটিকে ঘিরে কালো রেখায় ঝর্ণা কেবলি বয়ে চলেছে কিছুতেই শেষ হচ্ছে না। কুমুর কণ্ঠের অতুলনীয় নিটোল কোমলতাকে ঘিরে একটি সোনার হার। কুমুর হাতে সাবেক কালের মকর-মুখো মোটা সোনার বালা। দেখে মনে হয় যেন ওর অতুলনীয় দুখানি হাত এই ঐশ্বর্য্যকে গৌরব দান করেছে। কুমুর দুখানি হাতের বর্ণনায় কবি লিখেছেন—"সমস্ত দেহের বাণী যেন ওইখানে উদ্বেল হয়ে উঠেছে।" স্নানের ঘর থেকে কুমু বাইরে আসতে গিয়ে কি যেন দ্বিধা ভরে স্নানের ঘরের দুয়ার ধরে দাঁড়িয়ে আছে। তার একখানি হাত দরজার একটি পাল্লার উপরে —কবি তার একটি বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন—যেন একখানি অপরূপ ছবি।

কবির এই রূপ বর্ণনা, এই মুগ্ধদৃষ্টি পরম শ্রদ্ধা ও পরম বিস্ময়ের।

সাধারণ গৃহকর্মের মধ্যে নিরতা মেয়েকে কবি অসাধারণ সুন্দর বলে দেখেছেন। চিরকুমার সভায় শ্রীশ নৃপবালার যে ছবিখানি কল্পনার নেত্রে দেখে মুগ্ধ হয়েছে সেহল, নৃপবালা দুপুরের বিশ্রামের অবকাশে মাটিতে মাদুর পেতে বালিশের ওয়াড় সেলাই করছে। অবনত মুখে বসে সূঁচে সুতো পরাচ্ছে। পিঠের ওপরে ভিজে চুল মেলে দেওয়া।

নারী তার সমস্ত মনখানি এমনি সাধারণ কাজের মধ্যে মগ্ন করে দেয়। তার সেই মগ্নতার ছবিখানি কবিকে মুগ্ধ করেছে।

কবিকে তাঁর দিন শেষের শেষ সন্ধ্যায় যে ঘাটের আলো দেখাবে সেও ওই নারী। কবি তাঁর নাতনীকে বলেছেন—বিদায় নিয়ে যাবার দিনে ঘাটের আলো তুমিই আমাকে দেখাবে।

ঘাটের পারে আলো নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বাংলা দেশের একটি পরিচিত বিদায় দৃশ্য। নদীবহুল বাংলা দেশে মানুষ নৌকা করে যাওয়া-আসা করে। যখন ঘাট থেকে নৌকো ছাড়ে তখন :প্রবাসযাত্রীকে প্রিয়জনেরা আলো নিয়ে তাকে ঘাটে পৌছে দিয়ে যায়। তারপর যতক্ষণ পর্য্যন্ত নৌকো দেখতে পাওয়া যায় ততক্ষণ তারা আলো নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আর নৌকোর মধ্যেকার প্রবাসী যাত্রী যতক্ষণ ওই আলো নদীর বাঁকে অদৃশ্য হয়ে না যায়, ততক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থাকে। প্রিয়জনের বিদায় বাণী ওই আলোর মধ্যে দিয়ে তার কাছে এসে পৌছতে থাকে।

পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে যাবার দিনে নারীর ভালবাসাই মানুষকে তার দূর যাত্রার পথে পাথেয় দান করে। ভালোবাসাই মানুষের পথ চলবার পাথেয়। ভালোবাসা ছাড়া মানুষ চলবার উৎসাহ পায়না। যতদিন মানুষ পৃথিবীতে বেঁচে থাকে ততদিন নারী নানারূপে পুরুষকে আপনার স্নেহে অভিষিক্ত করে রাখে। এ জীবন থেকো বিদায় নিয়ে যাবার দিনেও নারীর ভালোবাসা, তার বিদায় অশ্রুই মানুষের জীবনের সম্বল। নারী পুরুষের জীবন ও মরণকে তার ভালোবাসা দিয়ে ধন্য করে রাখে।

কিশোর দিনের একটি মধুর স্পর্শ কবির মনে পড়ে। কোন এক কৈশোরিকা সেদিন কবির হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে বলেছিল, আমি হাত দেখতে জানি। হাত দেখে সে বলল— "তোমার স্বভাব প্রেমের লক্ষণে দীন।" কবি জানতেন এ অপবাদ একেবারেই মিথ্যা। কিন্তু তা নিয়ে কবির নালিশ ছিল না এইজন্যে যে ওই কিশোরীর হাতের স্পর্শের আনন্দের মধ্যেই কবি তাঁর সত্য পুরস্কার পেয়েছিলেন।

কবি লিখেছেন—আমি যেন কবিতার একটি পদ, খুঁজে বেড়াচ্ছি তার অন্য পদটিকে দুটি পদের মিলন হলে যেমন কাব্যের সুরটি বেজে ওঠে তেমনি নারীর সঙ্গে মিলনে জীবন কাব্যের সুরটি সুসম্পূর্ণ হয়ে বেজে ওঠে। কবির প্রেম গিয়ে মিশেছে পূজোতে। কবি লিখেছেন—

সোজা যায় বুঝা—
যারে বলে ভালোবাসা, তারে বলে পূজা।"

এই জন্যই রবীন্দ্ররচনার মধ্যে থেকে প্রেম আর পূজোকে দুটো ভাগ করা চলেনা। প্রেম আর পূজা তার মধ্যে মিশে গেছে। নারী যেন একাসনে আসন নিয়েছে ভগবানেরই সঙ্গে, কবির জাবনে।

রূপের সম্পূর্ণতা কবির মনে কামনার বদলে পূজোর মনোভাব জাগিয়ে তোলে—কবি এই কথা বলতে চেয়েছেন তাঁর 'বিজয়িনী' কবিতায়।

নারী তার পরমাশ্চর্য্য রূপ নিয়ে স্নানের জন্যে

অচ্ছোদ সরোবরের পথে চলেছে। মদন তার পথে বসে রইল তাকে কামনার শরে বিদ্ধ করবে বলে। নারী স্নান সমাপন করে নগ্ন দেহে যখন সোপানে উঠে দাঁড়াল, তখন ওই রূপের পরিপূর্ণ মহিমা দেখে মদনের তীর ও ধনু বিজয়িনীর পায়ের তলায় খসে পড়ল তার হাত থেকে।

পরিপূর্ণ রূপ, কামনার তীব্রতা দূর করে দিয়ে তার জায়গায় ভক্তির গভীরতা জাগিয়ে তোলে, কবির নিজের জীবনের এই উপলব্ধি এই কবিতায় ফুটে উঠেছে। [ক্রমশঃ

মোপাশাঁর গল্পে নারী

প্রিয়ব্রত মুখোপাধ্যায়

গী দ্য মোপাশাঁ। ছোট্ট একটি নাম। অথচ কোটি কোটি মানুষের রক্তে যা চাঞ্চল্য আনে। বুকে আনে উন্মাদনা।

মোপাশাঁ পৃথিবীর সাহিত্য-ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। তাঁর আসন বিশ্বের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ লেখকদের আদিতে না হোক একেবারে প্রথম সারিতে।

ছোট গল্পের যাদুকর মোপাশাঁ। ছোট গল্পের ক্ষেত্রে এত বড় প্রতিভা খুব কম দেশেই দেখা গিয়েছে। ১৮৭৩ সালে বিখ্যাত ফরাসী ঔপন্যাসিক গুস্তাভ ফ্লবেয়ার মোপাশাঁর মধ্যে প্রতিভার যে কুঁড়ি দেখেছিলেন তাই কালে শতদলের মত নিজেকে মেলে ধরেছিল। ফ্লবেয়ার এবং তুর্গেনিভকে আদর্শ করে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তিনি। এবং তাঁদের চেয়ে স্থায়ী কীর্তি অর্জন করেছেন বললে বোধহয় অত্যুক্তি করা হবে না।

লোকপ্রিয় মোপাশাঁ। সর্বদেশের লোকই তাঁর গল্প পড়তে ভালবাসে। মোপাশাঁর এই জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ তাঁর গল্পের বৈচিত্র্য। এত বৈচিত্র্য অন্য কোন লেখকের গল্পে খুঁজে পাওয়া কঠিন। সমালোচকরা চেখভকে মোপাশাঁর উর্ধ্বে স্থান দিলেও তাঁরা এই বিষয়ে একমত হবেন যে চেখভের গল্পে মোপাশাঁর মত বৈচিত্র্য নেই। প্রখ্যাত জোসেফ কনরাড যে বলেছেন—He is never dull,—এ-কথাটা বর্ণে বর্ণে সত্য। আর আনাতোল ফ্রাঁস মোপাশাঁকে এই বলে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন—Nothing is lacking in this robust and masterly storyteller.

মোপাশাঁর লেখনী অজস্রধারায় উৎসারিত হয়েছে নতুন নতুন বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে। মোপাশাঁ তাঁর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে মানুষের মনের গহন গভীরে নেমেছেন ডুবুরির মত আর অজস্র মণিমুক্তা উপহার দিয়েছেন তাঁর প্রিয় পাঠককে।

এত দরদ ও সহানুভূতি নিয়ে তিনি মানুষকে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন যে ভাবলে অবাক হতে হয়। আর তাঁর শিল্পচাতুর্য? তার প্রশংসা না করে পারা যায় না।

মোপাশাঁর অসংখ্য গল্পে আমরা নানা নারী-চরিত্রের সাক্ষাৎ পেয়েছি। সব ক'টি চরিত্রই আপন বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল—আপন মহিমায় মহিমান্বিত। মোপাশাঁ তাঁর স্বল্পকালীন জীবনে এত নারীচরিত্রের সাক্ষাৎ কেমন করে পেলেন ভাবতে আশ্চর্য লাগে।

বিখ্যাত ইউস্‌লেস্ বিউটি গল্পটির কথা ধরা যাক। গল্পটির কেন্দ্রচরিত্র সাতটি সন্তানের জননী ত্রিশ বৎসরের সুন্দরী যুবতী। গল্পের যখন আরম্ভ তখন সেই সুন্দরী আর সূতিকা গৃহে যেতে বীতস্পৃহ। সূতিকা গৃহে তার ঘৃণা জন্মেছে। সে তখন পৃথিবীর অন্য সাধারণ রমণীর মত বাঁচতে চায়। জীবনকে উপভোগ করতে চায়। আর আপনার দেহ-সৌন্দর্যকে বুঝি সেই শোভনাংগী সর্বাগ্রে স্থান দেয়। তাই সে তার স্বামীর কাছে অনৃতভাষণেও পশ্চাৎপদ হয় না। আর এমনি সে-কথা যাতে তার নিজেরই চরিত্র মসীলিপ্ত হয়। চার্চে খৃষ্টের মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে সে বলে—কাউন্টের (তার স্বামী) সাতটি সন্তানের মধ্যে একটি সন্তান প্রসূতিজ। তবে কে সেই সন্তান সে-কথা বলতে সে অস্বীকার করে। এই কথা সেই সুতনুকা তার সন্তানের মস্তক স্পর্শ করে বলতেও দ্বিধাবোধ করে না। তার স্বামী মানসিক যন্ত্রণায় ভোগে এরই ফলে। এইভাবে সে স্বামীকে দূরে সরিয়ে রাখতে সক্ষম হয়। তার দেহ-সৌন্দর্য

অটুট থাকে। লোকে তার রূপোপভোগ করে এবং প্রশংসা করে। অবশেষে দীর্ঘ ছয় বৎসর পরে মানসিক যন্ত্রণায় কাতর স্বামীর কাছে সে রহস্যের অবগুণ্ঠন খোলে। বলে যে সে পূর্বে মিথ্যা বলেছিল এবং এ কাজ সে করেছিল আর সন্তান গর্ভে ধারণে তার প্রবল অনীহা থেকে।

আমাদের দেশে এমন চরিত্র সম্ভব? তবে মনে রাখতে হবে যে মোপাশাঁ যাদের কথা লিখেছেন তারা সবাই ফরাসী। এই গল্পটি পড়ার পর ঐ সুন্দরী রমণীর স্বামীর মত আমাদের মনেও একই প্রশ্ন জাগে—ক্যান্ এ মাদার স্পিক্ লাইক্ দ্যাট্?

জুলি র‍্যঁমা গল্পটিতে তিনি দেখিয়েছেন একটি বিধবাকে যার দেহে জরা অথচ মনে তিনি নবীনা। (মহাভারতে বর্ণিত চ্যবন-ঋষির কথা মনে পড়ে যায় না কি?) তিনি প্রেমব্যাকুলা অথচ মুস্কিল এই যে তাঁর প্রণয়ী জুটছে না। তাই এই লোলচর্মবৃদ্ধা রমণীটি প্রতি সন্ধ্যায় তাঁর চাকর-চাকরাণীকে প্রেমিক-প্রেমিকার অভিনয় করতে বলেন। সেই প্রণয়-নিবেদনের দৃশ্য তিনি দুচোখ ভরে দেখেন আর দেখেন। তাঁর মনে পুরানো স্মৃতির উদ্রেক হয় এবং তিনি শান্তি পান। ফ্রয়েড্ যে বলেছেন (মহাভারতেও প্রায় একই কথা আছে) 'কোন কালেই নারীর প্রণয় বাসনা লুপ্ত হয় না' এ গল্প তারই একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

মাদাম জয়েল ফিফি এবং ২৯নং বেড্ গল্প দুটিতে মোপাশাঁর স্বদেশপ্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রসংগে মোপাশাঁর জীবন সম্বন্ধে কিছু বলা অন্যায় হবে না। আর এও ত এক হিসাবে সত্যি যে ছোটগল্পে লেখক নিজেকেই নতুন করে সৃষ্টি করে থাকেন।

মোপাশাঁ যখন উন্মাদ হন তখন তাঁর ধারণা হয়েছিল যে ফ্রান্সের সংগে জার্মানীর আবার যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে এবং তিনি দেশরক্ষার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেছেন।

মাদাম জয়েল ফিফি গল্প সম্পর্কে আরও একটি কথা আছে। এই গল্পটি মোপাশাঁর অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সের বহু প্রশংসিত রচনা। এই গল্পের নায়িকা এক ইহুদী বারবণিতা। চারজন প্রুশিয়ান সৈন্যের চারজন নর্মসহচরীর মধ্যে সে ছিল অন্যতমা। মাদাম জয়েল ফিফির (কোন মেয়ের নাম নয়—একজন সৈন্যকে তার সহকর্মীরা ঐ নামে ডাকত) ভাগে সে পড়েছিল। মাঃ ফিফির নিষ্ঠুর আচরণ সে সহ্য করেছিল। কেননা সেই অত্যাচার ত কেবল মাত্র দৈহিক নির্যাতন—যা সে সহ্য করতে অভ্যস্ত। কিন্তু সে সহ্য করতে পারে নি মানসিক অত্যাচার। মাঃ ফিফি যখন বলেছিল, ফ্রান্সের সব নারীই তাদের অধিকারে তখন সে প্রতিবাদ করেছিল। বলেছিল, সে নারী হিসাবে নিজেকে দাবী করে না, কেননা সে ত বেশ্যা। প্রুশিয়ানরা বেশ্যা ছাড়া ফ্রান্সের আর কাউকেই ভোগ করার উপযুক্ত নয়। এই কথা শুনে কাউন্ট তার গালে চড় মেরেছিল। দ্বিতীয় চড় মারবার আগেই সে মাঃ ফিফির ভবলীলা সাংগ করে দিয়েছিল একটি ছুরির আঘাতে এবং পলকের মধ্যে সে অন্তর্হিত হয় সেখান থেকে। এই সাহসিকাকে এক দেশ-প্রেমিক বিবাহ করেন। গল্পটির শেষ করেছেন মোপাশাঁ এইভাবে, অ্যাণ্ড হি মেড্ এ লেডী অব্ হার। গল্পটির রচনা-চাতুর্যের প্রশংসা না করে থাকা যায় না।

২৯ নং বেড্ গল্পের কেন্দ্রচরিত্র ইরমা নামে একটি নারী। ফ্রান্সের এক পদস্থ সামরিক কর্ম-চারীর প্রণয়িনী সে। ক্যাপ্টেন ইরমাকে রেখে যুদ্ধে যোগ দেয়। জার্মানদের সংগে যুদ্ধান্তে ফিরে সে শোনে যে তার প্রণয়িনী হসপিটালে ২৯ নং বেডে এবং ইরমা দুরারোগ্য যৌনরোগে আক্রান্ত। ক্যাপ্টেনের মন তা বিশ্বাস করতে চায় না। তাই সে ছোটে হসপিটালে। গিয়ে দেখে তার আদরের সুন্দরী ইরমা কংকালসার হয়ে বিছানায় আশ্রয় নিয়েছে এবং সত্যিই তার গণোরিয়া হয়েছে। ক্যাপ্টেন ঘৃণাবোধ করে। কেননা ক্যাপ্টেনের অনুপস্থিতকালে জার্মাণ সৈন্যরা ইরমার দেহ সম্ভোগ করে এবং ইরমাকে তারা পুরোপুরি অধিকার করে নেয়। ইরমা তাদের বাধা দেয় নি। এই বাধা না দেওয়ার পেছনে যে মনোভাব ছিল তাই ইরমা ব্যক্ত করে ক্যাপ্টেনকে—তোমরা জার্মানদের কি আর ক্ষতি করেছ? তোমার চেয়ে বেশী করেছি আমি—ঢের ঢের বেশী। আমি তাদের বিষিয়ে মারব বলেই নিজের দিকে তাকাই নি।" তার দুরারোগ্য যৌনব্যাধি

জামানদের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার সংকল্পের মধ্যে ইরমার দেশপ্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। ইরমার শেষ উক্তিটি অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। আর এ হেন মনোভাব বুঝি নারীর পক্ষেই সম্ভব।

দি ভেন্দেত্তা গল্পটি একটি পৃথিবী বিখ্যাত গল্প। এই গল্পে নারীর সীমাহীন নিষ্ঠুরতার প্রতি আলোকপাত করেছেন মোপাশাঁ। গল্পটি একটি বিধবাকে নিয়ে। বিধবার সবেধন নীলমণিকে নিকোলাস নামে একটি লোক খুন করে পালিয়ে যায়। বিধবা কসম খায় যে সেএই হত্যারপ্রতিশোধ নেবে। সে তার কুকুরটিকে দিনের পর দিন শিক্ষা দেয় কেমন করে আততায়ীকে হত্যা করতে হবেএবং এই পর্বের যে বিবরণ মোপাশাঁ দিয়েছেন তার তুলনা নেই। বিধবার সামনে কুকুরটি তার পুত্র-হন্তাকে টুঁটি টিপে মেরে ফেলে। আর সে তাই দেখে এবং এই ভাবে তার প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ করে বাড়ী ফিরে এসে বহুদিন পর সে সুখনিদ্রায় রাত কাটায়। নারীর কেবল কুসুম-কোমল রূপ দেখতেই আমরা সচরাচর অভ্যস্ত। তাই এহেন বজ্র-কাঠিন্য আমাদের অভিভূত করে।

Clochette গল্পে এমন একটি নারী চরিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে যার জীবনে বসন্ত একবারই এসেছিল, এবং সেই প্রথম প্রেমের কথা স্মরণ রেখেই সে তার কৌমার্য অক্ষুন্ন রেখেছিল আজীবন। এখানে মনে রাখা দরকার যে এই গল্পের নায়িকা ফরাসী দেশের।

দি ফল্স জেম্স্, দি ভেনাস্ অব্ ব্রান্জিয়া ও হাউ হি গট্ দ্য লিজিয়ন অব্ অনর—গল্প তিনটিতেই ছলনাময়ী নারীর সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। প্রথমটির নায়িকা রূপসী নারী যাকে তার স্বামী প্রথম দর্শনেই ভালবেসেছিল এবং বিবাহ করেছিল। এই নারীর অনেক গুণ—প্রধানতঃ সে সুগৃহিণী ছিল। আর তার স্বামীর মতে তার অনেকগুণের মধ্যে প্রধান দোষ থিয়েটার দেখা এবং নকল অলংকার কেনা ও পরার দিকে তার অত্যধিক ঝোঁক। সে প্রতিদিন নিত্য নতুন অলংকার দিয়ে তার শোভন তনুদেহটি সাজাত। যাই হোক, তাকে নিয়ে তার স্বামী খুব সুখেই ছিল। কিন্তু এত সুখ কি আর সহ্য হয়। মাত্র আট-দিনের রোগে ভুগে সেই সুন্দরী মারা গেল। তার স্বামীর অবস্থা তারপর থেকে শোচনীয় হয়ে উঠল। সে তার পত্নীর স্মৃতি ভুলতে পারছিল না। ক্রমশঃ সে গরীব হয়ে পড়ল। বাজারে তার অনেক দেনা। তাই নিতান্ত নিরুপায় হয়ে একদিন সে তার স্ত্রীর ঝুটো অলংকার নিয়ে দোকানে গেল। অলংকারের দোকানে মৃতা স্ত্রীর স্বামীর জন্য চমক অপেক্ষা করছিল। সে শুনল অলংকারগুলো একটাও ঝুটো নয় বরং খাঁটি জিনিষ। দাম শুনে ত তার চক্ষু চড়ক। আরও জানল এসবই একটি বিশিষ্ট ভদ্রলোকের দেওয়া উপহার। অপ্রত্যাশিত সংবাদ শুনে পত্নীবিরহ-বিধুর ভদ্রলোকটির মনের কি অবস্থা হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

দি ডায়মণ্ড নেকলেশ গল্পটি বিশেষ কারণে বাংলাদেশের পাঠকবর্গের সুপরিচিত। গরীবের বড়লোক আত্মীয় যেমন বাঞ্ছিত নয়, তেমনি বোধ-হয় সুন্দরী স্ত্রীও। এই গল্পের নায়িকা এক কনিষ্ঠ করণিক-বধু। সে সুন্দরী। (মোপাশাঁর গল্পে সুন্দরীর একটু ছড়াছড়ি নয় কি?) তার তনুদেহটি নানা আভরণে সাজাতে তার সাধ যায় কিন্তু সাধ্যে কুলায় না। সে সমাজে মেলামেশা করতে পারে না এবং সে কারণে তার ভক্তেরও অভাব। স্পষ্টতঃই সে এই কারণে অসুখী। অবশেষে একদিন বল-নৃত্যে যোগদানের সে সুযোগ পায়। কিন্তু সুযোগ পেলে হবে কি, তার যে উপযুক্ত পোষাক নেই। অগত্যা স্বামীর সঞ্চিত সমস্ত অর্থ দিয়ে তার পোষাক তৈরী হয়। অতঃপর প্রশ্ন এসে পড়ে মানানসই অলংকারের। সেই সুন্দরী মুক্তোর হার জোগাড় করে তার বান্ধবীর কাছ থেকে। পার্টিতে যোগ দেয়। সবকিছুই ভালভাবে কাটে। কিন্তু মধুরেণ সমাপয়েৎ হয় না। কেন না মুক্তোর হারটি খোয়া গেল। দোকান থেকে অবিকল ঐ রকমের একটি মুক্তোর হার কিনে সে তার বান্ধবীকে ফিরিয়ে দেয়। এখানেই সব শেষ হয় না। কেন না ঐ দম্পতিকে দশবৎসর ধরে কষ্ট করে সেই দেনা শোধ করতে হয়। এবং পরে একদিন সেই মহিলা তার বান্ধবীর কাছ থেকে জানতে পারে যে বান্ধবীর হারটি ছিল নকল।

গল্পটি অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। এর মূল বক্তব্য আমাদের মনকে গভীরভাবে নাড়া দেয়।

দি সিগনাল গল্পটিতে নারীর এক বিচিত্র মনস্তত্ত্বের উপর আলোকপাত করেছেন মোপাশাঁ। অভিজাত মহিলাটি তাঁর ঘরের জানালায় বসে লোক চলাচল দেখতে ভালবাসেন। একদিন তিনি লক্ষ্য করলেন তাঁরই ঘরের অপর দিকের জানালায় বসে একটি মেয়ে রাস্তার লোকদের ইসারা করছে। বুঝতে তাঁর কষ্ট হয়না যে মেয়েটি খারাপ। রাস্তা থেকে ঐ মেয়েটির ঘরে লোক আসত এবং আনন্দ উপভোগ করে চলে যেত। কেন জানিনা, ঐ বিপথগামিনীর মত ঐ অভিজাত মহিলার মনে ঐ প্রকারের অংগভংগী করার বাসনা জাগে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তিনি ঐ মেয়েটির মত হাসলেন, মাথা নাড়লেন। এবং এসবই তিনি করলেন জানালার ধারে বসে। মেয়েটিকে অনুকরণ করা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য তাঁর ছিল না। হয়ত বা ছিল। একটি সুন্দর যুবক তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হল। যখন ঐ সুপুরুষটি তাঁর বাড়ীর দরজায় এসে উপস্থিত তখন তিনি উপলব্ধি করলেন যে তিনি আগুন নিয়ে খেলা করছেন। কেননা এই ব্যাপার তাঁর স্বামীর কর্ণগোচর হবার সম্ভাবনা। যুবকটিকে তিনি বাড়ী থেকে বিতাড়িত করতে পারলেন না। এদিকে তাঁর স্বামীর ঘরে ফেরার সময় আসন্ন। তাই ঐ অভিজাত মহিলাটি নিজেকে সমর্পণ করতে বাধ্য হলেন। যুবকটি কৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁকে কিছু দক্ষিণা দিয়ে প্রস্থান করে।

ভদ্রমহিলাটি এই ঘটনা তাঁর এক বান্ধবীকে বলছিলেন। অবশেষে বললেন—এই অর্থ নিয়েই তাঁর ফ্যাসাদ হয়েছে এবং তিনি কি করবেন তা ভেবে পাচ্ছেন না। বান্ধবীর পরামর্শ ভিক্ষা করলেন। মহিলাটির বান্ধবী বললেন যে ঐ অর্থ দিয়ে সে যেন তার স্বামীকে কিছু উপহার দেয়।

শুধুমাত্র শেষ কথাটি দিয়েই বান্ধবীর মনের সুন্দর পরিচয় দিয়েছেন ছোটগল্পের যাদুকর।

আর এই গল্পের নায়িকার মুখ দিয়ে মোপাশাঁ যে কথাগুলো বলেছেন সেগুলো স্বাভাবিক ভাবেই মনে পড়ে—" I believe that we women have the souls of monkeys, I have been told (and it was a physician who told me) that the brain of a monkey is very like ours, Of course we must imitate some one or other, we imitate our hasbands when we love them, during the first months ofter our marriage and then our lovers, our female friends, our confessors when they are nice, We assume their ways of thought, their manners of speech, their words, their gestures, every thing."

কথাগুলো ভেবে দেখবার মত।

———

নববর্ষ প্রশস্তি

নববর্ষের প্রথম আলোকে মুখরিত মন্দির
জ্ঞান গরিমায় ধ্যান মহিমায় আনন্দ মঞ্জীর।
হৃদয় ভক্তি শ্রদ্ধা ক্রমিক—এ দেবভূমির দীপ্ত প্রেমিক,
জাগ্রত কোন চেতনা অলক প্রার্থিত বন্দীর।
নববর্ষের প্রথম প্রকাশে সুন্দর মন্দির ॥

দিকে দিকে ধ্বনি মুক্তির জাগে কাকলি কণ্ঠে সুর,
ঘুম ভাঙা পাখি উচ্ছলছল আশ্বাস ভরপুর।
প্রভাতী পথের চকিতে পন্থা, বর্ণালীময় সোনালি সন্ধ্যা
সুরসাধনার সেতারের তারে সীমাহারা গভীর।
নববর্ষের প্রথম প্রদোষে আলোকিত মন্দির ॥

কথা: শ্রীরামেন্দ্রনাথ মল্লিক   সুর: শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিক   স্বরলিপি: শ্রীযুক্তঅরুণ লেখা মল্লিক

| ম ধ - | ণ ঋ´ ঋ´ ঋ´ I ঋ´ ঋ´ ঋ´ | র্স ঋ´ স ঋ´ ণ I র্স - - | - - - - - I
ন ব ০ ব র্ ষের প্রথম আ ০ লো ০ ০ কে ০ ০ ০ ০ ০ ০
ধ ণ র্স | স - র্স ঋ´ I ণ স ণ | ধ - - - I ধ ণ ণ | ণ ণ ণ র্স I
মু খ রি ত ০ ম ন্ দি ০ ০ ০ ০ ০ র্ জ্ঞা ০ ন গ রি মা য়
ধ স ধ | ম ম ঋ - I ঋ ঋ - | স ঋ স ঋ ণ I স - - | - - - - 1
ধ্যা ০ ন ম হি ম য় আ ন ন্ দ ০ ম ০ ন্ জী ০ ০ ০ ০ ০ র্
ম ধ
স ঋ ম | স - মা - I ম ধ ধ | ণ ণ র্স - 11
আ ন ন্ দ ০ ম ন্ জী ০ ০ ০ ০ ০ র্

।। র্স র্স র্স । র্স ণ ণ ধ I ধ ম ম । ম ঋ ঋ - I স ঋ ণ । স - - - I

হৃ দ য় ভক্ তি॰ শ্রদ্ধা ক্র॰ মি ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ক্

ম

স ঋ স । ঋ ম ম ম । ম - - । - ধ ধ - I ম ধ ধ । ধ - ধ ণ I

এ ॰ ॰ দে॰ ব ভূ মি॰॰ ॰ ॰ ॰ র্ দীপ্ ত প্রে॰'ম॰

ধ ণ র্ঋ । র্স - - - । র্স র্ঋ র্ঋ । র্ঋ - র্ঋ - I র্স র্ঋ র্ম । র্ম - র্ঋ র্স I

• ॰॰ ॰॰ ॰ক জা॰গ্র ত॰কোন্ চে ত॰ না॰অ ল

র্স ণ র্স । র্স - র্ঋ র্স । ণ র্স ণ । ধ - - - I ধ ধ ণ । ণ - ণ ণ I

ক॰ ॰ প্রা র থি ত বন্॰দী ০ ০ ০ র্ ন ব ০ ব র্ ষে ন

ণ ণ ণ । ণ ণ ণ - । ণ - ধ । ণ ধ ণ র্ঋ । র্স - - । - - - - I

প্রথ ম প্রকাশে ০ হুন্০দ র০ ম ন্ দি ০ ০ ০ ০০ র্

ধ ণ ণ । ণ ণ ণ র্স I ধ র্স ধ । ম ম ঋ - I ঋ ঋ - । স ঋ স ঋ ণ I

জ্ঞা০ ন গ রি মা য় ধ্যা০ন ম হি মা য় আ ন ন্ দ ০ ম০ ন্

ম ধ

স - - । - - - - । স ঋ ম । ম - ম - । ম ধ ঋ । ণ ণ র্স - II

জী০ ০ ০ ০ ০ র্ আনন্ দ ০ ম ন্ জী০ ০ ০ ০০ র্

I ম ম র্স । র্স ণ ণ ধ । ধ ধ ম । ম ঋ ঋ ঋ । ঋ - - । ঋ - - - I

দি কে ০ দি ০ কে ০ ধ্বনি ০ মুক্ তির জা ০ ০ গে ০ ০ ০

ঋ

স ঋ ম । ম ঋ ঋ স । স ঋ স । ণ - - - । ধ ণ ণ । ণ - ণ ণ I

কা ক লি কণ্ ঠে ০ সু ০ ০ ০ ০ ০ ০ ঘুম্ ভা ঙা ০ পা খী

ণ স স । স - স স । স ঋ ঋ । ঋ স ঋ ণ । স - - । - - - - I

উ চ্ ছ ল০ছল আ০শা সে০ ভ র পু ০ ০ ০ ০ র্

স ঋ ম । ম ধ ণ ঋ । র্স - - । - - - - I

আ শা সে০ভ র পু ০ ০ ০০ ০ র্

স স ণ । ণ ধ ধ ম । ম ম ঋ । ঋ ঋ ঋ স । স ঋ ণ স । - - - - I

প্র ভা ০ তী ০ প ০ থে র ০ চ কি তে ০ পন্ ০ থা ০ ০ ০ ০

স - ঋ । ঋ - ঋ ঋ । স ঋ ম । ম ঋ ঋ - । - স ঋ ণ । স - - - I

ব র্ ণা লী ০ ম য় সোনা লি স ন্ ধ্যা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

স ঋ ম । ম ম ম - । ম ম ধ । ধ ধ ধ ধ । ধ ণ ধ । ণ - - - I

সু র॰ সাধ নার্ সে তা॰ রে র তা রে সী মা হা রা॰ ॰ •

ধ

- র্স ধ । ণ ণ র্স - । র্স র্ঋ র্ম । র্ম র্ঋ র্ঋ র্স । র্স র্ঋ ণ র্স । - - - - I

• • ॰ ॰ ॰॰॰ সী মা ০ হা • রা ॰ গণ ০ ডি • ॰ ॰ র্

ধ ণ ণ । ণ ণ ণ র্স । ধ র্স ধ । ম ম ঋ - । ঋ ঋ - । স ঋ স ঋ ঋ I

জ্ঞা• ন গরিমায় ধ্যা০ন মহি মা য় আ ন ন্ দ॰ ম॰ ন্

ম ধ

স - - । - - - - । স ঋ ম । ম - ম - । ম ধ ধ । ণ ণ র্স - II II

জী॰ • ॰॰॰র্ আনন্ দ ০ ম ন্ জী॰॰ ॰॰ ॰ র্

থাট বা মেল

অর্চনা মিত্র।

"থাট" অথবা "মেল" সঙ্গীত জগতে অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। অথচ, 'থাট'কে, সকলেই প্রায় অবজ্ঞা করে থাকেন। কারণ, এদের এতটুকুও সুর মাধুর্য্য নেই, মানুষের মনকে এরা আনন্দ দিতে পারেনা। তবুও এদের প্রয়োজন আছে। এরা না থাকলে রাগ-রাগিণীরা প্রতিনিয়ত জন্মগ্রহণ করতে পারবেনা।

সঙ্গীতশাস্ত্রী পণ্ডিত বেঙ্কটমখী, গণিতের সাহায্যে প্রতিপন্ন করেছেন যে থাট বা মেল বাহাত্তরটী হতে পারে। যদিও আধুনিক যুগে পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডের প্রচারিত দশটী থাটই প্রচলিত।

'থাট', সাতটী স্বরের সমষ্টি মাত্র। 'মেল' সংস্কৃত শব্দ। বাংলা বা হিন্দীতে 'থাট' কথাটি সর্ব্বজন বিদিত। থাটের কয়েকটি বিশেষ নিয়ম আছে। যেমন—'থাট' সম্পূর্ণ জাতের হবে। অর্থাৎ, ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, ও নিষাদ—সংক্ষেপে, সা, রে, গ, ম, প, ধ, নি এই সাতটী স্বরের প্রয়োগ, থাটে অনিবার্যরূপে হবে।

পণ্ডিত ভাতখণ্ডের প্রচারিত দশটী থাটের নাম-হল—কল্যাণ, বিলাবল, খম্বাজ, ভৈরব, ভৈরবী, তোড়ী, মারবা, কাফী, আসাবরী ও পূর্বী।

প্রতিটী থাট থেকে, অসংখ্য রাগ-রাগিণীর জন্ম হয়েছে, হচ্ছে ও হবে। এদের কয়েকটি করে সন্তানদের নাম দেওয়া হল।

১। বিলাবল—পটমঞ্জরী, দেশকার, দুর্গা, গুণকলী, নটী, ককুভা, মলুহাকেদার, ভবানী প্রভৃতি।

২। কল্যাণ—ভূপালী, হমীর, গৌড়সারং, চন্দ্রকান্ত, ছায়ানট, মালশ্রী, হিন্দোল, কেদারী শুদ্ধকল্যাণ প্রভৃতি।

৩। খম্বাজ—দেশ, তিলঙ্গ, খমবাবতী ইত্যাদি।

৪। ভৈরব—রামকেলী, কালিংড়া, প্রভাত, আহরী-ভৈরব, ঝীলফ (১) শিবমত ভৈরব, গৌরী (১) প্রভৃতি।

৫। ভৈরবী—মালকৌশ

৬। তোড়ী—গুর্জরী

৭। আসাবরী—সিন্ধুভৈরবী, জৌনপুরী, দরবারী কানাড়া, ঝীলফ (২), দেশী

৮। কাফী—পীলু, মেঘ, মিঁয়া কি মল্লার, সারং, মেঘমল্লার, শুদ্ধসারং, সামন্ত সারং, সুহা, মধ্যমাদি, সৈন্ধবী, ধনাশ্রী প্রভৃতি।

৯। মারবা—পূরিয়া, সাজগিরি, ভংখার, ললিত, বরাটী ইত্যাদি।

১০। পূর্বী—গৌরী (২), শ্রী, বাসন্তী, টংকী প্রভৃতি।

দশটী থাটের সন্তান-সন্ততি অনেক। এদের সন্তানদের মধ্যে এদের ছায়া স্পষ্টরূপে বা অস্পষ্ট-রূপে পরিলক্ষিত হয়। যেমন আসাবরীর সন্তান 'জৌনপুরী'তে, 'আসাবরীর' স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। 'দরবারী কানাড়া' শুনলেও, সে, যে 'আসা-বরীর' আমদ, বোঝা যায়।

'শ্রী' রাগে, 'পূর্বীর' ছাপ পাওয়া যায়। অনেক সময়, আবার এই নিয়মের ব্যতিক্রমও দেখা যায়। যেমন ভৈরবীতে 'কোমল রে' প্রয়োগ করা হয়, অথচ মালকৌশতে 'রে' বর্জ্জিত। ভৈরবীতে পঞ্চম অনিবার্য্য। অথচ মালকৌশে পঞ্চম নেই।

নীচে, দশটী থাটের আরোহ-অবরোহ দেওয়া হল।

কল্যাণ—সা, রে, গ, ম প, ধ, নী, সা—সা, নী, ধ, প, ম, গ, রে সা।

বিলাবল—সা, রে, গ, ম, প, ধ, নী, সা—সা, নী, ধ, প, ম, গ, রে, সা।

খম্বাজ—সা, রে, গ, ম, প, ধ, নী সা—সা, নী, ধ, প, ম, গ, রে, সা।

ভৈরব—সা রে, গ, ম, প, ধ, নী সা—সা, নী, ধ, প, ম, গ, রে সা।

ভৈরবী—সা, রে, গ, ম, প, ধ, নী, সা—সা, নী, ধ, প, ম, গ, রে, সা

আসাবরী—সা, রে, গ, ম, প, ধ, নী সা—সা, নী, ধ পা, ম, গ, রে সা।

কাফী—সা, রে, গ, ম, প, ধ, নী, সা—সা, নী, ধ, প, ম, গ, রে, সা।

মারবা—সা, রে, গ, ম, প, ধ, নী, সা—সা, নী, ধ, প, ম, গ, রে, সা।

পূর্বী—সা, রে, গ, ম প, ধ, নী, সা—সা, নী, ধ, প, ম, গ, রে, সা।

তোড়ী—সা, রে, গ, ম, প, ধ, নী, সা,—সা, নী, ধ পা, ম, গ, রে সা।

নোট—রাগ ও থাটের মধ্যে পার্থক্য আছে। যেমন—থাট মারবাতে পঞ্চম প্রয়োগ হয়, কিন্তু রাগ মারবাতে পঞ্চম বর্জ্জিত। থাট সম্পূর্ণ জাতের হয় সেই জন্যই এই ব্যবস্থা। রাগ-রাগিণী সুর-মাধুর্য্যে অতুলনীয় কিন্তু থাট, সৃষ্টির গৌরবে মহান্।

নোট—কোমল চিহ্ন—রে, গ, ধ, নী,। চড়ার—সা (ওপরের)

তীব্র মধ্যম—ম শুদ্ধ মধ্যম—ম

হাতের কথা

সুরাচার্য

একটি অদ্ভুত লোকের হাতের কথা বলছি। তিনি ছিলেন এক বর্দ্ধিষ্ণু পরিবারের সন্তান। পিতৃদেব জমিদার, এ ছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্যে আয় ভাল ছিল। কিন্তু পিতৃদেব ব্যবসা দেখলেন না। জমিদারীর আয় বসে বসে মহানন্দে খেতে লাগলেন। একটিমাত্র ছেলে, তিনি আদরের দুলাল হয়ে মানুষ হচ্ছিলেন। মাতা পিতা কেহই বিদ্যার কদর বুঝতেন না। কাজেই তাকে বিদ্যায় সুশিক্ষা দেবার জন্য যথেষ্ট আগ্রহান্বিত ছিলেন না। বিদ্যালয়ে অবশ্য ভর্ত্তি করে দেওয়া হয়েছিল, এবং গৃহে শিক্ষক রাখাও হয়েছিল। কিন্তু পড়ে কে? বাপের পয়সা ছিল, বাপেরও হুঁস ছিল-না। কাজেই ছেলে স্কুল পালাতে লাগল এবং গৃহ শিক্ষকও নিয়মিত এসে দেখে ছাত্র বাড়ী নাই, তিনি তখন বাগানে সান্ধ্যভ্রমণ করছেন। বাড়ীতে একটা বৃদ্ধ কাকাতুয়া ছিল। সে অনেক কথা বলত। বাড়ীতে শিক্ষক মহাশয় ছড়ি হাতে ঢুকলেই বলত "খোকা, মাষ্টার এসেছে, পড়বি আয়।" খোকা তখন কোথায়? উধাও। কাজেই মাষ্টার কিছুক্ষণ বসে চলে যেতেন। কয়েকবার অভিযোগ করে মাষ্টার মহাশয় বুঝেছিলেন, তাঁকে মাইনে দেওয়া হচ্ছে কেবল একবার হাজির হবার জন্যে। কাজেই বুঝতে পারছেন ঐ ছেলের বিদ্যা কতদূর গড়িয়ে ছিল।

(২) তাঁর বিদ্যা হয়নি বটে কিন্তু মাথা খাটতো অনেক ভাবে। উদ্ভাবনী শক্তি তাঁর অদ্ভুত। যতরকম দুষ্টামি সাধারণ ছেলেরা করে, তিনি তার উপর দিয়ে যেতেন। কোনদিন ঘুঘনী-ওয়ালার ঘুঘনীর টিন লুকিয়ে রেখে মজা দেখছেন, কোনদিন চীনাসাহেবের কাপড়ের গাঁঠরী লুকিয়ে রাখছেন, কোনদিন কারও টিকি কেটে রাখছেন, কোনদিন ঘুমন্ত অবস্থায় কারও নাকে অল্প নস্যি ছড়িয়ে তার হাঁচির মজা উপভোগ করছেন। কোনদিন সাহেবরা যখন টেনিস খেলায় মত্ত কয়েকটি ছুঁচো বাজী ছেড়ে দিয়ে তাদের খেলার লণ্ডভণ্ড অবস্থা উপভোগ করছেন। কালীপূজার সময় রকে বুড়োরা যখন নিশ্চিন্ত আরামে হুঁকো টানছেন তখন তাদের দিকে হাউই ছেড়ে দিচ্ছেন, ফলে তাদের মধ্যে কেউ হুঁকো হাতে উল্‌টে পড়ছেন। এই সব কত নিত্য নূতন বদমাইসি করতেন যে তার ইয়ত্তা নাই। অনেক অভিযোগ অনেকে করেছেন। ধনঞ্জয়ের ব্যবস্থাও হয়েছে অনেক। তবে তাঁর খেয়াল নিয়ে তিনি ঠিকই চলতেন।

(৩) একটু বড় হোলে তখন এই সব দুষ্টামি কমে গেল বটে, তবে অন্য খেয়াল হতে লাগল। ভালর মধ্যে একটা ছিল হাঁটা। হঠাৎ রাত্রি ৮টার সময় খেয়াল হোল শ্যামবাজার থেকে বালিগঞ্জ হেঁটে আসা যাক। সঙ্গে এক সহচরের কাঁধে হাত দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন বেড়াতে। প্রতি রাত্রে

১২টা পর্য্যন্ত তাঁর হাঁটার অভ্যাস কাজেই অসুবিধা ছিলনা। রাত্রি ১টার সময় খাবার সময়, রাত্রি ২টো পর্য্যন্ত মশারীর মধ্যে হারিকেন জেলে ডিক্‌সনারী পড়তেন। পরে শুয়ে পড়তেন। সকালে উঠতেন ১০৷৷০টা ১১টায়। তারপর চা খাওয়া, খবরের কাগজ পড়া, আড্ডা ইত্যাদি দিয়ে দুপর ২টোয় মধ্যাহ্ন ভোজন পরম পরিতোষের সহিত। একদিন তিনি এক আত্মীয়ের বাড়ীতে মধ্যাহ্ন নিদ্রায় রত। বিকাল ৪টা নাগাদ্ শুনলেন তাঁদের একজন আত্মীয় মারা গেছেন। কাজেই খাবার দাবার ফেলা যাবে। তিনি তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে বল্লেন "সে কি রে, খাবার দাবার কি ফেলতে আছে? লক্ষ্মী যে! নিয়ে আয় আমার কাছে।" তখন তিনি গোটা ৩৬ রুটী সাবাড় করলেন তরকারী সহ। চেহারায় পালোয়ান তেমন ছিলেন না, খাবার শক্তি ছিল কিন্তু অসাধারণ। তার অবশ্য আর একটি কারণ অনেক রকম নেশায় তিনি পারদর্শী ছিলেন। গঞ্জিকা সেবনই শেষ পর্য্যন্ত প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বাজী রেখে তিন টানে একটা সিগরেট শেষ করতেন, বিড়ি একটানে শেষ করতে পারতেন!

(৪) যতদিন তার মা বাবা জীবিত ছিলেন, কোন অসুবিধা ছিল না। তাঁরা গত হলে, দেখবার কেউ রইলে না, এবং যাঁরা দেখবার জন্য interest নিলেন, তাদেরও পাত্তা দিলেন না। কাজেই গৃহত্যাগী হয়ে এখানে সেখানে দিন কাটতে লাগলো, পরে শোনা যায় তিনি ফুটপাতেই অনেক রাত্রি কাটিয়েছেন এবং শেষকালে ফুটের ধারেই জীবনের সমাপ্তি ঘটে। মারা যাওয়ার সময় কিছু জমি ছিল যার দাম তখন ৫০।৬০ হাজার টাকা অথচ তিনি অদ্ভুত খেয়াল নিয়ে থেকে ভিখারীর মত জীবন সমাপ্ত করলেন। তার কোষ্ঠীটা আমার হাতে একবার এসেছিল, তাতে লেখা ছিল যে শেষ জীবন ভিখারীর মত কাটবে। অথচ কোষ্ঠী যখন তৈয়ারী হয়েছিল, তখন তিনি নেহাৎ বালক। এ ত গেল কোষ্ঠীর ফল। আমি তার হাত দেখেছিলাম, ইচ্ছে ছিল একটা ছাপ নেবার, হয়ে উঠেনি। কিন্তু যেটুকু মনে আছে, তাতে তার হাতের রেখাগুলি ছিল এইরূপ:—

(৫) জীবনীরেখা গভীর ও দীর্ঘ ছিল, একটী শাখা চন্দ্রের উচ্চস্থানেরদিকে প্রসারিত ছিল। মস্তিষ্ক রেখা মধ্যখানেদ্বিধা বিভক্ত,দুইই চন্দ্রের দিকে গড়িয়েছিল, একটী চন্দ্রেরমধ্যস্থানে, দ্বিতীয়টী নীচের দিকে কবজীর কাছাকাছি। হৃদয়রেখা কিছুটা উপরের দিকে অবস্থিত এবং শনির স্থান পর্য্যন্ত
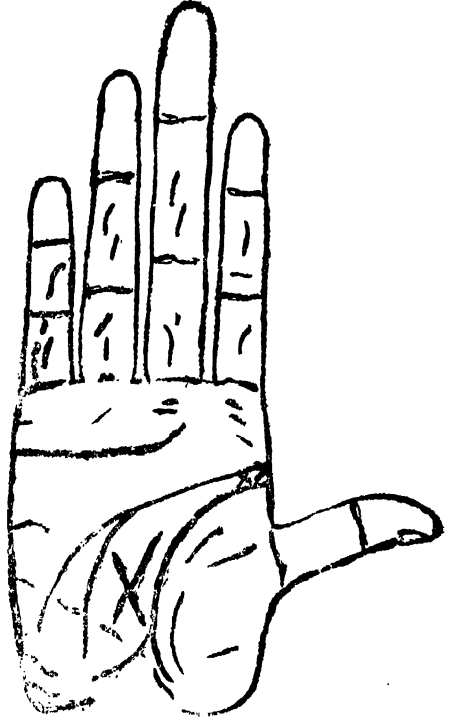
গিয়েছিল একাকী, কোন শাখা প্রশাখা না নিয়ে। রেখাটী অগভীর ও কিঞ্চিৎ কৃষ্ণাভযুক্ত। দুই হাতেই কোন ভাগ্যরেখা ছিলনা, না ছিল স্বাস্থ্যরেখা। রেখাগুলি ছিল মোটা, ধারে ধারে ক্ষীণ শাখা রেখা অস্ফুট ভাবে পড়ে ছিল। মস্তিষ্করেখার নীচে মঙ্গলের সমতল ক্ষেত্রে একটী বড় ক্রশ। পর্ব্বতের মধ্যে চন্দ্রের ক্ষেত্র সব চেয়ে উচ্চ, তাও সমান ভাবে নয়, ঢেউ খেলানো। বৃহস্পতির ক্ষেত্র অল্প পরিসরের। শনির কিঞ্চিৎ উচ্চস্থান, তাও রবির দিকে ঢলে পড়েছে। বুধ সমতল, মঙ্গল (Positive) আংশিক উচ্চ। শুক্র মোটামুটি।

(৬) আঙুলগুলি মোটা মোটা, নখগুলি চেপ্‌টা, চওড়া। মধ্যমা ও অনামিকা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘাকার। বুড়ো আঙুল মাঝারি, কিন্তু Stiff চন্দ্রের স্থান কব্‌জীর দিকে নেমে এসেছে।

(৭) হাতের তেলো শক্ত ও কর্কশ ছিল, হাতের রং নিষ্প্রভ। রেখাগুলিরও ঔজ্জ্বল্যের অভাব ছিল, সবচেয়ে আকর্ষণীয়

ছিল—মধ্যস্থানে দ্বিধাভক্ত মস্তিষ্করেখা লম্বমান চন্দ্রস্থানের উপর অবস্থিত।

(৮) চন্দ্র কল্পনার কারক, চন্দ্র কব্জীর উপর গিয়ে পড়ায় কল্পনার প্রাবল্য ঘটেছিল। তার উপর মস্তিষ্করেখা মধ্যস্থলে দ্বিধাভক্ত হওয়ায় বিচার-বিবেচনায় বাধা সৃষ্টি করিয়াছিল। উভয় শাখাই চন্দ্রের উপর পড়ায় কাল্পনিকতার আতিশয্য প্রায় সঙ্কটজনক অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছিল; বিশেষ করিয়া নীচের শাখাটি চন্দ্রের নিম্নস্থান দিয়া প্রায় কব্জীর নিকট আসিয়া পৌঁছার ফলে উদ্ভট কল্পনাধারা তার মস্তিষ্কে চলিতে থাকিত। যে সব দুষ্টামি করিয়া ফেলিতেন তা অনেক সময় অত্যাচারের আকার ধারণ করিত। কিন্তু কোনটাই Systematic নয়, নিছক খেয়ালের বশেই চলিতেন। ঠিক্ Criminal instincts ছিলনা, কারণ চুরি করা বা কাড়িয়া লওয়া এসব কিছু ছিলনা। বরং নিজের পয়সা খরচ করিয়া কোন বন্ধুকে পরিতৃপ্ত করিতে কার্পণ্য করিতেন না। কাহাকেও কায়দায় ফেলিয়া মজা উপভোগ করাই তাঁহার প্রধান আনন্দ ছিল।

(৯) হৃদয় রেখা শনির নিকট হইতে আসায় স্নেহ-মমতা কম ছিল। শনি ও চন্দ্র উভয় স্থান উচ্চ থাকায় আপন মনে অধিক সময় থাকিতেন এবং ছিন্ন ভিন্ন মলিন বেশধারী হইয়া কাটাইতেন। অথচ গা হাত পা পরিষ্কার রাখার চেষ্টা কম ছিল না। আধ্ চৌবাচ্চা জল কেবল পায়েই ঢালিতেন। ঠিক খ্যাপা পাগল ছিলেন না। কোনরূপ ভুল বকিতেন না। বরং মনের মত কয়েকটি বন্ধুর সহিত আড্ডা মারিতে ও জল্পনা-কল্পনা করিতে দেখা যাইত। সরস্বতী পূজার ভাসানের দিন এমন সং সাজিয়া রিক্সায় বসিতেন এবং ঠাকুরের সঙ্গে যাইতেন যে তার নিকট আত্মীয় বা বন্ধুবান্ধব না বলিয়া দিলে চিনিতে পারিত না। এই সব রকমারি খেয়ালই ছিল তাঁর জীবনে। গঞ্জিকা সেবন এইরূপ এক খেয়ালের মধ্যেই আসিয়াছিল। পরে গঞ্জিকাই তাঁহাকে সেবন করিয়া ফেলিল।

(১০) বৃহস্পতির ক্ষেত্র দোষযুক্ত থাকায় মান সম্ভ্রম ও প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন। ভাগ্য-রেখা উভয় হস্তে না থাকায় স্বেচ্ছাচালিত হইয়া জীবন কাটাইতেন। জীবনের কোন লক্ষ্যই ছিল না। "ভোজনং যত্র তত্র শয়নং হট্টমন্দিরে"—এই ছিল তাঁর ভাব। আয়ুরেখা হইতে একটি শাখা চন্দ্রের উপর পড়ায় এই ভবঘুরের স্বভাবটির পাকা রং ধরিয়াছিল। মস্তিষ্করেখা ও হৃদয়রেখা পরস্পর অধিক দূরবর্ত্তী হওয়ায় কোনরূপ সামাজিক বন্ধন, সংস্কার তাঁর উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের লোকের সহিত অবাধে মিশিয়া যাইতেন। বুধস্থান হইতে কর্ম্ম-কুশলতার কোন সাহায্য ছিল না। কাজেই জীবনটা একটা বিরাট ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল। মঙ্গলের ক্ষেত্রে বিরাট ক্রশটি ইহারই নির্দ্দেশক।

(১১) এই যে অদ্ভুত খেয়ালের জীবন এবং এই যে শোচনীয় পরিসমাপ্তি তা কি করতলের রেখাদির দ্বারা পরিষ্কার ভাষায় লেখা ছিল না? কিন্তু পড়ে কে? মানে কে? আর শোধরাবার চেষ্টাই বা করে কে? তাই ত সংসারে এত অপচয়, তাই এত দুঃখ। সময়ে একটি ফোঁড় দিলে অসময়ের দশটি ফোঁড়ের কাজ হয়, এটা অনেকেই বোঝেন না!

শ্রাবণ মাস কেমন যাবে?

শ্রাবণ মাসের গ্রহসংস্থান মন্দ নয়। বিশেষ করে রবি গ্রহ, বরুণ, প্রজাপতি ও বৃহস্পতি গ্রহের স্নেহদৃষ্টি পাচ্ছে, কাজেই রাজসরকারের পক্ষে অনেক বিষয়ে শুভ। বরুণ ও প্রজাপতি গ্রহ নূতন ও অভিনবত্বের সূচক। কাজেই শ্রাবণ মাসের গোড়াতেই মানবের যে অভিনব অভিজ্ঞতা চন্দ্রগ্রহে পদার্পণজনিত ঘটে এই সাফল্যের মূলে রবিগ্রহের সুষ্ঠু অবস্থা অনেকটা কারণ এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে।

বৃহস্পতির স্নেহদৃষ্টিতে এই অভিজ্ঞতা যে যথেষ্ট প্রসার লাভ করে ফলবতী হবে এ অনুমান বা আশা করা যায়। রাহুগ্রহ বিরাট পরিবর্ত্তনের কারক। শ্রাবণ মাসের গ্রহসঞ্চারের সময় রবির সহিত রাহুর ৫ম.৯ম সম্বন্ধ খুবই নিকট অংশে ছিল। কাজেই বিরাট পরিবর্ত্তনের যুগ যে এই শ্রাবণ মাসেই ঘটল তা ধরে নেওয়া যেতে পারে। আমাদের দেশে Bank Nationalisation-ও একটি বিরাট পরিবর্তন। রাহুর পরিবর্ত্তন কতকটা

হঠাৎ হয় এবং তার সঙ্গে কিছু জ্বালা বা আলোড়ন থাকে। এটা বাদ দেওয়ার উপায় নাই।

চন্দ্রের অবস্থা খুব ভাল নয়। কারণ শনির দ্বারা বৈর দৃষ্টিতে আক্রান্ত। কাজেই জনসাধারণের উচ্ছ্বাস আহ্লাদ বেশী করবার উপায় নাই। অবশ্য চন্দ্রগ্রহ স্বগৃহে এবং শুক্রের স্নেহদৃষ্টিতে। কাজেই জনসাধারণের কিছুটা সুযোগ সুবিধা আনন্দ হবেই। বুধ, শুক্র, মঙ্গল, চন্দ্র, সব গ্রহ স্বক্ষেত্রে, কাজেই শ্রাবণ মাস অনেক বিষয়ে Epoch-making শুভ সূচনা করে। শনি পুরাতন পন্থা, বার্দ্ধক্য ইত্যাদির কারক, বৃহস্পতি গুরুস্থানীয় ব্যক্তি, পাণ্ডিত্য ইত্যাদির কারক। গোচরে শনি বৃহস্পতি, দুটি গ্রহই দুর্ব্বল। কাজেই অনেক পুরাণ পন্থা ইত্যাদি কলকে পাবে না, নূতনই অধিকার করবে নূতনের আবেগে। যাঁদের বুদ্ধি তৎপুর, তাঁদেরই জয় হবে। ধীর, স্থির, বৃদ্ধ অথবা পুরাণ-পন্থী যাঁরা তাঁদের বেকায়দা চলবে। যাই হোক এখন ব্যক্তিগত মাসফলে আসা যাক্—

বৈশাখ—এই মাসে যাঁদের জন্ম তাদের শ্রাবণ মাস স-স-সি-রা দেখি। অবশ্য ১লা আগষ্ট থেকে রাহুর সঞ্চারে আ, তেজ বাড়বে। গৃহ বন্ধু মাতা এই সব সংক্রান্ত মনটা থাকবে বেশী ব্যাপৃত। বিদ্যালাভে মনঃসংযোগ করলে ভালই হয়। অধিক ব্যয়ে যে পড়ে গিয়েছিলেন এবার সেগুলি কমতে থাকবে। শত্রু চিন্তাও দূর হবে অনেকটা, অর্থাগম ভাল দেখি। ছোট-খাটো ভ্রমণাদি সম্ভব। জ্ঞাতি আত্মীয় সংক্রান্ত চিন্তা করার কিছু নেই। তাঁরা ভালই manage করবেন। পেট যাতে ভাল থাকে সেদিকে নজর রাখবেন। দুশ্চিন্তা বেশী করবেন না। ভার যা আপনার মাথায় তা তো এখন বহন করে যেতেই হবে, উপায় কি? ভাগ্য গড়তে বাধা ঠেলতে হচ্ছে ঠিকই। ৫ই আগষ্ট পর্য্যন্ত Contract, agrement Correspondence স্বামীর বা স্ত্রীর স্বাস্থ্য এই সব উদ্বেগের কারণগুলি থাকবে। তারপর বুদ্ধি ও তৎপরতার দরুণ, কাজ এগোতে পারবেন।

জ্যৈষ্ঠ—আপনাদের শ্রাবণ মাস ভালই কাটবে। দৈহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পাবেন, ভোগ-বিলাস মন্দ হবেনা। কথার জোরে অনেক জায়গায় ভাল manage করবেন। এবার কর্ম্মে ঝঞ্ঝাট এসে পড়ছে। কর্ম্মের বিস্তার হবে সত্যি, কিন্তু তড়িক-ঘড়িক্ নানাবিধ কর্ম জীবনের সম্মুখে হাজির হবে। গৃহের ব্যাপারে এবার উদ্বেগের সূচনা। ৫ই আগষ্ট পর্য্যন্ত সবকাজেই বাধা পাবার কথা, তারপর মুখের তোড়ে কাজ গুছিয়ে নিয়ে আনতে পারবেন। বন্ধুদের ব্যাপারে বেশী sensitive হবেন না। তবে সতর্ক থাকতে আপত্তি নাই।

আষাঢ়—আপনাদের শ্রাবণ মাস ভালই। কর্ম্মের ঝঞ্ঝাট থেকে এবার মুক্তি পাবেন। লটারীর যোগাযোগ এসে পড়ল। বৎসর দেড়েক ধরে Chance নিতে পারেন। চিন্তা যদি কিছু আসে ভয় খাবেন না। কারণ আপনি আছেন আপন দুর্গে। তবে অবরোধ-প্রতিরোধ মধ্যে মধ্যে হবেই। বিদ্যালাভ ও চর্চার চিন্তা এবার কমলো। জ্ঞাতি আত্মীয় প্রতিবেশী নিয়েই উদ্বেগ হাজির। গৃহ উৎপাৎ এবার কমবে। শেষের দশদিন নিজের মত চলে যাবে। নূতন বন্ধু লাভ হবে। আপনি যথার্থ বিনয়ী হলেও temper সপ্তমে উঠবে মাঝে মাঝে। কি দরকার বেকার মাথা গরম করে!

শ্রাবণ—আপনাদের শ্রাবণ মাস এক নূতন বার্ত্তা বা অধ্যায় আনছে। অর্থাগম ভালই। বাড়ীতে কড়া নেড়ে টাকা দিয়ে যেতে পারে। সহজে যে টাকা আদায় হচ্ছিল না, টপ করে এসে যেতে পারে। কিন্তু আপনার অর্থ চিন্তা ত কম দেখি না। প্রায় দেড় বৎসর টাকার উদ্বেগ অশান্তি ভোগ করতে হবে। স্বাস্থ্য ও দেহের দিকে নজর রাখবেন। accidentএর সম্মুখিন হতে পারেন। চেষ্টা করে কিছু savings করতে পারেন, তবে বেশী হবেনা, এটা নিশ্চয়। জ্ঞাতি আত্মীয় নিয়ে উদ্বেগ এবার কমতে থাকবে। বৎসর দেড়েক এ বিষয়ে ঝক্‌মারী কম গেল না। এবার বৈবাহিক কুটুম্ব নিয়ে কিছু উদ্বেগ এসে পড়ছে। বিবাহের যোগাযোগে নিজে বাদ সাধবেন না। হলে ভালই হবার কথা। যাঁদের বিবাহ হয়ে গেছে তাঁদের সন্তান লাভের যোগাযোগ দেখা যায়। যাঁদের সন্তান আছে তাঁরা তাদের জন্য কিছু সুব্যবস্থা করতে পারবেন।

ভাদ্র—আপনাদের শ্রাবণ মাসে ব্যয় বাহুল্য। কর্ম্মে সুখ সুবিধা অনেক পাবেন, তবে বেশী আতঙ্কিত থাকবেন

না। ছোটজিনিষকে বড় আকারে কল্পনা করে অনেক সময় অযথা দুশ্চিন্তা এনে ফেলবেন। এই ভাবেই এইত এখন সুরু, বৎসর দেড়েক এইরকম চলবে। কাজেই কেন খামখা worry করা। স্থির হয়ে ঠিক্ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে নিজেই দেখতে পাবেন বৃথা দুশ্চিন্তা করছেন। বিবাহিত হলে পত্নীর বা স্বামীর শক্তি যোগ্যতা, প্রবারতা বাড়বে। কাজেই তাঁকে তাঁর কর্ম্মে বাধা সৃষ্টি না করে সাহায্য করার চেষ্টা করুন। যে ভার নিজের ক্ষমতায় কুলোচ্ছেনা, তাঁর হাতে তুলে দিন। তিনি দৌড়ঝাঁপ করে ঠিক্ manage করবেন। বেশী কাজ করলে মেজাজ অনেক সময় ঠিক থাকেনা। কাজেই তাঁর মুখের ঝাঁঝটা পেলে রাগ করবেন না। অর্থের উদ্বেগ এবার আপনার কমতে থাকলো। ঘর বাড়ী-বা যান বাহন সংক্রান্ত কিছু ইচ্ছা অভিরুচি থাকলে যাঁর যা সামর্থ্য এগিয়ে যেতে পারেন। আয় আপনার ভালই চলবে।

আশ্বিন—আপনাদের শ্রাবণ মন্দ কি? ভয় ভয় ভাব, যেটা এতদিন ছিল, এবার সেটা কাটল। তবুও সতর্ক থাকবেন কারণ প্রজাপতি গ্রহ মধ্যে মধ্যে crisis সৃষ্টি করে বসেন। কর্ম্মচিন্তা এখন আপনার প্রধান। মহানন্দে কাজে ডুবে যান। নিজের সামর্থ্য শক্তি বাড়বে। আয় ভাল হবে, কাপালও খুলবে। তেজ বিক্রম অক্ষুণ্ণ থাকবে। পেট ভাল থাকবেনা। হাবিজাবী খাওয়া এড়াবার চেষ্টা করবেন। বিবাহিত যাঁরা তাঁদের পত্নীর বা স্বামীর কাজের এবং দায়িত্বের ঝামেলা কিছু কমলো এবং কমতে থাকবে। এবার তাঁরা অনেকটা শান্তিতে থাকবেন। সেই পুরাণ হাসির রেখা মুখে কতকটা দেখতে পাবেন। সন্তান-সংক্রান্ত দায়-দায়িত্ব উদ্বেগ এখনও চলবে বেশ কিছু দিন, ব্যস্ত হয়ে লাভ নেই।

কার্ত্তিক—আপনাদের শ্রাবণ মাস কাজের দিকে ভাল। আয় নিয়ে অবশ্য এবার উদ্বেগ সুরু হোল। তেজ বিক্রম বেশী দেখাবার চেষ্টা করবেন না। কারণ সেটা টেঁকবে না। পেটের দিকে নজর দিন। বেশী ভোজন করবেন না, উপদেয় লাগছে বলে। কারণ, দেখছি রসনা পরিতৃপ্তির দিকে মনটা ঝুঁকছে। বিবাহিত হলে দাম্পত্য জীবন ভালই। কিন্তু স্ত্রীর বা স্বামীর কিছু chrnoic দুর্ব্বলতা দেখা যাচ্ছে। একদিনে সারবে না নিয়মিত যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। তিনিত কিছুদিন হোল গম্ভীর হয়ে বসেই আছেন, আরো কিছুদিন গম্ভীরই থাকবেন। কারণ তাঁর মাথায় এসে পড়েছে নূতন দায়িত্ব। জ্ঞাতি-আত্মীয় সংক্রান্ত উদ্বেগ এবার কমতে থাকলো, তবে ব্যয় এখনও চলবে তাঁদের কারণে। সন্তানদের স্বাস্থ্য বিদ্যা ইত্যাদি ভাল চলবেনা। বৎসর দেড়েক যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। যাঁরা ছাত্র-ছাত্রী তাঁদের লেখাপড়ায় মনঃসংযোগ কম দেখি। সামাজিক উৎসব আনন্দেই তাদের দিনটা কাটবে বেশী। কাজেই যাঁরা উত্তম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রী তাঁরা অবহেলা করলে মনোমত ফল পাবেন না।

অগ্রহায়ণ—আপনাদের শ্রাবণ মাস ভালই। এবার কর্ম্মচিন্তা এসে পড়লো। যাঁরা ছোট এবং পিতা জীবিত, তাদের কর্ম্মচিন্তার পরিবর্ত্তে পিতৃচিন্তা এসে পড়ছে। পিতার উদ্বেগ অশান্তি দেখা যায়, এবং বৎসর দেড়েক থাকবে। স্থান পরিবর্ত্তন, গৃহ পরিবর্ত্তন, ভ্রমণাদি যোগ রয়েছে। বন্ধু-বান্ধবেরও পরিবর্ত্তন হবে। যারা ছাত্র-ছাত্রী তাদের নূতন পাঠের দিকে মন যাবে। শরীর ভালই থাকবে। নিজের দুর্গে বসে আছেন এরকম নিরাপত্তা বোধ করবেন। যাঁরা অবিবাহিত তাঁদের বিবাহ যোগ ভালই। যাঁরা বিবাহিত তাঁদের দাম্পত্য-সুখ দেখা যায়। ধর্ম্মপ্রাণ লোকের ধর্ম্মে মন পড়বে। আয়ের অবস্থা ভালই। অনেকটা দুশ্চিন্তা কাটলো এবার।

পৌষ—আপনাদের শ্রাবণ মাস মাঝারি। কর্ম্মের দুশ্চিন্তা এবার কাটলো, তেজ বিক্রমও বাড়ার দিকে। পারেন তো কিছু টাকা জমাবার চেষ্টা করুণ। কারণ savings এর যোগাযোগ দেখা যায়। ভাগ্যগঠনে বাধা আছে, উদ্বেগও এসে পড়বে। শরীরের দিকে একটু নজর রাখবেন। উপযুক্ত আহার করার চেষ্টা করুন। কোন-রূপ দুঃখ শোক তাপ পেতে পারেন। ভাল লোকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখলে, আপনার অনেক দিকে সুবিধে হতে পারে। কাজের মধ্যে ডুবে থাকুন এবং পারেনত নূতন কিছু করার চেষ্টা দেখুন।

মাঘ—আপনাদের শ্রাবণ মাস খুব সুৎসই নয়। এবার বেশী খরচের দিনে পড়ে যাচ্ছেন। বৎসর দেড়েকে রাহু ত বাবর বোয়ালের মত আপনার সঞ্চিত অর্থে থাবল মারবে। এবং সঞ্চয় না থাকলেও রেহাই নাই। ধার

করিয়ে ছেড়ে দেবে। এতদিন বাহুর জোরে যে দাপট চালাচ্ছিলেন এবার সেই বাহুকে সংযত করুন। কারণ অধিক বিক্রম খাটবে না। সদ্‌বন্ধুর সংগে যোগাযোগ রাখুন, তাতে আপনার কাজ হবে বেশী। পড়াশোনায় মন দিলে লাভ হবে, কাজ হবে। সচ্চিন্তা, ধর্ম্মচিন্তার পক্ষেও সময়টা ভাল। আয় ভালই থাকবে। অধিক টাকার জন্য ছুটবেন না, কারণ ভুল schemeয়ে ফেঁসে যেতে পারেন।

ফাল্গুন—আপনাদের শ্রাবণ মাস ভালই। এতদিন যে অত্যধিক ব্যয় হয়ে যাচ্ছিল এবার তা কমবে। নিজের তেজ প্রতাপও বাড়বে। Leadership, initiative এই সব দিক্ দিয়ে এগিয়ে যান। আপনি না চাইলেও আপনাকেই অনেকে সর্দ্দার মানবে। যারা বেশী চালাকী করবে, আপনার দু-ঘা খেলে বেঁটে হয়ে দৌড়বে। আপনার বুদ্ধি পরিষ্কার ও স্বচ্ছ দেখি। মাথা কাজ করবে ভাল। অর্থ বিষয়ক সুরাহা হতে আরো সময় লাগবে, নভেম্বর পর্য্যন্ত অপেক্ষা করুন। যাঁরা বিবাহিত তাঁদের পত্নী বা স্বামীর চিন্তা বাড়তে পারে। কারণ তাঁরা থাকবেন কতকটা hypersensitive, তাঁদের মনে স্ফূর্ত্তি আনার জন্যে তাঁদের প্রয়োজন ও মনস্তত্ত্ব বুঝে ব্যবহার করবেন।

চৈত্র—আপনাদের শ্রাবণ মাস জোরদার না হলেও মন্দ নয়। যে ঝড়ের আবহাওয়ায় ছিলেন এবার তা অনেকটা কাটলো। অবশ্য মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ চমকাবে ঠিকই। গৃহ, মাতা, বন্ধু, বান্ধব এই সব ব্যাপারে ভালই। অর্থচিন্তা ভালই আছে এবং থাকবেও। তবে উপায়ও করবেন। হঠাৎ কিছু ধনপ্রাপ্তি বা অন্য কোন রকম লাভ সম্ভব। অবিবাহিত হলে বিবাহ প্রস্তাব আর ঠেলে ফেলে দেবেন না। বিবাহিতদের সন্তানস্থান ভাল নয়। একটা কিছু ঝঞ্ঝাট লেগেই থাকবে। ধর্ম্মচিন্তার ইচ্ছা থাকলেও সুযোগ পাচ্ছেন না, বা সুযোগ থাকলে ইচ্ছা করছেন না। এর কোন্‌টা আপনি তলিয়ে দেখুন। মোটকথা এ বিষয়ে এখন অগ্রগতি নাই। শত্রুচিন্তায় লাভ কি? তাদের ক্ষতি করার চেয়ে আপনার ভয়ই তো বেশী। এবার হুড়-দাড় করে আপনার টাকা খরচের পালা সুরু হল। বৎসর দেড়েক ধরে নিতে পারেন।

প্রশ্ন বিচার ও উত্তর

১। **শ্রীকোমলেন্দু গুপ্ত**, কানপুর।

আপনার যথেষ্ট সাবধানতার প্রয়োজন অন্ততঃ ৫।৬ মাস পর্য্যন্ত। একটি পোখরাজ ৪ রতি ধারণ করুন। প্রত্যহ সকালে বা সন্ধ্যায়, বা দুইবেলা ভক্তিভরে নবগ্রহস্তোত্র পাঠ করুন। কিছুকাল ছুটী লইয়া তীর্থস্থান ঘুরে আসতে পারেন। এক কথায় আপনার দৈববলে বলীয়ান্ হওয়া বাঞ্ছনীয়। দুশ্চিন্তা করে লাভ নাই। Practical হবার চেষ্টা করবেন, কারণ আমি দেখছি আপনি Idealistic ও ভাবপ্রবণ এবং ঝোঁকের মাথায় দুঃসাহসিকতা দেখান। আপনি মানুষ ভাল, কিন্তু একরোখা, তাই অনেক সময় বিপদ এসে পড়ে। যতটা liberal হয়ে adjust করতে পারবেন ততই ভাল। সঙ্কটে মধুসূদনের পূত নাম কার্য্যকরী।

২। **এ. দত্ত**, উড়িষ্যা।

বিদ্যায় বিঘ্নবাধা আছে। সামাজিক আকর্ষণও আপনাকে পড়ালেখায় ভাল করে মন দিতে দেয় না। কিন্তু আপনার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ, আশাকরি একাগ্রতা নিয়ে এগোলে নিশ্চয়ই কতকটা কৃতকার্য্য হতে পারবেন।

ভবিষ্যতে চাকরী করতে পারবেন এবং চাকরী-জীবন গ্রহণ করলে ভালই উন্নতি করতে পারবেন।

৩। **শ্রীমতী এম্. ঘোষ**, ঢাকুরিয়া।

আগামী অক্টোবর মাস থেকে আপনার স্বামীর অর্থোপার্জ্জন যোগ ভাল, ১৯৭০ মার্চের মধ্যে নিশ্চয়ই তাঁর চাকুরী বা অর্থোপার্জ্জনের কোন কর্ম্ম ঘটিবে।

আপনার গৃহলাভ বা ভূসম্পত্তি লাভ যোগ আছে। ৩৭।৩৮ বৎসর বয়সে ঘটিতে পারে।

৪। **শ্রীকল্যাণ ব্যানার্জ্জী**, শালকিয়া, হাওড়া।

১। আপনার বিদেশ ভ্রমণ যোগ আছে।

২। আপনি উচ্চপদস্থ বা সম্মানজনক চাকুরী পাবেন। ভাল চাকুরীর যোগ দেখা যায় প্রায় দুইবৎসর বাদে।

৫। **শ্রীপ্রভাস চন্দ্র কাব্যতীর্থ**, জ্যোতির্বিনোদ শিলদা, মেদিনীপুর।

১। ধর্ম্মস্থান মধ্যম, অধিক অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর নয়। কারণ পার্থিব জীবনের আকর্ষণ বিলক্ষণ আছে। ধর্ম্মচর্চা, ধর্ম্মভাব আপনার আছে। ঐহিক সুখ আশা যত ত্যাগ করতে পারবেন ততই আধ্যাত্মিক উন্নতির রাস্তা খোলা পাবেন।

২। গোচরে শনির অবস্থান চন্দ্র হইতে ভাল থাকিলেও নৈসর্গিক আয়ুকারক রবি আক্রান্ত। কাজেই পিত্ত রক্ত, বক্ষ সংক্রান্ত দৌর্বল্য ঘটিতে পারে। ইহার পরেও শনির অবস্থান চন্দ্রাপেক্ষা ভাল থাকিবেনা। কাজেই স্বাস্থ্যাদি সম্বন্ধে যতটা সম্ভব নিয়মাদি পালন কর্ত্তব্য। অযথা দুশ্চিন্তা করবেন না। তাতে স্বাস্থ্যেরই ক্ষতি। দীর্ঘায়ু হইবার পূর্ব্বে সুস্বাস্থ্যই অধিক প্রয়োজন। কাজেই প্রাতঃ-ভ্রমণাদি সুরু করুন। আপনি লগ্ন লেখেন নাই। আপনার মেষ লগ্ন হলে পোখরাজ ধারণ করুন। বৃষলগ্ন হলে গোমেদ এবং নাভিশঙ্খ উপকার করবে।

৬। **শ্রীঅরুণকান্তি দে**। কলিকাতা ৩০।

১। আপনার চাকুরীতে দায় দায়িত্ব ও পরিশ্রম যথেষ্ট দেখিতেছি। আপনি নিজেও খাটিতে পরাঙ্মুখ নন্। চাকুরীতে আপনার নিশ্চয়ই উন্নতি হবে, তবে দেরীতে। ধৈর্য্য ধরে যান।

২। সাহিত্যিক হিসাবে দক্ষতা দেখাতে পারবেন। গোড়ায় সুযোগ সুবিধা না পেলেও হতাশ হবেন না। সাহিত্যে আপনার স্বাভাবিক অধিকার আছে দেখছি।

৭। **শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়**, কলিকাতা ৫৭

১। আপনার মেজদাদার প্রথমা কন্যার বিবাহযোগ পড়ে গেছে। চেষ্টা করে যান্।

২। ১৯৭১এর মধ্যেই বিবাহ হয়ে যাবে আশা করি। অধিক বিলম্ব হলে ১৯৭২ ধরে নিতে পারেন। কোষ্ঠী মিলিয়ে বিবাহ দেবার চেষ্টা করবেন। কারণ মেয়েটির জন্মচক্রে ভৌম দোষ আছে। মেয়েটি বুদ্ধিমতী ও সৎ-স্বভাবা। উদর পীড়া দেখা যায়। গলার রোগ মধ্যে মধ্যে দেখা দিতে পারে।

কয়েকটি কথা। প্রশ্ন অনেকে ত্রুটির বেশী করেছেন। কেহ কেহ চিঠি লেখার সময় দেননি। কেহ কেহ জন্মচক্র পরিষ্কার ভাবে লেখেননি। কেহ লগ্ন বা রাশি লিখতে ভুলে গেছেন। কেহ জন্মচক্র দশা ইত্যাদি না দিয়ে কেবল জন্মসময় ইত্যাদি দিয়েছেন যার ফলে আমাকেই সব কষতে হয়েছে। বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা বা লাহিড়ী মহাশয়ের Ephemeris হইতে কৃত জন্মচক্র দশা ইত্যাদি পাইলে তবেই আমার পক্ষে উত্তর দেওয়া সম্ভব হবে। চিঠিতে ডাকটিকিট পাঠাচ্ছেন লিখে, ডাকটিকিট দিতে কেহ কেহ ভুলে গেছেন। সেক্ষেত্রে ভারতবর্ষেই উত্তর দিয়েছি আলাদা উত্তর দিইনি। ভবিষ্যতে উত্তর মিললে সংবাদ জানালে কৃতার্থ হব।

যাঁরা ডাকটিকিট দিয়েছেন তাঁদের কাহারো কাহারো উত্তর আলাদা গেছে এবং বাকী যাচ্ছে।

আপনার ভবিষ্যৎ জানতে চান কি ?

আপনার যদি কোন গুরুতর প্রশ্ন থাকে, তার উত্তর দেবেন সুরাচার্য্য আপনার জন্মসময়, তারিখ এবং জন্মস্থান জানালে। যাঁদের জন্মচক্র, গ্রহের স্ফুট, বিংশোত্তরীর দশা যা চলছে তা জানা আছে তাঁরা এগুলি লিখে পাঠালে, শীঘ্র উত্তর দেবার সুবিধা হবে। Lahiri's Ephemenis বা বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুযায়ী গণনা করা থাকলেই পাঠাবেন। কারণ সুরাচার্য্য এই দুই গণনার উপরই নির্ভর করেন। দুইটীর বেশী প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব হবে না। এই উত্তর "ভারতবর্ষ"-এর পরের সংখ্যায় পাবেন। অবশ্য খুব বেশী অনুরোধ এসে গেলে পত্রের প্রাপ্তি ক্রম অনুযায়ী আস্তে আস্তে পরের সংখ্যাগুলিতে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা হবে। প্রশ্নের সঙ্গে এই পাতার শেষে যে 'কুপন' আছে সেটী ছিঁড়ে পাঠাতে হবে। প্রতি 'কুপন'-এ দু'টী প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হবে।

আপনি যদি প্রশ্নের উত্তর গোপনীয় ভাবে চান তাহলে ডাকটীকিট ও ঠিকানা সহ ভারতবর্ষ-এর ঠিকানায় অনুরোধ জানাবেন। সেক্ষেত্রে সুরাচার্য্য মহাশয় সরাসরি আপনাকে উত্তর দেবেন। পত্র লেখার সময় ও তারিখ পত্রে থাকলে অনেক সময় যথার্থ উত্তর দেওয়ার সহায়তা হয়। হাতের ছাপ ও পাঠাতে পারেন প্রশ্নের রহস্যোদ্ঘাটনের সহায়তা হিসাবে। দুই হাতের ছাপ প্রয়োজন। ছাপ নেবার অনেক পদ্ধতি আছে। সাধারণ কালিতে ছাপ ভাল হয়না; Stamp padink-এ চলতে পারে, যদি Stamp pad-এর সাহায্য নেন। Press ink, Cyclostyle ink অর্থাৎ ছাপার কালি সবচেয়ে ভাল। কিন্তু এই কালি হাতে লাগাতে হলে কাঠের বা রবারের রোলার প্রয়োজন। অনেকের এটা যোগাড় করা সম্ভব নাও হতে পারে। ভুষো কালি হাতে লাগিয়ে চেষ্টা করে দেখতে পারেন। পরিত্যক্ত Lip stick বাড়ীতে থাকলে তা দিয়েও হাতের সুন্দর ছাপ নেওয়া যায়। নূতন ব্যবহার করলে বৃথা খরচ বৃদ্ধি হবে এই যা। মনে রাখবেন, কেবল কৌতুক বশতঃ প্রশ্ন করবেন না। তাতে আপনার ও সুরাচার্য্যের দুজনেরই সময় নষ্ট হবে। প্রশ্ন প্রয়োজনীয় বা গুরুতর, বা জানার আগ্রহ যথেষ্ট থাকলে তবে প্রশ্নের উত্তর ভাল পাওয়া যায়। মনে মনে কল্পনা করে প্রশ্ন বার করবেন না। যে প্রশ্নের উত্তর পাবার জন্য মন ব্যাকুল সেই প্রশ্নই প্রশ্ন।

অনেকেই প্রশ্ন ঠিকমত করতে পারেন না। তাঁরা জানতে চান এক, কিন্তু জিজ্ঞাসা করেন আর এক! কাজেই উত্তর সন্তোষজনক পাওয়া যায় না। এজন্য প্রশ্নটা একটু ভাববেন এবং আসল জ্ঞাতব্য কি সেই কথাটাই খুব সরল, সহজ, স্পষ্ট এবং যথাসম্ভব ছোট্ট করে জানাবেন।

ধরুন আপনার বাজারে কিছু দেনা আছে। আপনি ভাবছেন একটা লটারী পেলে দেনাটা শোধ করে ফেলতে পারেন। কাজেই প্রশ্ন করলেন "লটারী পাব কিনা?" লটারী পাওয়া আসলে কিন্তু প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হচ্ছে ঋণ শোধ, কারণ আপনি ঋণ পীড়ায় পীড়িত। কাজেই আপনার প্রশ্ন হওয়া উচিত "দেনা শুধতে পারবো কি?" "দেনা শুধতে কত সময় লাগবে?" "দেনা সময়ে পরিশোধ না করলে কি ক্ষতি হয়ে যাবে"—এই সব। কিন্তু লটারী পাবার জন্যে মন সত্যই ব্যাকুল থাকলে তখন জিজ্ঞেস করতে পারেন লটারী পাবেন কিনা। সেই টাকা তখন কী কাজে লাগাবেন সেটা প্রশ্ন নয়।

প্রশ্নের উত্তর সন্তোষজনক ভাবে মিলে গেলে সুরাচার্য্যকে "ভারতবর্ষ"-এর ঠিকানায় জানাবেন।

॥ কুপন ॥

আষাঢ়

গ্রহ-জগৎ

হুঁশিয়ারী

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

একটি একটি করি
হিংসায় হিংসা গড়ি
চলিয়াছ কোন্ মোহে হে বৈজ্ঞানি!
প্রাণ হত্যা করিবারে
ধ্বংসমুখী সাধনায়
কেবা তোমা দিল অধিকার?
একি তবে তস্করের বিলাস ভ্রুকুটি!
না:? রাষ্ট্রীয় খাতিরে শুধু
অনিচ্ছায় ইচ্ছার প্রয়াস?
যে-সাধনা একদিন করেছিল
প্রকৃতির অতলান্ত রহস্যের
দ্বার উদ্‌ঘাটন—
লেগেছিল সার্বিক মানব কল্যাণে
কেন তারে ঠেলে দিলে
ভীষণের প্রলয় আননে!
ঘটায়োনা বুদ্ধি ভ্রম!
চেতনার মহানতায়
জেগে উঠে পুনরায়
দিয়ে যাও মঙ্গলের সাড়া
সেই বাণী শুনে হোক
মানবের মন-আত্মহারা।

———

কিশোর জগৎ

ঊর্দ্ধ গগনে বাজে মাদল—

শ্রীজ্ঞান

এই কিছুকাল আগেই এক অভূতপূর্ব্ব, অত্যাশ্চর্য্য, অবিস্মরণীয় ঘটনা যে ঘটে গেল তা তোমরা সকলেই জান! ঘটনাটি হল চন্দ্রপৃষ্ঠে মানুষের অবতরণ! যার অর্থ হচ্ছে পৃথিবীর বাইরের আর এক জগতের মাটিতে পদক্ষেপ! বিশ্বের বাইরে এই যে পদক্ষেপ এ ছিল এতদিন শুধু মানুষের কল্পনায়। এ যে কখনও বাস্তবে সম্ভব হবে তা বোধ হয় বেশীর ভাগ কেউই বিশ্বাস করত না। কিন্তু সেই অবিশ্বাস্য কাণ্ডও সংঘটিত হল এই বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে! এ যে কত বড় ব্যাপার তা তোমরা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করতে পারছ। এ হচ্ছে এক অতুলনীয় বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টার এক অসাধারণ সাফল্য! আর এই সাফল্যের শেষ শুধু কি এইখানেই? না, এ শুধু প্রথম পদক্ষেপ মাত্র! এ খুলে দিল নতুন দিগন্ত, দিল নতুন পথের সন্ধান। এর পর মানুষ ছুটে চলবে বিশ্বের বাইরে দূর হতে দূরান্তরে, গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে! এই পৃথিবীর মানুষের পদাঙ্ক পড়বে বিভিন্ন গ্রহের মাটিতে! দূর হবে নিকট। হয়ত অসীম আলোক-বর্ষের সীমাহীন দূরত্বেও গ্রহজয়ী মানুষ একদিন পাড়ি জমাবে! আজ হয়ত এ অবিশ্বাস্য মনে হলেও, সময়ে প্রমাণিত হবে যে এও সত্য হল।

যুগ যুগ ধরে যে চাঁদ পৃথিবীর মানুষকে আলো দিয়ে আসছেই শুধু নয়, নানা জল্পনা-কল্পনার সৃষ্টি করে চলেছেও, সেই অজানা রহস্যময় চাঁদ আজ মানুষের কাছে যেন ধরা পড়ে গেছে! তার রহস্য এবার ধীরে ধীরে উদ্ঘাটিত

হতে চলেছে। এর পর আরও মানুষের পদক্ষেপ পড়বে চাঁদের বুকে। পরে এই চাঁদকে মধ্যবর্তী "ষ্টেসন্" রূপে ব্যবহার করে বিশ্বের মহাকাশচারীরা দূরান্তরের গ্রহে পাড়ি দেবার চেষ্টা করবে।

চাঁদের পর মঙ্গল গ্রহের দিকেই মহাকাশ বৈজ্ঞানিকদের নজর রয়েছে। কারণ চাঁদের পর পৃথিবীর সবচেয়ে কাছের গ্রহ হল মঙ্গল এবং অনেকের ধারনায় মঙ্গলের সঙ্গে পৃথিবীর অনেক সাদৃশ্যও নাকি আছে, আর মঙ্গলগ্রহে জীবন থাকাও সম্ভব। তাই মহাকাশ বিজ্ঞানীরা মঙ্গলগ্রহের মাটিতে একদিন মানুষ নামবার চেষ্টা করবেন,তবে তার এখনও দেরী আছে। কিন্তুদেরীথাকলেও মানুষ যে মঙ্গল ও অন্যান্য গ্রহে পদক্ষেপ করবে সে বিশ্বাস আজকের এই বৈজ্ঞানিক যুগের মানুষের আছে এবং আমরা বিশ্বাস করি তোমাদের তো বটেই, আমাদের জীবদ্দশাতেই পৃথিবীর মহাকাশচারীরা মঙ্গলের মাটিতে পদক্ষেপ করবে, আর ধীরে ধীরে এই লোহিত-গ্রহের রহস্যও উদ্‌ঘাটিত হবে—জানা যাবে তার রক্ত রংয়ের কারণ, আর জীবন সেখানে আছে কি না।

একদা এই চাঁদ ও মঙ্গলকে নিয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের জল্পনা-কল্পনার অন্ত ছিল না। তাঁদের সঙ্গে সমতালে বিশ্বের কয়েকজন প্রতিভাধর সাহিত্যিকও তাঁদের অসাধারণ দূরদৃষ্টির সাহায্যে এই দুটি গ্রহকে নিয়ে সৃষ্টি করে গেছেন সার্থক সাহিত্যও! তাঁরা আজ নেই; কিন্তু তাঁরা কল্পনায় যা দেখে গেছেন ও লিখে গেছেন আজ বাস্তবে প্রায় তাই সত্য হতে চলেছে! ফরাসী সাহিত্যিক জুল ভার্ন ছিলেন অসাধারণ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন লেখক। তাঁর প্রায় শতবর্ষ আগে লেখা গ্রহান্তর গমনের গল্পের ও সাগরের নীচে সাব্‌মেরিনের চিত্তাকর্ষক কাল্পনিক কাহিনীর অনেক কিছুই আজ সম্ভব হতে চলেছে। প্রখ্যাত সাহিত্যিক এইচ, জি, ওয়েলস্‌ও তাঁর চমকপ্রদ কাল্পনিক গল্পের মধ্য দিয়ে চাঁদে যাওয়া, অন্য গ্রহের জীবের পৃথিবীতে আগমন প্রভৃতি অতি সুন্দরভাবে লিখে গেছেন। এঁরা কেউই কিন্তু বৈজ্ঞানিক ছিলেন না; কিন্তু তাঁদের কল্পনাশক্তি ও দূরদৃষ্টি এতই প্রখর ছিল যে তাঁরা বহুকাল আগেই যেন ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন মানুষ কিভাবে মহাকাশ পরিভ্রমণ করবে। জুল ভার্ন-এর লেখা থেকেই আজকের মহাকাশ বিজ্ঞানীরা প্রেরণাই শুধু লাভ করেন নি,—শোনা যায় জুল ভার্ন-এর কাল্পনিক মহাকাশযানের গঠন থেকেই নাকি আজকের মহাকাশযানের সার্থক পরিকল্পনা হয়েছে। জুল ভার্ন মহাকাশে ভারহীনতা প্রভৃতি অনেক তথ্য তাঁর লেখার মধ্যে দিয়ে প্রচার করে গেছেন। তোমরা, যারা জুল ভার্ন ও এইচ, জি, ওয়েলস্‌-এর লেখা গল্প এখনও পড়নি, তারা বইগুলি জোগাড় করে পড়ে ফেল। পড়লেই বুঝতে পারবে তাঁদের কল্পনা ও দূরদৃষ্টি কত প্রখর ছিল। এইসব পুস্তক পাঠ করলে তোমাদের কল্পনাশক্তিও বৃদ্ধি পাবে, আর দুঃসাহসিক অভিযানের প্রেরণাও লাভ করবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার বৈজ্ঞানিক সাফল্যের তুলনায় আমাদের দেশ অনেক পিছনে পড়ে আছে বটে, কিন্তু ভবিষ্যতেও যে আমাদের দেশের তরুণরা মহাকাশ ভ্রমণের দুঃসাহসিক সুযোগ লাভ করবে না, একথা বলা চলে না। কে জানে, হয়ত অদূর ভবিষ্যতে ভারতীয় তরুণদেরও ডাক পড়বে আর্মষ্ট্রং, এল্‌ড্রইন্, কলিনস্-এর মতন মহাকাশে পাড়ি জমাবার জন্য! আমি বিশ্বাস করি ভারতীয় তরুণরা সাহস, শক্তি ও বুদ্ধিতে কোনও দেশের তরুণদের চেয়ে নিকৃষ্ট নয়। শুধু সুযোগের অভাবে ও প্রকৃত শিক্ষার অভাবেই তারা পিছিয়ে পড়ছে, আর কুটিল রাজনীতি ও দলনীতির জালে তারা জড়িয়ে পড়ছে। প্রকৃত শিক্ষা, সুযোগ ও সর্বোপরি সুষ্ঠু নেতৃত্ব পেলে তারাও এগিয়ে চলতে পারবে বিশ্বের সকল প্রগতিশীল দেশগুলির সঙ্গে সমতালে।

আজ মহাকাশে যেন বাজছে দুন্দুভি, মহাকাশ যেন ডাকছে পৃথিবীর মানুষকে তার বুকের অসীম রহস্যকে উদ্‌ঘাটিত করবার জন্যে! তোমরা তরুণের দল, তোমাদের কানে কি সে ডাক পৌঁছাচ্ছে না? তোমরাও প্রস্তুত হও ভবিষ্যতের জন্যে, ধ্বনিত হোক তোমাদের কণ্ঠে বিদ্রোহী কবি নজরুলের গান:

ঊর্দ্ধ গগনে বাজে মাদল
নিম্নে উতলা ধরণী তল
অরুণ প্রাতের তরুণ দল
চল্‌রে চল্‌রে চল্—
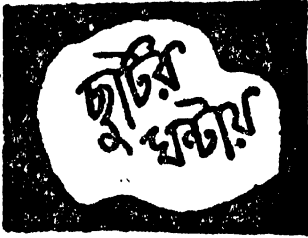
চিত্রগুপ্ত

নানা-ধরণের রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে যে কত সব বিচিত্র রহস্যময় আজব মজার কারসাজি দেখানো সম্ভব, তার কিছু কিছু হদিশ তোমাদের ইতিপূর্ব্বেই দিয়েছি। এবারেও তোমাদের তেমনি-ধরণের আরেকটি অভিনবকৌতূহলোদ্দীপক কারসাজির কথা বলছি। এবারের এই মজার খেলাটির নাম হলো—"ভূতুড়ে আলোর আজব রোশনি"। এ খেলাটির কলা-কৌশল রপ্ত করা খুব একটা কঠিন কাজ নয় এবং খেলা দেখানোর জন্ম যেসব রাসায়নিক উপকরণ জোগাড় করা দরকার, সামান্ত চেষ্টা করলেই সেগুলি তোমরা অল্প-ব্যয়ে সহরের যে কোনো বড় ওষুধের বা রাসায়নিক পদার্থের দোকানে কিনতে পাবে। কাজেই সেই সব টুকিটাকি উপকরণ সংগ্রহ করে ছুটির অবসরে বিচিত্র রহস্যময় এই "ভূতুড়ে আলোর আজব রোশনি" জ্বালিয়ে-তোলার কারসাজি দেখিয়ে তোমাদের আত্মীয়-বন্ধুদের যদি তাক্ লাগিয়ে দিতে চাও তো চটপট শিখে নাও—এ খেলার সহজ-সরল কলা-কৌশলটুকু।

ছোটবেলা থেকেই তোমরা সকলেই তো লোকের মুখে এবং গল্পের কেতাবে রহস্যময় ভৌতিক আলেয়ার আলো জলার নানান্ আজগুবী-অদ্ভুত সব কাহিনী শুনেছো আর পড়েছো। সহর থেকে দূরে গ্রামের প্রান্তে নির্জ্জন-নিরালা জলা-জঙ্গলের মাঝে রাতের অন্ধকারে হাট-বাজারের কাজকর্ম সেরে মেঠো পথ ধরে ঘরে ফিরে যাবার সময় কত লোক যে আচমকা ভূতুড়ে-ভয়ঙ্কর আলেয়ার ইতস্ততঃ সঞ্চালিত রোশনি আলো জ্বলে উঠতে দেখে ভয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছে কিম্বা চেতনা হারিয়েছে এমন অনেক কাহিনী হামেশাই শোনা যায়—কিন্তু নিজের চোখে এ সব অদ্ভুত ঘটনা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ বরাতে বড় একটা ঘটে না। কাজেই এমন অদ্ভুত কাণ্ড চোখের সুমুখে প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ যখন মিলছে তোমাদের রাসায়নিক বিজ্ঞানের দৌলতে, তখন নিজেরাই হাতে-কলমে পরখ করে জেনে রাখো—এই ভৌতিক লীলার আসল রহস্যটুকু।

তোমাদের মধ্যে যারা বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রী, তাদের সম্ভবতঃ ভালোই জানা আছে যে আর্দ্র-বায়ুর সংস্পর্শে এলে 'ফসফরাস্' নামে রাসায়নিক পদার্থ বাতাসের অক্সিজেনের সঙ্গে বাষ্পাকারে মিশে যায়। এই রাসায়নিক সংমিশ্রণের ফলে, বিজ্ঞানের রহস্যময় প্রক্রিয়ায় বাষ্পের রঙ নীলাভ-উজ্জ্বল হয়ে ওঠে…অন্ধকারের মাঝে জ্বলন্ত দেখায় আলোর রোশনির মতো। তবে সে রোশনি হয় ক্ষণস্থায়ী…মাত্র বিভিন্ন দুটি রাসায়নিক পদার্থের সংমিশ্রণ কালটুকুর জন্ম…বাতাসের অক্সিজেনের সঙ্গে মিশে বিলীন হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে নীলাভ আলোর উজ্জ্বল রোশনিও হয় অদৃশ্য। তাই বিজ্ঞানের এই বিচিত্র রহস্যময় কারসাজি-টুকুর সম্বন্ধে যাঁদের ধারণা নেই, তাঁদের কাছে এ ঘটনা অলৌকিক ব্যাপার বা ভৌতিক কাণ্ডের সামিল বলেই অনুমান হয়। আসলে কিন্তু, আলেয়ার এই নীলাভ-আলোর রোশনি জ্বলে ওঠার কারণ—'ফস্ফরেটেড্ অক্সিজেন গ্যাস' অর্থাৎ, ফস্ফরাস্ আর অক্সিজেনের বাষ্পাকারে সংমিশ্রণের রাসায়নিক প্রক্রিয়া ছাড়া অন্ত কিছু নয়। বৈজ্ঞানিক-গবেষকেরা বলেন যে পঙ্কিল জলা-জঙ্গলে যখন জৈবিক আর উদ্ভিজ্জ পদার্থগুলি ক্রমশঃ পচে ও গলে গিয়ে রূপান্তরিত হয়, তখনই সৃষ্টি হয় বিচিত্র-রহস্যময় এই 'ফস্ফরেটেড্ অক্সিজেন গ্যাস'। 'ফস্ফরাস্' বা 'ক্যালসিয়াম্ ফস্ফাইড্' পদার্থ সংগ্রহ করার অসুবিধা ঘটলে, দেওয়ালীর সময় বাজারে 'চটপটি' নামে যে বাজি পাওয়া যায়, সেই জিনিষ জলে গুলে নিলেই সহজেই 'ফস্ফরাস্' মিলবে।

কিন্তু এ সব তো বিজ্ঞানের তথ্য পরিচয়…আপাততঃ শোনো—তোমরা নিজেরা কি উপায়ে এমনি "ভূতুড়ে-আলোর আজব রোশনি" সৃষ্টি করতে পারবে, তারই হদিশ দিই।

এ-ধরণের 'ফস্‌ফরেটেড্‌ অ'ক্সিজেনের গ্যাস' জ্বালিয়ে তোলার দুটি উপায় আছে।

প্রথমটি হলো—সচরাচর রাসায়নিক গবেষণাগারে যেমন ব্যবহার হয়, এমন একটি সরু নল বসানো কাঁচের একটি 'ফ্ল্যাস্কের' (flask) বা "কাঁচ-কুপীর ভিতরে খানিকটা ফস্‌ফরাস্‌ আর জল মিশিয়ে জ্বলন্ত বাতি বা স্পিরিট-ল্যাম্পের আগুনের তাপে ফোটালে কিছুক্ষণ বাদেই ঐ নলের মুখে উত্তাপহীন বিচিত্র এক-ধরণের নীলাভ উজ্জ্বল আলোর শিখা নজরে পড়বে। তবে ঘরটি অন্ধকার থাকলেই এই শিখা দৃষ্টিগোচর হবে—দিনেরবেলা কিম্বা বিজলীবাতির আভায় এ-শিখার রোশনি সহজে চোখে দেখা যাবেনা। কাজেই ঘরে বসে "ভূতুড়ে আলোর" এই "আজব রোশনি" পরখ করে দেখবার সময়, সারা কামরাটি অন্ধকার থাকা প্রয়োজন—নাহলে এ কারসাজির মজাটুকু মোটেই জমবেনা।

এ কারসাজি দেখানোর দ্বিতীয় এবং আরো চমকপ্রদ মজার উপায় হলো—আত্মীয়-বন্ধুদের সামনে এ-কারসাজি দেখানোর আগেই বিকালে দর্শকদের দৃষ্টির অগোচরে বাড়ীর বাগানে কিম্বা কাছাকাছি কোনো মাঠে ছোট একটি গর্ত্ত খুঁড়ে, সেই গর্ত্তের ভিতরে অল্প-পরিমাণে খানিকটা "ক্যালসিয়াম ফস্‌ফাইড্‌" (Calcium Phosphide) ভরে রেখে, আলগাভাবে বালি-মাটি (বালি মেশানো মাটি) ছড়িয়ে গর্ত্তের মুখ বন্ধ করে দিতে হবে। তারপর সন্ধ্যার পর বা অন্ধকার রাতে দর্শকদের সাদরে খেলার আসরে (অর্থাৎ সেই গর্ত্তের সামনে) হাজির করে ইতিপূর্ব্বে বিকালে বালি-মাটি ছড়িয়ে ঢেকে রাখা সেই গর্ত্তের উপর খানিকটা জল ছিটিয়ে দিলেই আবছা আঁধারের মাঝে সকলেই সচকিত হয়ে লক্ষ্য করবেন যে আলেয়ার আলোর মতোই অলৌকিক অদ্ভুত 'ভূতুড়ে আলোর আজব রোশনির' নীলাভ উজ্জ্বল শিখা বিচিত্র রহস্যময় লীলায় জ্বলছে নিভছে আর এপাশে ওপাশে ছুটে বেড়াতে সুরু করে দিয়েছে।

এই হলো—"ভূতুড়ে আলোর আজব রোশনি" খেলাটির আসল রহস্য।

আগামী বারে এমনি ধরণের আরেকটি অভিনব-বিচিত্র বিজ্ঞানের খেলার পরিচয় দেবার চেষ্টা করবো।

মনোহর মৈত্র

১। সময়ের হেঁয়ালী:

গ্রীষ্মের রাত···গুমোট গরমে চোখে ঘুম আসছে না। শয্যায় চুপচাপ শুয়ে রয়েছি···পাশের দালানে দেয়ালের গায়ে টাঙানো ঘড়ির পেণ্ডুলামের অবিরাম দোলনের একঘেয়ে শব্দ ভেসে আসছে কানে—টিক্‌-টিক্‌-টিক্‌। দেয়াল-ঘড়িটি পুরোনো আমলের···প্রতি আধ-ঘণ্টা অন্তর টং করে শব্দ বাজে এবং প্রত্যেক ঘণ্টায়ও সশব্দে বেজে সবাইকে জানিয়ে দেয় সময় কত হলো। ঘুম আমার ভেঙেছে রাত বারোটা ছয় মিনিটে।···তারপর থেকে সমানে জেগেই রয়েছি···কতক্ষণ—তার কোনো হদিশ মেলে না। বলতে পারো—রাত ঠিক ক'টা বেজেছে, তার সঠিক হদিশ জানতে হলে, আরো কতক্ষণ আমায় এমনিভাবে জেগে থাকতে হবে?

২। 'কিশোর জগতের' সভ্য-সভ্যাদের রচিত ধাঁধা:

লেখা-পড়া শিখে তোমরা সবাই তো দিনে-দিনে বেশ বিদ্বান্‌ বুদ্ধিমান্‌ হয়ে উঠছো। কাজেই বুদ্ধি খাটিয়ে বলো তো দেখি কোনো একটা খাটকে খাটো করতে হলে, সেটিতে কি যোগ করা দরকার?

রচনা: চিন্তাহরণ মজুমদার (কানপুর)

৩। ময়দানে খেলার মাঠের টিকিট-ঘরের সামনে সারি দিয়ে দাঁড়ানো একরাশ লোকের মাঝে তুমিও রয়েছো - কখন তোমার সুযোগ মিলবে ভিতরেরগ্যালারীতে গিয়ে বসবার। সারির সুমুখ দিক থেকে গুণলে হয় দশম এবং পিছন দিক থেকে যদি গোণো, তাহলে হচ্ছে একাদশ। হিসাব করে বলো তো দেখি সেই সারিতে মোট কত জন দাঁড়িয়ে রয়েছেন?

মৃণাল চৌধুরী (রাঁচী)

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—বিশেষ কারণে এই সংখ্যায় গত মাসের "ধাঁধা আর হেঁয়ালির"উত্তর ও উত্তরদাতাদের নাম-ধাম প্রকাশ করা সম্ভবপর হলো না। আগামীসংখ্যায় যথারীতি সেগুলো প্রকাশিত হবে।

॥ চিত্রে চুম্বন ॥

শ্রী'শ'—

ভারতীয় চলচ্চিত্রে এবার চুম্বন দৃশ্য দেখা যাবে। আর শুধু চুম্বনই নয়, তৎসহ নগ্নদেহও দৃশ্যমান হবে। খোসলা কমিটি এই চুম্বন দৃশ্যের ও নগ্নদেহ দেখানর সপক্ষেই রিপোর্ট দিয়েছেন। সুতরাং শীঘ্রই এই সব দৃশ্যে ভারতীয় চলচ্চিত্র আরও মনোমুগ্ধকর হয়ে উঠে দর্শক-জনতাকে (এখন জনতাই তো সব) পরিতৃপ্ত করবে। খোসলা কমিটি ভারতীয় চলচ্চিত্রকে ভারতীয় সংস্কার, সংস্কৃতি ও সমাজের মোহ থেকে মুক্ত করে তাকে আরও প্রগতিশীল বা progressive করে তুললেন। "জয়, খোসলা কমিটির জয়"—বলে উর্দ্ধবাহু হয়ে নৃত্য করতে ইচ্ছা করছে এবং তৎসহ "ইনক্লাব জিন্দাবাদ" ধ্বনি (যা সব ব্যাপারেই চলে থাকে) দেবারও প্রবল বাসনা জাগছে। ধন্য এই খোসলা কমিটি, ধন্য তার বিচার ও বিবেচনা। তাঁরা ঠিকই ধরেছেন চুম্বন ও নগ্নদেহ দেখাতে না পারলে পরিচালকরা ঠিকমত তাঁদের ভাবকে প্রকাশ করতে পারেন না; অর্থাৎ এই সব দেখাতে না দেওয়া মানে পরিচালকদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা,—এবং তা করা অত্যন্ত গর্হিত কর্ম্ম, বিশেষ করে এই গণতন্ত্রের যুগে। সুতরাং ('ইনক্লাব' ধ্বনি সহ) আজকের এই গণতন্ত্রকে সেলাম জানিয়ে খোসলা কমিটি অনুমতি দিয়েছেন যে পরিচালকরা তাঁদের ভাবপ্রকাশের সহায়করূপে চুম্বন ও নগ্নদেহ চলচ্চিত্রে প্রদর্শন করতে পারবেন। আর আপামর দর্শক সাধারণ, বিশেষ করে সামনের শ্রেণীর দর্শকজনতা বিপুল উল্লাসে 'শিটি' বা শিষ, করতালি, চেয়ার চাপড়ান (উল্লাস বেশী হলে কয়েকটি চেয়ার ভাঙতেও পারে) প্রভৃতি কয়েকটি ক্রিয়াকাণ্ডের মাধ্যমে দৃশ্যগুলি যে তাঁদের ভাল লাগছে বোঝাতে চাইবেন। আর পিছনের শ্রেণীর দর্শক সাধারণের মধ্যে উপবিষ্ট সকন্যা পিতা, ভগিনীসহ ভ্রাতা ও

পুত্রসহ মাতা প্রভৃতি পরিবারের সকলেই নিশ্চয়ই এই সব বাস্তব দৃশ্য (এখনকার বস্তুতান্ত্রিক জগতে নাকি বাস্তব সব কিছুই বহুমূল্য) অতি আগ্রহ-আনন্দে উপভোগ করবেন, আর হয়ত পরস্পরের গা টেপাটেপি করে দৃশ্যগুলির তারিফও করবেন। আ-হা-হা—এই সব দৃশ্য যেন আমি মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছি! রূপালী পর্দ্দায় যা দেখান হবে তা ভাবতে পারলেও লিখতে কলম সরল না (সেন্সরের ভয় এখনও আছে তো, কিছুদিন পরে আর অবশ্য থাকবে না) তাই শুধু প্রেক্ষাগৃহের একটু বর্ণনা দিলাম।

ইতিমধ্যে খোস্‌লা কমিটির এই যুগান্তকারী (নগ্নযুগের সূচনা হচ্ছে কি না!) অভিমতকে নানা জনে নানা মতে অভিহিত করছেন। কয়েকজন প্রখ্যাত পরিচালক এটিকে স্বাগত জানিয়েছেন। নামকরা নায়করাও একে সোল্লাসে অভিনন্দিত করেছেন (চুম্বন দৃশ্যে নায়িকাকে চুম্বনের অধিকার তো তাঁদেরই, আর নগ্নদৃশ্যে তাঁদের নগ্ন হবার বোধহয় দরকার হবে না; কারণ দর্শকরা কুমারদের নগ্নদেহ দেখতে যে বিশেষ আগ্রহী হবেন বলে তো মনে হয় না। সে ক্ষেত্রেও সেই নায়িকাদের নিয়েই টানাটানি। সুতরাং নায়কদের উল্লসিত হওয়াই তো উচিত)। তবে কয়েকটি নামী নায়িকা এর বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করে ফেলেছেন! (এর জন্যে তাঁদের "প্রতিক্রিয়াশীল" বলে ধিক্কার দেব কি না ভাবছি)। সংবাদপত্রে চিঠি-পত্র লিখেও কিছু কিছু বে-আক্কেলে লোক এই অপরূপ রিপোর্টের বিপক্ষতাচরণ করছেন। (এই সব ভারতীয় সংস্কৃতি, শোভনতা ও শালিনতার প্রতি এখনও বিশ্বাসী ব্যক্তিদের "পুঁজিবাদী", মানে সংস্কারের পুঁজি আগলে রয়েছেন এইরকম একটা কিছু বলে আর কি চিহ্নিত করে শাস্তিবিধান করা উচিত নয় কি?)

যাই হোক, আমরা এখন ভারতীয়, বিশেষ করে বোম্বাই চিত্র-নির্ম্মাতাদের পরবর্ত্তী চিত্রগুলির অপেক্ষায় দিন গুন্‌ছি! এতদিন সেন্সরের কাঁচি এড়িয়ে তাঁদের চিত্রগুলি প্রায় অর্দ্ধনগ্ন হয়ে এসেছে আর জড়াজড়িও প্রায় চুম্বনের কাছাকাছি চলে এসেছে। এবার যখন অনুমতি পাওয়া গেল তখন বোম্বাই চিত্র চুম্বন ও নগ্নদৃশ্য সম্বলিত হয়ে যে কি অপরূপ রূপে রূপায়িত হয়ে উঠবে তাই ভেবে আমরা আনন্দে, উল্লাসে, উৎসাহ, উদ্দীপনায় শিহরিত হচ্ছি, আর ভাবছি ধন্য আমরা, এই মহাপ্রগতির যুগে জন্মগ্রহণ করতে পেরেছি বলে। আমাদের সন্তান সন্ততিগণও ধন্য,—এই প্রগতির যুগে জন্ম-গ্রহণ করতে পেরেছে বলেই তো এই সব মহান্ দৃশ্য চিনাবাদাম চিবোতে চিবোতে ও আইসক্রীমের আস্বাদ নিতে নিতে বন্ধু ও বান্ধবীসহ দেখতে পারবে!

আজ শুধু দুঃখ হয় আমাদের স্বর্গত পূর্ব্বসূরীদের জন্য! তাঁরা আগে জন্মে ফেলেছিলেন বলেই না এই সব মহান্ দৃশ্য দর্শন থেকে বঞ্চিত হলেন! খোস্‌লা কমিটির এই রিপোর্টের কথা তাঁরা যদি জানতে পেরে থাকেন (তাঁদের পক্ষে জানা খুবই সম্ভব; কারণ তাঁরা তো হাওয়ায় খবর পান!) তাহলে তাঁদের অনেকেই হয়ত কবরের মধ্যেও ওলট্‌-পালট্‌ খাচ্ছেন, আর যাঁরা ভস্মীভূত হয়েছেন তাঁরা হাওয়ায় হাহাকার করে ফিরছেন! তবে মনে হয় এ সব দৃশ্য দেখার লোভ তাঁরা সম্বরণ করতে পারবেন না। চর্ম্মচক্ষে দেখার সুযোগ না পেলেও, তাঁদের ও-জগতের চক্ষে ভারতীয় চিত্রের এই "প্রগতিশীল" দৃশ্য সমূহের রসাস্বাদনের জন্য তাঁরা নিশ্চয়ই প্রেক্ষা-গৃহে ভীড় জমাবেন। (তাঁদের তো আর টিকিট লাগবেনা। আর "সিট"-এও তাঁরা বসবেন না, আর অদৃশ্য বলে তাঁদের ভীড়ে আমাদের অসুবিধাও হবে না।) তবে একটা ভয় এই যে এই সব দৃশ্য দেখার আনন্দের আতিশয্যে তাঁরা আবার প্রগতিশীল ছোকরাদের স্কন্ধে ভর করে না বসেন। তাহলেই কিন্তু প্রেক্ষাগৃহে ভূতের নৃত্য আরম্ভ হয়ে যাবে। খোস্‌লা কমিটির রিপোর্ট সেই নৃত্যেরই আয়োজন করছেন বলে মনে হয়, অতএব সাধু সাবধান!

* * * * *

ফ্রাসোঁয়া ক্রুফোঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ

শ্রীমতী চয়নিকা সেন

প্রঃ। আমেরিকার চলচ্চিত্রের উৎকর্ষতার সম্বন্ধে আপনি চিত্র পরিচালক হিসাবে কি অভিমত পোষণ করেন?

উঃ। আমেরিকার পরিচালকদের তুলনায় অন্যরা তো বটেই, এমন কি আমি নিজেও বেশী বিচার-বুদ্ধি শক্তি সম্পন্ন বলে মনে করি। মার্কিনী চিত্রের বর্বরতা এবং স্থূলতা নকল করা আমাদের উচিত নয়। আমাদের মধ্যে মেলভিল ঐ পথ অনুসরণ করে শিল্পের ক্ষেত্র থেকে বিপথগামী হয়েছেন।

চলচ্চিত্রকে জনগণমনোরঞ্জনকারী শিল্প হিসাবে স্বীকার করি কারণ আমরা সকলেই আমেরিকার চলচ্চিত্রের উপর নির্ভর করেই প্রতিষ্ঠা পেয়েছি। আমার মনে হয় আমরা হিচককের (Hitchcock) আদর্শ অনুসরণ করতে পারি। অল্প সংখ্যক জনপ্রিয় প্রয়োজকের মধ্যে হিচকক অন্যতম। আমার বক্তব্যকে আরও একটু স্পষ্ট করে উদাহরণ স্বরূপ বলতে পারি Resnais তাঁর বক্তব্যকে অযথা ভারাক্রান্ত করেন। "Vertigo" অথবা "Marienbad" এ কার্য্যকরী উদ্ভাবনী শক্তি অথবা মানসিক উত্তেজনার অভাব পরিলক্ষিত হয়।

আজকাল লোকে হঠাৎ কোন ছবি দেখতে যায় না। তারা সেই সব ছবি দেখতে যায়, যার কথা তারা খুব শুনেছে। এই নির্বাচিত দর্শকদের ৩ শি. ৬ পে. টিকিটের প্রবেশ মূল্যের উপর নির্ভর করে ৫০,০০০ হাজার পাউণ্ড খরচ করে তোলা ছবির খরচ তোলা সম্ভব পর কি? যদিও-হঠাৎ-ঢুকে পড়া দর্শক ও সিনেমা নিয়মিত দেখতে অভ্যস্ত দর্শককেও আমাদের ধর্তব্যের মধ্যে আনা উচিত। একটি চিত্রের কথা ধরা যাক্Les Bonnes Femmes, এই ছবির চরিত্রগুলির সাদৃশ্য যুক্ত ব্যক্তিরা অতি অবশ্যই এই ছবিটি দেখতে যাবে। কিন্তু সঠিক বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে তারা বিষয়টিকে বিচার করতে বা রসোপলব্ধি করতে পারবে না। Chabrol-এর যেতে পারে। একই ছবির একই ঘটনা বিষয়বস্তু বা কলা কৌশলের দিক দিয়ে অন্যভাবে দর্শকদের নিকট উপস্থাপিত করা যেতে পারে। অপরাধ সংঘটিত না করেও শঙ্কাকুল মুহূর্ত সৃষ্টি করা যায়। দর্শককুলকে বেশ আবিষ্ট করে Chabrol তাঁর বক্তব্য রাখতে পারতেন।

Les Bonnes Femmes ছবিটি ধরা যাক্ যদি হিচকক্ করতেন, তা'হলে কি কি পরিবর্তন আমরা আশা করতাম?

প্রথমতঃ তিনি ছবিটির এই রকম একটা বিরাট গম্ভীর নাম না দিয়ে সাদামাটা একটা নাম রাখতেন। যেমন—The shop girl vanishes,

ছবি আরম্ভ হোল। একদিন কাঁচা সোনা ঝরানো সুন্দর সকালে দোকানের প্রথম মেয়েটি দোকানে এলো না। কিন্তু তা'কে বাড়ীতেও পাওয়া গেল না। মেয়েটি যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। Surprise,

যখন দ্বিতীয় মেয়েটি এলো তা'কে মোটর সাইকেলের আরোহী শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যার চেষ্টা করছে। Horror, যখন তৃতীয় মেয়েটি এলো তখন কেবলমাত্র উৎকণ্ঠা, উত্তেজনা। দর্শক তখন জানে ঐ মোটর সাইকেলের আরোহীই হত্যাকারী, মেয়েটি নয়।

জঙ্গলের মধ্য দিয়ে প্রেমিক-প্রেমিকার কিছু দূরে গমন, গাছের ছায়ায়, লেকের ধারে প্রেমালাপ ইত্যাদি।

সর্বশেষে যখন চতুর্থ মেয়েটি এলো, তখন তা'কে ঠিক সময় রক্ষা করল তার প্রেমিকপ্রবর এবং হত্যাকারী নিজের মোটর সাইকেলেই নিজের মৃত্যুকে ডেকে আনলো। Chabrol'কে সমালোচনা করছি না। আমার মতে এটাই তাঁর শ্রেষ্ঠ শিল্প-কীর্ত্তি, তবু আরও ভালো করে গল্প বললে আরও দর্শক মনোরঞ্জনে সক্ষম হোত; এটাই আমার

ছবি করাটাকে ফুটো নৌকার সঙ্গে তুলনা করা চলে। সব সময় মনে হচ্ছে এই ডুবে যাবে। ন্যুয়েল ভাগ পরিচালকদের আবির্ভাব বেশ একটা প্রতিযোগিতার মনোভাব ও হলিউডের সঙ্গে তুলনামূলক সমালোচনার সুযোগ এনে দিয়েছে। এই মুহূর্তে এই মন্দার বাজারে কোন ছবি ফ্লপ করার চাইতে ছবি না করা ভালো বলে মনে করি।

Orson Welles কখনও ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি নিয়ে ছবি করেন না। এবং নিজগুণে তিনি আমাদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা আকর্ষণ করেন। তিনি প্রতি চার বৎসর অন্তর The Trialএর মত ছবি আমাদের উপহার দেন। অন্ততঃপক্ষে বিশ্ববিখ্যাত ১৫ জন অভিনেতা অভিনেত্রী Orson Welles-এর ছবিতে কাজ করতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করবে। Resnais-ও একই পর্য্যায়ে একদিন উন্নীত হবেন বলে মনে করি। Raoul Levyকে দর্শকরা Orson Wellesকে দিয়ে Marco Polo পরিচালনা করাবার জন্য অনুরোধ করলে তিনি বলেছিলেন—ও'কে দিয়ে আর কিছু হবে না। এখন Raoul Levy তাঁকে রোজ অনুরোধ করছেন Christian Jaque যা আরম্ভ করেছিলেন সেই Marco Polo, ওয়েলস্ যেন শেষ করেন।

আমেরিকানদের একটা জিনিস অনুকরণযোগ্য। তাদের প্রত্যেকটি বিভাগে তারা জানে কি ভাবে প্রাণচাঞ্চল্য আনতে হয়। চিত্রনাট্যগুলি সাধারণতঃ খুবই উঁচু স্তরের হয়। আমি সম্প্রতি Philip Yordan-এর লেখা একটি চিত্রনাট্য পেয়েছি। সবকিছু সেখানে আছে, এমনকি পরিহাসটুকু পর্য্যন্ত। একটি পংক্তিও তার পরিবর্ত্তনের দরকার নেই। যে কেউ চিত্রনাট্য ফেলে ছবি তুলতে আরম্ভ করতে পারে। আমেরিকার সিনেমাগুলি সব চেয়ে ভালো এবং সবচেয়ে খারাপের সংমিশ্রণে তৈরী।

পরিশেষে আমি বলব ছবি নির্মাণ ব্যাপারে প্রত্যেকেরই নিজ নিজ স্বাধীনতা থাকা উচিত।

অবশ্য একথাও স্মরণ রাখা দরকার সকলে আবার এ ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতার যোগ্যও নয়। অনেক নূতন চিত্র নির্মাতাদের মধ্যে অভিজ্ঞতার পরিপূর্ণতা আসেনি এবং তারা অনেক ভুল করে বসে। অনেক ছবির সম্পাদনা দেখি অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ। এর কারণ আত্মতুষ্টি, বিচার শক্তির অভাব, অলসতা। ভালো করে লক্ষ্য করে দেখলে দেখা যাবে যে ফ্রান্সে ভাল চিত্র কাহিনীকারের এবং প্রযোজকের বেশ অভাব আছে। সুতরাং একজনকে একাকী বহু দায়িত্ব ও সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, যেটা আমেরিকার পরিচালকদের ক্ষেত্রে হতে হয় না। পরিশেষে প্রত্যেক দর্শকের রুচি-জ্ঞান এখন বেড়েছে এবং তাদের জন্য আরও ভালো, আরও উন্নত, আরও আকর্ষণকারী ছবি করাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

* * * * * *

অনিবার্য্য কারণবশতঃ "সাগরপারের ধ্রুপদী চলচ্চিত্র" বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশ করা সম্ভব হইল না। আগামী সংখ্যা হইতে পুনরায় যথারীতি প্রকাশ করা হইবে।

সম্পাদক—পট ও পীঠ

প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন—নীপা চৌধুরী

জীতু চৌধুরী—ডায়মণ্ড হারবার রোড—কলিকাতা

এক সংবাদে দেখলাম উত্তমকুমারের ৭৩-৭৪ সাল বাবদ এক লক্ষ নব্বই হাজার সাতশো পনের টাকা আয়কর বাকি পড়েছে। এই যদি বাকি হয় উনি দিয়েছেন কত?

০ ইনকামট্যাক্স অফিসারই বলতে পারেন।

* * *

ভোলানাথ ঘোষ—জাষ্টিশ দ্বারকানাথ রোড কলিকাতা

পরিণীতায় সৌমিত্রর পাশে মৌসুমী একেবারেই বেমানান নয় কি?

০ অশোককুমারের পাশে সুচিত্রা সেন অথবা বৈজয়ন্তীমালা যদি বেমানান না হয়ে থাকে তবে সৌমিত্র-মৌসুমীই বা বেমানান হবে কেন?

* * *

কল্পনা হালদার—বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট—কলিকাতা

কমল মিত্র যাত্রার আসরে নামলেন কেন?

০ তাঁর প্রয়োজনে।

* * *

শিশির ভট্টাচার্য্য—নারকেলডাঙা নর্থ রোড, কলিকাতা

গুপী গাইন বাঘা বাইন বার্লিন ফিল্ম ফেষ্টিভ্যালে কোন পুরস্কার পেলনা কেন?

০ পুরস্কার পাওয়ার যোগ্যতা নেই বলেই।

* * *

কল্যাণ রায়—আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড—কলিকাতা

"সজারুর কাঁটা" "ভিজে বেড়াল" "দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন" প্রভৃতি ছবিগুলির খবর কি?

০ কোন খবর নেই।

* * *

গীতা ব্যানার্জি—মহিম হালদার ষ্ট্রীট—কলিকাতা

ভগবানের ঠিকানাটা কি বলতে পারেন?

০ পারি, কিন্তু বলবনা। আজকের মানুষ যেভাবে জানলে তাঁকে তাড়িয়ে দিয়ে তাঁর সিংহাসন দখল করবার জন্যে ভয়ানক রকমের একটা যুদ্ধ বেধে যাবে। আমি শান্তিপ্রিয় মানুষ, ভগবানের ঠিকানা বলে দিয়ে খামোখা যুদ্ধ বাধাই কেন? মাপ করবেন।

* * *

রতন ব্যানার্জি—সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট—কলিকাতা

অগ্রগামী পরিচালিত বিলম্বিত লয়ের নায়িকা দীপা চ্যাটার্জি সৌমিত্র চ্যাটার্জির স্ত্রী নাকি?

০ উত্তমকুমারের নায়িকা সৌমিত্র চ্যাটার্জির স্ত্রী? আপনার কল্পনার দৌড় আছে বলতে হবে। না উনি, অন্য দীপা চ্যাটার্জি।

* * *

আনোয়ারা খান—রমনা ঢাকা

আমি চলচ্চিত্রে অভিনয় করতে চাই। আমার বয়স বাইশ, উচ্চতা ৫ফুট ৩ইঞ্চি। ইন্টারমিডিয়েট অবধি পড়েছি। সাম্প্রতিক কালের তোলা একটা ছবি পাঠালাম। আপনার কাছ থেকে আশাব্যঞ্জক উত্তর পেলে কলকাতায় যাবার ব্যবস্থা করব।

০ এ ব্যাপারে আমি আপনাকে কোন সাহায্য করতে পারব না। তাছাড়া চলচ্চিত্রে অভিনয় করবার জন্যে আপনার এখানে আসার দরকারটাই বা কি? ঢাকাতেই তো বিস্তর ষ্টুডিয়ো আছে শুনেছি। ওখানেই চেষ্টা করুন না কেন!

* * *

পত্রলেখা ব্যানার্জি—লেক ভিউ রোড—কলিকাতা

গতবারের আমার প্রশ্নের 'নটী বিনোদিনী'র ওপর হতে ইনভার্টেড কোমা তুলে নেওয়া হল কেন? কলকাতার পেশাদার মঞ্চে যে কটি নাটক অভিনীত হচ্ছে তাদের নাম দিয়ে প্রশ্নটা করেছিলাম। "দিলী আতর" জিনিষটা কি? ওটা দিলীপের আতর না দিশী আতর? না

০ কমপোজিটার মশাই, এ প্রশ্নের উত্তরটা দয়া করে আপনিই দিন।

* * *

নারায়ণ চন্দ্র নন্দী—রামগড় কলোনি যাদবপুর কলিকাতা

এইবারের সংখ্যায় কয়েকটি সত্যসত্যই ভালো প্রবন্ধের জন্যে আপনাদের ধন্যবাদ।

০ সত্যি বলছেন, না ঠাট্টা করছেন? মজাদার কেচ্ছাকাহিনী ছাড়া এখন আর অন্য কিছু লোকে পড়ে বলে তো আমার মনে হয় না। অবশ্য গরম গরম রাজনৈতিক বুলি থাকলে অন্য কথা। যাই হোক ভালো লেগেছে জেনে আমরা সুখী হয়েছি এই কথা জেনে যে ভালো জিনিষের ভালো পাঠক এখনও আমাদের দেশে আছেন।

* * *

লালমোহন সাধুখাঁ—কাশীপুর রোড—কলিকাতা

উত্তমকুমারের জীবনী নিয়েই 'The Guru' নাকি?

০ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধাটা খুবই প্রয়োজন। কিছু লোকসংখ্যা না কমলে এ দুনিয়ায় থাকা আর সম্ভব নয়।

অমল মিত্র—দেশপ্রিয় পার্ক ওয়েষ্ট—কলিকাতা

সন্ধ্যা রায় এবারে বম্বে যাচ্ছেন শক্তি সামন্তর পরবর্তী ছবিতে শাম্মী কাপুরের বিপরীতে অভিনয় করতে। বাংলা দেশের নায়িকাদের বম্বে চালান করে দিয়ে বোম্বাই মার্কা শিম্মী, সায়রাবানুকে এদেশে আনানো ভালো হচ্ছে কি?

০ বাংলাদেশের শিল্পীদের দরকার পয়সা, বোম্বাইয়ের শিল্পীদের দরকার ইজ্জৎ। নিজেদের মধ্যে আপসে অদলবদল করছেন ওঁরা। যতদিন না আবার বেশ কিছু নতুন শিল্পী তৈরী হচ্ছে ততদিন আমাদের চুপ করে থাকা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

* * *

সুবোধ নন্দী—পাটওয়ার বাগান ষ্ট্রীট—কলিকাতা

সায়রাবানু নাকি পোলিও রোগে আক্রান্ত হয়েছেন?

০ ঠিক জানিনা। শুনেছি চিকিৎসার জন্যে দিলীপকুমার ওকে নিয়ে বিদেশে গেছেন।

* * *

শান্তিশেখর ব্যানার্জি—পোড়ামাতলা—নবদ্বীপ

একাধিক পুরুষের সম্ভোগে নারী পতিতা হয় যদি, তবে অহল্যা, কুন্তী, তারা, দ্রৌপদী, মন্দোদরী প্রভৃতি নারীরা সতী বলে পুজনীয়া হন কেন?

০ পুরুষ সম্ভোগে নারী কোনদিনই পতিতা হয় না। অর্থের বিনিময়ে যৌবন বিক্রি করাটা যাদের পেশা তাদেরই পতিতারূপে গণ্য করা হয়ে থাকে। তাছাড়া অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা ও মন্দোদরী—এই পাঁচজন পুরাণ-কথিত নারী বিশেষ অবস্থায় ও বিশেষ কারণে ঐরূপ হতে বাধ্য হয়েছিলেন (দেবতুল্য গুরুজনের আদেশে)। ওঁদের সঙ্গে বাস্তবের সাধারণ নারীর তুলনা করলে ভুল করা হবে।

শ্রীপতি সরকার—সুরেশ সরকার রোড—কলিকাতা

অতি ব্যস্ত নায়িকা মাধবীর হাতে নাকি মাত্র একখানি ছবি? এর চাইতে মানে মানে Retire করলে মানও বাঁচতো পেটও ভরতো। নয়কি?

০ Retire করবার কোন প্রশ্ন আসে না শিল্পীর জীবনে। আলোর পরে অন্ধকার, অন্ধকারের পর আবার আলো এইটাই মানব জীবনের চিরন্তর সত্য।

* * *

শংকর বসু—আশুতোষ মুখার্জি রোড—কলিকাতা

অঞ্জনা ভৌমিকের সঙ্গে ....এর সম্পর্ক কি?

০ ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে কোন প্রশ্ন করবেন না। এই ধরণের কোন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয় না।

* * *

মানস মজুমদার—মনোমোহন পাণ্ডে রোড, কলিকাতা

চলচ্চিত্র সংরক্ষণ সমিতি ইত্যাদি রকমারি প্রতিষ্ঠান করে নিজেদের মধ্যে মারামারি করার চেয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদি তিন চারটে চিত্রগৃহ নির্মাণ করেন যেখানে যে সকল প্রযোজক কালোটাকা দিতে না পেরে চিত্রের মুক্তির ব্যবস্থা করতে পারছেন না তাদের ছবিগুলি সেখানে দেখান হয় তবে সবদিকেই সুরাহা হয় নাকি?

● আপনার প্রস্তাবটা খুবই যুক্তিপূর্ণ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে এভাবেও বিশেষ সুফল হবে বলে মনে হয় না। কারণ প্রদর্শক, পরিবেশক, প্রযোজক, শিল্পী,টেকনিসিয়ান্ ইত্যাদি চলচ্চিত্রের সঙ্গে জড়িত প্রতিটি বিভাগেই এত বেশী দুর্নীতি ইদানিং ছড়িয়ে গেছে যে এই শিল্পকে বাঁচাতে গেলে একমাত্র রাস্তা হচ্ছে চলচ্চিত্র শিল্পকে জাতীয়করণ করা। অন্যথায় বাঙলা দেশের চলচ্চিত্র শিল্পের ভবিষ্যতে আর কোন চিহ্নই থাকবে না।

*   *   *

তাপসী সরকার—লালা লাজপৎ রায় সরণি—কলিকাতা

কাগজে দেখলাম মহিলা শিল্পী মহল দুঃস্থ মহিলা শিল্পীদের আশ্রয় দেবার উদ্দেশ্যে গরচা লেনে একখানি বাড়ি কিনেছেন। ইতিমধ্যেই কিছু কিছু শিল্পীকে সেখানে আশ্রয়ও দেওয়া হয়েছে। কারুর কাছ হতে কোনরকম ভিক্ষে না নিয়ে এইভাবে একটি মহৎ প্রচেষ্টাকে তাঁরা যে সাফল্যমণ্ডিত করতে পেরেছেন তার জন্য মহিলা শিল্পী মহলকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনি আমার হয়ে তাঁদের কাছে এই খবরটা দয়া করে পৌঁছে দেবেন কি ?

● নিশ্চয়ই দেব।

*   *   *   *   *

তারি ছবি আঁকি

শ্রীপথিক

মনের দুয়ার খুলি কে এলো আবার ?
দেখিতে পাইনা তবু ভাবি অনিবার।
কতদিন কত মুখ এসেছিল দ্বারে,
আকুল হৃদয় নিয়ে ডেকেছে বারেবারে।
ঝরেছে আঁখিলোর সকরুণ নয়নে,
নেমেছিল বিষাদ সন্ধ্যা তার জীবনে।
সাড়া তবু দিই নাই তার আহ্বানে
রুদ্ধ ঘরে ছিনু সেথা সদা অলসশয়নে।
ভেবেছিনু প্রয়োজনে কি জানি কি চাবে
হয়তো বা নিঃস্ব করে সব নিয়ে যাবে।
শেষে ফিরে গেছে অকারণে অবেলায়।
দিয়েছি বিদায় তারে হেলায় খেলায়।

আজ সে কায়া নয় ছায়া হয়ে এসেছে।
সে শূন্য হৃদয় আজ আমারে দিয়েছে।
মনে ভাবি কেবা সে কার-কথা ভাবি ?
ফিরায়ে দিয়েছি যারে তবু কেন—
তারি ছবি আঁকি ?

——

চন্দ্র বিজয়—

মার্কিন মহাকাশচারী ত্রয়ী নেল্ আর্মষ্ট্রং, এড্উইন্ অল্ড্রিন্ ও মাইকেল কলিনস্ চন্দ্র জয় করে অর্থাৎ চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করে ফিরে এসে এক ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন! চন্দ্রপৃষ্ঠে মানুষের এই অবতরণ বিশ্ব-ইতিহাসের এক বিশেষ ঘটনা-রূপে চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। চন্দ্রের মাটিতে এর আগে আর কখনও কোনও মানুষের পদস্পর্শ হয়নি, এই প্রথম মনুষ্যপদচিহ্নে লাঞ্ছিত হল চন্দ্রের অস্পৃষ্ট মৃত্তিকা!

আবহমানকাল ধরে মানুষ চাঁদকে দেখে আসছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা দেখেছেন দূরবিক্ষণের সাহায্যে, আর সাধারণ মানুষ দেখে আসছে কল্পনায় নানা রং মিশিয়ে। পুরাণে, কিংবদন্তীতে, রূপকথায়, কবিতায়, সাহিত্যে সর্বত্রই এই চাঁদকে নিয়ে কত কথাই লেখা হয়েছে। বিজ্ঞানীরা চাঁদের সত্যকে উদ্ঘাটিত করবার চেষ্টা করে এসেছেন, আর কবিরা কল্পনার কুহেলিকা সৃষ্টি করে চাঁদকে আরও অস্পষ্ট, আরও কুহেলিকাময় করে তুলেছেন। আবার জুল্ ভার্ণ ও এইচ, জি, ওয়েলস্ তাঁদের সার্থক সাহিত্য সাধনার মধ্য দিয়ে চাঁদ ও অন্যান্য গ্রহের বিজ্ঞান-ভিত্তিক বর্ণনা দিয়ে পাঠক-মনোরঞ্জন করে গেছেন।

আজ সেই চাঁদ মানুষের কাছে ধরা পড়ে গেছে। এরপর জ্যোতির্বিজ্ঞান আরও এগিয়ে চলবে। মানুষ চন্দ্র জয়েই সন্তুষ্ট থাকবে না। সে ধাপে ধাপে আরও এগিয়ে চলবে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে! চন্দ্রবিজয় তার প্রথম পদক্ষেপ মাত্র। অদূর ভবিষ্যতে মঙ্গল গ্রহের লাল মাটিতে হয়ত মানুষের পদক্ষেপ হবে! আর্মষ্ট্রং, অল্ড্রিন্, কলিন্স্-এর মতন আরও কত মহাকাশচারী বীরেরা বিঘ্ন-বিপদ পার হয়ে,দুঃখ-দহন তুচ্ছ করে বিজ্ঞানের জয়ধ্বজা উড়িয়ে ভবিষ্যতে গ্রহান্তরে যাত্রা করবেন। তাঁদের আমরা এখন থেকেই জানিয়ে রাখছি আমাদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন, আর এই সঙ্গে জানাই এই তিন মার্কিন মহাকাশচারী বীরকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন ও অভিবাদন।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন—

ভারতের চতুর্থ রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সমাপ্ত হয়েছে এবং রাষ্ট্রপতি রূপে শ্রীভি, ভি, গিরি নির্বাচিত হয়ে শপথ গ্রহণ করেছেন। এইবারকার এই রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিশেষ উৎসাহ, উত্তেজনা ও উদ্বেগ লক্ষ্য করা গেছে। ইতিপূর্বেকার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের আবহাওয়া শান্তই থাকত এবং সাধারণ লোকে এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিত না। এর পূর্বের তিন রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ ও ডঃ জাকির হুসেন-এর নির্বাচন সাধারণভাবেই সমাধা হয়েছিল, কিন্তু এইবারকার নির্বাচন এক বিশেষ রূপ গ্রহণ করে কংগ্রেস দলের মধ্যে দুটি পক্ষ হয়ে যাওয়ায়। এক পক্ষ ভূতপূর্ব্ব উপরাষ্ট্রপতি ও নির্দ্দল প্রার্থী শ্রী ভি, ভি, গিরিকে এবং অপর দল লোকসভার স্পীকার ও কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী শ্রীসঞ্জীব রেড্ডিকে সমর্থন করেন। প্রধানমন্ত্রী প্রমুখ কংগ্রেসের অনেকেই শ্রীগিরির পক্ষ সমর্থন করায় এবং বামপন্থী দলগুলিও শ্রীগিরিকে ভোট দেওয়ায়, শ্রীগিরি দ্বিতীয় প্রেফারেন্স ভোটের গণনায় শ্রীসঞ্জীব রেড্ডীকে পরাজিত করে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হন।

আমরা নব-নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি শ্রীভি, ভি, গিরিকে তাঁর এই নির্বাচনে জয়লাভের জন্য অভিনন্দন ও অভিবাদন জানাচ্ছি এবং তাঁর সুদীর্ঘ জীবন ও স্বাস্থ্য কামনা করছি।

কংগ্রেসে কোন্দল—

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস, য'র ঐতিহ্য অতুলনীয় এবং অতীতে যার ত্যাগে ও শৌর্য্যে, নেতৃত্বে ও পরিকল্পনায় ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করেছে, সেই ঐতিহ্যপূর্ণ ঐতিহাসিক কংগ্রেস বিশ বৎসর ক্ষমতাভোগের পর, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে অন্তর্দ্বন্দ্বে এমন স্তরে এসে পড়েছিল যে, কংগ্রেস দল ভাগ হয়ে যাবার পর্য্যায়ে পড়েছিল। অবশ্য বিবদমান দুই পক্ষের শেষ মুহূর্তে কিছু শুভবুদ্ধির উদয় হওয়ায় শেষ পর্য্যন্ত এই দল ভাগ ঘটেনি। কিন্তু এই অপ্রীতিকর সংঘর্ষ যে তিক্ততা রেখে গেল তা সহজে দূর হবে বলে মনে হয়না এবং হয়ত তা সুদূরপ্রসারীও হতে পারে।

তবে ঘনমেঘের পিছনেও যেমন সূর্য্যালোকের ঝিলিক থাকে এবং মন্দ থেকেও যেমন অনেক সময় ভালও হয়, তেমনি এই দ্বন্দ্ব থেকেও মনে হয় ভাল কিছু হতে পারে। যেমন, প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর দল এখন সর্ব্বপ্রকারে চেষ্টা করবেন সাধারণের ভাল হয় এরকম কাজ বেশী করে করবার জন্যে (অবশ্য আগেও তাঁরা সে চেষ্টা করতেন, তবে এখন আরও বেশী করে করবেন)। আর তাঁর বিরোধীপক্ষ তাঁদের সে প্রচেষ্টায় বাধা দিয়ে জনতার কাছে অপ্রিয় হতে চাইবেন না। প্রধানমন্ত্রীর জনপ্রিয়তা এখন বিশেষ বৃদ্ধি পেয়েছে, সেই জনপ্রিয়তাকে সুষ্ঠু ভাবে কাজে লাগাতে পারলে অবশ্যই দেশের ও দশের মঙ্গল হবে।

তবে এই খোলাখুলি বিরোধের মধ্য দিয়ে দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তি না করে আপোষে সকল সমস্যার সমাধান করে নিতে পারলেই বোধ হয় ভাল হত। যাই হোক, আশা-করি কালের প্রভাবে এই মনোমালিন্য কেটে গিয়ে আবার সকলে এক হয়ে একযোগে দেশের উন্নতির জন্য কাজ করতে পারবেন।

বিধান ভবনে বিভ্রান্তি—

এবারকার পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার বর্ষাকালীন বাজেট অধিবেশন প্রায় শেষ হতে চলল। অধিবেশন সচরাচর যে রকম হয়ে থাকে সেইরকম প্রায়ই তপ্ত আবহাওয়ায় ও উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতিতে চলেছিল। বিরোধী পক্ষ কংগ্রেস দল, দলনেতা শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের নেতৃত্বে শক্তিশালী সরকার পক্ষ যুক্তফ্রন্টের সঙ্গে যোঝবার চেষ্টা করেছেন। সিদ্ধার্থবাবু প্রমুখ কংগ্রেস পক্ষের কয়েকজনের বক্তৃতা বেশ যুক্তিপূর্ণ ও জোরাল হয়েছিল। অপরপক্ষে যুক্তফ্রন্টের দুই সুযোগ্য নেতা শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীজ্যোতি বসু এবং আরও কয়েকজন নেতা বিরোধী পক্ষের আক্রমণের যোগ্য উত্তর দিয়েছেন তাঁদের জোরালো বক্তৃতার মাধ্যমে। মাননীয় স্পীকার শ্রীবিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথাযোগ্য দৃঢ়তা ও ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সভা পরিচালনা করেন। বিরোধী কংগ্রেস পক্ষ একাধিকবার সভাকক্ষ ত্যাগ করে তাঁদের প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তবে বিশেষ অপ্রীতিকর কিছু ঘটেনি এই অধিবেশনে। কিন্তু ৩১শে জুলাই অপরাহ্ণে ঘটেছে এক অভূতপূর্ব্ব অঘটন। তাকে শুধু অপ্রীতিকর বা অঘটন বললে কিছুই বলা হয় না। ঐ দিন অপরাহ্ণে বিধান সভায় অধিবেশন চলাকালীন একদল ইউনিফর্ম পরিহিত পুলিশ বিধান সভা ভবনে ঢুকে পড়ে বিষম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। পূর্ব্বের এক গণ্ডগোলে নিহত তাঁদের এক সহকর্ম্মীর মৃতদেহ ঐ পুলিস দল শোকযাত্রা করে নিয়ে আসেন, কিন্তু হঠাৎ তারা যেন ক্ষেপে গিয়ে বিধান সভা ভবনের মধ্যে ঢুকে পড়ে সব কিছু তছনছ করতে আরম্ভ করে। এরকম অদ্ভুত কাণ্ড আর কখনও কোথাও ঘটেছে বলে শোনা যায় নি। যাই হোক, পরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যথোপযুক্ত কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি বিধান করা হয়।

সংবাদ ও স্বাধীনতা—

সংবাদ প্রকাশের স্বাধীনতা বা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ব্যক্তি স্বাধীনতার সঙ্গেই তুল্য এবং এই স্বাধীনতা সকল গণতান্ত্রিক সভ্যদেশেই চলিত আছে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা মানেই গণতন্ত্রের সমাধি রচনা করা। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় সেইরকমই ঘটবার যেন উপক্রম হয়েছিল। গত ৮ই জুলাই অপরাহ্ণে "আনন্দ বাজার পত্রিকা" ও "হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড" সংবাদপত্রদ্বয়ের অফিসে একদল ছাত্রনামধারী চড়াও হয়ে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। তারা কয়েকটি মোটরগাড়ীর ও সংবাদপত্র অফিসের বিশেষ ক্ষতি সাধন করে। ঐ সংবাদপত্রদ্বয়ের পরিবেশিত

সংবাদ ঠিকমত বা তাঁদের মনোমত নয় বলেই নাকি এই আক্রমণ! যাই হোক, এই আক্রমণ আর বেশীদূর গড়াইনি এবং সুখের কথা দলমতনির্বিশেষে সকল নেতারাই এই আক্রমণের তীব্র নিন্দা করেছেন। সংবাদ পত্রের স্বাধীনতার ওপর ভবিষ্যতে আর জোরজুলুম করা হবে না বলেই আমরা আশা করি এবং জনপ্রিয় সরকারকে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে অনুরোধ জানাই।

অগ্নিসংযোগ—

জেরুসালেম্-এর সুপ্রসিদ্ধ আল্ আক্সা মসজিদটি অগ্নিদগ্ধ হয়েছে। খবরে জানা গেছে যে এক বিকৃতমস্তিষ্ক অষ্ট্রেলিয় যুবক নাকি এই অগ্নিসংযোগ করেছে। কি কারণে যে সে ঐ দুষ্কার্য্য করেছে তা জানা যায় নি। কিন্তু কার্য্যটি যে কত গর্হিত ও অন্যায় হয়েছে তা সারা বিশ্বের মুসলমান সমাজের বিক্ষোভ থেকেই বোঝা যায়।

ধর্ম্মের ওপর আঘাত কোনও জাতিই সহ্য করতে পারে না। অতীতে হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বীদের এইরকম তাদের ধর্ম-স্থান অপবিত্র করণের লাঞ্ছনা বহুবার সহ্য করতে হয়েছে। তাই আমরা এর যাতনা বোধ করতে পারি। বিশ্বের চতুর্দ্দিকে এবং ভারতের নানা স্থানে এইজন্য প্রতিবাদ দিবস পালন করা হয়েছে। ইজরায়েল সরকারের উচিত এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সত্বর ব্যবস্থা অবলম্বন করা এবং দোষীর কঠোর শাস্তিবিধান করা। সকলের ধর্ম্মকেই শ্রদ্ধার সঙ্গেদেখা উচিত এই কথাটি সকল ধর্ম্মাবলম্বীরা মনে রাখলে এই সকল গর্হিত কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হবে না।

আবার বন্যা—

আবার বন্যার জল বাঁধ ভাঙতে আরম্ভ করেছে। মালদহ, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি কয়েকটি জেলায় ইতিমধ্যেই বিশেষ ক্ষতি সাধিত হয়েছে। কিন্তু ক্ষতি যাতে আর বেশী না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে সত্বর সব কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। আর এই বাৎসরিক বন্যার কবল থেকে এ দেশকে কি করে রক্ষা করা যায় সে সম্বন্ধেও রাজ্যসরকারসহ সকল দল ও মতের লোককে একত্রে কাজ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি, যাতে এই উৎপাত থেকে এদেশের লোক চিরতরে নিষ্কৃতি পায়।

শিল্পী সতীন্দ্রনাথ লাহা—

প্রখ্যাত শিল্পী ও শিশু-সাহিত্যিক সতীন্দ্রনাথ লাহা দীর্ঘকাল রোগভোগের পর পরলোকে প্রস্থান করেছেন। চিত্রশিল্পীরূপে শিল্পী মহলে ও লেখকরূপে সাহিত্য জগতে তিনি বিশেষ পরিচিত ছিলেন। ছোটদের "পাঠশালা" পত্রিকা তিনি সম্পাদকরূপে পরিচালনা করতেন। তাঁর আঁকা বহু রঙ্গিন চিত্র "ভারতবর্ষ" ও অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর অঙ্কিত "শকুন্তলা" চিত্রটি শিল্পরসিক মহলে বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করে। তিনি ধনীর দুলাল হয়েও শিল্প ও সাহিত্য সাধনায় অকুণ্ঠ পরিশ্রম করে গেছেন। শিল্প সাধনায় তাঁর দান বহুকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

আমরা তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গকে আমাদের সমবেদনা জানাচ্ছি।

অধ্যাপক অক্ষয়জীবন বসু—

বঙ্গবাসী কলেজের অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রখ্যাত অধ্যাপক অক্ষয় জীবন বসু কিছুকাল আগে পরলোক গমন করেছেন। সদা হাস্যময় ও সুমিষ্ট স্বভাবের অধিকারী অধ্যাপক বসু ছাত্র-ছাত্রীদের কাছেই শুধু প্রিয় ছিলেন না, সুলেখক হিসাবে তিনি সাহিত্যিক মহলেও বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তাঁর বহু রচনা "ভারতবর্ষ" ও অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধগুলি যেমন বিদগ্ধসমাজে স্বীকৃতি লাভ করেছে, তেমনি তাঁর সরস রচনাগুলিও সাধারণ পাঠকসমাজে জন-প্রিয়তা পেয়েছে। তিনি "ভারতবর্ষ" পত্রিকার সঙ্গে বহুকাল লেখকরূপে যুক্ত ছিলেন। তাঁর মতন সহজ, সরল শান্ত ও জ্ঞানী মানুষ আজকের সমাজে ক্রমশই বিরল হয়ে আসছে।

তাঁর এই অকস্মাৎ বিয়োগে আমরা স্বজন বিয়োগ বেদনা বোধ করছি এবং দুঃখভারাক্রান্ত চিত্তে তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করছি।

বিজ্ঞপ্তি

নুতন ও পুরাতন বহু লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক-লেখিকার
লেখায় সমৃদ্ধ হয়ে আগামী শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন
সংখ্যা একত্রে "শারদীয়" সংখ্যারূপে
প্রকাশিত হবে।

সম্পাদক—শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩।১।১, বিধান সরণী, (পূর্বতন কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্
কলিকাতা ৬, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দ্বিজেন্দ্র লাল রায় প্রতিষ্ঠিত

ভারতবর্ষ

শারদীয় সংখ্যা

৫৭-তম
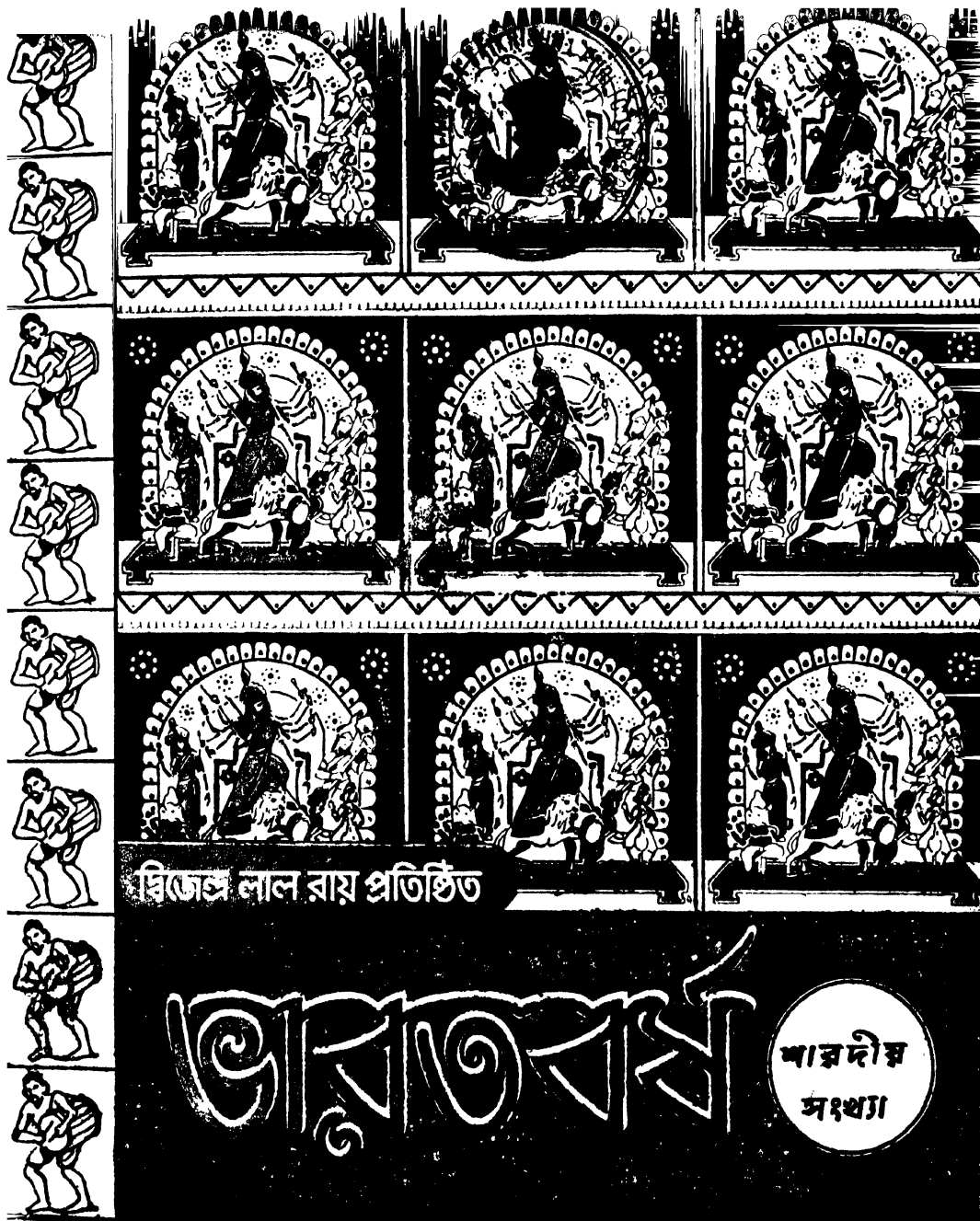
পুজোর মরশুমে
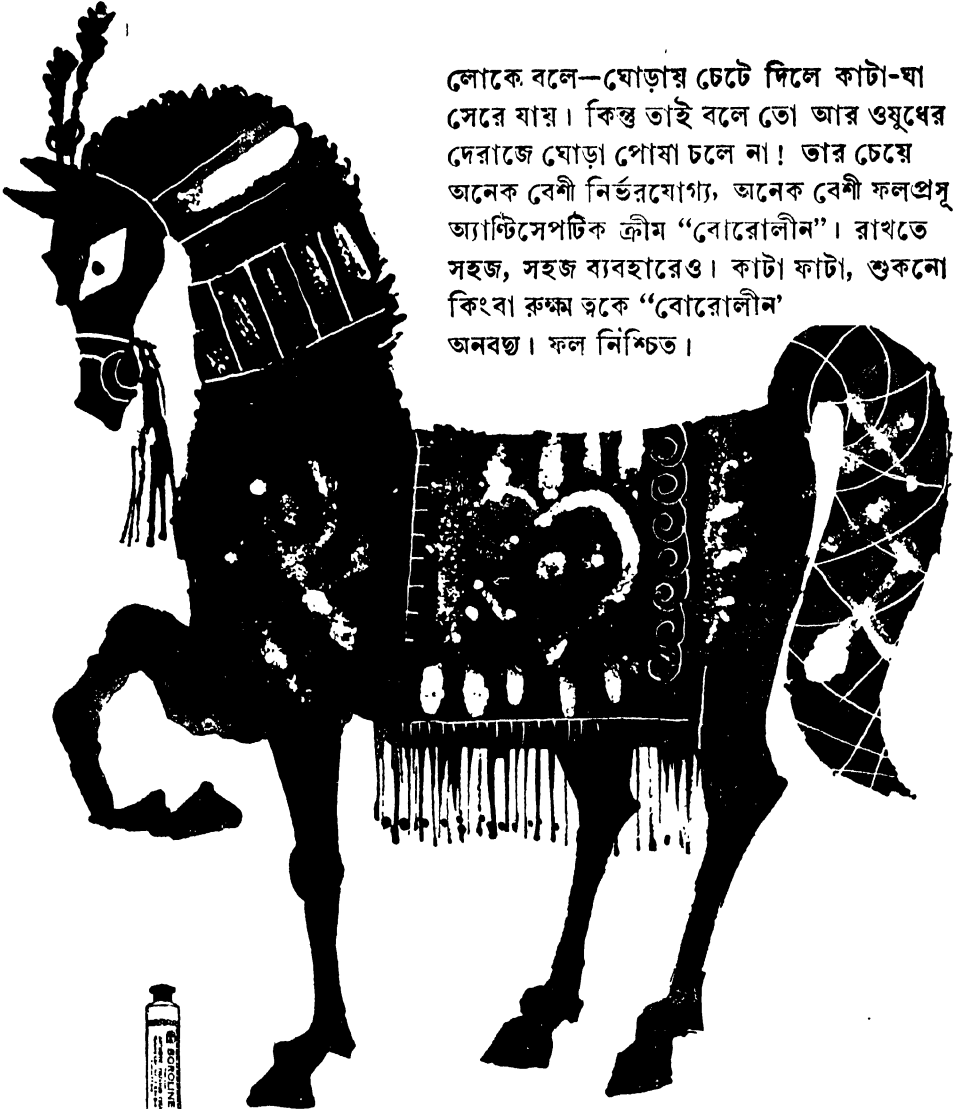
বোরোলীন

বোরোলীন হাউস, কলিকাতা-৩

একটি নির্ভরযোগ্য কেশ তৈল
বেঙ্গল কেমিক্যালের
ক্যান্থারাইডিন হেয়ার অয়েল
ভেষজগুণ সম্পন্ন ক্যান্থারাইডিন হেয়ার অয়েল ব্যবহারে আপনার রেশম-কোমল ঘন কাল চুলের কোমলতা ও মসৃণতা অক্ষুণ্ণ রাখবে ও চুল পড়া বন্ধ করতে সাহায্য করবে।
বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর • দিল্লী

আমাদের দেশবাসীর ও পৃষ্ঠপোষক-
গণের সুখ ও সমৃদ্ধি বাড়ুক এই কামনা
করছি এবং দেশ গড়ে তোলার
সমস্ত কাজে আমরা সর্বাঙ্গীন
সহায়তা ক'রব, নতুন করে
আবার এই শপথ নিচ্ছি।
ইউনাইটেড কমার্সিয়াল ব্যাঙ্ক
হেড অফিস ঃ কলিকাতা
ASP/UCO-9/69

ছোটদের জুতো চাই
আজীবন
খুশি পায়ে চলতে
বাটার ছোটদের জুতো বাড়ন্ত পায়ের কথা মনে রেখেই তৈরি। এমনই এদের নকশা ও নির্মাণ-বৈশিষ্ট্য যে হাঁটতে চলতে অবাধ সহজ। সামনে আঙুল মেলার বাড়তি জায়গা, খাপখাওয়ানো গোড়ালির গড়ন, আর এমন জুতোর তলি যা অনায়াসে পা সঞ্চালনের সহায়ক। টুকটুকে রঙ, বাহারে নকশা, আর আরামে পয়লা নম্বর—এমন জুতোই এখন মজুত বাটার দোকানে। আজই নিয়ে আসুন আপনার বাচ্চাদের, এদের খুশি পায়ে শুরু হোক শরতের শোভাযাত্রা।
বাহার ৩.৫০
বান্টি ৯.৫০
Bata
বেবি ৯.৫০
মোকাসিন ৪.৭৫—৫.৫০
স্মার্ট ৯.৯৫

ভারতবর্ষের

সপ্তপঞ্চাশত্তম বর্ষ—প্রথম খণ্ড—২য়, ৩য়, ৪র্থ সংখ্যা

শারদীয়—১৩৭৬

লেখ-সূচী

লেখ-সূচী

লেখ-সূচী

লেখ-সূচী

লেখ-সূচী

লেখ-সূচী

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ

নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ।
নমঃ প্রকৃত্যৈ ভদ্রায়ৈ নিয়তাঃ প্রণতাঃ স্মতাম্ ॥ ১
রৌদ্রায়ৈ নমো নিত্যায়ৈ গৌর্যৈ ধাত্র্যৈ নমো নমঃ।
জ্যোৎস্নায়ৈ চেন্দুরূপিণ্যৈ সুখায়ৈ সততং নমঃ ॥ ২
কল্যাণ্যৈ প্রণতা বৃদ্ধ্যৈ সিদ্ধ্যৈ কুর্মো নমো নমঃ।
নৈঋ‍‍র্ত্যৈ ভূভৃতাং লক্ষ্ম্যৈ সর্বাণ্যৈ তে নমো নমঃ ॥ ৩
দুর্গায়ৈ দুর্গপারায়ৈ সারায়ৈ সর্বকারিণ্যৈ।
খ্যাত্যৈ তথৈব কৃষ্ণায়ৈ ধূম্রায়ৈ সততং নমঃ ॥ ৪
অ'তসৌম্যাতিরৌদ্রায়ৈ নতাস্তস্যৈ নমো নমঃ।
নমো জগৎপ্রতিষ্ঠায়ৈ দেব্যৈ কৃত্যৈ নমো নমঃ ॥ ৫

* * *

মহামায়াকে দেবগণ এইরূপে স্তব করিলেন—দেবীকে, মহাদেবীকে প্রণাম। সতত মঙ্গলদায়িনীকে প্রণাম। সৃষ্টিশক্তিরূপিণী প্রকৃতিকে প্রণাম। স্থিতিশক্তিরূপিণী ভদ্রাকে প্রণাম। আমরা সমাহিত চিত্তে তাঁহাকে বার বার প্রণাম করি। ১

রৌদ্রাকে (সংহারশক্তিকে) প্রণাম। নিত্যাকে (ত্রিকালাতীত সত্তারূপিণীকে) প্রণাম। গৌরী জগদ্ধাত্রীকে প্রণাম। জ্যোৎস্নারূপা, চন্দ্ররূপা ও সুখস্বরূপাকে সতত প্রণাম। ২

কল্যাণীকে প্রণাম করি। বুদ্ধিরূপা ও সিদ্ধিরূপাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি। অলক্ষ্মীরূপা এবং ভূপতিগণের লক্ষ্মীরূপা শর্বাণীকে বার বার প্রণাম করি। ৩

দুস্তর-ভবসমুদ্র-পার-কারিণী, শক্তিরূপিণী, সৃষ্টিকর্ত্রী খ্যাতি (বা ভেদ বা প্রসিদ্ধি) রূপিণী কৃষ্ণবর্ণা ও ধূম্রবর্ণা দুর্গা দেবীকে সতত প্রণাম করি। ৪

যিনি বিদ্যারূপে অতি সৌম্যা এবং অবিদ্যারূপে অতি রৌদ্রা (অতি ভীষণা) তাঁহাকে পুনঃপুনঃ প্রণাম। জগতের আশ্রয়রূপিণীকে প্রণাম। ক্রিয়ারূপা দেবীকে পুনঃপুনঃ প্রণাম। ৫

ভারতবর্ষ

শাশ্বত ও সনাতন ধর্মোপাসক ভারতবর্ষ

শ্রীপ্রহ্লাদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ভারতীয় আর্যগণের ধর্ম শাশ্বত ও সনাতন। ইহা কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রচারিত ধর্ম নহে। এই ধর্মের ভিত্তি অনন্ত অক্ষয় অব্যয় অদ্বয় ব্রহ্ম-বোধ। এই ধর্মের মূলে সর্বভূতে ব্রহ্মজ্ঞান। "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।" এই ধর্মের সঙ্গে বর্ত্তমান পৃথিবীতে প্রচারিত কোন ধর্মের সঙ্গে বিরোধ নাই।

পরম ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়। তিনি লীলামানসে বহুরূপে বহুভাবে বর্ত্তমান। শিশু যেমন বহুবিধ ক্রীড়নক বা খেলনা লইয়া খেলা করে—আপনমনে ভাঙ্গে গড়ে, তদ্রূপ পরম ব্রহ্ম বিরাট শিশুরূপে কোটি কোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও তাহার স্থাবর জঙ্গমাত্মক কোটি কোটি জীব লইয়া আপন মনে খেলা করিতেছেন—কোটি কোটি সৌরজগৎ তৈয়ারী করিতেছেন সঙ্গে সঙ্গে তাহার সৃষ্টি স্থিতিলয়ও সাধন করিতেছেন। ঐরূপ ঐ সকল সৌরজগতে কোটি কোটি স্থাবর জঙ্গমের সৃষ্টিস্থিতি ও লয়ও সাধন করিতেছেন। এই সকল নিত্য পরিবর্ত্তনশীল হইলেও পরম ব্রহ্ম নিত্য অনন্ত অক্ষয় অব্যয় অদ্বয়। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড এবং জীবজগৎ সমস্তই ঐ এক এবং অদ্বিতীয়ের লীলামূর্ত্তি। তিনি ভিন্ন এই বিশ্বে ভিতরে বা বাহির অন্য কিছু নাই।

ভারতীয় ধর্ম যেরূপ শাশ্বত ও সনাতন, ভারতীয় সভ্যতাও তদ্রূপ শাশ্বত ও সনাতন। কারণ ঐ সভ্যতার মূলে সর্বভূতে পরম ব্রহ্ম-বোধ। সভ্যতা বাহিরের খোলস—ধর্মই তাহার প্রাণশক্তি।

পাশ্চাত্য মনীষীগণ বলিতেছেন, মানবিক সভ্যতা ক্রমবিবর্ত্তন আশ্রয় করিয়া উন্নত হইতেছে। আদিম মানব পশুবৎ উলঙ্গ থাকিত আম মাংস আহার করিত, গুহাবাসী হইয়া না, অগ্নির ব্যবহার জানিত না, প্রকৃতিজাত ফল মূল পত্র বা জীবাদি আহার করিয়া জীবন রক্ষা করিত। আদিম মানব অগ্রে গুহাযুগে বাস করিত তারপর প্রস্তর যুগ, ধাতুযুগ প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমানে রকেটযুগে উপনীত হইয়াছে। কোন কোন মনীষীগণের ধারণা মানবজাতির সৃষ্টিও ঐরূপ প্রাকৃতিক ক্রম-বিবর্ত্তনের ফলে—কীট, পতঙ্গ, জলচর, উভচর, স্থলচর, পশু, পক্ষী, বানর, পরিশেষে মানব।

ভারতীয় ঋষিগণ এই কথা স্বীকার করেন নাই। বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি কোনও শাস্ত্রে গুহাযুগ, প্রস্তরযুগ প্রভৃতির কথা নাই। ভারতবর্ষ পুণ্যভূমি কর্মভূমি, সাধনভূমি। ভারতের সভ্যতার ধারা বিভিন্ন। বৈচিত্র্য লইয়াই প্রকৃতি। প্রকৃতিতে সভ্যতার ধারা একটী রূপেই থাকিবে ইহার কোন সত্যতা নাই বা থাকিতে পারে না। বিভিন্ন সভ্যতা বিভিন্ন ধারায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে ও চিরকাল করিবে।

ভারতবর্ষ ভিন্ন পাশ্চাত্য দেশ ভোগভূমি। পাশ্চাত্য দেশের সভ্যতার ধারা ভোগের ক্রম-বিবর্ত্তনের ফলেই উন্নত হইতেছে এবং হইবে। পরিশেষে এই সভ্যতা ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। ভোগবাদীগণের লক্ষ্য ব্যক্তিগত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ইহা আত্মকেন্দ্রিক। ব্যক্তিগত সুখ স্বাচ্ছন্দ্যলক্ষ্যে সকলে ধাবমান হইলেই বিরোধ অনিবার্য। এই বিরোধ বা সংঘর্ষ অতিক্রম করিতেইআইনগতশান্তি শৃঙ্খলা, ক্ষমতাদৃপ্ত জনগণ এইআইনপ্রণয়ণ করেন। বর্ত্তমান পাশ্চত্যে সভ্যতার ভোগবাদের ফলে দেশে দেশে বিরোধ ও সংঘর্ষ। ভোগবাদীগণের রক্ষার নিমিত্ত দেশে দেশে ধনতন্ত্রবাদ, রাষ্ট্রতন্ত্র বাদ, গণ-

হইতেছে এবং ভবিষ্যতে আরোও হইবে। এই বিংশ শতাব্দীতে দুইটী বিশ্বযুদ্ধ এই সকল বাদের লক্ষ্যেই সংঘটিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে এই সকল 'বাদ' রক্ষার্থে দেশে দেশে মারণাস্ত্র প্রস্তুত এবং সঞ্চিত হইতেছে। সংবাদপত্রে প্রকাশ, বর্ত্তমানে জড়বিজ্ঞানের অশ্রুতপূর্ব অভূতপূর্ব উন্নতির ফলে এরূপ মারণাস্ত্র, ধনতন্ত্রবাদের ধারক ও বাহক আমেরিকা দেশে এবং রাষ্ট্রতন্ত্র সমাজতন্ত্রবাদের রক্ষক রাশিয়া দেশে সঞ্চিত হইয়াছে যাহার প্রয়োগে বর্ত্তমান পৃথিবী অন্যূন পঞ্চাশ বার ধ্বংস হইতে পারে এবং তাহা এক মুহূর্ত্তেই হইতে পারিবে। সুতরাং তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধে এই পৃথিবীর ভোগবাদী সভ্যতার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।

ভারতীয়গণের বিশ্বাস সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার মানস-সন্তান মনুর বংশধর ভারতীয় মানবগণ। ইহারা ক্রমবিবর্ত্তনের ফলে সৃষ্ট হন নাই এবং ভারতীয় সভ্যতাও আদি অকৃত্রিম শাশ্বত ও সনাতন, ইহাও মানবগণের ভোগসুখের ক্রমবিবর্ত্তনের ফলে সৃষ্ট নয়। বর্ত্তমানে ভারতীয় সভ্যতা এবং সনাতন ধর্ম, বর্ত্তমানের পাশ্চাত্য সভ্যতার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তিসুখবাদের দ্বারা কালিমা লিপ্ত হইলেও আজিও ভারতবর্ষে বহু সাধুসন্ত আছেন, যাঁহাদের লক্ষ্য একমাত্র এই বিশ্বের কল্যাণ। ভারতের উপনিষদের উপদেশ 'আত্মানং বিদ্ধি' (আত্মা, যিনি সর্বভূতে সর্বত্র বর্ত্তমান, তাঁহাকে জানো), 'ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ' (ত্যাগের দ্বারা ভোগ করিবে—নিজ ব্যক্তিগত সুখভোগ তুচ্ছ করিয়া পরকে সুখী করিবে, বিশ্বের কল্যাণে আপনাকে সর্বদা নিযুক্ত রাখিয়া পরমানন্দে কালাতিপাত করিবে), তত্ত্বমসি [তৎ (সেই) ত্বম্ (তুমি) অসি (হও) অর্থাৎ তুমি স্বয়ং ব্রহ্ম, সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম (এই পরিবর্ত্তনশীল বিশ্বে যাহাকিছু সবই ব্রহ্মের লীলামূর্ত্তি) প্রভৃতি। ঐ সকল অমূল্য উপদেশ ভারতীয় সাধুসন্তগণের হৃদয়ে সদা জাগরূক আছে।

সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরেরতরে ইহাই ভারতেরমর্ম কথা। আপনার ব্যক্তি-গত সুখ ক্ষণিক—পরকে আপনা হইতে বিচ্ছিন্ন মনে করিয়া দাম্ভিক মনে যে কৃপা তাহার সুখও ক্ষণিক। যে আত্মা আমার মধ্যে 'আমি' রূপে বিরাজ করেন পরের মধ্যেও সেই একই আত্মা এরূপ মনে পরকে আপন মনে করিয়া যে ত্যাগ সেই ত্যাগেই নির্মল আনন্দ ভোগ হয়। ভোগবাদীগণ ঐরূপের ত্যাগে বিশ্বাসহীন।

ভোগবাদীগণ বলেন,—মানবগণের ইন্দ্রিয়গ্রাম সকল বিষয়-মুখী করিয়াই সৃষ্ট হইয়াছে। সুতরাং ইন্দ্রিয়গ্রাম বিষয়ভোগ করিবেই। তাহাদিগকে বিষয়ভোগ হইতে বঞ্চিত করা শক্তির অপচয়।

ভারতীয় ত্যাগবাদী ঋষিগণ বলেন—মানবের ইন্দ্রিয়সকল বহির্মুখী বা বিষয়মুখী। এই দেহ রক্ষার্থে এবং বংশ রক্ষার্থে বিষয় ভোগের প্রয়োজন। প্রয়োজনের অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় ভোগ পাপ। ইহা ব্যক্তিগত ভাবে এবং সমাজগত ভাবেও অন্যায়। এই সকল বহির্মুখী ইন্দ্রিয়গ্রামকে অন্তর্মুখী করিয়াই সাধনা।

ভোগবাদী সমাজবিজ্ঞানীগণ বলেন—অসন্তোষ উন্নতির মূল। অসন্তোষ কর্মশক্তির উদ্বোধক। যাহারা নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট তাহারা আত্মপ্রতারিত, অলস এবং জীবন্মৃত।

ত্যাগবাদীগণ বলেন—যাহাদের জীবনের লক্ষ্য ধন, জন, মান সন্তোষ তাহার বাধক। কিন্তু যাহাদের লক্ষ্য আপনাকে জানা এবং এই বিশ্বের প্রকৃতি জানা এবং বিশ্বের কল্যাণে আপনাকে নিযুক্ত করা তাহাদের পক্ষে সন্তোষ অমৃত এবং অসন্তোষ বিষবৎ।

আর্য সভ্যতার ভিত্তি বর্ণাশ্রমধর্ম। গৃহস্থাশ্রম আর্যসমাজের ভিত্তি। গৃহস্থাশ্রমে গৃহিণী সর্বেসর্বা। গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।' যত দিন মাতা বর্ত্তমান তত দিন মাতাই গৃহিণী বা গৃহকর্ত্রী। মাতার অবর্ত্ত-মানে পরিণীতা পত্নী। পত্নীর অবর্ত্তমানে কন্যা। আর্য সমাজে নারীর তিন রূপ—মাতা, জায়া, কন্যা। আর্য সমাজে বান্ধবী, নর্মসঙ্গিনী প্রভৃতির স্থান ছিল না। গৃহস্থাশ্রমে অতিথি ছিল নারায়ণ। অতিথির আগমনে গৃহস্থাশ্রম আনন্দে উৎফুল্ল হইত। অতিথির সন্তোষ বিধানের জন্য গৃহকর্তা এবং গৃহিণীর অকরণীয় বলিয়া কিছুই ছিল না। সর্বত্র অভ্যাগত, গুরু পদ বাচ্য ছিল।

আর্য সভ্যতা কোন দিন ব্যক্তিকেন্দ্রিক ছিল না, ছিল সমাজ কেন্দ্রিক। ভারতের পরিবার যৌথ পবিবার। এই যৌথ পরিবার প্রথা

ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয় সুখলাভের প্রতিকূলে এবং পরার্থে ত্যাগের অনুকূলে ছিল। ভারতে বৃটিশ অধিকারের পূর্ব পর্যন্ত এই যৌথ পরিবার প্রথা অক্ষুণ্ণ ছিল। এমন কি, কোন কোন ক্ষেত্রে ভারত স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত অখণ্ড ভারতের পূর্বাঞ্চলে একাধিক যৌথপরিবার আমরা দেখিয়াছি।

ধর্মের সঙ্গে সভ্যতার অঙ্গাঙ্গিক সম্বন্ধ। ধর্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কোন সভ্যতা দীর্ঘদিন স্থায়ী হইতে পারে না। নদীর প্রবাহ যেরূপ নদীকে সতেজ রাখে তদ্রূপ মানবতাধর্মবোধ সভ্যতাকে প্রাণবন্ত করিতে সাহায্য করে। আর্যধর্ম দেশকালবস্তু নিরপেক্ষ। সত্যদর্শী সত্যাশ্রয়ী তপোনিষ্ঠ ঋষিকুল এই ধর্মকে স্বীয় জীবনে সত্যভাবে উপলব্ধি করিয়া গিয়াছেন। এবং এই ধর্মকে প্রাণবন্ত রাখিবার জন্য অধিকার ভেদে বিভিন্ন সদাচারের বিধান দিয়া গিয়াছেন।

পাশ্চাত্যে ভোগভূমিতে মানবগণ প্রণীত আইন শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার সহায়ক। ত্যাগভূমি ভারতবর্ষ কোনদিন নিত্য পরিবর্তনশীল মানবগণ প্রণীত আইনকে সদাচারের মর্যাদাদান করে নাই। বেদবিহিত স্বধর্ম আমাদের ধর্ম। ইহা মানবজাতির কল্যাণ, শ্রীবৃদ্ধি, নিঃশ্রেয়স্‌ ও অভ্যুদয় লাভের নিমিত্ত। কর্তব্য অকর্তব্য নির্দ্ধারণে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ।

ভারতীয় বর্ণাশ্রমধর্ম ভারতীয় শাশ্বত ও সনাতন-ধর্মকে প্রাণবন্ত রাখিয়াছিল। ব্রাহ্মণগণের স্বভাবজাত কর্ম ছিল শম, দম, তপস্যা, শৌচ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞানবিজ্ঞান এবং ব্রহ্মবোধ। তাহাদের অর্থের প্রয়োজন সামান্যই ছিল। প্রকৃতিজাত ফলমূলাদি তাহাদের জীবন রক্ষা করিত। তাহারা ছিলেন ত্যাগী ও প্রধানতঃ অরণ্যবাসী। ক্ষত্রিয়গণের স্বভাবজাত কর্ম ছিল শৌর্য, তেজ, ধৃতি, কর্মকুশলতা যুদ্ধে অপরাঙ্মুখা, দান, প্রশাসন ক্ষমতা। তাঁহারা যথাশাস্ত্র শান্তি রক্ষা করিতেন। কৃষি, গোরক্ষা এবং বাণিজ্য ছিল বৈশ্যের স্বভাব জাত কর্ম এবং শূদ্রের ছিল সেবা ধর্ম। এই আদর্শের বিলোপে ভারতবর্ষ পরাধীনতার শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। বর্তমানে ভারতবর্ষ বিদেশীয়গণের শৃঙ্খল মুক্ত হইলেও, উচ্ছৃঙ্খলতার নাগপাশে অশান্ত ও অস্থির। ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা কি মানবতাধর্মের বিনাশের কারণ হইয়াছে?

পাশ্চাত্য দেশেও বর্ণাশ্রম ধর্ম বর্তমান। সেখানে বর্ণ—প্রধানতঃ দুইটি শ্বেত ও কৃষ্ণ। শ্বেতাঙ্গগণ তাহাদের জড়বিজ্ঞানের প্রযুক্তিবিদ্যার সাফল্যে আত্মহারা। পাশ্চাত্যসভ্যতার সাম্যবাদ প্রধানতঃ মুখে। কার্যে তদ্বিপরীত। কৃষ্ণচর্মীগণ বহুক্ষেত্রে অপাংক্তেয়।

ভারতীয় ধর্মে আশ্রম ছিল চারিটী—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও ভৈক্ষ্য। ইহা কোন বিশেষ বর্ণের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল না। গুরুগৃহে যাইয়া ব্রহ্মচর্যপালনে বিদ্যাশিক্ষা করিতে হইত। ব্রহ্মচর্য আশ্রম গৃহস্থগণকে স্বধর্ম পালনে উদ্বুদ্ধ করিত। পঞ্চাশ বর্ষ পূর্ণ হইলে গৃহস্থগণ পুত্রগণের উপর গৃহের ভারার্পণ করিয়া বনবাসী হইতেন। বনে স্বচ্ছন্দজাত ফলমূলাদি আহার ও তপস্যাই প্রধান কর্ম ছিল। তাহার পর ভৈক্ষ্য। শূদ্রগণ ভৈক্ষ্যবৃত্তি গ্রহণ করিতেন না।

পাশ্চাত্য সভ্যতারও আশ্রম আছে। তাহা তিন প্রকার—ধনী, মধ্যবিত্ত এবং নির্ধন। এই আশ্রম সকল অর্থ সাপেক্ষ। এজন্য এই আশ্রম পরিবর্তনশীল।

ভারতীয় শাশ্বত সনাতন ধর্মের লক্ষ্য পরিপূর্ণতা। সনাতনধর্মীগণ অল্পে সন্তুষ্ট হইতেন না। ইন্দ্রিয়সুখ সীমিত এবং দুঃখগর্ভ এজন্য তাহারা ইন্দ্রিয় সুখের জন্য লালয়িত হইতেন না, উপনিষদের উপদেশ "ভূমৈব সুখং" "নাল্পে সুখমস্তি ভূমাত্বেব" "বিজিজ্ঞাসিতব্য" তাহাদের মনে সর্বদা জাগরূক থাকিত।

"অহং ব্রহ্মাস্মি, "সর্বংখল্বিদং ব্রহ্ম" এই সকল শ্রুতিবাক্য সনাতন ধর্মীগণ অন্তরে বিশ্বাস করিলেও, যতদিন না ঐ সকল সত্য সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধিতে আসে ততদিন উপাসনায় ব্রতী থাকিতেন। তাঁহাদের উপাসনা—সত্য শিব এবং সুন্দরের উপাসনা। এই উপাসনা অবাধ, অপ্রমেয়, আনন্দময়।

পরমব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয় হইলেও তিনি এই বিশ্বে বহুরূপে লীলায়িত। এজন্য সনাতন ধর্ম অধিকার ভেদে উপাসনার বিধান বর্তমান। এই অধিকার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত। যেরূপ বিভিন্ন রঙের প্রতিফলনে একটী সুন্দর আলেখ্য হয়, যেরূপ বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের বিভিন্ন শব্দ ঝংকার একটী ঐকতানের সৃষ্টি করে, সেইরূপ ভারতীয়

সমাজে বর্ণাশ্রম ধর্ম ভারতকে একটী আদর্শ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করিয়াছিল। ভারতীয় পল্লীসমাজে এখনও এই আদর্শ সম্পূর্ণরূপে ক্ষুন্ন হয় নাই। বর্ণাশ্রম ধর্মে যাহারা ঘৃণা বিদ্বেষ অস্পৃশ্যতা বর্ত্তমান বলেন তাহার আত্মপ্রতারিত। এই প্রকৃতিতে সাম্যবাদ কোথায়? এই প্রকৃতিতে সকল জীব কি একই শক্তিসম্পন্ন? এই বিশ্বে সকল মানব কি একই বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন? এই বিশ্বে সমস্তই বিচিত্র তথাপি এই বৈচিত্র্যের মধ্যে এক আশ্চর্য সমতা বর্ত্তমান। সমাজে অধিকার ভেদ থাকিবেই, রাষ্ট্রপ্রশাসন ব্যবস্থায়ও অধিকার ভেদ বর্ত্তমান। তবে এই অধিকার ভেদ নিত্য পরিবর্ত্তনশীল। এই পরিবর্ত্তনশীলতা প্রকৃতির ধর্ম। ভারতীয় বর্ণাশ্রম ধর্মও এই পরিবর্ত্তনশীলতা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল না তবে তাহা নির্বাচনের উপর নির্ভরশীল ছিল না; ছিল,তাহাদের ব্যক্তিগত কর্মের উপর। শূদ্রাণীর গর্ভজাত বিদুর, ক্ষত্রিয়াণীর গর্ভজাত ভীষ্ম সমাজে যে মর্যাদার অধিকারী ছিলেন অনেক ব্রাহ্মণেরও সেই মর্যাদার অধিকার ছিল না। বর্ত্তমানেও ইংলণ্ডে যেরূপ বংশগত ভাবে রাজপরিবারের মর্যাদা দানের ব্যবস্থা, ভারতবর্ষেও ব্রাহ্মণগণ সেরূপ ভাবে জাতিগত ভাবেও মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্যভোগবাদী সভ্যতার উচ্ছিষ্ট ভোগে পাশ্চাত্য ভাবধারায় শিক্ষিত নরনারী উন্মত্ত। তথাপি ভারতীয় পল্লী অঞ্চলে আজিও ব্রাহ্মণের মর্যাদা সম্পূর্ণরূপে ক্ষুন্ন হয় নাই।

ভারতীয় সনাতন ধর্মে ও সভ্যতায় কোন দিন গুণ ও কর্মের উপরে ধনের প্রাধান্য ছিল না। পাশ্চাত্য ভোগবাদী সভ্যতা অর্থকে পরমার্থ মনে করেন। আজিও ভারতের রক্ষণশীল সমাজ অর্থকে পরমার্থ মনে করেন না। এখনও সাধারণ ভারতবাসীর নিকট রাজা মহারাজা ধনীগণ অপেক্ষা কৌপীনবন্ত সাধু-সন্তগণ অধিকমর্যাদার অধিকারী। গান্ধীজী কৌপীনবন্ত হইয়াই মহাত্মা আখ্যা পাইয়াছিলেন। কৌপীনবন্ত গান্ধী ভারতের শ্রেষ্ঠ নাগরিকের মর্যাদায় বিভূষিত ছিলেন। ভারতে কৌপীন কোনদিন অপ্রীতিকর ছিল না বরং অধিকতর শোভন ও প্রীতিপদ ছিল।

ভারতীয় সনাতন ধর্মীগণ সর্বদাই ক্ষমাপ্রার্থী। তাহারা কাহাকেও ক্ষমা করিবেন কাহারও উপর ক্ষমতার অধিকার গ্রহণ করিবেন এই চিন্তা পর্যন্ত তাহাদের দুঃসহ ছিল। তাঁহারা কাহাকেও কৃপা করিবেন এই চিন্তাও দুঃসহ ছিল। তাঁহারা সর্বদা কৃপাপ্রার্থী হইয়া সমাজের কল্যাণে নিযুক্ত থাকিতেন। তাহাদের দয়াধর্ম শুধু মানব সমাজে সীমাবদ্ধ ছিল না উহা সর্বভূতে স্থাবর জঙ্গমে কীটপতঙ্গ হইতে মানবগণ পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। সনাতন ধর্মে অহিংসা পরমধর্ম। বিধিযুক্ত হিংসা, অহিংসা নামেই আখ্যাত ছিল। ভারতীয় সনাতন ধর্মীয় নীতি উদার, বিশ্বজনীন, প্রশান্ত। ভারতীয় প্রেম, ক্ষমা, অহিংসানীতি ব্যক্তিগত, জাতিগত দেশগত ছিল না। উহা ছিল সার্বজনীন, বায়ুর মতো সর্বগত সর্বব্যাপক। ভারতীয় গৃহিণীগণ কখনও গৃহের সকলের, এমন কি দাসদাসীগণের আহার সমাধা না হওয়া পর্যন্ত আহার করিতেন না। এরূপ গৃহিণী আমি দেখিয়াছি।

ভারতীয় সনাতন ধর্মী সমাজেও জাতীয় গৌরব ছিল। কিন্তু, তাহা পাশ্চাত্যের ন্যাশানালিজিমের মত সঙ্কীর্ণ, নিজদেশ ও জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। উহা ছিল সর্বব্যাপক। ভারতমাতা কখনও কাহাকেও তাহার স্নেহদানে কুণ্ঠিত ছিলেন না। ভারতের সমাজে কত জাতি কত ধর্ম লীন হইয়াছে তাহার সংখ্যা নাই।

মানব সমাজে প্রধানতঃ তিন ভাব- (.) পশুভাব (২) মানবভাব (৩) দেবভাব। পশুভাব আত্মকেন্দ্রিক সর্বদা ইন্দ্রিয় সুখ অন্বেষণে ব্যস্ত। মানবভাব, ব্যক্তিকেন্দ্রিক হইলেও সমাজের শান্তিরক্ষায় সংযত। দেবভাব সার্বজনীন। স্থাবর জঙ্গম কীটপতঙ্গ হইতে বায়ুর মত সর্বব্যাপক। সর্বংখল্বিদং ব্রহ্ম।' এই ব্রহ্মবোধের ভাবধারা তাহার সমগ্র মনে ও কার্যে সর্বদা ব্যক্ত থাকিত

ভারতীয় সনাতন ধর্মে সাধনমার্গ দুইটী—(১) নিবৃত্তি (২) প্রবৃত্তি। নিবৃত্তি মার্গের প্রধান কথা ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ। নিজের ইন্দ্রিয়গত ভোগেচ্ছা ত্যাগ করিয়া সার্বজনীন কল্যাণধর্মী হইয়া নির্মল আনন্দ ভোগ। এই আনন্দ প্রশান্ত, অপ্রমেয় ধীর স্থির। প্রবৃত্তি মার্গ ইহজীবনে নিজ সুখসমৃদ্ধি এবং পরজন্মে স্বর্গসুখ লক্ষ্যে প্রযুক্ত। নিবৃত্তি

মার্গে ইহজীবনে সার্বজনীন সুখসমৃদ্ধি এবং পরজন্মে মোক্ষপদ।

ভারতীয় সনাতনধর্মে আত্মকেন্দ্রিকতা বা ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা কোনদিন ছিল না। ভারতীয় ধর্ম-শাস্ত্র সকল অধ্যাত্মসম্পদে ভরপুর। সর্বভূতে আত্মদর্শন সকল ধর্মশাস্ত্রের লক্ষ্য। সর্বভূতের কল্যাণকর্ম ইহার একমাত্র উপদেশ।

ভারতের পরম দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষের যে জাতীয়তা বোধ ছিল সার্বজনীন এবং লক্ষ্য ছিল বিশ্বের কল্যাণ ভারত স্বাধীনতা লাভের পরে সেই ভারতে জাতীয়তা বোধ সীমিত হইয়াছে দল গঠনে। বিশ্বের কল্যাণ দূরের কথা খণ্ডীকৃতভারতের কল্যাণ যেন দূরবর্তী হইয়া চলিয়াছে। অসংখ্য রাজনৈতিক দল তাহাদের দলের বা পার্টির বা তাহাদের "ইজিম্"এর স্বার্থরক্ষার জন্য সর্বদাই ব্যস্ত। দেশের কল্যাণই যদি সকল দলের স্থির-লক্ষ্য হয় তাহা হইলে তাহাদের পথ বা "ইজিম্" লইয়া এত মারামারি কেন? ভারতের তরুণ সমাজ আজ যেন সকল রাজনৈতিক দলের ক্রীড়নক মাত্র। ছাত্রাণাং অধ্যয়নং তপঃ। ছাত্রগণের অধ্যয়নই তপস্যা এ বোধ আজ ভারতে কোথায়? শিক্ষা না করিয়াই শিক্ষিতের ডিপ্লোমা লইবার জন্য উন্মত্ত আচরণ ছাত্র সমাজের কলঙ্ক স্বরূপ হইতেছে। সর্বত্র সর্বদা উচ্ছৃঙ্খলতা আজ শান্তি-কামী ভারতীয়গণের মনে আশঙ্কা পরিব্যপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

মনীষীগণ বলেন স্বাধীনতা লাভের পর ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্ররূপে ভারতবর্ষ সকলরূপ ধর্মভাব হইতে বিচ্যুত হইয়াছে। ধর্মকে বাদ দিয়া কেউ কোনদিন আপনাকে উন্নত করিতে পারে নাই, কোন দিন পারিবে না এ সত্য ভারতের প্রশাসক-গণ কবে বুঝিবেন! শাশ্বত সনাতন ধর্মের উদ্বোধন এখন ভারতের কাম্য। এই ধর্ম অন্যকোন ধর্মের প্রতিকূল নয়। ইহাই পথ, অন্য পথ নাই।

ওঁ শুভমস্তু।

কথা কও কবি

শ্রীসুধীর গুপ্ত

(১)

কবি, তুমি কথা কও—কবিতায় কথা তব কও।
চলমান জনতার চালনার ভার নিজে লও।
কবিরা যে স্বপ্ন দেখে সে স্বপ্ন অমর;
সে স্বপ্ন কুসুমে হয় সভ্যতা সুন্দর;
সে স্বপ্ন সমতা আনে; দিলে দিলে মিল
সে স্বপ্নে সহজে আসে। সমস্ত নিখিল
শুভ্র যাহা ধ্রুব যাহা—যাহা প্রেমময়
কবি স্বপ্নে নিত্য পায় তা'রই পরিচয়;
নির্ভয় সবারে করে—নিশ্চিন্ত—মহান্।
সে স্বপ্নের সুষমায় সকলের প্রাণ
সম-তানে—সম-গানে—গতির জোয়ারে
মাতে, তাই ঐক্য আসে বিচিত্র সংসারে।

(২)

কবি, তুমি কথা কও—কবিতায় কথা তব কও।
প্রাণবন্ত জনতার চালনার ভার নিজে লও।
তোমার কথায় মাটি হবে স্বর্ণময়;
জঞ্জালের আস্তাকুঁড় পুড়ে হবে লয়।
তোমার কথার তোড়ে জাগিবে উল্লাস;
ভগ্ন—ভিন্ন—ছিন্ন যাহা হবে সবই নাশ।
স্বপ্ন যে স্রষ্টারই দান আনন্দের ঢেউ,
তাই তা'রে রোধিবারে পারে না তো কেউ।
স্বপ্ন শান্তি—স্বপ্ন শক্তি—স্বপ্ন সৃষ্টি-মূল;
স্বপ্নই দেখাতে পারে যে পথ নির্ভুল।

(৩)

স্রষ্টা প্রতিনিধি তুমি; জনতার মহাপ্রাণোল্লাস
যে রূপ লভিতে চায়, তব গানে তা'রই তো উচ্ছ্বাস।
সে মহা-সঙ্গীত-মন্ত্রে সবারে চেতাও;
অগ্রনেতা হও তুমি; হে ঋষি-কাণ্ডারী,
তোমারই আদর্শে যেন পাড়ি দিতে পারি
সঙ্কট-সঙ্কুল যত সর্পিল সরণী।
ধন্য করো—পুণ্য করো মানব-ধরণী।
একদিন কণ্ঠে তব ধ্বনিল যে গান
ফরাসী বিপ্লবে তা-ই হোলো বহ্নিমান;
সাম্য-মৈত্রী-মহাবাণী বিশ্বে তা' ছড়ালো;
পুঞ্জীভূত তমিস্রায় রৌদ্র তা' ঝরালো।
রুশী বিপ্লবেরও বান উদ্বেলতা নিয়া
স্বপ্ন তরঙ্গেতে তব গেল যে বহিয়া;
জয়ধ্বনি জগতে তা' সর্বত্র ছড়ায়।
তব স্বপ্নে চারিধার শুধু ভ'রে যায়।

(৪)

কবি, তুমি কথা কও—কবিতায় কথা তব কও।
চলমান জনতার চালনার ভার নিজে লও।
তব স্বপ্ন-শব্দ-মন্ত্র যত পাঠাগারে
স্তূপীকৃত হ'য়ে আছে; বিশ্ব সভ্যতারে
রূপ দিতে যুগে যুগে প্রয়োজন যা'র
হ'য়েছে অখণ্ড বিশ্বে শুধু বার বার।
বেদ-মন্ত্রে—হোমরের মহাকাব্য-গানে—
রোমের 'এনিডে' আর দান্তের ব্যাখ্যানে—
মহাচীনে—পারস্যের কাব্যের উচ্ছ্বাসে
তা'রই রেশ আজও বুঝি ভেসে ভেসে আসে।
প্রাণেরে উতলা করে কাব্য আর গান;
দেশে কালে ছাপায়ে তা' মানবের প্রাণ
কল্লোলিত হ'য়ে চলে; তার মৃত্যু নাই
সে মহা সঙ্গীতে পূর্ণ করো সর্ব ঠাঁই।
বলো তুমি সমগোত্র মানবেরা সবে;
দ্বন্দ্ব নয়—ছন্দময় মিল হবে—হবে।
কবি তুমি কথা কও—প্রাণোচ্ছল কথা তব কও।
চলমান জনতারে চালাবার ভার তুমি লও।

শারদোৎসব

অমরনাথ বসু

বাংলাদেশে শরতের অতি পরিচিত হাসি আজ আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হচ্ছে। সারা বৎসরের বেদনার চিহ্ন ক্রমে ক্রমে মিলিয়ে যাচ্ছে এবং সেই সঙ্গেই ধ্বনিত হচ্ছে সর্বমানব-মানবীর কল্যাণ এবং আনন্দের উৎসব—দুর্গোৎসব। উপনিষদ্ বলছেন আনন্দ থেকেই সকল বস্তুর আবির্ভাব আর আনন্দের মধ্য দিয়েই তার অবক্ষয়। সে কারণেই শরতের প্রসন্ন হাসির ছোঁয়ায় বাংলাদেশের মানব-মানবীর অন্তর আনন্দে সমুজ্জ্বল। দেখতে পাই শতদুঃখ আর অভাব অভিযোগের মধ্যেও মাতৃহৃদয় কন্যার আগমনে মুখর। বস্তুতঃ শুধু বাংলাদেশেই নয় সারা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নামে এই উৎসবের শুভ সূচনা কিন্তু ঠিক একই সময়ে। বিভিন্ন অঞ্চলে পূজোর বিভিন্ন রূপ কিন্তু কাঠামো সর্বত্রই এক। বর্ত্তমান ভারতবর্ষের রাজধানী নয়াদিল্লীতে 'দশেরা উৎসব' রূপে পরিচিত। এটি বিজয়া দশমীর দিনই অনুষ্ঠিত হয়। নেপাল ও ভুটানে "দশাই" করুয়া বা ঘট স্থাপন করে, অসমীয়ারা শালপাতায় নানা রকমের শস্য দিয়ে ইতুপূজোর মত করে। পাঞ্জাবে ভবানী মন্দিরে, জ্বালামুখীতে দেবী পীঠে, বিহারে দশেরা উৎসবে, তারাপীঠে ব্রহ্মশীলায়, ওঙ্কারেশ্বরের পর্বত সানুদেশে ঘট স্থাপন পূর্বক, কুমায়ুনে দুর্গাকবচে ও তাহির সম্প্রদায়ের মধ্যে চণ্ডীপুঁথিতে দুর্গাপূজো অনুষ্ঠিত হয়। এইভাবে দুর্গাপূজোর বিচিত্ররূপ সারা ভারতবর্ষ তথা ভারতবর্ষের বাহিরেও বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নামে অনুষ্ঠিত হয়।

কিন্তু বাংলাদেশে আজকের এই শারদ উৎসবের সূচনা অনেক প্রাচীন কাল থেকেই শুরু হয়েছে। আর সত্যিকারের শারদ উৎসব বলতে যা বোঝায় তা অতি সুপ্রাচীন যুগের। আনুমানিক সাড়ে-আসছে অর্থাৎ ঋক্ বেদের সময় হ'তে। আজ থেকে প্রায় চারশো বছর আগে বাংলাদেশেতাহেরপুর নামে এক জায়গায় নাকি এই শারদ উৎসবের প্রথম সূচনা। তাহেরপুরের রাজা কংসনারায়ণ নাকি এই উৎসবের প্রবর্ত্তক বলে শোনা যায়। রাজা কংসনারায়ণ অত্যন্ত দয়ালু ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিছিলেন। এছাড়া তিনি ছিলেন জগজ্জননী শক্তির উপাসক। তিনি শক্তিমন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে নিজ রাজ্যে মৃন্ময়ী প্রতিমা গড়িয়ে, চারশো বছর আগে এই উৎসবের শুভ সূচনা করেন। এর ফলে তিনি ধর্মপ্রাণ হিন্দুর জীবনে এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করলেন। বারভূঁইয়া গ্রন্থে জানা যায় রাজা কংসনারায়ণ আনুমানিক আট লক্ষ টাকা ব্যয় করে এই উৎসব সুসম্পন্ন করেন। তাঁরই সময়ে স্মার্ত্ত রঘুনন্দন শারদ উৎসবের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করলেন। তাঁর লিখিত এই শ্লোক আজও বারবার স্মরণ করার মত। তিনি লিখেছেন—

"বোধয়েৎ বিল্বশাখায়াং ষষ্ঠ্যাং দেবীং ফলেষুচ।
সপ্তম্যাং বিল্বশাখাং তামাহৃত্য প্রতিপূজয়েৎ॥
পুনঃ পূজাং তথাষ্টম্যাং বিশেষেণ সমাচরেৎ।
জাগরঞ্চ স্বয়ং কুর্য্যাদ্বলিদানং মহানিশি॥
প্রভূতবলিদানঞ্চ নবম্যাং বিধিবচ্চরেৎ।
ধ্যায়েদ্দশভুজাং দুর্গাং দুর্গাতন্ত্রের পূজয়েৎ॥
বিসর্জ্জনং দশম্যন্তু কুর্য্যাদ্ধি শারদোৎসবৈঃ।
ধূলিকর্দ্দমবিক্ষেপৈঃ ক্রীড়াকৌতুক মঙ্গলৈঃ॥

উপরোক্ত শ্লোকে কবি মানবিক সমাজ চেতনার কথা বলেছেন। বস্তুতঃ এই দশভুজার আরাধনা সকল মানুষের নিত্য নূতন উৎসব। মাতৃপূজায় সকলের অংশ গ্রহণের উল্লেখ মহাভারতেও দেখতে পাওয়া যায়। সেখানে আছে—"শবরৈর্ববরৈশ্চৈব পুলিন্দৈশ্চৈব পূজ্যাতে"। সার্বজনীন এইশারদউৎসবে

দীক্ষিত হবার আহ্বান জানিয়েছে। এই মাতৃ-পূজায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এদের মধ্যে কোনরূপ ভেদাভেদ থাকবেনা। বিসর্জনান্তে সকলেই কাদামাটিতে শেষবারের মত লুটিয়ে পড়বে। শরৎ ঋতুর অখিল বাতাসে মাতৃনাম ধ্বনিত হ'বে। সেইসঙ্গেই শরতের সার্বজনীন রূপটিও চারিদিকে ফুটে উঠবে। মহামায়া দেবী দুর্গার বর্ণনা প্রসঙ্গে উপনিষদ্ বলেছেন—"জননী দুর্গাই অষ্টরূপিণী, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, বিশ্ব দেবগণ, সোমপায়ী, অসোমপায়ী সকলেই। অসুর, রাক্ষস, পিশাচ, যক্ষ, সিদ্ধ প্রভৃতি সকলই তিনি। সত্ত্ব রজঃ তমোগুণ সকলই তিনি। জননী দুর্গাই গ্রহ নক্ষত্রাদি জ্যোতিঃ স্বরূপা এবং কলা-কাষ্ঠাদি কালস্বরূপিণী।" তিনি যখন বিরাট বিশ্বের সকল শক্তিরই আধার তখন তাঁর পূজায় সকলের অংশ গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন। অন্য অর্থে দেবী দুর্গা হচ্ছেন বিশ্বজননী, করুণা রূপিণী কল্যাণময়ী মাতৃস্বরূপা। ১৩২৯ সালের কার্ত্তিক মাসের 'সাহিত্য পত্রিকায়' বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গোৎসব সম্পর্কিত একটি রচনা প্রকাশিত হয়। এই রচনাটি এরও আগে অর্থাৎ ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে, আজ থেকে ঠিক একশো বছর আগে ইংরাজীতে প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধে লেখা হয়েছে—

"আমাদের সকল উৎসবের মধ্যে দুর্গোৎসবই শ্রেষ্ঠ উৎসব। এই দুর্গোৎসবের ব্যাখ্যা এইভাবে করা যাইতে পারে। ভারতের জোতিষশাস্ত্রে বর্ষের দ্বাদশ মাসকে দ্বাদশ সংক্রামণ অনুসারে আখ্যাত করা হয়। অর্থাৎ সূর্য্য যে মাসে যে রাশিতে সংক্রমত হন, সেই রাশি অনুসারে সেই মাসের নামকরণ করা হয়। যেমন বৈশাখ মাসে মেষ রাশি, মেষ রাশিস্থ ভাস্কর বলিলেই বৈশাখ বুঝায়। তেমনই জ্যৈষ্ঠ মাসে বৃষ রাশি। তেমনই আবার আশ্বিন মাসে যখন দুর্গোৎসব হয় তখন দুর্গা সিংহবাহিনী, কন্যা সিংহের পৃষ্ঠেই আসেন।"

বঙ্কিমচন্দ্র ১২৮১ সালের 'ভ্রমর' পত্রিকায় দুর্গোৎসব সম্পর্কিত আর একটি প্রবন্ধে লিখেছেন "শক্তি যেমন সর্বলোকপূজ্যা, আর দুইটি বাঙালীর কাছে তেমনি পূজ্য। বাঙালী দর্শনশাস্ত্রে শুনিয়াছে যে জ্ঞানেই নিঃশ্রেয়স—শক্তিতে নহে। ঐশী শক্তির গুণে,জ্ঞানব্যতীত,আমরা মুক্তিলাভকরিতে পারিনা। আরোও বাঙালী দেখে যে শক্তিই হউক আর জ্ঞানই হউক, ইহকালের সুখ দুইয়ের এক হইতে হয়না। শক্তিশালীও দুঃখ পায়, জ্ঞানবানও দুঃখ পায়। অতএব ইহলোকের সুখ দুইয়ের একেরও দেয় নহে। সেটি ভাগ্যাধীন। অতএব ভাগ্য একটি পৃথক দেবতা। ভাগ্যলক্ষ্মী জ্ঞান সরস্বতী। বাঙালী তিনটিকে একত্রে পূজা করে। এই বাঙালীর মহোৎসব।"

আর শারদীয়া পূজাই হ'চ্ছে আমাদের জীবনের প্রকৃত মহাপূজা। এ প্রসঙ্গে স্বর্গত অক্ষয়চন্দ্র-সরকারের উক্তিটি বিশেষ স্মরণীয়। তিনি লিখেছেন "যে ভাবে মহাকাল এই বিশাল ধরণীপৃষ্ঠে স্তরের পর স্তর সংগ্রহ করিয়াছেন, যেভাবে কাল মাহাত্ম্যে হিন্দুধর্মে কালমাহাত্ম্যে স্তরের পর স্তর উঠিয়াছে, সেই ভাবে বাঙালীর দুর্গোৎসবে নানা প্রকার উপাসনা এবং নানারূপ উপকরণ উদ্ভূত হইয়াছে। অতীত ভক্ত বঙ্গবাসী অতীত সাক্ষীর পরামর্শ মত সেই সকল সংগ্রহ করিয়াছেন। যে বিবর্তন—বিকাশ জড়জীবজগতের মূল নিয়ম, সেই বৈদিক-কালের শক্তিরূপা অতসীবর্ণময়ী উজ্জ্বলা—অনল-শিখা আজি এই অধঃপতনের দুর্দিনে সর্বদেব পরিবেষ্টিতা মহাশক্তিতে চণ্ডীমণ্ডপ মণ্ডিত করিতেছেন।"

এই মহাপূজার প্রচলনের সঙ্গে বাঙালী জীবনের কি এক আশ্চর্য্যসুন্দর দীর্ঘ নিবিড় সংযোগ। পূজোর এই চারটি দিনের জন্য বাঙালী সমাজের

আর ভক্তির মধ্য দিয়ে পূজোর সার্বজনীন রূপটি ধর্মীয় জীবনের মানমন্দিরে প্রতি বছরই বিস্তৃতি লাভ করছে এটা সত্যিই খুব আনন্দের। আজ পূর্বেকার ঘট আর পটের পূজার পরিবর্তে শিল্পীর তুলির যাদুস্পর্শে মাতৃমূর্তিগুলি বিচিত্র রূপ ধারণ করেছে ঠিকই কিন্তু পূজার প্রচলন যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। একদিন এ পূজা মুষ্টিমেয় ধনীর অঙ্গনেই অনুষ্ঠিত হ'ত সকলের পক্ষে এ পূজা করার সামর্থ্য ছিল না। অতএব আজ শরতের অখিল আকাশে সার্বজনীন পূজার রূপটি বাঙালী হৃদয় এত বেশী মথিত করে। শেষে যুক্তিবাদী চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তিটিকেই স্মরণ করি "এ প্রতিমা কখনো মিথ্যা বিষয়ের প্রতিমা নহে, তাহা হইলে এতদিন ধরিয়া এত কোটি লোকে এত উল্লাসের সহিত কখন ইহা পূজা করিত না। যাহা মনুষ্যহৃদয়ে বদ্ধমূল, তাহা কখনো মিথ্যা নহে।"

॥ মাতৃ আহ্বান ॥

শ্রীমোহিনীমোহন গাঙ্গুলী

এসোমা জননী চির কল্যাণী মধুর শরতে আজি—
দিগদিগন্তে তব আগমনী সঙ্গীত উঠে বাজি।
আলো ঝল মল প্রান্তরে মাগো সবুজ আসন পাতা
শিউলি ভরানো কচি তৃণ দলে শিশিরের মণি গাঁথা!
কাশের কেশর দুলিছে বাতাসে—তটিনী তুলিছে তান
আলোকে ছন্দে কুসুমে গন্ধে পুলকে পুরিত প্রাণ।

তবু কেন আঁখি বেদনায় ম্লান? সন্ত্রাসে কাঁপে ধরা,
অসুর পশুর পাশবিকতায় নিখিল পৃথিবী ভরা।
মরণ রণের বাদ্য বাজিছে—দিকে দিকে অভিযান
দৈত্যেরা করে নিরীহ লোকের তপ্ত শোণিত পান।
দুর্বল ভীরু লাঞ্ছিত জাতি ভাসিছে অশ্রু জলে—
সত্য সাম্য প্রেম প্রীতি দলি' নিষ্ঠুর পদতলে
ছুটে দানবেরা: রক্ত প্লাবন ছুটিছে অভ্রলেহী—
মৃন্ময়ী নয়, চিন্ময়ী হয়ে আয় মা জ্যান্ত দেহী।

অসুর নাশিতে, ঘন দুর্দ্দিনে অসুর নাশিনী মাগো—
দশপ্রহরণ দশহাতে ধরি দশদিকে জাগো জাগো।
ত্রিনয়নে তোর জ্বলুক অনল ধ্বংসের হুতাশন
মদনমত্ত অসুরের সাথে শুরু হোক মহারণ।
দানব রক্তে রাঙায়ে পৃথ্বী—করে দাও মাটি লাল
বঙ্গ-শ্মশানে জাগিয়া উঠুক নিদ্রিত মহাকাল।
এসো এসো তুমি রণচণ্ডিকা—আহ্বান করি আজ—
ধরো রুদ্রাণী শঙ্করী তুমি ধ্বংসের নব সাজ।

হে জ্যোতির্ম্ময়ী! অন্ধ তামসী রজনীরে করো ভোর-
অসুর দলিতে, বিশাল মহীতে অকাল বোধন তোর।

দেবী-দুর্গা

নির্মলগোপাল গঙ্গোপাধ্যায়

পূর্ব দিগন্তে তপ্ত-কাঞ্চন-বর্ণাভা যে জননীর জ্যোতির কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়, সেই মা দুর্গা বৎসরান্তে বঙ্গভূমিতে আসছেন। দুর্গা-পূজা বাঙ্গালীর জাতীয় উৎসব। পৌরাণিক দেবীগণের ভিতর দেবী দুর্গা অতীব শক্তিশালিনী। তপ্তকাঞ্চন-বর্ণাভা গৌরী এবং দশভূজা দুর্গার শুভাগমনে বাঙ্গালী মাত্রই আনন্দোল্লাসে চঞ্চল হয়ে মেতে ওঠে। সুদীর্ঘকাল থেকেই বাঙ্গালীর জীবন ও মননের সঙ্গে শারদীয় এই মহাপূজার একটি অন্তরঙ্গ সম্পর্ক অলক্ষ্যে গড়ে উঠেছে। বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠতম ও বৃহত্তম পূজা ও উৎসব উপলক্ষ্যে প্রবাসীর স্বদেশে আপন-জনের নিকট আগমন, প্রমোদ-ভ্রমণ, নব বস্ত্র ও পোষাক-পরিচ্ছদ ক্রয়, সজ্জা, হৈ-হুল্লোড়ে দোকানপসার পথ-ঘাট, বারোয়ারী-আসর চতুর্দিকে সর্বত্রই একটা প্রাণচাঞ্চল্য দৃষ্ট হয়। নগর-পল্লী সবই এই দুর্গাপূজার হাওয়ায় প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। এই প্রাণ-বন্যায় মানুষ তার দুঃখ-কষ্ট-আঘাত সব কিছু সাময়িকভাবে বিস্মৃত হয়। নিঃসন্দেহে এই মহাপূজা বাঙ্গালীকে অনুপ্রাণিত করে এবং বঙ্গসমাজে নবজীবনের অনুভূতি ও প্রেরণা জাগ্রত করে। বাঙ্গালী না উদ্দীপনায় জগজ্জননীকে আহ্বান করে, তাঁর প্রতিষ্ঠার পীঠ রচনা করে এবং উৎসবের প্রাচুর্যে মহানন্দে অভিষিক্ত করে তাঁকে অর্চনা করে। আত্মনিবেদনান্তে বিগত-দিনের গ্লানি থেকে মুক্তি বাঞ্ছা করে আগামী জীবনের জন্য সাহস, শক্তি ও সম্পদ প্রার্থনা করে।

দুর্গতিনাশিনী মাতা দুর্গা আসছেন। বাঙ্গালী তাঁর কৃপা প্রার্থনা করবে। আত্ম-নিগ্রহ, অহিংসা, ক্ষমা, শৌচ প্রভৃতি পরম পুষ্প দিয়ে এবং সর্বস্ব নিবেদনান্তে বাঙ্গালী তাঁর পূজায় প্রবৃত্ত হবে।

যাঁর শুভাগমনোপলক্ষে আজ চতুর্দিকে সাড়া পড়ে গিয়েছে—স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের কলরবে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠেছে, সেই দুর্গা কে?

কেনোপনিষদে সুন্দরভাবে বর্ণিত একটি উপাখ্যান থেকেই এর পরিচয় পাওয়া যায়:

বহু-বহু বর্ষ পূর্বেকার পুরাকালের কাহিনী। তখন প্রায়ই দেবাসুরে সংগ্রাম হত। এবম্প্রকার এক দেবাসুর-সমরে সর্বান্তর্যামী ব্রহ্ম দেবতাদের পক্ষে দনুজগণকে পরাজিত করেন অর্থাৎ পরমাত্মা ব্রহ্মের অনুগ্রহেই দেবগণের জয় হয়, কিন্তু ব্রহ্মাত্মতত্ত্ব সম্পর্কে দেবতাগণ সর্বৈব অজ্ঞ থাকা হেতু তাঁদেরই অন্তরাত্মা পরম ব্রহ্মের কৃপাই যে এই বিজয়ের মূল হেতু তা দেবগণ অনুধাবন করতে অক্ষম হয়ে সকলের অন্তর্যামী ব্রহ্মকৃত এই জয়ের গৌরবকে স্বীয় জয় ভেবে তাঁরা বেশ কিছু প্রফুল্ল ও দৃপ্ত হয়ে উঠলেন। দেবগণ মুখেও এ-কথা প্রকাশ করলেন যে, এই যুদ্ধ জয়ের গৌরব ও মহিমা তাঁদেরই। দেবগণের এবম্বিধ অলীক উল্লাস সর্বান্তর্যামী ব্রহ্মের নিকট অবিদিত রইল না বটে কিন্তু এতে তিনি অসন্তুষ্ট ও রুষ্ট হলেন না, বরং এ তাঁর চিত্তে কারুণ্যের উদ্রেক করল। দেবগণের এই মিথ্যা অহমিকা ও অজ্ঞানতা দূর করবার স্পৃহায় ব্রহ্ম এক অতি-মহৎ যক্ষরূপ (যজনীয় পূজ্য) পরিগ্রহ করে দেবতাদের সম্মুখে আবির্ভূত হলেন। সেই অদৃষ্টপূর্ব রূপ আত্মজ্ঞানহীন দেবতাগণ অবলোকন করে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। তাঁরা এই অজানা যক্ষের পরিচয় অবগত হওয়ার জন্য আগ্রহান্বিত ও ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। দেবগণ সর্বপ্রথমে সর্বজ্ঞ অগ্নিদেবকে (জাতবেদা) এই যক্ষের পরিচয় জেনে আসবার জন্য প্রেরণ করলেন। যক্ষের নিকট অগ্নিদেব উপস্থিত হতেই যক্ষ তাঁর পরিচয় ও শক্তি জানতে চাইলেন। অগ্নিদেব তাঁর পরিচিতি জ্ঞাপনান্তে তিনি যে পলকে বিশ্বের সর্ব পদার্থ দগ্ধ করতে সক্ষম তাও জানালেন। যক্ষ জাতবেদার সমক্ষে একগাছা তৃণ স্থাপন করে তা দগ্ধ করতে বললেন। সর্বতেজ প্রয়োগ করেও অগ্নিদেব তৃণটি দগ্ধ করতে অপারগ

হয়ে লজ্জায় অধোবদন হয়ে দেবতাগণের সমীপে প্রত্যাবর্তন করে যক্ষের স্বরূপ নির্ণয়ে তাঁর ব্যর্থতা জ্ঞাপন করলেন। অতঃপর দেবগণ পবনদেবকে (মাতরিশ্বা) যক্ষের কাছে পাঠালেন। পূর্বের ন্যায় একই ভাবে যক্ষ বায়ুদেবের পরিচয় ও শক্তি জানবার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। স্বীয় পরিচয় নিবেদনান্তে মাতরিশ্বা জানালেন যে, পৃথিবীর সবকিছু নিমেষে তিনি উড়িয়ে দিতে সক্ষম। মাতরিশ্বার সামনে একটি তৃণ রেখে যক্ষ সেটি উড়িয়ে দিতে বললেন। পবনদেব তাঁর সব বল ও বেগ নিয়োজিত করেও তৃণটিকে স্থানচ্যুত করতে সমর্থ না হয়ে বায়ুদেবও লজ্জায় নতমস্তকে প্রত্যাগমন করলেন। গত্যন্তর না থাকায় দেবগণ তখন দেবরাজ ইন্দ্রকে যক্ষের স্বরূপ জানবার জন্য উপরোধ করায় ইন্দ্র স্বীকৃত হয়ে যক্ষের পরিচয় অবগত হওয়ার জন্য গমন করলেন। মন্থর-পদক্ষেপে যক্ষের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতেই যক্ষ ইন্দ্রের সমক্ষে অন্তর্হিত হলেন। দেবতাগণের মধ্যে সর্বাধিক শক্তিমান ইন্দ্র, কিন্তু তাঁর সে দৈবশক্তি যে ব্রহ্মশক্তির নিকট কত নগণ্য তা উত্তমরূপে উপলব্ধি করিয়ে দেওয়ার মানসেই যক্ষ তথা ব্রহ্ম ইন্দ্রের সঙ্গে বাক্যালাপ না করে অদৃশ্য হলেন। এতে দেবরাজ ইন্দ্র চিন্তিত ও আশ্চর্যে নীরব হয়ে গেলেন। বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে ইন্দ্র যখন দণ্ডায়মান ছিলেন, তখন অকস্মাৎ তাঁর সম্মুখস্থ গগনে অপরূপ শোভাময়ী দেবীর রূপে উমা-হৈমবতীর আবির্ভাব ঘটামাত্র সসম্ভ্রমে দেবাদিদেব ইন্দ্র প্রণত হয়ে দেবীর নিকট যক্ষের পরিচয় জানতে চাইলেন। দেবীর নিকট হতে ইন্দ্র যখন জ্ঞাত হলেন যে, এই যক্ষই সকলের অন্তরাত্মা-অন্তর্যামী, পরমাত্মা এবং ইনিই দেবাসুর সংগ্রামের জয়ের হেতু—যাঁর গৌরব আত্মসাৎ করে দেবগণ গৌরবান্বিত হয়েছিলেন। তখন ইন্দ্র একদিকে বিস্মিত, ক্ষুব্ধ ও লজ্জিত হলেন, তদ্রূপই অপর দিকে তিনি এই জ্ঞানার্জন করলেন যে, ব্রহ্মের শক্তিতেই সকলে শক্তিমান্।

ভগবান পূজ্যপাদ শ্রীশঙ্করাচার্য লিখেছেন যে, এই উমা হৈমবতী হেমাভরণ-ভূষিতা পর্বতপতি হিমবৎ তনয়া হরগেহিনী দেবী পার্বতী। সর্বজ্ঞ পরমেশ্বরের ইনিই নিত্য-সহচরী—ইনি মূর্তিমতী ব্রহ্মবিদ্যা।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকে এবং নারায়ণ উপনিষদে পাওয়া সিদ্ধির জন্যই ইনি জন্মগ্রহণ করেন।

সর্বদেবতার সর্বপ্রকার তেজ, শক্তি ও দ্যুতি হতে এই দনুজদলনী দেবীর আবির্ভাব। তাঁর পদভরে ভূলোক প্রকম্পিত হয়, পর্বতরাজি বিচলিত হয়, সপ্তসিন্ধুর অম্বু উচ্ছলে ওঠে। আলুলায়িত কুটিল তাঁর কুন্তলভারের আলোড়নে মেঘমণ্ডল খণ্ড খণ্ড হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে যে উন্মাদিনী জননীর প্রচণ্ড লীলায় ক্ষণিকে প্রলয় সংসাধিত হয়, সেই রুদ্রমূর্তিতে বাঙালী দুর্গা-পূজা করে না। বাঙালী তার হৃদয়ের অনুরাগে, বাঙলার জল, বায়ু, মাটি, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সন্তানস্নেহে উন্মাদিনী শরচ্চন্দ্রনিভাননা জননী- দুর্গার মুখ মাধুরীতে রূপায়িত করেছে। প্রাচীন পুঁথিতে দুর্গার যে আকার, প্রকার ও রূপের বর্ণনা আছে তার সঙ্গে বাঙালী কর্তৃক অধুনার্চিত দুর্গার মিল অত্যল্প। অবশ্য এ-ও অতীব সত্য যে, পুরাণে, মহাভারতে (বোম্বাই সংস্করণে) ও অপরাপর গ্রন্থে দুর্গা সম্বন্ধে পরস্পর-বিরোধী বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। সেই দিক থেকে বাঙালী ষড়ৈশ্বর্য-বিমিশ্র যে মাধুর্য পরিকল্পনা করেছে তা অপরূপ এবং বাঙালী তার সাধনা-বলে বিশ্বেশ্বরী জগজ্জননীর এই যে অপরূপ-রূপ খুলে দিয়েছে তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

পূর্বেই বলেছি যে, দেবী-দুর্গা সর্বাপেক্ষা অধিক শক্তিশালিনী এবং অসুর বিনাশ করে সর্ববিধ মঙ্গল বিধান এই শক্তির লক্ষ্য। সত্যযুগে সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্যের তিন বৎসরব্যাপী দুর্গার আরাধনা থেকে প্রভাময়ী দ্যুতিময়ী, শক্তি ও তেজোময়ী এই দুর্গার পরিকল্পনা কিঞ্চিৎ পরিবর্তিতাকারে বাঙলায় এসেছে। দুর্দমনীয় মহিষাসুরকে বধ করণার্থে সকল দেবতার বিক্রমরাশি একত্র হয়ে দুর্গা-মূর্তিতে পরিণত হয়েছিল। রাবণ নিধনের জন্য শ্রীরামচন্দ্র শরৎ-ঋতুতে আশ্বিন মাসে দুর্গা-পূজা করেছিলেন এবং প্রকৃতপক্ষে তারই স্মৃতি বাঙালীর এই দুর্গার্চনা বহন করে।

বিশ্বপালয়িত্রী জীবধাত্রী মহাশক্তি-স্বরূপিণী জগন্মাতার পূজা করলে তিনি সর্বজনের সকল দুর্বলতা ও কাপুরুষতা দূর করবেন। বাঙালীর এই মাতৃপূজা বিশ্ববাসীর কল্যাণ এবং সমগ্র জগতের শান্তি আনয়ন করবে। দেবী-দুর্গার আশীর্বাদে সকলেরই কল্যাণ ও মঙ্গল হবে। দিকে-দিকে পুলক খেলবে। বাঙালীর দুর্গা-পূজা সার্থক হবে।

অমিত্রাক্ষর

=নাটক=

সুশীল মুখোপাধ্যায়

চরিত্র

১। শশাঙ্কশেখর
২। মানস
৩। অশ্বিনী
৪। বিকাশ
৫। দেবেশ
৬। সমিত
৭। রথীন
৮। রমেশ
৯। পরেশ
১০। ব্রজেন
১১। সোনা
১২। উমা
১৩। মীরা
১৪। কমলা
১৫। বেয়ারা
১৬। খোকন
১৭-১৯। তিনজন ছাত্র

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[শশাঙ্কশেখর ভট্টাচার্য্যের বাড়ীর একটী ঘর। সময় সন্ধ্যা। ঘরের আসবাব পত্র অতি সাধারণ ধরণের। খোলা জানালা দিয়ে শশাঙ্কশেখর বাহিরে রাস্তার দিকে চাহিয়া আছেন। রাস্তার আলো জলিয়া উঠিল। শশাঙ্কশেখর একভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। প্রবেশ করিল স্ত্রী উমা। ঘরের আলো জ্বালাইয়া দিয়া বলিল—]

উমা॥ সেই বেলা পাঁচটা থেকে জানালায় দাঁড়িয়ে আছ? সন্ধ্যে হয়ে গেছে হুঁস নেই? আজ বুঝি সন্ধ্যে-আহ্নিক করবে না?

শশাঙ্ক॥ তাইত! কিন্তু মানস ত এখনও ফিরলোনা—

উমা॥ সন্ধ্যের সময় কবে সে বাড়ী ফেরে?

শশাঙ্ক॥ কিন্তু আজ একটা বিশেষ দিন। আজ মানসের এম-এ পরীক্ষার খবর বেরোবে। আমি তাকে বলে দিয়েছি যে খবর পেলেই সে যেন বাড়ী চলে আসে।

উমা॥ তাহলে হয়ত' খবর ভালো নয়।

শশাঙ্ক॥ না না উমা, তা হতে পারে না।

উমা॥ তবে সে আসতে এত দেরী করছে কেন?

শশাঙ্ক॥ আমার মনে হয় পাশের খবর পাওয়ার পর বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে একটু আমোদ আহ্লাদ করছে। জানো উমা আমার নিজের এম-এ পড়ার সুযোগ হয় নি। তাই আমার বরাবরের আশা মানসকে এম-এ পাশ-করাবো। আজ আমাদের বড় আনন্দের দিন।

উমা॥ আগে পাশের খবর পাও তারপর আনন্দ কোরো। পাশ ফেলের কথা কী কিছু বলা যায়?

শশাঙ্ক॥ মানস পাশ করবেই। আমি তার জন্যে কত চেষ্টা করেছি কত কষ্ট করেছি—

উমা॥ তুমি চেষ্টা করলেও আর ছেলে পাশ করবে-না। স্কুল আর ছাত্র পড়ানো নিয়ে তুমিত দিনরাত ব্যস্ত

থাকতে। মানস বই নিয়ে কতক্ষণ বাড়ীতে পড়তো সে খবরত জানে না—

শশাঙ্ক॥ (হাসিয়া) এম-এ পড়া বাড়ীতে বসে হয়না। লাইব্রেরীতে বসে বড় বড় বই পড়তে হয়। দামী দামী সব বই—সে সব বই কেনার টাকা আমাদের কোথায়? তুমি মাঝে মাঝে বলতে মানস কলেজের পর বাড়ী আসে না। বাড়ী ফেরে রাত দশটায়। তুমি ভাবতে ও কোথায় যায় কী করে? কিন্তু আমি জানতুম যে মানস ক্লাসের পর লাইব্রেরীতে বসে পড়াশোনা করে।

উমা॥ সাতটা বাজতে চল্লো—পাশ করলে সে এতক্ষণ বাড়ী আসত —

শশাঙ্ক॥ (বোঝাইবার চেষ্টা করে) তুমি বুঝতে-পারছ না, বন্ধুরা তাকে ছাড়বে তবেত সে আসবে! মানসকে যে ওর বন্ধুরা খুব ভালবাসে—

উমা॥ সেটাইত ভাবনার কথা—

শশাঙ্ক॥ (হাসিয়া) কী যে তুমি বল? তুমি চাও নিজের ছেলেটাকে চিরদিন আঁচল চাপা দিয়ে কোলে শুইয়ে রাখতে। তা কী হয়? মানস এখন বড় হয়েছে। ও আস্তে আস্তে কত উঁচুতে উঠবে তুমি দেখো। পণ্ডিত বলে ওর কত নাম হবে। মানস আমাদের বংশের মর্য্যাদা রাখবে। আমরা ভাটপাড়ার কালিপদ ন্যায়রত্নের বংশ··· পণ্ডিত বংশ! তুমি দেখবে উমা, তোমার ছেলে পাশ-করে প্রোফেসর হবে, রিসার্চ করবে···কত বই লিখবে—

উমা॥ মানসকে ঘিরে তোমার অনেক আশা, অনেক স্বপ্ন! ভগবান করুন তা যেন সফল হয়—।

(উমা ভিতরে যায়। শশাঙ্ক পুনরায় মানসের জন্য প্রতীক্ষা করেন। কখনও জানালার কাছে যান কখনও বই লইয়া পড়ার চেষ্টা করেন আর বার বার ঘড়ির দিকে তাকান। দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। শশাঙ্কশেখর ভাবিলেন মানস। প্রবেশ করিল পরেশ চট্টোপাধ্যায়, শশাঙ্কর পুরাতন বন্ধু)

(দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ পাইয়া শশাঙ্ক বলিলেন—)

শশাঙ্ক॥ কে, মানস এলি?

পরেশ॥ (বাহির হইতে) আমি পরেশ শশাঙ্ক—

শশাঙ্ক॥ ও পরেশ! (অগ্রসর হইয়া গিয়া) এসো পরেশ এসো—

পরেশ॥ (ভিতরে আসিয়া) শশাঙ্ক, তুমি বোধ হয় অন্য কাউকে আশা করছিলে?

শশাঙ্ক॥ হ্যাঁ ভাই। মানসের জন্যে বিকেল পাঁচটা থেকে অপেক্ষা করছি। আজ ওর এম-এ পরীক্ষার খবর বেরুবে—

পরেশ॥ আমিও ত আজ সকালে কাগজে ঐ খবর দেখে তোমার এখানে এলুম—

শশাঙ্ক॥ বেশ করেছ। বোসো পরেশ বোসো। মানস এখনি আসবে—

(উভয়ে বসিল)

তারপর তোমার খবর বল। কোলকাতায় কবে এলে?

পরেশ॥ কাল এসেছি। চাকরীর মেয়াদ তো ফুরোলো।

শশাঙ্ক॥ সে কী?

পরেশ॥ (ম্লান হাসিয়া) আবার কী? ৩৫ বছর সেলসম্যানের কাজ করলুম। যতদিন ঘোরাফেরা করে ব্যবসা দিয়েছি ততদিন কোম্পানী টাকা দিয়েছে তারপর যেই বয়স হোলো কাজকর্ম্মও বিশেষ দিতে পারলুম না, সঙ্গে সঙ্গে ছুটী—

শশাঙ্ক॥ তাইত—

পরেশ॥ সেই জন্যেইতো তোমার কাছে এলুম শশাঙ্ক জানি, অন্ততঃ একটা ভাবনা থেকে তুমি আমায় মুক্তি দেবে—

শশাঙ্ক॥ তোমার মেয়ের বিয়ের কথা বলছো তো তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। কথা যখন তোমাকে দিয়েছি পরেশ, সে কথা আমি রাখবই। মীরা-মাকে আমি ঘরে আনবই—

পরেশ॥ সে কথা আমি জানি। তবে কী জানো শশাঙ্ক, আজকালকার ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে জোর করে কিছু তো বলা যায় না—

শশাঙ্ক॥ যায় পরেশ যায়। অন্ততঃ আমার ছেলে হয়ে আমি তোমাকে নিশ্চিত কথা দিতে পারি—

(প্রবেশ করে উমা)

উমা॥ (দরজার কাছ হইতে) আজ আর সন্ধে আহ্নিক করবে কখন? (সহসা জনৈক আগন্তুক দেখিয়া ফিরিয়া যাইবার উপক্রম করে)

পরেশ ॥ (সহাস্যে) বৌঠান, আমি পরেশ—

উমা ॥ (যাইতে যাইতে ফিরিয়া) ও, অনেক দিন [...]রে এলেন তাই···

শশাঙ্ক ॥ তা ছাড়া জানো পরেশ, তোমার বৌঠানের [...]চাখটা ক'মাস হোলো বড় কষ্ট দিচ্ছে। ওঁর আজকাল [...]ন্ধ্যের পর দেখতে বেশ কষ্ট হয়—

পরেশ ॥ তাই নাকি ? ডাক্তার দেখাচ্চ ত ?

শশাঙ্ক ॥ হ্যাঁ, আমার দুজন পুরোনো ছাত্র দুজনেই [...]শ বড় চোখের ডাক্তার। তাদের দেখিয়েছি, কিন্তু [...]ানো বিশেষ ফল হয় নি—

পরেশ ॥ তাই তো !

উমা ॥ (প্রসঙ্গ চাপা দেওয়ার জন্য) মীরা কেমন [...]াছে ?

পরেশ ॥ মীরা ভালোই আছে।

উমা ॥ তাকে নিয়ে এলেন না কেন ?

শশাঙ্ক ॥ (সহাস্যে) ঐ শোনো পরেশ, তোমার [...]ৌঠান রীতিমত আধুনিকা হয়ে উঠেছেন ! বৌ হয়ে [...]রে আসার আগেই মীরা-মাকে এখানে যাতায়াত সুরু [...]রতে বলছেন—

পরেশ ॥ (সহাস্যে) তা কি হয়েছে ? নিজের ঘরে [...]াসবে তাতে দোষ কী ?

শশাঙ্ক ॥ আরে দাঁড়াও ভাই। দুটো বছর যাক। [...]ানসের জন্যে যে রিসার্চের কথাটা ভেবে রেখেছি সেটা [...]দ আগে শেষ করুক। এত তাড়াতাড়ি কেন ? উমা, [...]রেশের জন্যে চা নিয়ে এসো— (উমা ভিতরে যায়)

পরেশ ॥ কী জানো শশাঙ্ক, কিছুদিন থেকে শরীরটা [...]ালো যাচ্চে না। কবে কী হয় কিছুই বলা যায় না। [...]াই বলছিলুম মীরার বিয়েটা যত শীগ্‌গির দিয়ে দিতে [...]ারি ততই ভালো। জানোইত মা-মরা ঐ একটী আমার [...]ময়ে। কোনোরকমে বি-এ অবধি পড়িয়েছি। এবার [...]াশও করেছে, অনার্সও পেয়েছে। কিন্তু আর আমার [...]াড়াবারও ক্ষমতা নেই। এবার কোনোরকমে বিয়েটা [...]দতে পারলেই নিশ্চিন্ত হতে পারি—

শশাঙ্ক ॥ তুমি কিছু ভেবো না, পরেশ ! তোমার [...]ীর মৃত্যুশয্যায় আমি তাঁকে কথা দিয়েছি। সে আমি [...]ভুলি নি।

পরেশ ॥ সবই জানি। তবে মেয়ের বাপ বুঝতেইত পারো। তাছাড়া ঐ যে বললুম, দিনকাল পাল্টে গেছে। ছেলেমেয়েরা যে সব সময় বাপ-মার কথা শুনবে এ ভরসা আজকাল করা যায় না—

শশাঙ্ক ॥ (হাসিয়া) মানস আমার তেমন ছেলে-নয়, পরেশ। বেশত, মানসও এখনই আসছে, তার সামনেই আজ কথা হয়ে যাবে—

(উমা পরেশের চা-খাবার লইয়া প্রবেশ করে)

উমা ॥ (পরেশকে) আপনার চা—

(পরেশ চা পাইয়া পান করিতে সুরু করিবে এমন সময় প্রবেশ করে দেবেশ)

দেবেশ ॥ কাকীমা, মানস এসেছে ?

উমা ॥ (রাত্রে চোখে ঝাপসা দেখে) কে ?

দেবেশ ॥ আমি দেবেশ কাকীমা।

উমা ॥ ও দেবেশ, কী খবর বাবা ?

দেবেশ ॥ মানস বাড়ী এসেছে ?

উমা ॥ না, মানস তো এখনও আসে নি।

দেবেশ ॥ মানস বাড়ী আসে নি ?

শশাঙ্ক ॥ মানস পরীক্ষার খবরের জন্যে দুপুরে বেরিয়েছে ; তুমি যাও নি ?

দেবেশ ॥ (অগ্রসর হইয়া শশাঙ্ককে প্রণাম করিতে করিতে) আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি ফার্ষ্টক্লাশ পেয়েছি—

শশাঙ্ক ॥ বাঃ, বাঃ, বড় খুসী হলুম দেবেশ—

উমা ॥ বেঁচে থাকো বাবা দীর্ঘজীবী হও—

শশাঙ্ক ॥ আচ্ছা, দেবেশ মানসের কী হোলো ?

(দেবেশ নীরব থাকে)

দেবেশ, মানসের খবর তুমি কিছু জানো ?

দেবেশ ॥ কাকাবাবু, মানস পাশ করতে পারে নি—

শশাঙ্ক ॥ (বিশ্বাস করিতে পারে না) মানস পাশ করতে পারে নি ! দেবেশ তুমি ঠিক জানো মানস পাশ করতে পারে নি—

দেবেশ ॥ জানি কাকাবাবু। খবরটা পাওয়ার পরই মানস যে কোথায় গেল দেখতেই পেলুম না। তাই খবর নিতে এসেছিলুম সে বাড়ী এসেছে কি না—

শশাঙ্ক ॥ (হতাশ ও বিভ্রান্ত ভাবে) উমা শুনেছ,

মানস ফেল করেছে। পরেশ, মানস ফেল করেছে। তার মানে, আমি--আমি ফেল করেছি—

—২য় দৃশ্য—

ক্যালকাটা কফি কর্ণার— C, C, C, কলেজ স্কোয়ার অঞ্চলের একটী মোটামুটী পরিচ্ছন্ন প্রতিষ্ঠান।]

দৃশ্যের সুরুতে দেখা যায় কয়েকজন ছাত্র খাওয়া শেষ করিয়া বিল চুকাইয়া মশলা মুখে দিয়া, সিগারেট ধরাইয়া চলিয়া যাইতেছে।

প্রতিষ্ঠানের মালিক ব্রজেনবাবু—মোটাসোটা কালো, মাথায় টাক, বয়স ৫৫।৬০ কাউণ্টারে বসিয়া আছেন। অল্প কথার লোক, কিন্তু সব দিকে নজর। সব দেখাশোনা করে একজন বয়—নাম সোনা। চালাক চতুর চটপটে ছোকরা, রোগা, কালো, লম্বা, বয়স ১৬ হইতে পারে বা ২৬ও হইতে পারে। রেডিওতে হিন্দীফিল্ম সঙ্গীত বাজিতেছিল। সোনা খুসীমনে রেডিওর গান শুনিতে-শুনিতে টেবিল পরিষ্কার করিতেছে ও মাঝে মাঝে নিজেও গাহিতেছে। ব্রজেনবাবু নির্বিকার, হিসাব লিখিতে ব্যস্ত। এমন সময় প্রবেশ করে অশ্বিনী ঘোষ ও বিকাশ-মিত্র। দুজনেরই বয়স ৫০-এর উপর। অশ্বিনী ধনী ব্যবসায়ী। বিকাশ তাহার বন্ধু ও সহকারী। অশ্বিনী কথাবার্ত্তায় চালচলনে বর্তমান যুগের করিৎকর্মা ব্যক্তির জীবন্ত উদাহরণ। বিকাশ স্বার্থান্বেষী, ধূর্ত্ত, বাজের লোক।)

অশ্বিনী॥ (দরজার নিকট হইতে) বিকাশ এ কোথায় নিয়ে এলে ?

সোনা॥ (শুনিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ) সি-সি-সি! খুব ভালো জায়গা স্যার—

বিকাশ॥ ক্যালকাটা কফি কর্ণার! মিঃ ভগত ত এখানেই meet করবে বলেছে। ওদের এরকম জায়গা না হলে সুবিধে হয় না, জানোত'

সোনা॥ (সহাস্যে) আপনাদেরও কোনো অসুবিধে হবে না—বসে দেখুন (চেয়ার দেয়। পরমুহূর্ত্তেই এক-গাল হাসিয়া ওদের অভ্যর্থনা জানাইল। মেনু-কার্ড বিকাসের হাতে দিয়া অভ্যাস মত বলিল)

সোনা॥ এখানে সব পাবেন, স্যর! মটন-চপ, ফাউল দোপেঁয়াজী, মোগলাই পরটা, ডিমের ডেভিল, গরম চা, ঠাণ্ডা গরম ড্রিঙ্ক! রেট মডারেট! মশলা, ম্যাচিস্ ফ্রী! কী দেব বলুন ?

বিকাশ॥ (হাসিতে হাসিতে) শুনেছ ত!

সোনা॥ এখানে কত ভাল ভাল কলেজের ছেলে-মেয়েরা আসে আর একবার এলে উঠতেই চান না। একদিন দুপুরে আসবেন—

ব্রজেন॥ (হাঁক দিল) সোনা—

সোনা॥ যাই বড়বাবু।

(সোনা ব্রজেনের নিকট গেল ব্রজেন কানেকানে কী বলিয়া দিল। সোনা আসিয়া বলিল)

(অশ্বিনী-বিকাশকে) আপনাদের দুটো ফাউল দোপেঁয়াজী আর দুটো ডেভিল দি ?

বিকাশ॥ (হাসিয়া) আচ্ছা, নিয়ে এসো—

বিকাশ॥ চল আশ্বিনী আমরা ঐ পাশের টেবিলে বসি—

(অশ্বিনী ও বিকাশ দেওয়ালের পাশের একটি টেবিলে গিয়া বসে। সোনা খাবার দিয়া যায়। এই সময় প্রবেশ করে দুটি যুবক—মানস ও তাহার সহপাঠী রথীন মানস রথীনকে ধরিয়া আনিতেছে)

মানস॥ আয়, আয়! ফেল করেছিস ত কী হয়েছে

(অশ্বিনী ও বিকাশ একবার ফিরিয়া ওদের দে[illegible] তারপর পুনরায় কোকা কোলায় মন দেয়)

আমিও ত ফেল করেছি! কিন্তু আমি কী তে[illegible] মত ভেঙে পড়েছি ? আয়, কফি খাওয়া যাক—

রথীন॥ না মানস আমার ভালো লাগছে না আমায় ছেড়ে দে, বাড়ী যাই—

মানস॥ পাগল না কী ? এই mood-এ তো[illegible] ছেড়ে দি আর তুই রাস্তায় গাড়ী চাপা পড়—

রথীন॥ সে ঢের ভালো। বাড়ীতে আর এ দেখাতে পারবো না—

মানস॥ নাঃ! রথীন, তুই মেয়ে মানুষেরও অ[illegible] চোখের সামনে দেখলি লালী সেন কী করলে! পা[illegible] লিষ্টে নাম না পেয়ে চাইলে ডানপাশে, দেখলে বা[illegible] ঘোষ! তারপর বাঁ পাশে দেখলে ডবলু মিত্তি[illegible]

জনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে গ্র্যাসবাসাডার-এ চড়ে সলো! উড়ে যাবে outer space-এ! (হাঁক দিল) সোনা, দুটো কফি -

সোনা ॥ আনছি মানস দা—

রথীন ॥ দেখ মানস, ওদের কথা বাদ দে। ওরা ড়লোক, পাশ করলেই বা কী না করলেই বা কি? কিন্তু আমার অবস্থা তুই ত জানিস্। আমার কী ফেল করা লে?

মানস ॥ আমারই বুঝি চলে? আমার বাড়ীর বস্থা তোর অজানা নয়—

(সোনা কফি লইয়া আসে)

সোনা ॥ (কফি দিতে দিতে) আর কিছু দেব, মানস দা?

মানস ॥ (রথীনকে) বল আর কী খাবি?

রথীন ॥ কিছু না।

সোনা ॥ ফেল করেছে বুঝি?

মানস ॥ (ধমক দেয়) ভাগ এখান থেকে—

(সোনা দৌড়িয়া পালায়)

মানস ॥ নে, কফি খা—

রথীন অনিচ্ছাসত্ত্বেও খাইতে শুরু করে। মানসও কফি খাইতে থাকে। সিগারেট ধরায়)

(রথীনকে প্যাকেট দিয়া) নে, সিগরেট ধরা—

রথীন ॥ থাক, ভালো লাগছে না।

মানস ॥ (সিগারেটে টান দিয়া) রথীন, মনে জোর র। পরীক্ষায় পাশ করাই জীবনের সব চেয়ে বড় কাজ য়। জীবনকে এত ছোটো করে দেখিস নি। পৃথিবীতে নেক কাজ আছে যা পরীক্ষায় পাশ না করেও করা যায়, র বোধ হয় পাশ না করলেই ভালো করে করা যায়—

(অশ্বিনী মানসের কথাবার্তায় আকৃষ্ট হয়। কাশকে ইঙ্গিত করে। সোনা ওদের খাবারের প্লেট য়।)

সোনা ॥ (খাবার টেবিলে দিতে দিতে) স্পেশাল রী করে আনলুম, স্যার—একেবারে হাতে গরম—

(রাখিয়া দিয়া যায়। ওরা খাইতে খাইতে মানস-রথীনের কথাবার্তা শোনে)

topmen তাদের কজনের University র ডিগ্রী আছে? তারা কী মানুষ নয়?

রথীন ॥ তুই কাদের কথা বলছিস?

মানস ॥ কেন? বড় বড় industrialists ,business-magnats. traders.…

রথীন ॥ এদের তুই দেশের বড়লোক মনে করিস?

মানস ॥ নিশ্চয়ই। এরা নিজেরাই শুধু বড় হয় নি, এরা দেশকে বড় করেছে। এরা শুধু নিজেরাই টাকা করছে না, এরা দেশের সম্পদ বাড়াচ্ছে, কত লোককে employment দিচ্ছে। এরাই ত এ যুগের প্রকৃত মানুষ। আর এম, এ পাশ করে আমরা কী করতুম? মাষ্টারী কী প্রোফেসরী—এই ত?

রথীন ॥ সে কথা এখন ভাবতে পারছি না। আমি কেবল ভাবছি যে আমি পরীক্ষায় ফেল করেছি। সকলের কাছে আমি অপদার্থ—

মানস ॥ না সকলের কাছে নয়। আমার কাছে ত নয়ই। কারণ, আমি জানি যে এই ফেল করা ছেলেরাই একদিন সমাজের মাথায় উঠবে আর ভালো ছেলেরা তাদের কাছে গিয়ে মাথা নীচু করে দাঁড়াবে কোনো একটা কাজের জন্য।

রথীন ॥ তুই তাহলে আর পড়বি না?

মানস ॥ আবার?

রথীন ॥ তাহলে কী করবি?

মানস ॥ এতদিন ডিগ্রীর সন্ধানে ছিলুম, এবার ভাগ্যের সন্ধানে বেরুবো—

রথীন ॥ মানে?

মানস ॥ বাবার স্কুলমাষ্টারীর টাকায় কষ্ট করে চালানো অভাবের সংসারে হাত-পা কুঁকড়ে অনেকদিন থেকেছি। এবার ভালো করে বাঁচার চেষ্টা করবো।

রথীন ॥ কী করে?

মানস ॥ টাকা রোজগার করতে হবে, অনেক টাকা। কোলকাতা-বোম্বাই-মাদ্রাজের মত সহরে টাকা উড়ছে—লুফে নিতে জানা চাই। চারধারে দেখছিস না কী রকম টাকার খেলা চলছে। এতদিন ইতিহাসের ছাত্র হয়ে অতীতের অন্ধকারে হামাগুড়ি দিয়েছি এবার বর্তমানের

রথীন ॥ আশা করি তোর স্বপ্ন সফল হবে—

মানস ॥ (জোর দিয়া) হতেই হবে।

(রথীন উঠিয়া পড়ে)

কী যে উঠছিস যে—

রথীন ॥ মানস, আমি যাই। পরে আবার দেখা হবে—

(রথীন চলিয়া যায়)

মানস ॥ (সোনাকে ডাকিয়া বলে) সোনা, একটা ডেভিল—

সোনা ॥ (ভিতর হইতে) দিচ্ছি, মানস দা—

(অশ্বিনী ও বিকাশ খাওয়া শেষ করিয়াছে।

অশ্বিনীর ইঙ্গিতে বিকাশ মানসের টেবিলের কাছে আসিল। সোনা 'ডেভিল' দিয়া গেল)

আপনার 'ডেভিল' মানস দা—

(সোনা চলিয়া যায়)

বিকাশ ॥ (মানসকে) Excuse me, এই চেয়ারটায় বসতে পারি ?

মানস ॥ (খাইতে খাইতে) ওটার মালিক আমি নয়, ব্রজেন দা—

বিকাশ ॥ তা জানি। তোমায় জিজ্ঞেস করছি যে এটাতে আমি বসলে তোমার কোন অসুবিধে হবে কি ?

মানস ॥ দেখুন, আপনি আমাকে চেনেন না, আমিও আপনাকে চিনি না। অথচ আপনি আমাকে তুমি বলছেন —এটা কী ঠিক ?

(বিকাশ কিছু বলার আগেই অশ্বিনী—)

অশ্বিনী ॥ (উঠিয়া আসিয়া মানসকে বলে) আপনি ঠিক বলেছেন। আমি ওর হয়ে আপনার কাছে মাপ চাইছি, মানসবাবু—

মানস ॥ আপনি আমার নাম জানলেন কী করে ?

অশ্বিনী ॥ আপনাদের দুই বন্ধুর প্রত্যেকটি কথা আমি মন দিয়ে শুনেছি। আপনার নাম শুনতেও ভুল করি নি।

মানস ॥ আমাদের কথা আপনি শুনছিলেন ? উদ্দেশ্য ?

অশ্বিনী ॥ বলছি। বসতে পারি ?

মানস ॥ নিশ্চয়ই। (বিকাশকে) আপনিও বসুন।

(অশ্বিনী ও বিকাশ বসিল)

বিকাশ ॥ (অশ্বিনীকে দেখাইয়া) এঁকে চেনে

মানস ॥ (খাইতে খাইতে) আগে কখনও দেখে বলে ত মনে করতে পারছি না

অশ্বিনী ॥ আমার নাম অশ্বিনীকুমার ঘোষ।

বিকাশ ॥ A. K. G. Enterprise'এর নাম শুনেছে

মানস ॥ A. K. G. Enterprise ? বাংলা দে A. K. G. Enterprise-এর নাম শোনে নি এমন কে আছে না কি ?

বিকাশ ॥ ইনিই সেই A. K. G.

মানস ॥ আপনিই A. K. G. ?…আপনি ত যুগের একজন মহাপুরুষ (বিকাশকে) আর আপনি ?

অশ্বিনী ॥ বিকাশ মিত্তির। আমার বন্ধু business এর বাঁ হাত।

মানস ॥ Business এর বাঁ হাত! বুঝে মহাপুরুষের কালপুরুষ—

বিকাশ ॥ বাঃ দেখেছ অশ্বিনী মানসবাবু কী সু কথা বলেন—কোনো সংকোচ নেই, জড়তা নেই, সটান মনে আসে বলে যান! বাঃ, এইত চাই—

অশ্বিনী ॥ (মানসকে) আপনাকে আমার ভ ভালো লাগছে মানসবাবু! I wish we were friend

(মানসের দিকে হাত বাড়া

মানস ॥ Most gladly

(অশ্বিনীর দিকে হাত বাড়ায়। উভয়ে উভয়ের জোর করিয়া ধরে)

অশ্বিনী ॥ Let's hope we shall be fnie —for ever!

মানস ॥ Thank you! (করমর্দনের পর) এ তুমি বলতে পারেন—

অশ্বিনী ॥ (সহাস্যে) তাই বলবো।

মানস ॥ এখন বলুন কী খাবেন ? আমা আস্তানায় এসেছেন আমারই খাওয়ানো উচিত। কী খাবেন ?

অশ্বিনী ॥ খাওয়াত এইমাত্র শেষ করেছি। এক কাপ করে কফি হলেই হয়—

মানস ॥ Vory good! (হাঁক দেয়) সোনা দি কফি স্পেশাল!

সোনা ॥ এক্সট্রা স্পেশাল করে দি, মানসদা—

মানস ॥ দিতে পারো। তবে আজ পকেট গড়ের মাঠ—

বিকাশ ॥ (হাসিয়া) সোনা জানে আজ গড়ের মাঠ কাল ইডেন গার্ডেন হবে—

মানস ॥ কী করে?

বিকাশ ॥ কেন, বন্ধুকে তো বলছিলে কোলকাতায় টাকা উড়ছে লুফে নিলেই হোলো—

মানস ॥ তা হোলো, কিন্তু তার সুযোগ ত চাই—

(সোনা কফি দিয়া যায়)

অশ্বিনী ॥ মানস, সে সুযোগ যদি আমি তোমায় দি?

মানস ॥ (বিস্মিত) আপনি? আপনি আমায় টাকা রোজগার করার সুযোগ দেবেন?

অশ্বিনী ॥ Businessএ তো নতুন appointment দিতেই হয়—

মানস ॥ সাধারণ কেরানীর চাকরী করার ইচ্ছে নেই—

অশ্বিনী ॥ না না সাধারণ কেরানীর চাকরী নয়। এমন কাজ যদি তোমায় দি যাতে তুমি তোমার talent, তোমার প্রতিভা দেখানোর সুযোগ পাও?

মানস ॥ আমার talent? আমার প্রতিভা? আপনি তার সন্ধান পেলেন কী করে?

বিকাশ ॥ (হাসিয়া) রতনে রতন চেনে—

অশ্বিনী ॥ শোনো মানস, আমি একজন young-man খুঁজছি···তোমারই মত একজন young man··· smart, intelligent, bold—আর যার দৃষ্টিভঙ্গী পুরোপুরি modern.

মানস ॥ পুরোপুরি মডার্ণ দৃষ্টিভঙ্গী বলতে আপনি কী বোঝেন?

অশ্বিনী ॥ সব কথা আজ এখানে আলোচনা করার সময় নেই। (ঘড়ি দেখিয়া ও পকেট হইতে কার্ড দিয়া) এই আমার ঠিকানা। কাল সন্ধ্যে সাতটায় আমার বাড়ীতে এসো—সব কথা হবে।

মানস ॥ আপনার বাড়ীতে? বেশ যাবো। আজ তাহলে উঠি নমস্কার

(মানস উঠিয়া পড়ে)

ব্রজেন ॥ (মানস চলিয়া যায় দেখিয়া) সোনা—এক আধী

সোনা ॥ (ছুটিয়া আসিয়া মশলার প্লেট সামনে ধরিয়া) মানস দা, এক আধী—

মানস ॥ (হাসিতে হাসিতে) কাল হবে। আজ আসি—

(মানস বাহির হইয়া যায়)

—৩য় দৃশ্য—

পরের দিন। সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা। শশাঙ্কশেখরের বাড়ীর ঘর। শশাঙ্ক বই পড়িতেছিলেন। প্রবেশ করে স্ত্রী উমা।

শশাঙ্ক ॥ মানসকে রাজী করাতে পারলে? পরের বছর সে পরীক্ষা দেবে?

উমা ॥ না।

শশাঙ্ক ॥ সব কথা বুঝিয়ে বলেছিলে?

উমা ॥ তুমি নিজে কাল রাত্রে অত করে বললে তাতেই সে বুঝলো না—

শশাঙ্ক ॥ মানসের কথাবার্তায় আমি অবাক হয়ে-গেছি। ওর মনের ভেতর যে এই সব ছিল তা ত আমি কোনদিন বুঝতে পারি নি! আমার জীবন ব্যর্থ হয়ে গেল উমা—

উমা ॥ ছেলে এম-এ পাশ করলো না বলে তোমার জীবন ব্যর্থ হয়ে গেল—এ কী রকম কথা?

শশাঙ্ক ॥ ছেলেকে নিজের মনের মত করে মানুষ করতে পারলুম না—

উমা ॥ আজকাল ক'জন তা পারে? চারিদিকে ত দেখছ!

শশাঙ্ক ॥ আমার পূর্ব্বপুরুষেরা নিজ খরচে বাড়ীতে ছাত্র রেখে তাদের পড়িয়ে পণ্ডিত তৈরী করেছেন। আর আমি আমার নিজের ছেলেকে এম-এ টা পাশ করাতে পারলুম না।

উমা ॥ মানুষের সব আশা কী পূর্ণ হয়?

শশাঙ্ক ॥ আমি ত বেশী কিছু আশা করি নি। কত লোক কত কী আশা করে—কত বাপ চায় ছেলে মুঠো-মুঠো টাকা রোজগার করুক···সমাজে খুব ক্ষমতা, প্রতিপত্তি পাক। আমি ত সে সব কিছু চাইনি। আমি শুধু চেয়েছিলুম যে মানস লেখাপড়া শিখে মানুষ হোক। আমাদের কতবড় পণ্ডিতের বংশ তা ত তুমি জানো।

কালীপদ ন্যায়রত্নের নামে লোকে এখনও শ্রদ্ধায় মাথা নীচু করে—

উমা ॥ ওসব পুরোনো কথা ভেবে কী হবে?

শশাঙ্ক ॥ কিছুই হবে না জানি। কিন্তু অতীত যে রক্তের মধ্যে মিশিয়ে আছে। জানো উমা, এই বই... এই বই হচ্চে আমাদের বংশের প্রাণশক্তি। বিদ্যার চর্চা ভুলে গেলে আমাদের আর কিছুই থাকবে না। আমাদের বংশের মধ্যে আমার বাবাই প্রথম চাকরী করতে সুরু করেন কিন্তু সেও ঐ অধ্যাপনার কাজ। আমার পিতামহ আমার বাবাকে এই সর্ত্ত করিয়েছিলেন যে যুগের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যদি বংশের সকলের পক্ষে পুরোনো ঐতিহ্ বজায় রাখা সম্ভব নাও হয় তাহলে অন্ততঃ একজন অধ্যাপনা নিয়ে থাকবে। টাকার অভাবে আমি এম-এ পড়তে পারি নি। তাই আমার বরাবরের আশা ছিল যে মানসকে আমি এম-এ পাশ করিয়ে প্রোফেসর করবো। কিন্তু মানসকে আমি মানুষ করতে পারলুম না— (ইতিমধ্যে মানস প্রবেশ করিয়াছে সে বাহিরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত।)

মানস ॥ (শশাঙ্কর শেষের কথাগুলির উত্তরে বলে) এম-এ পাশ না করেও আর প্রোফেসর না হয়েও যে মানুষ হওয়া যায় তা কী আপনি অস্বীকার করেন?

শশাঙ্ক ॥ না। সমাজে এমন অনেক সত্যিকারের মানুষ আছে যারা য়ুনিভার্সিটীর বাড়ীখানাও দেখে নি। আবার এমন মানুষও আছে যারা ডিগ্রীর মালা গলায় ঝুলিয়ে অমানুষ হয়েছে—

মানস ॥ তবে?

শশাঙ্ক ॥ কথাটা তা নয়, মানস। কথাটা এই যে আমি তোমাকে আমার আদর্শমত তৈরী করতে চেয়েছিলুম, যে আদর্শ আমাদের বংশের ঐতিহ্যসম্মত, কিন্তু আমার মনে হচ্চে যে তুমি আমার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে দেবে বলে ঠিক করেছ। পড়া ছেড়ে দিয়ে তুমি কী করতে চাও?

মানস ॥ টাকা রোজগারের চেষ্টা করতে চাই—

শশাঙ্ক ॥ কিন্তু আমি ত তোমাকে সে কথা বলি নি—

মানস ॥ আপনি না বলতে পারেন। কিন্তু সংসারে টাকার যে কত দরকার—

শশাঙ্ক ॥ (বাধা দিয়া) সে ভাবনা তোমার নয়।

মানস। আমার হোতো না যদি না টাকার অভাব আমায়... মানে, আমাদের ভোগ করতে হোতো। টাকার অভাবে যে মা'র চোখের চিকিৎসা পর্য্যন্ত হচ্চে না, এ কথাটা ত সত্যি—

উমা। মানস, নিজের কষ্টের কথা যা বলতে চাও বল। আমার জন্যে কোনো কথা বলার দরকার নেই—

(উমা ভিতরে যায়)

শশাঙ্ক। তোমার মার চোখের চিকিৎসা হচ্চে না এ কথা তোমায় কে বলেছে? দুজন বড় চোখের ডাক্তারকে দেখানো হয়েছে, তুমি জানো না?

মানস। জানি। আর এ-ও জানি যে তারা যত্ন করে দেখে নি।

শশাঙ্ক। কি করে জানলে?

মানস। তাদের fees দিয়েছিলেন?

শশাঙ্ক। তারা দুজনেই আমার ছাত্র। তারা আগেই জানিয়েছিল যে আমার কাছে তারা টাকা নেবে না—

মানস। বাবা, আজকের পৃথিবীকে আপনি এখনও চেনেন নি। আপনি বুঝতে পারেন নি যে ওটা ছিল ওদের মুখের কথা।

শশাঙ্ক। বটে!

মানস। বাবা, বিনা টাকায় চিকিৎসা হয় না। শুধু চিকিৎসা কেন, টাকা না থাকলে আজকের পৃথিবীতে কোনো কিছুই হয় না।

শশাঙ্ক। তোমার মতে টাকাই তাহলে একমাত্র জিনিষ—

মানস। একমাত্র বলছি না। বলছি সবার আগে চাই টাকা। টাকা থাকলে অন্য সব কিছু হবে।

শশাঙ্ক। আশ্চর্য্য! আমার ছেলে হয়ে এই বয়েসে এমন টাকা চিনলে কী করে?

মানস। আপনার ছেলেকে আপনি ত ঘরে বন্ধ করে রাখেন নি। তাকে পাঠিয়েছিলেন বড় স্কুলে, বড় কলেজে, বড় ইউনিভারসিটীতে, যেখানে বড় বড় লোকের ছেলেরা পড়ে। সেখানে তাদের সঙ্গে সমান তালে চলতে পারি নি, সমান ভাবে তাদের সঙ্গে মিশতে পারি নি; আর তার জন্যে নিজেকে কত ছোট, কত অসহায় মনে হয়েছে তা কী আপনি জানেন?

শশাঙ্ক। না, এসব কথা কোনো দিন ভাবি নি।

মানস। ভাবলে বুঝতে পারতেন কেন আমি টাকা রোজগারের জন্যে ব্যস্ত হয়েছি। আপনি জানেন যে এম এ পড়ার সময় আমার দুটো টিউশনী করে বন্ধুদের সঙ্গে পাল্লা দিতে হয়েছে?

শশাঙ্ক। এ কথা তুমি ত আমাদের জানাও নি—

মানস। জানালে টাকাটা ত সংসারেই চলে যেত—

শশাঙ্ক। বটে! কিন্তু যে মার চোখের চিকিৎসার জন্যে আমার বিরুদ্ধে তোমার অভিযোগ কই তার জন্যে দশটা টাকাও ত আমার হাতে কোনো দিন দিয়ে বল নি যে, বাবা, মা'র চিকিৎসার জন্যে এই টাকাটা নিন— আমার রোজগারের টাকা—"

মানস। আমি জানতুম দিলেও কিছু হবে না। টাকাটা সংসারেই খরচ হয়ে যাবে।

শশাঙ্ক। মানস, তুমি যে ভেতরে ভেতরে এই রকম তৈরী হয়েছ তা ত আমি বুঝতে পারি নি। তোমার মা বোধ হয় তোমায় ঠিকই চিনেছিলেন। তাঁর বাইরের চোখ ঝাপসা হয়ে এলেও ভেতরের চোখ বেশ স্পষ্ট দেখছিল ছেলে কোন্‌দিকে যাচ্চে। আর আমি পুত্রস্নেহে অন্ধ হয়ে কিছুই দেখতে পাই নি! কেবলই ভেবেছি যে মানস আমার মনের মত মানুষ হবে—

মানস। বাবা এ কথাটা বোধহয় স্বীকার করে নেওয়া ভালো যে আজকের যুগে মানুষের প্রথম এবং প্রধান পরিচয় টাকা—

শশাঙ্ক। অনেক দিন আগে আমার এক বন্ধু এই কথাই বলেছিল। আমি তর্ক করেছিলাম। শেষ পর্য্যন্ত সেই তর্ক আমাদের দুই বন্ধুর বিচ্ছেদ ঘটিয়েছিল—

মানস। বাবা, আপনি কী ইঙ্গিত করেছেন যে আপনার আর আমার মত যদি ভিন্ন হয় তাহলে আমাদের পথও ভিন্ন হতে পারে?

শশাঙ্ক। অসম্ভব নয়। কিন্তু আশা করবো তা যেন না হয়—

(এমন সময় ব্যস্ত ভাবে প্রবেশ করে মীরা)

মীরা—কাকাবাবু!—

শশাঙ্ক। মীরা! কী খবর?

মীরা। কাকাবাবু, বাবা হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, আপনি শীগ গির চলুন—

শশাঙ্ক। সে কী?...এই ত কাল পরেশ এখানে এসেছিল—

মীরা। এখান থেকে ফেরার পরই শরীর খারাপ হয়। আজ হঠাৎ পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছেন। পাড়ার একজন ডাক্তারবাবুকে বাবার কাছে বসিয়ে আমি ট্যাক্সী নিয়ে চলে এসেছি। কাকাবাবু, আপনি একবার চলুন...আমার বড্ড ভয় করছে—

শশাঙ্ক। কোন ভয় নেই মা, আমি এখনই যাচ্চি—

(শশাঙ্ক ভিতরে যান)

মানস। তোমার বাবার এর আগে একটা strok হয়েছিল না?

মীরা। হ্যাঁ।

মানস। ভয় পাওয়ার কিছু নেই। তবে সাবধানে থাকতে হবে এখন থেকে। মীরা, তুমি ত এবার অনার্স নিয়ে পাশ করেছ? এম, এ পড়ছ নাকি?

মীরা। না।

মানস। কেন?

মীরা। টাকা কোথায়? বাবা রিটায়ার করেছেন।

মানস। তাহলে তুমি এবার রোজগারের চেষ্টা কর। কত মেয়ে ত আজকাল চাকরী করছে—

মীরা। তুমি আবার এম-এ দেবে ত, মানসদা—

মানস। না। এই নিয়েই ত বাবার সঙ্গে তর্ক হচ্ছিল—

(প্রবেশ করে উমা)

উমা। কই, মীরা কই?

মীরা। কাকীমা, এই যে আমি— (প্রণাম করে)

উমা। থাক মা থাক! বেঁচে থাকো। কোন ভয় নেই মা, তোমার বাবা শিগ্‌গিরই ভালো হয়ে যাবেন—

মীরা। (অশ্রুভারাক্রান্ত কণ্ঠে) বাবা ছাড়া আমার যে কেউ নেই, কাকীমা—

উমা। (সান্ত্বনা দিয়া) কেন মা, আমরা ত আছি—

(প্রবেশ করে শশাঙ্ক)

শশাঙ্ক। (মীরাকে) চল মা চল! মানস, আমাদের সঙ্গে যাবে নাকি?

মানস। (ঘড়ি দেখিয়া) আমার সাতটায় একটা appointment আছে—

শশাঙ্ক। চল মা, আমরা যাই,...দুর্গা...দুর্গা...

(তাড়াতাড়ি যাইতে গিয়া চৌকাঠে হোঁচট খাইল)

উমা। বাধা পড়লো...বসে যাও

শশাঙ্ক। না না, দেরী হয়ে যাবে—

(শশাঙ্ক ও মীরা বাহির হইয়া যায়।

—৪র্থ দৃশ্য—

(অশ্বিনী ঘোষের বাড়ী—রমলার ঘর। ঘরে মূল্যবান্ আসবাব পত্র। রমলা অশ্বিনীর একমাত্র কন্যা। সন্ধ্যা ৭টা। রমলা খোলা জানালা দিয়া বাহিরে তাকাইয়া দাঁড়াইয়াছিল যেন সে কাহারও প্রতীক্ষা করিতেছে। তাহার পর একখানি বই লইয়া পড়ার চেষ্টা করিল। তাহার পর বই রাখিয়া অর্গানে বসিয়া গান সুরু করিল। রবীন্দ্র সঙ্গীত—গানের মাঝে প্রবেশ করে অমিত। অমিত অধ্যাপক এবং রমলার গৃহশিক্ষক। বয়স ২৬।২৭, সুন্দর চেহারা। তাহার হাতে বই। রমলা তাহার আশা লক্ষ্য করে নাই। গান শেষ হওয়ার পর—)

রমলা। আপনি কখন এলেন জানতে পারি নি ত! লুকিয়ে লুকিয়ে গান শুনলেন কিন্তু গান কেমন লাগলো কিছু বল্লেন না ত—

অমিত। (সহাস্যে) খুব ভালো লেগেছে—

রমলা। (খুসীভাবে) সত্যি? আর একটা শুনবেন?

অমিত। না। এবার পড়া আরম্ভ করা যাক।

রমলা। আজ পড়াটা থাক না—

অমিত। তা হয় না, রমলা। তোমার বাবা আমায় মাসে মাসে টাকা দেন তোমায় পড়ানোর জন্যে, তোমার গান শোনার জন্যে নয়।

রমলা। আপনি কী মনে করেন আমি পড়লুম কী না পড়লুম তা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় বা ইচ্ছে বাবার আছে?

অমিত। জানি। ব্যবসাজগতের বাইরে যে কোনো কিছু থাকতে পারে তা তোমার বাবা ভাবতেই পারেন না।

রমলা। অন্য কোনো কিছুর কথা ছেড়ে দিন। আমি যে তাঁর একমাত্র মেয়ে, আমার মা নেই, ভাই নেই, অন্য কেউ নেই—সেই আমার কথা ভাবারও কী তাঁর সময় আছে? অবশ্য আমি এ কথা বলছি না যে বাবা আমায় ভালবাসেন না। তবে সে কী রকম ভালবাসা জানেন?

অমিত। কী রকম?

রমলা। একজন বিলাসী বড়লোক যেমন কোনো শিল্পীর তৈরী পাথরের মূর্ত্তি তার বাগানে সাজিয়ে রাখে অনেকটা সেইরকম।

অমিত। এ তুমি কী বলছ রমলা?

রমলা। বিশ্বাস করুন অমিতবাবু এ বাড়ীর বহু মূল্যবান্ সাজ-সরঞ্জামের মধ্যে আমিও একটা

অমিত। তুমি তোমার বাবার ওপর অবিচার করছ রমলা।

রমলা। আমি বাবাকে দোষ দিচ্ছি না, অমিতবাবু। সাতটা কোম্পানীর দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়ে যাকে দিনরাত কাজ করতে হয় তার পক্ষে মেয়ে কি করছে না করছে তা দেখার সময় পাওয়া সম্ভব নয়—

অমিত। সে কথা ঠিক।

রমলা। প্রথম জীবনে বাবা খুবই কষ্ট পেয়েছিলেন। তারপর হঠাৎ এক পাঞ্জাবী industrialist এর নজরে পড়েন। সেই থেকেই বাবার জীবনের পরিবর্ত্তন। আজ বাবার যতগুলো ব্যবসা দেখছেন তার অনেকগুলোই তাঁর কাছে পাওয়া—

অমিত। সেই পাঞ্জাবী ভদ্রলোকটীর নিজের কেউ ছিল না?

রমলা। তাঁর দুটি ছেলে, দুইটি মারা যায়। একটি মদ খেয়ে ড্রাইভ করতে গিয়ে accident করে আর একটি দিল্লীর কোনো fashionable hotel এর bar-এ খুন হয়। আর তারও কয়েক বছর আগে ভদ্রলোকের স্ত্রী এক বন্ধুর সঙ্গে সুইট্জারল্যাণ্ডে বেড়াতে গিয়ে আর ফেরে নি—

অমিত। চমৎকার জীবন ত ভদ্রলোকের!

রমলা। পরপর ক'টা ঘা খেয়ে ভদ্রলোক শেষদিকে কাজকর্ম্ম আর কিছুই দেখতেন না। বাবা ছিলেন তাঁর confidential clerk আর ভদ্রলোকের খুব favourite হয়ে ওঠেন মারা যাওয়ার সময় তিনি সমস্ত বিজনেসের দায়িত্ব বাবাকে দিয়ে যান। কাজেই বাবাকেও

আমি দোষ দিতে পারি না। আমি শুধু আমার কথাই আপনাকে বলছিলুম—

অমিত। রমলা, তোমার খুব একা একা মনে হয়, না?

রমলা। ভীষণ। তাই ত বই, গান, ছবি আর ঐ ফুলের বাগান-এ সব নিয়েই থাকি

(প্রবেশ করে অশ্বিনী। সঙ্গে বিকাশ)

অশ্বিনী। রমলা তুমি এইখানে?...সাতটা বেজে গেছে তুমি এখনও তৈরী হও নি? আজ গ্রাণ্ডে ডিনার পার্টি তোমার মনে নেই?

রমলা। আজ আমি যাবো না, বাবা—

অশ্বিনী। সে কী? যাবে না কেন?

(অমিতের দিকে সন্দিগ্ধভাবে চায়)

রমলা। ও সব পার্টি আমার ভালো লাগে না।

অশ্বিনী। না না, এ সব কথা ঠিক নয়। তোমায় যেতেই হবে।

রমলা। সামনে আমার পরীক্ষা—

বিকাশ। পরীক্ষা। পরীক্ষার জন্যে আজকাল কেউ পড়াশোনা করে না কি?

অশ্বিনী। (অমিতকে) কী প্রোফেসর বুঝি ছাত্রীকে বুঝিয়েছ যে ডিনারে গেলে পড়ার ক্ষতি হবে?

অমিত। আজ্ঞে না, আমি এ সব কিছুই জানি না।

বিকাশ। কী করে জানবে? বই পড়েইত সময় নষ্ট করলে!

অমিত। বই পড়াতে যথেষ্ট আনন্দ পাওয়া যায়।

বিকাশ। কিন্তু পেটত ভরে না, টাকাও আসে না।

অমিত। বিকাশবাবু, টাকাই জীবনের সব কিছু নয়।

অশ্বিনী। প্রোফেসর, জীবনকে চিনলে ও কথা বলতে না।

বিকাশ। রঙীন কাঁচের মধ্যে দিয়ে দুনিয়াটাকে এখনও দেখছ বাবাজী, সাদাচোখে দুদিন দেখ, তখন বুঝবে।

অমিত। সকলের দৃষ্টিভঙ্গী একরকম নয়। সকলের রুচিও সমান নয়।

বিকাশ। অশ্বিনী মাষ্টার এবার বই-এর পড়া মুখস্ত বলতে আরম্ভ করেছে সহজে থামবে না। আমি যাই বাড়ী থেকে তৈরী হয়ে আসি। তোমার গাড়ীটা নিয়ে যাই—

অশ্বিনী। যাও। বেশী দেরী কোরো না।

(বিকাশ চলিয়া যায়।)

(অমিতকে) প্রোফেসর আজ ছাত্রীকে ছুটী দাও। রমি আমার সঙ্গে যাবে—

(অমিত রমলার দিকে চায়, দেখে সে মাথা নীচু করিয়া বসিয়া আছে। অমিত উঠিয়া পড়ে)

অমিত। বেশ! আমি যাচ্ছি—

রমলা। (অমিতকে) আপনি কাল আসবেন ত?

অমিত। আসবো।

(অমিত চলিয়া যায়)

অশ্বিনী। রমি, তোমায় ত আমি কতবার বলেছি যে এই সব পার্টি ঠিক খাওয়া দাওয়ার জন্যে নয়। এগুলো part of our business...

রমলা। বেশ ত তোমার বিজনেস তুমি যাও। আমাকে এর মধ্যে টানা কেন?

অশ্বিনী। কারণ আছে। পরে বুঝবে। এখন যা বলি শোনো। কথার অবাধ্য হয়ো না।

রমলা। বাবা, আমি কী কোনোদিন তোমার কথার অবাধ্য হয়েছি?

অশ্বিনী। না, তা হও নি। তবে কিছুদিন ধরে লক্ষ্য করছি যে তুমি আমার কথাগুলো ঠিক ভালো মনে নিতে পারছ না। আমার মনে হচ্চে যেন আমার ওপর তোমার আগের মত শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস নেই। কী হয়েছে বলত?

রমলা। কিছু না। আমার মন ভালো নেই।

অশ্বিনী। মন ভালো নেই কেন? মন ভালো থাকার জন্যে যা যা দরকার সবইত তোমায় দিয়েছি—তবে তোমার মন ভালো নেই কেন?

রমলা। সে তুমি বুঝবে না বাবা।

অশ্বিনী। আশ্চর্য্য! তুমি আমার মেয়ে। তোমার কথা আমি বুঝবো না?

রমলা। না। তার কারণ তোমার আর আমার মন ভিন্ন প্রকৃতির। তুমি যাতে সুখ পাও, আনন্দ পাও, আমি তাতে পাই না।

অশ্বিনী। এই সব উদ্ভট idea তোমার মাথায় কে ঢোকালে?

রমলা ॥ এ সবই আমার নিজের ধারণা।

অশ্বিনী ॥ হতে পারে না। আমার মেয়ে হয়ে এই সম্পদ আর স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে থেকে এই পরিবেশে তোমার এ রকম ভাবনা একেবারে অস্বাভাবিক। নিশ্চয়ই এ সবের পেছনে কেউ আছে—

(রমলা কোনো উত্তর না দিয়া চলিয়া যাইতেছিল)

রমি দাঁড়াও। আমার কথার জবাব দাও।

(রমলা ফিরিয়া নীরবে দাঁড়াইল)

এ সবই অমিতের কাছে শেখা

রমলা ॥ (দৃঢ়স্বরে) না।

অশ্বিনী ॥ শোনো রমি অমিতের সঙ্গে তোমার মেলামেশা আমি পছন্দ করি না।

রমলা ॥ অমিতবাবু আমাকে পড়াতে আসেন। আমি তাঁর সঙ্গে মেলামেশা করি না।

অশ্বিনী ॥ ভালো। তবে এ কথা জেনে রাখো রমি যে অমিত বিদ্বান, ভালোছেলে হলেও তার জগৎ সম্পূর্ণ আলাদা। অমিত চায় জ্ঞানবিদ্যার চর্চ্চা করে ভালো ছেলে হয়ে আজকের সমাজে বাস করতে! অসম্ভব! তোমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমার নিজের একটা ধারণা আছে—

রমলা ॥ (ধীর ভাবে) কিন্তু আমার মনে হয়, বাবা, যে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রত্যেক মানুষের নিজের স্বাধীনতা থাকা উচিত—

অশ্বিনী ॥ রমি, I'm sorry যে তুমি আমার সঙ্গে এইভাবে কথা কইছ—

রমলা ॥ বাবা, তোমার মনে কষ্ট দেওয়ার জন্যে আমি কোনো কথা বলি নি

অশ্বিনী ॥ রমি, তোমার মা তোমায় দশ বছরের মেয়ে রেখে স্বর্গে যান। সেই থেকে আমি তোমায় বাপের স্নেহ আর মা'র যত্ন একসঙ্গে দিয়ে মানুষ করেছি। তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই। তোমাকে সুখী করাই আমার একমাত্র লক্ষ্য। আমার সমস্ত বিজনেস-এর মালিকানা একদিন তোমারই হাতে আসবে। আমি তারই জন্যে তোমায় তৈরী করার চেষ্টা করছি।

রমলা। এত বড় ভার বইবার শক্তি আমার নেই বাবা—

অশ্বিনী। না থাকে শক্তি অর্জ্জন করতে হবে। শক্তি আমারও একদিন ছিল না।

কিন্তু আজ? আজ এমন কোনো কাজ নেই যা আমি আমার business interstএ করতে পারি না। কিন্তু এসব করছি কার জন্যে? সবই ত তোমার জন্যে রমি—

রমলা। (স্থির কণ্ঠে) না।

অশ্বিনী। (সবিস্ময়ে) না!

রমলা। বাবা, তুমি যা করছ তা করছ একটা নেশার ঝোঁকে, টাকা রোজগারের নেশা—

অশ্বিনী। না না, এ তুমি কী বলছ রমলা? তুমি কী অস্বীকার করবে রমি যে আমার বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমি দেশের কাজ করছি না? আজ আমাদের দেশের শিল্প বাণিজ্যের প্রসারের কত দরকার তা তোমার মত শিক্ষিত মেয়ের জানা উচিত—

রমলা। জানি।

অশ্বিনী। তবে? আমি কী দেশের সম্পদ বাড়াতে সাহায্য করছি না? আমি কী অন্ততঃ তিনহাজার লোককে cmhloyment দিই নি?

রমলা। তা সত্ত্বেও আমি বলবো যে তোমার আসল প্রেরনা হচ্চে টাকা রোজগার করার মোহ, দেশের কাজ নয়।

অশ্বিনী। না না, এসব তোমার ভুল ধারণা। আর এই সব তোমার মাথায় ঢুকিয়েছে অমিত…that worthless professor।

রমলা। বাবা তুমি অমিতবা'বুর ওপর অন্যায় করছ—

অশ্বিনী। না, কোনো অন্যায় করি নি। আর করলেও তার জন্যে আমি দুঃখিত নয়। তবে এটা জেনে রাখো যে আমার আজকের এই দায়িত্ব কাল তোমার ওপর এসে পড়বে। আর তার জন্যে তোমাকে প্রস্তুত

রমলা। তোমায় ত আগেই বলেছি বাবা, যে এতবড় দায়ীত্ব নেবার শক্তি আমার নেই—

অশ্বিনী। তোমায় সাহায্য করার জন্যে উপযুক্ত লোক তুমি নিশ্চয়ই পাবে—

রমলা। কে সে?

(প্রবেশ করে বেয়ারা, হাতের কার্ড অশ্বিনীকে দেয়)

অশ্বিনী। (কার্ড লইয়া পড়ে) মানস ভট্টাচার্য্য—

(রমলার দিকে চায়, তাহার পর বেয়ারাকে ইঙ্গিত রে আগন্তুককে ভিতরে পাঠাইতে)

(প্রবেশ করে মানস)

অশ্বিনী। (পরিচয় করাইয়া দেয়) মানস ভট্টাচার্য্য, ামার মেয়ে রমলা—

(রমলা ও মানস পরস্পরের দিকে চায়)

—৫ম দৃশ্য—

(কয়েক মাস পরের ঘটনা)

(শশাঙ্কশেখরের ঘর। শশাঙ্কশেখর পড়িতেছিলেন। ন্ধ্যা। প্রবেশ করে দেবেশ। তাহার হাতে একটি াইল)

দেবেশ। কাকাবাবু ব্যস্ত আছেন?

শশাঙ্ক। (বই বন্ধ করিয়া) দেবেশ? এসো, এসো। ·কদিন আসনি যে বাবা?

দেবেশ। থীসিসটা নিয়ে ব্যস্ত ছিলুম। আজ নিয়ে চ্ছি ডাঃ গাঙ্গুলীকে দেখাতে। যাবার আগে আপনাকে ণাম করতে এলুম। আপনার উৎসাহেই ত' এ কাজ ারম্ভ করেছি—

শশাঙ্ক। (খুশীমনে) আশীর্ব্বাদ করি বাবা, খুব ড় পণ্ডিত হও। আর তোমার অর্জ্জিত জ্ঞান-বিদ্যা মি অনেকের মধ্যে বিতরণ কর।···কী জানো দেবেশ, কছু লোককে ত জ্ঞান-বিদ্যার আরাধনা নিয়ে থাকতেই য়। সবাই যদি শুধু টাকার পেছনে ছোটে আর ে কোনো উপায়ে টাকা রোজগার করার কথা ভাবে াহলে দেশ থেকে যে লেখাপড়া উঠে যাবে আমরা া নিঃস্ব হয়ে যাবো দেবেশ, পৃথিবীর সামনে আমরা ী করে দাঁড়াইবো? আজও যে আমরা সভ্য জগতের ামনে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছি সে ত' তোমার এই টা কলখানার জন্যে নয়। দাঁড়িয়ে আছি বেদ উপনিষদ ্রাণ সাহিত্য ব্যাস-বাল্মিকি, কালিদাস, ভবভূতি— দের জন্যে। এ কথা ত সত্যি—

দেবেশ। নিশ্চয়ই।

শশাঙ্ক। দেখ দেবেশ, কলকারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য এ সবের প্রয়োজন নেই, এমন কথা আমি বলি না। যুগ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছু পরিবর্ত্তন স্বাভাবিক নিয়মেই ঘটবে তা কেউ রোধ করতে পারবে না। কিন্তু যা আমাদের নিজস্ব পৃথিবীতে যা নিয়ে আমাদের আসল পরিচয়—আমাদের দর্শন আমাদের শাস্ত্র আমাদের কাব্য তা নিয়ে কেউ চর্চ্চা করবে না, তাকে ভুলে যাবে, এ কেমন কথা? সারা দেশটা কেবল technicion আর businessman এ ভরে যাক এ ও ত কাজের কথা নয়—

(প্রবেশ করে উমা)

উমা। (দরজার নিকট হইতে) ওখানে কে?

দেবেশ। আমি দেবেশ কাকীমা—

শশাঙ্ক। জানো উমা, দেবেশ আজ ওর লেখা নিয়ে প্রোফেসরকে দেখাতে যাচ্ছে। দেখবে, দেবেশ শীগিরই ডক্টরেট পাবে—

(দেবেশ উমাকে প্রণাম করে)

উমা॥ বেঁচে থাকো বাবা, রাজা হও—

শশাঙ্ক॥ না না "রাজা হও" নয়, বল "মানুষ হও"! বুঝলে দেবেশ, বাঙলা দেশের মায়েদের ছেলে আশীর্ব্বাদ করার বাণীটা এবার বদলে ফেলা দরকার। 'রাজা' নয়, দেশে মানুষ চাই অন্ততঃ জনকয়েক সত্যিকারের মানুষ

(বলিতে বলিতে ভিতরে যান)

দেবেশ॥ মানসের ব্যাপারে কাকাবাবু মনে খুব আঘাত পেয়েছেন, না কাকীমা?

উমা॥ বড় বেশী আশা করেছিলেন তাই আঘাতটাও বেশী পেয়েছেন। আমি কিন্তু বরাবরই জানি যে মানস আজকালকার আর পাঁচজন ছেলের মতই-তাদের চেয়ে ভালোও নয়, আবার তাদের চেয়ে খারাপও নয়। ওর সম্বন্ধে আমি কোনদিন খুব বেশী আশা করি নি, তাই সব কিছু মেনে নিতে পেরেছি। আমার ভাবনা এখন মীরাকে নিয়ে। হঠাৎ ওর বাবা মারা গেলেন। কোলকাতায় ওর আত্মীয়-স্বজন বিশেষ কেউ নেই। বেচারী কোথায় যাবে? উনি বল্লেন-এখানেই থাক—

দেবেশ॥ মীরা ত একটা চাকুরী পেয়েছে, কাকীমা? তাহলে আর ভাবনা কী?

উমা॥ তাহলেও ভাবনা আছে বাবা

(প্রবেশ করে মীরা। অফিস হইতে ফিরিতেছে)

(পায়ের শব্দ শুনিয়া) কে ?

মীরা॥ আমি মীরা, কাকীমা! আজ আমার ফিরতে দেরী হয়ে গেছে। আপনার চোখে ওষুধটা দেওয়া হয় নি ত—

উমা॥ সে পরে হবে। আগে তুমি হাত মুখ ধুয়ে কিছু খেয়ে নাও।

মীরা। আগে আপনার ওষুধটা দি···দেবেশদা, কাকীমার চোখের ওষুধটা ও ঘর থেকে এনে দিন না, please···

(দেবেশ যাইতেছিল। মীরা ডাকিল)

দেবেশ দা, সেই সঙ্গে খাবার ওষুধটাও—

দেবেশ। (যাইতে যাইতে ফিরিয়া অল্প হাসিয়া) আর কিছু ?

মীরা। না।

(দেবেশ যাইতেছিল। মীরা আবার ডাকিল)

দেবেশ দা, ওষুধ খাবার ছোট গ্লাসটা আনতে ভুলবেন না যেন—

দেবেশ। (যাইতে যাইতে ফিরিয়া) না বললেও চলতো। ওষুধের শিশি আনলে খাবার গ্লাসও আনতে হয়-এটুকু জানা আছে।

মীরা। (সহাস্যে) তাই বুঝি ?

(দেবেশ যাইতেছিল। মীরা ডাকিল)

দেবেশ দা—

দেবেশ। (যাইতে যাইতে ফিরিয়া) আবার কী ?

মীরা। (হাসিতে হাসিতে) মিক্সশ্চার খাওয়ার পর জল খেতে হয় জানেন ত ?

দেবেশ। জানি।

মীরা। তাহলে জলখাওয়ার গ্লাসটাও আনবেন—

দেবেশ। (হাসিয়া) আনব।

(দেবেশ যাইতেছিল। মীরা আবার ডাকিল)

মীরা। দেবেশ দা হাতের ফাইলটা রেখে যান, না হলে অত জিনিষ একসঙ্গে আনবেন কী করে ?··· (অগ্রসর হইয়া) দিন—

দেবেশ। (হাসিয়া) ধর। (মীরার হাতে ফাইল দেয়) আর যদি কিছু বলার থাকে বলো। আর ডাকলে কিন্তু সাড়া দেব না—

মীরা। না, আর কিছু বলার নেই।

(দেবেশ যাইতেছিল মীরা বলিল) দেবেশ দা··· (দেবেশ ফিরিল) না না সাড়া দিতে হবেনা। বলছি জিনিষগুলো নিয়ে তাড়াতাড়িই আসবেন—

দেবেশ। যে আজ্ঞে

(দেবেশ ভিতরে যায়)

উমা। বড় ভালো ছেলে, এই দেবেশ!

মীরা। (ফাইলের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে হ্যাঁ। কত কী লিখেছে এই ফাইলে।

(প্রবেশ করে দেবেশ সব জিনিষ লইয়া)

দেবেশ। (মীরাকে) এই যে সব মিলিয়ে না এই চোখে দেওয়ার ওষুধ এই খাওয়ার ওষুধ এই ওষু খাওয়ার গ্লাস এই জলখাওয়ার গ্লাস।

মীরা॥ (ফাইল ফিরাইয়া দিয়া) আর এই আপনা ফাইল! (উমাকে) কাকীমা আসুন, চোখে ওষুধ দিয়ে দি—

(ওষুধ দেওয়ার সব ব্যবস্থা করে)

দেবেশদা, শিশিটা ধরুন ত ড্রপারটা দিন আহা, ঐ শিশির মুখেই লাগানো রয়েছে···নাঃ! এসব থীসি পণ্ডিতের কাজ নয়। দিন আমায় দিন (শিশি লইয়া কাকীমা আসুন চোখটা খুলুন—আর একটু—ব্যাস (ও দিল) এবার বন্ধ করুন।

উমা॥ গতজন্মে তুমি আমার মেয়ে ছিলে।

মীরা॥ (সহাস্যে) এ জন্মে বুঝি পর হয়ে গেছি ?

উমা॥ না না, সে কী কথা! আগজন্মে ছিলে মে এ জন্মে হয়েছ মা। জানো দেবেশ মীরা আসায় আম কত সুবিধে হয়েছে—

মীরা॥ আপনি থামুন ত কাকীমা! (খাওয় ওষুধ দেওয়ার ব্যবস্থা করে) নিন, এবার ওষুধটা খে ফেলুন। (উমাকে ওষুধ দিল) এই নন জল।

(উমা জলপান করিল। মীরা জিনিষপত্র ঠিক করি রাখিল)

দেবশদা বসুন, আমি আসছি।

দেবেশ॥ না, এখন আর বসতে পাচ্ছি না।

মীরা॥ তাহলে কাল আসবেন—ঠিক ত ?

দেবেশ॥ আসবো। কাকীমা চললুম।

(দেবেশ চলিয়া যায়)

উমা ॥ দেখছ ত মা, দেবেশ আর মানস! দুই বন্ধু, পাশাপাশি বাড়ী এক স্কুলে, এক কলেজে পড়েছে, এক ধরনের মানুষ। ছোটবেলাতেই দেবেশের বাবা মারা যায়। কতকষ্ট করে লেখা পড়া করেছে। দেখ, আজ সে সোনার চাঁদ ছেলে। আর মানসের জন্যে ওঁর এত চেষ্টা সবই মিথ্যে হয়ে গেল! সবই ভাগ্য! মীরা তুমি মা ভিতর যাও, কিছু খেয়ে নাও—

(মীরা ভিতরে যায়। একটু পরে বাহির হইতে প্রবেশ করে মানস)

(পায়ের শব্দ শুনিয়া) মানস এলি?

মানস ॥ হ্যাঁ—

উমা ॥ সারাদিন কোথা ছিলি? দেবেশ এসেছিল—

মানস ॥ কেন?

উমা ॥ দেবেশ ওর লেখা নিয়ে প্রোফেসরকে দেখাতে যাচ্ছে তাই ওঁকে প্রণাম করতে এসেছিল।

মানস ॥ ও!—ভীষণ খিদে পেয়েছে জলখাবার তৈরী হয়েছে? মীরা কোথায়!

উমা ॥ সে এই অফিস থেকে এসে আমায় ওষুধ দিয়ে ভেতরে গেছে। একটু বোস। খাবার এখনই তৈরী হয়ে যাবে—

মানস ॥ বসার সময় নেই। আমায় এখনই যেতে হবে।

(ভিতর হইতে প্রবেশ করেন শশাঙ্ক)

শশাঙ্ক ॥ কোথায় যাবে?

মানস ॥ কাজ আছে—

শশাঙ্ক ॥ কী কাজ? কোথায় কাজ? (মানস উত্তর দেয় না) উত্তর দিচ্চনা কেন?

মানস ॥ কাজ খুব জরুরী, কিন্তু কী কাজ তা আপনাকে বলতে পারবো না।

শশাঙ্ক ॥ সে কী? তুমি এমন কী কাজ করতে যাচ্চ যা আমাকে বলতে পারো না?

মানস। তার কারণ আপনি সে কাজ পচ্ছন্দ করবেন না, অথচ সে কাজ আমায় করতেই হবে।

শশাঙ্ক। মানস, যা বলবে তা সোজা কথায় বলো—

একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের হয়ে কোনো একজন officerকে আমায় হাত করতে হবে। তারই জন্যে টাকা নিয়ে এখনই আমায়—

শশাঙ্ক ॥ বুঝেচি। এই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটির নাম কি? তার মালিক কে? আর তার সঙ্গে তোমার সম্পর্কই বা কী?

মানস। বাবা এসব আপনাকে এখন কিছুই বলা যাবে না।—আপনি আমাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করবেন না—

শশাঙ্ক। বেশ! তবে একটা কথা বলা আমার কর্তব্য বলে মনে করি। উমা, দাঁড়াও—

(উমা ভিতরে যাইতেছিল দাঁড়াইল। শশাঙ্ক বলিল)

কথাটা তোমার শোনা দরকার। মানস, এই সব কাজে যেতে যাওয়ার আগে তোমায় আমি আর একবার বলছি তুমি আমার কথা মত চল। ঐ ভাবে টাকা উপায়ের কথা ভুলে যাও—

মানস। বাবা, এ সব কথা আপনি আমাকে আর বলবেন না—

(উমা ভিতরে যায়)

শশাঙ্ক। মানস, তোমায় আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। কোথায় যেন কী একটা হয়েছে—

মানস। বাবা, আমি এক নতুন জগতের সন্ধান পেয়েছি। সে জগৎ আপনার জগৎ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা অথচ সেটাই বাস্তব, সেটাই আজকের যুগের সত্যিকারের জগৎ। এই ক'মাসে আমি কয়েকটা বিশেষ ধরনের কাজ নিয়ে কয়েকজন বড় বড় লোকের সঙ্গে দেখা করেছি। এরা ভারতবর্ষের নানা জায়গার লোক। এদের ভাষা আলাদা, পোষাক আলাদা, আদব কায়দা আলাদা, এমন কী খাওয়া দাওয়া পর্য্যন্ত আলাদা। কিন্তু একটা জায়গায় তারা সবাই এক—সেটা হচ্ছে টাকা রোজগার—সেখানে একের সঙ্গে অন্যের কোনো তফাৎ নেই। মিঃ ঘোষ আমায় এক এক করে এদের কাছে পাঠিয়েছিলেন— তাদের প্রত্যেকের কাছেই আমি কাজ হাসিল করেছি। আজ তিনজনের কাছে গিয়েছিলুম। সেই রিপোর্ট নিয়ে আমায় মিঃ ঘোষের কাছে এখনই যেতে হবে।

য আমার এখানে কাজ করতে আসায় তোমার বাবার ঙ্গে তোমাব কিছুটা মনান্তর হয়েছে—

মানস। হ্যাঁ। কিন্তু আমি যা ভালো মনে করি তা করতে ভয় পাই না।

অশ্বিনী। আচ্ছা মানস, তোমার বাবা ত যথেষ্ট াণ্ডিত। তিনি কী ঐ কথা বোঝেন না যে দিনকাল দলাচ্ছে, মানুষকেও তার সঙ্গে বদলাতে হবে?

মানস। বাবা ভীষণ গোঁড়া, একরোখা লোক।

অশ্বিনী। বুঝলাম। এখন ধর আমার কাছে তাঁর মতে কাজ করার জন্য তিনি যদি এতই রেগে যান যে তোমার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না রাখেন?

মানস। বাবা সম্পর্ক না রাখেন আমিও দূরে সরে যাসবো।

অশ্বিনী। তারপর?

মানস। তারপর একদিন প্রচুর টাকা রোজগার রে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে তাঁর কাছে যাবো—নিজের ীবন দিয়ে প্রমাণ করে দেব যে তাঁর আদর্শ নীতিগত-াবে সত্য হলেও বাস্তবজগতে অচল।

অশ্বিনী। তুমি যা বলছ তাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস কর?

মানস। করি।

অশ্বিনী। পারবে?

মানস। আপনি আমায় সুযোগ দিন।

অশ্বিনী। সুযোগ আমি তোমায় দেব। কিন্তু মানস ্ই দ্বন্দ্বে তোমায় জিততে হবে আমাকে জয়ী করতে বে।

মানস। নিশ্চয়ই করবো।

অশ্বিনী। বেশ—

(বেয়ারা চা দিয়া যায়।)

নাও চা খাও।

(দুজনে চা পান করিতে করিতে কথা হয়)

আচ্ছা মানস, রমলাকে তোমার কী রকম মনে হয়?

মানস। রমলা? রমলা···রমলা বেশ ভালো মেয়ে। বে একটু স্বাধীন প্রকৃতির—

অশ্বিনী। (ঈষৎ হাসিয়া) তোমার তাই মনে হয়?

মানস। আজ্ঞে হ্যাঁ। তবে আপনাকে খুব শ্রদ্ধা রে।

অশ্বিনী। আচ্ছা মানস, অসবর্ণ বিবাহ সম্বন্ধে তোমার কী মত?

মানস। (হাসিয়া) ওটা এখন এত বেশী হচ্ছে যে সবর্ণে বিয়ে করাই একটা যেন ব্যতিক্রমের ব্যাপার।

অশ্বিনী। (হাসিয়া) বুঝেচি।

(চা শেষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়। তারপর ডাকে)

রমলা!

(প্রবেশ করে রমলা)

রমলা। মানস এসেছে—

রমলা। বাবা, আমি এখন একটু ব্যস্ত আছি, আমার প্রোফেসর এসেছেন।

অশ্বিনী। (গম্ভীর কণ্ঠে) বেশ কিন্তু মনে রাখো রমলা, আমার শরীর ভালো নয়। আগামী মাসে আমি মানসের সঙ্গে তোমার বিয়ের দিন স্থির করছি—

রমলা। বাবা!

(মানস সবিস্ময়ে একবার অশ্বিনীর দিকে চায়, তারপর রমলার দিকে।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[শশাঙ্কশেখরের বাড়ীর ঘর। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। উমা ও মীরা। মীরা যথারীতি উমাকে ওষুধ দিল—চোখের এবং খাওয়ার। তারপর দৈনিক কাগজখানি তাহাকে পড়িয়া শোনাইবে বলিয়া প্রস্তুত হইতেছে এমন সময় প্রবেশ করিল দেবেশ।]

দেবেশ। কাকীমা কী করছেন?

উমা। কে দেবেশ? এসো বাবা! ক'দিন আসনি কেন?

মীরা। (সহাস্যে) ওমা, আপনি বুঝি জানেন না, কাকীমা? মানসদা'র বিয়েতে নেমন্তন্ন খেয়ে দেবেশদা তিন দিন বিছানায় শুয়েছিল এত খেয়েছিল—

উমা। মীরার সবেতেই ঠাট্টা!

দেবেশ। কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়, কাকীমা। লোভে পড়ে একটু বেশীই খেয়েছিলুম—হজম করতে পারি নি। আর অশ্বিনীবাবু বন্দোবস্তও করেছিল তেমনি! খুব ঘটার বিয়ে হোলো—

উমা। আচ্ছা দেবেশ, আমার মানসকে বর সেজে কেমন মানিয়েছিল?

দেবেশ। সুন্দর মানিয়েছিল কাকীমা। বেনারসী-জোড়, ফুলের মালা চন্দন পরে মানসকে মনে হচ্ছিল যেন রাজপুত্র—

উমা। মানসকে কে সাজিয়ে দিয়েছিল?

মীরা। কনের বাড়ীর লোকরাই নিশ্চয়—

উমা। (দীর্ঘশ্বাস) তা নয় ত আর কে দেবে? মানসের বৌকে কেমন দেখলে, দেবেশ? আমার মানসের পাশে মানিয়েছিল ত?

দেবেশ। চমৎকার মানিয়েছিল।

উমা। আচ্ছা দেবেশ, মানস আমাদের কথা জিজ্ঞেস করলে?

দেবেশ। আপনার কথা খুব বেশী করে জিজ্ঞেস করলে কাকীমা। জানেন কাকীমা, আমার মনে হোলো মানসের খুব ইচ্ছে যে বৌ নিয়ে এসে আপনাকে প্রণাম করে যায়।

উমা। তুমি ওদের আসতে বললে না কেন? বিয়ে যখন হয়েই গেছে আর আজকাল ত' এ রকম বিয়ে হামেশাই হচ্ছে—

দেবেশ। মানসের আসার খুব ইচ্ছে। কিন্তু কাকাবাবুর ভয়ে সাহস হচ্ছে না···

উমা। তা ঠিক। উনি যে রকম রাগী আর গোঁড়া লোক, নতুন বৌকেই হয়ত 'দু' কথা বলে বসবেন। কাজ নেই বাপু! আমি মনে মনে ওদের আশীর্ব্বাদ করছি। আর তা ছাড়া দেখ দেবেশ, ওরা এলেও আমি ভালো করে দেখতে পাবো না—ঝাপসা দেখবো। তার চেয়ে মনে মনে দেখি, স্পষ্ট দেখতে পাবো।

মীরা। আপনার হরলিকস্ খাওয়ার সময় হোলো। আমি নিয়ে আসি।

(মীরা ভিতরে যায়)

উমা। মীরা যে আমাদের কত কাজ করছে তা আর বলার নয়। আমার ত এই প্রায় অসহায় অবস্থা। হাতড়ে-হাতড়ে দু' একটা কাজ করতে পারি কি না পারি। ঐ মেয়ে একা সংসারের কাজ করছে আবার অফিসে চাকরীও করছে। তার ওপর তোমার কাকাবাবুর হেডমাষ্টার হয়ে আজকাল যা মেজাজ হয়েছে—তাকে সামলানো···

দেবেশ। সবই জানি, কাকীমা।

উমা। তাই মাঝে মাঝে ভাবি অমন ভালো মেয়ে—তার কী বরাত! বৌ-করে ঘরে আনবো সব ঠিক। কিন্তু দেখো, কোথা থেকে কী হয়ে গেল! দেবেশ, তুমি বাবা ওর কথা একটু ভেবে দেখো—

(প্রবেশ করে মীরা—হাতে হরলিক্স উমার জন্য)

মীরা। কাকীমা, আপনার হরলিক্স।

(উমাকে দেয়। উমা পান করে। প্রবেশ করেন শশাঙ্কশেখর—অত্যন্ত উত্তেজিত)

শশাঙ্ক। ঝকমারী এই হেডমাষ্টারীর কাজে! এই যে দেবেশ! কটা বাজলো দেখত—

দেবেশ। (ঘড়ি দেখিয়া) আট-টা।

শশাঙ্ক। (জামা ছাড়িতে ছাড়িতে) বেলা সাড়ে ন'টায় বেরিয়েছি, বাড়ী এলুম রাত আট-টায়! হেডমাষ্টার হয়ে সুখ বেড়েছে।

(মীরা জামা-চাদর লইয়া ভিতরে যায়)

বলেছিলুম যে ও কাজে আমার দরকার নেই, তোমরা অন্য কাউকে হেডমাষ্টার কর—আমার কথা শুনলে না। জোর করে আমায় হেডমাষ্টার করে—তবে ছাড়লে—

দেবেশ। ঠিকই ত' করেছে। আপনি স্কুলের সব চেয়ে সীনিয়র টীচার,—হেডমাষ্টার ত আপনারই হওয়া উচিত।

(মীরা প্রবেশ করে—হাতে জলখাবারের থালা)

মীরা। কাকাবাবু আগে আপনি হাতমুখ ধুয়ে কিছু খেয়ে নিন।

(শশাঙ্কশেখর ভিতরে যান)

দেবেশ। বুঝতে পারছেন কাকীমা, আজ স্কুলে একটা কিছু হয়েছে—

উমা। ভাগ্যিস মীরা ছিল তাই হাত মুখ ধুতে পাঠিয়েছে। এ রকম মেজাজে ফিরলে আমি কোনোদিন পারি নি—

(প্রবেশ করেন শশাঙ্ক শেখর)

শশাঙ্ক। জানলে দেবেশ, কাল থেকে মাষ্টার মশাইদের ধর্ম্মঘট! শুনে এলুম স্কুলের ফটকে সবাই

সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন—কোনো মাষ্টার বা ছাত্রকে ঢুকতে দেওয়া হবে না। তারপর বেলা ২টায় সমাবেশ, ৩টায় মিছিল, ৫টায় মিটিং—তাঁদের সাত দফা দাবী না আদায় হওয়া পর্য্যন্ত এই রকম চলবে!

মীরা। কাকাবাবু আপনি আগে খেয়ে নিন—

(খাবারের থালা শশাঙ্কর হাতে দেয়)

আমি ততক্ষণ আপনাকে আজকের কাগজ পড়ে শোনাই—

শশাঙ্ক। আচ্ছা পড়

(শশাঙ্কশেখর খাইতে আরম্ভ করেন। মীরা কাগজ পড়িবার উদ্যোগ করে। প্রথমেই একটা খবর চোখে পড়ে—খবরটা মানসের সম্বন্ধে)

মীরা। (সোৎসাহে) কাকীমা, আজকের কাগজে মানসদা'র নাম বেরিয়েছে—

উমা। (ব্যগ্রভাবে) মানসের নাম? কাগজে বেরিয়েছে? কী লিখেছে?

মীরা। মানসদা মিটিং করতে দিল্লী যাচ্ছে—কোলকাতা থেকে আরও সব বড় বড় লোক যাচ্ছে! ওদের একটা ছবিও কাগজে বেরিয়েছে—

উমা। কাগজে মানসের ছবি বেরিয়েছে? কই দেখি, দেখি—

(লইবার জন্য হাত বাড়ায়, মীরা দিতে যায়। শশাঙ্কশেখর কাগজখানি টানিয়া লন)

শশাঙ্ক। তুমি রাতে দেখতে পাবে?

উমা। (হতাশভাবে) তাও ত' বটে! আচ্ছা কাল সকালে ছবিটা দেখবো। এখন মানসের কথা কী লিখেছে পড়ে শোনা ত মা—

(কাগজ লইয়া শশাঙ্কশেখর নিজে মানসের ছবিটা এমনভাবে দেখেন যেন কাহারও নজর না পড়ে কিন্তু মীরা সবই লক্ষ্য করে)

শশাঙ্ক। পরে শোনাবে। (মীরাকে) মীরা আমার জামার পকেটে একখানা চিঠি রেখেছি ফেরবার সময় দেখলুম লেটার বক্সে রয়েছে। সেটা যে পকেটে রেখেছি তা এতক্ষণ মনেই ছিল না। দেখো ত' কার চিঠি—

(মীরা চিঠি আনিতে ভিতরে যায়)

(দেবেশকে) দেবেশ তোমার থিসিস কতদূর?

দেবেশ। আর বেশী এগোতে পারিনি কাকাবাবু! সময় পাচ্ছি না—

শশাঙ্ক। সন্ধ্যেবেলা মেয়েদের সঙ্গে গল্প করতে বসলে সময় কোথা থেকে পাবে?

(দেবেশ অপরাধীর মত চলিয়া যায়। প্রবেশ করে মীরা)

কার চিঠি?

মীরা। মানসদার। কাকীমাকে লিখেছে। পড়বো।

শশাঙ্ক। (একটু ভাবিয়া) পড়—

(শশাঙ্কশেখর ভিতরে যান কিন্তু দরজার আড়াল হইতে সবই শোনেন)

উমা। তোমার কাকাবাবু চলে গেলেন। ছেলের চিঠিও শুনবেন না।...আমি কী শুনবো?

মীরা। কেন শুনবেন না কাকীমা? আপনার ছেলে আপনাকে চিঠি দিয়েছে আর আপনি শুনবেন না?

উমা। উনি যদি রাগ করেন?

মীরা। সে অন্যায় রাগ। ছেলে কী কখনও বাপ-মা'র কাছে পর হয়ে যায়?

উমা। মীরা তুই ঠিক বলেছিস মা, আমি মানসের চিঠি শুনবো। তুই পড়—

মীরা। (চিঠি পড়ে) শ্রীচরণেষু-

মা, তোমায় খুব দেখতে ইচ্ছে করছে। মা, তুমি যদি অনুমতি কর একদিন গিয়ে তোমায় প্রণাম করে আসি। তোমার বৌমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাবো। তুমি বোধ হয় রাগ করেছ। বাবা ত করেছেনই জানি। মা, আমি কিন্তু কোনো অন্যায় করি নি। তোমার আশীর্ব্বাদে আজ আমি নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছি। আমি কাল দিল্লী যাচ্ছি একটা বড় মিটিং-এ। আমাদের কোম্পানী আমাকে পাঠাচ্ছে। ফিরে যেন তোমার চিঠি পাই। তোমার চোখ কেমন আছে? চিকিৎসার জন্যে আপাততঃ দুহাজার টাকা পাঠাচ্ছি। টাকাটা দু'একদিনের মধ্যেই পৌছবে। মীরাকে বোলো সে যেন আমায় ক্ষমা করে। আমি দেবেশকে সব কথা বলেছি। বাবাকে আমার প্রণাম জানিও। তুমি আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিও। ইতি

তোমার স্নেহের মানস

(চিঠি শুনিতে শুনিতে উমার চক্ষু অশ্রুসজল হইয়া ওঠে)

উমা। মীরা, চিঠিখানা আমায় দেনা মা

(মীরা চিঠি দেয়। উমা সেটী সযত্নে রাখে। চিঠি পড়া শেষ হইলে প্রবেশ করেন শশাঙ্কশেখর। হাতে একখানি বই)

শশাঙ্ক। এবার তোমরা পাশের ঘরে যাও, আমি একটু পড়াশোনা করবো—

উমা। (উঠিয়া) বেশী রাত কোরো না। আজ সারাদিন খুব পরিশ্রম হয়েছে। মীরা, আমার হাত ধর মা—

(মীরা উমার হাত ধরে। খবরের কাগজখানিও লইয়া যাইতেছিল)

শশাঙ্ক। মীরা, আজকের কাগজ আমার এখনও পড়া হয় নি।

মীরা। (কাগজ দিতে যায়)...এই যে কাগজ

শশাঙ্ক। ঐখানে রেখে যাও

(মীরা কাগজ রাখিয়া দেয়। তাহার পর উমার হাত ধরিয়া ভিতরে লইয়া যায়)।

(শশাঙ্কশেখর কাগজ লইয়া মানসের সংবাদটী উৎসুক ভাবে পড়িতেছেন এমন সময় দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ)

শশাঙ্ক। কে?

(—নেপথ্যকণ্ঠ) শশাঙ্ক, বাড়ী আছ?

(বলিতে বলিতে প্রবেশ করে অশ্বিনী ঘোষ)

আমি অশ্বিনী···অশ্বিনী ঘোষ।···চিনতে পারছ?

শশাঙ্ক। অশ্বিনী!···এসো এসো।

অশ্বিনী। (হাসিতে হাসিতে) তবু ভালো, আশা করি বসতেও বলবে—

শশাঙ্ক। বাড়ীতে কেউ এলে বসতে বলাই ত নিয়ম

অশ্বিনী। কিন্তু শশাঙ্ক ভট্চায ত নিয়মের ব্যতিক্রম। ···তাহলে বসা যাক

শশাঙ্ক। অবশ্য আমার এই ঘরে তোমার বসতে যদি অসুবিধে না হয়।

অশ্বিনী। কোনো অসুবিধে হবে না। বরঞ্চ তুমি যদি ধূমপান করতে নিষেধ কর তাহলে কিছুটা অসুবিধা হতে পারে। তোমার ত সিগরেটের ধোঁয়া সহ্য হয় না।

শশাঙ্ক। সহ্য হয় না এমন অনেক জিনিষই ত'

অশ্বিনী। তা হয়। যেমন মনে কর, আমার সঙ্গে তোমার যে একটা নতুন সম্পর্ক হয়েছে সেটা তোমার ভালো না লাগলেও ত মেনে নিতে হবে।

শশাঙ্ক। না, সে সম্পর্ক আমি স্বীকার করি না।

অশ্বিনী। মানসের সঙ্গে তুমি কোনো সম্পর্ক রাখতে চাও না?

শশাঙ্ক। মানস আমার সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিন্ন করে চলে গেছে—

অশ্বিনী। যদি সে ফিরে আসে?

শশাঙ্ক। তাহলে এ বাড়ীতে হয় সে না হয় আমি থাকবো। মানসের আর আমার পথ আলাদা।

অশ্বিনী। সেটা কী মানস আমার মেয়েকে বিয়ে করেছে বলে?

শশাঙ্ক। সেটা একটা কারণ হলেও একমাত্র কারণ নয়।···আর, মানস তোমার মেয়েকে বিয়ে করেছে না তুমি কৌশলে মানসের সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে দিয়েছো?

অশ্বিনী। শশাঙ্ক, তুমি কী বলতে চাইছ?

শশাঙ্ক। আমি বলছি যে তুমি মানস কি টাকার লোভ দেখিয়ে তোমার জালে জড়িয়ে—আমাকে শিক্ষা দেবার জন্যে—

অশ্বিনী। তার মানে।

শশাঙ্ক। পঁচিশ বছর আগে সেই তর্কের কথা আশা-করি তোমার মনে আছে, অশ্বিনী। সেদিনের তর্কে আমাদের দুজনের বিভিন্ন আদর্শ বেশ পরিষ্কার ভাবে বোঝা গিয়েছিল। তোমার আদর্শ টাকা আমার আদর্শ মনুষ্যত্ব। তুমি আমাকে চ্যালেঞ্জ করেছিলে, বলেছিলে যে তোমার জীবন দিয়ে তুমি প্রমাণ করে দেবে কার আদর্শ ঠিক। আজ তুমি প্রচুর সম্পদের অধিকারী, দেশের, সমাজের একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি, আর আমি একজন গরীব স্কুলমাষ্টার। আজকের পৃথিবীর মাপদণ্ডে আমি পরাজিত, জয় তোমারই—

অশ্বিনী॥ শশাঙ্ক, এ সব কথা আজ কেন? আজ আমি এসেছি—

শশাঙ্ক॥ (বাধা দিয়া) আমাকে শেষ করতে দাও, অশ্বিনী। আজ আমার নিজের ছেলেকে তোমার আদর্শে বিশ্বাসী করিয়ে, তাকে তোমার পায়ের নীচে ফেলে

আমার কাছে প্রমাণ করতে যে তুমি কতখানি জিতেছ ? তাই নয় কী অশ্বিনী ?

অশ্বিনী ॥ না শশাঙ্ক, আজ আমি এসেছি তোমায় জানাতে যে তোমার ছেলে মানস আজ কত বড় হয়েছে। কাগজে বোধ হয় দেখেছ সে দিল্লী গেছে একটা খুব বড় conferenceএ A, K, G, Enterpriseকে represent করতে। এত বড় confrence-এ বসতে পাওয়াই একটা সম্মান। মানস তোমার গৌরব শশাঙ্ক,—

শশাঙ্ক ॥ মানস আমার লজ্জা—

অশ্বিনী ॥ কেন ?

শশাঙ্ক। সে A, K, G, Enterprise-এর প্রতিনিধি হয়ে গেছে বলে।

অশ্বিনী ॥ তুমি কী ইঙ্গিত করছো, শশাঙ্ক—?

শশাঙ্ক ॥ কথাটা তাহলে স্পষ্ট করেই শুনতে চাও ?

অশ্বিনী ॥ তোমার যদি বলার সাহস থাকে, তাহলে আমার শোনার শক্তিও আছে—

শশাঙ্ক ॥ কথাটা সাহসের নয়, ভদ্রতার। অশ্বিনী, ২৫ বছর পর তুমি আমার বাড়ীতে আজ এসেছ। একটা অপ্রিয় সত্যকথা আমায় দিয়ে জোর করে না-ই বা বলালে তার চেয়ে তুমি বোসো, আমি যথাসাধ্য অতিথি সৎ-কারের ব্যবস্থা করি ?

অশ্বিনী ॥ কথাটা না শোনার আগে নয়।

শশাঙ্ক ॥ কথাটা নতুন কিছু নয়, অশ্বিনী। আর এমনও নয় যা নাকি তুমি কোনোদিন শোনো নি। তবে তোমার মুখের ওপর হয়ত সে কথা কেউ কোনোদিন বলে নি। কথাটা এই যে তোমার ব্যবসা সততার ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়।

অশ্বিনী ॥ কোনো ব্যবসাই তা নয়।

শশাঙ্ক ॥ এ কথা আমি বিশ্বাস করি না। দেশে অনেক সৎ ব্যবসায়ী—ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আছে। কিন্তু তুমি তাদের একজনও নয়।

অশ্বিনী ॥ এ কথা যদি সত্যি হোতো তাহলে এতদিন ধরা পড়ে যেতুম—

শশাঙ্ক ॥ ধরা যে পড় না তার কারণও সকলে জানে। টাকার জোরেই সকলের মুখবন্ধ করে রেখেছ—

অশ্বিনী ॥ তাহলে স্বীকার করছো টাকায় অনেক কিছু করা যায়—

শশাঙ্ক ॥ যা নিত্য চোখে দেখা যায় তা স্বীকারের অপেক্ষ রাখে না।

অশ্বিনী ॥ সেই টাকা আমার আছে—

শশাঙ্ক ॥ সে কথা সকলেই জানে—

অশ্বিনী ॥ আর টাকার জোরেই আমি আজ সমাজের মাথায় বসে আছি—

শশাঙ্ক ॥ সে কথা ত আমি আগেই বলেছি।

অশ্বিনী ॥ তাহলে মানুষের পরিচয় আজ কিসে বলে মনে হচ্ছে ? বিদ্যায় না টাকায় ? (শশাঙ্ক নীরব থাকে) সমাজ আমায় স্বীকৃতি দিয়েছে, তোমায় দেয়নি কেন ? কারণ আমার টাকা আছে, তোমার নেই।

শশাঙ্ক ॥ তাতে আমার কোনো দুঃখ নেই। তুমি তোমার আদর্শ নিয়ে চল,আমি আমার আদর্শ নিয়ে চলি—

অশ্বিনী ॥ তোমার ছেলে কিন্তু তোমার আদর্শে বিশ্বাস করেনা, করে আমার আদর্শে—

শশাঙ্ক ॥ সেটা তার দুর্ভাগ্য—

অশ্বিনী ॥ মানস আজ সৌভাগ্যের স্বর্ণশিখরে—

শশাঙ্ক ॥ দুঃখের বিষয় সোনাটা খাঁটী নয়—

(অশ্বিনী পকেট হইতে নোটের তাড়া বাহির করিয়া)

অশ্বিনী। (শশাঙ্কর সম্মুখে নোটের তাড়া দেখাইয়া) কিন্তু এটা নিশ্চয়ই খাঁটী ! দু'হাজার টাকা মানস পাঠিয়েছে তার মার চিকিৎসার জন্যে। এই নাও।

শশাঙ্ক ॥ (কোনোমতে ক্রোধ সংযত করিয়া) ওটা আমি স্পর্শ করবো না—

অশ্বিনী ॥ কিন্তু মানসের মা, যাঁকে মানস পাঠিয়েছে ?

শশাঙ্ক ॥ তাঁকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো—(ডাক দেন) মীরা !

(মীরা ভিতর হইতে সাড়া দেয়)

মীরা ॥ আসছি কাকাবাবু—

(প্রবেশ করে মীরা)

শশাঙ্ক ॥ মীরা, তোমার কাকীমাকে একবার এখানে আসতে বল—

(মীরা চলিয়া যায়)

অশ্বিনী ॥ মেয়েটী কে ?

শশাঙ্ক ॥ পরেশের মেয়ে। পরেশ চাটুজ্যে আমাদের সঙ্গে স্কুলে পড়তো—

অশ্বিনী ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ মনে আছে নৈহাটীতে থাকতো—

শশাঙ্ক ॥ পরেশ মারা গেছে। মীরার—নিজের অধিকারে এ বাড়ীতে থাকার কথা। পরেশকে আমি কথা দিয়েছিলুম। আজ মীরা আমার বাড়ীতে আশ্রিতা মাত্র—

(প্রবেশ করে উমা মীরার হাত ধরিয়া)

অশ্বিনী ॥ নমস্কার বেয়ান।

উমা ॥ নমস্কার—

অশ্বিনী ॥ (টাকা দিতে যায়) আপনার চোখের চিকিৎসার জন্যে মানস ২০০০ টাকা পাঠিয়েছে।… আপনি এটা রাখুন—

উমা ॥ (স্থিরকণ্ঠে) মানসকে বলবেন সে যে মনে-করে আমায় টাকা পাঠিয়েছে তাতেই আমার নেওয়া হয়েছে—

অশ্বিনী ॥ টাকাটা আপনি রাখবেন না ? আপনার ছেলে আপনাকে পাঠিয়েছে—

উমা ॥ মানসকে বলবেন সে যেন টাকাটা গরীব অন্ধদের সাহায্যের জন্যে খরচা করে—

অশ্বিনী ॥ আপনার চোখের চিকিৎসা ?

উমা ॥ সে কথা যদি সে জিজ্ঞেস করে তাকে বলবেন যে আমি বাইরে ঝাপ্সা দেখলেও মনের ভেতর তাকে বেশ স্পষ্ট দেখতে পাই। (মীরাকে) মীরা, আমাকে ভেতরে নিয়ে চল্ মা—

(মীরার হাত ধরিয়া ভিতরে যায়)

—দ্বিতীয় দৃশ্য—

(রমলার ঘর। সময় সকাল। মানস সোফায় বসিয়া কাগজ পড়িতেছে। রমলা খোলা জানালার ধারে দাঁড়াইয়া আপনমনে প্রভাতী সুরের একটী রবীন্দ্র সঙ্গীত গাহিতেছিল। বেয়ারা চা ইত্যাদি রাখিয়া গেল। রমলা গান শেষ করিয়া মানসের কাছে আসিয়া তাহার সহিত অন্তরঙ্গ হইবার চেষ্টা করে। কিন্তু মানসের মন অন্যদিকে।)

রমলা ॥ (মানসের কাছে আসিয়া) গান কেমন লাগলো ?

মানস ॥ (অন্যমনস্ক ভাবে) গান ?…ভালো—

রমলা ॥ (বুঝিতে পারিয়া) আজ টেবিলে চা না দিয়ে ঘরেই দিতে বলেছিলুম—

মানস ॥ (কাগজ দেখিতে দেখিতে) ওঃ !

রমলা ॥ (চা তৈয়ারী করিতে করিতে) কাল কত রাত্রে ফিরলে ?

মানস ॥ (ঐ ভাবেই) কাল ?…তখন দুটো হবে।

রমলা ॥ চা নাও। (চায়ের কাপ দিতে দিতে) অত রাত হোলো কেন ?

মানস। কাল রতনলাল ভগত এণ্ড-এর অফিস সার্চ্চ হয়েছে—

রমলা। আমি জিজ্ঞেস করছিলুম কাল অত রাত অবধি কোথা ছিলে ?

মানস। কাল ? ইনটারন্যাশানাল-এ

(চায়ের কাপ রাখিয়া একটী ফাইল লইয়া বসে)

রমলা। সেখানে কী ছিল ?

মানস। কী আবার ? পার্টি। জানোই'ত এতদিন তোমার বাবা যা করতেন এখন আমাকে তাই করতে হচ্ছে। বড় বড় কোম্পানীর কর্ম্মকর্ত্তাদের, সরকারী অফিসারদের entertain করা—যার যেখানে রুচি তাকে সেখানে নিয়ে গিয়ে কাজ আদায় করা। কাল মিঃ রামস্বামীকে নিয়ে গেছলাম ইনটারন্যাশানলে! ভদ্র-লোকের বেলীড্যান্স দেখার ভারী ইচ্ছে। ইনটার-ন্যাশানাল দুজন ইজিপসীয়ান বেলী-ড্যান্সার আনিয়াছে—

রমলা। চা ঠাণ্ডা হয়ে গেল—

মানস। নোরা আর ডোরাকে দেখে ভদ্রলোক আর উঠতেই চান না! পেগ-এর ওপর পেগ চালালো, শেষে রাত দেড়টায় টেবিলের তলা থেকে স্বামীজিকে টেনে তুলতে হোলো! অবশ্য কনট্রাক্টটা তার আগেই সই করিয়ে নিয়েছিলুম—

রমলা। ডিমের পোচ-টা খাও।

মানস। আগে এ সব কাজের জন্যে তোমার বাবার assistant ছিল বিকাশবাবু। এখন আমাকেই সব

করতে হয়। বিকাশবাবু অবশ্য এতে বেশ মনে মনে চটেছে—

রমলা। ডিমটা খেলে না?

মানস। ভালো লাগছে না?

রমলা। তাহলে একটা টোষ্ট খাও—খালি পেটে সকালে চা খাওয়া ঠিক নয়।

মানস। আচ্ছা দাও—

রমলা। (টোষ্ট দিতে দিতে) আজ সন্ধ্যেবেলা বাড়ীতে থাকবে ত?

মানস। আজ? না রমলা আজ ত পারবো না, আজ একটা বিশেষ কাজ আছে—

রমলা। সে কী? তুমি বলেছিলে আজ আমরা একসঙ্গে বেড়াতে যাবো, আজ আমার জন্মদিন—ভুলে গেছ!

মানস। না রমলা ভুলি নি। কিন্তু কাল রাত্রে টেলিগ্রাম এসেছে দিল্লী থেকে মিঃ ট্যাণ্ডন আজ আসছে! আমাদের Steel এর সমস্ত ব্যাপারটা ওর হাতে। আজ ওকে নিয়েই আমার সারাদিন কাটবে। আমায় এখনি এয়ার পোর্টে যেতে হবে মিঃ ট্যাণ্ডনকে রিসিভ করতে। তারপর ১২টায় Export Council-এর মিটিং গ্র্যাণ্ডহোটেলে, তারপর দেড়টায় ওখানেই লাঞ্চ। তিনটেয় চেম্বার অফ কমার্স, সাড়ে চারটেয় ফেডারেশনের টী·· তারপর সন্ধ্যেবেলা কালিঘাট!

রমলা। কালিঘাট?

রমলা। ধর্মপ্রাণ লোক এঁদের ভেতরেও আছেন রমলা। গতরাত্রে যে সাহেবটী পার্ক ষ্ট্রীটের হোটেলে নোরা-ডোরার বেলা-ড্যান্স দেখতে দেখতে হুইস্কীর বোতল উড়িয়েছেন আজ তিনিই আবার সাউথ অফ-পার্কষ্ট্রীটে কালিমন্দিরে গিয়ে মার পূজো দেবেন তারপর কপালে সিন্দুরের টিপ পরে কিঞ্চিৎ কারণবারি ভাঁড়ে করে পবিত্র ভাবে পান করে 'মা মা' বলে নাটমন্দিরে গড়াগড়ি দেবেন! এ এক বিচিত্র জগৎ রমলা—

রমলা। তোমার জগৎ নিয়ে তুমি আছ, কিন্তু আমার এই নিঃসঙ্গ জগতে আমি যে হাঁফিয়ে উঠছি, এ কথা কী তুমি বুঝতে পারো না?

মানস। পারি রমলা, খুব পারি। কিন্তু কী করবো, উপায় নেই। কাজ কাজ আর কাজ! আর তোমার বাবাটীও হয়েছেন তেমনি—! দুটো কড়া চোখ আমার ওপর এমন ভাবে রেখেছেন যে একটু ফাঁকি দেবার উপায় নেই। সুযোগ পেলেই জ্ঞান দিচ্ছেন—মানস, কোনো দিকে চাওয়া নয়, কাজ করে যাও।

(টেলিফোন বাজে)

(রিসিভার তুলিয়া) হ্যালো! কে? রমেশ? কী খবর? ভিটলভাই দয়ারাম? এসেছে? তুমি appointment করে রাখো, কাল continental-এ, হ্যাঁ, লাঞ্চে মিট করবো—হ্যাঁ, নমস্কার—

(রিসিভার রাখিয়া) দেখছ'ত রমলা—একটু সময় নেই! যাই, তৈরী হয়ে নি দশটার মধ্যে এয়ার পোর্টে পৌছতে হবে—

(মানস ভিতরে যায়। রমলা নিজের আঁকা অর্দ্ধ সমাপ্ত একটী ছবিতে তুলি বুলাইতে আরম্ভ করে। প্রবেশ করে অশ্বিনী)

অশ্বিনী। (ছবি আঁকিতে দেখিয়া) বাঃ! রমি তুমি যে এমন সুন্দর ছবি আঁকতে পারো তা ত জানতুম-না। কার কাছে শিখলে?

রমলা। অমিত বাবুর কাছে।

অশ্বিনী। প্রোফেসর ছবি আঁকতেও জানে?

রমলা। অমিতবাবু আরও অনেক কিছু জানেন।

অশ্বিনী। তার মানে কোনোটাই ভালো করে জানে না। হয় না মা, হয় না। এক এক জনকে এক এক বিষয় নিয়ে থাকতে হয়, তবে উন্নতি করতে পারে। দেখছ না আমি সব ছেড়ে দিয়ে এই বিজনেস নিয়েই পড়ে আছি। মানসকেও তাই বলি "মনকে একটা রাস্তা ধরে চলতে দেবে"—

রমলা। তোমার কথা মানস খুব মানে।

অশ্বিনী। (খুসীমনে) মানবেই'ত! আমি'ত তোমায় বলেছিলুম মানস খুব ভালো ছেলে! তুমি দেখে নিও রমল মানস তোমায় কত সুখী করবে। ভালো লোকের হাতেই আমি তোমায় দিয়েছি! আমি আর ক'দিন?

রমলা। বাবা, অমন কথা তুমি কেন বলছ?

অশ্বিনী। (হাসিয়া) দুটো Strone ত হয়ে গেছে আর বড় জোর একটা—

রমলা। বাবা—

অশ্বিনী। ভয় নেই মা, ভয় নেই। এখনও আরও কিছুদিন আছি। মানসকে আমি অনেক উঁচুতে তুলে দিয়ে যাবো! দেখিয়ে দেবো যে বাঙালীও ব্যবসা করতে জানে। ওকে আমি শীগ্গিরই ইউরোপ আমেরিকার business centresগুলো ঘুরিয়ে আনবো—

রমলা। মানস কী একলাই যাবে?

অশ্বিনী। হ্যাঁ। বিজনেস-এর জন্যে'ত যাওয়া!

রমলা। (হতাশ ভাবে) ওঃ। (ছবি আঁকায় মন দেয়)

অশ্বিনী। রমল, মানস কী এয়ার পোর্টে চলে গেছে?

রমলা। না।

অশ্বিনী। সে কী! এখনও যায় নি? বসে গল্প করছিল বুঝি? ঐ ওর দোষ! রমল, তুমি এটা মোটেই encourage কোরো না—

(প্রবেশ করে মানস। এয়ার পোর্ট যাওয়ার জন্য প্রস্তুত)

এই যে মানস! সময়ে দমদম পৌঁছতে পারবে ত?

মানস। (ঘড়ি দেখিয়া) পারবো। রমলা তুমি—

অশ্বিনী। (বাধা দিয়া) না, এখন আর কোনো কথা নয়। চল মানস, আমিও তোমার সঙ্গে যাই। আমাকে পার্কষ্ট্রীটে নামিয়ে দিয়ে যেও—

(মানস ও অশ্বিনী বাহির হইয়া যায়। রমলা ছবিতে মন দেয়। প্রবেশ করে বিকাশ)

বিকাশ। (দরজার কাছ হইতে) এই যে মা রমলা একা একা বসে আছো? মানস কোথায়?

রমলা। মানস এয়ার পোর্টে গেছে—

বিকাশ। মানস চলে গেছে? আমি যে বলেছিলুম আমায় সঙ্গে নিতে? অশ্বিনী কোথা?

রমলা। মানসের সঙ্গেই বেরিয়েছেন। বাবার পার্ক-ষ্ট্রীটে কাজ আছে—

বিকাশ। মানস তা হলে একাই গেল! তা ভালো। এসব কাজ একা একা, করতে পারলেই ভালো তবে মানসের বয়সটা ত কাঁচা অবশ্য মানস খুবই চালাক চতুর ছেলে। তবে কী জানো মা, যে সব কাজ তাকে করতে হয় তা সবই ত সোজা রাস্তায় হয় না। বিপদ আছে—

রমলা। বিপদ!

বিকাশ। বিপদ ত আজকাল চারিধারে মা! দেখছ-না বড় বড় কোম্পানীর ভেতরের গলদ কী রকম পটাপট ধরা পড়ছে—

রমলা। মানস বলছিল কাল রতনলাল ভগতচাঁদের অফিস সার্চ হয়েছে—

বিকাশ। মালও বেরিয়েছে! আবার মালিককে হাজতবাসও করতে হয়েছে, অবশ্য, এ খবরটা কাগজে চেপে গেছে—

রমলা। বিকাশকাক, ওরা ত শুনেছি খুব influ-ential ফার্ম।

বিকাশ। হলে হবে কী? আজকাল যে অনেক-গুলো চোখ! আর ভেতরের কথা ফাঁস করে দেবার লোকের ত অভাব নেই। এসব কাজ ত একলা হয়না, পাঁচকান হবেই। তাই সবার মুখ টাকা দিয়ে বন্ধ রাখতে হয়। যার ভাগে টাকা পড়বে না, বা কম পড়বে সেই তখন সাধু সেজে অন্যদের ধরিয়ে দেবে। তাইত মানসকে বলেছিলুম আমাকে সঙ্গে নিও। কী ভাবে কাকে কায়দা করতে হয় সেটা ত জানি! তা মানস একাই গেল ট্যাণ্ডনকে রিসিভ করতে! আর ঐ ট্যাণ্ডনটা একটা ভয়ানক লোক—

রমলা। কী হবে বিকাশকাকা?

বিকাশ। তোমার জন্যেই ভাবনা হয় মা! তুমি ছেলেমানুষ সংসারের কিছুই জানো না। নিজের লেখা-পড়া, গান-বাজনা, ছবি আঁকা, ফুলের বাগান, এসব নিয়েই থাকতে। ভালোবাসো দেখতে বড় ভালো লাগে। আজ যদি মানস একটা বিপদে পড়ে তাহলে তোমার কী হবে—আমি দিনরাত শুধু তাই ভাবি—

রমলা। বিকাশকাকা, আপনি কিছু করতে পারেন না?

বিকাশ। এতদিন ত করেছি মা। তোমার বাবা একা-একা কোন কাজ করতে ভরসা পেত না—

সব সময় সঙ্গে থাকতো তোমার এই বিকাশ কাকা। কতবার কত বিপদের মুখ থেকে টেনে নিয়ে এসেছি। মানসের সঙ্গে থাকলে তাকেও সাহায্য করতে পারতুম। কী আর করা যাবে? বরাত ছাড়া ত আর পথ নেই—

রমলা। আমি কি করবো বিকাশকাকা?

বিকাশ। কী আর বলবো বল? ছেলেমানুষ, ক'দিনই বা বিয়ে হয়েছে? কোথা স্বামী-স্ত্রীতে আমোদ-আহ্লাদ করবে তা না বিজনেস-এর দোহাই দিয়ে স্বামী চলে গেল কোথা কোন্ হোটেলে বেলী-ড্যান্স দেখতে, আর স্ত্রী বেচারা বাড়ীতে একা-একা রাত জেগে বসে। তোমার জন্যেই কষ্ট হয় মা! আর মানসের জন্যেও হয়—তোমায় চিনলে না! যার ঘরে তোমার মত স্ত্রী সে কি না—যাক্ মা! সবই ভাগ্য মা! তা না হলে ভাবো না আজ তোমার জন্মদিন—আমার সে কথা মনে আছে আর মানস—

রমলা। বিকাশকাকা, আমি একা-একা হাঁফিয়ে উঠেছি—

বিকাশ। সে আর আশ্চর্য্য কী মা? তুমি বলে তাই মুখ বুঁজে সব সহ্য করছ! অন্য মেয়ে হলে এতদিনে—

রমলা। আমার আর ভালো লাগছে না। ইচ্ছে করছে কোথাও চলে যাই—

বিকাশ। কোথায় যাবে? হ্যাঁ, যদি শ্বশুরবাড়ী যাবার উপায় থাকতো তাহলে না হয় দিনকয়েক সেখানে ঘুরে আসতে।

রমলা। আমি তাহলে কী করবো বলতে পারেন, বিকাশকাকা?

বিকাশ। (ভাবিয়া) এক কাজ কর না মা—অমিত বাবুকে খবর দাও না। তার সঙ্গে বসে সব গল্প-সল্প করো, মনটা ভালো থাকবে। বল ত আমি না হয় অমিতের বাড়ীতে গিয়ে খবর দিয়ে আসি—

রমলা। আপনি যাবেন?

বিকাশ। এটুকু উপকার তোমার জন্যে করতে পারবো না? আমি আজই যাবো—

—৩য় দৃশ্য—

[শশাঙ্কশেখরের ঘর। সময় মধ্যাহ্ন।]

(দেবেশ ফাইল হইতে ডিকটেশন দিতেছে, মীরা সর্টহ্যাণ্ড লিখিতেছে)

দেবেশ। Next paragraph "How is this Atman to he realised…

মীরা। (লেখা বন্ধ করিয়া)—How is this কী?

দেবেশ। Atman

মীরা। বানান বলুন ওটা কী ইংরিজী কথা?

দেবেশ। টুকে বি, এ পাশ করেছ? সংস্কৃত 'আত্মন্' কথা জানো না?

মীরা। ইংরিজীতে সর্টহ্যাণ্ড নিচ্ছি—তারমধ্যে সংস্কৃতর 'ঘটমট' কেন?' 'soul' লিখবো?

দেবেশ। না। যা বলছি তাই লেখ—

মীরা। বেশীক্ষণ লিখতে পারবো না, হাত কন কন করছে—

দেবেশ। লক্ষ্মীটি, আর একটু হলেই শেষ হয়ে যাবে—

মীরা। (সহাস্যে) আর একটু হলেই আমিও শেষ হয়ে যাবো! (খাতা সরাইয়া রাখিয়া) এখন পাঁচমিনিট বিরাম! একটু গল্প করা যাক—

দেবেশ। কাজ শেষ করে গল্প করা যাবে—

মীরা। উঁহু! কাজের মাঝে গল্প, গল্পের মাঝে কাজ!

দেবেশ। খুব ফাজলামি হয়েছে! Please এটুকু শেষ করে দাও …বিকেলে একজায়গায় নিয়ে যাবো—

মীরা। ঠিক ত…তিন সত্যি কর—

দেবেশ। যাবো—যাবো—যাবো 'হোলো ত'…নাও, এবার আরম্ভ কর—

মীরা। বল—

দেবেশ। "what is the utility of self realisation? According to Vedanta—

মীরা। (দুষ্টামি করিয়া) According to Vebanta আমার প্রাণান্ত বলে যাও…তারপর?

দেবেশ। কী হচ্চে মীরা? তুমি ভারী দুষ্টু হয়ে উঠছ! কাকীমাকে বলে দেব—

মীরা। একঘণ্টার ওপর নোট নিচ্ছি…অফিসে মাইনে দিয়েও এত খাটাতে পারে না। আর তোমার নোট নিচ্ছি ত নিচ্ছি—and all for love!

দেবেশ। Loves Labour সব সময় lost নাও হতে পারে—

মীরা। তার মানে ?

দেবেশ। মানে সর্টহ্যাণ্ডে নেওয়া এই নোটগুলো তোমার অফিসের type-writer-এ যত তাড়াতাড়ি type করে এনে আমায় দেবে আমি তত তাড়াতাড়ি থীসিসটা submit করতে পারবো—

মীরা। তাতে আমার লাভ ?

দেবেশ। হিসেবের খাতায় লাভ লোকসান কী গোড়াতেই বোঝা যায় ? শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়।

মীরা। যে আজ্ঞে—

(দরজার কাছে উমাকে দেখা যায়)

কাকীমা !

(মীরা তাড়াতাড়ি উঠিয়া উমাকে ধরিয়া আনে)

উমা। মীরা মানসের চিঠিটা আমার বালিশের নীচে ছিল, কোথায় গেল বলত ?

মীরা। (লজ্জিত) কাকীমা একেবারে ভুলে গেছি। বিছানার চাদর বদলানোর সময় চিঠিটা কাকাবাবুর টেবিলে রেখেছি।

উমা। (ব্যস্তভাবে) মীরা, লক্ষী মা আমার, চিঠিটা এখনই নিয়ে আয়। তোর কাকাবাবুর হাতে পড়লে উনি তখনি ছিঁড়ে ফেলবেন—

মীরা। না কাকীমা, কাকাবাবু কখনোই তা করবেন না।

উমা। তুই ওঁকে জানিস না মা। ভীষণ একরোখা ! আমার শ্বশুরও ঐ রকম ছিলেন—দেবচরিত্র লোক, কিন্তু রাগলে রক্ষে নেই।

মীরা সে যাই হোক, আমি যখন সেদিন মানসদার চিঠি পড়ছিলুম কাকাবাবু দরজার পেছনে দাঁড়িয়ে সব শুনেছেন—

উমা। সত্যি ?

মীরা। কাকাবাবু ভেবেছেন যে আমি কিছু দেখতে পাই নি। চিঠি শুনতে শুনতে কাকাবাবু যে মাঝে মাঝে চোখও মুছছিলেন তাও আমি দেখেছি—

উমা। তুই যা মা চিঠিটা এনে আমায় আর একবার পড়ে শোনা—

(মীরা ভিতরে যায়)

অমন লক্ষী মেয়ে আর হয় না !

দেবেশ। (হাল্কাভাবে) আজকাল কিন্তু একটু একটু দুষ্টু হচ্চে !

উমা। (হাসিয়া) না না দেবেশ তুমি বাবা মন ঠিক কর। তোমার মা'কে আমি সব কথা বলবো। তাঁকে রাজী করানোর ভার আমার—

(মীরা চিঠি লইয়া প্রবেশ করে)

মীরা। চিঠি এনেছি কাকীমা। কোনখানটা পড়বো বলুন। গোড়া থেকে ?

উমা। না না, তার দরকার নেই। ঐ খানটা পড়, যেখানে মানস লিখেছে—মা তোমায় খুব দেখতে ইচ্ছে করছে—

মীরা। (হাসিয়া) ওটা-ইত চিঠির গোড়া কাকীমা।

উমা। তা আমি জানি। চিঠিত আমার মুখস্ত হয়ে গেছে। মানস লিখেছে মা, তুমি যদি অনুমতি কর তোমায় গিয়ে প্রণাম করে আসি—

মীরা। উঁহু ! হোলো না। আপনি কথা বাদ দিয়ে গেছেন—

উমা। কী কথা বাদ দিলুম।

দেবেশ। (চিঠি দেখিয়া) কাকীমা, আপনি "একদিন" কথাটা বাদ দিয়ে গেছেন। মানস লিখেছে—"একদিন গিয়ে প্রনাম করে আসবো"—

উমা। হাঁা, তা বটে ! কিন্তু কী জানো বাবা দেবেশ ঐ একদিন কথাটা কিছুতেই আমার মনে থাকে না। কেন বলত ?

দেবেশ। কী করে থাকবে কাকীমা ? আপনি যে মনে মনে চান মানস রোজই আপনার কাছে আসুক—! তার কথাই আপনি সব সময় ভাবেন—

উমা। তা ভাবি। কিন্তু সেটা কী ঠিক ? তোমার কাকাবাবু যখন মানসের একদিন আসাও পচ্ছন্দ করেন না, তখন আমি তার রোজ রোজ আসার কথা ভাববো কেন ?

দেবেশ। কেন ভাববেন না ? মানস আপনার ছেলে সে আপনার কাছে আসুক,—ঐ ইচ্ছে করা ত অন্যায় নয়।

উমা। তুমি ঠিক বলেছ বাবা

দেবেশ। কাকীমা, আপনি যদি বলেন আমি মানসের

কাছে যেতে পারি—গিয়ে বলতে পারি যে আপনি তাকে দেখতে চেয়েছেন—

উমা। (উৎসাহে) দেবেশ, তুমি যাবে ? তুমি মানসকে আমার কাছে আনতে পারবে ?

দেবেশ। কেন পারব না ? মানস ত আসতে চায়। শুধু অনুমতির অপেক্ষা। আমি মানসকে বলবো— 'মানস, তোমার মা তোমায় ডেকেছেন'—

উমা। হাঁ্যা, তাই বোলো। তবে দেখ দেবেশ, মানস ত এখন খুব কাজের লোক হয়েছে সে যদি বলে দিনের বেলা সময় হবে না। সন্ধ্যের পর যাবো—

দেবেশ। বলবো, তাই যেও

(উমা নীরব থাকে। মীরা বলে)

মীরা। সন্ধ্যের পর এলো বলে কাকীমার যে দেখতে অসুবিধা হবে।

দেবেশ। (লজ্জা পাইয়া) তা ও ত বটে !

উমা। দেবেশ, তুমি বাবা আমার মানসকে বুঝিয়ে বোলো—"মানস্ তোমার মা সন্ধ্যের পর চোখে ভালো দেখতে পান না তুমি ভাই একদিন দুপুর বেলা যেও—?

দেবেশ। তাই বলবো, কাকীমা

উমা। আর বোলো সে যেন সেদিন আমার এখানেই খায়। জানিস মীরা আমার হাতের রান্না সুক্ত খেতে মানস খুব ভালোবাসে। মানস যেদিন আসবে তুই সেদিন আর অফিস যাস নি। আমায় সব যোগাড় করে দিবি, আমি মানসের জন্যে সুক্ত রাঁধবো

মীরা। তাই হবে কাকীমা।

উমা। তবে একটা কথা ভাবছি—

মীরা। কী ভাবছেন ?

উমা। ভাবছি, মানস তবৌমাকেও সঙ্গে আনবে সে যদি সুক্ত না খায় ! মানস আমার গরীবের ঘরের ছেলে। আজ সে যত বড়লোকই হয়ে থাকুক আমার হাতের রান্না সুক্ত সে আনন্দ করে খাবে। কিন্তু তার বৌ, সে যদি খেতে না চায় ?

মীরা। (হাল্কা করার জন্যে) বৌদির জন্যে আপনি মাছের মুড়ো রেঁধে রাখবেন ! নতুন বৌ প্রথম বাড়ীতে আসবে শাশুড়ীকে প্রণাম করতে আর শাশুড়ী তাকে তেতো সুক্ত খাওয়াবে ?

উমা। ঠিক বলেছিস ! দেখ মীরা, আমি যেন কী রকম হয়ে গেছি ! আমার বৌমা বাড়ীতে আসবে আর আমি তাকে নিরামিশ সুক্ত খাইবে ছেড়ে দেব ?

কে এলো ? (দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ)

দেবেশ। আমি দেখছি কাকীমা—

(দেবেশ বাহিরে যায়। একটু পরে প্রবেশ করে হাতে M. O. form.)

কাকীমা, মানস একটা মণিঅর্ডার পাঠিয়েছে। ও লিখেছে যে শ্বশুরের হাতে টাকাটা পাঠানো ওর ভুল হয়েছিল। টাকাটা মণি অর্ডারেই পাঠাচ্ছিল কিন্তু ওর শ্বশুর বল্লেন যে তিনি যখন নিজেই এখানে আসছেন তখন তিনিই ত আনতে পারেন। মানস আপত্তি করে নি। পরে বুঝেছে কাজটা ঠিক হয়নি। এবার তাই মণি-অর্ডার করেছে। (ফর্মটা দিতে যায়) এই নিন কাকীমা ফর্মে সই করে দিন—এই যে এইখানে (কলম দিতে যায়) আচ্ছা দাঁড়ান, আমি পিওনকে ভেতরে নিয়ে আসি, তার সামনেই সই করুন—

(দেবেশ বাহিরে যাইতেছিল সম্মুখে শশাঙ্কশেখর বাহির হইতে ভিতরে আসিতেছেন হাতে সাপ্তাহিক পত্র)

শশাঙ্ক। (গম্ভীরকণ্ঠে) না।

দেবেশ। কাকাবাবু, মানস নিজের রোজগারের টাকা তার মাকে পাঠিয়েছে—

শশাঙ্ক। টাকাটা কলঙ্কিত। তার মা সেটা নিতে পারে না।

দেবেশ। মানস আপনার ছেলে—

শশাঙ্ক। মানস আমার কলঙ্ক। (হাতের সাপ্তাহিক পত্রখানি দেখায়) এই দেখ ! কাগজে কী লিখেছে। C, B, I, (Central Bureau of Investigation) মানসকে ডেকে পাঠিয়ে কেন জেরা করেছিল তার কাহিনী পড়ে দেখো। আর দেখো, তার সঙ্গে মানসের পিতৃ-পরিচয়ও কেমন স্পষ্ট অক্ষরে লেখা আছে। (মীরাকে) মীরা, ফর্মখানা পিওনকে ফিরিয়ে দিয়ে এসো—

— ৪র্থ দৃশ্য —

[রমলার ঘর। অপরাহ্ণ। রমলা ও অমিত। সামনের টেবিলে একরাশ, বই, খাতা ইত্যাদি।]

(দৃশ্য আরম্ভে দেখা দেখা গেল রমলা হাসিতেছে—প্রাণখোলা হাসি। অমিতও সে হাসিতে যোগ দিয়াছে। তাহার পর অমিত বলে)

অমিত। রমলা, এবার পড়া আরম্ভ করা যাক।... এম-এ পরীক্ষার তারিখ কাগজে বেরিয়েছে দেখেছ ত? জানুয়ারীর আর বেশী দেরী নেই

রমলা। আমি যে এই জানুয়ারীতে পরীক্ষা দেবো এ কথা আপনাকে কে বললে?

অমিত। তা যদি হয় তাহলে আমায় এত আগে থেকে ডাকলে কেন?

রমলা। (হাসিতে হাসিতে) আপনি ভারী বোকা

অমিত। (বিস্মিত) সে কী?

রমলা। ভীষণ বোকা! (উচ্চ হাসি)

অমিত। (বিব্রত) কী করছো রমলা? অমন করে হাসে? মানসবাবু শুনতে পেলে কী ভাববেন?

রমলা। মানসবাবুর ও সব ভাবার সময় নেই!... আপনি কিন্তু ভারী বোকা—

অমিত। কেন?

রমলা। আমার এক বন্ধুর দিদি—

অমিত। (থামাইয়া দিয়া) আমি বোকা—তার সঙ্গে তোমার বন্ধুর দিদির কী সম্পর্ক?

রমলা। সম্পর্ক আছে শুনুন না। এম-এ পড়ার সময় আমার বন্ধুর দিদিটী ফিফ্‌থ ইয়ারে ভর্তি হয়েই ইউনিভারসিটীর একজন বড় প্রোফেসরকে টিউটর রাখলে—

অমিত। আঃ! এ যে তুমি গল্প আরম্ভ করলে—

রমলা। (হাসিয়া) গল্প হলেও সত্যি। আগে মন দিয়ে শুনুন, তারপর গল্পের moral গ্রহণ করুন—

অমিত। বলো

রমলা। বন্দোবস্ত হোলো প্রোফেসর সপ্তাহে দুদিন আসবেন—গাড়ী করে তাঁকে আনতে হবে। দু'ঘণ্টা পড়াবেন, মাসে ৪০০ টাকা। মেয়েটি সুন্দরী, বিবাহিতা এবং তার স্বামীর প্রচুর টাকা। স্বামীটিকে ব্যবসাসূত্রে প্রায়ই বাইরে বাইরে থাকতে হয়—মেয়েটি বাড়ীতে একা।

অমিত। একরকম ভালো, পড়ার সময় disturb করার কেউ নেই।

রমলা। প্রথমদিন পড়াতে এসেই প্রোফেসর সব দেখে শুনে বল্লেন—দুবছরে পরীক্ষা না দেওয়াই ভালো। এত বই! ভালো করে পড়তে গেলে দুবছরে হয় না! বেশ কিছু দেরী করে দিলে পড়াটা solid হয়—

অমিত। প্রোফেসর নিজেই এ কথা বল্লেন?

রমলা। হ্যাঁ। সেই প্রোফেসর পরে মন্ত্রী হয়েছিলেন বুঝেছেন? আর আপনি? সুরুতেই ভাবছেন কবে ছাত্রী পরীক্ষায় বসবে! আপনি ঐ প্রোফেসারী করবেন—তার বেশী আপনার দ্বারা কিছু হবে না—

অমিত। (হাসিয়া) তা জানি। এখন পড়াশোনা কিছু হবে কী?

রমলা। শেলী পড়বো। "One word is too often profaned"

অমিত। সুন্দর কবিতা। শেলীর বন্ধু মিসেস উইলিয়মস-এর উদ্দেশ্যে লেখা।

রমলা। (আবৃত্তি করে)

I cannot give what men call love
But wilt thou not accept
The wonship the heart lifts above
তারপর কী?

অমিত। And the heavens reject not

রমলা। (পুনরায় সুরু করে)

The desire of the moth for the star
of the night for the morrow

অমিত। ১৮২১ সালে লেখা। শেলী তখন ইটালীর 'পিসা' সহরে—

রমলা। ভালো লাগছে না। একটু বেড়াতে যাবেন?

অমিত। সে কী! এই বললে শেলী পড়বো?

রমলা। আজ থাক। চলুন একটু বেড়িয়ে আসি—

অমিত। কোথা?

রমলা। যেখানে হয়।...যাবেন?

প্রবেশ করে মানস। ব্যস্তভাব।

মানস। (অমিতকে) হ্যালো প্রোফেসর! ভালোত? ছাত্রী কেমন পড়ছে?...রমলা, এখানে একটা ফাইল ছিল, কোথা গেল বলত?

রমলা। জানি না।

মানস। সেটা বড্ড দরকার, কিন্তু পাচ্ছি নাত।

(খুঁজিতে থাকে)

রমলা। যা দরকার, যাকে দরকার, সময়ে কিছুতেই পাওয়া যায় না।

মানস। (খুঁজিতে খুঁজিতে) ঠিক বলেছ! অফিসেও এই একই ব্যাপার। দরকারের সময় কাউকে পাবার-যো নেই।

রমলা। তোমাকে আমার এখন দরকার। পাবো-কী? বসবে একটু—

মানস। রমলা আমার যে এখনি বেরুতে হচ্চে—একটা খুব important meeting।

রমলা। আমার ভীষণ মাথার যন্ত্রণা হচ্চে। আমায় নিয়ে একটু বেড়াতে যাবে।

মানস। বল্লুম ত' রমলা আমার একটা জরুরী মিটিং রয়েছে। তুমি অমিতবাবুর সঙ্গে বেড়িয়ে এসো না। Professor why don't you take her out for a drive? আমি Imperial-এ পৌছেই গাড়ীটা পাঠিয়ে দিচ্চি কেমন? please don't mind…আর একদিন নিয়ে যাবো—

(মানস দ্রুত বাহির হইয়া যায়)

রমলা। (অমিতকে) কী ভাবছেন?

অমিত। নাঃ। ভাবার আর কী আছে?

রমলা। কিন্তু করার? করার কী কিছুই নেই?

অমিত। আমি কী করতে পারি?

রমলা। কী করতে পারেন সে কথা ত আমার স্বামীই আপনাকে বলে গেলেন—rather, অনুরোধ জানিয়ে গেলেন—

অমিত। কিন্তু তা ত আমার পক্ষে সম্ভব নয় রমলা—

রমলা। কেন?

অমিত। আমি তোমার প্রোফেসর।

রমলা। প্রোফেসর যদি ছাত্রীকে বেড়াতে নিয়ে যায় তাহলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়?

অমিত। তা জানি না। তবে সব লোকের মন শুদ্ধ নয়, এটা জানি।

রমলা। আপনি মিথ্যে সন্দেহের ভয় করেন?

অমিত। করি।

রমলা। আপনি ভীরু।

অমিত। আমার ভীরুতা যদি আমার অন্যায় থেকে রক্ষা করতে পারে সে ভীরুতা স্বীকার করায় আমার লজ্জা নেই।

রমলা। ছাত্রীকে নিয়ে যদি শিক্ষক বেড়াতে যায় তাতে অন্যায়টা কী হোলো?

অমিত। রমলা, আমি মনে করি যে শিক্ষকের আচরণ শুধু সৎ হলেই হবে না, লোকে তার আচরণ সম্বন্ধে যাতে মিথ্যে সন্দেহও না করতে পারে শিক্ষককে সেই ভাবে চলতে হবে। আজ হয়ত তোমার মনটা চঞ্চল আছে। পরে স্থিরভাবে আমার কথাটা ভেবে দেখো রমলা। আজ আমি যাই—

(যাইতে যাইতে ফিরিয়া)

হ্যাঁ যাবার আগে তোমায় একটা কথা বলে যাই-রমলা—

রমলা। দরকার নেই।

অমিত। তুমি তা মনে করতে পারো। কিন্তু বলাটা আমার কর্তব্য। রমলা, এর পর তোমায় আমি পড়াতে আসি বা না আসি, তোমার মনের এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে নিজেকে কোনো একটা কাজে ডুবিয়ে দিও। আর বইপড়াই বোধ হয় সব চেয়ে সহজ আর ভালো কাজ—

(অমিত চলিয়া যায়। রমলার প্রায় ক্ষিপ্ত অবস্থা)

রমলা। (সামনের বইগুলি সজোরে ফেলিয়া দিয়া) উপদেশ! উপদেশ! আর উপদেশ!

(প্রবেশ করে বিকাশ। একখানি ছেঁড়া বই তাহার গায়ে লাগে।

বিকাশ। (বইখানি তুলিয়া রাখিতে রাখিতে) এ কী মা? এমন করে রেগে বই ছুঁড়ছো কেন? অমিতকে দেখলুম। তার মুখখানাও যেন ভার ভার মনে হোলো, কী হয়েছে? অমিতের সঙ্গে বুঝি ঝগড়া হয়েছে? মানস কোথা?

রমলা। (অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে) বিকাশ কাকা, বলতে পারেন আমি কী করবো?

বিকাশ। কেন মা? অমিত কী তোমায় কিছু বলেছে?

রমলা। বিকাশ কাকা, আমি আর সহ্য করতে পারছি না। আমি যেতে চাই এ বাড়ীর বাইরে যেখানে

আলো আছে, আকাশ আছে, প্রাণ আছে, আনন্দ আছে—

বিকাশ। মানসকে বুঝি একেবারেই কাছে পাচ্ছ না? কী করে পাবে? তার সময় কোথা? তোমার বাবার আমলে আমি অনেক কাজ করে দিতুম। মিথ্যে কথা বলবো না, তাতে আমার দু'পয়সা রোজগা'র হোতো। তেমনি তোমার বাবা তোমার মা'র সঙ্গে বসে দুদণ্ড কথা বলার সময় পেতো। এখন মানস একলা কতদিক সামলাবে বল? আজত' ওদের Imperial-এ বড় মিটিং। সব জায়গা থেকে বড় বড় business-magnentsরা আসবে Eastern zone-এ call-girls selection করতে—

রমলা। call-girls?

বিকাশ। (হাসিয়া) হ্যাঁ। ভীষণ demand! সুন্দরী, যুবতী, আর স্মার্ট এই সব মেয়েরা ··

রমলা। (শেষ করিতে না দিয়া) আজ Imperial-এ আসবে?

বিকাশ। হ্যাঁ। খাওয়া-দাওয়া, নাচ গান আমোদ আহ্লাদ হবে—আর তারই ফাঁকে ফাঁকে একএকজন business tycoon তাঁর ফার্মের জন্য মেয়ে বেছে নিয়ে মোটা মাইনে কমিশন দিয়ে emply করবেন। এ সবই হচ্ছে big business এর অঙ্গ। মানসকেও ত ফ্যাসানমাফিক চলতে হবে। আর তোমার বাবা মানসকে বলে দিয়েছেন যে সে যেন সবচেয়ে attrative মেয়ে পছন্দ করে, তাতে যা টাকা লাগে A, k, G, Enterprise দেবে। তোমার বাবার অবশ্য টাকার অভাব নেই। কিন্তু আমি ভাবছি মানসের কথা—

রমলা। কী ভাবছেন?

বিকাশ। ভাবছি এই সব মেয়েরা ত একটু বেশী forward হয়—আর মানস বেচারী ছেলেমানুষ—

রমলা। বিকাশ কাকা, আমি কী করবো বলতে পারেন?

বিকাশ। তোমায় ত' বাঁচতে হবে মা!—তাই ভুলে থাকতে হবে—

রমলা। কেমন করে ভুলবো?

বিকাশ। কেন? ভুলে থাকার ত' কত উপায় আছে। ···দিনরাত বাড়ীতে বসে না থাকে একটু মাঝে মাঝে ক্লাবে-ট্লাবে গেলে ত পারো। এইত five hunred club খুব fashionable আর respectable, কত বড় বড় ঘরের মেয়েরা সেখানে যায়...যাবে সেখানে! বন্দোবস্ত করে দেব? যাবে আজ রাত্রে···five hundred club-এ যাবে?

রমলা। (ভাবিতেছিল হঠাৎ বলিল) যাবো।

বিকাশ। আজই?

রমলা। হ্যাঁ আজই।

(বিকাশ সঙ্গে সঙ্গে গিয়া টেলিফোনে ডায়াল করে)

বিকাশ। হ্যালো!···500 club

—পঞ্চম দৃশ্য—

[অশ্বিনীর বাড়ীর অফিস ঘর। অপরাহ্ণ বেলা আন্দাজ ৪টা। মানস কর্মব্যস্ত। তাহার টেবিলের পাশে তিনজন ভদ্রলোক একজন সাহেবী পোষাক, একজন পাঞ্জাবী, একজন গুজরাটী বসিয়া আছেন। আর একটী টেবিলে মানসের P, A, রমেশ পাঠক কাজ করিতেছে। মাঝে মাঝে টেলিফোন আসিতেছে, রমেশ জবাব দিতেছে।]

মানস। রমেশ!

রমেশ। ইয়েস স্যর!

মানস। ইন্দ্রানী ভার্গব আজ নাইট প্লেনে দিল্লী-যাবে। ওর রিজারভেশন হয়ে গেছে?

রমেশ। ইয়েস স্যর!

মানস। ইন্দ্রানীকে বলে দিও যেন দিল্লী থেকে ফিরেই আমায় রিপোর্ট করে।

রমেশ। ইয়েস স্যর!

(টেলিফোন বাজে। রমেশ ধরে)

হ্যালো! C, B, I···মিঃ ভট্চায? আছেন···স্যর

(মানসকে টেলিফোন দেয়)

মানস। Speaking—হ্যাঁ হ্যাঁ সব কথাত সেদিন আপনাদের বলে এসেছি! further information? কে দিয়েছে? আমাদেরই লোক? নাম বলবেন না? বুঝেছি!—আচ্ছা, আপনাকে কোথায় 'মিট' করবো? New Olympic? কাল রাত ন'টায়!—নমস্কার! (রিসিভার রাখিয়া) রমেশ!

রমেশ। ইয়েস স্যার!—আমি নোট করেছি-কাল New olympic—9 P,M,

মানস। very good! হ্যাঁ। দেখ, বিকাশ মিত্তির বলে যে ভদ্রলোকটী প্রায়ই আসেন তাঁর সম্বন্ধে একটু সতর্ক থেকো—

রমেশ। I understand, sir

(মানসকে কতকগুলি কাগজপত্র সই করিতে দেয়)

কালকের মিটিং-এর agenda।

(মানস সই করিতে থাকে)

মানস। ইনকম ট্যাক্স-এর কতদূর কী হোলো?

রমেশ। আমাদের lawyer অফিসারের সঙ্গে দেখা করেছেন। এই চেকটা সই করতে হবে—

(রমেশের দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া সই করে)

রমেশ। (একখানি কাগজ দেখাইয়া) হলদিবাড়ী টী গার্ডেনস এর strike notice…বারো দফা দাবী দিয়েছে …না মেনে নিলে পয়লা থেকে ষ্ট্রাইক—

মানস। ওদের union এর প্রেসিডেন্ট কে?

রমেশ। C, R, Bose

মানস। তাকে বলে পাঠিও আমার সঙ্গে যেন শনিবার রাত ১০টায় Maidens-এ দেখা করে

রমেশ। yes sir! আমি নিজেই যাবো

মানস। very good! আর মিস লুসী ইরাণীকে বোলো যেন বারো নম্বর টেবিলে present থাকে (ঈষৎ হাসিয়া) very confedential…

রমেশ। I know sir…

(রমেশ আর কয়েকটী ফাইল মানসের সামনে ধরে)

মানস। (ক্লান্তভাবে) আজ আর নয়। I'm tired

(কলম রাখিয়া চেয়ারে হেলান দিয়া বসে)

রমেশ। (অশ্বিনীকে আসিতে দেখিয়া) মিঃ ঘোষ স্যর

(প্রবেশ করে অশ্বিনী। মানসের শেষ কথা শুনিয়াছে)

অশ্বিনী। (মানসকে) Tired! so soon! মানস সামনে তোমার অনেক কাজ—

(বলিতে বলিতে রমেশের সম্মুখে গিয়া দাঁড়ায় রমেশ সোজা হইয়া দাঁড়ায়—attention এর ভঙ্গীতে। অশ্বিনী তাহার smartness ইত্যাদি লক্ষ্য করে—সামান্য ত্রুটী সংশোধন করিয়া দেয়—টাই ঠিক করিয়া দিল, রুমালটী যথাস্থানে রাখিয়া দিল ইত্যাদি। তাহারপর (মানসকে) your newly-appointed P, A

মানস। হ্যাঁ রমেশ পাঠক

অশ্বিনী। (রমেশকে) fine young man!

রমেশ। thank you, sir

অশ্বিনী। Mr, pathak, you may now go

রমেশ। Thank you sir

(রমেশ কাগজপত্র গুছাইয়া রাখিয়া চলিয়া যায়)

অশ্বিনী। যা বলছিলাম মানস, you can't afford to be tired

(টেলিফোন বাজে। অশ্বিনী ধরে)

হ্যালো! কে? রীটা স্যাক্সেনা? …আমি মিঃ ঘোষ …কী খবর? মিঃ চতুর্বেদী কাল আসছেন?…ঠিক আছে মিঃ ভট্চায কাল সাড়ে চারটায় ওঁকে এয়ার পোর্টে রিসিভ করবেন। আমি বলে দেব—(রিসিভার রাখিয়া) রীটা স্যাক্সেনা কে?

মানস। সেদিন Imperial-এ এই মেয়েটীকেই আমি Select করেছি।

অশ্বিনী। is she prelty?

মানস। Very—চতুর্বেদী নতুন controller হয়ে আসছে। শুনেছি খুব কড়া লোক।

অশ্বিনী। (ঈষৎ হাসিয়া) কড়া?—"put money in lower purse" my boy—কথাটা কার জানো! বড় দামী কথা! মনে রেখো—

মানস। টাকায় সব হয়?

অশ্বিনী। হয়। কনট্রোলার কত মাইনে পায়? দুহাজার। আড়াই-হাজার! তিনহাজার! তুমি কত দিতে পারো? দশ, বিশ, পঁচিশ হাজার!

মানস। টাকায় যদি সব তাহলে S, D, M, Co, পীতমসিং এণ্ড সন্স, শ্রীবাস্তব ইনডাসট্রিস সার্চ্চ হয় কেন? আর আমাকেই বা C, B, I, হেডকোয়ার্টার্সে তলব করে জেরা করা হয় কেন?

অশ্বিনী। কারণটা ঐসব কোম্পানীর টাকার অভাব বলে নয়। টাকাটা ঠিক মত ব্যবহার করা হয়নি বলে। আর এ কথাও মনে রেখো যে তোমাকে ডেকে শুধু কয়েকটা প্রশ্ন করা হয়েছিল, তার বেশী কিছু নয় আর সেটা তোমার টাকার জোর আছে তাই। শোনো মানস যা ঘটেছে তা থেকে শেখার চেষ্টা কর—

মানস। কী শিখতে হবে ?

অশ্বিনী। শিখতে হবে এই যে উঁচু মহলে শত্রু সৃষ্টি করবে না, নীচু মহলকেও খুশী রাখবে। অফিসারদের যথাযোগ্য সম্মান দেবে, সে যদি ৫০০ টাকার অফিসার হয় তাহলেও। জেনো সেই তোমার মনিব, যদিও তুমি তাকে কিনে রাখতে পারো। মনে রেখো টাকার দরকার সকলেরই। অন্যে যদি দেখে যে সব টাকাই তোমার পকেটে যাচ্ছে তাহলে তারা তোমার ক্ষতি করতে পারে—

মানস। তার কারণ এই নয় কী যে আমাদের নিজেদের ভেতর গলদ আছে ?

অশ্বিনী। (ধমক দিয়া) মানস !

মানস। I am sorry।

অশ্বিনী। চা-বাগানের কুলীরা Strike notice দিয়েছে। তাদের দাবী আধাআধি মেনে নেবে। তাতে যদি আমাদের খরচ মাসে ২৫০০০ বেড়ে যায় তাতে কিছু যায় আসে না। এজেন্টদের Secret instruction দিয়ে বাজারে মাল Shortge করিয়ে দেবে। And then let the usal economic law operate—

মানস। আজ্ঞে হ্যাঁ।

অশ্বিনী। foreign bank-এ টাকা transferএর কথাবার্তা সব পাকা হয়ে গেছে ?

মানস। না। লোক্যাল ম্যানেজার বড় বেশী চাইছে।

অশ্বিনী। কত ?

মানস। বিশ হাজার।

অশ্বিনী। কিছু বেশী চায় নি। তাকেত পাঁচজনকে দিয়ে যেতে হবে।

মানস। কিন্তু এ রকম করে কতদিন চলবে ?

অশ্বিনী। (সবিস্ময়ে) তার মানে ?

মানস। আমি কী বলতে চাইছি তা আপনি নিশ্চয় বুঝেছেন—

অশ্বিনী। বুঝেছি বলেই অবাক হচ্চি।

মানস। অবাক আমি নিজেও কম হচ্চি না। গত কয়েক মাসের মধ্যে আমায় এমন কয়েকটা কাজ করতে হয়েছে যা আগে কোনোদিন কল্পনাও করি নি। তাই ক'দিন থেকেই ভাবছি—

অশ্বিনী। কী ভাবছ ?

মানস। ভাবছি এ ছাড়া কী পথ নেই ? সৎপথে, সোজা রাস্তায় বিজনেস হয় না ?

অশ্বিনী। (অবিশ্বাসের হাসি)• মানস আজ তুমি সত্যিই ক্লান্ত। অথচ সামনে তোমার অনেক কাজ।

মানস। কিন্তু আমার আর এ সব ভালো লাগছে না।

অশ্বিনী। এখন আর এ কথা বলা চলে না, মানস। আমাদের মত ব্যবসা করা আর বাঘের পিঠে চড়া-একই কথা। একবার চড়লে আর নাবার উপায় নেই। আমার হাতে গড়া বড় বড় প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব তোমার ওপর দিয়েছি। সে দায়িত্ব তোমায় পালন করতেই হবে—

মানস। তাই করতে গিয়ে আমি কিন্তু আপনার মেয়েকে অসুখী করেছি—

অশ্বিনী। কে বলেছে তোমায় যে রমলা অসুখী ?

মানস। আমি নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছি। রমলা দিনরাত বাইরে বাইরে থাকে। ক্লাব, ড্যান্স, ডিনার, পার্টি এ সব নিয়েই সে মত্ত।

অশ্বিনী। এই জন্যে তুমি ভাবছ রমলা অসুখী ! তোমার ধারণা ভুল। তুমি জানো না মানস যে আধুনিক কালের বড় ঘরের মেয়েরা এ সবের মধ্যেই আনন্দ পায় আর এতেই তাদের আনন্দ পেতে হবে—

মানস। (সবিস্ম[illegible]) তার মানে ?

অশ্বিনী। তা না হলে, স্ত্রীদের এ রকম diversion না থাকলে স্বামীরা কাজ করবে কখন ? তাদের ত সব সময়ই নষ্ট হবে স্ত্রীদের শাড়ী গয়নার দোকান, আর সিনেমায় নিয়ে যেতে যেতে ? ব্যবসা করবে কখন ?

মানস। আমি আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছিনা।

অশ্বিনী। ক্রমশ পারবে। পণ্ডিত বংশের রক্তটা এখনও মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করে ওঠে ত। সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে। রমলার জন্যে তুমি ভেবো না—

মানস। রমলার জন্যেইত আমার সবচেয়ে বেশী ভাবনা। কিছুদিন থেকে ওর শরীরও—

(টেলিফোন বাজে)

মানস। (টেলিফোনে) ! speaking···Dr, Mrs Bose ? নমস্কার ! খবর আছে। বলুন···congratulations হঠাৎ ? রমলা আপনার চেম্বারে গিয়েছিল ?···কী

বল্লেন? রমলা মা হতে যাচ্ছে? Romola going to be a mother?

ইতিমধ্যে রমলা দরজার নিকট আসিয়া দাঁড়িয়াছে বাহিরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। টেলিফোনের শেষ কথাগুলি সে শুনিয়াছে। অশ্বিনী কন্যার সংবাদ শোনামাত্র মানসের পশ্চাতে গিয়া দাঁড়ায়—মানস তখনও টেলিফোন ধরিয়া।

সে আনন্দে অভিভূত। তাড়াতাড়ি টেলিফোন শেষ করে Thank you doctor.

মানস রমলাকে দেখিয়া আনন্দোচ্ছ্বল কণ্ঠে ডাকে—

মানস। রমলা!

(রমলা কোনো রূপ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে না। অশ্বিনী খুসীমনে রমলার দিকে অগ্রসর হইয়া বলে)

অশ্বিনী। (রমলার মাথায় হাত দিয়া) God blessgon my child (রমলা নীরবে মাথা নীচু করে, অশ্বিনী ভিতরে যায়)

(ইতিমধ্যে রমলা সাময়িক আবেগটুকু সামলাইয়া লইয়াছে)

মানস। রমলা!

রমলা। (নিরুত্তাপ ভাবে) কী বলছো?

মানস। কী বলবো তাই ভাবছি। অনেক কিছু বলতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু কথা খুঁজে পাচ্ছি না। (রমলার মুখের দিকে চাহিয়া হঠাৎ বলে) রমলা, তোমায় ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে! রমলা তুমি কী সুন্দর!

রমলা। (অবিচলিতভাবে) আমায় কী আজ তুমি প্রথম দেখলে?

মানস। না। কিন্তু আজ যেন তোমায় নতুন করে দেখছি?

রমলা। কেন?

মানস। রমলা, আজ আমার কাছে তোমার এক নতুন পরিচয়! রমলা·· রমল-এতবড় আনন্দের খবর তুমি আমায় বলো নি, রমলা!

রমলা। তোমার শোনার সময় কোথা? তোমার ত অনেক কাজ—

মানস। কাজ···কাজ···আর কাজ! এ আর ভালো লাগছে না, রমলা।···আজ আর কোনো কাজ নয়। আজ শুধু তুমি আর আমি!···চলো কোথাও বেড়াতে যাই···অনেক দূরে, যাবে রমলা?

(রমলা উত্তর দেয় না)

রমলা, চুপ করে আছ কেন?···তুমি কী আমার ওপর রাগ করেছ? যদি করে থাকো, কিছু অন্যায় করো নি—

(রমলা তথাপি সাড়া দেয় না)

রমলা—

রমলা। আমায় এখন বেরুতে হবে।

মানস। কোথায় যাবে?

রমলা। একটা পার্টি আছে

মানস। আজ না হয় পার্টিতে না-ই বা গেলে! রমলা, আজ তোমায় আমার কাছে পেতে ভারী ইচ্ছে করছে—

রমলা। আমারও একদিন ইচ্ছে করেছিল। সেদিন তুমি—

মানস। কী করবো রমলা, কাজের চাপে···

রমলা। (শেষ করিতে না দিয়া) সেদিন তোমার কাজ ছিল—আজ আমার আজ—

(রমলা চলিয়া যায়)

মানস। রমলা!

(রমলা ততক্ষণে বাহির হইয়া গিয়াছে)

তৃতীয় অঙ্ক

—১ম দৃশ্য—

[শশাঙ্কশেখরের বাড়ীর ঘর। সময় সন্ধ্যা। অসুস্থ উমা বসিয়া আছে। মীরা তাহাকে কীর্ত্তন গান শুনাইতেছে।]

(মীরার কীর্ত্তন গান)

হামা দে পালায় পাছু ফিরে চায় রাণী পাছে তোলে কোলে
রাণী কুতূহলে ধর ধর বলে হামা টেনে তত গোপাল চলে

(প্রবেশ করে দেবেশ)

উমা। (অশ্রুসজল নয়ন) বড় চমৎকার গান।

মীরা। আর আমার গাইতেও খুব ভালো লাগে, কাকীমা—

উমা। মীরা! মীরা!…আমার আছে আর না মা আমি যে আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না!

(মীরা উমার কাছে যায়)

মীরা। কাকীমা কী হয়েছে?

উমা। মীরা চোখে যে টুকু আলো ছিল তা-ও কী আজ নিভে গেল? আমি কী অন্ধ হয়ে গেলুম?

মীরা। (চোখের জল মুছাইতে মুছাইতে) না কাকীমা তা কেন? গান শুনতে শুনতে আপনার চোখে জল এসেছে কিনা তাই! এবার দেখুন ত'…আপনার সামনে কে বলুন ত—

উমা। কে কে আমার সামনে! (হাত বাড়ায়)

মীরা। কাকীমা আমি দেবেশ—

উমা। কখন এলে বাবা? গানটা শুনেছ? বড় সুন্দর গান! বলে রাণী কুতূহলে ধর ধর "হামা টেনে তত গোপাল চলে"—গোপাল মা'কে ধরা দেবে না। মা যতই ধর ধর বলে ছুটছে গোপাল ততই হামা টেনে পালাচ্ছে

দেবেশ। কাকীমা, গোপালদের স্বভাবই ঐ—পালিয়ে বেড়ায়, আবার ধরাও দেয়—

উমা। আচ্ছা দেবেশ মানসের মনি-অর্ডার ফেরৎ দিয়েছি কতদিন হোলো?

দেবেশ। তিন বছর হয়ে গেল

উমা। এই তিন বছরের মধ্যে আমাদের কোন খোঁজ করে নি। কেনই বা করবে? দু'দুবার অপমান হোলো। তারও ত' একটা গোঁ আছে। সে ত' এই বংশেরই ছেলে—

দেবেশ। কাকীমা, মানসের সঙ্গে আজ আমার দেখা হয়েছে।

উমা। (সাগ্রহে) মানসের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে? কেমন আছে সে?

দেবেশ। মানস, ভালোই আছে কাকীমা। মানসের ছেলে হয়েছে।

উমা। (আনন্দচঞ্চল) মানসের ছেলে? আমার মানসের ছেলে? আমার সেই মানস—তার ছেলে?

(প্রবেশ করেন শশাঙ্কশেখর—অত্যন্ত উত্তেজিত)

শশাঙ্ক। (আপনমনে গজরাইতেছে) এই সব ছেলে! যত সব মূর্খ, অপোগণ্ডের দল—

দেবেশ। কী হয়েছে কাকাবাবু?

শশাঙ্ক। আমার খুব শিক্ষা হয়েছে! জানো দেবেশ, আজ ক্লাস টেন-এর ছেলেগুলো আমায় এতক্ষণ ঘরে আটকে রেখেছিল!

দেবেশ। কেন?

শশাঙ্ক। তাদের দাবী মানতে হবে—সবাইকে ক্লাস ইলেভেন-এ প্রমোশন দিতে হবে—পরীক্ষায় পাশ করে থাকুক আর না-ই থাকুক!

মীরা। পাশ না করলেও প্রমোশন দিতে হবে?

শশাঙ্ক। না দিলে কাল থেকে অনশন ধর্ম্মঘট।—এই সব ছেলে! এরাই একদিন দেশের মাথা হবে! কিচ্ছু হবে না, কিচ্ছু হবে না—এ দেশের কিচ্ছু হবে না! সাধে কী আর দেশটা চোর-জোচ্চর-বদমায়েসে ভরে গেল? শিক্ষার অভাব—সৎ শিক্ষার অভাব! মানুষ তৈরী হচ্ছে না, দেবেশ—শিক্ষার নামে কতকগুলো ইমারৎ তৈরী হচ্চে আর 'শিক্ষা গেল' 'শিক্ষা গেল' বলে বক্তৃতা হচ্ছে!

মীরা। কাকাবাবু, আপনি সারাদিন পর এলেন—হাতমুখ ধুয়ে ঠাণ্ডা হয়ে বসুন—

শশাঙ্ক। (সে কথা না শুনিয়া) কী করে যেন খবর পেয়েছে যে কোনোকোনো মাষ্টারমশাইয়ের না কি আপত্তি নেই, হেডমাষ্টারটাই যত নষ্টের মূল! তাই হেডমাষ্টার ঘেরাও!

উমা। অন্য মাষ্টার মশাইদের যদি আপত্তি না থাকে তোমারই বা এত গোঁ কেন?

শশাঙ্ক। ঐখানেই ত হয়েছে আমার বিপদ! বিচার, বুদ্ধি, বিবেক—এদের যে এখনও বিসর্জ্জন দিতে পারি নি। দেবেশ, তোমরা যাকে বল 'tact' সেটা যে আমার নেই! আমি এ যুগে অচল—

উমা। সকলের সঙ্গে মানিয়ে চললেই ত' হয়—

শশাঙ্ক। ভাটপাড়ার কালিপদ ন্যায়রত্নের বংশ! অন্যায়ের সঙ্গে রফা করা শিখি নি। তাই সকলের সঙ্গে আমার মিলবে না। আমি চাকরী ছেড়ে দিয়ে এসেছি

দেবেশ। এ আপনি কী করলেন, কাকাবাবু? চাকরী ছেড়ে দিলেন?

পরও আমি হেডমাষ্টারী করবো? আমার পক্ষে তা করা সম্ভব? আজ আমি ওদের অন্যায় দাবী মেনে নিয়ে অপদার্থ, অযোগ্য ছেলেগুলোকে ভয়ে প্রমোশন দেব, কাল সেই ছেলেগুলো, যারা আজ আমার মুখের সামনে ঘুসী পাকিয়ে চীৎকার করেছে—"Down with the Headmaster" তারা হাসতে হাসতে আমার ক্লাসে এসে যখন বসবে আমি তাদের কল্যাণ চিন্তা করে, যত্ন নিয়ে তাদের পড়াতে পারবো?

দেবেশ। কিন্তু কাকাবাবু, সবাইত' তাই করছে—

শশাঙ্ক। দেবেশ, সবাই যা করছে তা যদি পারতুম তাহলে এই ছেঁড়া জামা আর ময়লা ধুতি পরে এই ভাঙা ঘরে বাস করতুম না। পারলুম না. দেবেশ, পারলুম না। যদিপারতুম তাহলে, A.K,G Enterprise এর বড় সাহেব অন্ততঃ বিশ লক্ষ টাকা লাভের অংশ যার ঘরে ওঠে বলে সবাই বলে, তিনহাজার লোক যার অফিসে কাজ করে—সেই আমার নিজের ছেলেকে আমি পর করে দিতুম না—

উমা। দিয়ে যে খুব ভালো করেছ তা নয়। নিজের অহঙ্কারে তুমি অন্ধ। তা না হলে মানস কী এমন করেছে যার জন্যে তুমি তাকে পর করে দিয়েছ?

শশাঙ্ক। শোন মা মীরা, শোন! তোর কাকীমা বলছে মানস কী করেছে? ভুলে গেছে—সব ভুলে গেছে! কিংবা তোর মুখখানা তোর কাকীমা ভালো করে দেখতে পায় না—তাই—তাই অমন কথা বলছে—

মীরা। কাকাবাবু!

শশাঙ্ক। দুঃখ করিস নি মা, দেবেশ তোর ভার নেবে। পরেশকে আমি কথা দিয়েছিলুম—আমি ভুলি নি মা, আমি ভুলি নি। দেবেশ তোর ভার নেবে—দেবেশও আমার ছেলে—, ছাত্র আর ছেলে কি আলাদা?

দেবেশ। কাকাবাবু, আপনি কিন্তু মানসের ওপর অবিচার করেছেন—

শশাঙ্ক। (সবিস্ময়ে) তোমারও এ কথা মনে হয়, দেবেশ?

দেবেশ। হ্যাঁ

শশাঙ্ক। বাঃ! তোমার কাকীমা রোজ অন্ততঃ একবার

দেবেশ। কাকাবাবু, আমার মনে হয় মানস এমন কিছু করেনি যার জন্যে তার এই শাস্তি—

শশাঙ্ক। শাস্তি! এ তে মানসের কী শাস্তি হোলো! সেত' টাকার পাহাড়ের ওপর বসে আছে। যে টাকা আজ মানুষের একমাত্র দেবতা, সেই টাকা তার অজস্র। সে বড়লোকের মেয়ে বিয়ে করেছে, বড়লোক শ্বশুরের আদরের জামাই হয়ে পরম আনন্দে বাস করছে! লোকজন, বাড়ী, গাড়ী, সুখের সমস্ত উপকরণ তার হাতের মুঠোর মধ্যে! মানসত সুখেই আছে! শাস্তি যদি হয়ে থাকেত হয়েছে আমার, ছেলেকে পর করে দিয়ে মনের দুঃখ মনে চেপে দিন কাটাচ্চি। আর তোমার ঐ কাকীমা! ছেলের জন্যে দিন রাত কেঁদে কেঁদে চোখদুটোকে প্রায় অন্ধ করে ফেলেছে—

উমা। কিন্তু তাতেওত তোমার মন গলে নি।

শশাঙ্ক। উমা, আমি মানসের সব অন্যায় ক্ষমা করতে পারতুম। মানস আমার কথা না শুনে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে—সে ব্রাহ্মণ সন্তান হয়ে অব্রাহ্মণ বিবাহ করেছে—আর তা-ই করে সে আমাকে মিথ্যেবাদী করেছে। মীরার সামনে আমি মাথাতুলে দাঁড়াতে পারি না—

(মীরা ভিতরে চলিয়া যায়)

ঐ দেখ, মেয়েটা মাথা নীচু করে চলে গেল! এ-ও আমি ভুলতে পারতুম। কিন্তু ঐ একটা জায়গায় এসে মনকে কিছুতেই রাজী করাতে পাচ্ছি না—সেটা হচ্ছে টাকা।

উমা। তোমার সবেতেই বাড়াবাড়ি! শ্বশুরের ব্যবসা দেখাশোনা করে মানস টাকা উপায় করছে। এতে অন্যায়টা কোথা?

শশাঙ্ক। উমা, অশ্বিনীর টাকা বড় অসৎ উপায়ে রোজগার করা টাকা। আর সেটাই আমার আর আমার ছেলের মধ্যে একটা আড়াল সৃষ্টি করছে। স্নেহ আমারও আছে, উমা, মানসকে আমিও ভালবাসি সে আমার একমাত্র সন্তান! আমি তাকে চাই (বুক দেখাইয়া) এইখানে…এইখানে তাকে জড়িয়ে ধরতে চাই কিন্তু মাঝ-খান থেকে বাধা দিচ্ছে ঐ কলঙ্কিত টাকা—

উমা। কিন্তু আমি আর কোনো কথা মানবো না।

শশাঙ্ক। (বিস্মিত) এতদিন বলনি, আজ বলবে ?র কারণ দেবেশ ?

দেবেশ। কাকাবাবু মানসের সঙ্গে আজ আমার খা হয়েছে। তার একটী ছেলে হয়েছে—

উমা। হ্যাঁ মানসের ছেলে—

শশাঙ্ক। মানসের ছেলে !

(পাশের ঘর হইতে দ্রুত প্রবেশ করে মীরা)

মীরা। কাকাবাবু রেডিওতে খবর দিলে যে অশ্বিনী াব heart attack হয়ে আজ বিকেলে হঠাৎ মারা াছে—

শশাঙ্ক। অশ্বিনী মারা গেছে ! মানসের ছেলে ালো আর অশ্বিনী চলে গেল ! জানো দেবেশ এই শ্বিনী একদিন আমার খুব প্রিয় বন্ধু ছিল। তারপর ামাদের বিচ্ছেদ ঘটলো আদর্শের বিরোধ নিয়ে। বছর পর অশ্বিনী আমার কাছে এসেছিল— ানসের বিয়ের পর। আমি তারে অপমান করে ফিরিয়ে য়েছিলুম। ঐ টাকাই আমাদের দুই বন্ধুর মধ্যে পাঁচিল লেছিল। ঐ কলঙ্কিত টাকা। দেবেশ, বলতে পারো ামি কী করি ? এ যুগের সঙ্গে আমার যে কিছুতেই ল হচ্ছে না—এই বেয়াড়ামনটা নিয়ে আমি কী করি বল ? দেবেশ আমি একটা misfit, আধুনিক যুগে আমি তীতের একটা কঙ্কাল। আমি এ যুগের একটা প্রকাণ্ড কৌতুক ! আমাকে তোমরা দূরে সরিয়ে দাও ! আর ানসকে বলো তার বে-ছেলে নিয়ে সে তার মা'র কাছে ফিরে আসুক !

—২য় দৃশ্য—

অশ্বিনীর বাড়ীর অফিস ঘর। সকাল ১১টা। মানস াজে ব্যস্ত। রমেশ পাঠক সাহায্য করিতেছে]

মানস। (লিখিতে লিখিতে) রমেশ ! estate uty কত assess করেছে ?

রমেশ। তুলক্ষ, বাবট্টি হাজার তিনশো পঞ্চাশ !

মানস। আমাদের lawyerকে কাগজ পত্র পঠিয়েছ ?

রমেশ। ইয়েস স্যর !

মানস। ওরিয়েন্ট টী আর বেঙ্গলষ্টীল-এর শেয়ারের াগজগুলো ?

মানস। ডিরেকটরস্ বোর্ডের মিটিং কবে ?

রমেশ। সোমবার এগারোটা—

(টেলিফোন বাজে। রমেশ ধরে)

(টেলিফোনে) হ্যালো ! সেন এণ্ড বাটলিবয়। অডিটার্স

মানস। বলে দাও, কাগজ পত্র যা পাঠানো হয়েছে তার ওপরই রিপোর্ট তৈরী করতে

রমেশ। (মানসকে) ইয়েস স্যর। হ্যালো ! যা কাগজ পত্র গেছে তার ওপর রিপোর্ট তৈরী করবেন···হ্যাঁ মিঃ ভট্টাচার্য্যি তাই বলেছেন, নমস্কার

(প্রবেশ করে বেয়ারা কার্ড হাতে। রমেশকে দেয়)

মিঃ রথীন ব্যানার্জ্জী ইনকামট্যাক্স অফিসার—

মানস। (খুসীভাব) রথীন এসে গেছে !

(নিজেই যায় তাহাকে ভিতরে আনিতে। বেয়ারাও যায়। অতি সমাদরে রথীনকে লইয়া প্রবেশ করে)

(রথীনের কাঁধে হাত দিয়া) কী ব্যাপার বল ত ? সেই যে দুই ফেল করা বন্ধুতে···

রমেশ, তুমি যেতে পারো—

রমেশ। thank yon sir !

(রমেশ চলিয়া যায়)

(রমেশ যাওয়ার পর)

ব্রজেনদার কফিকর্ণারে বসে চা খেলুম তারপর এত-দিনের মধ্যে দেখাই নেই ! অথচ, কোলকাতাতেই বরাবর আছিস ত ?

রথীন। না ভাই। আমাদের ত বদলীর চাকরী বাইরে বাইরে ঘুরতে হয়েছে। তিন বছরের বেশী এক জায়গায় রাখে না—

মানস। তবে তোদের চাকরীতে তিন বছরেই ভাগ্য ফিরিয়ে নেওয়া যায়—কী বলিস ?

রথীন। সবাই পারে না।

মানস। যারা একেবারে নীরেট তারাই শুধু পারে না। তুই ত সে দলে নয়।

(রথীন অস্বস্তি বোধ করে। জবাব দেয় না)

ভালোই আছিস তা হলে। নে সিগরেট খা 'চারমিনার' নয় রে !

রথীন। শুধু সিগারেট কেন? সবই ত পাল্‌টেছিস দেখছি—

মানস।—(হাসিতে হাসিতে) তাই মনে হচ্ছে? মনে আছে কফি কর্ণারে বসে তোকে বলেছিলুম যে পৃথিবীতে অনেক বড় কাজ আছে যা পরীক্ষায় পাশ না করেও করা যায়—?

রথীন। (সিগারেট ধরাইয়া) আছে। আর তুই তা প্রমাণ করেছিস।

মানস। (সহাস্যে) সে কথা এখন থাক।···কী খাবি বল?

রথীন। কিছু না।

মানস। তা কী হয়? কতদিন পরে দেখা—আর তুই আমার এখান থেকে না খেয়ে চলে যাবি?

(ডাকে) বেয়ারা—চা!

রথীন চায়ের সঙ্গে ফিস ফ্রাই তুই ত ভীষণ ভালবাসতিস—তাই না?

রথীন। (সহাস্যে) এখনও বাসি।

মানস। দেখ, আমার কী রকম মনে আছে। আর আমি সে বন্দোবস্তও করেছি। তুই বোধ হয় আমার কথা ভুলেই গেছিস—

রথীন। মোটেই নয়। পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হলেই তোর কথা হয়। সেদিন দেবেশের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। দেবেশ ডকটরেট পেয়েছে জানিস?

মানস। জানি। ও পড়াশোনা নিয়েই রইলো। আচ্ছা আমার কথা তোরা কী বলিস বলত? বলিস ত মানসটা শ্বশুরের পয়সায় নবাবী করছে?

রথীন। না না, তা কেন? বরং বলি যে বাহাদুর ছেলে এই মানস। যা করবো বলেছিল তা করে দেখিয়ে দিয়েছে—

মানস। কিন্তু তার জন্যে যে কী পরিশ্রম করতে হয়েছে আর কী মূল্য দিতে হয়েছে তা যদি জানতিস রথীন—

রথীন। জানি। এখন বল হঠাৎ ডেকেছিস কেন?

মানস। বলছি। আগে চা টা ।। এত তাড়াতাড়ি কেন?

রথীন। জানিস্ ত' আজকাল সদাচার পেছনে পেছনে ঘুরছে! আমি যে তোর বাড়ীতে এসেছি এটুকু জানাজানি হলেই চাকরী নিয়ে টানাটানি।

মানস। তুই থাম রথীন! আমার কাছে সাধু সাজার চেষ্টা করিস নি!

রথীন। না তোর কাছে সাধু সেজে লাভ কী?

মানস। (ইঙ্গিত বুঝিতে পারে না) তাই বল! তোর আগে যে অফিসার ছিল আমাদের কেসগুলো যে deal করতো ক বছরের ভেতর কোলকাতায় তিনখানা বাড়ী কিনেছে—কোনোটার দাম লাখটাকার কম নয়। এ খবর জানিস ত?

রথীন। না।

মানস। জানিস না! আশ্চর্য্য!

(বেয়ারা চা ইত্যাদি লইয়া—এবং সর্ব্বশেষে রমলা প্রবেশ করে)

Just see! রমলা নিজে তোর জন্যে চা নিয়ে আসছে

মানস। (পরিচয় করাইয়া দেয়) রমলা, আমার স্ত্রী রথীন ব্যানার্জী আমার বন্ধু এখন I,T,O (নমস্কার বিনিময়)

রমলা। (রথীনকে) আপনি বসুন।

মানস। জানো রমলা রথীন আর আমি একসঙ্গে এম, এ পরীক্ষায় ফেল করেছিলুম। তারপর আজ এই প্রথম দেখা!

রমলা। তাই বুঝি?···

মানস। তুই ত আমাদের বিয়েতেও আসিস নি—

রথীন। আমি সে সময় কোলকাতায় ছিলুম না।

রমলা। রথীনবাবু, ফ্রাইটা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

মানস। নে নে রথীন···খেতে আরম্ভ কর।

(রথীন খাইতে আরম্ভ করে)

মানস। জানো রমলা, রথীন এখন ইনকম-ট্যাক্স অফিসর আর luckely আমাদের matter সব রথীনের হাতে!···(রথীনকে) কী যে ঝামেলায় পড়েছি ভাই তা আর বলতে পারি না!

রথীন। ঝামেলা কিসের?

মানস। অন্য ঝামেলাত আছেই। তার ওপর তোমাদের নোটীশ! শ্বশুরমশাই থাকতে তিনিই সব দেখাশোনা করতেন। তিনি গত হওয়ার পর দেখলুম পাঁচ বছরের ইনকম ট্যাক্স বাকী! একসঙ্গে দিতে হবে

়র চল্লিশ লক্ষ ! ওদিকে death duty ধরেছে ছ খের ওপর। সেটা যাহোক একটা বন্দোবস্ত হয়ে ়ব। এখন ইনকমট্যাক্সের কী করি বল ?

রথীন। কী আর করবি ? পাওনাট্যাক্স দিয়ে দে

মানস। তুই কী রকম I, T, O, রে ? (হাসিয়া) ঝচি রমলা আছে বলে লজ্জা পাচ্ছিস ? না না রমলা রকম নয়। তোর কোনো ভয় নেই।

(মানস উঠিয়া ড্রয়ার হইতে নোটের তাড়া বাহির রিয়া দেখায়)

মানস। (নোটের তাড়া দেখাইয়া) দশহাজার ়ছে—

(রথীন কোনো জবাব দেয় না)

কী রে, কিছু বলছিস না যে ····না না, লজ্জা করার ়কার নেই—

রথীন। না না, লজ্জা করছি না। দেখছেন ত ়সেস ভট্টাচার্য্য, কী রকম খেয়ে যাচ্ছি—

রমলা। আর একটা ফ্রাই দিতে বলবো ?

রথীন। (হাসিয়া) মাফ করবেন, আর নয়—

(মানস এই অবসরে নোটের তারা রথীনের পকেটে গুঁজিয়া দেয়। রথীন কিছু বলে না)

কোনো রকমে শেষ করেছি।

আজ উঠি।

মানস। (খুসীভাবে) Thank you, Rathin ় you···

রথীন। (মানস শেষ করার আগেই) Thank you anas

নোটের তাড়া টেবিলের উপর রাখিয়া

মানস, ওটা তুলে রাখ—আজ চলি ! নমস্কার মিসেস ়চায

(রথীন চলিয়া যায়)

মানস। (ডাকে) রথীন ! রথীন !

(রথীন ততক্ষণে বাহির হইয়া গিয়াছে)

মানস। (নোটের তাড়া তুলিয়া) রথীন চলে গেল ! ়হাজার টাকা—আমার মুখের ওপর ফেলে দিয়ে ়ীন চলে গেল !

রমলা। পৃথিবীতে সবাই টাকাকে বড় করে দেখে না

মানস। দশহাজার টাকা A, K, G, Enterprcs এর কাছে কিছুই নয়, কিন্তু রথীনের কাছে অনেক টাকা।

রমলা। তোমাদের মত টাকা চিনতে সবাই এখনও শেখে নি।

মানস। রমলা আজ তোমার বাবা নেই বলে এ কথা তুমি বলতে পারলে

রমলা। বাবার সামনেও এ কথা অনেকবার বলেছি। টাকার চোরাবালির ওপর গড়ে ওঠা জীবন আমি কোনোদিন চাই নি।

মানস। কিন্তু টাকার যা কিছু সুবিধে সবই তুমি ভোগ করেছ, করছ এবং করবে—

রমলা। বাবার কথা অমান্য করার সাহস বা শক্তি আমার ছিল না—সে কথা লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করছি। আর নিজের সেই দুর্ব্বলতার জন্যেই আজ আমার জীবনের সমস্ত স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে—

মানস। কী তোমার স্বপ্ন ?

রমলা। (ম্লান হাসিয়া) সে কথা আজ তোমায় বলে কী হবে ? আমি চেয়েছিলাম অল্প আয়ের সংসার —অভাবের সংসার নয়, অধিক সম্পদেরও নয়। এমন একটি সংসার যেখানে সৎভাবে উপায় করা অর্থ মানুষের দাস হয়ে থাকবে মানুষকে তার দাস করবে না। আমি চেয়েছিলাম আমার জীবনে এমন একজনকে যে হবে সৎ, বিদ্বান, চরিত্রবান—

মানস। যার জীবনের এমনই স্বপ্ন সে fastionable societyতে দিনের পর দিন ড্যান্স ডিনার পার্টি আর নাইট ক্লাব করে বেড়িয়েছে কী করে তাত' বুঝতে পারি না।

রমলা। সে বোঝবার ক্ষমতা তোমার নেই। টাকার পেছনে ছুটতে গিয়ে মানুষের মন বলে যে একটা কিছু আছে তা তুমি ভুলেই গেছ। তবে এ কথাও আমি আজ স্বীকার করবো যে ভুল আমিও করেছি। নিজের জীবনের ব্যর্থতার দুঃখ ভোলার জন্য বিকাশ কাকার পরামর্শে যে উত্তেজনার পেছনে ছুটেছিলাম তাতে সুখ পাই নি।

মানস। রমলা তুমি বিকাশ কাকার পরামর্শে এই সর্ব্বনাশের পথ বেছে নিয়েছিলে ?

রমলা। এ পথ যে সর্বনাশের পথ তা বোঝবার মত মনের অবস্থা সেদিন আমার ছিল না। পরে বুঝেছিলাম। তাই এ জীবনটাকেই শেষ করে দেব বলে মনকে তৈরী করেছিলাম—

মানস। রমলা!

রমলা। হাঁা। বাবার ড্রয়ার থেকে স্লিপিং পিল সরিয়েও রেখেছিলাম কিন্তু যে রাত্রে তা ব্যবহার করবো বলে ঠিক করেছিলাম সেই রাত্রে—

মানস। কী? সে রাত্রে কী?

রমলা। ঘুমের বড়ি খাবার আগে হঠাৎ আমার মনে হলো আমার মাঝে কে যেন ঘুমিয়ে আছে! কে যেন আমায় তার ছোট্ট দুটী হাত দিয়ে ডাকছে! কার যেন মুখের হাসি আমায় সব দুঃখ ভুলিয়ে দিচ্ছে। আমার মনে হোলো আমার কোলে আমার খোকন আসছে! আমার আর মর হলো না—

মানস। রমলা এ তুমি কী বলছ?

রমলা। মানস, খোকন আমার কোলে আসার পর আমি আমার জীবনের অর্থ খুঁজে পেয়েছে। আমার স্বপ্নকে আমার খোকনের মধ্যে সার্থক করবো—এই আমার সঙ্কল্প। খোকনকে আমি মানুষ করবো।

মানস। আমিও ত তাই চাই রমলা

রমলা। হয় ত চাও। কিন্তু সত্যকারের মানুষ কাকে বলে তা তুমি জানো না। তাই তোমার ছেলেকে তুমি মানুষ করতে পারবে না।

মানস। রমলা তুমি কী বলছ আমি বুঝতে পারছি না

রমলা। আমি বলছি আমার খোকনকে আমি তোমার কাছ থেকে দূরে রাখতে চাই—

মানস। তার মানে?…খোকন আমার কাছে থাকবে না?

রমলা। না।

মানস। তাহলে সে কোথায় থাকবে?

রমলা। যেখানেই থাক—তোমার কাছ থেকে দূরে

মানস। আমার ছেলেকে আমি আমার কাছে পাবো না! আমার খোকন—

রমলা। তার ভালোর জন্যেই আমায় এ কাজ করতে হবে। খোকনকে আমায় মানুষ করতেই হবে। মানস এ বাড়ীতে আজ আমার শেষদিন। কাল আমি খোকনকে নিয়ে চলে যাবো—

মানস। রমলা, এ হতে পারে না। এ আমি হতে দেব না। খোকন আমার ছেলে। তাকে তুমি আমার কাছ থেকে জোর করে নিয়ে যেতে পারো না।

রমলা। যেতে হবেই। আর ক'মাস পরেই খোকন চারবছরে পড়বে। আস্তে আস্তে তার জ্ঞান হতে সুরু হয়েছে। আর দেরী করা উচিত নয়।

মানস। রমলা, তুমি আমার কথাটা ভেবে দেখ—

রমলা। আমি সব কথা ভালো করে ভেবেছি। মানস, তুমি ছেলেকে 'মানুষ' করতে পারবে না। তুমি যে পথে চলেছ সে পথের শেষ অবধি তোমায় যেতে হবে—

মানস। (ভাবিয়া) রমলা, বোধ হয় তোমার কথাই সত্যি। কাঁটাবনের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছি—ফেরা অসম্ভব। তোমার বাবার হাতে গড়া জিনিষ যা তিনি বহুকষ্টে, বহু পরিশ্রমে তোমার জন্যে—

রমলা। (বাধা দিয়া) তুমি ভুল করছ, মানস। একটা মাত্র মেয়ের জন্যে এত টাকার দরকার হয় না।

মানস। কিন্তু, খোকনকে নিয়ে তুমি কোথায় যাবে, রমলা?

রমলা। আপাতত, সেটা তোমার জানার দরকার নেই।

মানস। কিন্তু রমলা, তুমি চলে গেলে, খোকন চলে গেলে আমি কী নিয়ে বাঁচবো?

রমলা। টাকার জন্যেই তুমি বাঁচবে। টাকা রোজগারের নেশা তোমায় ভুলিয়ে দেবে। একদিন আমাদেরও ভুলিয়ে দেবে—

মানস। রমলা!

রমলা। বলো—

মানস। যাবার আগে আমায় কী তোমার আর কিছু বলার নেই?

রমলা। শুধু এইটুকুই বলার আছে যে পারো যদি এখন থেকে সৎভাবে কাজ করার চেষ্টা কোরো যাতে আমার খোকন তার বাবার পরিচয় দিতে লজ্জা না পায়—

মানস। আর কিছু ?

রমলা। আর আশা করে থাকবো যে একদিন তুমি টাকার জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে পারবে। আর সেই দিন আমি তোমার খোকনকে নিয়ে আবার তোমার পাশে এসে দাঁড়াবো।

— তৃতীয় দৃশ্য—

[শশাঙ্কশেখরের বাড়ীর ঘর। সময় সন্ধ্যা। অসুস্থ উমাকে মীরা রামায়ণ পড়িয়া শোনাইতেছে]

মীরা। (রামায়ণ পাঠ).

এক ঠাঁই চারি ভাই হইল মিলন।

আনন্দে অমরে করে পুষ্প বরিষণ।

আজ এই অবধি থাক, কাকীমা

উমা। ঐটুকু শেষ কর মা—কৌশল্যার সঙ্গে রামের দেখা করিয়ে দে—

মীরা। (পুনরায় পড়ে)

পুত্রশোকে কৌশল্যার অস্থি চর্ম্মসার।

রাম নাম বিনা তাঁর মুখে নাহি আর ॥

সুমিত্রার নেত্রে বারি ঝরে ঝর ঝর।

সর্ব্বদা কান্দিছে বলি রাম রঘুবর ॥

হেন কালে সীতাসহ শ্রীরাম লক্ষ্মণ।

রথ হতে নামি এলো জননী-সদন ॥

মাতা-বিমাতারে রাম করেন প্রণাম।

আশীর্ব্বাদ করে চিরজীবী হও রাম ॥

অন্ধের নয়নে জল হয় পুনর্ব্বার।

সেইরূপ আনন্দে সতিনী দুজনার ॥

পুলকে পূর্ণিত হয়ে কান্দে দুই রাণী।

দুইজনে প্রণামিলা সীতা ঠাকুরাণী ॥

(রামায়ণ বন্ধ করিয়া) হয়েছে ত ?কৌশল্যার কাছে রাম ফিরে এল। মায়ে-ছেলেতে মিলন হোলো। এ জায়গাটি আপনার রোজ একবার শোনা চাই—

উমা। বড় ভালো লাগে মা শুনতে। চোদ্দ বছর পরে ছেলে ফিরে এলো, মা তার জন্তে অপেক্ষা করে বসেছিল। ছেলে এসে মাকে প্রণাম করলে, বৌ শাশুড়ীকে প্রণাম করলে-এ যেন আমাদের ঘরের কথা। তবে কী জানিস মা, আসলে এ সব ত ঠাকুরদেবতার কথা তাই চোদ্দ বছর পরেওমায়ে-ছেলেতে দেখা হোলো। চোখের জল মুছে ফেলতেই মা ছেলেকে বেশ ভালো করেই দেখতে পেলে। মানুষের ঘরে কী তাই হয় ? মানসকে দেখি নি আজ কতদিন! এর মধ্যে চোখের মাথা খেয়ে বসে-আছি। আজ যদি সে একদিনের জন্তেও আসে তাকে ত আমি ভালো করে দেখতেও পাবো না—

মীরা। কেন পাবেন না, কাকীমা ? দেবেশ দা আপনার চোখ অপরেশনের সব ব্যবস্থা ঠিক করেছে—

(প্রবেশ করে দেবেশ)

দেবেশ। কাকীমা আজ ডাঃ সেনগুপ্তর সঙ্গে পাকা কথা হয়ে গেল। উনিত আপনার চোখ দেখেই বলে-ছিলেন অপারেশন করতে হবে। আপনার জ্বরটা বন্ধ হলেই উনি অপারেশন করবেন। উনি ভরসা দিয়েছেন আপনি আবার সব দেখতে পাবেন—

উমা। কী আর দেখবো বাবা! চোখে যদি সত্যিই দৃষ্টি আবার আসে তাহলে যে মুখখানি সবার আগে দেখতে চাই সে মুখখানিত দেখতে পাবো না। তবে দেবেশ তোমাকে দেখবো, মীরাকে দেখবো সেওত কম আনন্দ নয়। কিন্তু দেবেশ অপারেশনের ত অনেক খরচ!

দেবেশ। অপারেশনের সমস্ত খরচ মীরাই দিচ্ছে, কাকীমা—

উমা। মীরা!

মীরা। কাকীমা।

উমা। (কাছে টানিয়া) বেঁচে থাকো মা, রাজরাণী হও। আর যার ঘরে যাবে—দেবেশ দেবেশ, কই বাবা,

(দেবেশ হাত বাড়াইয়া দেয়। দেবেশ ও মীরার হাত একত্র করিয়া)—তার ঘর, আমার দেবেশের ঘ[র] আলো কর—

(দেবেশ ও মীরা উভয়ে উমাকে প্রণাম করে। প্রবে[শ] করেন শশাঙ্কশেখর। তাঁকেও প্রণাম করে)

শশাঙ্ক। কী ব্যাপার ? হঠাৎ প্রণাম কেন ?

(ওরা সবাই মৃদু হাসে)

বুঝেচি! বুঝেচি! বেশ! বেশ! বড় আনন্দে[র] কথা! পরেশ, তুমি ওপর থেকে দেখ। আমি ক[থা] রেখেছি। যে এখন আমার কাছে ছেলের চেয়ে বে[শি] সেই সোনার চাঁদ ছেলে দেবেশ, তার হাতে আ[মি] তোমার মীরাকে দিয়েছি। তুমি ওদের আশীর্ব্বাদ ক[র]

উমা। আমি যাই পূজো সেরে ঠাকুরের আশীর্ব্বাদী ফুল তোমাদের এনে দি। মীরা চল মা—

(মীরার হাত ধরিয়া ভিতরে যায়)

দেবেশ। কাকাবাবু ডাঃ সেনগুপ্ত ত Recently ভিয়েনা থেকে ফিরেছেন। উনি আজ আমায় খুব ভরসা দিয়েছেন—

শশাঙ্ক। দেখ যদি কিছু হয়। তোমার কাকীমার চোখের অবস্থা এতটা খারাপ হোতো না, যদি না মানসের জন্যে দিন রাত চোখের জল ফেলতেন—

দেবেশ। মানসের কথাটা কাকীমা কিছুতেই ভুলতে পারছেন না।

শশাঙ্ক। কী করে পারবে? ম যে। মা কখনও ছেলের কথা ভুলতে পারে? আমি, আমি পুরুষমানুষ আমি পারি। আমি ভুলতে পেরেছি। মানসের কথা ভুলেও মনে আসতে দিই না। কেনই বা দেব? ছেলে হয়ে বাপের কথা শুনলে না, বাপের মান রাখলে না, তার আদর্শ মানলে না, আমিই বা তাকে ছেলে বলে মনে করবো কেন? না না আমি তার কথা ভাবি না।…তবে তুমি দেখে নিও দেবেশ, এর শাস্তি তোলা রইলো! আমার ছেলে যেমন আমাকে দুঃখ দিয়েছে, আমাকে কাঁদিয়েছে তার ছেলেও—

দেবেশ। কাকাবাবু, আপনি মানসকে অভিশাপ দিচ্ছেন?

শশাঙ্ক। না না, অভিশাপ দিচ্ছি না। আমি বলছি ছেলে যেমন আমার অবাধ্য হয়েছে, আমার শিক্ষা, আমার আদর্শ মানে নি, তার ছেলেও তা-ই করবে। সে-ও তার বাপের মানবে না, বাপের শিক্ষা নেবে না, বাপের ইচ্ছেমত চলবে না।

(শশাঙ্কশেখরের এইকথার সুরুতেই রমলা খোকনকে লইয়া নীরবে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, ওদের অলক্ষ্যে। শশাঙ্কর কথা শেষ হইতেই রমলা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া খোকনকে শশাঙ্কশেখরের দিকে বাড়াইয়া দেয়)

রমলা। সেইজন্তেই ত আপনার খোকনকে তার বাবার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে এনেছি—

শশাঙ্ক।…কে?

রমলা। আগে আপনার খোকনকে আপনি নিন

শশাঙ্ক। আমি! আমি…তোমার খোকনকে

(রমলা শশাঙ্কশেখরের কোলে খোকনকে তুলিয়া দেয়)

রমলা। আপনার খোকন—আপনার বংশের একমাত্র—

শশাঙ্ক। বুঝেচি! বুঝেচি! আমার দাদু আমার দাদু…

(রমলা শশাঙ্কশেখরকে প্রণাম করে)

আর তুমি খোকনের মা!

রমলা। হ্যাঁ, বাবা

শশাঙ্ক। (উচ্ছ্বাস সংযত করিয়া) তুমি অশ্বিনীর মেয়ে!…তা মা তুমি এই গরীবের ঘরে

রমলা। এ আমার শ্বশুর ঘর। এখানে আমার অধিকার আছে। বিশেষ করে যখন আমি আপনার বংশের এই ছোট্ট প্রদীপ শিখাটিকে অনির্বাণ রাখায় দাবী নিয়ে আপনার কাছে এসেছি। আপনি ত আমায় ফিরিয়ে দিতে পারেন না বাবা—

শশাঙ্ক। না মা তা পারি না। আমার দাদুকে তুমি আমার কোলে দিয়েছ। আমার দাদু! আমার দাদু কিন্তু মা, এত' তোমাদের জিনিষ, তোমরা ত একে এখনই আমার কাছ থেকে নিয়ে যাবে—

রমলা। না বাবা। আমার খোকন আপনার কাছেই থাকবে—

শশাঙ্ক। সে কী মা? তার বাবার কাছে থাকবে না?

রমলা। তার বাবার আদর্শ থেকে তাকে দূরে রাখবো বলেই ত আপনার কোলে আমার খোকনকে তুলে দিয়েছি। আমার খোকনকে আপনি শিক্ষা দিন, আপনার আদর্শে সে গড়ে উঠুক—

শশাঙ্ক। কিন্তু মা, আমার আদর্শের সঙ্গে ত' এ যুগের মিল হবে না

রমলা। না হোক। কিন্তু যা সত্য তা চিরদিনই সত্য বাবা, দেশে আজ চাই মানুষ…একের পিঠে অনেকগুলো শূন্য বসানো একটা বড় অঙ্ক নয়।

শশাঙ্ক। (বিস্মিত ও আনন্দিত) তোমার মুখে এই কথা! শোনো দেবেশ শোনো! কোটিপতি অশ্বিনীর মেয়ে কী বলছে, শোনো

রমলা। আমার জীবন দিয়ে এ কথা জেনেছি বাবা! আপনি আমার খোকনকে মানুষ করুন। করতেই হবে।

শশাঙ্ক। (আনন্দে ও গর্ব্বে) করবো মা করবো।

করতেই হবে আমি যে আজ—মাষ্টার! মানুষ তৈরী করাই ত' আমার কাজ মা! একবার হেরেছি বলে কী বারবার হারবো? না দাদু তোমার কাছে আমি হার মানবো না।...দেবেশ দাঁড়িয়ে দেখছ কী? তোমার কাকীমাকে বলো আমার দাদু এসেছে! (নিজেই ডাকেন) কই, কোথায় গেলে, দেখ কে এসেছে—

(নেপথ্যে হইতে উমার কণ্ঠে শোনো যায়)

উমা (নেপথ্যে) কে এসেছে?

বলিতে বলিতে তাড়াতাড়ি আসে।

(উমা তাড়াতাড়ি প্রবেশ করে)

উমা—কে?—কে এসেছে?

শশাঙ্ক—(অগ্রসর হইয়া গিয়া) আমার দাদু! আমার দাদু এসেছে · এই নাও—

(উমার কোলে খোকনকে দেয়)

উমা—(খোকনকে বুকে জড়াইয়া) দাদাভাই! আমার দাদাভাই! আমার মানসের ছেলে?

(রমলা উমাকে প্রণাম করে)

মীরা। কাকীমা, বৌদ আপনাকে প্রণাম করছে।

উমা। (স্নেহাশীর্ব্বাদ করিয়া) এসো মা এসো ··আজ আমার কী আনন্দ তুমি এসেছো···দাদাভাই এসেছে!··· কিন্তু···কিন্তু আমার মানস কই?···সে আসে নি?

শশাঙ্ক! না উমা। মানস এখানে আসতে পারে না। সে জানে তার পথ আর আমার পথ এক নয়।

দেবেশ। কাকাবাবু!

শশাঙ্ক। দেবেশ, এ দুঃখ মেনে নিতেই হবে তবে আমি আশা ছাড়াবো না। যতদিন বেঁচে থাকবো মানুষ তৈরীর চেষ্টা আমায় করতে হবে।

(উমার কোল হইতে খোকনকে লইয়া)

আমার দাদুকে আমি মানুষ করবো···আমার দাদু আমাদের সবাইয়ের ভবিষ্যৎ! আমি তাকে মানুষ করবো, মানুষ করবো—মানুষের মত করে আমি তাকে মানুষ করবো···

যবনিকা

॥ শারদীয়া ॥

রঞ্জিতবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

কত কথা বলো তুমি শরতের হাসি,
কান পেতে শুনি আজো, হয় কাজে ভুল;
দূর বনানীতে আর আকাশের নীলে
মনকাড়ো সবাকার, তুমি বুল বুল।

বাতাসের রাগিণীরা শরতের সুরে
পূজো পূজো গন্ধময়ী কত কথা কয়!
সব দেশ, সব কাল, পেরিয়ে রঙিন
শরৎ হাসছে যেন নব জ্যোতির্ময়।
যুবক যুবতী আর শিশু বৃদ্ধ সব
একাকার আজকে যে, এই মাকে দেখে,
জীবন্ত 'ভারতবর্ষ' ঝুমকোর মত
ভালবাসি, তাই মনে গেছ ছবি এঁকে।

শারদীয়া পূজো মার, সাহিত্য রঙিন,—
সবাই হাসছে আজ শিউলির সাথে;
কাশ ফুল দোলা দেয় বলাকার মনে
প্রণাম জানাই মাকে, এ শরৎ প্রাতে।

স্বপ্নের রাজত্ব যেন, ভরে সব হিয়া।
মধুময়ী তাই আজ এই শারদীয়া।

আমার জীবন-বন্ধুর পথে

অধ্যাপক শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায়

কবে যে তোমায় বেসেছিনু ভালো সে কথা ত
মনে নাই।
শরৎ-প্রভাতে শেফালি-সুবাসে ভাবিতেছি
আমি তাই।
পূর্ব আকাশে কনক তপন
ছড়ায় মাটিতে স্বর্ণ-কিরণ,
দূর্বার বুকে আলো-ঝলমল হীরে, চুণী শত মণি
মনের গহনে খুঁজিয়া না পাই শত স্মৃতি শুধু
গণি।

হয়ত বা সে মধু-যামিনীর একটি উতলা লগ্ন।
দূর নীলিমায় নিদ্‌হারা চাঁদ ধরণী স্বপনে মগ্ন;
দূর বনশাখে মত্ত কোকিল
ঢালিতেছে কুহু-তান অনাবিল,
'বউ কথা কও' ডাকিতেছে পাখী পাতার
অন্তরালে,
দিবে নাকো সাড়া অভিমানী সেই প্রিয়া তার
কোনো কালে।

কি জানি সে কোন হেমন্তিকার একটি উদাস
সন্ধ্যা
স্মৃতির পরশে মেদুর সুরভি বিতরিছে নিশি-
গন্ধা।
সাঁঝের আকাশে সন্ধ্যাতারাটি,
করুণ নয়নে বিষাদ ছায়াটি
করিয়াছে ম্লান বসুন্ধরার শ্যামল আননখানি,
আমি কি সেদিন ভালোবেসেছিনু? ভুলেগেছি
মিতা, জানি।

হয়ত সেদিন বর্ষামুখর নিবিড় তামসী রাতি,
গুরু গুরু মেঘ গুমরি উঠিছে, দাদুরী ডাকিছে
মাতি;
ক্ষণে ক্ষণে জাগে দামিনীর হাসি,
ধরণীর তল ওঠে উদ্ভাসি,
চলেছিলে তুমি মোর পুরোভাগে উদ্দেশ-হারা
পথে,
ভালোবেসেছিনু সেইদিন? মনে পড়েনাকো
কোনমতে।

মনে না পড়ুক, আমি জানি এই অনন্ত
ভালোবাসা,
জীবনের পথ-পরিক্রমায় অবিরাম যাওয়া-
আসা;
এত কাছে তুমি আসিয়াছ তাই,
স্নেহ-সুমধুর স্পর্শ যে পাই,
সুখে আর দুখে জীবনাবর্তে হে জীবন-সঙ্গিনী,
আমার জীবন-বন্ধুরপথে তুমি চির নন্দিনী।

ভাষাচার্য্য ডক্টর মহম্মদ শহীদুল্লাহের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে অবদান

শ্রীসুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়

বর্তমান বাংলাসাহিত্যে শহীদুল্লাহ্ একটী অবিস্মরণীয় নাম। ভাষা আন্দোলনে পূর্ব বাংলায় অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানে যে রাষ্ট্রীয় আলোড়ন এসেছিল তাতে মুহম্মদ শহীদুল্লাহের অবদান কতযে মূল্যবান ছিল তা পশ্চিমবাংলার সাহিত্যানুরাগীরা বিশেষভাবে অবগত। শাস্ত্রে লেখা আছে "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" কিন্তু বর্তমানের মানদণ্ডে মাতৃভাষাও কম গরীয়সী নয়। তাই আমার মতে স্বর্গের মতো গরীয়সী 'মাতা, মাতৃভূমি ও মাতৃভাষাকেও' বলা উচিত। মাতৃভাষাকে এমন ক'রে ভালবাসতে না পারলে ভাষার জন্য প্রাণ দেওয়া যায় না। ভালবেসেছিলেন বাংলাভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের মাতৃভাষানুরাগী অধিবাসীরা। তাইতো পূর্ববাংলার মুসলমানেরা পূর্বপাকিস্তানের উপর পশ্চিম পাকিস্তানের উর্দু জেহাদের মোকাবেলা করতে ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়িয়েছিলেন। ধর্মের আকর্ষণের চেয়ে ভাষার দাবীও যে কিছু কম নয়, তা' পূর্ববাংলার মুসলমানেরা প্রমাণ করেছিলেন। পশ্চিম বাংলায় হিন্দী বিরোধী মনোভাব প্রকাশে কতটুকুই বা স্বার্থত্যাগ ও নিষ্ঠা দেখাতে পেরেছে অহিন্দী ভাষাভাষীরা? ভাষাচার্য শহীদুল্লার কাহিনী আমাদের বাড়ীতে হাওড়ার সুপ্রাচীন সাহিত্যিক 'কেদার-বদরীর পথে'র লেখক ৺বীরেশ চন্দ্র দাসের কাছে অর্ধশতাব্দী আগে তন্ময় হ'য়ে শুনতাম। তাঁদের পাড়ায় শহীদুল্লাহের বাস ছিল। তিনি ছিলেন শহীদুল্লাহের চেয়ে বয়সে কিছু বড়। যে সব কাহিনী তাঁর কাছে শুনেছিলাম সে কাহিনী ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ আমায় ৭৯, বেগম বাজার রোড, ঢাকা —১ এর তাঁর বাসস্থান 'পেয়ারা ভবন' থেকে ২৮শে এপ্রিল ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে পুরাতন স্মৃতির রোমন্থনে তাঁর এক অনবদ্য সুন্দর জীবনকথা লিখে পাঠান। তাঁর লেখা থেকেই আমি উদ্ধৃত করে গঙ্গাদকে গঙ্গাপূজার মত তাঁরই জীবন কথা প্রকাশ করছি।

"আমি ১৮৯৯ সালে পঞ্চাননতলা এম, ই, স্কুল হইতে মাইনর পাস করিয়া ১৯০০ সালের জানুয়ারি মাসে হাওড়া জিলা স্কুলের ৪র্থ শ্রেণীতে (বর্তমানে ৭ম শ্রেণীতে) ভর্তি হই। তখন আমরা সাতকড়ি চাটুর্য্যের লেনে থাকিতাম। হাওড়ার সঙ্গে আমাদের পুরাতন সম্পর্ক। আমার পিতা প্রথমে হাওড়ার কাছারিতে একজন কেরানি ছিলেন। পরে তিনি চাকরি ছাড়িয়া স্বাধীনভাবে দলিল লেখকের কাজ করিতে থাকেন। তিনি ইংরেজি ও বাংলায় দলিলপত্র লিখতেন। হাওড়ার বেলিলিয়াস সাহেব, নরসিংহ দত্ত প্রভৃতির ঘরে বোধ হয় তাঁহার হস্তলিখিত দলিলপত্র থাকিতে পারে। তাঁহার নাম মুন্‌শী মফীজুদ্দীন মাহমদ। তাঁহার পিতৃব্য মুন্‌শী গোলাম আবেদ লাটের মুন্‌শী ছিলেন। তিনি সালিকিয়ায় বাস করিতেন। আমাদের পূর্বপুরুষদের বাসস্থান জেলা ২৪ পরগনার বসীরহাট মহকুমার পেয়ারা গ্রাম। আমরা বংশানুক্রমে বিখ্যাত পীর গোরাচাঁদের খাদিস (সেবাইত)) তজ্জন্য আমরা লাখেরাজ সম্পত্তি ভোগী ছিলাম। সমস্ত গ্রামটী নিষ্কর এবং আমাদের জ্ঞাতি গোষ্ঠীর নিবাস। আমি সেখানে ১৮৮৫ সালের ১০ই জুলাই জন্মিয়াছিলাম। পিতার স্বহস্ত লিখিত খাতায় আমাদের ভাইবোনদের জন্মতারিখ লেখা আছে। দেশে পাঠশালায় বাংলা লেখাপড়া শিখিয়াছিলাম। হাওড়ার বেলিলিয়াস মাইনর স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইয়া ইংরেজি পড়া আরম্ভ করি।

"যখন জিলাস্কুলে ভর্ত্তি হই, তখন মতিবাবু (বোধ হয় মতিলাল চট্টোপাধ্যায়) হেড মাষ্টার ছিলেন। আমি দ্বিতীয় ভাষারূপে সংস্কৃত লইয়া ছিলাম। ইহার একটি কারণ ছিল। আমরা পীর বংশীয় এবং বংশে আরবী পারসীর চর্চা ছিল। স্বভাবতঃ পারসী লইবার কথা। স্কুলের মৌলভী সাহেব বড় রাগী মেজাজের ছিলেন। তিনি প্রায়ই ছাত্রদিগকে বেঞ্চের উপর দাঁড় করাইয়া দিতেন কিংবা অন্য কোন শাস্তি দিতেন। আমার মেজো ভাই মহম্মদ এবাদুল্লাহ মৌলভী সাহেবের মার খাইয়া পড়া ছাড়িয়া দেন এবং ঘরে বসিয়া মুক্তারি পড়িতে থাকেন। আমি তাঁহার মারের ভয়ে সংস্কৃত লইয়াছিলাম। আমার যতদূর মনে পড়ে ফার্স্ট ক্লাস পর্য্যন্ত সংস্কৃতের পরীক্ষায় ফার্স্ট থাকিতাম। ক্লাসের একদল ছেলে একবার পণ্ডিত ম'শায়ের খেপাইবার জন্য (তিনি ছিলেন ফরিদ পুরের অধিবাসী, সুতরাং তাহাদের নিকট বাঙ্গাল) তাঁহাকে গিয়া বলে, "পণ্ডিত ম'শায়, আপনি বড় অন্যায় করেন"। তিনি বলিলেন, 'কি বাবা, কি অন্যায়?' তাহারা বলে, "আমরা বামুন কায়েতের ছেলে; আপনি কিন্তু ঐ মুসলমান ছেলেটাকে সংস্কৃতে আমাদের উপরে নম্বর দেন, এ ভারি অন্যায়।" তখন পণ্ডিত ম'শায় বলেন, "তা বাবা, আমি করব কি? সিরাজুদ্দৌলা (তিনি আমার নাম মনে রাখিতে পারিতেন না। তাই ঐ নামে ডাকিতেন) লেখে ভাল। তোরা তো তেমন লিখতে পারিস নে"। এই সংস্কৃত বি, এ, পর্যন্ত আমার পাঠ্য ছিল। আমি সংস্কৃতে বি, এ, অনার্স পাস করিয়া এম, এ, পড়িবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হইয়াছিলাম। কিন্তু পণ্ডিত সত্যব্রত সামাশ্রমী প্রমুখ অধ্যাপক-বর্গের আপত্তি হইল যে "বন"কে বেদ পড়ান যাইতে পারে না। তাঁহারা আমাকে ক্লাস হইতে বাহির করিয়া দেন। ভাইস চ্যান্সেলার আমাকে প্রাইভেট্ ছাত্র রূপে সংস্কৃত এম, এ, পরীক্ষা দিতে উপদেশ দেন। কিন্তু ৺হরিনাথ দে (আমার প্রাক্তন অধ্যাপক) আমাকে বলেন যে প্রাইভেট পরীক্ষা দিলেও যখন পরীক্ষার খাতায় তোমার নাম থাকিবে (তখন এই-রূপ নিয়ম ছিল) তখন কিছুতেই গোঁড়া পণ্ডিতেরা সংস্কৃত ছাড়িয়া অন্য বিষয় লও। আমি তাঁহার উপদেশে Compartive Philology লই।

"আমি ৪র্থ শ্রেণীর বাৎসরিক পরীক্ষার ফলে একটি রৌপ্যপদক পাই। সেটি এখনও আমার কাছে যত্নে রক্ষিত আছে। স্কুলে আমাদের ফার্ষ্ট হয় ছিল রেণুপদ সমদ্দার। সে একরকম গ্রন্থকীট ছিল বলিলেই হয়। আমি কিন্তু ঘরে হিন্দী, উড়িয়া, উর্দু ও ফরাসী পড়িতাম। এমন কি গ্রীক ও তামিল পড়িতে শিখিয়া ছিলাম। আরও অনেক সহপাঠী ছিল; কিন্তু তাহাদের সকলের নাম মনে নাই।

"সে সময় আমাদের গণিতের শিক্ষক ছিলেন রজনীবাবু। তিনি ছিলেন চিরকুমার। খুব গম্ভীর প্রকৃতির। তাঁহার মুখে কখন হাসি দেখি নাই। তিনি নাকি পূর্বে কটক কলেজের গণিতের অধ্যাপক ছিলেন। মায়ের পীড়ার সময় ছুটী পান নাই। সেই অভিমানে তিনি অধ্যাপক পদ ত্যাগ করেন।

"আমাদের ইতিহাসের শিক্ষক ছিলেন 'জটি বাবু' (বোধ হয় জটিলাল দত্ত)। তিনি বই হাতে রাখিতেন। ছাত্রদিগকে মুখস্থ বলিয়া যাইতে হইত।

"আরও কয়েকজন শিক্ষক ছিলেন; তাঁহাদের চেহারা মনে আছে, কিন্তু নাম ভুলিয়া গিয়াছি। প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে বলিব—

অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মিলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

১৯০৪ সালের মার্চ মাসে আমি প্রথম বিভাগে এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা পাস করি এবং মুহসিন বৃত্তিলাভ করি। হাওড়া জিলা স্কুলের ছাত্রাবস্থায় আমার রচনার অভ্যাস ছিল"।

ডাঃ শহীদুল্লাহ্ এখানে তাঁর ছাত্রাবস্থার কাহিনী নিজেই বিবৃত করেছেন। ১৯০৪ সালে যখন এণ্ট্রেন্স পাশ করেন তখন তার বয়স উনিশ বছর। ১৯০৬ সালে তিনি এফ, এ, ১৯১৮ সালে বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। স্যার আশুতোষ তাঁকে বিদেশে শিক্ষার জন্য একটী বৃত্তি মঞ্জুর করেন। কিন্তু স্বাস্থ্য পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হওয়ায় তাঁর সেইবার বিদেশযাত্রা সম্ভব হয়নি। পরের

বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সহকারী রিসার্চ স্কলার' হিসেবে যোগ দেন। দু' বছর বাদে সংস্কৃত ও বাংলার অধ্যাপক হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যান। পরে খণ্ডকালের জন্য আইনের অধ্যাপকও ছিলেন।

১ ৬ সালে তিনি প্যারিসে যান। সেখানে Les Chants mystiques নামক তাঁর মৌলিক নিবন্ধের জন্য ১৯২৮ সালে সাহিত্যের ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন। তিনিই প্রথম ভারতীয় মুসলমান যিনি এই উপাধি পান। সেখান থেকে তিনি Freiberg বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ও আরবী পড়তে যান।

১৯৩৭ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ হ'ন ও ১৯৪৪ সালে কর্ম হ'তে অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁকে দেশবাসীরা অবসর দিতে নারাজ। তাই তাঁর ডাক এল বগুড়া থেকে। ঢাকা থেকে তিনি বগুড়া কলেজে অধ্যক্ষ হয়ে চলে যান। দেশ বিভাগের ফলে শিক্ষকের অভাবের জন্য ১৯৪৮ সালে পুনরায় তাঁকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের জন্য পাকিস্তান সরকার আহ্বান জানান। চার বছর পরে তাঁকে Faculty of Arts এর ডীন্ মনোনীত করা হয় ও সে কাজে তিনি ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত বহাল থাকেন। আর এক বছর তিনি ফরাসী ভাষায় অধ্যাপকের কাজও করেন। ১৯৫৬ সালে তিনি রাজসাহী বিশ্ব-বিদ্যালয়ে যোগ দেন ও সেখানে Dean of the Facalty of Arts নিযুক্ত হন। ৭৩ বছর বয়সে তিনি অধ্যাপনা কার্য থেকে বিদায় গ্রহণ করেন।

একবছর করাচীতে উর্দ্দু উন্নয়ন বোর্ডে কাজের পর তিনি আঞ্চলিক বাংলা ভাষার অভিধান প্রণয়নে প্রবীণ সম্পাদকের কাজ করেন। তাঁরই কথায়—

"আমি বর্তমানে ১৯৬০ সালের এপ্রিল হইতে বাংলা একেডেমীতে কর্মচারী আছি। প্রধান সম্পাদক রূপে পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক বাংলা ভাষায় অভিধান শেষ করিয়াছি। এখন ইসলামী বিশ্বকোষ বাংলা ভাষায় সম্পাদনা করিতেছি।"

কিশোর কাল থেকে রচনায় বিশেষ আগ্রহী থাকায় হাফেজের গজল, রামায়ণের বাংলা অনুবাদ, ওমরের রুবাইয়াৎ ও কোরাণের অনুবাদ প্রভৃতি বহু ফারসী ও উর্দ্দু রচনা অনুবাদ করেন। পূর্ব-বঙ্গের বিখ্যাত কবি আলোয়ালের রচিত 'পদ্মাবতী' কাব্য নাটকটী সম্পাদনা করেন। তিনি ঢাকায় থাকাকালীন বহু পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। পাক্ সরকার ১৯৫৮ সালে তাঁকে ভাষা উন্নয়নের জন্যে ১০,০০০ টাকা পুরস্কার দেন।

তিনি বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির মুখপত্র 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিক'ার সম্পাদনা করেন। এতেই তিনি কাজি নজরুল-রচনা প্রকাশ করেন। তিনি বাংলা পত্রিকা 'বঙ্গভূমি' ও ইংরিজীতে 'Peace' বলে পত্রিকাও সম্পাদনা করেন।

তিনিই পাকিস্তানের Asiatic Society of Pakistan প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি Royal Asiatic Socicty-এর সদস্য, আন্তর্জাতিক pen-এর সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য। ১৯ ৬ সালে যে পাকিস্তানী দল চীনদেশে গিয়েছিলেন সেখানেও তিনি সেই দলের সদস্য ছিলেন।

কিশোর কালে তাঁর অনূদিত হাফেজের গজল ও রামায়ণের অনুবাদের কয়েকছত্র সংযুক্ত করা হ'ল যা তিনি আমায় পত্রের মাধ্যমে পাঠিয়ে ছিলেন।

হাফেজের গজল

আইস, বিনষ্ট হই মদিরা সেবনে
হয়তো এ মরুভূমে পাব সেই ধনে।

রাম বনবাসের পর (রামায়ণ হইতে অনূদিত)

'রাম বিনা অযোধ্যায় আসিলাম ফিরে।
শোকতপ্ত পুরবাসী তাই নিন্দে মোরে।'

হাওড়া জিলা স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র হিসেবে প্রাক্তন ও নূতন ছাত্র সম্মিলনে তাঁকে আমন্ত্রণ করা হয়। তিনি জানান যে পাক সরকার মাত্র কুড়িটাকা নিয়ে বাইরে যেতে দেবেন। ফেরার প্লেনের ভাড়ার ব্যবস্থা করলে তিনি সম্মেলনে যোগ দিতে পারেন। আন্তরিক ইচ্ছা থাকলেও সময়ের অভাবে সে ব্যবস্থা করা সম্ভব-হয়নি গত ১৯৬৫ সালে। তবে আমরা তার রচনা প্রকাশ করতে সমর্থ হই।

মুহম্মদ শহীদুল্লার তিরোধানে বাংলা ভাষার অশেষ ক্ষতি হ'ল। জানিনা পাকিস্তানে এই শূন্য স্থান পূর্ণ করার যোগ্য ব্যক্তি আছেন কিনা?

পরারাগ

তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী

ভিতরের লাফানিটা দ্বিগুণ ভাবে বেড়ে উঠছে গাড়ীর গতি বাড়ার সংগে সংগে। পিছনের কুশনটা টেনে নিয়ে বুকে চেপে ধরেছে প্রমীলা।

ফাঁকা রাস্তায় গাড়ীটা ছুটছে। স্পীডো-মিটারের কাঁটা সরছে। তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট। নিশুতি রাত আর রাস্তায় গাড়ী মানুষ চলছে না তাই রক্ষে। তা না হলে বুঝি গাড়ীটা কোথাও কারো মুখোমুখি বা পাশাপাশি ধাক্কা লাগিয়ে একটা মর্মান্তিক ব্যাপার করে বসত।

ড্রাইভারের মনটা বেশ সতেজ। তবে চালাবার উন্মত্ততায় যখন মাতোয়ারা হয়ে যায়, তখন ওকে রোখা দায়। গাড়ীর মালিক যিনি, তিনিও ড্রাইভারের মতোই দুর্দান্ত চালান। স্টীয়ারিং-এ হাত রাখবার জন্য ওর মন যে ছটফট না করে এমন—তা নয়। প্রমীলার আপত্তির জন্য তা পারে না।

রঞ্জন সাহেবের পছন্দ স্রেফ ওই ড্রাইভারকে। দেশে গেলে, না আসা পর্যন্ত খেয়ে সুখ নেই শুয়ে সোয়াস্তি নেই।

অন্যদিন হ'লে হয়তো গাড়ীটার গতি বাড়ানো নিয়ে অনেক কথাই উঠত। প্রমীলাকে ভীতু ইত্যাদি অনেক বিশেষণে ভূষিত করা হত। ভীতু হক আর সাহসী হক—এসব শোনবার পর রঞ্জনের হাত থেকে স্টীয়ারিং কেড়ে, নিয়ে, গতি কমিয়ে গাড়ী চালাতে সুরু করত প্রমীলা নিজেই।

রঞ্জন প্রমীলার পিঠ চাপড়ে হাসতে হাসতে বলত, সুযোগ্য স্বামীর সুযোগ্যা স্ত্রীই বটে। ক্ষেপিয়ে না দিলে, হাতটার দফারফা হ'য়ে যেত। কনকনানিতে মরছিলুম।

ওঃ। তাই নাকি। স্টীয়ারিং ছেড়ে সরে গেছে প্রমীলা।—ওসব চালাকি ছাড়ো। এখন আস্তে আস্তে চালাও। আমাকে দিয়ে খাটাবার মতলব করবে না আর বুঝলে? কর যদি চলন্ত গাড়ী থেকে ঝাঁপ দেবো।

মুখে আঙুল দিয়ে প্রমীলাকে আর ও অলুক্ষণে কথা মুখে আনতে বারণ করেছে রঞ্জন। বলেছে, ওরে বাব্বাঃ। তুমি আমার একটা মাত্র স্ত্রী। দ্বিতীয় আর নেই। গেলে দুর্ভোগের অন্ত থাকবে না আমার।

খিলখিলিয়ে হেসে উঠেছে প্রমীলা।—তুমি তো তা হ'লে ভাগ্যবানই হবে। ভাগ্যবানেরই তো স্ত্রী মরে শুনেছি।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আজ আর এসব হাসি কৌতুকের ফোয়ারা ছুটছে না। ছুটছে শুধু ওদের মোটরকারটা। রঞ্জন ড্রাইভারকে নির্দেশ দিয়ে চলেছে। জলদি, আউর জলদি।

প্রমীলার মুখে কোনো কথা নেই। দু' চোখে হাতচাপা দিয়ে চুপচাপ হ'য়ে বসে আছে সেই থেকে। গাড়ীতে ওঠবার পরই ওর এই অবস্থা। রঞ্জন জিজ্ঞেস করেছে অনেক বার। কি হ'য়েছে এখানে কোনো ডাক্তারের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে দেখাবে কিনা? রাত হ'লেও, ঘুমিয়ে পড়লেও ডাক্তারের কাছে রুগীর প্রাণটাই আসল। তাছাড়া এর জন্য বাড়তি ফিস দিতে সে প্রস্তুত আছে। প্রমীলার কোনো ভয়ের কারণ নেই, লজ্জারও কারণ নেই।

সব কথারই উত্তর দিয়েছে প্রমীলা একটি মাত্র শব্দে—না।

মুখের দিকে চেয়ে আছে। দু'চোখ ঢাকা যন্ত্রণা কতখানি হ'চ্ছে বুঝতে পারছে না। গাড়ীতে ওঠার সময় প্রমীলাকে বলেছিল রঞ্জন, এটা ঠিক হ'ল না। ডাইরেক্টরের অনুরোধ উপরোধ অগ্রাহ্য

করে ফ্লোর থেকে একেবারে ছিটকে বেরিয়ে আসাটা উচিত হয় নি। তিনি যখন বলছেন, ঠিক হচ্ছে—অদ্ভুত, তখন কেমন করে মনে হল, ঠিক নয়।

প্রমীলা ছলছলে চোখে রঞ্জনের দু' চোখ দেখে নিয়েছে ভালো করে। মানুষটা তাকে কোনো সন্দেহ করছে কিনা। ধরে ফেলেছে কিনা। না, এসব জটিল কুটিল মনের আভাস ও দুচোখ দিয়ে উঁকি মারতে পারে না কখনো। খানিকটা নিশ্চিন্ত হ'য়েছে। জানিয়েছে, তার বুকের মাঝখানটায় অসহ্য যন্ত্রণা হ'চ্ছে। বাড়ী পৌঁছতে পারলে বাঁচে।

—বাড়ী পৌঁছল প্রমীলা। রঞ্জনের দেহে ভর দিয়ে দিয়ে উঠল ওপরে। ঘরে এসে সমস্ত শরীরটাকে এলিয়ে দিল বিছানায়।

তাকে একটু একলা থাকতে দিতে অনুরোধ জানাল রঞ্জনকে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে রঞ্জন। করিডরে সোফার ওপর গালে হাত দিয়ে বসে বসে ভেবেছে, নিজের যন্ত্রণায় ব্যতিব্যস্ত করে তুলতে চায় না প্রমীলা কাউকে। তাকে তো একেবারেই নয়। আজকালকার দিনে ওর মতো মেয়ে পাওয়া ভাগ্যের কথা। টিকে থাকলে হয়।

প্রমীলার ডাকার অপেক্ষায় ক্ষণ গুণে চলেছে রঞ্জন।

বিছানায় শুয়েও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারে-নি প্রমীলা। নিশ্চিন্ত হতে পারে নি। রঞ্জনের জন্যেই ছটফট করেছে অনবরত। এই লোকটার জন্যেই দুশ্চিন্তার অন্ত নেই তার। সবেতে নির্বিকার। সবার ওপরে অগাধ বিশ্বাস। সবার ওপর থাকুকগে—প্রমীলার ওপর অত বিশ্বাস করতে গেল কেন? কেন একটু দেরী করল না, কেন একটু চিন্তা করল না। সাত তাড়াতাড়ি বিয়ে করার দরকার ছিল কি?

প্রমীলা নামল খাট থেকে। সন্তর্পণে পা-টিপে টিপে দরজার পাশে এসে দাঁড়াল। নীল রঙের পরদার ফাঁকে চোখ রেখে দেখল। একই ভাবে গালে হাত দিয়ে বসে আছে রঞ্জন। সোফার হাতে ডান হাতটা পড়ে আছে। আঙুলের ফাঁকে আছে। কোনো খেয়াল নেই।

যে মানুষ একটার পর একটা সিগারেট ধরাতে ভোলে না হাজারো বকাবকিতেও, তার প্রমীলার জন্য একি অবস্থা! এতখানি মোহে অন্ধ হয়ে পড়ুক তার ব্যাপারে এটা চায়নি প্রমীলা।

একে ছেড়ে যাবার কথা ভাবলে যেমন ভেতরটা ডুকরে কেঁদে ওঠে, তেমনি ধরে রাখবার কথাও ভাবলে, বুকে হাতুড়ি পিটতে থাকে যেন কে অহর্নিশি।

হাতুড়ি পিটছে আজ বুকের ভিতর নতুন করে।

মনকুমারের কথাগুলো মনে পড়ছে বার বার। সেদিন ওই স্টুডিওতেই অভিনয় করছিল প্রমীলা। ডাইরেক্টর ছবি ওঠবার আগে থেকেই হুঁশিয়ার করে দিলেন বার চারেক। ভালো করে ভাব ফোটাতে না পারলে কিন্তু বিপদ। ছবির লাভ-লোকসান নির্ভর করছে স্রেফ প্রমীলার ওপর। ও যদি উনিশ-বিশ করে ফেলে, তাহলে ছবি গেল, প্রমীলাও গেল।

ছবির সব দৃশ্যই ভালো উঠছে খুব। প্রাণঢালা অভিনয়ও করেছে প্রমীলা। অভিনয়ে তার ফাঁক ছিল না, ফাঁকি ছিল না। সার্থক অভিনয়ের জন্য স্টুডিওর সবার মুখ থেকে সুখ্যাতিও কুড়িয়েছে প্রচুর। ডাইরেক্টর, মিউজিক ডাইরেক্টর, টেকনিশিয়ন কেউ আর পঞ্চমুখে প্রমীলায় খ্যাতি ছড়াতে বাকি রাখে নি চতুর্দিকে।

ফিল্ম তোলবার সময় শেড ভরে যায় লোকে। শেষ ছবিটুকু তুলতে বাকি। তোলা হচ্ছে। এবারে শেডের বাহিরে লোকে লোকারণ্য।

শেষদৃশ্যটির জন্য ক'রাত ক'দিন ঘুমুতে পারে নি প্রমীলা। ঘরে পায়চারি করেছে কেবল না ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চোখে জ্বালা ধরেছে বটে, কিন্তু জল ঝরে নি।

প্রমীলা শুনেছে মানুষ কাঁদতে নাকি ভালো-বাসে। সে মনেই হক আর চোখেই হক —মোট কথা মানুষ কাঁদে। অথচ এত সব জেনে-শুনে প্রমীলা কিছুতেই কাঁদতে পারছেনা। না মনে, না চোখে।

ডাইরেক্টর বলে দিয়েছেন, প্রমীলা! মনেই কেঁদো তুমি। তাহলেও যথেষ্ট। মন কাঁদলে চোখও

মাথা নেড়েছে প্রমীলা। চেষ্টা করবে ডাইরেক্টরের নির্দেশ পালন করতে।

মন কি রকম করে কাঁদে—কি রকম ক'রে কাঁদাতে হয় মনকে—জানে না প্রমীলা। দেওয়ালে টাঙানো মানুষপ্রমাণ বেলোয়ারী কাঁচের আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে নিজেকে। ভারী সুন্দরী দেখায়। ভারী ভালো লাগে। মন খুশী হয়। দুঃখী হয় না। সাধনার ধন কান্নার আগমন প্রতীক্ষা বৃথা হ'য়ে যায়।

কান্না কান্না কান্না।

হেসে কুটিকুটি হয় প্রমীলা। ডাইরেক্টর বলেছেন, এই বইটার এদৃশ্যে সাকসেসফুল হতে পারলে সিনেমা জগতের মক্ষিরাণী একেবারে। পারবো না বললে চলবে না। যে কোনো উপায়ে পারতেই হবে। অ্যাসিস্টেন্ট ডাইরেক্টর প্রমীলার না কাঁদার জন্য কয়েদীর দুর্ভোগ দেখে সহানুভূতি দেখিয়েছেন। প্রমীলার পক্ষ থেকে ডাইরেক্টরের কাছে আরজি পেশ করেছেন।—দাদা ওকে ছেড়ে দিন। গ্লিসারিণ আছে তো, কান্নার ছবি ভালোই উঠবে।

জানি। সে জ্ঞান আমারো আছে। ওকে বড় করতে গেলে, ওসব করতে আমি কিছুতেই দোব না। নকল কান্না চলবে না। ন্যাচার‍্যাল, একদম ন্যাচার‍্যাল। টসটস ক'রে চোখের জল ঝরে পড়বে। থামবে না কিছুতেই। থামতে চাইবেও না।

ডাইরেক্টরের দীর্ঘ রায়ের ওপর আর কারো আপীল করা চলল না। শেডে গভীর রাতের নিস্তব্ধতা নেমে এলো। সকলে চুপ।

কান্নার সাধানায় মগ্ন হয়ে গেল প্রমীলা আবার। ভেবেছিল ছুটি পাবে—পেল না।

ছবি তোলানোর যে এত যন্ত্রণা, অভিনয় করার যে এত জ্বালা—আগে থেকে জানতে পারলে, এপথ মাড়াত না কোন দিন প্রমীলা।

যারা কান্নার জন্যই জন্মেছে, তারা বেশ কাঁদতে পারে। কেঁদে কেঁদে আপরকে কাঁদাতেও পারে। ডাইরেক্টর বলেছেন, এমন কান্না কাঁদবে যে, তোমার ছবির কান্না দেখে, দর্শকরা নিজেদের চোখের জল রুখতে পারবে না শত চেষ্টা করেও। হাপুস নয়নে কাঁদবে সব বয়েসীরা। ওদের রুমাল ভিজবে। শাড়ীর আঁচল ভিজবে। হলের বাইরে বেরুবে যখন, চোখ মুছতে মুছতেই বেরুবে তখন। এছবি হিট করবে। মানুষের মনে গভীর দাগ কাটবে। অভিনেত্রীর করুণ মুখ আর জলভরা চোখ দর্শকদের স্মৃতির পাতায় সোনালী জলে ছেপে থাকবে চিরদিন।

যেটাতে বিতৃষ্ণা—প্রতিশোধ নেবার জন্য বুঝি ঘন ঘন এগিয়ে আসতে থাকে কাছে বেহায়া নির্লজ্জের মতো সেটাই।

বাচ্চা বয়েসে রাখালির চোখের জলের সংগে নাকের জল ঝরতে দেখে গা ঘিন ঘিন করত প্রমীলার। দু'চক্ষে দেখতে পারত না সে ওকে। চব্বিশ ঘণ্টা যেন ওর চোখে শ্রাবণের ধারা ঝরেই আছে। তার সংগেই ওর সদাসর্বদা রেষারেষি।

প্রমীলার সব দোষই নাকি তার চোখে পড়ছে আর প্রমীলা ইচ্ছে করেই কাঁদায়—ওকে খোঁচা দিয়ে খুশী হয় বলে।

এসব কথা সত্যি হলেও, বড়মানুষেরাই চেপে যায় অনেক সময় বড়রকমের মনান্তর বাঁচাতে গিয়ে কিন্তু রাখালি বেপরোয়া। মনান্তর ঘটুক একজনের সংঙ্গে আর একজনের—এটাই যেন চায় ও যে কোনো ছুতো নিয়ে—সেটা প্রমীলার দিক থেকেই টেনেটুনে বার করবে ও—আর সেই ছুতোয় তুলকালাম কাণ্ড ক'রে বসবে কেঁদেকেটে। আট ন'বছরের মেয়ের এত দুষ্টুমিতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠত সকলে।

প্রমীলা কারো সংগে কথা কইতে কইতে হেসে ফেললে, অমনি কানফাটানো কান্না। প্রমীলা তাকে দূরছাই করছে, সে দেখতে কালো ব'লে। প্রমীলা গান গাইছে ওস্তাদজীর সংগে, সেখানে গিয়ে কেঁদে সারা। প্রমীলা তাকে মুখ ভ্যাংচাচ্ছে গলা ভালো নয় ব'লে।

রাখালির সব তাতে এই ছিঁচকাঁদুনেপনা ভালো লাগত না প্রমীলার মোটেই। পড়বার ঘরে পালিয়ে গেছে এর হাত থেকে বাঁচবার জন্য। সেখানেও রাখালির কান্নার হাত থেকে রেহাই পায় নি, ছায়ার মতো অনুসরণ করেছে তাকে।

খিল এঁটে; প্রমীলা পড়তে বসেছে সবে। বাইরে থেকে দুমদুম করে দরজায় লাথি ঘুষি মারছে রাখালি। ককিয়ে কি কান্না। প্রমীলা তার

লেখার পেনটা নিয়ে এসেছে লিখতে দেবে না বলে।

খুড়তুতো বোন রাখালির এই কান্নার বহর দেখে দেখে এমন একটা ধরণা জন্মেছিল যে বড় হয়েও—আজো সে ধারণা বদলায় নি। মনের কোণে জেঁকে বসে আছে। হিংস থেকেই কান্নার জন্ম। অত কাঁদত রাখালি—প্রমীলাকে প্রত্যেক বিষয়ে হিংসে করত বলেই।

হিংসের কান্নাকে ঘেন্নাই করেছে প্রমীলা। কোনো সহানুভূতিই আসে নি। রাখালির কাছ থেকেই তার কান্নাভীতি আসে প্রথমে। পরে যখুনি যেখানে যার চোখে জল আসতে দেখেছে, মুহূর্তে পালিয়ে যেন বেঁচেছে। মনে হয়েছে এখানেও দ্বিতীয় রাখালি উপস্থিত হ'য়েছে আবার।

রাখালি আজ শ্বশুরবাড়ী। তবু ডাইরেক্টরের নির্দেশে মনে হ'চ্ছে, রাখালি তাকে ছাড়ে নি। ওর কান্নাকে ঘেন্না করার প্রতিশোধ তুলতে চাইছে তাহাকে কাঁদিয়ে—একেবারে সবার সামনে।

ডাইরেক্টর যা বলেছেন, সে কান্না কিন্তু হিংসে থেকে নয়। প্রেম থেকে। নায়ক আসতে চাইছে। নায়িকার কাছে, আসতে পারছে না কিছুতেই। নায়িকাও কাছে পেতে চাইছে, পাচ্ছে না। এরকম অবস্থায় পড়া নায়িকার মনোবেদনা ফুটিয়ে তুলতে হ'বে প্রমীলাকে মুখেচোখে নিখুঁত ভাবে। অভিনয়কে সত্যি ভেবে নিতে হবে অন্তত যতক্ষণ ছবি তোলা চলবে। ছবির চরিত্রের সঙ্গে একাত্মা হয়ে যেতে হবে। নায়কের জন্য অন্তরের জমাট ব্যথা গলবে ধীরে ধীরে বহুদিন অদর্শনের পর নায়কের আবার দর্শন পাওয়ায়। হৃদয় গলে গলে নায়িকার চোখের জলে ঝরবে।

ভাব আনতে চেষ্টা করেছে প্রমীলা। কঠিন লেগেছে। কুড়ি বছর বয়েস অবধি এরকম প্রেমের এরকম নায়কের মুখোমুখি হয় নি। প্রকৃত প্রেমের অদর্শনব্যথা কি তা সে জানে না। ছোটবেলা থেকে গান-নাচকে ভালোবেসেছে। ভালোবেসেছে লেখাপড়া। মা-বাবাকে শ্রদ্ধা করেছে।

কলেজ বন্ধুরা হাসিমস্করা করে যে যার মনোমতকে দেখিয়েছে। জিজ্ঞাসু দৃষ্টি তুলে ধরেছে ওর মুখেরওপর। কোনটি ওর? ঘাডনেড়েছে কৌতুক করে বলেছে, আমার যে একেবারে কেউ নেই—তা নয়। আছে।

কে সে ভাগ্যবান? বন্ধুরা ছেঁকে ধরেছে। দেখাতেই হ'বে তাদের। দেখাবার উপায় না থাকলে শোনাতে হবে তার স্মরণীয় নাম।

হেসে গড়িয়ে পড়েছে প্রমীলা।

না। এখন নয়, থাক আজ।

ইলা এসে জড়িয়ে ধরে বলেছে, পালালে চলবে না। বলে যেতে হ'বে। নইলে ছাড় ছিড়েন নেই কিন্তু।

উত্তর দিকের বারান্দা থেকে কমনরুমে আসছিল তখন মনকুমার। ইলার কাছে খাতাটা চেয়ে নিয়ে তানপুরা এঁকে, প্রমীলা বলল, এই আমার হৃদয়মন সর্বস্ব। একেই পছন্দ আমার। আট বছর বয়েস থেকে এনগেজমেণ্ট হয়ে আছে।

বন্ধুরা হো-হো ক'রে হেসে উঠেছে। এ ওর গায়ে ঢলে পড়ে খাতা টানাটানি করেছে, দেখাদেখি করেছে। এপাশ-ওপাশের উৎসুকেরা উঁকিঝুঁকি মেরেছে। কিছু না দেখে, না বুঝেই অন্যের হাসি দেখে, মুহুমুহু হেসেছে। প্রেমপত্র-টেমপত্রের একটা কিছু ব্যাপার হবে হয়তো বা। রুমে ঢুকল মনকুমার।

প্রমীলাকে ঘিরে বন্ধুরা, —সহপাঠী-পাঠিকারা হাসাহাসি করছে দেখে হকচকিয়ে গেল।

দাঁড়িয়ে আছে তো দাঁড়িয়েই আছে। দেখছে তো দেখছেই। ওর চোখে যেন কি একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছে বা ঘটতে যাচ্ছে। ওর চোখ-মন ওই রকমই। ক্লাসের ছেলেমেয়েদের ওকে জানতে আর বাকি নেই।

মানুষটা নিরীহ গোছের। বোকা বোকা চাউনি। এমনি দেখলে তাই-ই মনে হয়। কিন্তু যারা ওর সংগে বেশী মেলামেশা করতে চেষ্টা করেছে, অন্তরংগ হ'তে চেষ্টা করেছে—তারা জানে ওর প্রকৃতি।

অদ্ভুত ধরনের। কেউ কিছু কথা কইলে—কেন কইল—এই নিয়ে রাতেদিনে ঘুমুতে পারবে না আর ও। কারণ খুঁজে খুঁজে সারা হ'বে। কেউ হাসল, কেউ কাঁদল—অমনি ওর গবেষণা সুরু হয়ে

এরকম ভাবপ্রবণ লোককে নিয়ে রগড় জমে বেশী। তাই ছেলে-মেয়েরা ওকে দেখলেই ফ্যানাবার চেষ্টা করে। ভাবাবার চেষ্টা করে। ওকে আসতে দেখলেই, এ ওর কানেকানে ফিসফিসিয়ে বলবে, এই মনোবিকার আসছে রে। একটা সাবজেক্ট ঠিক কর চট কর।

সামনে এলে, বলে, এই যে দার্শনিক মনকুমার। তোমাকে এখুনিএকটা বিষয়সলভ করে দিতেইহবে। কেউ চুলের কালো রঙ সম্বন্ধে, কেউ চামড়ার মসৃণ আর খসখসে সম্বন্ধে, কেউ কেউ আবার বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নে প্রশ্নে নাস্তানাবুদ করে ফেলবে ওকে।

এতে কোনো সময়ের জন্য মনকুমারের মুখেচোখে কোনো বিরক্তির চিহ্ন ফুটে উঠতে দেখে নি কেউ। এই কারণেই মানুষটা অজাতশত্রু হ'য়ে উঠেছিল।

অজাতশত্রুর কিন্তু জিদ ছিল দারুণ। মনোমত কথা না হলে তার ধারে কাছে যাবে না আর। বাক্যালাপ তো দূরের কথা—তাকে দূর থেকে দেখলেই অদৃশ্য হয়ে যাবে নিমেষে সেখান থেকে। তাই ওকে নিয়ে রংগরহস্য করলেও ওর মন বুঝেই করে সকলে। অবিশ্যি যারা পুরণো, তারাই এই নীতিটা মেনে চলে বেশী করে।

কমনরুমে কদিন ধরেই মনকুমারের খুব জোর সমালোচনা চলছিল ছেলে মেয়েদের মুখে-মুখে। মনকুমার নাকি এখন অনেক উচ্চস্তরে উঠে গেছে।

যে যা কথা কয় ওর সামনে, সে নাকি ওকেই উদ্দেশ করে বলে। অতএব রগড় করে যেটুকু বা আনন্দ পাওয়া যেত—বন্ধ।

মনকুমার দেখছে, কে জানে কি বুঝছে। হয়তো ভাবছে, প্রমীলাকে ঘিরে যে হাসাহাসি চলছে, সেটা ওকেই বিদ্রূপ করা হচ্ছে স্রেফ। মুখের হাসি মুখেই মিলিয়ে গেল সবার।

উপস্থিতবুদ্ধির ডিপো নামে খুব খ্যাতি ইলার কলেজ মহলে। মনকুমারের মনে যদি হাসাহাসি নিয়ে কোনো বিরূপ চিন্তার উদয় হয়ে থাকে, তাহলে তার নিরসন ক'রে দিচ্ছে এক মুহূর্তে ইলা। প্রমীলাকে আর অন্যদের আশ্বাস দিয়ে মনকুমারের সামনে এসে দাঁড়াল।

এটাও জানাল, এই জন্যই হসো-হাসি হচ্ছিল এতক্ষণ।

ইলার কথা কানে গেল কি গেল না—মনকুমারের হাবভাবে তা বোঝা গেল না। তবে বোঝা গেল—কাগজটা নিরীক্ষণ করছে খুব মন দিয়ে। মুখ তুলে তাকাল প্রমীলার দিকে। তারপর একটা ছোট্ট 'হুঁ' স্বগতোক্তি করে, যে দিক থেকে এসেছিল, সেই দিকেই হনহনিয়ে চলে গেল।

সকলে অবাক।

এরপরের ঘটনায় সকলের চেয়ে বেশী অবাক হয়েছে প্রমীলা।

রোজ তার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখত মনকুমার। দেখা হ'লে প্রথমে ওই দৃষ্টিই লক্ষ্য করেছে। এরপর যতবারই দেখা হত—রোজের প্রথম দেখার দৃষ্টি থাকত না। সে দৃষ্টি উদাসী চোখের।

প্রমীলা ওর দৃষ্টির অতল তলে তলিয়ে গিয়ে হয়তো লোকটার গহনের খোঁজ নিয়ে আসতে পারত—কিন্তু সে করতে গেলে, ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে তাকেও একদৃষ্টে এটা আবার প্রমীলার রুচিবিরুদ্ধ। তাছাড়া অন্য মেয়ে-ছেলেরাই বা কি বলবে? চাওয়াচায়ি দেখে ওরা আরো যা' তা' রটাবার সুযোগ পাবে। এমনিতেই তো মনকুমারের দেখা নিয়ে চারদিকে কানাকানি হ'তে সুরু হ'য়ে গেছে।

ইন্দ্রজিৎ মনকুমারের মন টলেছে। তবু আঁকা দেখেছে। তানপুরা হাতে প্রমীলাকে সাক্ষাৎ দেখে নি। দেখে নি কেউ কেউ কলেজের ছেলে-মেয়েরাও। ওই জন্যই তো আসছে ফাংশনে প্রমীলার গান শোনবার ব্যবস্থা করা হ'চ্ছে কলেজে। তখন তো মনকুমারের মন ব'লে আর কিছু থাকবে না। প্রমীলার গান শুনবে। ওকে নিষ্পলক চোখে দেখবে। আর ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা যাবে। এখন থেকেই তৈরী হয়ে থাকতে হ'বে সকলকে। মনকুমারকে সামলাতে হ'বে তখন।

সামলাতে হয় নি কাউকে। সামলে ছিল মনকুমারকে একাই প্রমীলা।

মাস'ছয়েক পরের ঘটনা। সে এক অদ্ভুত

ধরল। দরদী গলায় বেশ কিছুক্ষণ ধরে ধ্রুপদী খেয়াল শুনিয়ে মুগ্ধ করল শ্রোতাদের।

হাত তালি চলছে তো চলছেই। আবার গাইতে বলছে দর্শকরা প্রমীলাকে। কিন্তু হাত-তালির আওয়াজ সম্পূর্ণ থেমে যাওয়ার পূর্বেই মনকুমার ডায়াসের ওপর উপস্থিত হ'ল আচমকা। সকলে তাজ্জব। কারো কোন কিছু শোনবার বা বলবার অপেক্ষা না করেই মাইকের সামনে মুখ নিয়ে গিয়ে, নিজেই নিজের নাম ঘোষণা ক'রে বসল।—মনকুমার বোস খেয়াল গান গাইছে।

উদ্যোক্তারা দাঁতে দাঁতে ঘষছে। পাগলামি করারও একটা সীমা আছে। নিজেদের মধ্যের ঘরোয়া ব্যাপার নয় এটা। বিশিষ্ট বিশিষ্ট অতিথি-দের অনুরোধ করে আনা হয়েছে। ওঁরা ভাববেন কি কলেজ সম্বন্ধে। কলেজের ছেলেদের সম্বন্ধেই বা কি ধারণা নিয়ে বাড়ী ফিরবেন ওঁরা। প্রোগ্রামে নাম নেই দেখেও ডায়াসে ওঠে কোন্ লজ্জায়। বুদ্ধি বলে যদি একটু কিছু থাকে ঘটে।

কেউ বলল, ওর বেয়াদবি বরদাস্ত করা হবে না কিছুতেই। এখুনি ঘাড় ধরে নামিয়ে দেওয়া হক ডায়াশ থেকে। কেউ বলল, ঘরের কেলেং-কারী বাইরে ছড়াবে আরো এসব করলে। কেউ আবার বলল, এখন একেবারে চুপ, স্পিক টু নট। বাইরের কেউ কিছু বুঝতে পারেনি। হয়তো ওকে কমেডিয়ান ভাবছে। তা নাহলে, হল এত নিস্তব্ধ কেন, ও কি করে উদ্‌গ্রীব হয়ে দেখছে সব। উৎকর্ণ হয়ে আছে ওর কথা বা গান শোনবার জন্য। একটু অপেক্ষা করা উচিত।

শেষের জনের কথা শুনেছিল উদ্যোক্তারা। অপেক্ষা করেছিল।

ভালোই হয়েছিল ফল। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে মনকুমারের গান শুনেছে সকলে। তানপুরা হাতে ধ্যানমগ্ন সংগীত সাধকের মুদিত নেত্র দেখে মুগ্ধ হয়েছে। যেন একটা কল্পনালোকের মানুষ—স্বপ্নরাজ্যে বসে আছে। বসে আছে একটি দেব-শিশু। সৌম্য-স্নিগ্ধ মুখখানায় স্বর্গের দীপ্তি।

ভরাট মিষ্টি গলায় মিঞা ঘরানার খেয়াল গেয়ে শোনাল মনকুমার। গান থেমেছে। কিন্তু হলটা সুরের যাদুতে সম্মোহিত। চেয়ারের সংগে মানুষগুলো যেন এঁটে গেছে। এক একটা পাথর মূর্তি বসে আছে যেন।

মনকুমারের ওঠবার সময় হলটা সম্বিত ফিরে পেল। হাততালির আওয়াজে কানের পরদা ছেঁড়বার উপক্রম।

দেখছে প্রমীলা মনকুমারের আপাদমস্তক। লোকটার পায়ের নখ থেকে মাথার চুল অবধি যেন গানে গানে ভরা। ছদ্মবেশী সংগীত সাধক। সঞ্চয়ের থলি ভারী। অনেক কিছু পেতে পারা-যায় এর কাছে।

অপূর্ব জিনিস শুনলুম আপনার মুখ থেকে। আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু শেখবার আছে।

মুচকি হেসে উত্তর দিয়েছিল মনকুমার। খুব হেসেছিলেন তো সেদিন? রেগে গিয়ে তানপুরা ভেঙে ফেলে গান ছেড়ে ছিলুম। সে খবরটাও নেওয়া হয়েছিল তলায় তলায়। সবার সামনে অপদস্থ করবার জন্য তানপুরা এঁকে দেখিয়ে ছিলেনও তো খুব।

কোনো বাদ প্রতিবাদ না করে, মানুষটার ভুল ভেঙে দেবার চেষ্টা না করে, সংগে সংগে ভিতরে চলে এসেছিল প্রমীলা। শুনেছিল মনকুমারের মনের কথা।

প্রমীলার ব্যাপার নিয়েই মাথায় জিদ চেপে গেছল মনকুমারের। তানপুরা তৈরী করিয়েছিল। রেওয়াজ সুরু করেছিল আবার। ফাংশনে সকলকে বোকা বানিয়ে প্রতিশোধ নিয়ে তবে ছাড়বে সে। আজ তার সে আশা মিটেছে।

প্রমীলা গান শোনবার পর থেকে মনকুমারকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালো বেসেছিল। এ ভালোবাসার ভিতর কোনো কৃত্রিমতা ছিলনা। একবারে নির্ভেজাল।

প্রমীলার মনে হত, মনকুমার শিশুর মতো কত সরল কত সুন্দর। শিশুর মতোই খেয়ালী। মান-অভিমান কথায় কথায়। সবাইকে নিজের করে ভাবে বলেই, কারো কাছ থেকে মনোমত কথা শুনতে না পেলেই, রেগে আগুন।

দুঃসাধ্য। ও বড় অসহায়। মমতা স্নেহের আবরণে ওকে ঢেকে রাখতে চায় প্রমীলা। ঢেকে রাখেও। কলেজে কেউ ওকে ঠাট্টা তামাশা করতে গেলে বাঘিনীর মতো তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে তখুনি। কাউকে কিছু বলতে দেবে না ওকে।

এ নিয়ে ওদের দু'জনের নামে কানাঘুষোও কম হয় না কলেজের ছেলেদের মধ্যে। ওরা দু'জনেই কাউকে পরোয়া করেনা। গাত্রদাহে অমন অনেকের নামে অনেকে যা তা বলে বেড়ায়। তাতে কার কি আসে যায়? কারো গায়ে ফোস্কাও পড়েনা। রটানো বদনামটা লেখা হয়েও যায় না।

বন্ধুমহল থেকে প্রস্তাব পেশ করা হল প্রমীলা-মনকুমারের কাছে। তাদের বন্ধুসমাজের মুখ-পোড়া যাচ্ছে ওদের ব্যাপারে। প্রমীলা আর কতদিন মনকুমারের গানের ছাত্রী সেজে এবাড়ী ওবাড়ীর অভিসারকে লোকের চোখে ধোঁয়াটে করে রাখবে? মনকুমারই বা মাস্টার সেজে ভাঁওতা দেবে কতদিন? মুখে বড় বড় দার্শনিক তত্ত্ব আওড়ালে কি পার পেয়ে যাবে ভেবেছে?

দু'জনে বিয়ে করলে অবশ্য বলবার কিছু ছিল না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যা, কেউ কাউকে মন দিয়ে চায় না। তাই কেউ কাউকে বিয়েও করবে না নানান অছিলায় এ বিষয়ে নিশ্চিত। ওদের কাছে বন্ধুদের বক্তব্য বিয়ে যখন হবেই না, তখন যত শীগগির পারা যায় দু'জনে দু'জনের কাছ থেকে সরে যাক।

সরে যাক! মাথার ভিতর দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল মনকুমারের। সরে সে যাবেনা ওদের কথায়। প্রমীলাকে বিয়ে করে দেখিয়ে দেবে সে পুরুষ, কাপুরুষ নয়।

প্রমীলারও মনকুমারের অবস্থা। 'কেউ কাউকে মন দিয়ে চায় না'—এ ধারণা এলো কি করে তাদের ওপর। চায় কি না চায়—দেখিয়ে দেবে।

আকাশে মেঘই ডেকে ছিল শুধু। বৃষ্টি হয় নি।

প্রমীলাকে বিয়ে করতে পারে নি মনকুমার। প্রমীলাও মনকুমারকে সাতপাকের একপাকেও বাঁধতে পারে নি বহু চেষ্টা করেও।

সামান্য চিড় থেকেও, বড় ফাটল দেখা দেয়। হয়েছিল।

এক কান্না নিয়েই সব কিছু ঘটে গেল

ফিল্মে নামতে চায় নি প্রথমে প্রমীলা। মনকুমার জোর করেই রাজী করিয়েছে। সমস্ত দৃশ্যেই ভালো অভিনয় করে গেছে প্রমীলা। শেষেরটায় ঠেকেছে কান্না নিয়ে।

ডাইরেক্টরের নির্দেশ মতো কাঁদতে পারছে না। কান্না আসছে না ভিতর থেকে। কান্না আনবার চেষ্টা করতে গেলে, হেসে ফেলছে। এই নিয়ে রোজই স্টুডিও আর ঘর করতে করতে হয়রান হয়ে পড়েছে। ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে আর বেশী দেরী নেই। মনকুমার বুঝিয়ে সুঝিয়ে মাথাটা ঠাণ্ডা করে রাখবার চেষ্টা করছে কেবল।

কিন্তু শেষে মনকুমারেরই ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। মাথা গরম ক'রে বসল সেই। আর ফিল্ম দিতে হবে না। একটা অন্য লোকের জন্য দিন রাত এভাবে কান্নার চিন্তা করতে থাকলে, সব ভুলে, তাকে ভুলে ছবির নায়কের ওপরই আকৃষ্ট হ'য়ে পড়বে, প্রমীলা নিশ্চয়ই। সারারাত না ঘুমিয়ে কান্নাতত্ত্ব বিশ্লেষণ করে নিখুঁত ফলাফল বার করেছে মনকুমার।

প্রমাদ গণল প্রমীলা।

অনেক টাকা খরচ হ'য়ে গেয়ে বইটায়। এ অবস্থায় না গেলে, ছেড়ে দিলে, অভদ্রতার চূড়ান্ত হবে। মালিক পক্ষদের পথে বসানো হবে। বিবেকে বাধে প্রমীলার। তা ছাড়া কনট্রাক্ট ছাড়বে কেন তাকে সে ছাড়তে চাইলেও?

বিবেকের যুক্তির আইনের বাঁধনে প্রমীলা বাঁধা পড়লেও আর একটি মোক্ষম বাঁধন স্টুডিওর দিকে টানতে থাকে অগোচরেই। সে বাঁধন—যশের চরম শিখরে ওঠবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা। মক্ষিরাণী হবার মোহ।

এই মোহই প্রবঞ্চনা করতে শিখিয়েছিল মনকুমারকে। মনকুমারের কথায় সম্মত হয়েছে ভাব দেখিয়ে, গোপনে স্টুডিওতে চলে গেছে। ভাব—সে তার স্ত্রী হবার অনুপযুক্ত। প্রমীলা তার সংগে মধুর সম্পর্কের ছেদ টেনেছে নিজে হাতেই। বন্ধুরা যে বলেছিল কেউ কাউকে মন

প্রমীলার কাছে আসা বন্ধ করে দিল মনকুমার। প্রমীলা ভেবেছিল, মানুষটা এমনিতেই একটু অন্য ধরনের। হয়তো দুদিন বাদে রাগ পড়বে। প্রমীলার পরিস্থিতিটা অন্তত বুঝবে। তার প্রাণঢালা ভালোবাসাই টেনে আনবে আবার।

অনেক সাধ্য সাধনা করে ফিরিয়ে আনতে পারে নি মনকুমারকে আর।

বুকের ভিতরটা শূন্য হয়ে গেছল। মনে হয়েছিল তার সব কিছু হারিয়ে গেছে দুনিয়া থেকে। অসহ্য যন্ত্রণা বুকটাকে পিষে মারছিল। মনটাকে ঘোরাবার জন্য স্টুডিওতে গেল। সেখানে আরো অশান্ত হয়ে উঠল।

ফ্লোরে ডাকলেন ডাইরেক্টর। কান্নার ব্যাপার বোঝালেন আবার নতুন করে। ডাইরেক্টরের কোনো কথাই কানে যাচ্ছে না। চোখের সামনে ভেসে উঠছে শুধু মনকুমারের মুখখানা। কতদিন তার সংগে এসেছিল এখানে বসে থাকত সামনে। যতক্ষণ অভিনয় করেছে, ততক্ষণ চোখের পলক পড়ে নি, দৃষ্টি ঘোরায় নি একবারের জন্যও তার দিক থেকে, সে আজ নেই। সে আর আসবে না। যে রকম গোঁ, তার মুখ ও আর দেখবে না কখনো।

বুকের যন্ত্রণাটা বড্ড বাড়ছে। দু'চোখে জ্বালা ধরছে। হু-হু ক'রে প্রমীলার দু'চোখে কান্নার বন্যা ছুটল।

ছবি উঠল।

ডাইরেক্টরের চোখে জল। সহকর্মীদের, উপস্থিতদের—সবার চোখে জল গাল বেয়ে টসটস করে পড়ছে।

পিঠে হাত চাপড়ে বলল ডাইরেক্টর, এক্সেলেন্ট প্রমীলা। এক্সেলেন্ট। তোমার সাধনা সফল। যা চেয়ে ছিলুম তাই পেয়েছি।

কান্না থামছে না কিছুতেই। নিজেকে চেষ্টা করেও সামলাতে পারছে না। বাড়া পাঠিয়ে দিতে বলল প্রমীলা ডাইরেক্টরকে। শরীরটা ভালো বোধ হ'চ্ছে না।

এরপর থেকে বিয়ের আগে অবধি যতবার ছবির প্রয়োজনে প্রমীলাকে কাঁদতে হয়েছে, কেঁদেছে খুব। কান্নার সময় মনকুমারকে মনে ক'রেছে। চতুর্দিকে ধন্যি ধন্যি পড়ে গেছে প্রমীলার—প্রমীলা ভাবসম্রাজ্ঞী।

বিয়ের পর ছবির কাজ বন্ধ রেখেছিল বছর দুয়েক। আবার নামছে ডাইরেক্টরের বিশেষ অনুরোধে। অযথা ঘরে বসে প্রতিভার অপচয় করলে ঈশ্বরও বুঝি ক্ষমা করবেন না তাকে। বছর খানেকের বাচ্চাটার ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে বুকটা কেঁপে উঠেছে প্রমীলার। মনে মনে বলেছে, ঠাকুর! তোমার দেওয়া প্রতিভার অপচয় করবো না আমি। একে দেখো।

যে ছবিতে অভিনয় করছে এবারে তাতেও কাঁদতে হ'বে হাপুস নয়নে। কান্না আসছে। ছবি তোলবার জন্য সমস্ত প্রস্তুত। খানিক দূরে সামনাসামনি বসে আছে রঞ্জন। রঞ্জনের মুখখানার মতো অবিকল বাচ্চাটার মুখ। রঞ্জন আর খোকা—এর মধ্যিখানে মনকুমার আবার কেন?

হৃৎপিণ্ডটা টেনে ছিঁড়ে বার ক'রে ফেলে দিতে চাইছে যেন কে। মাথার ভিতর বিবেকের দংশনের জ্বালায় অস্থির হয়ে পড়ছে। ফ্লোর থেকে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে। পালিয়ে গেল। বুকের যন্ত্রণাটা বেড়েছে। অভিনয় ঠিক হ'চ্ছে না মনে হ'চ্ছে।

ঠিক হ'চ্ছে—ডাইরেক্টর হাসতে হাসতে বললেন।

আমার মনঃপুত হ'চ্ছে না। না হ'লে অভিনয় করবো না আমি বলেই তো এসেছি।

দ্রুতপদে ফ্লোর থেকে বেরিয়ে গেছল প্রমীলা। তারপর রঞ্জনের সংগে গাড়ীতে এসে উঠেছিল—

নীলপরদার ফাঁক দিয়ে দেখছে রঞ্জনকে প্রমীলা। রঞ্জন পোড়া সিগরেট ধরে আছে একহাতে। আর একহাত তার গালে। বসে আছে একই ভাবে। ভোর হ'য়ে আসছে। তবু তাকে ডাকে নি।

প্রমীলা কি ক'রে এমন সরল লোককে প্রবঞ্চনা করবে? পারবে না। ফিল্মে নামতে গেলে, কাঁদতে গেলে, মনকুমারকে মনে পড়বেই। এটা কি রঞ্জনকে প্রবঞ্চনা করা নয়?

কান্নার অভিনয় দেখে নি মনকুমার। তবু বলেছিল, অন্যলোকের জন্য—কান্নার চিন্তা করতে থাকলে—নায়কের ওপরই আকৃষ্ট হয়ে পড়বে—

একথা রঞ্জনের মাথায়ও আসতে পারে। কান্নার দৃশ্য প্রত্যক্ষ করলে, বদ্ধমূল ধারণা হ'য়ে যাওয়া কিছু অসম্ভবও নয়।

কাঁদতে গিয়ে হারিয়েছে মনকুমারকে। কেঁদে রঞ্জনকে হারাতে চায় না প্রমীলা। হারাতে পারবে না কিছুতেই।

হে বধির ভগবান্!

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

হে বধির ভগবান্!
কেন চুপ রহ, কথা নাহি কহ,—
এ কী তব অভিমান!
কত ডাকি, কত বেদনা জানাই,
কভু কোনো দিন সাড়া নাহি পাই;—
তবে কি হে তুমি অন্ধ শকতি?—
তাই ভেবে মরে প্রাণ।

নির্বাক্ ভগবান্!
স্রষ্টা-সৃষ্টি—তা'র মাঝে কেন
দুস্তর ব্যবধান?
আছ কিনা আছ দেখি নাই চোখে
জেগে আছ শুধু কল্পনা—লোকে—
শত সংশয়ে ছিন্ন হৃদয়,—
কর ত্রাণ! কর ত্রাণ!

উদাসীন ভগবান্!
খবর রাখো কি—কী গভীর দুখে
ধরণী মুহ্যমান?
সুদূর স্বর্গে করি' সুধাপান
ভুঞ্জহ সুখে কিন্নর—তান;—
যায়—সব যায়—প্রলয়-পয়োধি
হেথায় গর্জমান!

নির্মম ভগবান্!
কুসুম—সুবাস কেন দিলে করি'
কণ্টক—জ্বালা দান?
প্রাণে দুর্মর অমৃত—পিয়াসা,
মরণের কূলে কেন মোর বাসা?
জঠরে কেন এ ঘৃণ্যক্ষুধার
অনল দীপ্যমান?

অদৃশ্য ভগবান্!
ভুলে গেছি তোমা?—ভিক্ষা মাগিয়া
কাটে মোর দিনমান!
কতো কোলাহলে,কতো ঝঞ্ঝাটে
সকাল—সন্ধ্যা ফিরি হাটে বাটে;—
কোথায় স্থৈর্য, কোথা অবসর,
উদ্বেগহীন প্রাণ!

নিদ্রিত ভগবান্!
নূতন করিয়া পারো কি করতে
ধরণীকে নির্মাণ?
সর্পের মতো নির্মোক ছাড়ি'
যুগের যুগের গ্লানি—ক্লেদ ঝাড়ি'
উঠিবে জীর্ণ গলিত পৃথিবী
করি' কি মুক্তি—স্নান?

পোলিওমায়েলাইটিস ও প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট

ডাঃ অরুণ কুমার দত্ত

মানুষের জীবনে কতই না ভুল হয়। বিশেষ করে চিকিৎসার ক্ষেত্রে। এই ভুলের মাধ্যমেই কিন্তু আমরা শিখি। দুচারজন লোক এই ভুলের মাশুল দেয়; তাদের দুর্দৈবের ভেতর থেকে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করে। চিকিৎসা ও রোগের বিবর্তন হয় পরিবর্ত্তিত।

এই রকম একটা রোগের কথাই এক ঘটনার ভিতর দিয়ে বলি। ১৯২১ সালের আগষ্ট মাস। কানাডার অন্তর্গত ক্যাম্পোবেলা দ্বীপে সপরিবারে বেড়াতে এসেছেন মিঃ ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট, তখনও তিনি প্রেসিডেণ্ট হননি। সেখানে একদিন এক কাকচক্ষু হ্রদের জল দেখে আর লোভ সামলাতে পারলেন না। সেই বরফগলা ঠাণ্ডা জলে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন। অনেকক্ষণ ধরে সাঁতার কাটলেন। শরীরে কোন ক্লান্তি এল না। তারপর ভিজে কাপড়ে জলের ধারে, একটা গাছের গুঁড়িতে মাথা দিয়ে বিশ্রাম করলেন অনেকক্ষণ। আর নিউইয়র্ক থেকে আসা একটা চিঠি খুলে পড়তে লাগলেন।

কাজটা খুব অসমীচীন হয়েছিল। পরে সেটা বোঝা গেল। বাড়ী আসার পরে ঘন ঘন হাঁচি আর সর্দ্দি শুরু হলো। তার সঙ্গে প্রবল জ্বর আর বাঁ পায়ে ব্যাথা।

মিসেস্ রুজভেল্ট ছেলে মেয়েদের দূরে পাঠিয়ে, ডাক্তার ডাকলেন। ডাক্তার বেনেট পরীক্ষা করে দেখলেন,—রোগী বাঁ পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতেই পারছেন না।

ঘটনাচক্রে পেনিসিলভানিয়া ইউনিভার্সিটীর একজন বিখ্যাত নিউরোসার্জেন প্রফেসার ডাঃ ডবলিউ কীন তখন সেখান উপস্থিত ছিলেন। তাঁকে কনসাল্টেসনের জন্য ডাকা হলো। ডাঃ কীন রুজভেল্টকে পরীক্ষা করে বললেন, তাঁর শিরদাঁড়ার ভেতর একদলা রক্ত জমাট পাকিয়ে গেছে সেজন্য তিনি পা নাড়াতে পারছেন না। কিন্তু কয়েকদিন বাদেই যখন রুজভেল্টের অবস্থা আরও খারাপ হয়ে গেল তখন ডাঃ কীন মত পাল্টালেন। তিনি বললেন, রোগীর শির দাঁড়ার ভেতর ষ্ট্রোক হয়েছে। স্নায়ুমণ্ডলীতে রক্তসঞ্চালন না হওয়াতে এই বিপত্তি। তিনি পায়ে খুব জোর ম্যাসাজ করার উপদেশ দিলেন, আর বললেন—সারতে বেশ কয়েকমাস গেলে যাবে।

ব্যাপারটা কিন্তু অন্য রকম ছিল। আসলে রুজভেল্টের পোলিওমায়েলাইটিস হয়েছিল। আজ থেকে ৫০ বছর আগে পোলিওমায়েলাইটিসের ব্যাখ্যা ও চেহারা অন্যরকম ছিল। ৮৩ বছরের বৃদ্ধ ডাঃ কীন সম্ভবতঃ জীবনে পোলিওমায়েলাইটিসের রুগীই দেখেন নি।

পোলিওমায়েলাইটিসের নাম তখন অন্য ছিল। এ রোগকে তখন শিশুদের পক্ষাঘাত বা Infantile-paralysis বলা হত। রোগের উৎপত্তির কারণ তখন জানা ছিল না। infantile paralysis বলার কারণ, রোগটা দুই থেকে পাঁচ বছরের শিশুদের সাধারণতঃ হয়ে থাকে। নামটা কিন্তু পরে বদলে দেওয়া হয়। কারণ দেখা গেল শতকরা ৮০ ভাগ ক্ষেত্রে কোনরকম পক্ষাঘাত দেখা দেয় না।

সবচেয়ে মারাত্মক হচ্ছে, রোগের প্রথম অবস্থায় অসুস্থ মাংসপেশীকে নড়াচড়া করতে বলা। প্রফেসর ডাঃ কীন সে উপদেশই দিয়েছিলেন অসুস্থ রুজভেল্টকে। রুগ্‌ণ, অবসন্ন মাংসপেশীগুলোকে ম্যাসাজ করতে বলে, পক্ষাঘাতের অবস্থাকে আরও এগিয়ে দিয়ে গেলেন ডাঃ কীন।

রুজভেল্টের প্রস্রাব ও বাহ্য করার ক্ষমতা একেবারে চলে গেল। অসাড়ে সব হতে লাগল। ব্যথারও কোন উপশম হল না।

মিসেস্ রুজভেল্ট আর দেরী করলেন না।

বললেন, যত টাকাই লাগুক না কেন এ বিষয় শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞকে ডাকা হোক।

বোষ্টন থেকে এলেন ডাঃ রবার্ট লোভেট। রোগ দেখেই তিনি বিশ্লেষণ করে নাম দিলেন,—Acute anterior poliomyelitis, পায়ের ম্যাসাজ বন্ধ করা হলো। রুজভেল্টের তখন পা ছাড়িয়ে হাত এবং পিঠেও পক্ষাঘাত তার আক্রমণ চালিয়েছে।

কয়েকমাস বাদে, ডাঃ লোভেটের উপদেশে, রুজভেল্ট'কে নিউইয়র্কের বিখ্যাত প্রেসবিটোরিয়ান হসপিটালে ভর্ত্তি করা হলো। সৌভাগ্যক্রমে রুজভেল্ট নিরাময় হয়ে গেলেন।

পোলিওমায়েলাইটিসের আক্রমণ কিন্তু রুজভেল্টের চরিত্রে একটা গভীর পরিবর্ত্তন আনলো। তাঁর হাল্কা মেজাজটা বদলে গেল। তিনি আরও গম্ভীর, ধৈর্য্যশীল, দয়ালু ও পরহিতকারী হয়ে উঠলেন। পায়ের জোর কিন্তু রুজভেল্ট আর ফিরে পাননি। ক্রাচের উপর ভর দিয়ে টলমল করতে করতে তিনি যখন জনসভার বক্তৃতা দিতে উঠতেন, তখন কিন্তু সহজেই তিনি জনসাধারণেয় সহানুভূতি পেতেন।

রুজভেল্ট পরবর্ত্তীজীবনে তাঁর সঞ্চিত অর্থের একটা বড় অংশ দিয়ে আমেরিকায় পোলিওর রুগীদের জন্যে একটা হাসপাতাল স্থাপন করে গেছেন।

এই রোগের কয়েকটা স্তর আছে। প্রথম দিকে সর্দ্দি, জ্বর, মাথাব্যথা, বমি, পাতলা পায়খানা ইত্যাদি উপসর্গ দেখা যায়। মাংসপেশীগুলো টিপলে তখন ব্যথা করে। 'বেশীরভাগেরই সেভাবে একেবারে রোগ সেরে যায়।

যাদের সারে না তাদের কারুর কারুর পরে কিন্তু পক্ষাঘাত দেখা দেয়। সাধারণতঃ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পক্ষাঘাত সম্পূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করে। যাদের মাসখানেকের মধ্যে কোন উন্নতি দেখা গেলনা, তাদের পষাঘাত সারার সম্ভাবনা খুব কম।

যাদের মস্তিষ্কের স্নায়ুকেন্দ্রে পক্ষাঘাত (Bulbar paralysis) হয় তাদের অবস্থা ভয়াবহ হয়ে ওঠে। এসব রুগীরা গিলতে বা কাশতে পারেনা এবং শ্বাসকষ্ট-প্রকট হয়ে ওঠে।

রোগটার উৎপত্তি হয় ভাইরাস জাতীয় এক-রকমের জীবাণুর আক্রমণ থেকে। এই ভাইরাস নাকের ভিতর দিয়ে কিংবা খাদ্য ও পানীয়র মারফতে অন্ত্র দিয়ে শরীরের ভিতর ঢুকতে পারে। এপিডেমিকের সময় টনসিল অপারেসন করালে এরোগ আরও তাড়াতাড়ি শরীরে ঢুকে যায়। তারপরে শিরদাঁড়া কিংবা মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষে এবং স্নায়ুকেন্দ্রে আক্রমণ করে জখম করে দেয়। তারই ফলে হয় পক্ষাঘাতের সৃষ্টি।

পোলিওর যে টিকা দেওয়া হয় সেটা রোগকে বাধা দেওয়ার জন্য। সারাবার পক্ষে কাজে আসে না। আর শিশুদের রোগটা বেশী হবার কারণ শৈশবে রোগকে বাধা দেবার ক্ষমতা অনেক কম থাকে। সেজন্যে বড়দের এ রোগ বড় একটা দেখা যায় না। বেশীরভাগেরই হয়ত শৈশবে এ রোগ হয়েছিল কিন্তু পক্ষাঘাত না হবার দরুণ, সর্দ্দি জ্বর বলে চলে গেছে।

সন্ন্যাসজীবনের বিভিন্ন পর্য্যায়

শ্রীপ্রণবানন্দ

প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে দণ্ডী-একাদণ্ডী ত্রিদণ্ডী শব্দগুলির যথার্থ মূল্যায়ন সম্পর্কিত কোন সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করা হয় নাই। আমাদের দেশের সূত্র-শাস্ত্র মহাকাব্যদ্বয় পুরাণ এবং অন্যান্য গ্রন্থগুলি অধ্যয়নকালে এই সকল শব্দের সহিত পরিচিত হলেও তাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। কয়েকটি গ্রন্থে কিছু বিক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায়; কিন্তু সে বিবরণ কোন বিশেষ বিষয়ে সুস্পষ্ট আলোকপাত করে না। বিভিন্ন গ্রন্থের তুলনামূলক আলোচনা করে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে দণ্ডী একদণ্ডী ত্রিদণ্ডী অর্থে সূচিত করতো সকল সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী জীবনের তিনটি ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায় বা পর্য্যায়। স্বল্প পরিসরে সন্ন্যাসী বা পরিব্রাজক শ্রেণীভুক্ত এই তিনটি পৃথক্ পৃথক্ অধ্যায়ের একটি সামগ্রিক রূপ বিকাশের প্রচেষ্টাই হ'ল বর্তমান প্রবন্ধ।

আক্ষরিক অর্থে দণ্ডী হলেন সে-সব পরিব্রাজক যাঁরা ব্রহ্মচর্যকালে দণ্ড (লগুড়া বা লাঠি) গ্রহণ করতেন। একদল পণ্ডিত মনে করে থাকেন এঁরা শৈবসম্প্রদায়ভুক্ত একশ্রেণীর ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী; যদিও এ-সম্বন্ধে যথেষ্ট মতবিরোধ মধ্যে বিদ্যমাণ। ভ্রাম্যমাণ এই সন্ন্যাসীগণ ব্রাহ্মণের গৃহে ভিক্ষালব্ধ সামগ্রীদ্বারা ক্ষুধা নিবারণ করতেন। দিনেরাতে একবারের বেশী আহারের নিয়ম ছিল না। অগ্নি এবং কাঞ্চন স্পর্শ করা নিয়মবিরুদ্ধ ছিল।

একদণ্ডিন আক্ষরিক অর্থে সে সব সন্ন্যাসীদের বুঝায় যাঁরা কেবল একটি দণ্ড সর্বদাই ধারণ করে থাকতেন। অনেকে দণ্ডিন এবং একদণ্ডিন্ অর্থ একই বলে বিবেচনা করেন। তবে এ-মত সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে, কারণ দণ্ড এবং একদণ্ড বিভিন্ন বিভিন্ন অর্থে একই স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। দণ্ডী সন্ন্যাসী জীবনের প্রথমাধ্যায়ে গ্রহণ করা হতো; অপর পক্ষে একদণ্ডী তার অগ্রবর্তী অধ্যায় যে সময় দণ্ড ব্যবহৃত হতো সন্ন্যাসীর নিত্যসাথী হিসাবে।

সাধারণত; আক্ষরিক অর্থে ত্রিদণ্ডিন সে সব সন্ন্যাসীদের সূচিত করতো যাঁরা তিনটি দণ্ড একত্র করে হস্তে ধারণ করতেন। একদল পণ্ডিত ইহাদের শৈব সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী বলে অভিহিত করেন; অপর পক্ষে আর একদল পণ্ডিত মনে করেন ইহারা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত। এই সকল একাধিক দণ্ডধারী পরিব্রাজকগণ শিখা ব্যতীত সমস্ত মস্তক মুণ্ডন, গৈরিকবাস পরিধান, গলদেশে তুলসীকণ্ঠ ও কমলবীজের মালা এবং যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করতেন। আচার ব্যবহার, বিবিধ-নিয়ম এবং অন্যান্য ক্রিয়াকর্ম সমস্তই প্রায় দণ্ডীদের অনুরূপ ছিল।

খৃষ্টীয় ছয়-সাত শতকের লেখা ভট্টিকাব্য বা রাবণ বধ কাব্য থেকে আমরা ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসীদের অতিচমৎকার বিবরণ পাই [৫ম অধ্যায়, শ্লোক ৬১—৩]। মাথায় শিখি—হাতে কমণ্ডলু ও মাথার খুলি, পারিধানে কৌপিন এবং দণ্ড ধারণ করে ভ্রাম্যমাণ অবস্থায় সন্ন্যাসীদের বিভিন্ন স্থানে দেখা যায়। মল্লিকনাথ মন্তব্য করেন এই সকল সন্ন্যাসীগণ হলেন শৈব সম্প্রদায়ভুক্ত যেহেতু এদের মাথায় শিখি আছে—বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসীদের মাথায় শিখি থাকে না:

"দণ্ডবান্ ত্রিদণ্ডীত্যর্থঃ। অতএব। শিখীত্যুক্তম্, একদণ্ডিনঃ শিখাভবৎ"। সুতরাং শৈব-বৈষ্ণব সকল সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীগণের মধ্যে ত্রিদণ্ডী পর্যায় ছিল। শৈব-ত্রিদণ্ডিগণের শিখি থাকতো এবং বৈষ্ণব ত্রিদণ্ডিগণের থাকতো না।

শ্রীহর্ষবিরচিত "নৈষধেয় চরিতম্" গ্রন্থ থেকেও আমরা ত্রিদণ্ডী শ্রেণী পরিব্রাজকগণের উল্লেখ পেয়ে থাকি। ডাঃ জানি গ্রন্থসম্পাদনার সময় বলেছেন

"গ্রন্থে পাশুপত এবং শৈব শ্রেণীর উল্লেখ পাই"; এবং পাশুপত 'সম্প্রদায় ত্রিদণ্ড নামে অভিযুক্ত যেহেতু তাঁরা তিনটি দণ্ড একত্রে ব্যবহার করতেন [A critical Study of Sri Harsa's "Naisadheya Caritam"] সুতরাং এই গ্রন্থরচনাকালে পাশুপত ধর্মসম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের ভিতর যে ত্রিদণ্ডের প্রচলন ছিল সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ।

ধর্মসূত্রানুযায়ী ব্রহ্মচারীদের পক্ষে কাষ্ঠময় দণ্ডব্যবহার করা ছিল অপরিহার্য এবং গুরুগৃহে প্রবেশের পূর্বে দণ্ড পরিত্যাগ করার বিধি ছিল। মনুসংহিতার বিভিন্ন অধ্যায়ে এই দণ্ডিন ত্রিদণ্ডিনদের কথা বলা হয়েছে। কোন্ কোন্ সন্ন্যাসী কিরূপ পরিমাপের দণ্ড ব্যবহার করবেন মনু তার একটি বিশদ বিবরণ তাঁর সংহিতার মধ্যে দিয়েছেন। মনুর মতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই বর্ণত্রয় উপনয়নকালে দণ্ড ধারণ করবেন—তদনুসারে ব্রাহ্মণ বিল্ব ও পলাশের, ক্ষত্রিয় বট ও খদিরের এবং বৈশ্য পিলু ও উডুম্বর কাষ্ঠ নির্মিত দণ্ডধারণ করবেন। ব্রাহ্মণের দণ্ডের পরিমাপ হবে কেশান্ত পর্যন্ত; ক্ষত্রিয়ের ললাট পর্যন্ত, বৈশ্যের নাসিকা পর্যন্ত। মনুর ভাষায়:

ব্রাহ্মণোবৈল্বপালাশৌ ক্ষত্রিয়ো বাটখদিরৌ।
পৈলবৌডুম্বরৌ বৈশ্যে দণ্ডানর্হন্তি ধর্মতঃ॥
কেশান্তিকো ব্রাহ্মণস্য দণ্ডঃ কার্যাঃ প্রমাণতঃ।
ললাটসম্মিতো রাজ্ঞঃ স্যাত্তু নাসান্তিকো বিশঃ॥
[মনুসংহিতা, দ্বিতীয় অধ্যায়, শ্লোক ৪৫-৪৬]

পরবর্তী শ্লোকদ্বয়ে মনু এই সকল দণ্ডীদের বৈশিষ্ট্যের কথা অতিসুনিপুণ ভাবে আলোচনা করেছেন। যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিশাস্ত্রের মধ্যেও আমরা দণ্ডীদের কথা জানতে পারি। গোভিল (২,১০,১১) এবং আশ্বলায়ন (১,১৯,১৩; ১,২০,১) গৃহ্যসূত্রের ভিতর দণ্ডের পরিমাপ, ব্যবহার এবং তদ্ সম্পর্কিত বিবিধ বিবরণ পেয়ে থাকি।

সূত্র ও শাস্ত্র যুগের পূর্বেও যে দণ্ডী অর্থে সন্ন্যাসী বা পরিব্রাজক শ্রেণীকে সূচিত করতো সে-বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না, কারণ খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রখ্যাত ভাষ্যকার পতঞ্জলি বলেছেন 'ধূম দেখিয়া যেমন অগ্নির কথা থেকে সহজেই অনুমেয় যে সকল সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী বা পরিব্রাজকদের প্রতীক চিহ্ন হিসাবে ব্যবহৃত হ'ত দণ্ড।

খৃঃপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর বৈয়াকরণিক পাণিনির 'অয়ঃশূলদণ্ডা জিনাভ্যাং ঠক্‌ঠঞৌ' [পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী, ৫,২,৭২,] সূত্রানুসারে আমরা দণ্ডের উল্লেখ পাই। পতঞ্জ'ল উক্ত সূত্রের ভাষ্যকালে সুস্পষ্টভাবে শিবভক্তদের নামোল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে শিবভাগবতগণই অয়ঃশূলিক অর্থাৎ লৌহত্রিশূলধারী। দণ্ডাজিনক কথাটির উপর কোন মন্তব্য না করলেও মূলসূত্রে দণ্ডাজিন কথাটি থাকায় শিবভাগবতরাই যে দণ্ডাধারী ও পশুচর্ম পরিধানকারী ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে ডাঃ বাসুদেবসরণ আগরওয়াল [India as known to panini] এবং ডাঃ সুধাকর চট্টোপাধ্যায় [Evolution of Theistic Society in Ancient India] গ্রন্থদ্বয়ে যে আলোচনা করেছেন তা সুচিন্তিত এবং প্রণিধানযোগ্য।

পাণিনির অপর একটি সূত্রে "মস্কর-মস্করিণৌ বেণুপরিব্রাজকয়োঃ [পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী, ৬, ১, ১৫৪] থেকে সিদ্ধান্ত করা হয় যে সে সময় এক-শ্রেণীর সন্ন্যাসী বা পরিব্রাজক ছিলেন যাঁরা বংশদণ্ড ধারণকরে যথেচ্ছ ঘুরে বেড়াতেন। সূত্রটির ভাষ্য-কালে পতঞ্জলি মন্তব্য করেছেন যে বংশদণ্ডধারী ভিক্ষুপরিব্রাজকগণ বলে থাকেন "মা কৃতকর্মাণি মা কৃত কর্মাণি শান্তিবঃ শ্রেয়সীত্যাহাতো মস্করী পরিব্রাজকঃ"। সুতরাং এই মস্করি পরিব্রাজক বা সন্ন্যাসীর দল যে সেই সময় থেকেই দণ্ডের ব্যবহার প্রচলিত রেখেছেন সে বিষয়ে অনুমান করা যায়।

বাণভট্টরচিত "হর্ষচরিত" গ্রন্থে "মস্করিণ" শব্দ সন্ন্যাসী বা পরিব্রাজক শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে। এই মস্করিণ সাধারণতঃ বংশদণ্ড সঙ্গে রাখতেন। গ্রন্থটি অধ্যয়নকালে জানা যায় যে বিখ্যাত শৈবাচার্য ভৈরবাচার্যের কাছ থেকে তাঁরই একশিষ্য পুষ্যভূতি রাজসভায় দূতহিসাবে উপস্থিত হয়েছিলেন—গ্রন্থে তিনি মস্করিণ নামে অভিহিত।

সুতরাং অনুমানকরা ভুল হবে না যে আগত দূত ছিলেন শৈব মস্করিণ বা সন্ন্যাসী [হর্ষচরিত, ফুরার সম্পাদিত. পৃঃ ১৫২-৫৩]। হর্ষবর্ধনের পিতা প্রভাকর বর্ধনের সময়ও এই মস্করিণ সন্ন্যাসীগণ রাজসভায় উপস্থিত হতেন। এর থেকে অনেকে অনুমান করে থাকেন যে বংশদণ্ডধারী মস্করিণ সন্ন্যাসীগণ এবং শৈব সন্ন্যাসী এক ও অভিন্ন। অপরপক্ষে 'জানকীহরণ' কাব্যে কুমারদাস মস্করিণ এবং আজীবিকদের অভিন্ন বলে বর্ণনা করেছেন [জানকী-হরণ ; ১০।৭৬]। উৎপল নামক দশম শতাব্দীর এক ভাষ্যকার আবার আজীবিক এবং একদণ্ডিনদের এক মনে করেন। কোন কোন পণ্ডিত মনে করে থাকেন যে আজীবকগণ ছিলেন 'নারায়ণ পূজক'। অপরদিকে অধ্যাপক জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সিদ্ধান্ত করেন যে আজীবকগণ "এক শ্রেণীর শিব পূজক ছিলেন" [পঞ্চোপাসনা, পৃঃ ১৫২]

ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাধবাচার্যের গোষ্ঠীকেও একদণ্ডিন বলে বর্ণনা করা হয়েছে। দক্ষিণ ভারতের পাণ্ড্যরাজাদের সময়ে একদণ্ডিন-ত্রিদণ্ডীন প্রভৃতি শ্রেণীর পরিচয় পাওয়া যায়। বিভিন্ন গ্রন্থে দণ্ডী-একদণ্ডী ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসীদের ভিন্ন ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। বিষ্ণুধর্মোত্তর গ্রন্থ থেকে জানা যায় সূর্যদেবতার বামপার্শ্বস্থ অনুচর দণ্ডধারী ছিলেন এবং তিনি দণ্ডী নামে পরিচিত। প্রত্নতত্ত্বগত নিদর্শনও আমাদের সিদ্ধান্তকে আরও সুদৃঢ় করে। এবং এর থেকে অনুমান করা ভুল হবে না যে সৌর সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের ভিতরও দণ্ডের প্রচলন ছিল। আজীবিকদের ভিতর দণ্ডের ব্যবহার প্রচলিত ছিল সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা দণ্ডের ব্যবহার জানতেন এবং সন্ন্যাসজীবনে দণ্ডের প্রচলন অপরিহার্য ছিল।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে একথা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে এই তিনটি শব্দ কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী বা তিনটি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হ'ত না। ইহার প্রচলন প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের মধ্যেই নিহিত ছিল। এ সম্পর্কে পাশ্চাত্ত্য জগতের এক দার্শনিকের মন্তব্য মনোজ্ঞ :

"There is danda or staff held in the defence against evil spirit, much the dorje (or vajra) is used by the Northen Buddhist monks, This mystical staff is a bamboo with six knots, possibly symbolical of six ways (gati) or states of life through which it is belived that every being may have to migrate—a belief common to both Brahmanism and buddhism [sir Monier Williams, Buddhisim Preface-xiii]

সুতরাং দণ্ডিন-একদণ্ডিন-ত্রিদণ্ডিন শব্দগুলির উচ্চারণের সাথে সাথেই আমরা প্রথমে সব সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী এবং দ্বিতীয়তঃ সেই সন্ন্যাসীদের বিভিন্ন পর্যায় বা অধ্যায় (grade) বুঝি। বার্থ-এর [Religion of India]মন্তব্য এ বিষয়ে স্মরণীয়। তাঁর মতে ত্রিদণ্ডী আক্ষরিক অর্থে তিনটি দণ্ডের সমাহার, সন্দেহ নাই কিন্তু বিশেষ অর্থে ইহা সেই সবসন্ন্যাসীদের সূচিত করতো যাঁরা তপশ্চর্য-কালীন বাক্, চিন্তা এবং কর্মের উপর সংযম রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছেন। বিভিন্ন কৃচ্ছ্রসাধনের তপশ্চর্যায় সিদ্ধিলাভেরপথের অন্তরায়গুলিকে মাধ্যমে অতিক্রম করতে হয়। মনে হয় দণ্ডী-একদণ্ডী-ত্রিদণ্ডী হ'ল তপশ্চর্যা বা কৃচ্ছ্রসাধনের এক একটি পর্যায় বা অধ্যায়ের বাহ্যিক প্রকাশ। যে কোন সন্ন্যাসী বা পরিব্রাজক ইচ্ছা করলেই যে কোন দণ্ড ব্যবহার করতে পারতেন না।

ত্রিদণ্ডিন সন্ন্যাসীদের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মনু উল্লেখ করেছেন—যিনি জ্ঞানবলেকায়মনোবাক্যদমন করতে পারেন তিনিই ত্রিদণ্ডিন। দণ্ডত্রয় ধারণ করলেই ত্রিদণ্ডীন হওয়া যায় না। কাম, ক্রোধ প্রভৃতি রিপু-গুলিকে সংযত করে সর্বভূতে যিনি এই ত্রিদণ্ডের প্রকৃত মর্যাদা রক্ষা করে চলেন,তিনি যথার্থ ত্রিদণ্ডিন এবং সাধনায় সিদ্ধি-লাভে অধিকারী।

বাগ্দণ্ডোঽথ মনোদণ্ডঃ কায়দণ্ডাস্তথৈব চ।
যস্যৈতে নিহিতা বুদ্ধৌ ত্রিদণ্ডীতি স উচ্যতে ॥
ত্রিদণ্ডমেতন্নিক্ষিপ্য সর্ব্বভূতেষু মানবঃ।
কামক্রোধৌ তু সংযম্য ততঃ সিদ্ধিং নিযচ্ছতি ॥"

[মনুসংহিতা : দ্বাদশ অধ্যায়, শ্লোক-১০-১১

সুতরাং তপশ্চর্যার ক্ষেত্রে দণ্ডী একদণ্ডী ত্রিদণ্ডী

সাধনার পর্যায়গুলিকে বুঝানোর জন্য। পূর্ববর্তীর তুলনায় পরবর্তীটি অপেক্ষাকৃত শ্রেয় এবং প্রত্যেক সন্ন্যাসীর ঈপ্সিত। তবে যতদিন না ত্রিদণ্ডীন সাধনায় উপনীত হওয়া যায় এবং সে ক্ষেত্রে সিদ্ধি লাভ করা যায়, ততদিন প্রত্যেক সন্ন্যাসী অন্ততঃ একটি দণ্ড ধারণ করে থাকবেন—"যাবপ্লস্যুস্ত্রয়ো দণ্ডাস্তাবদেকেন "[মেধাতিথি]। ব্রহ্মচর্য গ্রহণের সাথে সাথেই গুরুর নিকট থেকে দণ্ড গ্রহণ করে স্বীয় তপশ্চর্যার দ্বারা পরবর্তী সন্ন্যাস-জীবনে দণ্ডী একদণ্ডী ত্রিদণ্ডী পর্য্যায় বা অধ্যায়ের সিদ্ধি লাভ করাই ছিল প্রত্যেক সাধকের সাধনার ফল। যোগ সাধনার বিভিন্ন পর্য্যায়ের ন্যায় সন্ন্যাসজীবনের এগুলি হল বিভিন্ন পর্য্যায় বা অধ্যায়।

ত্বং হি দুর্গা দশ প্রহরণ ধারিণী

কাব্যশ্রী যদুপতি ঘোষ।

এস মুক্ত ভারত আনন্দমঠে দশ প্রহরণ ধারিণী
পূর্ণ বিভূতি প্রকাশ প্রভায় ভুবন মানস হারিণী।
সংহরি তব আভরণহীন দৈন্য মলিন মূরতি
জাগো আজি রাজ রাজেশ্বরী—সঙ্গে কমলা
ভারতী।
দশ দিগন্ত আলো করা রূপ নিহারি নয়ন
ভরি মা
ধুয়ে মুছে যাক্ পতন দিনের ভ্রান্তি ক্লৈব্য জড়িমা।
তব প্রসন্ন নয়নের তলে লভিয়া শকতি জাগরণ
শত গৌরব ক্ষুরধার পথে আমরা করিব বিচরণ।
বিশ্ব ভুবন বিস্ময়ভরে মোদের উদয় হেরিবে
ইতিহাস পুনঃ স্বর্ণাক্ষরে কীর্ত্তি কাহিনী ভরিবে।
ঋষি বঙ্কিম রচিয়াছে মহা দেশ মাতৃকা তন্ত্র,
মাতৃ সাধনে জাতিরে দিয়াছে মহান্ দীক্ষামন্ত্র।

মুক্ত ভারতে ধর মা ঋষির ধ্যানের সে মহা
মূরতি
ভারতের যত সন্তান করি পুজা অর্চ্চনা আরতি।
আজি আসাগর হিমাচল ভরি ভারত পুত্রকন্যা
বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের জাগাও নিনাদ-বন্যা।
বোধন মন্ত্রে প্রাণমন ঢালি—মুক্তি দীপ্ত শরতে
দশ প্রহরণ ধারিণীরে আনো আনন্দমঠভারতে।
যাঁহার বিভূতি জ্ঞানে বিজ্ঞানে ধরমে এবং করমে
শরীরেতে প্রাণ বাহুতে শক্তি শ্রদ্ধা ভকতি
মরমে,
তাঁরই দেওয়া তাঁর সম্পদ ভরি হৃদয়ে-অর্ঘ্য
থালিকায়—
প্রণমি 'বন্দেমাতরম্' বলি নিবেদিব তাঁর রাঙ্গা
পায়।

দ্বিচারিণী
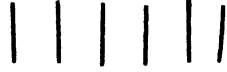
[নাটিকা]

নাট্যকার—মন্মথ রায়

মুখবন্ধ। এই নাটিকাটি বেতাল পঞ্চবিংশতি নামক সুপ্রাচীন উপকথা গ্রন্থের ৬ষ্ঠ উপাখ্যানকে ভিত্তি করে রচিত।

উপাখ্যানটি বিশ্বসাহিত্যে অপরিচিত নয়। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্ববিখ্যাত জার্মান ঔপন্যাসিক টমাস মান এই উপাখ্যানের ছায়ায় রচনা করেছেন তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থ "The Transposed Heads—A Legend of India." আমেরিকাতেও এ গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

বর্তমান নাটিকাটি কিন্তু বেতাল পঞ্চবিংশতি—মূল উপাখ্যানকেই অনুসরণ করেছে—অন্য কোনো গ্রন্থকে নয়।—লেখক]

চরিত্র—পুরোহিত, বসুবন্ধু, দীনদাস, মহেশ, সুবসনা।

॥ ১ ॥

[ধর্মপুর নগরে কাত্যায়নীর মন্দির। পুরোহিত পূজারত। ঘণ্টা বাজিতেছে। চণ্ডীপাঠ হইতেছে।]

"সর্বস্বরূপে সর্বেশে সর্বশক্তিসমন্বিতে।
ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি দুর্গে দেবি নমোঽস্তুতে॥
এতৎ তে বদনং সৌম্যং লোচন ত্রয়ভূষিতম্॥
পাতু নঃ সর্বভূতেভ্যঃ কাত্যায়নি নমোঽস্তু তে॥"

পুরোহিত। বৎস বসুবন্ধু! দেবীকে প্রণাম কর।

বসুবন্ধু। এতৎ তে বদনং সৌম্যং
লোচনত্রয়ভূষিতম্।
পাতু নঃ সর্বভূতেভ্যঃ
কাত্যায়নি নমোঽস্তু তে॥

পুরোহিত। এই কাত্যায়নী দেবী তোমারই পিতা রাজা ধর্মশীল কর্তৃক এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হন। তাতেই অপুত্রক রাজা তোমার মত পুত্ররত্ন লাভ করে ধন্য হন। খুবই জাগ্রত এই মহাশক্তি।

বসুবন্ধু। পিতার নিকট আমি তা অবগত আছি পুরোহিত ঠাকুর।

পুরোহিত। আগামী মহাষ্টমীতে তোমার বিংশ জন্মতিথি। রাজা ধর্মশীল পুত্র কামনাকালে দেবীর নিকট মানত করেছিলেন, তোমার ঐ বিংশ জন্মতিথি উৎসবে দেবী কাত্যায়নীকে ষোড়শোপচারে পূজা করবেন। তোমার পিতাকে তা স্মরণ করিয়ে দিয়ো বৎস।

বসুবন্ধু। পিতার তা স্মরণ আছে। আপনাকেই তা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য তিনিই আমাকে পাঠিয়েছেন এই মহাবনে।

পুরোহিত। দেবীর নিকট মানত—কোনো পুরোহিত বিস্মৃত হয় না বৎস। তবুও আমি প্রীত হয়েছি এইজন্য যে এই উপলক্ষ্যে তোমার নবযৌবন শ্রীমণ্ডিত মুখপদ্ম নিরীক্ষণ করতে পারলাম। তোমার সঙ্গে এই যুবকটি কে?

বসুবন্ধু। দীনদাস। আমার অভিন্নহৃদয় বন্ধু।

পুরোহিত। যদিও সুলক্ষণযুক্ত, কিন্তু তোমার সমশ্রেণী বলে বোধ হচ্ছে না তো!

বসুবন্ধু। জাতিতে তাঁতী। তন্তুবায় কার্যে দীনদাসের অসাধারণ দক্ষতা।

পুরোহিত। কিন্তু তাই বলে—

বসুবন্ধু। পাঠশালায় আমরা একই গুরুর কাছে পড়াশোনা করেছি। সূর্য সাক্ষী রেখে আমরা উভয়ে বন্ধুত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছি। আপনি দীনদাসকেও আশীর্বাদ করুন পুরোহিত ঠাকুর।

পুরোহিত। আশীর্বাদ আমি করছি, কিন্তু বন্ধুত্ব হওয়া উচিত সমানে সমানে. তোমাদের এ বন্ধুত্ব অসম। পরিণাম কি, পরিণাম প্রদায়িনী মা কাত্যায়নীই জানেন।

'সৌম্যানি যানি রূপাণি ত্রৈলোক্যে বিচরন্তি তে।
যানি চাত্যন্তঘোরাণি তৈরক্ষাস্মাংস্তথা ভুবম্।
খড়্গশূলগদাদীনি যানি চাস্ত্রাণি তেঽম্বিকে।
কর পল্লবসঙ্গীনি তৈরস্মান্ রক্ষ সর্বতঃ।'

॥ ২ ॥

[তন্তুবায় দীনদাসের গৃহ। দীনদাস এবং বসুবন্ধু। দীনদাস তাঁত চালাইতেছিল।]

বসুবন্ধু। বন্ধু, বৃথাই তুমি এত সুন্দর নীলাম্বরী শাড়িটি তৈরী করলে। এমন কোনো সুন্দরী আজ পর্যন্ত চোখে পড়লো না, যাকে এ শাড়ি মানায়।

দীনদাস। তা যদি বলো বন্ধু, দোষ আমার নয়, দোষ তোমার।

বসুবন্ধু। কেন? কেন বন্ধু?

দীনদাস। শাড়িটি বুনেছি আমি বটে, কিন্তু এর রং এর সুতো—এর সবই বেছে দিয়েছিলে তুমি। থাক্ তোলা—তোমার বৌ এসে পড়বে।

বসুবন্ধু। বৌ হয়তো কোনদিনে আসবে, কিন্তু এই শাড়ি পরবার মতো সুন্দরী যদি সে না হয়, এ শাড়ি সে পাবেনা। হ্যাঁ বন্ধু, ও শাড়ি তুমি সিন্ধুকে তুলেই রাখো শাড়ির যোগ্য সুন্দরী না পেলে ও শাড়ি তোলাই থাকবে এই থাক আমাদের দু'জনের প্রতিজ্ঞা।

দীনদাস। বেশ, তাই হবে। ঐ রইল আমাদের প্রতিজ্ঞা।

[উভয়ের উচ্চহাস্য]

বসুবন্ধু। এই দীনদাস, এসো একটা কাজ করা যাক।

দীনদাস। কি বন্ধু!

বসুবন্ধু। ঐ শাড়িটা বগলে নিয়ে, চলো, তুমি আর আমি দেশভ্রমণে বেরিয়ে পড়ি, তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াই।

দীনদাস। খুঁজে বেড়াই, কোথায় কে সেই তিলোত্তমা যাকে মানাবে আমাদের এই শাড়ি। বাঃ চমৎকার! আমি রাজি। চলো, দুর্গা বলে বেড়িয়ে পড়ি।

[ঠাকুর্দাসহ ষোড়শী সুবসনার প্রবেশ]

ঠাকুর্দা। দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়বে কিহে? আমরা যে শাড়ি কিনতে এলাম।

দীনদাস। আসুন, আসুন আপনাকে যেন কোথায় দেখেছি।

ঠাকুর্দা। তা দেখবে না কেন? আমি তোমাদের পাশের গাঁয়ের মহেশ তাঁতী। এককালে আমিও খুব ভালো কাপড় তৈরী করতাম হে। রাজবাড়ীতেও আমার তৈরি শাড়ি যেতো। এমন বুড়ো হয়ে পড়েছি। একটা মাত্র ছেলে ছিল। এই মেয়েকে রেখে সেও অকালে চলে গেল। এখন এই মহেশ তাঁতীকেও শাড়ি কিনে বেড়াতে হয় আমার এই সুবসনার বসনের জন্য।

বসুবন্ধু। সুবসনা!

ঠাকুর্দা। হ্যাঁ সুবসনা। ওর বাপই নাম রেখে গেছে। তা সুবসনার কি একটি সুবসন এখানে মিলবে?

সুবসনা। দাদু, এই নীলাম্বরীটা আমি নেব। আঃ, কি সুন্দর!

ঠাকুর্দা। না না, ও শাড়ির অনেক দাম। ও সব শাড়ি রাজকন্যারা—রাণীরা পরে। তুই তাঁতীর মেয়ে, ও শাড়ি তোর জন্য নয়। ঐ যে ওধারে আরো কত রং-বেরংয়ের সস্তা শাড়ি রয়েছে। এদিকে আয়—একটা বেছে নে।

বসুবন্ধু। কি বন্ধু কি ভাবছো?

দীনদাস। তুমিও কিছু কম ভাবছো বলে মনে হচ্ছেনা।

বসুবন্ধু। তুমি যেন গিলছো, আমার জন্যে কিছুটা রেখো।

সুবসনা। (দূর হইতে) না দাদু, এসব শাড়ি-একটাও পছন্দ হচ্ছে না।

বসুবন্ধু। (সোৎসাহে) বেশ তো, বেশ তো?

দীনদাস। বেশ তো বলছো যে? দেশ-ভ্রমণের-কি হলো?

বসুবন্ধু। দেশ-দেশান্তরে যাকে খোঁজবার কথা, মনে হচ্ছে সে তোমার ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে দীনদাস।

দীনদাস। অ্যা!

বসুবন্ধু। হ্যাঁ। এই শাড়ি পরবার জন্যই যেন এ মেয়ে জন্মেছে।

সুবসনা। না না ঐ শাড়িটাই আমি নেব। ঐ নীলাম্বরী—

ঠাকুর্দা। শোন্, শোন্।

সুবসনা। কি আবার শুনবো? ঐ নীলাম্বরী আবার চাই।

ঠাকুর্দা। আরে খেপে গেলি যে। রাজবাড়ির-শাড়ি তোকে মানাবে কেন?

বসুবন্ধু। না, তা মানাবে। তুমি কি বলো বন্ধু?

দীনদাস। হ্যাঁ, মানাবে নিশ্চয়ই। তবে কিনা— তাঁতীর মেয়ে তো। বড়জোর—ঐ এক বিয়ের রাতেই পরতে পারবে। (ঠাকুরর্দাকে) আপনার এই নাতনীর বিয়ে দেবেন নাকি?

ঠাকুর্দা। সে তো কবে থেকে ভাবছি! কিন্তু হতচ্ছাড়ী মেয়েটির চোখ দুটো বড় উঁচু, কোন পাত্রই মনে ধরেনা। তা আমি বলি আকাশের চাঁদ দেখাতেই ভালো, ধরা যায় না। আছে নাকি তেমন কোন পাত্র?

বসুবন্ধু। কেন থাকবে না? আপনারা বাড়ি যান, পাত্রের খোঁজ ঘরে বসেই পাবেন। আর এ শাড়ি—

দীনদাস। হ্যাঁ তোলা রইলো। বিয়ের রাতেই আমরা ওকে উপহার দেব।

ঠাকুর্দা। বাঁচালে ভাই। এ যেন রথ দেখা আর কলা বেচা এক সঙ্গেই হয়ে গেল। এই সুবসনা, হ্যাঁ করে ওদের মুখের দিকে কি দেখছিস? চল, বাড়ি চল… ওকি দাঁড়িয়ে পড়লি যে। এত দেরী করলে ওদিকে মা কাত্যায়নীর মন্দির বন্ধ হয়ে যাবে। দেবী দর্শন হবে না।

সুবসনা। ও হ্যাঁ…চলো।

[সুবসনাকে লইয়া ঠাকুর্দার প্রস্থান। তাহাদের পদশব্দ মিলিয়া যাইতেই।]

বসুবন্ধু। তুমি আমার বিয়ের কথা বলেছিলে না বন্ধু। এই মেয়ে পেলে আমি বিয়ে করি।

দীনদাস। বেশ তো, তবে কথা পড়ি।

বসুবন্ধু। হ্যাঁ, পাড়ো।

দীনদাস। তাঁতীর মেয়ে বলে তোমার আপত্তি নেই?

বসুবন্ধু। স্ত্রী রত্নং দুষ্কুলাদপি। আমার মন আর মানছে না। পিতার অনুমতি পেলে একসঙ্গে দুই উৎসব জন্মতিথি আর শুভ বিবাহ।

দীনদাস। বলো কি?

বসুবন্ধু। হ্যাঁ।

[ঘোড়া ছুটাইয়া বসুবন্ধু চলিয়া গেল।]

॥ ৩ ॥

[কাত্যায়নী দেবীর মন্দির। শঙ্খ ঘণ্টা সহযোগে আরতি। ঠাকুরর্দা, সুবসনা, পুরোহিত।]

পুরোহিত। এই কাত্যায়নীই ব্রজের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ব্রজাঙ্গনাগণ মনোমত পতিলাভের জন্য এঁরই আরাধনা করতেন। ব্রজকুমারীগণ প্রার্থনা করতেন—

কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।

নন্দগোপ সুতং দেবী পতিং মে কুরুতে নমঃ॥

কিনা, হে কাত্যায়নি, নন্দগোপপুত্র কৃষ্ণকে আমার পতি কর।' আশীর্বাদ করছি—কি যেন এর নাম মহেশ?

ঠাকুর্দা। সুবসনা।

পুরোহিত। সুবসনা, কৃষ্ণের মতই তোমার পতি হোক। প্রণাম কর।

এতৎ তে বদনং সৌম্যং লোচনত্রয়ভূষিতম্।

পাতু নঃ সর্বভূতেভ্যঃ কাত্যায়নি নমোঽস্তুতে॥

যাক্ আর একটু বিলম্ব হলে আজ আর দেবী দর্শন হতো না। আমি এবার দরজা বন্ধ করছি। [পুরোহিত দরজাবন্ধ করিয়া চলিয়া গেলেন।]

ঠাকুর্দা। আর ভাবনা কিরে খেপি, কৃষ্ণের মতো তোর বর হবে। হবেরে হবে। দেখে নিস্। জাগ্রত দেবী।…রোদের যা তাপ দেখছি, বেলা না পড়লে বাড়ি রওনা হতে পারবোনা। তুই এখানে বোস, আমি বিশ্রামের একটা জায়গা খুঁজছি।

[ঠাকুর্দা জায়গা খুঁজিতে গেল]

সুবসনা। কৃষ্ণের মত বর! কৃষ্ণ ছিলেন গোয়ালা, আমরা তো তাঁতী!

[দীনদাসের প্রবেশ]

দীনদাস। যাক, দেখা তবে পেলাম। তোমার ঠাকুর্দা কোথায় সুবসনা।

সুবসনা। বিশ্রামের জায়গা খুঁজতে গেছেন। তা' হঠাৎ আবার এখানে; শাড়িটা দিতে এসেছো নাকি?

[দীনদাস উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল]

সুবসনা। চুপ। অতজোরে হেসোনা। দাদু কাছেই আছে। কেন এসেছো?

দীনদাস। ছুটতে ছুটতে এসেছি। বলছি।

সুবসনা। আচ্ছা, ও শাড়িটা কার? তোমার না সেই লোকটার?

দীনদাস। সেই লোক কাকে বলছো?

সুবসনা। ঐ যে তোমার সঙ্গে ছিলো। তুমি যেমন কালো সে তেমনি ফর্সা।

দীনদাস। আরে সে তো আমার বন্ধু। এ দেশের রাজপুত্র। নাম বসুবন্ধু।

সুবসনা। এ দেশের রাজপুত্র তোমার বন্ধু?

দীনদাস। হ্যাঁ, দেখলে না?

সুবসনা। তাঁতীর ছেলে হলে হবে কি, তুমি তো তবে কম লোক নও। তোমার নাম?

দীনদাস। দীনদাস।

সুবসনা। কিন্তু তোমার চেহারাটা তো দাসের মত নয়।

দীনদাস। তবে কার মত?

সুবসনা। বাঘের মত।

[দীনদাস হাসিয়া উঠিল]

সুবসনা। চুপ! অত জোরে হেসো না। দাদু কাছেই আছে। শাড়িটা কার, তোমার না বন্ধুর?

দীনদাস। বুনেছি আমি রং আর সুতো বেছে দিয়েছে বন্ধু।

সুবসনা। কিন্তু কার জন্যে?

দীনদাস। এখন তো মনে হচ্ছে তোমারই জন্যে। এই, শোন ঐ রাজপুত্র তোমাকে বিয়ে করতে চায়?

সুবসনা। বলো কি?

দীনদাস। হ্যাঁ। তোমার দাদুর কাছে আমি সেই প্রস্তাব নিয়েই এসেছি।

সুবসন। হবে না।

দীনদাস। হবে না? কেন?

সুবসনা। মা কাত্যায়নী আমাকে বর দিয়েছেন।

দীনদাস। কী বর?

সুবসনা। আমার বর হবে কৃষ্ণের মত। তোমার মত।

দীনদাস। বল কি?

সুবসনা। হ্যাঁ গো। তা না হলে হয় তো এ রাজপুত্রই আমার বর হতো।

[নেপথ্য হইতে ঠাকুর্দা ডাকিল।]

ঠাকুর্দা। এই সুবসনা, ঝোলা ঝুলি নিয়ে এদিকে আয়।

সুবসনা। ঐ দাদু মন্দিরের পেছনে থেকে আমাকে ডাকছেন। তুমি যাবে না?

দীনদাস। তুমি এসো, আমি যাচ্ছি।

সুবসনা। এসো কিন্তু।

(সুবসনা চলিয়া গেল)

দীনদাস। মা কাত্যায়নী, শুনেছি তুমি খুব জাগ্রত দেবী। দয়া করে ঐ সুবসনাকে একটি বছরের জন্য আমাকে দাও। হ্যাঁ, তোমার মন্দিরে দাঁড়িয়ে আজ আমি মানত করছি, তা যদি দাও, বিয়ের একটি বছর যেদিন পূর্ণ হবে আমার নিজের মুণ্ড নিজ হাতে কেটে তোমার পায়ে রাখবো। প্রার্থনা আমার পূর্ণ করো মা।

দৈববাণী। তথাস্তু।

॥ ৪ ॥

[দীনদাসের গৃহ। দীনদাস ও সুবসনা। দীনদাস তাঁত চালাইতেছিল।]

দীনদাস। সুবসনা! সুবসনা!

[সুবসনা দূর হইতে উত্তর দিল।]

সুবসনা। যাচ্ছি।

[সুবসনার প্রবেশ]

সুবনসা। কি গো, এত চেঁচামেচি কেন?

দীনদাস। কোথায় থাকো বলো তো?

সুবসনা। আমার কেষ্টকে ঘাস খাওয়াছিলাম।

দীনদাস। কেষ্ট, কেষ্ট, সারাদিন ঐ কেষ্ট। আমার কি মনে হয় জানো?

সুবসনা। কি?

দীনদাস। আমি যদি দীনদাস না হয়ে ছাগশিশু ঐ কেষ্ট হতাম, অনেক বেশী আদর পেতাম আমি তোমার। রীতিমত হিংসা হয় আমার। ওকে নাওয়াচ্ছো, খাওয়াচ্ছো, বুকে নিয়ে ঘোরা-ফেরা করছো—অথচ আমি তোমার স্বামী, আর ওটা হল কিনা একটা পাঁঠা।

সুবসনা। (হাসিয়া) আমার বাপের বাড়ির ঐ একটা মাত্র চিহ্ন, তাও তোমার সহ্য হয় না? সত্যি তুমি বড় হিংসুটে। তোমার বন্ধু রাজপুত্রটি কিন্তু খুব উদার।

দীনদাস। কেন? কেন?

সুবসনা। তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হলো, কই তাতে তো সে তোমাকে হিংসে করে না। আসছে, যাচ্ছে, আনন্দ করছে।

দীনদাস। তা না ক'রে আর কি করবে বলো? তাঁতীর মেয়ের সাথে ছেলের বিয়ে দিতে রাজা কিছুতেই রাজি হলেন না। তাই না বন্ধু এসে আমায় বললো, সুবসনা যখন আমার হলো না, তখন তোমারই হোক। উদার না হয়ে উপায় কি?

সুবসনা। তোমরা দু'জনে প্রাণের বন্ধু। কিন্তু হলে হবে কি, তফাৎ অনেক।

দীনদাস। কি আবার তফাৎ?

সুবসনা। বলছি। ও রাজার ছেলে, তুমি প্রজার ছেলে।

দীনদাস। তা বটে।

সুবসনা। ও ধবধবে ফরসা, তুমি মিস্ কালো।

দীনদাস। মানছি।

সুবসনা। চাঁপা ফুলের মত গায়ের রং হলে হবে কি, ওর গায়ে জোর নেই। চোখে মুখে ওর বুদ্ধি খেলে খুব, কিন্তু শরীরটা যেন মাখন।

দীনদাস। আর আমার?

সুবসনা। তুমি ঠিক উল্টো। শরীরটি যেন একটি কালো পাথর। মুখখানা যেন একটা কালো মেঘ—তাতে খেলছে বিদ্যুতের ঝলক। তফাৎ নয়?

দীনদাস। কোন্‌টা ভালো?

সুবসনা। বলা শক্ত।...দুটোই ভালো। আমি কি ভাবি জানো?

দীনদাস। কি?

সুবসনা। এই দুটো মিলে যদি একটা হতো, আঃ। সেই একটা যদি আমি পেতাম!

দীনদাস। বলো কি?

সুবসনা। হ্যাঁ। চাঁপা ফুল তুমি নিশ্চয়ই ভালবাসো? মাখনও খেতে বেশ।

দীনদাস। হ্যাঁ, তা বটে, কিন্তু আমি তো পাথর!

সুবসনা। পাথরের মত যদি তোমার শরীরটা না হতো, তোমার কাছে ঘেঁষতাম না আমি। আর তোমার ঐ কালো মুখে বিদ্যুতের ঝলক আমার এত ভালো লাগে।

দীনদাস। বাঁচালে।

সুবসনা। কিন্তু তোমার মুখ, তোমার চোখ, তোমার বিদ্যা, তোমার বুদ্ধি ওর মতো সুন্দর নয়। যাক্ গে। মনের মতো তো সব কিছু হয় না। এক আধারে সব কিছু ধরে না। যেমন ঐ রাজপুত্র—

দীনদাস। কেন? কেন?

সুবসনা। রাজপুত্র যদি রাজাকে বলতো, রইলো তোমার সিংহাসন, ঐ মেয়েকেই আমি বিয়ে করবো, তবে বুঝতাম, হ্যাঁ পুরুষ বটে। জীবন আমার ধন্য হতো।

কিন্তু তা তো হল না—তাতো বললো না। হোক সুন্দর, কিন্তু কি ভীরু লোকটা।

দীনদাস। আর আমি?

সুবসনা। তোমারো কোন বাহাদুরি দেখছি না। ও নিলো না বলেই না তুমি আমাকে পেলে! হ্যাঁ বুঝতাম, যদি জীবন পণ করে তুমি আমাকে ওর হাত থেকে কেড়ে নিতে। হ্যাঁ তোমার শক্তি ছিলো, কিন্তু কতটা শক্তি তা পরখ করা হয়নি।

দীনদাস। থামো। তুমি জানো না। তোমাকে পেতে, তোমাকে কেড়ে নিতে আমি কি পণ করেছিলাম।

সুবসনা। কি পণ? কবে করলে? কার কাছে করলে? খুব বাহাদুরি হচ্ছে না?

[দরজায় রাজপুত্র আসিয়া দাঁড়াইল।]

বসুবন্ধু। আসবো?

দীনদাস। আরে, বন্ধু যে, এসো, এসো।... মাখন—মেঘ—বিদ্যুৎ!

বসুবন্ধু। সে আবার কি?

সুবসনা। অমনি আবোল-তাবোল সব সময় বকে। ওতে কান দেবেন না। আপনারা বসুন, আমি আমার কেষ্টকে জল খাইয়ে আসছি।

বসুবন্ধু। কেষ্ট ও! সেই ছাগ বৎস!

দীনদাস। হ্যাঁ বন্ধু, ঐ ছাগবৎস কেষ্টই এখন ওর প্রাণ।

সুবসনা। একটা অবলা জীব,—তার সঙ্গে হিংসে। তা বলতে কি সত্যি ও আমার প্রাণ।

বসুবন্ধু। আমারো।

সুবসনা। মানে?

বসুবন্ধু। আজ আমার বিশ বছর বয়সের জন্মতিথি।

দীনদাস। বল কি! আজ?

বসুবন্ধু। হ্যাঁ, আজ।

দীনদাস। দেখতে দেখতে তবে একটা বছর চলে গেল!

বসুবন্ধু। একটা বছর কি বলছো বন্ধু, বিশটি বছর চলে গেল।

দীনদাস। হ্যাঁ, তা গেল বটে, কিন্তু আমার বিয়েরও তবে আজই এক বছর পুরলো। আশ্চর্য, কোথা দিয়ে যে এই একটা বছর কেটে গেল, আমার খেয়ালই নেই।

সুবসনা। সেটা সত্যি। আমারো তো খেয়াল নেই। আজ তো তবে উৎসবের দিন।

বসুবন্ধু। সেই উৎসব করতেই আমি আসবো বলে রওনা হচ্ছি, এমন সময় এক নিদারুণ খবর এল কানে—

দীনদাস। কি?

সুবসনা। কি?

বসুবন্ধু। আমার বিশ বছর বয়সের জন্মতিথিতে বাবার ছিলো মানত, মা কাত্যায়নীর পুজো দেবেন ষোড়শোপচারে। কিন্তু সে পুজো হতে পাচ্ছে না।

দীনদাস। কেন?

সুবসনা। কেন?

বসুবন্ধু। বলির জন্য নিখুঁত ছাগশিশু মেলেনি একটিও। পুরোহিত বলছেন, এ নাকি এক অঘটন। এমনটি তিনি কখনো দেখেন নি, শোনেন নি। পিতা অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন—আজ যদি এই মানত পুজো না হয়, আমি নাকি আর বাঁচবো না। জীবন হানি আমার হবেই হবে।

সুবসনা। আপনি এটা বিশ্বাস করেন?

বসুবন্ধু। করি। আমি অনেক প্রমাণ পেয়েছি—খুবই জাগ্রত ঐ কাত্যায়নী দেবী।

দীনদাস। এখন উপায়?

বসুবন্ধু। সুবসনা, তুমি কি তোমার ঐ ছাগশিশু কোলে নিয়ে মন্দিরে গিয়েছিলে কোনদিন তোমার ঐ

দীনদাস। হ্যাঁ, হ্যাঁ। বিয়ের পরই পুজো দিতে গিয়েছিলাম আমরা। তোমার কোলে ছিলো ঐ কেষ্ট।

সুবসনা। পুরোহিত কেষ্টকে দেখে বলেছিলেন বটে, খুব সুন্দর; খুব সুলক্ষণ—আমার কেষ্ট। আমার যেন সেদিন মনে হয়েছিল পুরোহিত আমার কেষ্টকে দেখছেন, আর লোভে তাঁর মুখে জল আসছে। আজ বুঝি তাই—

বসুবন্ধু। হাঁ, পুরহিত তোমার কেষ্টর কথা ভোলেন নি। পিতাকে বলেছেন আমার জীবন রক্ষা করতে হলে আজকের রাতে মানত রক্ষা করতেই হবে। আর তা' করতে গেলে বলি দিতে হবে তোমার ঐ কেষ্টকে।

সুবসনা। না না, তা হবে না। কেষ্টকে আমি দেব না—আমি দেবো না।

[বলিতে বলিতে ছুটিয়া চলিয়া গেল।]

বসুবন্ধু। তুমি কিছু বলবে বন্ধু?

দীনদাস। তুমি আমার প্রাণের বন্ধু। আমি চাই তুমি বাঁচো। আমি তা ভাবছি না। আমি ভাবছি, আমার মানতের কথা।

বসুবন্ধু। তোমার আবার কি মানত?

দীনদাস। ছিলো, আমারো একটা মানত ছিলো।

বসুবন্ধু। কই বলোনি তো?

দীনদাস। না বলিনি। কাউকেই বলিনি। তোমাকে না, সুবসনাকেও না। মা কাত্যায়নী! আজ এ কী পরীক্ষা! রাজার মানত রক্ষা না হলে আমার প্রাণপ্রিয় বন্ধুর জীবন যাবে—

আমার মানত রক্ষা না হলে আমার প্রাণপ্রিয়া সুবসনার জীবন যাবে।

বসুবন্ধু। বল কি?

দীনদাস। হ্যাঁ সে ভয় আমার আছে। চুপ: সুবসনা আসছে।

[ছাগশিশু কোলে লইয়া সুবসনার প্রবেশ।

সুবসনা। এই কেষ্টকে নিয়েছি বুকে। দেখি কার সাধ্য একে কেড়ে নেয়।

দীনদাস। সুবসনা, শোনো।

দীনদাস। আজ মানত রক্ষা করার দিন। মানত রক্ষা না করলে সর্বনাশ। না, আমি ভাবতে পাচ্ছি না। ও—হো-হো।

[আর্তনাদে ছুটিয়া চলিয়া গেল। ক্ষণিক নিঃস্তব্ধতা।]

বসুবন্ধু। দীনদাস পালালো। কিন্তু আমি তো পালাতে পারছি না। আমি যে সত্যি বাঁচতে চাই। তোমাকে আমি পাইনি সুবসনা, একথা সত্য কিন্তু তবু তোমাকে ছেড়ে আমি স্বর্গে যেতেও পারবো না সুবসনা। তুমি আমার স্বর্গের চেয়েও বড়। তোমাকে দেখতে পাই বলেই, আমার এ জীবনে অত্যন্ত লোভ। তোমার বুক থেকে তুলে নিচ্ছি এই ছাগশিশু—যদি আমায় তুমি এতটুকু ভালবাসো, বাধা দিয়ো না।

[ক্ষণিক নিস্তব্ধতা]

বসুবন্ধু। তোমার বুকে ঘুমিয়েছিল আমার যে জীবন—আমি তা তুলে নিয়ে গেলাম—তুমি এতটুকু বাধা দিলে না। আমার জীবন ধন্য হলো, আমার জীবন ধন্য হলো।

॥ ৫ ॥

[কাত্যায়নী দেবীর মন্দির প্রাঙ্গণ। পুরোহিত, সুবসনা, দীনদাস এবং বসুবন্ধু। গভীর রজনী। শৃগালের ডাক শোনা যাইতেছে]

সুবসনা। আমি কি স্বপ্ন দেখছি।

দীনদাস। হ্যাঁ, এ স্বপ্নই।

বসুবন্ধু। নিশ্চয়ই স্বপ্ন।

দীনদাস। কাত্যায়নীর মন্দির।

বসুবন্ধু। একটা রক্তাক্ত খড়্গ পড়ে রয়েছে।

দীনদাস। দেবীর বেদী রক্তে ভেসে গেছে।

সুবসনা। না না, এ স্বপ্ন নয়। নইলে এত রাতে আমরা তিনজনই এখানে রয়েছি। কিন্তু কেমন যেন সব ওলট-পালট হয়ে গেছে। স্বপ্ন, নিশ্চয়ই স্বপ্ন।

[পুরোহিতের আবির্ভাব]

পুরোহিত। না, স্বপ্ন নয়।

বসুবন্ধু। এ কি! পুরোহিত ঠাকুর!

পুরোহিত। হ্যাঁ বৎস। তোমরা যা ভাবছো স্বপ্ন, একেবারেই স্বপ্ন নয়। তোমাদের চোখে মুখে আমি দেবীর চরণামৃত সিঞ্চন করছি। তোমাদের স্মৃতি পুনরুজ্জীবিত হোক। দেবীর ষোড়শোপচার পুজা অনুষ্ঠানে রাজপুত্র বসুবন্ধুর বিংশ জন্মতিথি উৎসব আজ সাড়ম্বরে সুসম্পন্ন হলো। মনে পড়ছে তোমাদের?

বসুবন্ধু। হ্যাঁ, পড়ছে, কিন্তু সুসম্পন্ন হলো কি করে বলি। এই উৎসবে আমি দেখা পেলাম না প্রাণপ্রিয় বন্ধু দীনদাসের, দেখা পেলাম না বন্ধু প্রিয়া সুবসনার। সব কিছু ব্যর্থ মনে হলো আমার। উৎসব অন্তে নিশাচরের মত ঘুরতে গিয়েছিলেন বন্ধু দীনদাসের গৃহে। কিন্তু গিয়ে দেখি সুবসনা ঘরে রয়েছে একা। আমাকে দেখেই সে কেঁদে উঠলো।

সুবসনা। হ্যাঁ উঠলাম। গভীর রাত্রে ঘুম ভাঙতেই দেখি পাশে আমার স্বামী নেই। এই অন্ধকার রাত্রে কোথায় তাকে খুঁজবো ভাবছিলাম, এমন সময় এলেন আপনি। আপনি সব শুনে বললেন—

বসুবন্ধু। সে যখন ঘরে নেই, তোমাকেও যখন সে ভুলেছে, কেন যেন আমার বার বার মনে হলো সে তার মানত রক্ষা করতে গেছে ঐ কাত্যায়নীর মন্দিরে। তোমাকে সঙ্গে নিয়ে ছুটলাম মন্দিরে।

দীনদাস। হ্যাঁ মানত রক্ষা করতে মন্দিরেই আমি এসেছিলাম। মানত ছিলো, এক বৎসরের জন্য ও যদি আমি সুবসনাকে পাই—স্বহস্তে ছেদন করবো আমার মস্তক; অর্ঘ্য দেব দেবীর চরণে। বৎসর হয়েছে পূর্ণ। মানত রক্ষা না করলে যদি দেবীর কোপে সুবসনার মৃত্যু হয়—সেই ভয়ে নিজের মাথা কেটে মানত রক্ষা করলাম আমি।

বসুবন্ধু। মনে পড়ছে। এখন আমার সব মনে পড়ছে। সুবসনাকে মন্দিরের বাইরে অপেক্ষা করতে বলে ছুটে এলাম মন্দিরে। এসে দেখি সেই লোমহর্ষক দৃশ্য। দীনদাসের মস্তক এখানে, দেহ ওখানে। তখনি আমার মনে হলো, আমি যখন এখানে এসে পড়েছি আর বাইরে যখন রয়েছে সুবসনা লোকে ভাববে দীনদাস আত্মহত্যা করেনি, সুবসনাকে হস্তগত করতে আমিই হত্যা করেছি দীনদাসকে। সুবসনাও ভাববে তাই। ওঃ, এ অপবাদের চেয়ে মৃত্যু ভালো। সঙ্গে সঙ্গেই সেই রক্তমাখা খড়্গ তুলে নিয়ে আমি আমার মস্তক ছেদন করলাম।

সুবসনা। কিন্তু আমি এসব কিছুই জানতে পারলাম না। একা একা মন্দিরের বাইরে কতক্ষণ আর অপেক্ষা করবো আমি। তাই ছুটে এলাম মন্দিরে। এসে দেখি স্বামী মৃত, বন্ধু মৃত। সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো তবে যাবজ্জীবন এ বৈধব্য—এ বিরহ আর কেন? লোকেও বলবে আমিই দুশ্চরিত্রা। বহুবল্লভের লোভে আমিই হত্যা করেছি স্বামীকে, তাঁর বন্ধুকে। না না, তা অসহ্য। ঐ খড়্গ তুলে নিয়ে আমি আত্মহত্যা করতে গেছি, এমন সময় মা কাত্যায়নীর দৈববাণী হলো।

দৈববাণী। বৎসে। আমি তোমার সাহস ও সৎ বিবেচনা দর্শনে প্রসন্ন হয়েছি। বর প্রার্থনা কর।

সুবসনা। ঐ দৈববাণী শুনে আনন্দে আত্মহারা হলাম আমি। বললাম—দেবি! যদি প্রসন্নই হয়ে থাকো তবে এঁদের দু'জনের প্রাণদান কর।

দৈববাণী। তথাস্তু। দু'জনের দেহের সঙ্গে জুড়ে দাও এদের মস্তক। শুভমস্তু।

সুবসনা। ঐ দৈববাণী শোনামাত্র উঃ! সে কি উত্তেজনা। কিন্তু তোমাদের বাঁচিয়ে তুলবার উন্মাদনায় পলকের মধ্যেই আমি কি ভুলই না করেছি!

দীনদাস। ভুল করেছো?

বসুবন্ধু। কি ভুল?

সুবসনা। দেখছো না? তোমাদের একজনের মাথা জুড়ে দিয়েছি অন্যের দেহে।

বসুবন্ধু। তাই তো! মাথা আমার কিন্তু দেহ দেখছি দীনদাসের!

দীনদাস। হ্যাঁ এ কি হলো! মাথা আমার, দেহ দেখছি বসুবন্ধুর।

সুবসনা। আমি এখন তবে কার?

পুরোহিত। শোনো, যেমন নদীর মধ্যে গঙ্গা উত্তম, পর্বতের মধ্যে সুমেরু উত্তম, বৃক্ষের মধ্যে উত্তম কল্পতরু সেরূপ সমুদয় অঙ্গের মধ্যে মস্তকই উত্তম। শাস্ত্রকাররা তাই মস্তকের নাম রেখেছেন উত্তমাঙ্গ—তোমার স্বামী সে। হ্যাঁ ঐ দীনদাস।

॥ ৬ ॥

[অরণ্যাঞ্চলে একটি মন্দির প্রাঙ্গণ। মন্দিরে সন্ধ্যারতি হইতেছে। রথ হইতে অবতরণ করিল বসুবন্ধু, দীনদাস এবং সুবসনা। সুবসনার ক্রোড়ে নিদ্রিত শিশু-পুত্র রঞ্জন।]

বসুবন্ধু। এক বৎসর পর, দেশ ভ্রমণে বেরিয়েছি।

সুবসনা। এ আমরা কোথায় এলাম? সন্ধ্যারতির শংখ ঘণ্টা শুনছি।

বসুবন্ধু। হ্যাঁ, এ তো দেখছি একটা মন্দির। বনের মধ্যে এ আবার কোন্ মন্দির?

দীনদাস। জায়গাটা তো তোমার রাজ্যেই বন্ধু। অথচ তুমি জানো না?

বসুবন্ধু। না, সত্যিই জানিনা। কখনো আসিনি এদিকে।

দীনদাস। আসোনি বলেই তো জোর করে তোমাদের ধরে নিয়ে এলাম দেখাতে। তোমরা শুধু কাত্যায়নীর মন্দিরই দেখেছো, কিন্তু গভীর বনে যে আরো সব মন্দির রয়েছে তাও জানা দরকার, দেখা দরকার। প্রয়োজন হয় তার।

সুবসনা। নিশ্চয়ই দেখব। রঞ্জন আমার কোলে ঘুমিয়ে পড়েছে। ওকে এই রথেই শুইয়ে রাখছি। তার পর চলো মন্দিরটা দেখে আসি। শিবের মন্দির মনে হচ্ছে। হ্যাঁগো, তুমি তো দেখছি জানো সব, বলো না কোন্ দেবতার মন্দির এটা?

বসুবন্ধু। মন্দিরের চূড়ায় বিরাট ত্রিশূল দেখছি। নিশ্চয় শিবের মন্দির। তাই না দীনদাস?

দীনদাস। হ্যাঁ শিবের মন্দির। পাপনাশন শিব।

সুবসনা। পাপনাশন শিব।

দীনদাস। হ্যাঁ, পাপনাশন শিব।

বসুবন্ধু। তবে বলো, পাপী ছাড়া কেউ এখানে আসে না?

দীনদাস। হ্যাঁ, পাপী ছাড়া কেউ এখানে আসে না।

সুবসনা। অ্যাঁ!

দীনদাস। হ্যাঁ।

[ক্ষণিক নিস্তব্ধতা]

[মন্দিরের ভিতর স্তব পাঠ হইতেছিল।]

করচরণকৃতং বাক্কায়জং কর্মজং বা
শ্রবণ নয়নজং বা মানসং বাহপরাধং
বিহিতমবিহিতং বা সর্বমেতৎ ক্ষমস্ব
জয় জয় করুণাব্ধে শ্রীমহাদেব শম্ভো।

বসুবন্ধু। এ স্তবের অর্থ কি জানো ?

সুবসনা। কি ?

বসুবন্ধু। আমার এই জন্মে হস্তপদের দ্বারা কৃত অপরাধ, বা বাক্যজ, শরীরজ, কর্মজ, শ্রবণজ, নয়নজ কিংবা মানস অপরাধ অথবা সঞ্চিত এবং আগামী সব অপরাধ ক্ষমা কর। হে করুণাসাগর, শ্রীমহাদেব, শম্ভু, তোমার জয় হউক, জয় হউক।' দীনদাস! বন্ধু!

দীনদাস। বলো।

বসুবন্ধু। বনভ্রমণের নাম করে তুমি আমাদের এখানে নিয়ে এলে কেন বন্ধু!

দীনদাস। পাপ মোচনের জন্য।

বসুবন্ধু। পাপ মোচনের জন্য! আমরা কে কি এমন পাপ করেছি যে, আসতে হবে এখানে ?

দীনদাস। সবাই পাপ করেছি, সবাই।

[ক্ষণিক নিস্তব্ধতা]

বসুবন্ধু। বেশ। তবে তুমিই আগে বলো, তুমি কি পাপ করেছ ?

দীনদাস। প্রথম দর্শনেই বন্ধু তুমি সুবসনাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলে, বিয়ে করতে চেয়েছিলে তাকে। যতদূর বুঝতে পেরেছিলাম, সুবসনার কামনাও ছিল তাই। তাই নয় কি সুবসনা ?

সুবসনা। [নীরব রহিল।]

দীনদাস। ঐ নীরবতাতেই তা প্রকাশ। কিন্তু তোমাদের সে কামনা আমি পূর্ণ হতে দেইনি। ছুটে গিয়ে কত্যায়নীর কাছে আমি মানত করেছিলাম অন্ততঃ এক বছরের জন্য যেন আমিই সুবসনাকে পাই। তাই তোমাদের উভয়ের মনস্কামনা আমি ব্যর্থ করেছিলাম দৈববলে—কাত্যায়নী দেবীর কাছে মানত করে। এই আমার পাপ।

সুবসনা। রাজপুত্র ছিল সুন্দর, কিন্তু তুমি ছিলে শক্তিমান। মেয়েরা ভালবাসে সৌন্দর্য কিন্তু কামনা করে বীর্য। আমাদের বিয়ে কি সুখের হয়নি স্বামী ?

দীনদাস। না হয়নি। তা যদি হতো তবে আমাদের দুই বন্ধুর জীবন এমন বিকৃত হতো না, ঘটতো না আমাদের এই দুঃসহ দৈহিক রূপান্তর। আমার উত্তমাঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হতো না ঐ কুসুমপেলব বন্ধুর অপটু আধমাঙ্গ।

সুবসনা। কিন্তু তার বিড়ম্বনা, তার দুঃখ, সব থেকে বেশি ভোগ করছে কে! আমি নই ?

বসুবন্ধু। বটেই তো। এতে সুবসনার পাপ কোথায় ? দৈববাণী শুনে আমাদের পুনর্জীবিত করার উন্মাদনায় চকিতে ভুল করে বসেছিল সুবসনা। সে ভুল কি তার ইচ্ছাকৃত ?

দীনদাস। আমি বলছি ইচ্ছাকৃত।

সুবসনা। না, কখনো না।

দীনদাস। থামো। তোমার অবচেতন মনে যে কামনা ছিলো অতি গোপনে, সেই কামনাই চকিতে ঐ ভুল হয়ে মুহূর্তের মধ্যে গড়ে তুলেছিল পরিপূর্ণ সেই পুরুষোত্তম, যে তোমার জীবনের স্বপ্ন, মনের কামনা—

সুবসনা। অ্যাঁ!

দীনদাস। হ্যাঁ। পাপ আর পারা কখনো চাপা থাকে না। তোমারও থাকেনি। তাই না আজ আমাদের এই দৈহিক বিকৃতি! অস্বীকার করতে পার ?

[ক্ষণিক নিস্তব্ধতা।]

বসুবন্ধু। আমি কি পাপ করেছি দীনদাস ?

সুবসনা। না না, তুমি কোনো পাপ করোনি বন্ধু। আমার মনে পাপ ছিল আজ বুঝেছি, কিন্তু তুমি কোন দিন ধরা দাওনি আমাকে।

দীনদাস। থামো। সামনে ঐ শিব—পাপনাশন শিব অকপটে যে গুপ্ত পাপ ব্যক্ত করবে সে পাবে মার্জনা। যে তা করবে না তার হবে আরো গুরুতর পাপ—সে পাপের আর কোনো ক্ষমা নেই। সবধান!

সুবসনা। এ ভয় তুমি কাকে দেখাচ্ছো, আর কেনই বা দেখাচ্ছো—আমি বুঝছি না।

দীনদাস। এক নির্লজ্জ পাপের জ্বলন্ত প্রমাণ ওখানে—ঐ রথে ঘুমিয়ে আছে।

সুবসনা। রথে ঘুমিয়ে আছে ?

দীনদাস। হ্যাঁ।

সুবসনা। রঞ্জন ?

দীনদাস। রঞ্জন। ও যদি আমার সন্তান হতো তবে ওর মুখ চোখ হোত আমারি মতো।

বসুবন্ধু। কিন্তু তা হয়নি। আমি অবাক হয়েছি দেখে রঞ্জন হয়েছে অবিকল আমারই মতো। কিন্তু কি করে তা হলো, ভেবে পাই না—ভেবে পাই না দীনদাস।

দীনদাস। সইতে পারছিলাম না আমি লোকের কানাকানি, সইতে পারছিলাম না লোকের হাসি ঠাট্টা। আজ এই পাপ নির্মূল করতে বনভ্রমণের ছলে আমি তোমাদের সবাইকে এনে ফেলেছি পাপ পুণ্যের বিচার কর্তা এই মহাদেবের মন্দিরে। সুবসনা!

সুবসনা। বলো।

দীনদাস। বিশ্বাস করো তুমি ঐ জাগ্রত দেবতা?

সুবসনা। করি।

দীনদাস। ঐ মন্দিরের চূড়ার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বলতে পারো কলঙ্কিত নয় তোমার ঐ দেহ।

সুবাসনা। না। দেহ আমার কোনো পাপ করেনি, পাপ করেছে আমার মন। আমি সেই শিল্পী—যে মনের কল্পনাকে নিখুঁত রূপ দিয়ে আঁকে কোন ছবি। আমার মনের কামনাকে, কল্পনাকে দশমাস দশদিন তিলে তিলে গড়ে তুলেছিলাম আমার দেহে। আমার আঁকা সেই ছবি ঐ রঞ্জন।

দীনদাস। দেহের পাপই শুধু পাপ নয়—মনের পাপ আরো বড়ো পাপ। সেই পাপ করছো তুমি। এ ব্যভিচারের কোন মার্জনা নেই সুবসনা। এ পাপের একটি মাত্র প্রায়শ্চিত্তই আছে, আর তা হচ্ছে—

সুবসনা। কি? বলো। থেমে গেলে কেন?

দীনদাস। নিক্ষেপ করতে হবে তোমার সন্তানকে—ঐ পাপ নাশন শিব সরোবরে। নিক্ষেপ কর—এখনি।…(চীৎকার করিয়া) করো।

সুবসনা। না—আমি পারবো না। কোনো মা তা পারে না।

দীনদাস। ব্যভিচারিণী মায়েরা পারে।

সুবসনা। আমি ব্যভিচারিণী নই।

দীনদাস। ব্যভিচারিণী নও!

সুবসনা। না। ব্যভিচার? কার সঙ্গে ব্যভিচার? ঐ রাজপুত্রের সঙ্গে? চেয়ে দেখ। ওঁর দেহেও তুমি।

[ক্ষণিক নিস্তব্ধতা]

বসুবন্ধু। বন্ধু, ঘরে চলো। আমার উত্তমাঙ্গে আর তোমার অংসাঙ্গেই গড়ে উঠেছে তোমার রঞ্জন—ঐ নারীর মানসিক কামনায়—মানসিক তপস্যায়। নিষ্পাপ সুবসনার দেহ। আর মনের পাপ এ জগতে কার না আছে? সমাজশাসন তাকে চিরকাল ক্ষমা করেছে। তুমিও করো। চলো, ঘরে চল।

সুবসনা। যাও তোমরা ঘরে, আমি যাবো না।

বসুবন্ধু। যাবে না?

সুবসনা। না। তোমরা যাও—রঞ্জনকেও নিয়ে যাও সঙ্গে।

বসুবন্ধু। কিন্তু কেন যাবে না তুমি?

সুবসনা। আমি দ্বিচারিণী। আমি তোমাদের দু'জনাকেই চেয়েছি। আর তা যখন চেয়েছি—তা যখন চাই, ঘর করবো কার? যার ঘরই করিনা কেন তাতে হবে দ্বিচারিণীর পাপ। তাই আমি ঠিক করলাম, তোমাদের কারো ঘরই আমি করবো না, কারো ঘরেই আমি যাবো না। আমি পড়ে থাকব এই মন্দিরে।

বসুবন্ধু। সুবসনা! শোনো!

সুবসনা। না রাজপুত্র। যদি তোমাকে কখনো ভুলতে পারি তবেই যাবো আমি স্বামীর ঘরে। আর তবেই বুকে নেবো আমার সন্তান। আমি ভুলবো, তোমাকে ভুলবো। এই দ্বিচারিণীর স্পর্শ থেকে সন্তানকে আমি বাঁচাবো—বাঁচাবো।

দীনদাস। কিন্তু বসুবন্ধুকে ভুলতে তুমি পারবে না সুবসনা।

সুবসনা। তা যদি না পারি, সোনার চাঁদ সন্তানকে আমি জন্মের মতো হারাবো। সেই হবে আমার সকল পাপের শাস্তি।

দীনদাস। এর ওপর আর আমার কিছু বলবার নেই সুবসনা।

বসুবন্ধু। আমার আছে। আশীর্বাদ করছি, প্রার্থনা করছি, তুমি যেন আমাকে ভুলতে পারো, ভুলতে পারো।

যবনিকা

সংকলন

'চন্দ্র-জয়ে' দার্শনিক রাসেল

সারা পৃথিবীর মানুষ যখন তিন মার্কিন বীর অভিযাত্রীর হাত থেকে তাদের ঐতিহাসিক চন্দ্র বিজয়ের গৌরবের অংশ পাবার জন্য লোভী হাত বাড়াচ্ছে, দার্শনিক বার্টাণ্ড রাসেল তখন এক মহা-বিপদে আশংকায় শংকিত হয়ে পড়েছেন। তিনি বলেছেন—"মানুষের গুণ এবং দোষ তুইই আছে। কিন্তু যদি কেবল মাত্র আমাদের দোষগুলি মহাজগতে ছড়িয়ে দিই, যদি আমাদের ভুলগুলি প্রথমে চাঁদে, পরে মঙ্গল ও শুক্র গ্রহে নিয়ে যাই এবং দূর ভবিষ্যতে গ্রহান্তরে প্রেরণ করি, তবে এই চালাকীর (আসলে যা বোকামী) কি দরকার? সে ক্ষেত্রে এই অভিযানে আহ্লাদিত হবার কিছু আছে বলে আমি মনে করি না। এবং মানুষ যদি অনুতপ্ত না হয়, এবং নিজেকে না শোধরাতে পারে তাহলে ঠিক এই ঘটনাই ঘটবে। মানুষ শুধু চাঁদে উপনীত হয়ে অথবা চাঁদকে বাসোপযোগী করেতুলবার চেষ্টাকরেই ক্ষান্ত হবে না। রাশিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্র হয়ত একই সময়ে চাঁদে নামবে—সঙ্গে থাকবে হাইড্রোজেন বোমা—এবং একে অপরকে ধ্বংস করার জন্য উঠে পড়ে লাগবে। পরস্পরকে ধ্বংস করার ব্যাপারটা পৃথিবীতে অনেক সস্তায় সারা যাবে বলে আমার ধারণা।

এই তীব্র মারমুখী কলহকে অন্যত্র ছড়িয়ে দেওয়ার আগে পার্থিব ব্যাপারে আমাদের আরও একটু বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন বলে আমি ব্যক্তিগত ভাবে মনে করি: আমাদেরই মহাজগতের স্তরে উন্নীত হতে হবে, আমারা লাভ-ক্ষতি, টানাটানি, নিষ্ফল ক্ষুদ্র কলহের স্তরে মহা-জগৎকে নামিয়ে আনব না।"

প্রতিযোগী দেশগুলি যদি মনীষী রাসেলের বাণীর মহিমা বুঝতে পারত তাহলে বিশ্বে অবশ্যই শান্তি আসত।

—সুবিমল সেন

দেশভ্রমণের উপকারিতা সম্বন্ধে বিজ্ঞজনের মত:

জ্ঞান লাভের উপায় হিসাবে দেশ ভ্রমণের বিশেষ উপযোগিতা রয়েছে। কিন্তু দার্শনিক রাসেল বলেছেন—"ব্যস্তবাগীশের মত ঘুরলেই জ্ঞান লাভ হয় না। স্পিনোজা দি হেগে থেকেই সন্তুষ্ট ছিলেন এবং জার্মানির সব চেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি বলে পরিচিত ক্যাণ্ট কোনিস্‌বার্গের দশ মাইল দূরে যান নি।"

এ অবশ্যই ভ্রমণ করতে পারছি না বলে মনে যাদের দুঃখ আছে তাদের সান্ত্বনা দেবে।

১৯৩১ সালে এক রচনায় হাক্সলী সাহেব ভ্রমণ সম্বন্ধে যা বলেছিলেন তার মধ্যেও যথেষ্ট সত্য আছে। তিনি বলেছিলেন—ভ্রমণ যত বাড়বে ততই সংস্কৃতি ও জীবন যাপনের পদ্ধতি ততই ঐক্য ও সমতার দিকে এগিয়ে যাবে। তার ফলে

কালক্রমে ভ্রমণ আর তেমন শিক্ষাপ্রদ থাকবে না। এখনও বার্গলেম থেকে উদয়পুর যাওয়ার অর্থ আছে। কিন্তু যখন বার্গলেমের সব অধিবাসী উদয়পুর যাবে কয়েকবার, আর উদয়পুরের সব অধিবাসী বার্গলেমে যাবে কয়েকবার, তখন আর ঐ সহরের লোকদের অন্য সহরে ভ্রমণের কোন উপকারিতা থাকবে না, এই দুই সহরের অভ্যন্তরে তখন পার্থক্য মূলক কিছু থাকবে না।

খুব বেশী জানা হয়ে গেলে তাচ্ছিল্য এসে যায় বলেই হয়ত।

—রমেন ঘোষ

নারী প্রগতি কোন্ পথে ঃ

মানব সভ্যতার ইতিহাস নারীর মাতৃত্ব গৌরবের ইতিহাস। নারীর জীবন পূর্ণতা লাভ করে মাতৃত্বে। সভ্যতার প্রাচীন কাল থেকে নারীর সতীত্ব, নারীর মাতৃত্ব গৌরবের আসনে আসীন। এই দুয়ের চেয়ে অধিক মহৎ নারীর জীবনে আর কিছুই নেই।

কিন্তু আজকালকার প্রগতিশালিনীরা এ দুয়ের মর্যাদা রেখে চলতে রাজী নয়। তাদের দলের মুখপাত্র জর্জ কেগ্র্যাডো তাদের সমর্থনে বলেছেন—

(১) জগতের প্রত্যেক নারীর পক্ষে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া অসম্ভব।

(২) প্রত্যেক বিবাহিতা নারীকেই মাতৃত্ব বরণ করতে হবে তার কোন মানে নেই।

(৩) যে সকল মেয়ের বিয়ে হবে তাদের অনেককেই স্বাস্থ্যের কারণে মাতৃত্ব এড়িয়ে যেতে হবে।

মাতৃত্ব প্রাপ্ত নারীগণ যে নিঃসন্তান নারীদের চেয়ে সুখী, সুতৃপ্ত বা পূর্ণতা প্রাপ্ত এমন মনে করার কিছু নেই। এমন চিন্তা করারও কারণ নেই যে নিঃসন্তান নারীগণ দৈহিক ও মানসিক দিক থেকে দোষগ্রস্ত। এরও কোন প্রমাণ নেই যে সন্তানবতী নারী অধিকতর পূর্ণজীবন যাপন করে, বরং তার বিপরীত কথাটি সত্য। সন্তান পালনে অধিক সময় নষ্ট হয়। তার সমস্যা আরও কত বেশী। এর ফলে অসংখ্য সন্তানবতী নারীসংকীর্ণ সীমাবদ্ধ দরিদ্র জীবন যাপন করে; তারা নিজের ঘরের বাইরে নজর দিতে পারে না।

এতকাল পর্যন্ত জগতের সর্বত্র সন্তান লাভই নারীর বিবাহিত জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য বলে গণ্য হয়ে এসেছে। একালেও যারা যথার্থ দৃষ্টি সম্পন্ন নয়, তারা বুঝতে পারেনা যে নারীর পক্ষে বিবাহিত জীবনের মধ্যে সন্তান লাভ ছাড়াও অনেক বিচিত্র রকমের উপলব্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। আজকাল অনেক সম্যক দৃষ্টি সম্পন্ন দম্পতি নিঃসন্তান থাকতে ভালবাসে। তারা পরস্পরের সুখের জন্যে জীবন যাপন করেই সুখী। ধর্মপিপাসুগণ অবশ্য এ-সকল মনোভাব বরদাস্ত করতে পারেন না। কিন্তু এই পাদরীসুলভমনোভাব সমর্থনযোগ্য নয়। মাতৃত্বেই নারীর পূর্ণতা ইহা এক ভ্রমাত্মক বাক্য। প্রত্যেকনারীকেই মাতা হতে হবে একথা বলার অধিকার কারোর নেই—না মার না বাপের, না শিক্ষকের—না ধর্ম যাজকের।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে সম্মানিত যে সভ্য দুনিয়ার মতবাদ, তা প্রগতিশালিনীদের প্রতি পদক্ষেপে আজ দলিত। কিন্তু প্রকৃতির নিয়মগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে নারীত্ব ও মাতৃত্ব বিশেষভাবে সম্পর্ক যুক্ত। অবশ্যই প্রকৃতিতে বন্ধ্যা নারী, পশু ও বৃক্ষের দেখা মেলে। প্রকৃতিতে এই প্রকারের বন্ধ্যাকারিকা শক্তির অস্তিত্বই হয়ত এই দলীয় প্রগতিশালিনী মেয়েদের মনে এই ধরণের ভাবনা জাগিয়ে তুলছে।

—সুস্মিতা রায়

সুললিতা দেবী / কুমারেশ ঘোষ

পেনো ওরফে পান্নালাল ল্যাম্পপোষ্ট থেকে সড় সড় করে খানিকটা নেমেই ধপাস করে ফুটপাতে এসে পড়লো। এবং বেকায়দায় পড়ায় তার ডান হাত খানা গেল ভেঙ্গে।

রাত তখন প্রায় বারোটা হলেও, পড়ার শব্দে আট-দশ জন লোক জমা হয়ে গেল, কাজেই বীটের পুলিশকেও ডেকে আনলো তারা।

ল্যাম্পপোষ্টটার খুব কাছেই দোতলার জানলা দিয়ে প্রখ্যাতা চিত্রাভিনেত্রী সুললিতা দেবী গলা বাড়িয়ে দেখলেন একবার—তাঁর জানলার নীচেয় একটা গোলমাল। ব্যাপারটা বুঝলেন না ঠিক। কী জানি, কি। সরে গেলেন সেখান থেকে। বড্ড ক্লান্ত তিনি।

—চোর। চুরি করতে যাচ্ছিল হয়তো।—একজন বললে।

একজন তরুণ বললে, ওপরের দোতলায় থাকেন আমাদের সুললিতা দেবী—তাঁর ঘরে ঢুকবার চেষ্টা করছিল ব্যাটা।

—কিংবা ইলেকট্রিকের বাল্ব চুরি করতে গেছলো হারামজাদা। আর একজন বললো।

পুলিশ বললে, চলো থানামে।

পেনোর ভাঙ্গা হাতটি একটি ময়লা দড়ি দিয়ে গলার সঙ্গে ঝুলিয়ে, পুলিশ তাকে থানায় নিয়ে গেল। লোকগুলোও আস্তে আস্তে সরে গেল সেখান থেকে। পুলিশী ব্যাপারে জড়িয়ে পড়তে চায় না।

থানায় পুলিশ অফিসার তাকে হাসপাতালে পাঠাবার জন্যে এম্বুলেন্সে খবর দিয়ে শুরু করলেন জেরা:

—ল্যাম্পপোষ্টে উঠেছিলে কেন?

—এমনি।

—এমনি! ওটা চলবার রাস্তা ভেবেছিলে? ন্যাকামি। মাল টেনেছিলে?

—না।

—তবে চুরি করতে?

—না।

—তবে কি করতে? বল্ শিগ্গীর। নইলে তুলো ধুনে দেবো।

—ওপরের দোতলার ঘরে সুললিতা দেবী থাকেন।

—কে দেবী?

—কেন স্যার, 'প্রাণ যায়', 'প্রেমের ছোবল', 'যৌবন জ্বালা' সিনেমার হিরোইন সুললিতা দেবী?

—তা তোর তাতে কি?

—আজ্ঞে তাকে একবার দেখতে গেছলাম।

—ঐ ল্যাম্পপোষ্ট বেয়ে? বোকা বোঝাচ্ছ? বদমাস।

—সত্যি বলচি। মাইরি বলচি। ব্যাপারটা বলবো খুলে?

—বল্। কি বলবি বল। শুনি তো গপ্পো—

—বলবো কি স্যার, ঐ সুললিতা দেবী আমাকে স্রেফ পাগল করে দিয়েছিল। ওর ছবি স্যার কাগজে দেখতে পেলেই কেটে রাখি—এই দেখুন স্যার। (দেখালো দু, তিন খানা ছবি।)—উনি যে বইতে নেমেছেন, আমি দেখেছি, তা যেমন করেই হোক। আর সিনেমা পত্রিকায় ওঁর সাক্ষাৎকার পড়ে পড়েই তো ওঁকে একবার নিজের বাড়িতে দেখতে—

—পড়তে পারিস?

—একটু-একটু স্যার। তাই তো স্যার ষ্টুডিও থেকে ফিরে উনি ঘরে কি করেন তা দেখতে—

—কি দেখলি?

—সে আর বলবেন না স্যার। মাথা খারাপ হয়ে গেল, তাই তো—

—একদম ধরাশায়ী।

—ওঃ। না দেখলেই ভাল ছিল স্যার।

—কেন? একদম খোলাখুলি ব্যাপার ঝি? তাই ভিরমি খেয়ে পড়েছিলি?

—যা বলেচেন স্যার। এমনটা যে দেখতে বে ভাবিনি। ভাবতাম মাথায় অনেক চুল। । দেখি, খোঁপা থেকে বিড়ের মতো কী একটা ার করলে স্যার। তারপর মুখে হাতের রং লতেই দেখি স্রেফ আপনার আমার মতই কেলে। খলাম ভূরুটা পর্যন্ত আঁকা স্যার। তারপর লবো স্যার?

—বল্।

—ব্লাউস খুলতেই দেখি রবারের দুই ঠুঙ্গী। । গ্লা। তখনি মাথা ঝিম-ঝিম করে উঠলো। তাও কোন রকমে আঁকড়ে ধরে ছিলাম। পাষ্টটা। কিন্তু মুখের ভেতর থেকে দু'পাটি বাঁধানো দাঁত খুলে বার করতেই তাঁর অমন নরম ফুলো গাল দুটো চুপসে গেল, আমিও যেন স্যার চুপসে স্রেফ—

—ছড়াৎ ছিটকে একদম ফুটপাতে। কী বল? হাসলেন পুলিশ অফিসার।

এমন সময় বাইরে পিঁ পিঁ শব্দে এম্বুলেন্সের হর্ণ শোনা গেল। ও-সির টেবিলে একখানা সচিত্র সিনেমা পত্রিকা উপুড় করা ছিল। তার মলাটের ছবিটাও তো সুললিতা দেবীরই। সেটা তাড়াতাড়ি ড্রয়ারে রেখে বললেন, তোর নামধাম? হ্যাঁ, আর কখনো ওসব করতে যেয়ো না বাপধন, বুঝলে? মারা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছো—

—আর না স্যার। এই কানমলা নাকমলা। লিখুন আমার নাম পেনো, মানে পান্নালাল। আচ্ছা স্যার, হাতটা আমার সারবে তো। ডান হাত কিনা—

শিল্পগুরু

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

শিল্পের অমৃত বীর্যে স্বৈর্যশীল-প্রাণ
অতীত ঐশ্বর্যময় চেতনার দান—
আপন সত্তার নীল দিগন্তে উজ্জ্বল
বর্ণাঢ্য বিচিত্র দৃষ্টি, সৃষ্টির সম্বল।

অনুভূতি প্রদ্যোতিত সুদীপ্ত প্রদীপ
আলোহীন সাগরের চিত্ত অন্তরীপ;
গভীর গভীর থেকে মুক্তামণি, হায়
শিল্পীর দুচোখ ভরা রঙের খেলায়।

গুহান্বিত ভাস্কর্যে ও চিত্রের সুষমা—
অজন্তা ইলোরা গর্ভে স্থিত মনোরমা,
জাগ্রত শিল্পীর তুলি, সচেতন রেখা
অজস্র সৃষ্টির মোহে মায়া চোখে দেখা।

তুলির অতুলনীয় যে কারুকীর্তিত—
সুচারু চৈতন্যে জানি সীমা-সংখ্যাতীত।

কাব্যার্থ চন্দ্রিকা

শ্রীগৌরগোবিন্দ ভট্টাচার্য্য

কবিতার অর্থ কি যে? কেহবা শুধায়—
উমেদার কবিতার সেও নিন্দা পায়,
অন্তহীন ভাব রাজ্যে যত চিন্তারাশি—
নিশিদিন কবিচিত্তে বাঁধে বাসা আসি।
তাহারই বাণীরূপ কবিতার বেশে—
কবিমনে রূপ নেয় ভাবের আবেশে।
তাহারই মূর্ত্তরূপ কবিতার রূপে—
দেখাদেয় লিখারূপে অক্ষর স্বরূপে।

ক্ষণস্থায়ী ক্ষুদ্রচিন্তা খণ্ডিত আকারে—
কবিচিত্তে রূপ নেয় গীতিকাব্য রূপে।
বিশাল বিষয় বস্তু বিশাল কল্পনা—
মহাকাব্যে রূপনের মহান রচনা।
সত্যশিব সুন্দরই কাব্য ফলশ্রুতি,
কাব্যপাঠে ভাবাবেশে কল্পলোকে গতি।

"রঙিন কাঁচের টুকরো"

আভা পাকড়াশী

আজ ইসরত বাজীর বিয়ের সেই সন্ধেটি মনে পড়ছে। সেদিনও এমনি কালো কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে গিয়েছিল। ঐ আসমানের কালো মেঘ-এর তলায় কি রেহতাব-এর চাঁদনী বা তারার আলো নেই। হয়তো আছে কিন্তু সবই এমনি কালো মেঘের তলায় ঢাকা। থেকে থেকে এক একবার বিজলী ঝিলিক হানছে, আর আমারও মনের এধার থেকে ওধার অবধি একটা বেদনা-ভরা স্মৃতির চীড় ধরছে। মস্ত লম্বা রেলিং ঘেরা বারান্দায় আমি একা দাঁড়িয়ে রয়েছি, আকাশের দিকে চেয়ে। এবার নামলো বলে বরষার ধারা। এক পশলা বৃষ্টির শেষে মেঘের এই ঘ-ঘটা আর থাকবে না। ঐ থমথমে আসমানে ফের হয়তো চাঁদনী চমকাবে, আলোর খুশী ঝ র পড়বে আবার। কিন্তু আমার এই মনের মেঘ কি জীবনে কখনো কাটবে না। যদি বাদলের ধারাই না নামলো তো শুধু শুধু মেঘই বা করেছিল কেন। কার ভুলে বাদল নামল না, আমার না আফতাবের। আমিই বা তখন রাজী না হয়ে কি করতাম। সম্বলের মধ্যে তো রয়েছে মাত্র কয়েকটি সোনালী স্মৃতি; আর কিছুই নেই। সে কি তবে ভালবাসেইনি আমায়। শুধুই দয়া দেখিয়ে-ছিল? যাঃ, চোখের জলে সুর্মা ধুয়ে গেল।

নীচের পোর্টিকোয় এখুনি হয়ত ভারী গাড়ীর দরজা বন্ধ হবে। সাদেক মিয়া ফিরবে। তখুনি ছুটে ওপরে আসবে আর খানাকামরা, শোবার ঘর, বাইরের বাগিচা, পিছনের ছাজ্জা সব সে খুঁজে বেড়াবে আমার তালাসিতে। আমায় দেখতে পেলেই হেসে উঠবে তার চোখ দুটো। ঐ এক মানুষ।

কিন্তু ঐ আফতাব। আজও সে কেন আমার মনে আগুন জ্বালছে। ফিরে ফিরে কেনবা মনে পড়ছে সেই ওর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিনটির কথা, ইসরত বাজী—আমার বড় বোন। তার বরাত এল—সাদী হয়ে গেল—জন্মের মত সে আজ থেকে আমাদের পর হয়ে গেল। তাকে নিয়ে চলেও গেল নতুন ভাই সাহেব। শুধু ছেঁড়া খোঁড়া ফুলের পাঁপড়ি, পানদানে দু একটা পান আর রসোইতে ডেকে কিছু সেল্‌হা পোলাও আর গোস্ত পড়ে রয়েছে। অত লোকজন, অতগুলি মেয়ের হাসি, চিৎকার চেঁচামেচি, তাদের পোষাকের জরী, জেবরের চমক, চমকিলি চপ্পলের ঢের, বোর্খার পাহাড় সব গায়েব হয়ে গেছে, বরাত চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই। শুধু ও ঘরে চারপাইতে আম্মী আর ছাতের সিঁড়ির কোণে আমি—ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে চলেছি তখনো। হঠাৎ কে যেন আমার মাথায় হাত রাখল। চোখ তুলতে দেখলাম আফতাব। মুখে একটা সান্ত্বনার মত শব্দ করে তার সেই বিশেষ ধরণের হাসি হাসতে হাসতে আমায় বলে উঠল—আহা! দরিয়ার পানি যে সব ফুরিয়ে গেল অমিনা বেগম! কুমারী মেয়ে আমি—'বান্নু'—ওভাবে আমায় বেগম বলে ঠাট্টা করায় বিরক্ত হয়ে তাকালাম ওর দিকে।

আবারও সে বলল—এই বেগম! তোমায় কাঁদলেও কিন্তু ভারী সুন্দর দেখায়, বুঝেছ! কিন্তু কাঁদছই বা কেন তুমি এখন! ইসরত বাজকে তার মিয়া হয়ত এখন কত পেয়ার করছে সে কত নতুন জামা কাপড় পেয়েছে—তুমি সেই সব কিছুই পাচ্ছ না তাই বুঝি কাঁদছ!

কান্না ছেড়ে এক ঝটকায় উঠে দাঁড়ালাম—তখনো সে তেমনি করে হাসছে। কতদিন বাদে যেন নতুন করে দেখলাম আফতাব কে। চুড়িদার পাজামা, মাখ্‌খন রং শেরোয়ানী আর সেই রং এর টুপি, পায়ে নাগরা, এই সামাজিক পোষাকে

কি সুন্দর লাগছে ওকে। যেমন তার সোনার মত রং তেমনি সুরজের মত চমকাচ্ছে। মিঠা পান খেয়েছে আফতাব—কথার সঙ্গে খুসবু আসছে মুখ থেকে। আমার কমারীমন কি যেন হয়ে গেল। ওদিকে আকাশ ভরা বাদল। খুব জোরে একটা বাজ পড়ল কোথায়। চমকে উঠলাম আমি—ও ও আমার হাত দুটো চেপে ধরল। একটা অজানা অনুভূতিতে কেঁপে উঠলাম থরথর করে। ততক্ষণে ও আমায় শক্ত করে বুকে জড়িয়ে ধরেছে। শুকনো গলায় বড় ধীরে বললাম আম্মী ডাকছে—ছাড়ো।

ইসরত বাজীর পরেই আমি। আমার অন্য ভাইবোনেরা আরও ছোট ছোট। এই সাতভাগের ভাঙ্গা বাড়ীটা আমাদের নিজেদের।
আব্বাজান মারা যেতে তকলিফের শেষ নেই। নীচের থেকে যেটুকু কেরায়া আসে তারপরে আম্মী জামাকাপর সেলাই করে পাড়শীদের। সলমা চুমকির আর রঙ্গীন কড়াইএর কাজ আমিও করি মার সঙ্গে তাছাড়া সংসারের সমস্ত কাজ তো আছেই। কাঠের জ্বালে রান্না করছি। —তন্দুরে রুটি ঠুকছি নোংরা সালোয়ার কামিজ উড়ুখুড় চুল, ঠিক সেই সময় হয়তো আফতাব এসে হাজির। ঠোঙ্গায় ভরা ফল নয় তো একরাশ বিস্কুট নিয়ে আসে। ছোট ভাই বোনেরা ছেঁকে ধরে ওকে। ঘরে মার সঙ্গে চারপাইতে বসে বসে বাত জমাবে কিন্তু ওর নজর থাকে রসোইতে। ও এলেই ঢেঁকির পাড় পড়তে থাকে আমার বুকে। ও আমায় দেখতে চাইছে বুঝতে পেরেও সহজে রসোই ছেড়ে বেরোইনা। কিন্তু সেও না ছোড় বান্দা, হয় তখন তার পিয়াস লাগবে নয়তো আর কিছু জরুরত পড়বে। আম্মী অবুঝের মত তার সঙ্গে আমায় ডাকবে। আমার কি আর ওর সামনে যেতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু তবুও যাই না, ওর তুলনায় নিজেকে যেন বড় ছোট, বড় হেয় মনে হয়, মনকে চোখ ঠারি, বলি ছিঃ এ ঠিক নয় কিন্তু মন কি আর উচা নীচের ফরাক মানে। সে তার মনে খোয়াব দেখে। স্বপ্নে তারও রাজরাণী হবার সাধ যায়। চলে, কিন্তু আমরা যে বড় গরীব আর ওরা অনেক বড় লোক। তাই আম্মীরও কখনো এই চিন্তা মনে আসেনি হবে।

বুয়াজীরা অত পর্দা মানে না। পিশেমশাই বিলেত ফেরত ব্যারিষ্টার। আফতাব ডাক্তার। আর ওর বোন নাদিরা, বরাবরই কনভেন্টে পড়েছে, নিজেই মোটর ড্রাইভ করে। একাই দোকান বাজার করে আনে। ওদের মতই বড় লোকের মেয়ে আন্নীশবানু তারই সঙ্গে। আফতাবের শাদীর বাতচিত চলছে। সে নাদিরার সঙ্গেই পড়তো। যেমন নাদিরা, তেমনি আন্নীশ, দুইজনেরই ভীষণ অহঙ্কার।

সেদিন যেন কি ছিল—বোধ হয় ঈদমিলাপ, বুয়াজীর বাড়ীতে বিরাট খানাপিনার ইন্তেজাম হয়েছে। কোকোকোলার বোতল—রাহাফজার খুসবু, পিয়ানোর টুংটাংটেপরেকর্ডারে বিলিতি বাজনা, তার সঙ্গে ফরাসে দস্তরখানের ওপরে সব নানা জায়বেজার খাবারের ইন্তেজাম। পোলাউ খাওয়ার আমাদের অবস্থা নয়, কিন্তু আমার আম্মীর হাতের গোস্ত পোলাউ খুব ভাল উতরোয়। বুয়াজী তাই মাকে ডেকে পাঠালেন পোলাউ পাকাতে', অবশ্য বাড়ীতে কামকাজ পড়লেই আমাদের ডাক পড়ে।

অত লোকের পোলাউ মস্ত ভেক—আমিও সাহায্য করছি মাকে। নাদিরার সহেলীরা সব সেজে গুজে মাথায় নানা রকম চুলের শো দিয়ে এসেছে। আন্নীশও রয়েছে তাদের মধ্যে। ঈদের নতুন জামা কাপড়—আঁটো ব্রোকেটের কামিজ সাটিনের গারারা—জরীদার শালোয়ার কামিজে চম চম করছে সকলে, তার সঙ্গে যোগ হয়েছে মেহ্‌দি রাঙ্গা হাতে নানা রংএর কাঁচের চুড়ি আর পায়ের নতুন সুনহেরী চপ্পল।

বুয়াজী সেজেছেন সাদা দামী কাপড়ের শালোয়ার কামিজে। দোপাট্টায় তাঁর লেশের বাহার, আর গয়না পরেছেন সব মুক্তোর। নাকের হীরেটা জলজল করে জলছে তাঁর। কাপড় বাঁচিয়ে একবার করে রসোইতে উঁকি দিচ্ছেন আবার উঠোন পেরিয়ে চলে যাচ্ছেন ওদিকের বসার ঘরে। একঘরে সব ছেলেরা দাওয়াতে বসেছে,

পাঠাচ্ছে আর চাইছে মিঠা চাউল, আমিও সমানে ডেক থেকে গরম পোলাউ বার করে করে ঢাকনি দেওয়া বাসনে ভরে ভরে পাঠিয়ে দিচ্ছি। যা ফেরত আসছে তা আবার ডেক এ ঢেলে রাখছি। একবার দেখি আফতাব এসে দাঁড়িয়েছে রসোই ঘরের দরজায়, বুয়াজী একটু বিরক্ত হয়ে ওর দিকে তাকাতে সে বলল, বাঃ আমিনা যাবে না একবার ওখানে। আমার চোখের সঙ্গে চোখ মিলতে ও বলল চল, বসার ঘরে চল একটু, সারাদিন কি এইই করবে নাকি?

সে তো বলে খালাস, কিন্তু আমিই বা যাই কি করে? না আছে আমার অমন নতুন পোষাক-আসাক আর না করেছি সাজগোজ। ঘামে ভেজা মুখটা জল দিয়ে একটু ধুয়ে ওর কথায় তবু একবার চলেই গেলাম বসার ঘরে। কিন্তু না এলেই বোধ হয় ভাল হত। আমি গিয়ে দাঁড়াতেই সবার চোখ পড়ল আমার দিকে—কে যেন একটি মেয়ে নাদিরাকে জিজ্ঞেস করল—ও কে? নাদিরা তার উত্তরে তাচ্ছিল্যের মত করে বলল—ও! ও একজন মুলাজিমা কাজ করে আমাদের বাড়ীতে। অপমানে আর লজ্জায় আমার কান মাথা ঝাঁ ঝাঁ করে উঠেছে তখন। মাথাটা একটু ঘুরেই গিয়েছিল বোধ হয়। কোণে রাখা বড় ফুলদানিটা ধরতে গেছি হাত লেগে পড়ে গিয়ে সেটা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। টলতে টলতে চলে এলাম রসুইতে। মা আমায় দেখেই ধমকে উঠল—কোথায় গিয়েছিলি! ধনেপাতা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে এবার কাবাবগুলো সাজিয়ে ফ্যাল প্লেটে প্লেটে। পেছনে তাকাতে দেখি নাদিরা আর আন্নীশও এসেছে আমার পেছু পেছু—শ্লেষের মত করে বলল এটা কি করে এলে তুমি! ওদের পাশ থেকে আর একটি কে মেয়ে বলে উঠল, —বাবাঃ কারুর বাড়ীর নোকরাণী যে এত সুন্দর হয় এতো কখন দেখিনি! আফতাবও এসেছে—পাশ থেকে টিটকিরির মত করে বলে উঠল যা বলেছ রাবেয়া! অনেককে আবার দামী পোষাক পরেও ঝি চাকরাণীর মতই দেখায়! আন্নীশ আর নাদিরা, কালো ভীষণ রেগে গেল ওরা একথা শুনে।

আমরা গরীব, এরা বড় লোক আত্মীয়। আম্মা ওদের কাছে সাহায্যের আশা রাখে। তাই ওদের টাকার খয়রাতকে গতর দিয়ে শোধ দেয়।

খাওয়া দাওয়ার পর রাত্রে ওরা সব সিনেমা যাবে। নীচু হয়ে বসে আমি তখন দস্তর খান থেকে অল্প অল্প খাবারভরা সব বাসনগুলো খালি করছি। মাংসর জায়গায় মাংস, পোলাউএর জায়গায় পোলাউ, ঢেলে ঢেলে রাখছি। শালোয়ারটা মাংসের ঝোল লেগে নোংরা হয়ে গেছে। কামিজ টায় কি করে বা কালি লেগে গেছে। একরাশ কোঁকড়া চুল বিনুনী থেকে বেরিয়ে এসে মুখের দুপাশে এলোমেলো হয়ে ঝুলছে। আমার দিকে মায়ার চোখে তাকিয়ে আফতাব নাদিরাকে বলল—সবাই তোমরা সিনেমা যাবে আর এ বেচারী বাদ। তাচ্ছিল্যের গলায় নাদিরা বলল—কি যে বল তুমি ভাইয়া। ওর ঐ নোংরা জামা কাপড়। উড়ুখুড়ু চুল। তাছাড়া আমাদের আর সময়ই বা কোথায়। হাত থেকে নিজের খাওয়া প্লেটটা নামিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে বলে—চলতো, গাড়ী আনো তুমি। যেন তক্ষুণি মনে পড়তে বলল, আর কাল আমরা পিকনিকে যাব—তুমিও আসছ তো আমাদের সঙ্গে।

আফতাব গম্ভীর গলায় বলল না, আমায় অনেক দূরে কল-এ যেতে হবে।

গলায় আদর ঢেলে নাদিরা বলল—ছাড়ো তোমার কল—চোখ মটকে বলল, ভাইজান! তোমার হবু বিবি আন্নীশও তো থাকছে সঙ্গে।

আফতাব চলে যেতে যেতে বিরক্ত গলায় বলে গেল—থাকে থাক—আমার অত সব মেকী সাজ দেখার গরজ নেই—আমার বিবি আমার জন্য রান্না করে নোংরা কাপড়ে আমার কাছে এসে দাঁড়ালেই বরং আমি বেশী খুশী হব।

আমার দিকে আগুন চোখে তাকিয়ে হাত ধুতে গেল নাদিরা।

হাসির হররা তুলে ওরা সব চলে গেল সিনেমায়। ঈদএর আজ চার দিন। আসমানে ছেঁড়া ছেঁড়া বাদল জমেছে এই শীতেও। কাজ কাম শেষ করে সামনের বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে আছি হঠাৎ যেন পেছন থেকে কেউ একটা শাল নিয়ে জড়িয়ে দিল গায়। চমকে ফিরে তাকাতেই দেখি আফতাব। বললাম, তুমি যাওনি সিনেমায়? আস্তে করে বলল না, টিকিট পাইনি, আবার গিয়ে

ওদের নিয়ে আসব। তেমনি করে হাসছে ও, আমার মাথায় হাত রেখে আদর করে বলল—কি সুন্দর দুটো চোখ তোমার আমিনা—ভীরু তিতির আর ভরা বাদলের ভাষা যেন তোমার চোখে। আর তেমনি সাগরের ঢেউ তোমার রেশমের মত চুলে। পরবরদিগার বোধ হয় একান্তে বসে বড় যত্ন গড়েছিলেন তোমায়। তাইতো তোমায় হিংসে করে ওরা ঐ সব কথা বলে, দুঃখ পেয়োনা তুমি। ঐটুকু সান্ত্বনার ছোঁয়া পেয়েই চোখের জল আর বাধা মানেনি তখন আমার। রাত্রে সিনেমা থেকে ফিরে নাদিরার সে আমাকে কি শাসানী। বলে রূপ দেখিয়ে যাদু করবে ভেবেছ আমার লেখা পড়া জানা ভাইকে! লজ্জা করে না তোমার! বেশরম! গায়ে পড়ে ভাব জমাতে চাওয়া? দাঁড়াও বলে দিচ্ছি সব আম্মীকে!

এরপরে মায়ের কান্না, বুয়াজীর বকুনি! হুকুমের মত করে বলে দিলেন আর কখনো তোমাদের আমার বাড়ী আসতে দিচ্ছি—ভাল করে!

আমরা যাইনি, তবে আফতাব এসেছে, ফাঁক পেলেই আমায় সান্ত্বনা দিয়েছে। আমিও তাকে মুখ ফুটে বলতে পারিনি যে, এ বিয়ে হবার নয়। ঐ আফতাবের আলোয় আলো হয়ে থেকেছে আমার মন। নতুন করে খুশী জেগেছে মনে। বুয়াজীর সেই অপচ্ছেদ্দা করে আমার ভাইবোনদের খেতে দেওয়া, মাকে দয়া দেখান, নাদিরার নীচা নজর, কটু কথা সব ভুলে গেছি। শুধু আফতাব আর আফতাব। আমার সমস্ত সত্ত্বায় যেন ছেয়ে গিয়েছিল সে।

সেদিনে খবর এলো নাদিরার সাদির। জামাই মস্ত বড়লোক। বোম্বাইতে বিরাট কারবার। বিলেত ফেরত ছেলে। জলে জল বাঁধে। ভালই হোল। এদের মত জামাইও পর্দা মানেনা, সে তাই নিজেই আসছে মেয়ে কে দেখতে। তার বাবা মা কেউ নেই। সঙ্গে অবশ্য চাচা আসছে।

বড় কাম কাজে আম্মীকে না হলে আর চলবে কি করে। সব দিকে সামাল দিয়ে অত টেনে কে সব করবে। তাই জরুরতে পড়ে বুয়াজী নিজেই এলেন গাড়ী নিয়ে। মায়ের হাত ধরে বললেন—যা হবার হয়ে গেছে বহেন—চল। করছেন তিনি এত ভাল রিস্তা পেয়ে। হবু জামাইএর প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ।

আদুরে মেয়ে নাদিরা। তার আবার আশীর্ব্বাদ। ওঃ, সেকি ধুম। মিস্ত্রী লেগে চারদিনে রং ফিরিয়ে চমক এনে দিল বাড়ীতে। বাগিচার মালি লন ছেঁটে একেবারে সবুজ মখমলি জমীন বানিয়ে দিল। তিনজন দর্জি বসে গেছে, কত রং বেরংএর জরীর কামদার—ভেলভেট —নাইলন—লেশএর সালোয়ার কামিজ সেলাই হচ্ছে। নাদিরার আবার তা সব পছন্দ নয়, সে নিজেই বড় বড় দোকানে ঘুরে চমৎকার চমৎকার সব পোষাক, শাল, পশমী জামা—জুতো কিনে কিনে আনছে। তার সঙ্গে আসছে কত রকম ডিজাইনের কত জড়োয়া আর মুক্তোর জেবর. গহনা। বরের স্যুট, শাল, ঘড়ি, বোতাম তো আছেই।

আর সময়ও নেই। বোম্বে থেকে হাওয়াই জাহাজে আসছে দুলহন। দুপক্ষের কথাবার্তা প্রায় সব পাকা। এখন পাকা দেখা হলেই বিয়ে। মাঙ্গনীর পর প্রথামত অপেক্ষা করতেও রাজী নয় দুলহা। বিয়ে করেই সে নাদিরাকে নিয়ে হাওয়াই জাহাজে বম্বে চলে যাবে।

নেমন্তন্ন চিঠি গুলো যা ছাড়তে দেরী। প্রথম দিনে মাঙ্গনী—দ্বিতীয় দিনে নিকাহ্—সেই রাত্রেই শাদি। এর মধ্যেই আত্মীয় স্বজনে বাড়ী ভরে গেছে। ডেকরেটর ঘর সাজিয়ে দিয়ে গেছে। তারপর খবর হল—দুলহন এসে গেছে। লখ্‌নৌএর সব চেয়ে দামী আর নামী হোটেলে সে উঠেওছে।

সকাল থেকে নানারকম খানাপাকানর ধুম পড়েছে। আজ দুলহা আসবে বাড়ীতে তারপরই মাঙ্গনী, আর খাওয়ান-দাওয়ান। নাদিরার এক ব্রোকেটের জামা তৈরী হয়েছে হলদে রংএর। অনেক দাম। সে তাই পরেই উপটন মাখবে। বুয়াজী বলেছেন পরে ঐ জামাটা তিনি আমায় দেবেন। কথায় বলে ঐ উপটন এর হলুদে হলদে হয়ে যাওয়া জামা যে গায় দেয়, তারও নাকি তাড়াতাড়ি বিয়ে হয়ে যায়! লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছিলাম আমি। নাদিরার তো আর ঠমকে এখন মাটিতে পা-ই পড়ছে না। সখীদের ঘেরার মধ্যে

দুটো রসোই ঘরে রসোই হচ্ছে একসাথে। রাত্রে দাওয়াত। বিকেলে দুলহা আসবে। ওদিকের রসোইতে বাবুর্চিতে মুর্গমুসল্লম শ্রীমান আর পান বানাচ্ছে। বাদাম পেস্তা দিয়ে সেঁউই এর মিঠাই হয়েছে। আর এই রসোইতে তিনমুখী মস্ত কাঠের উনুনে ফুটছে গোস্ত শালন। আম্মীর তৈরী গোস্ত পোলাউএর মস্ত ডেক দমে বসেছে—কাঁচা কিমার কাবাব বানাচ্ছে এখন আম্মী। ওদিকে নাসরা আপা এবাড়ীর রাঁধুনি তন্দুরে রুটি সেঁকছে আর আমি রাশিকৃত মাংসর সিঙ্গাড়ায় পুর ভরছি। রসুই ঘরটা বড্ড গরম। আম্মীর মুখটা আগুণের আঁচে লাল হয়ে উঠেছে। আমার চোখ জ্বলছে কাঠের ধোঁয়ায়। কোন রকমে পুর ভরে চলেছি এত কষ্ট হচ্ছে কিন্তু মনের কোণে কোথায় যেন আনন্দের একটু রেশও রয়েছে, ভাবছি এতো আমার নিজের বাড়ীরই কাজ—কষ্ট হলেইবা চলবে কেন। সিঙ্গাড়া গুলো এবার ভেজে ফেলতে হবে, আমার দশা দেখে নাশরা আপা এসে বলল,—দাওনা, আমি একটু হাত লাগাই, একা আর তুমি কত করবে।

তক্ষুণি পেছন থেকে বুয়াজীর শাসনের মত হুকুম শোনা গেল—বললেন, নাশরা। তন্দুরের রুটী ঠোকা শেষ হয়ে গিয়েছে তো পুদিনা পিসতে বোস। দইএরমাঠা বানিয়ে ফেল এবার পুদিনার রস দিয়ে। তাচ্ছিল্যের মত করে আমায় বললেন ঐ কটা সিঙ্গাড়া আর একা গড়ে ভাজতে পারবেনা তুমি। বল'তো নয় আমিই তবে হাত লাগাই। সম্ভ্রমের গলায় তাড়াতাড়ি করে বলি—না না, আমিই করছি বুয়াজী। ফুটন্ত ঘিয়ে সবে কিছু সিঙ্গাড়া ছেড়েছি অমনি শোর উঠল দুলহা এসেছে। ঐ দুলহা মিয়া এসে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে জুতোর খট খট, পট পট আওয়াজ তুলে মেয়েরা সব ছুটল সামনেরবারান্দায়—নাশরা আপা আমায় আজ ডাকল তবু সিঙ্গাড়া কটা কড়া থেকে তুলে রেখে আমার যেতে একটু দেরীই হয়ে গেল। উঠোন পেরিয়েঘর—পেরিয়ে ভবে বারান্দা। নীচের সিঁড়ি উঠানে উঠেছে। আমি ছুটে উঠোনে পৌছতে না পৌছতেই দেখলাম পিশেমশাই যেন কার পিঠে হাত রেখে জড়িয়ে নিয়ে ওপরে উঠছেন, একেবারে ওঁদের সামনে পড়ে গেলাম আমি আশেপাশে আর কোন মেয়ে নেই। একটু থ খেয়ে দাঁড়িয়ে আবার ছুট্টে রান্নাঘরেই ফিরে এলাম। ছিঃ ছিঃ কি লজ্জা। কি লজ্জা। ঐ নিশ্চয়ই বর। আর আমি কিনা এই নোংরা পোষাকে একেবারে গিয়ে তার সামনে পড়ে গেলাম।

তারপর তো এলাহি কাণ্ড একদণ্ড নিঃশ্বাস ফেলার ফুরসত নেই। পান, শরবত, ফুলেরমালা, আঙ্গণভরা আলোর মালা, লোকজন-গান-বাজনা খাওয়া দাওয়া। তিন চার ক্ষেপ করে মেয়ে পুরুষের আলাদা আলাদা দস্তরখান পড়ল। রান্নাঘরে বসে একদফা সব প্লেট সাজিয়ে পাঠান, আবার খাওয়ার পর যে খাবার বাঁচছে সেই সব প্লেট খালি করে ধোয়ান, একটা ঝোঁকের মধ্যে আম্মীর সঙ্গে সমানে এইই করে চলেছি।

অনেক রাত হয়ে গেছে। মেহমানরা সব খানা-পিনা শেষে চলে গেছে। দুলহাও তার হোটেলে ফিরে গেছে। আঙ্গনের ধারে একটা জলরাখা ছোট কুঠুরি। তার পাশে আর একটা ছোট ঘর। আঙ্গনের ওদিকে ওদের খানা কামরা, ড্রয়িংরুম, শোবার ঘর। ওদিকে আমরা থাকিনা। যখনই আসি এই ছোট ঘরটায় থাকি আমরা। সারাদিনের খাটুনীতে ঘরের ভেতরে অঘোরে ঘুমোচ্ছে আম্মী। আমার চোখে ঘুম নেই, রসোইএর গরমে তখনো যেন আমার গা মাথা জ্বলছে। আঙ্গণে একটা চারপাই পড়েছিল সেটাতেই শুয়ে পড়েছি। হঠাৎ কেউ মাথায় হাত রাখতে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম! দেখি পিশেমশাই। তাড়াতাড়ি করে মাথায় গায়ে দোপাট্টা জড়িয়ে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে তসলিম দিলাম। ইনি মানুষটি বড় গম্ভীর, কখনই আমাদের সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তা বলেন না। কিন্তু কেন জানিনা আমার পিশিমার চেয়েও ওঁকে অনেক বেশী আপন মনে হয়। ওঁর চোখের ঐ প্রশ্রয়ের মত স্নেহমাখা দৃষ্টি টুকুর জন্যেই যেন একটা শ্রদ্ধা মেশান আত্মীয়তার আসন উনি গড়ে নিয়েছেন আমার মনে। ওঁকে মনে হয় পিশিমার সংসারের আওতার বাইরের। যেন আমাদেরই মত অসহায় অবস্থা ওঁর। কিন্তু এভাবে এত রাত্রে ওঁকে আমার কাছে দেখে সত্যিই কিছু ঠাহর করতে পারছিলাম না যেন। এতরাত্রে এভাবে গায়ে হাত দিতে গাটা যেন

কেমন ছম ছম করছিল। আমরা গরীব, তাবলে আমার জওয়ানী তো গরীব নয়! নাহলে ঐ দাদুর বয়সী রহিমশেখ ঘর থেকে টাকা দিয়ে আমায় শাদি করতে চায়। আব্বাজানের মতই ভক্তি তাঁকে করি কিন্তু তবুও, ভরসা কি। কিন্তু যখন তিনি দুঃখের মত করে বললেন,—দুলহা ফিরে গেল আমিনা। মাঙ্গনী হলনা। তখন আমার ভয় কাটল। আমারও মনে হল—সত্যিতো মাঙ্গনী তো হয়নি। বুয়াজী তখন অবশ্য কৈফিয়তের মত করে সবাইকে বলেছিলেন দুলহামিয়ার চাচাজী নাকি জেবর-গহনা আনতে ভুলে গেছেন, তাই খানা পিনা সবই হয়ে রইল শুধু আশীর্ব্বাদটা কাল হবে! কাজের ঝোঁকে তখন সে সবকথা ভাল করে শুনিও নি আমি!

কিন্তু পিশেমশাই একি কথা বলছেন! বলছেন,—আমিনা নিকাহর সময় তো তোমাকেই তিনবার "হ্যাঁ" বলতে হবে, তাই সবচেয়ে আগে কথাটা তোমাকেই বলছি। আমার তখন মাথার ভেতরে ঝাঁ ঝাঁ করছে, আর তিনি দুঃখের মত করে বলেই চলেছেন—বুঝলে আমিনা! দুলহার আমাদের বাড়ীর চালচলন, তোমার পিশিমার ঠাটঠমক সবই পশন্দ হয়েছিল, শুধু পশন্দ হয়নি তাঁর মেয়েটিকে! তা তুমিও তো আমার বেটী, তোমার আব্বা তো আমার জিগরি দোস্ত ছিল! তোমার সাদীও তো আমাকেই দিতে হবে—তাই নাদিরাকে সে পশন্দ না করে তোমায় করেছে বলে আমার কেন ক্ষোভ নেই!

এদিকে আমি তো তখন মনের ভেতরে লজ্জায়—ভয়ে মরে যাচ্ছি! ভাবছি বুয়াজী এরপরে তাহলে কি করবেন। আম্মীকে তিনি কি ছেড়ে কথা কইবেন! অন্য কারণেও আমার চোখের জল বাধা মানছেনা—মনের ভেতরে তাই চিৎকার করে বলছি—না পিশেমশাই না, তা হয় না, আমি যে আপনার বাড়ীর বৌ, আমাকে আপনি কেন অন্যের হাতে তুলে দিচ্ছেন! কি করে দিচ্ছেন! এই বাড়ীঘর, আপনাদের সবাই কে যে আমি আমার নিজের বলেই ভেবেছি! মনের ভেতরে জানতাম আফতাবের বিবি হয়ে এলে একমাত্র এই মানুষটির কাছেই যা একটু স্নেহের পরশ পাব। যখন বা তাঁর পায়ের কাছে বসে পড়েছিলাম, আমার চোখের জলে তাঁর পা ভিজে গেল কিন্তু লজ্জায় একটা কথাও ফুটল না আমার মুখে! হাত ধরে আমায় তুলে বসালেন তিনি। আর আমার এই চুপ থাকাটাকে ধরে নিলেন সম্মতি! মনের ভেতরে তখনো আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে আমি না পারি আফতাব পারবে। এবার অন্ততঃ সে আফতাবের মত জ্বলে উঠে ঠিকই নিজের অধিকার জারী করবে!

নাঃ, সে সব কিছুই হোলনা। শুধু যা হবার তাই পর পর হয়ে গেল। পরের দিনই নিকাহ, সেই রাত্রেই সাদী। লোকজন—হৈ হল্লা—দাওয়াত আম্মীর আনন্দে ভাসা চোখের জল, বুয়াজী আর নাদিরার হুল ফোটান কথা, আফতাবের অসহায় চাউনি সব পেছনে ফেলে শেষ পর্য্যন্ত নাদিরার বদলে আমিই দুলহন সেজে হাওয়াই জাহাজে চড়ে চলে এলাম এখানে!

যে আমাকে যেচে দুলহন্ করে এনেছে সে সব সময় আমার সুখ সুবিধের খেয়ালও রাখে, পরছায়ের মত সে আমার পেছু পেছু ঘোরে আমি তার বেগম, সেই কাজ আমিও যতটা পারি তাকে সেবা দিয়ে, সঙ্গ দিয়ে পুরাকরি! কিন্তু আমার মনের মেঘ কাটল কই! নীচের পোর্টিকোয় কখন গাড়ী থেমেছে, ওরা এসেছে, বারান্দায় দাঁড়িয়েও আমি তার কিছু দেখিনি কিছু শুনিওনি। হঠাৎ পেছনে ভরা গলার বড় চেনা আওয়াজ। সে ডাকল—আমিনা! মনের ভেতরে পর্য্যন্ত যেন চমকে উঠলাম আমি! বললাম—এ কি! তুমি আবার কেন! সেই তেমনি পাগল করা হাসি হেসে আফতাব বলল, বারে! আজ যে তোমার সলিগিরা! একটা কাজে বম্বে এসেছিলাম তাই তোফা এনেছি তোমার জন্য! একটা চমৎকার চাঁদির কৌটা সে আমার হাতে দিল। আর সাদেক মিয়া দিল একটা শাড়ীর প্যাকেট। সে আবার শাড়ী পরা বড় ভালবাসে। আদর মেশান আদেশের গলায় সে বলল যাও বহু-বেগম! জলদি তৈয়ার হয়ে নাও, এক্ষুনি সব অতিথিরা আসতে শুরু করবে। আর এই আসলি মেহ-মানের খোয়াগ তো আমিই করছি। এই বলে আফতাবের পিঠে হাত রেখে তাকে নিয়ে বসার কামরার দিকে চলে গেল সে।

আমার কামরার নাইলন লেশের পর্দা গুলো হাওয়ায় দুলে দুলে ফুলে ফুলে উঠছে। তবে কি ওরাও আমার মনের ইসারা পেয়েছে!

ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে প্রথমে আফতাবের চাঁদির কৌটো খুললাম। তারমধ্যে একি। সেই ফুলদানি ভাঙ্গা রঙিন কাঁচের টুকরো গুলো জ্বল জ্বল করছে! আর সাদেক মিয়ার প্যাকেটটা খুলতেই একটা সুখলাল রুপোলী জরীর কাজে ঠাসা চমৎকার শাড়ী বেরিয়ে এলো। এই সাদেক মিয়ার আর কিছুই ছিলনা, ছিল সাহস! সেই সাহসের জোরেই সে আমার শাদির লাল জোড়ায় মুড়ে দিয়েছে। আর আফতাবের ছিল মেকী চমক। মিথ্যেই তার নাম ঐ সূর্য (আফতাব)! তাই সে নিজেও ঐ কাঁচের টুকরোর মত ভেঙ্গে গুড়িয়ে গেছে, আর আমার মনের মধ্যেও তার সেই পেয়ার উলফত আর মমতার স্মৃতি কাঁচে কাটা ঘায়ের মত চিন চিন করে জ্বলছে।

বাইরে অঝোর ধারে বর্ষা নামল! ঠাণ্ডা ভিজে বাতাসের ঝাপটা আসছে ঘরে। এই বাদল শেষে কি তবে চাঁদ তারার আলোয় আবার আসমান হেসে উঠবে। সত্যিকারের সাহসই বোধহয় শেষ অবধি সব দুঃখের বাদল কাটিয়ে দিয়ে এমনি করে হেসে ওঠে। জোরে বিজলী চমকালো আর চমকালো সাদেকের আনা টুকটুকে লাল শাড়ীটার রূপালী জরী। আমি এামি এবার হাত বাড়িয়ে অসঙ্কোচে সেই সুন্দর শাড়ীটাই বুকে তুলে নিলাম।

স্যার সুরেন্দ্রনাথ

শ্রীকুমুদ রঞ্জন মল্লিক

বাঙালীর তেজস্বিতা তোমাতে প্রকট,
দুপ্রধর্ষ বীর তুমি 'Surrender not,
গুল্ম রাজ্যে উচ্চশির, হে অক্ষয় বট—
নৃপতি কিরীট হীন 'Surrender not'।
এক করা খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত
তোমার আদর্শ ছিল—দেখাইলে পথ।
তুমি যে সুদূরদর্শী, হে কল্যাণকৃৎ
মিলন সৌধের তুমি পাতিয়াছ ভিত।
জানি জনগণ স্মৃতি স্বল্প ক্ষণস্থায়ী,
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সে নায়কে আজ মনে নাহি।
যাহার মর্মর মূর্ত্তি চিরস্মরণীয়—
গড় নাই, সর্ব্ব অগ্রে তাহাই গড়িও।
বজ্রগর্ভ অগ্নিগর্ভ যে বাগ্মীর ভাষা
এ জাতিকে দিয়াছিল আকাঙ্ক্ষা আশা,
ভুলিয়াছি তাঁকে, বড় তুল্য যার নাই—

॥ এই সব রমণীরা ॥

নচিকেতা ভরদ্বাজ

এই সব রমণীরা একদিন নদী হয়ে বয়ে যাবে—,
এসব প্রান্তরে
ঝরাবে কুয়াশা-ফুল, জীবনানন্দের মত একথা আমিও
জেনে গেছি-এই সব শিশু-নারী, কিশোরী ও
উদ্ভিন্নযৌবনা
সকলেই রমনীতে রূপান্তর নেবে ঘরেঘরে।
তবুও তো কেউ কেউ থেকে যায় অবাক উত্তীয়,
কেউ কেউ বজ্রসেন, শ্যামার সহেলী অন্যমনা
একা একা অন্ধকারে। তা না হলে সমুদ্রে যাবেই
সমস্ত নদীর জল—দুই তীরে অজস্র ফলিয়ে ফসল
সবুজের সমারোহ—নগর—বন্দর রাজধানী।
অন্ধকার তবু জেনো আমাদের স্থির চৈতন্যেই
ধরা পড়ে। তাই এই সম্ভ্রান্ত কল্লোল
চারিদিকে দৃপ্ত এই মহানাটকের।
কুশীলব সবাই বিজ্ঞানী
না হয়েও পথ চলে বিজ্ঞানের আশ্চর্য নিয়মে।

ক্ষুধা তৃষ্ণার সংসারে সতী

জয়শ্রী চক্রবর্তী

রাতের অন্ধকারে, প্রকাশ্য রাজপথে লুটিয়ে পড়ে গড়াগড়ি দিচ্ছিল এক মাতাল। মুখে তার অনর্গল—অসংলগ্ন কথার ফোয়ারা! সমাজের ওপর নিদারুণ বিক্ষোভ এবং বিতৃষ্ণা, কথাগুলোর মধ্যে ভয়ানক ঘৃণা উপচে পড়ছিল। কখনো সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। কখনো তার উল্লাসকর হাসি—রাজপথের অন্ধকারকে কাঁপিয়ে তুলছিল। পাশেই ল্যাম্প পোষ্টের আলোটা, তীর্য্যক হয়ে পড়েছিল, দূরের প্রহরারত পুলিশ এগিয়ে এসে দেখলো—একজন মাতালই বটে! কিন্তু সে পুরুষ নয়, নারী। অবিন্যস্ত আলুলায়িত কেশে, বিলোল কটাক্ষে—মহানগরীর আলো আঁধারীর জগৎকে নিরীক্ষণ করছিল, আরো আশ্চর্য, কোন পথচারীকে দেখা মাত্রই, তার অধিকতর সুরামত্ত উল্লাস জাগছিল, বিচিত্র ভাব ভঙ্গিতে, কদর্য ইঙ্গিত করতে পর্যন্ত দ্বিধা জাগছিল না! একেবারেই—বে—সামাল মাতাল…

এই প্রথম রাজপথের ধুলা ধুসর পথ থেকে—মত্ত প্রলাপিনী নারীকে—সেই প্রহরারত পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল। তারপর তার বিরুদ্ধে, দণ্ডবিধির কঠিন ধারায়—অভিযোগ আনা হয়েছিল এই বলে, উন্মুক্ত রাজপথে, প্রকাশ্য লোকালয়ে—সুরা মত্ততার বশে অশালীন আচরণে—অশোভনীয় দৃশ্যের অবতারণা করা—বিশেষত একজন নারী হিসেবে. এই ব্যভিচারের দৃষ্টান্ত—সমাজের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর!

আদালতে যেদিন সেই নারীর বিচার আরম্ভ হোল সেদিন—আদালত কক্ষ কৌতূহলী জনতায় পরিপূর্ণ! অপরাধের ইতিহাসে—উন্মুক্ত রাজপথে কোন নারীর পান মত্ততায় অশালীন দৃশ্য সৃষ্টি করা সেই প্রথম ঘটনা। কাজেই, আগ্রহী দর্শকের একটু ভীড় হ'য়েছিল বেশী।

কাঠগড়ায় উঠে দাঁড়ালো সেই বাঙালী বধূ। যার লাজুক মুখের—দৃশ্য পটে ফুটেছিল—এক নম্র সৌন্দর্য! যার শান্ত পূর্ণ মুখের ছায়ায় কোন ঘৃণিত অপরাধের চিহ্ন ছিল না! ঘর বধূর সেই লাজ বরণী মুখটি প্রায় ঢেকে রেখেছিল—দীর্ঘ অবগুণ্ঠনের অন্তরাল! সঙ্কুচিত দেহ ভারে আশ্চর্য, জড়তা জড়িয়েছিল, সে এক অপূর্ব মূর্তি! অপরূপ রূপের মাধুরী! সেদিকে সকলে বিস্ময়ে চেয়ে রইলো। স্বয়ং দণ্ডদাতাও দীর্ঘ সময়ের জন্য—সেই লাজ বরণী বধূ রূপকে, অপলক নেত্রে অপরিমিত বিস্ময়ে—দর্শন করতে লাগলেন? সন্দেহ দোলায় জোড়া ভ্রু কুঁকরে উঠলো। আশ্চর্য, এই রমণীকেই—সুরা মত্ত অবস্থায় পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল?

এযে সাক্ষাৎ দেবী মূর্তি! লক্ষ্মী স্বরূপা! নিস্তব্ধ আদালত গৃহ থম্ থম্ করতে থাকে। তার বোবা কণ্ঠ স্বরে, অবাক সুর বেজে ওঠে। পরিশেষে বিচারক যা যা জিজ্ঞেস করেছিলেন, তার সব উত্তরই সতী দিয়েছিল। ভীতা হরিণীর কণ্ঠ স্বর কেঁপে উঠলেও, সে সব সত্যই স্বীকার করেছিল। এক সময় অবগুণ্ঠনের সরে গিয়েছিল, সতীর সমস্ত মুখখানা দেখা যাচ্ছিল, অপ্রশস্ত কপাল জুড়ে সিঁদুরের টিপ,ঘন কেশের জোবা পথের মত টানা সরু সিঁথিতে—যেন পলাশ ফুল ছড়িয়েছিল। দু'টি নিটোল হাতে—শাঁখা এবং পরনে লাল চওড়া পাড় শাড়ী। সতীর লক্ষ্মীর মত রূপ যেন তাতেই ঠিকরে পড়ছিল।

সতী তার দীর্ঘ জীবনে জবানী দিচ্ছিল—অশ্রু ভারাক্রান্ত মধ্য রাতের রাজপথকে ভেবেছিলাম, আমার সেই ষ্টেশনের ভেরা, মনে হচ্ছিল—শিকারী বাবুদের ঝাঁক থেকে পালিয়ে এসেছি। আমার ছেলে মেয়েরা না খেয়ে বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছিল—ফিরতে কাল রাত হয়। ওদের

একে একে ঠেলে তুলতে গিয়ে অনুভব করলাম আমার কাছে কেউ নেই। নিশ্চয় অন্য জায়গায় এসে পড়েছি। তখন জ্ঞান ছিল না। কি যে করেছিলাম—কিছুই জানি না…

তারপর ?

সতী চুপ করে কাঁদতে লাগলো। আঁচলের তলায় আড়াল করে নিল অশ্রুপ্লাবিত মুখখানিকে। এত চোখের জলকে যেন বাঁধ দেওয়া যাচ্ছে না। সেই অবারিত জলের ধারা যেন, বন্যার মত ছুটে আসছিল।

সতী সুরু করেছিল আবার তার জবানী।

উনিশশো পঞ্চাশ সালের পর, দাঙ্গা বিধ্বস্ত পূর্ব বাংলা থেকে সে পালিয়ে এসেছিল স্বামীর সংগে। এ দেশে এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল, ভেবেছিল এখানে আর সতী নারীর লাঞ্ছিত হবার ভয় নেই। কিন্তু নিঃসম্বল নিঃসহায় অবস্থায় ওদের ডেরা বাঁধতে হয়েছিল ষ্টেশনের ধারে! আজও যে সংসারটা খোলা আকাশের নীচে ঝড় ঝঞ্ঝা জল শীতে রোদ্দুরে কেঁপে ওঠে। যার নীচে চারটি ক্ষুধার্ত শিশুর আর্ত কান্না অনবরত শোনা যায়। কিন্তু সতীর স্বামী শত চেষ্টা করেও একটি চাকরী জোটাতে পারেনি। ফলে অনাহারে অনিদ্রায় দুশ্চিন্তায় তার উন্মাদ অবস্থা প্রকাশ পেলো। সেই অবস্থায় সে ষ্টেশনের ডেরা ছেড়ে কোথায় যেন নিরুদ্দেশ হয়ে গেল—আর ফিরে আসেনি সতীর সংসারে। অথচ যারা, সতীর কোলে, বুকের কাছে ছিল, তাদের দিনরাত ক্ষুধার্ত কান্না, সতীর চারটি শিশুর সেই অসহায় কাতরোক্তি শুনতে শুনতে, এক সময় সতীর মনে হোত, চারটে ক্ষুধায় আর্তরব ভরা কণ্ঠকে, চিরদিনের জন্য নীরব করে দিতে গলা টিপে মেরে ফেলে। নয় চলন্ত ট্রেণের তলায় ছুঁড়ে দিতে।

অসহ্য হয়ে সতী তাও করতে গেছে। আবার থমকে গেছে মায়ের অন্তরের মমতা, কোথায় যেন চুপিসারে লুকিয়ে থাকে। একটু সুযোগ পেলেই সে তেড়ে আসে, সেই যেন সতীকে মারতে আসে। তখনই দুচোখ দিয়ে অবাধ্য জলের ধারা নেমে আসতো। সমস্ত অপরাধ-বোধকে, মুহূর্ত মধ্যে ধুয়ে মুছে নিঃশেষ করে দিতো, তখন সতী তার চারটি শিশু সন্তানকে দুহাতে একসঙ্গে আঁকড়ে ধরে ওদের ধুলো ভর্ত্তি ক্ষুধার্ত মুখগুলিতে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিতো, আর ভগবানকে বলতো হায়! তুমি কি দুষ্টু! মায়ের মনকে কত ভাবেই না পরীক্ষা কর! কত দুঃখে তোমার এই নিষ্ঠুর খেলা সময় সময় সইতে হয়!

সতী কাঁদে! সংসারের শুধু খাওয়ার দাবী। যেখান থেকে হোক জুটিয়ে এনে দাও তবেই চুপ করবে খিদের শিশুগুলো। ওরা যেন সবাই মিলে যুক্তিকরে চেঁচাতো! মায়ের আঁচল টেনে, চুল ছিঁড়ে, মুখ খিমচে, সতীকে ডেরা থেকে কোথায় যেন পাঠিয়ে দিতে বাধ্য করতো। তখন সতীর মনে হোত ওই চারটে ক্ষুধার শিশুই মূর্তিমান শয়তান। ওরা সবাই মিলে যেন সতীর সম্ভ্রমকে পথের ধুলোয় মিশিয়ে দিতে চেয়েছিল।

তখন নিরুপায় অসহায় এক মা, চার শিশুর ষড়যন্ত্রে শেষে দেহ মন, দুটোকেই অল্পদামে বিক্রী করে ফেললো। ক্ষুধার জগতে বিচিত্র বেসাতিতে সতী তার সতীত্বকে বড় কষ্টে বেচে দিয়েছিল। ষ্টেশনের ধারে ঘুরে বেড়ানো শিকারী পয়সাওয়ালা বাবুদের দল আর পাঁচটা শিকারের মত, সতীকেও তারা শিকার করে নিয়েছিল। উদ্বাস্তু নারী জীবনের এক মর্মন্তুদ ইতিহাস রচনা হয়েছিল দেশ ভাগের পর। তাদেরই দলের একজন নারী এই সতী। যার সতীত্বের চেয়ে নিষ্ঠুর সত্য হয়েছিল, চারটে ক্ষুধার্ত শিশুর জঠর যন্ত্রণা সতীর সম্ভ্রমের চেয়েও তা দামী হয়ে উঠেছিল। তাই তুচ্ছ মূল্যেই এই মাকে তার সর্বস্ব বিকিয়ে দিতে হোল বিচিত্র সেই জীবন বেসাতির হাটে।

সতী বধূর লাজ নম্র মুখখানিকে ঢেকে দিতে আসতো রাত্রির অন্ধকার সেই যেন, এক নারীর সমস্ত লাজ, ভয়, মানকে নিমেষে অপহরণ করে নিয়ে যেতো। তখন সতীর অবগুণ্ঠনের সেই দুরন্ত রাত্রিটা, বিচিত্র প্রলোভনের ইশারায় অদ্ভুত হাসি হাসতো। ছেঁড়া কাঁথায় গড়ানো চারটি ক্লান্ত শিশুর ক্ষুধার্ত মুখের করুণ ছায়াটা কি ভীষণ কাতর মনে হোত।

তারপর কত রকম লোকের আনাগোনা। ষ্টেশনের পথ হাজার মানুষের ভীড়ে ভর্তি। সকলেই এক রকম নয়, সবাই এক মানুষও নয়। কত ভাল লোক, কত মন্দ লোক, কত জনের নির্লোভ হৃদয় অবহেলিত চাউনি, আবার কারো কাটাকে লোভের আগুন, সেই অনন্ত জ্বালায় যেন সতীর পবিত্র অঙ্গ পোড়াতে এসেছে।

তারই ঝলসে ওঠা—আলোর নতুন নতুন নোটের তাড়া—নতুন পয়সার চকচকে চেহারা দেখেছে সতী। কান পেতে শুনেছে—পয়সার বিচিত্র ঝন্‌ঝনে শব্দ! ক্ষুধার্তের, ব্যথিতের কানে—কি মিষ্টি ভাবেই না সেই শব্দ বাজতো! শুধু সতীর সংসারে ওটাই ছিল দুর্লভ। ও' গুলোর স্বাদ ছিল অজ্ঞাত। ওই সব অদ্ভুত ধাতুগুলোর বিনিময়ে ক্ষুধার্তের পেট ভরে, জঠর যন্ত্রণায় নিবৃত্তি হয়, কি চমৎকার একটা মহৌষধ, যা সতীকে প্রলুব্ধ করেছিল, অবাক করেছিল। দেখেছিল, ও'গুলোর চেয়ে সতীর সতীত্ব বড় নয়।

পেটের ক্ষিদেটা কি সাংঘাতিক। ঐ জঠরের ভয়ঙ্কর জন্তটা নির্বাক আনন্দে শুধু খেতে চায়, যার তাড়না প্রতি মুহূর্তে দেহের গরম খাঁচা ভেঙে খান্ খান্ করে ফেলতে চায়। তখন অসহায় মানুষের চোখের জলে একটা গভীর টলটলে দীঘি তৈরী হয়। তার মধ্যে ডুবে গিয়ে, কি আনন্দ কি দুঃখ কি ঘৃণাই না আসে। অপূর্ব নেই সাধে মরে গিয়ে ককিয়ে উঠতে ইচ্ছা করে, নয় নিজের কাঁচা রক্ত মাংসগুলো শুষে চিবিয়ে খেয়ে—সেই রাক্ষুসে ক্ষুধা নিবৃত্তি করা। নারকীয় ক্ষুধাটা যেন—তাতেই মিটতে চায়। নইলে, শিকারীদের শিকারে ধরা দেওয়া শেষ পর্যন্ত জীবনের টান ও দিকেই ছুটে যায়, যখন আর জীবনও নয়—মরণও নয়। জীবন্মৃত্যুর—কি চমৎকার একটা চেহারা! যাকে দেখলে, ভয় হয়, ঘৃণা হয়, নয় বিচিত্র ভালবাসায় ডুবে যেত ইচ্ছে হয় তারি দোসর হ'বার সাধ। বুঝি সেই সাধেই সতীর সতীত্ব বিক্রি হয়ে গেল। কেনা হোল জঠর জন্তটার কিছু খাদ্য। নিত্য প্রয়োজনই মেলে। রাতের সংসারে—সতীনারীদের—সতীত্ব কেনা বেচার বিচিত্র হাট বসে। দরাদরির বিরোধ নেই। কত অল্প দামেই অসহায় নারীদের দামী সত্বাগুলো বিক্রি হয় তারপর তাদের ভোগের বীভৎস ব্যাপার। দেখে শুনে প্রথমে একটু ভয় হোতে বৈকি। সতীর সেই ভীষণ লজ্জা ভয়ঙ্কর ভয় আসতো—খুব কাছে। কিন্তু ওই অসহায় অবস্থাকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিতো—আর এক ক্ষুধার মানুষগুলো। ওদের মুখে চোখে আদিম রাক্ষসটাকে দেখতো সতী। বীভৎস এক ক্ষুধা তৃষ্ণার কাতরতা। সংসারে এই অদ্ভুত ক্ষুধা—তৃষ্ণাকে বুঝতে পারেনি সতী—জীবনের এ সমস্ত যন্ত্রণার মানে।

তবু একটা যন্ত্রণার উপশম করতে গিয়ে—মানুষের আরো কত রকম যন্ত্রণা দেখেছিল সতী। ক্ষুধা কত রকমের, কত রকমের তৃষ্ণা, আসলে কোনটারই ঠিক নিবৃত্তি হয় না। উপশম হয় না। অলক্ষ্যে সতীর সতীত্ব বেচে, জঠর জন্তটার পেট ভরিয়ে, একটা দিকের তৃপ্তি আনলো কিন্তু কি একটা বোবা যন্ত্রণা, জীবনের সমস্ত গভীরে জড়িয়েছিল। তারও একটা ক্ষুধা সৃষ্টি হয়েছিল নতুন নিঃসত্বা করে। সমস্ত সত্ব বেচে দেওয়ার নিঃসহায়তা শূন্যতা পরিমাপহীন যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠেছিল তাকে নিরাময় করে তোলবার আশায় যেদিন সে রঙিন পানসে জলীয় পদার্থে চুমুক দিল, সেদিন সে একটা অদ্ভুত স্বাদ পেয়েছিল। বিষাদেও—বিভোরতার সুখ আছে বোধ হয়, তাতেও এক ধরণের আস্বাদনের তৃপ্তি।

নইলে, গোবিন্দলালের সুরাশক্তির সেটাই উৎকৃষ্ট প্রমাণ হোত না। ওরই বিচিত্র আনন্দ দরবারে সতীর এই বিভোর আস্বাদনের আকর্ষণ জাগে। গোবিন্দলালই ওকে শেখায়—তৃষ্ণার জগতে, এও এক তৃষ্ণা। সুরাও এক সুধা। তাকে মুখে পান করলেই আনন্দ! তাকে ভাল বাসলেই, ভাল লাগা, ঘৃণা করলেই তা ঘৃণ্য। আর অমৃত মনে হলে, তাকে পান করে নাও। খুসী মত, ইচ্ছে মত। সুরায় মাতাল কেন? সুধায় মাতাল বল। সুধামৃত পানে মাতোয়ারা।

তবে, সবাই ঘৃণা করে কেন মাতালকে? অসংযমের পশু লালসা বলে অশ্রদ্ধা করে কেন? সেই বিচিত্র প্রশ্নে সতী, কত বিব্রত হচ্ছিল। গোবিন্দলাল অদ্ভুত হাসি হেসেছিল। বুঝিয়েছিল ও সব যার যা মত। কেউ সাপ খায়, ব্যাঙ খায় আবার কেউ খায়না এসব, যার যা রুচি! যার যা খুসী! তবু, সবাই সবাইএর রুচিকে ঘৃণা করছে, সমালোচনা করছে, কিন্তু কি আসে তাতে? কার কি ক্ষতি? যার যা ভালো লাগে তাই নিয়েই তো দুনিয়া চলছে। কেউ কি একটা নিয়মকে মানছে? এক হতে পারছে সবাই মিলে? তাহলে বৈচিত্র্য কোথায়? জীবনের বিভিন্ন আনন্দ কোথায়? নিত্যনীল আনন্দের নিরঙ্কুশ সুখ?

শিক্ষিত, সভ্য সমাজের সেই ক্ষুধা তৃষ্ণার মানুষটাই সতীর সমস্ত যন্ত্রণা ভরা তৃষ্ণা মেটাবার সেই মহৌষধ প্রয়োগের সুধা, পানের নির্দেশ দিয়েছিল। তারপর প্রচণ্ড বিষাদে বিরাগ হয়েও একদিন সে অপরূপ আনন্দে মেতে গেল। দিনের পর দিন, অদ্ভুত রকমের বিভোরতা আনলো। জীবনের সেই সকরুণ শূন্যতার কষ্ট, এ জীবনের সমস্ত কষ্টের শান্তি হোত যেন ক্ষণিক সুরা পানে। যখন গোবিন্দলালের মত করে সতী বিশ্বাস করেছিল সুরা নয়, সুধা। বিস্বাদ নয়, স্বাদ। দুঃখ-আনন্দ মিলে এক অপূর্ব আস্বাদন।

আস্বাদ সুখেই যেন মরণ এলো। বিভোরতায় বুঝি নিদ্রা এলো, তবু, সে মহামরণ নয়, মহানিদ্রাও নয়। অতৃপ্ত জীবনের পাশে শুয়ে আধো জাগন্ত চোখে জীবন্মৃত্যুর স্বপ্ন-দেখা। পোড়া অদৃষ্টের সেই যমদূতটা শুধু শিয়রে বসে, স্বর্গ-নরকের অদ্ভুত সব গল্প শোনায়। যার সমস্ত—স্পর্শ লাগলে অনুভূতিতে বিচিত্র বিলাস এনে দেয়, বিলাসিনী হয়ে সতী বিলিয়ে দেয় তার বিচিত্র জীবনকে। যখন জঠর জন্তুটার খিদে মিটিয়েই ক্ষুধা মেটে, তৃষ্ণা মেটে না। কি ভয়ঙ্কর পিপাসা? অতৃপ্ত সেই তৃষ্ণার কাতরতায়, সুরায় পাগল হ'তে চায়। তখন ক্ষুধার্ত চারটে শিশুর মুখের চেয়ে; একটি নারী মুখের —করুণ ছবিটাই বেশী ব্যাকুল করে। যার জন্যে—সতীর ভীষণ মমতা হয়। যার অনন্ত তৃষ্ণা মেটাবার ইচ্ছায় —সমস্ত রোজগারের বেশী নিঃশেষ হয়।

একদিকে চারটি শিশুর বুভুক্ষা নিবৃত্তির চেষ্টা, আর এক নারীর তৃষ্ণার্ত প্রাণের—তৃষিত বাসনা মেটানোর। দু'টোই সমান তালে মিটিয়ে চলেছে সতী। ক্ষুধার তৃষ্ণার সংসারে সতী তার সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছে।

তাই গোবিন্দলালের পরে অনেকেই এসেছে সতীর জীবনে, আর সবাই গোবিন্দলালের মত—সুধামৃত পানের —প্রেরণা দেয়নি, তার আগেই যেন সতী সুধা স্বাদে জীবনকে মাতিয়ে দিয়েছে। যত রোজগার বেড়েছে সুধা পানের বিচিত্র আস্বাদও জেগেছে—ততখানি। মাতাল হ'বার সেই সাধও।

কিন্তু কোন দিনই এমন ঘটনা ঘটেনি; প্রকাশ্য রাজপথে লুটিয়ে সতী তার মাতাল হ'বার আনন্দ দেখিয়েছে সকলকে। মাতোয়ারা হ'য়েও নিজের নিভৃত ডেরায় ফিরেছে। কখন শুধু অযথা প্রলাপ বকেছে—পাগলের মত হেসেছে, কখনো কেঁদেছে ফুঁপিয়ে, নয় চারটে শিশুর ধুলোমাখা গায়ে মাঠের অন্ধকারে গরুর বাচ্ছা-আদরের মত করে বোবা সোহাগে সেও আদর করেছে। পরে ওদের চারজনের মাঝে জায়গা করে নিয়ে কখনো ঘুমিয়ে পড়েছে।

কিন্তু সে রাতে রাজপথের ধুলি শয্যায় নিদ্রা থেকে নাবিয়ে দিয়ে গিয়েছিল শয়তান বনবিহারী। শুধু, সতীর সর্বস্ব কিনেই—তার সব আনন্দ মেটেনি। সতীর পান মত্ততার অসহায় সুযোগে বনবিহারী তাকে পথে ফেলে দিয়ে আর এক অদ্ভুত আনন্দ পেয়েছে নিশ্চয়। তার কারণও সতী জানেনা, অনেক সময় অনেক কারণ হীন ভাবে—কোন শয়তান—কাউকে দুর্ভোগে ফেলে এক এক ধরণের বিচিত্র উল্লাস অনুভব করে। বনবিহারী হয়তো সেই দলের, পথের ধুলোয় নারীর সম্ভ্রমকে মিশিয়ে দেওয়ার—আর এক আনন্দ ক্ষুধাও—বোধ হয় পেয়ে বসেছিল বন বিহারীকে। তাই সতী অসহায়ের মত রাজপথের ওপর পড়ে হাসি কান্না দুঃখ আনন্দে বিভোর হয়ে,—কত কাণ্ডই না করেছিল।

সতী ভাবে শুধু ওই এক রাত। কিন্তু জীবনের সেই—ধুলিশয্যার রাত আর কখনো আসবেনা সতীর জীবনে—আর কোন শয়তানের এমনি নারীলাঞ্ছনার উল্লাস জাগবে না কে বলতে পারে? হয়তো সে কথা সতীও জানেনা—এই ধুলি শয্যায় তার চির নিদ্রার আয়োজন কিনা।

বিচিত্র বিশ্ব

শ্রীপরিমল ভট্টাচার্য্য

অমর শিল্পীর সাধনা

তখন আমার বয়স কত আর হবে, ধরুন ১৮।১৯-শের বেশী নয়। মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত আজিমগঞ্জ নামক মফঃস্বল সহরে থাকি। যুদ্ধের সময় কলকাতা ছেড়ে তখন আমাদের সমগ্র পরিবারটি আশ্রয় নিয়েছিল সেখানে। কিছু জমিজমা কিনে চাষবাসও চলছিল, যাতে সংসারের আয় বাড়ে। আমাদের দেখাদেখি কিছু আত্মীয়-স্বজনও আমাদের চেনা পরিচিতির সুযোগ নিয়ে সেখানেই সপরিবারে আস্তানা গাড়লেন।

মন্দ লাগছিল না। ছোটবেলাটা কলকাতায় কাটিয়েছি কাজেই এই নতুন পরিবেশের মধ্যে নিজেকে নতুন করে খুঁজে পেলাম। গাঁয়ের সমবয়সী বন্ধুরাও কি জানি কেন সহরের ছেলে বলে হয়তো আমাকে মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারেনি। কাজেই বেশীর ভাগ সময় আমার কাটতো গল্পের বই পড়ে আর বড়দের আড্ডায় ফাই-ফরমাশ খেটে। লাভও হত কম নয়। বিচিত্র পৃথিবীর বিচিত্র সব কাহিনী আর ঘটনা শুনতে আমার বেশ ভাল লাগত। তারি কিছু মণিমুক্তার সঞ্চয় আমার স্মৃতির থলিতে আজও অক্ষয় অমর হয়ে আছে। বড়দের এই আসরের মধ্যমণি ছিলেন আমাদের অক্ষয় জ্যাঠামশাই। ঘটনাটা তাঁরি মুখে শোনা, অতএব তাঁর জবানিতেই বলি।

কার্ত্তিকের এক সন্ধ্যা, বেশ একটু ঠাণ্ডার আমেজ আছে চতুর্দ্দিকে। বৈকালিক ভ্রমণ সেরে এসে আমাদের বৈঠকখানায় গুরুজনেরা আড্ডা জমিয়েছেন। পাড়ার দুচারজন বিশিষ্ট ভদ্রলোকও উপস্থিত আছেন।

অন্দর মহলে ঢুকে দেখি জল খাবারের আয়োজন চলছে। ফিরে এলাম বৈঠকখানায়। দেখলাম অক্ষয় জ্যাঠামশাই গল্প সুরু করছেন। ধীরে ধীরে গড়গড়া টানতে টানতে আরম্ভ করলেন। আজ আপনাদের যে রোমাঞ্চকর কাহিনীটি শোনাব। মনে রাখবেন তার প্রতিটি অক্ষর বর্ণে বর্ণে সত্য, বিশ্বাস করুন বা না করুন, ঘটনাটি ঘটেছিল আজ থেকে ১৫০ বছর আগে, এই মুর্শিদাবাদ জেলাতেই। বাংলাদেশে তখন জমিদারদের স্বর্ণময়যুগ, সোনার বাংলায় তখন সাধারণ মানুষও সুখে-শান্তিতে, আদরে সোহাগে মানুষ হত। গুণীরা গুণীজনের সমাদর করত। শিল্পী আর এক শিল্পীকে শ্রদ্ধা করত। এর মধ্যে কোন্ জাত্যভিমান নেই, কোন বিভেদ বিচার নেই কে কোন দেশের মানুষ। এমনি সুখের সোনাঝরা দিন ছিল তখন। আনন্দ উৎসবে, পালে পার্বণে, সঙ্গীত চর্চ্চায় দিনরাত্রি যে কোথা দিয়ে কেটে যেত, তা টের পাওয়া যেতনা। এই সব আনন্দ অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন তখনকার দিনের রাজা মহারাজা, আর অর্থবান্ জমিদারেরা। এঁদেরই একজন হলেন রাজা শিবেন্দ্র নারায়ণ রায়। তখন তাঁর বয়স মাত্র বাইশ কি চব্বিশ হবে। এরই মধ্যে তবলা বাজিয়ে বেশ সুনাম হয়েছে তাঁর। বড় বড় জলসায় বা মাইফেলে তখনও তাঁর ডাক পড়েনি বটে কিন্তু বলতে গেলে শিক্ষানবিশীর একেবারে শেষপর্য্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছেন। সকাল, সন্ধ্যা ও রাত্রি রীতিমত রেওয়াজ চলছে। পিতা রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণ রায় আজ বেঁচে থাকলে পুত্রের এই কঠোর শিল্প সাধনা দেখে অত্যন্ত খুসী হতেন।

বিখ্যাত তবলিয়া হিসেবে পিতার যে সুনাম ছিল, তারি উত্তরসূরী হিসেবে পুত্রকে আরও বড় তবলিয়া হতে হবে এই সাধনায় মেতে আছেন তরুণ রাজা শিবেন্দ্র নারায়ণ, আর তাঁর এই সাধনায় উপযুক্ত স্থল হিসেবে

তিনি বেছে নিয়েছিলেন যে স্থানটি তার নাম হল বার-দুয়ারী বাঈমহল, ভাগীরথী তীরস্থ একটি সুরম্য বাগানবাড়ী। অর্থাৎ ঐতিহাসিকদের কথানুসারে আমরা আজ যেখানে বাস করছি এই তল্লাটেরি কোন জায়গায় ছিল তার অতীত অবস্থান। খোঁজাখুঁজি করলে তার কিছু ধ্বংসাবশেষ হয়তো আজও বার করা তেমন অসম্ভব নয়। হয়ত এমনও হতে পারে ঠিক এই বৈঠকখানাঘরটাই ছিল তাঁর সেই বিখ্যাত বারদুয়ারী বাঈমহলের প্রধান হলঘরটি। যার স্মৃতিটুকু আজও বেঁচে আছে আমাদের এখানকার ঠিকানার মধ্যে ডাকঘর বারদুয়ারী।

কথাটা শেষ করে জ্যাঠামশাই একটু দম নিলেন।

ঠিক সেই সময়ে অন্দর মহল থেকে আমার ডাক পড়লো! পিসীমা আমার হাত দিয়েই জলখাবারের থালাটা পাঠালেন বৈঠকখানায়। খাবারের থালাটা আসরের মধ্যিখানে নামিয়ে রেখে আমি কিন্তু দরজার একপাশে দাঁড়িয়ে রইলাম।

অক্ষয় জ্যাঠামশাই ফের সুরু করলেন হঁ্যা, একদিন রাত্রে শিবেন্দ্র নারায়ণ তাঁর পিতার পুরনো দিনের বোল টোকা খাতাপত্র সাজিয়ে নিয়ে রেওয়াজ করতে বসেছেন। আসরে সেদিন বাইরের দুচারজন গুণী এবং সমঝদার ব্যক্তি উপস্থিত আছেন। তাঁরাও এসেছেন আর এক গুণী যন্ত্রী লক্ষৌয়ের বিখ্যাত সেতারী আলীহোসেন সাহেবের সেতার বাজনা শুনতে। কাজেই রাজা শিবেন্দ্র নারায়ণের উদ্দেশ্য রেওয়াজের মধ্য দিয়ে বিখ্যাত সেতারীর সঙ্গে সঙ্গত করে নিজের আত্মবিশ্বাস এবং প্রতিষ্ঠাকে দৃঢ়তর করা। আলীসাহেব আপন মনে বাজিয়ে চলেছেন। বসন্তকাল। গভীর রাত্রি। বাইরে শুক্লপক্ষের চাঁদ মৃদু আলো ছড়িয়ে সমস্ত বারদুয়ারী বাগানবাড়ীটাকে যেন রহস্যময় করে তুলেছে। ভেতরের আসরে তখন সুরের লহরী তুলেছেন আলীসাহেব। সেতারের ঝালার সঙ্গে সমানে পাল্লা দিচ্ছেন রাজা শিবেন্দ্র নারায়ণ। যেমনি মিষ্টি হাত, তেমনি পিতার কাছ থেকে পাওয়া খানদানী ঘরের বোল। শ্রোতারা মুগ্ধ। আলী সাহেব নিজেও মাথা নেড়ে হাসিমুখে তরুণ শিল্পীকে উৎসাহ দিচ্ছেন মাঝে মাঝে। রাজা শিবেন্দ্র নারায়ণ মনে মনে প্রণাম করছেন সামনের দেওয়ালে টাঙান স্বর্গতঃ পিতার তৈল-চিত্রটির দিকে তাকিয়ে।

এমনি বিস্তারিত সুরের মায়াজালের মধ্যে আলীসাহেবের সাহসা ধ্যানভঙ্গ হল। হঠাৎ—একেবারে হঠাৎই যেন দৃষ্টি আকর্ষিত হল বাইরের দরজার দিকে। চওড়া বারান্দা, তারপরেই গোলাপ বাগান; ঠিক তার কোণ ঘেঁসেই স্থির স্থির করে বয়ে চলেছে ভাগীরথী। দরজার স্বচ্ছ পর্দাটা মাঝখান থেকে দু'ফাঁক করা, বসন্তের হাওয়ায় মৃদুভাবে দুলছে। ঠিক সেই পর্দার ফাঁকটুকুর মধ্যে—আবছা আলোয় দেখা গেল বেশ লম্বা চোহারার অস্পষ্ট একটা মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। গায়ে পাঞ্জাবী আর পরনে পায়জামা। কিন্তু আশ্চর্য মুখখানা কেমন যেন আকার-বিহীন।

সেইদিকে তাকিয়ে আলী সাহেবের বাজনা ধীরে ধীরে থেমে গেল। রাজা শিবেন্দ্র নারায়ণের হাতও তবলা-বাঁয়ার উপর থেমে রইল। ঘটনাটা তাঁরও দৃষ্টি এড়ায়নি। শ্রোতারা হঠাৎ বাজনা বন্ধ হওয়ার কারণ বুঝে উঠার আগেই রাজা শিবেন্দ্র নারায়ণ চীৎকার করে বলে উঠলেন-কে কে ওখানে—ভেতরে আসুন। কোন উত্তর নেই। শুধু দরজার স্বচ্ছ পর্দাটা একটা দমকা বাতাসে জোরে দুলে উঠলো এবং সেই বাতাসের স্রোতটা ঘরে ঢুকে সবাইকে স্পর্শ করে গেল। ওঃ, কি ভীষণ ঠাণ্ডা সেই হাওয়া! মুহূর্তের মধ্যে সবার মুখেই একটা আতঙ্কের ছায়া ফুটে উঠলো। রাজা শিবেন্দ্র নারায়ণ আবার চীৎকার করে উঠলেন গয়াদীন্, গয়াদীন্, দেখতো ওখানে কে দাঁড়িয়ে!

এবার লক্ষ্য করা গেল সেই অস্পষ্ট ছায়ামূর্তিটা অভয়মুদ্রার ভঙ্গীতে ডানহাতখানা ঈষৎ তুলে কি যেন ইসারা করলো।

রাজা শিবেন্দ্র নারায়ণ নিজেই উঠলেন আসর ছেড়ে, ছায়াটা সবার দৃষ্টির সামনেই হাওয়ায় মিটিয়ে গেল। এমন সময় ঠিক ওই দরজা দিয়েই লণ্ঠন হাতে গয়াদীন ব্যস্তসমস্ত হয়ে ঘরে ঢুকে রাজার সামনে অভিবাদন করে দাঁড়াল।

"কেয়া হুকুম বাবুজী"—

'এতক্ষণ কোথায় ছিলি—কে একজন বাইরের লোক এত রাত্রে বাঈমহলে ঢোকবার চেষ্টা করছিল।

গয়াদীনের এক মুখ সাদা দাড়ির মধ্যে বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠলো।' বাহার কা আদমী নেহি হুজুর,ম্যয়তো খোদহি গেটপর খাড়া থা—আদমী ক্যায়সে আওয়েগা ?

আমরা সবাই দেখলাম—ঠিক ওইখানে, বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল, পাঞ্জাবী আর পাজামা পরা তবে মুখখানা স্পষ্ট দেখতে পাইনি। যাও ওদিকে গিয়ে ভাল করে খুঁজে দেখ। বাগানের কোথাও লুকিয়ে পড়লো কিনা, একা যেওনা সঙ্গে শিউশরণ আর বদরীনারানকে ডেকে নাও।

সাহস আর সামর্থ্যের দিকটা ইঙ্গিত করতেই গয়াদীনের মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠলো।

হো সক্‌তা কি ম্যাঁয়নে আজ আসী বরস কি বুঢ্‌ঢা হো গয়ি, লেকিন নজর তো অভিতক ঠিকই হ্যায়—রাতকে আন্ধেরিমে ভি—

দূর! কোথায় নেশাভাঙ করে পড়েছিলি তার ঠিক নেই। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে—ঐ বিরাট সুসজ্জিত হলঘরের মধ্যে সশব্দে কিছু একটা ভারী জিনিষ পতনের শব্দ হল।

সবাই মুখ ফিরিয়ে দেখলো—বড় একখানা তৈলচিত্র দেওয়াল থেকে মেঝের উপর দড়ি ছিঁড়ে পড়েছে।

গয়াদীন কাছে ছুটে গিয়ে ছবিখানাকে তুলে ধরে একপাশে দেওয়ালের গায়ে আপাততঃ দাঁড় করিয়ে রাখলো।

ছবিখানার দিকে তাকিয়ে রাজা শিবেন্দ্র নারায়ণের বুকখানা মুহূর্ত্তের জন্য কেঁপে উঠলো। ছবির পুরুষ মানুষটির পরনে পাজামা আর পাঞ্জাবী। ছবিখানা তার স্বর্গতঃ পিতৃদেবের ভারতবিখ্যাত বেনারস ঘরওয়ানার তবলা বাজিয়ে—ছোটেলালজীর। এটী পিতা অতি যত্ন সহকারে নামকরা একজন শিল্পীকে দিয়ে আঁকিয়ে ছিলেন।

ঘরের মধ্যে আবার ঠাণ্ডা হাওয়ার স্রোত বয়ে গেল, দরজার পর্দাটা আবার হাওয়ায় ভীষণ দুলছে। সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলো।

হঠাৎ বাহিরের দরজার দিকে তাকিয়ে গয়াদীন অস্ফুটস্বরে উচ্চারণ করলো—উহাঁ কোন্ হ্যায়—ছোটেলালজী ইহাঁ।—গুজরযানে কি ইতনা বরস পর ?

সবাই তাকিয়ে দেখলো আগের মত দরজার কাছে পর্দাটার ফাঁকেসেই ছায়ামূর্ত্তিটা দাঁড়িয়ে আছে। এবার যেন আগের থেকে অনেকখানি স্পষ্ট। মুখে ম্লান হাসি।

ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করে সবারই যেন হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে এল। গয়াদীন কিন্তু তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে তার দিকে।

সে যেন কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলনা যে বহুকাল আগে মৃত ওস্তাদজীর অস্তিত্ব আজ এতদিন পরে এখানে কি করে সম্ভব। একটু পরেই দুর্জয় সাহস নিয়ে এগিয়ে গেল গয়াদীন। বর্ত্তমান জীবিত লোকদের মধ্যে একমাত্র সেই তার পূর্বতন মালিক অর্থাৎ রাজা রাজেন্দ্র-নারায়ণের বেনারসের বিখ্যাত তবলার গুরু ওস্তাদ ছোটেলালজীকে চিনত।

দু'পা এগিয়ে গয়াদীন সেই ছায়ামূর্ত্তির কাছাকাছি গিয়ে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলো কেয়া কুচ কসুর হ্যায় ছোটেলালজী ? তব ফির ইহাঁ কিঁউ আয়ে ?

ছায়ামূর্ত্তিটী ধীরে ধীরে হাতের ইসারায় তবলা বাঁয়া জোড়াকে দেখিয়ে দিল।

গয়াদীন কি বুঝলো সেই জানে। সে মালিকের আদেশের অপেক্ষায় আর না থেকে নিজেই এগিয়ে গিয়ে তবলা বাঁয়া জোড়া নিয়ে এগিয়ে গেল দরজার কাছে প্রায় ছোটেলালজীর অশরীরী প্রেতদেহটার কাছাকাছি। হাতের ইসারায় ছোটেলালজী আর এগোতে নিষেধ করলেন। কাজেই চৌকাঠের ঠিক ওপারে তবলা বাঁয়া জোড়া রেখে গয়াদীন হলঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়াল। আবার ইসারা করলেন ছোটেলালজী গয়াদীনকে। গয়াদীন এবার আলীসাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে অনুনয় করলো ওস্তাদজী, ফিন সুর লাগাইয়ে মুঝে আজ বহুত পুরাণী এক রাত কি ইয়াদ আতি হ্যায়—জব বড়া মালিক জিন্দা থা। কথাটা শেষ করে গয়াদীন তাকাল তার বর্ত্তমান মালিকের দিকে অনুমতি পাওয়ার অপেক্ষায়। মাথা নেড়ে সায় দিলেন রাজা শিবেন্দ্র নারায়ণ।

হতভম্ব, বিস্মিত আলীসাহেব এমন বিচিত্র অনুরোধের সম্ভাব্য কোন সদুত্তর স্মরণ করতে না পেরে শেষে ধীরে ধীরে সভয়ে আলাপ সুরু করলেন, রাগ দরবারী কানাড়া। আশ্চর্য্য, পর্দার ওপাশে তবলায় চাটি পড়লো। চমকে উঠলেন শ্রোতারা। মধ্যরাতের স্তব্ধ আবহাওয়ার মধ্যে

যেমনি সুরের আলাপ, তেমনি সঙ্গতের মাধুর্য্য। জীবনে কোনদিন এমন আসরে বসে এমন অভিনব বাজনা শোনেন নি শ্রোতারা। কাজেই প্রথমটা ভেতরে ভেতরে সবাই যেন ঘামতে লাগলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, যতই সুর আর সঙ্গতের মূর্চ্ছনা বাড়তে লাগলো, ততই যেন সবার প্রাণে একটা আনন্দের বন্যা বয়ে গেল।

আহা তবলা নিয়ে যেন খেলা করছেন ছোটেলালজী বোল নয় তবলা যেন কথা কইছে। আলী সাহেব নিজেও দ্বিগুণ উৎসাহে বাজাতে লাগলেন, একবারও তার মনে হোল না যে তিনি একজন অশরীরী ওস্তাদের সঙ্গে বাজাতে বসেছেন।

বাজনা শুনতে শুনতে রাজা শিরেন্দ্র নারায়ণের চোখের পাতা ভিজে উঠলো। মনে পড়লো ছোট-বেলাকার কথা, পিতা কত যত্ন সহকারে তবলা শেখাতে বসতেন তাকে কোলে নিয়ে। ছোটেলালজীর আসর মাত করবার গল্প কতবার পিতার মুখে শুনেছেন। —এই সেই ওস্তাদ ছোটেলালজী, আজ তার আসরে খানদানী মেহমান—অতবড় গুণী শিল্পীর অতৃপ্ত আত্মা আজ ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তবলার পিছুনে পিছনে। কি অপূর্ব শিল্পানুরাগ—ধন্য সাধনা ছোটেলালজীর। দেবতার সামনে ভক্তের মাথাটা আপনি নুয়ে পড়লো। বাজনা শেষ হওয়ার দিকে, করতালি আর বাহবার মধ্যে একসময় আলী-সাহেবের সেতারের একটি তার ছিঁড়ে গেল। দেখা গেল ওপাশে তবলা বন্ধ! ছোটেলালজী উঠে দাঁড়িয়েছেন।

অশ্রুসিক্ত নয়নে সয়াজীন পর্দার কাছে গিয়ে দাঁড়াল করজোড়ে, বার বার যেন তার পুরনো দিনগুলির কথা মনে পড়ছে। পুরনো ওস্তাদকে দেখে পুরানো মালিককেও তার মনে পড়ে গেল। বুঝলো শিল্পীর অন্তরের ব্যথা। ধীরে জিজ্ঞাসা করলো—জী চাহেতো ফিরে ভি কুছ, ফরমাইয়ে ওস্তাদজী।

মিনিটখানেক পর ধীরে ধীরে উত্তর এল—পর্দার ওপাশ থেকে—রো'চার রোজ গানা-বাজানা শুনানা সয়াজীন,—ব্যস্ ফির কভি নেহি আয়ুঙ্গা। মালিককা বাচ্চা বড়া তেজী হ্যার, ম্যা'র আশীরবাদ কর রহাহুঁ কি জরুর একদিন বড়া হোগী। নাম ওঁর ইনাম—দোনো মিলেগী উসকো।

কথাগুলো শেষ হলে মুহূর্তের মধ্যে ছোটেলালজীর অশরীরী দেহটা হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

ঘরের ভেতর দুটি শিল্পী তখন পরস্পরের দিকে তাকিয়ে চোখের জলে ভাসছেন। হ্যাঁ, সত্যিইতো সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে হলে এমনি করে চোখের জলেই তার মূল্য দিতে হয়।

এই অবধি বলে অক্ষয় জ্যাঠামশাই চুপ করলেন। সমস্ত বৈঠকখানা জুড়ে একটা ভৌতিক আবহাওয়া থমথম্ করছে। অক্ষয় জ্যাঠামশাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে উপস্থিত শ্রোতারা পুরনো কোন সূত্র পাবার চেষ্টা করছে। বাইরের খোলা দরজা দিয়ে এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া ঘরে ঢুকলো। অক্ষয় জ্যাঠামশাই গায়ের চাদরটা একটু উপরের দিকে টেনে নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন যা, খাবারগুলো ভেতরে নিয়ে যা—ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

আদেশ পালনের উদ্যোগ করতেই পিছন থেকে আমার কানের উপর একটা মোচড় পড়লো!

তাকিয়ে দেখি পিসীমা বিকৃত সুরে আমায় ধমকাচ্ছেন জলখাবার দেওয়ার পর যে ভদ্রলোকদের এক কাপ করে চা দিতে হয়—সে কথাটা কি বুড়ো বয়সেও শিখিয়ে দিতে হবে।

বিশ্বাস করুন পিসীমার এই সহজ শিক্ষাটা সেদিন আমার বুঝতে বেশ রীতিমত সময় লেগেছিল।

মহাপুরুষের কৃপালাভ

বছর দশেক আগেকার ঘটনা। সেবার পঞ্জিকা অনুসারে বার মাসের তের পার্বণগুলো একটু দেরী করেই এসেছিল, কাজেই কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা শেষ হতে না-হতেই শেষ ঋতুটির হঠাৎ আক্রমণের ভয়ে যে যার গরম জামা গায়ে দিয়ে বের হতে হত।

সেদিন সন্ধ্যের পর আমি ও আমার এক প্রিয়বন্ধু দুজনে মিলে বেরিয়ে ছিলাম শ্যামবাজারের দিকে। বিশেষ প্রয়োজনীয় কিছু কাজ ছিল আর এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করার। তার বাড়ীটি ছিল বিডন ষ্ট্রীট আর চিত্তরঞ্জন এভিনিউর মোড়ের কাছাকাছি।

কথায় কথায় অনেক রাত হল। শেষে আর একদিন

এসে বাকি কথা সারবো বলে যখন আমরা দুইবন্ধু বিদায় নিলাম, তখন হাতঘড়িতে দেখি রাত প্রায় সাড়ে-দশটা বাজে।

বাস ধরবার তাগিদে জোর কদমে হেঁটে চলেছি আমরা দুইবন্ধুতে। প্রায় বড় রাস্তার কাছাকাছি আসতেই একটি অভূতপূর্ব ঘটনা চোখে পড়লো। ডান-দিকে ঠিক পাশের গলিটায় ঢোকবার মুখের তিনতলা বড় বাড়ীটার চওড়া বারান্দার উপর একটি পাগল ধরণের লোক বসে আছে। এক মাথা ঝাকড়া চুল, তাতে কোনদিন তেল পড়েছে বলে মনে হয়না। এবং দাঁড়ি-গোঁফের জঙ্গলে তার মুখের প্রায় সবটাই ঢাকা পড়ে গিয়েছে। গায়ে একখানা মলিন এবং ছেঁড়া কম্বল জড়ানো। পরনে একখানা অতি নোংরা ধুতির অর্দ্ধাংশ লুঙ্গির মতন করে পরা আছে। হাবভাবে ঠিক প্রকৃতিস্থ মানুষ বলে মনে হয়না। দু'একবার শুধু শিশুর মত আপন মনে হাসতে দেখলাম। লক্ষ্য করলাম একটি ছোটখাট জনতা বারান্দার সামনে রাস্তার উপর করজোড়ে দাঁড়িয়ে।

আমার সঙ্গের বন্ধুটি চিরকালই একটু সাধুসঙ্গপ্রিয়। অসম্ভব কিছু ঘটতে দেখলেই তারি আগে এগিয়ে যাওয়া চাই। এ ক্ষেত্রেও তার কোন ব্যতিক্রম ঘটলোনা। আকৃষ্ট হয়ে দুজনেই এগিয়ে গেলাম বারান্দার কাছে। আশ্চর্য্য, দেখলাম পাগল লোকটির সামনে থরে থরে অসংখ্য রকমের সুন্দর সুন্দর খাদ্যবস্তু সাজান। মাছ, মাংস, তরী-তরকারী থেকে আরম্ভ করে ফল মূলাদি, দই, মিষ্টি, চিড়েমুড়ি, পরমান্ন—কোন কিছুই যেন বাদ নেই। ঠিক এরই সামনে হাতজোড় করে একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। বেশ উজ্জ্বল গায়ের রং, সুন্দর সাত্ত্বিক চেহারা। পাগলটির দিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝে কাঁদ কাঁদ স্বরে অনুনয় করছেন—বাবা, আপনার কৃপায় আমি সব পেয়েছি। আমার সারা জীবনের সঞ্চিত যাকিছু অর্থ, বিষয় সম্পত্তি, প্রয়োজন হলে আমি সব-কিছু দিয়ে আপনার সেবা করবো। আপনি শুধু অনুগ্রহ করে গ্রহণ করুন। কিছু মুখে দিন। আপনার শোওয়ার জন্ত নতুন খাট, বিছানা, মশারী সব কিনে এনেছি বাবা, ঐ দেখুন ভেতরের ঘরে সাজিয়ে রেখেছি। অনেক রাত্ত হল সেবা করে এবার শোবেন চলুন.সেই সূর্য্যোদয়ের আগে থেকে আপনাকে অনুরোধ করছি বাবা। তবুও আপনার দয়া পেলাম না। কি আমার অপরাধ আমায় বলে দিন, মার্জনা করুন। কিন্তু যাঁর উদ্দেশ্যে এত কথা বলা তিনি কিন্তু নির্বিকার। ভাবের কোন পরিবর্ত্তন নেই। ভাল করে লক্ষ্য করলাম বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি শুধু একা নন্ মনে হল বাড়ীর সব পরিজন ও প্রিয়-জনেরাই রাস্তায় কর্ত্তার আদেশ মত করজোড়ে দাঁড়িয়ে। ছেলে, মেয়ে, পুত্রবধূ, জামাই, নাতি-নাতনী, মানে স্বজন বলতে আর কেউ বাদ'নেই। এমনকি বাড়ীর ঝি-চাকর, ঠাকুর, দারোয়ানেরাও পথের উপর করজোড়ে দাঁড়িয়ে। মনে হল বাড়ীতে যেন উৎসব লেগেছে। দেবতাকে পঞ্চ ব্যঞ্জন সহকারে ভোগ দিয়ে ভক্তরা প্রসাদের আশায় দাঁড়িয়ে আছেন। সামনে একটা প্রণামীর থালা রাখা। তাতে প্রচুর টাকা ও খুচরো পয়সা ছড়ানো।

এমন জীবন্ত ঠাকুরপুজো দেখে আমরা দুইবন্ধুতে তো একেবারে হতবাক্। এক ভদ্রলোককে পাশে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম ব্যাপারটা কি দাদা? ইনি কে?

ভদ্রলোক হাতজোড়া একবার কপালে ঠেকিয়ে উত্তর করলেন সাক্ষাৎ মহাপুরুষ। এঁরই কৃপায় ব্রজেনদাদের আজ এতবড় বিরাট অবস্থা। সমাজে দশজনের একজন। কলেজ ষ্ট্রীটে অতবড় জামাকাপড়ের দোকান, চেতলায় কয়লার গোলা, হাতীবাগানে দু'খানা খাবারের দোকান, শুধু কলকাতার উপরেই পাঁচখানা বাড়ী, দু'খানা গাড়ী, তিনটে লরী, এ ছাড়া অন্যান্ত বিষয়-আশয়তো আছেই। আর নগদ টাকার কথা ছেড়ে দিন, বিশ্বাস করবেন না। ভদ্রলোক আবেগে আরও কিছু বলতে চাইছিলেন। আমার বন্ধুটির চোখজোড়া এরই মধ্যে বেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ভদ্রলোকের হাতটা টেনে ধরে রাস্তার ওফুটে এনে বললেন ঘটনাটা একটু গুছিয়ে বলুনতো দাদা, মনে হচ্ছে আপনি এখানকার পুরনো বাসিন্দা সব কিছু জানেন।

জানেন মানে?—পাশের পুরনো দুইতলা বাড়ীটাইতো আমাদের পৈত্রিক বাসস্থান। উত্তর দিলেন ভদ্রলোক।

আমার বন্ধুটি উৎসাহ দিলেন—তাহলেত আপনার সামনেই একরকম সব কিছু ঘটেছে।

হ্যাঁ, তা বলতে পারেন···তাহলে শুনুন, আমাদের ফিরে যেতে হবে আজ থেকে প্রায় ৪০ বছর পিছনে।

তখন ব্রজেনদার এই তিনতলা রাজপ্রাসাদটি ছিলনা. ছিল খান দুই-তিন জীর্ণদশা প্রাপ্ত খোলার চালের ঘর। জমিটা অবিশ্যি ১০ কাঠাই ছিল, পৈত্রিক সূত্রে পাওয়া। আর আর্থিক অবস্থা ছিল খুবই খারাপ। দিন যেন আর চলেনা বললেই ঠিক হয়। ব্রজেনদার বয়স তখন কত-আর হবে? ধরুন আমার তখন বয়স বছর কুড়ি ব্রজেনদা আমার থেকে প্রায় ৪।৫ বছরের বড় ছিলেন, তাহলে ধরুন এই বছর পঁচিশেক হবে।

সংসারে খাওয়ার লোকের অভাব নেই, ঘরে বিধবা-মা, ছোট দুটি ভাই, দুটি বোন, নিজের স্ত্রী, এবং প্রথম সন্তান বিনোদ তখন মাত্র মাস তিনেকের শিশু, এ ছাড়া আর দুটি বাড়তি লোকও আছে, দোকানে কাজ করে আবার বাড়ীতে ফাই-ফরমাশ খাটে। ঐযে এখন যেখানে গ্যারেজ ঘরে বড় খাবারের দোকানটা দেখছেন ঠিক ঐখানটাতেই ছিল ব্রজেনদার মুড়ি মুড়কির দোকান—দোকান বলতে একখানা চালাঘর মাত্র, দরজা বলতে একখানা ঝাঁপ রাত্তিরে কোন রকমে দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকতো। তখনতো আর চুরি ডাকাতির এত হিড়িক পড়েনি। একরকম বলতে গেলে খুবই কষ্টের মধ্যে সংসার যাত্রা নির্বাহ করছিলেন ব্রজেনদা।

তবে একটা কথা বলবো ওরকম ন্যায়নিষ্ঠ ধার্মিক এবং সাত্ত্বিক পুরুষ খুবই কম দেখা যায়। কাজেই ওঁর এইযে হঠাৎ দৈব কারণে ভাগ্যোদয় এটা ঈশ্বরের কাছে ওঁর ন্যায্য পাওনা ছিল বলতে হবে।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম, মাঘমাসের ১১ই তারিখ। শীত-কাল। সনটা এখন আর স্মরণ নেই। রাত প্রায় ৮টা হবে। ব্রজেনদা একা এই মুড়ি-মুড়কির দোকানে বসে-ছিলেন। সকাল থেকে আজ তেমন কিছু কেনাবেচা হয়নি। ঘরে মাস তিনেকের শিশুটী প্রবল জ্বরে ভুগছে, ডাক্তারবাবু বলে গিয়েছেন, সাবধানে রাখতে হবে, নইলে নিমোনিয়ার দিকে যেতে পারে। হাতে একটি পয়সা নেই, দোকানে বিক্রি নেই, তেমন চলে না। হাজার রকম চিন্তায় মগ্ন হয়ে চুপ করে তাকিয়ে আছেন ব্রজেনদা কালিপড়া হ্যারিকেনটার দিকে। বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে।

দূরে কোন বাড়ীতে শয়ন আরতির কাঁসর ঘন্টা বাজা শেষ হল। চমক ভাঙ্গলো ব্রজেনদার। হাতজোড়া কপালে ঠেকিয়ে ঠাকুরের উদ্দেশ্যে প্রণতি জানালেন। শেষে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে উঠে পড়লেন।

ধীরে ধীরে ঝাঁপ বন্ধ করে দড়ি দিয়ে বাঁধলেন, ভাঙ্গা হ্যারিকেনটার কাঁচ তুলে একটু কাগজে আগুন ধরিয়ে দোকানের সামনে ফেলে দিয়ে চোখ বুজে কার উদ্দেশ্যে যেন প্রণাম করলেন।

ঠিক সেই সময়ে—ঠিক সেই মুহূর্তেই চোখ খুলে সামনে দেখলেন এই মহাপুরুষ দাঁড়িয়ে। এই রকম পাগলের বেশে। মিটিমিটি হাসছেন আর পেটে হাত দিয়ে বলছেন, দুটো মুড়ি খেতে দিবি বাবা—বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে। ব্রজেনদা আচমকা এই রকম একটা পাগল লোককে চোখের সামনে দেখে প্রথমটা ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। হাতস্থ হয়ে বললেন—এখন কি করে দি বাবা—অগ্নি সাক্ষী করে দোকান বন্ধ করেছি একটু আগে এলেও না হয় হত।

পাগলটা হেসে বললে তা নাহয় আমায় সাক্ষী রেখেই খোল—দেনা—বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে, আমি বলছি তোর ভাল হবে, তোর খোকা ভাল হয়ে যাবে। কিচ্ছু ভয় পাস্‌নি—ব্রাহ্মণকে পেট ভরে খাওয়া—দেখবি সব ঠিক হয়ে যাবে।

খোকা ভাল হয়ে যাবে—সব ঠিক হয়ে যাবে—। আশার এই বাণীটি যেন ব্রজেনদার মনের আকাশে বিদ্যুতের তৈরী দৈববাণীর মত খেলে গেল। অন্ধকারে আশার আলো যেন দেখতে পেলেন। ছেলের মঙ্গল কামনা করে খেতে চাওয়াতে তাই আর মনে কোন দ্বিধা করলেন না। যা থাকে ভাগ্যে হবে—তবু পাগলকে তিনি অভুক্ত থাকতে দেবেন না।

আবার দোকানের ঝাঁপ খুললেন। পাগলটা খুব খুশী—হেসে হেসে বলতে লাগলো—কোন ভয় নেই—সব ঠিক হয়ে যাবে—অনেক বড় হবি, কত গাড়ী হবে—কত টাকা পয়সা, কত ছানা-পোনা হবে। দে খেতে দে দু'খানা বড় বাতাসাও দিসরে। কি জানি কেন কথাগুলো শুনে ব্রজেনদার চোখে জল এসে গেল। এই একটু আগেই সেই দুঃশ্চিন্তায়, ভাবনায় অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। কাপড়ের খুঁটে চোখের জল মুছে ব্রজেনদা বললে—আর আশায় আলেয়া দেখিওনা বাবা, খেতে দিচ্ছি খাও, শুধু আশীর্বাদ কর। পরিজন নিয়ে দু'মুঠো যেন খেতে পাই, এর চাইতে বড় চাওয়া আমার আর কিছু নেই—বলে পাগলটার পেতে-থাকা কোঁচড়ে প্রায় সিকি টিন মুড়ি ঢেলে দিলেন। খানিকটা নতুন গুড়ের পাটালীও দিলেন সেই সঙ্গে। পাগলটা খুব খুশী মুখে দিয়ে খেতে আরম্ভ করলো। সেইদিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন ব্রজেনদা। খাওয়ার ভঙ্গী দেখে মনে হল যেন কতকাল অভুক্ত রয়েছে লোকটা। সেই দিকে তাকিয়ে ব্রজেনদা বললেন—আহা, কতদিন খেতে পাওনি বাবা। খাও বাবা পেট-ভরে খাও, আরো দেব'খন—খাও। করুণাময় যেন তোমারও দুঃখ দূর করেন। তুমিও যেন দু'বেলায় পেটভরে খেতে পাও।

কথাটা শুনে খাওয়া থামিয়ে পাগলটা হাসতে লাগলো—বাঃ বাঃ, বেশ কথা বলেছিসরে, বেশ বেশ বলেছিস্, একটু জল দিবি ?

ব্রজেনদা তাড়াতাড়ি মাটির কলসী থেকে এনামেলের গেলাসে জল গড়িয়ে দিলেন।

মুখে না ঠেকিয়ে গলার ভেতরে সব জলটুকু ঢক্ ঢক্ করে ঢেলে দিলে পাগলটা। গেলাসটা ফেরৎ দিয়ে খুঁটের কাপড়ে মুখ মুছে বললে—পেটটা ভরে গেল, নে, এবার দক্ষিণে দে, দে একটা পয়সা দে- ব্রাহ্মণকে ভোজন করালি—দক্ষিণে দিবিনে, হাঁ। করে দেখছিস কি? যা, ঐ ক্যাশ বাক্স থেকে তুলে নিয়ে আয়।

একপেট খেয়ে আবার নির্লজ্জের মত পয়সা চাওয়াতে ব্রজেনদা একটু ইতস্ততঃ করেছিলেন, ভাবছিলেন দোকান খুলে খেতে দিয়েছেন, আবার ক্যাশবাক্স খুলে পয়সা দিতে হবে।

পাগল বোধ হয় ব্রজেনদার মনের কথাটা বুঝতে পেরেছিলেন। বললেন—না, না, পেটে খেতে দিয়েছিস যখন নিশ্চয়ই ট্যাঁকে বেঁধে নিয়ে যাব না। দে—এখুনি ফেরৎ দিয়ে দেব।

লজ্জা পেয়ে যন্ত্রচালিতের মত ব্রজেনদা ক্যাশবাক্স হাতড়ে একটা তামার পয়সা এনে দিলেন। পয়সাটা নাকের কাছে নিয়ে কি যেন শুঁকলেন তারপর বিড় বিড় করে অস্পষ্ট দু'একটা আওয়াজ করে মুখের কাছে এনে

জোরে ফুঁ দিয়ে আবার ব্রজেনদার হাতে সেটা ফিরিয়ে দিয়ে বললেন—নে, এটা তোর ক্যাশ বাক্সে রেখে দে। ভুলেও কোনদিন পয়সাটা হারাসনি। যখের ধনের মত এটাকে আগলে রাখবি, আর রোজ সকালে একবার করে নিজের হাতে এটার উপর মা-লক্ষ্মীর নাম করে ফুল ছড়িয়ে দিবি, বুঝলি? যা, আজ থেকে তোর বাড় বাড়ান্ত হবে। ধনে মানে ফলে ফুলে একেবারে উপচে পড়বে। যা রেখে দে।

পয়সাটা মাথায় একবার ঠেকিয়ে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে তুলে রাখলেন ব্রজেনদা। করজোড়ে আবার এসে দাঁড়ালেন পাগলটার সামনে। বললেন—তুমি কে জানিনা বাবা, বিচার করার শক্তি আমার নেই। একটা প্রণাম করতে দাও বাবা।

দু'পা পিছিয়ে গিয়ে পাগলটা উত্তর দিল না আজ থাক আর একদিন আসবো—তোর মৃত্যুর আগে দেখে যাব তোর সুখের সংসার। তোর সেবা নেব—প্রণাম নেব। আজ নয়—একটু মুখশুদ্ধি দিবি?

কথাগুলো শুনে মন্ত্রমুগ্ধ সাপের মত মাথাটা দোলাতে লাগলেন ব্রজেনদা। যেন সব আদেশগুলোই তিনি শিরোধার্য্য করলেন।

পাগলটা আবার বললো—দে একটু মুখশুদ্ধি দে—

ব্রজেনদা আবার ভিতরে ছুটলেন মুখশুদ্ধি আনতে।

কিন্তু দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য বলতে পারব না, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই পাগলটা যেন সেখানে থেকে হাওয়ায় মিশিয়ে গেল। ব্রজেনদা পিছনে তাকিয়ে শুধু অন্ধকার ছাড়া আর কিছু দেখতে পেলেন না। মুখশুদ্ধির কৌটাটা হাতে নিয়ে ব্রজেনদা সেই শীতের রাতে যেন থর থর করে কাঁপতে লাগলেন। তবে সেটা অতিরিক্ত ঠাণ্ডায় কি অতিরিক্ত মানসিক আনন্দের শিহরণে তাভক্তি বলতে পারবো না।...

এই অবধি বলেই ভদ্রলোক চুপ করলেন। আমরা দুইবন্ধুতে তখন অবাক বিস্ময়ে ফিরে তাকালাম সেই মহাপুরুষের দিকে।

আমার বন্ধুটিতো ভক্তিতে, শ্রদ্ধায় রীতিমত অশ্রুপাত করতে লাগলেন, মুখে বললেন—এইপাপচক্ষে যেকোনদিন মহাপুরুষ দর্শন করতে পারবো—স্বপ্নেও ভাবিনি। আজ

ভদ্রলোকটি আবার বললেন সেই মহাপুরুষের কৃপা-লাভের দিনটিকে স্মরণ করবার জন্য প্রতি বছরই ১১ই মাঘ ব্রজেনদা দরিদ্রনারায়ণ সেবা করান, সূর্য্যোদয় থেকে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত। আজ চল্লিশ বছর ধরে ব্রজেনদা এই এই মহাপুরুষের আশাপথ চেয়ে বসে আছেন সেবা করবেন বলে। সারা কোলকাতার অলি-গলি, সহরতলীতে খুঁজে বেড়ান ব্রজেনদা স্মৃতি পটে আঁকা সেই সন্ধ্যারাতের পাগল মহাপুরুষের মুখখানা দেখবার জন্য।

কিন্তু আশ্চর্য্য স্বয়ং ভগবানই এসেছেন আজ ভক্তের দুয়ারে। আজই ভোর বেলা প্রাতভ্রমণ করতে বের-হবার সময় দেখেন ঠিক দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন সেই প্রার্থিত মহাপুরুষ, মিটি মিটি হাসছেন। ব্যস, ব্রজেন পালের পরিবারের চল্লিশ বছরের চলমান জীবনের রথ আজ স্তব্ধ হয়ে গেছে ব্রজেনদার আদেশে।

সকাল থেকেই ভোগ দিয়ে সবাই করজোড়ে দাঁড়িয়ে আছে বাবার সামনে—এমন কি দুগ্ধপোষ্য শিশুটীর মুখেও আজ জল দেওয়া পর্য্যন্ত বারণ ঠাকুরের সেবা না হওয়া পর্য্যন্ত। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, কোন শিশুর মুখ দেখলে ধরা যায়না যে আজ সারাদিন তাদের অভুক্ত রাখা হয়েছে, ঠাকুরের প্রসাদ খাওয়াবার প্রলোভন দেখিয়ে। কথাটা শেষ করে ভদ্রলোক নিজেই কাঁদতে লাগলেন—আমরা পাপীতাপী নরাধম। তাই আমাদের করুণা করলেন না, একটা নয়া পয়সাও ছুঁয়ে দিলেন না যে ভাগ্য ফিরিয়ে নেব।

ধীরে ধীরে এ ফুটপাথ থেকে নেমে জনতার ভীড় ঠেলে কোন রকমে পাগলাবাবার কাছাকাছি গিয়ে প্রণাম করে মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম।

এমন সময় পাগলা বাবা বাড়ীর কর্ত্তা অর্থাৎ ব্রজেন-বাবুর দিকে তাকিয়ে বোধহয় ধূমপান করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তৎক্ষণাৎ একটা রূপার ট্রে ব্রজেনবাবু এগিয়ে ধরলেন বাবার সামনে। তাতে পান, দোক্তা, জর্দা, সিগারেট, চুরুট, বিড়ি এমন কি ছোট একটা কাগজের পুরিয়াও দেখলাম, তাতে বোধহয় আরও কড়া ধরণের কোন নেশার বস্তু আছে।

পাগলাবাবা অন্য কিছুই গ্রহণ করলেন না। শুধু

আমার বন্ধুটি একটু উত্তেজিত হয়ে আরও দু'পা কাছে এগিয়ে গেল।

ঠিক সেই মুহূর্তে ছোট্ট একটি ঘটনা ঘটে গেল। পাগলাবাবা বিড়িটা ধরিয়ে জলন্ত কাঠিটা ছুঁড়ে ফেললেন এক পাশে। অমনি আমার বন্ধুটি সেই জলন্ত কাঠিটা মাটিতে পড়বার আগেই লুফে নিলেন হাতের মুঠোয়।

পাগলাবাবার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম মিটি মিটি হাসছেন আমার বন্ধুটির দিকে তাকিয়ে। মুহূর্তের মধ্যে সমগ্র জনতার দৃষ্টি গিয়ে পড়লো আমার বন্ধুটির দিকে। আমিতো চুরি অপরাধের আসামীর মত লজ্জায় মরি। বন্ধুটি কিন্তু কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে এগিয়ে গিয়ে পাগলাবাবার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলো। আমি হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। বন্ধুটি এগিয়ে এসে আমার হাত ধরে হন হন করে এগিয়ে চললো বাস ধরবার জন্য। ভয়ে লজ্জায় আমি আর পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখিনি কি ঘটছে সেখানে। এই ঘটনার এইখানেই ইতি। শুধু পাঠক-পাঠিকার কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য জানাই যে দিন কয়েক পরে আবার শ্যামবাজারে গিয়েছিলাম বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। শুনলাম মধ্যরাত্রির পর পাগলাবাবা কণামাত্র পরমান্ন মুখে দিয়েছিলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই কোথায় যে মিলিয়ে গিয়েছিলেন কেউ তা বলতে পারলেন না। কিন্তু আশ্চর্য্য, পাগলাবাবার অন্তর্ধ্যানের কিছুক্ষণ পরেই বাড়ীর ভেতরে কান্নার রোল উঠলো। দৈবকৃপাধন্য সৌভাগ্যবান্ পুরুষ ব্রজেনবাবু তাঁর পার্থিব সুখের সংসারকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করেছিলেন।

হ্যাঁ, আর একটি খবরও এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হবেনা যে আমার সেই ভক্ত বন্ধুটি আজ একজন ধনী ও কীর্ত্তিমান্ কাষ্ঠ ব্যবসায়ীরূপে নিজেকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ফলে-ফুলে তারও সংসার আজ বাড়-বাড়ন্তের দিকে। তবে তারও হঠাৎ এই রকম সৌভাগ্য উদয়ের পিছনে পাগলাবাবার প্রতি তার অচলাভক্তি কাজ করেছে কি তার প্রতি পাগলাবাবার অকৃপণ করুণা বর্ষিত হয়েছে, সে বিচারের ভার আজ পাঠক-পাঠিকাদের হাতে, আমার নয়।

সব কাজেতেই বাধা

অনুরাধা মুখোপাধ্যায়

যেটায় যখন হাত দিয়েছি আমি
অমনি কী মা সেটাই নেবে কেড়ে
বলবে 'বুবুন' ভাঙবি ওরে সোনা
হাতে নিসনি ছেলেমানুষ যে রে!
বাবীর মত সেফ্‌টিরেজর নিয়ে
যেই ভেবেছি কামিয়ে ফেলি দাড়ি
কোত্থেকে যে ছুট্টে এল বাবী
আমায় দেখে গোটালো পাত্‌তাড়ি।
বাবীর তখন অফিস যাবার তাড়া
জুতোটা তাই ভাবছি পালিশ করি
কাজটা আমার এগিয়েছে সেই সবে
দেখেই মা তো হেসেই গড়াগড়ি।

খাটের গায়ে পেরেক আছে উঠে
হাতুড়িটা যেই নিয়েছি হাতে
বকলো আমায় দুষ্টুছেলে বলে
তোমরা বলো রাগ হয়না তাতে?
বাবীর মত ফাইল ব্যাগে ভরে
অফিস যাব ভাবছি মনে মনে
কানধরে মা বকলো আমায় এসে
পড়েছি তো আচ্ছা জ্বালাতনে।
সব কাজেতেই এমনতর বাধা
সবকাজই তাই পড়ে আমার বাকী,
কাজ করলেও তোমরা আমায় বল
আমি শুধুই অকাজ করি নাকী?

ভাঙা আয়না

উমা দে শীল

সকালবেলা ঘুম ভেঙেই মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল। সারারাত ধরে বৃষ্টি, এখনো ছাড়বার কোন চিহ্ন নেই। সামনের রাস্তাতে একহাঁটু জল নর্দমার সঙ্গে মিলে মিশে থৈ থৈ করছে। কোন রকমে বাজারটা সেরে নিয়ে বাড়ি ফিরতেই দেখি মিঠুয়াকে ওর মা চাপাস্বরে খুব বকাবকি করছে। মিঠুয়া অপরাধীর মতো মুখ নিচু করে কেঁদে চলেছে। গালটা লাল হয়ে উঠেছে।

—অফিসে যাব তাড়াতাড়ি, কোথায় দেবে গুছিয়ে তা নয়, সাত সকালে মেয়েটাকে মারছো?

—দ্যাখো না, এই খরচের ওপর আবার খরচের ধাক্কা। আয়নাটা ভেঙে ফেলে বাপসোহাগীর এখন আবার শুধু শুধু কান্না।

অতসীর নিজের চোখেই জল এসে পড়ল। ওর বিয়ের সময়কার তত্ত্বে পাওয়া আয়নাটা! আজো কি মুখ দেখার সময়ে সেই প্রথম সিঁদুর পরার লজ্জারাঙানো মধুর দিনগুলো অতসীর মনে ভেসে ওঠে?

—যাক্‌ গে ছেলেমানুষ, আবার একটা কেনা যাবে।

গামছাটা হাতে করে টিন ঘেরা কলতলাটায় ঢুকে পড়লাম। পুজো এসে পড়েছে। কি করে কি হয়। আজ আবার অফিসারদের ঘেরাও করার কথা কি সব বোনাস-টোনাস নিয়ে—যত হাঙ্গামা। এই সব গোলমালে পড়ে মাথাতে একটাও প্লট আসছে না। এই উপরি আয়টা মাঝে মধ্যে—তাছাড়া প্রুফ দেখা, নাম টাম তো বিশেষ কিছু নেই আমার। ধরাধরি করে।

কী দেরী হয়ে গেল। ভাত খেয়েই কোন রকমে অফিসে ছুটলাম। অফিসের মুখে ছোটখাট ভীড়। কাছে যেতেই হারানদা বললে—বুঝেছো ঠ্যালা, আজ ম্যানেজার, এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ম্যানেজার কারো পাত্তা নেই। ম্যানেজার তো আসবেনই না খবর পাঠিয়েছেন। ছোটকর্ত্তাও আসেন কি না ছাখো।

—তার মানে? হাঁ হয়ে রইলাম।

—তার মানে আজ ঘেরাও হবে না। আমাদের পাওনার দিনও পেছিয়ে গেল।

একে ম্যানেজারের অনুপস্থিতিই একটা অসম্ভব কাণ্ড। তার ওপর আজ ঘেরাওয়ের ফাঁদ পাতা হয়েছিল। কাজেই উত্তেজনা বেশি। আমার এসব নিয়ে বলার কিছু ছিল না, ম্যানেজার আমার দূর সম্পর্কের আত্মীয়, সেই সূত্রে তিনিই আমার বেকারত্ব ঘুচিয়েছেন। অফিসে আমার রেকর্ড ভালো। সেটুকু রাখতে পারলেই বাঁচি।

বিকেল পাঁচটায় ছুট হতে না হতে হারানদা এসে ধরল।

—চলো না হে হাওড়াহাটের দিকে যাই, বউটার শাড়িখানা কিনে আর অমনি ছেলের জামার দরটা দেখে আসি।

—পুজোর বাজার শুরু হয়ে গেলদাদা? আমার আবার বোনটার বাড়ি এবার তত্ত্ব না পাঠালেই নয়। কিছু না দিলে এবার তাকে আসতেই দেবে না। কোথা থেকে খরচ পাই?

—তোমার তবু হ্যানা ত্যানা রোজগার আছে—থামিয়ে দিয়ে বললাম—পেট ফাঁকা থাকলে মগজও ফাঁকা—মানে ও সব রোজগারও ফাঁকা। বাজারে গিয়ে মিছিমিছি মন খারাপ দাদা, তুমি বরং একাই যাও।

—ও হ্যাঁ তোমাদের যে একটা মন বলে জিনিস আছে তা ভুলেই যাই হে। যাও যাও বাড়ি

ায়ে মনের চর্চা—বিশ্রীভাবে হাসতে হাসতে চলন্ত
সে হারানদা লাফিয়ে উঠল।

বাড়ি ফিরবার সময়ে রোজ হেঁটেই যাই, বেশ
বিা ফাঁকা হাওয়ায় বেড়াতে বেড়াতে। পনেরোটা
য়সাও বাঁচে। অতসী এক এক সময়ে বলে—
ত দুঃখু তোমার শুধু আমার জন্যেই নাগো?
ামায় যদি বিয়ে না করতে—

হায়রে কপালে যে আরো কি হত কে জানে! ও
তা তবু টেনেটুনে চলে। ছেঁড়া শাড়িতে তালি
াগিয়ে আর এ্যাত্তো বড় সিঁদুরের টিপ পরে
ক যে গর্বিত! বাড়ি ফিরতেই খুশি খুশি সুরে
লল—

আজ খিচুড়ি রেঁধেছি, গরম গরম আলুর ঝাল
ড়া ভেজে দেব। সন্ধ্যে সন্ধ্যে খাবে, হ্যাগো?
কারণ খুশির মানে বুঝলাম, ওকে বোঝা এত
হজ। পুজো আসছে যে। আকাশে বাতাসে
ামবাজারের ভীড়ে মাইকের সুরে বাসে ট্রামে নতুন
াপড়ের প্যাকেটে সর্বত্র পুজোর ডাক। সেই
াকে সাড়া দিয়ে অতসীরও ঘরদোর ঝক্‌ঝক্‌
রছে। মাজাঘষা শেষ—এখন শুধু একটা তুটো
্যাকেট পেলেই হয়।

আমার পুজো অনেক উঁচুতে নীল আকাশের
কে সাদা মেঘের মধ্যে ভেসে বেড়ানো চিলের
নায়। ঠিক দুপুরে সেই চিলের তীক্ষ্ণডাকে
নের ভিতর টান পড়ে গঙ্গার বুকে ধু ধু চড়ার
পর চিলের রোদ-ঠিকরে পড়া ডানায় আমার
ানন্দ। এসব মনে মনে ভাবি। যদি দেশে যেতে
ারতাম, সাদা কাশবনে, ধানের খেতে মনটাকে
ুটিয়ে দিতাম—আমার প্রণাম ওই খানে।

একাদশীতে নদীর বুকে প্রতিমার খড়ের
াঠামো ভেসে যায় ঘাটে স্নান করতে করতে দু'
এক ফোঁটা চোখের জল যদি ঝরে পড়ে—সেই
আমার বিজয়া। প্রতিবারই লক্ষ্মীপুজোর বিস-
র্জনের সন্ধ্যায় নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া মঙ্গলদীপ
লাগলে নিয়ে ভেসে যেত আমার মন—আমার
শুভকামনা নিয়ে।

কিন্তু মিঠুয়া?

বড্ডো সত্যি ও। কাছে এসে দুইহাতের দিকে

রাত্তিরে একবার গেলাম সম্পাদকদের কাছে।
শুধু হাতে যাওয়া বৃথাই। কিন্তু বৈচিত্র্যহীন
জীবনে প্রেরণা কই? কি নিয়ে লিখব? শুকনো
মুখ দেখে অতসী সব হতাশা মুছিয়ে দেবার
ভঙ্গিতে বললে—এত ভাবনা কেন গো, মিঠুয়ার
একটা যা হোক জামা কিনে দিতে পারলেই আর
কিছু—হঠাৎ বুঝি মনে পড়ল, অতসী থেমে থেমে
বলল—আর একটা আয়না চাই। আয়নাটা
অনর্থক ভেঙে ফেলার জন্যে মিঠুয়ার ওপর খুব
রাগ হলো। সব সময়ে হুড়োহুড়ি—একটু কি
শান্ত হতে নেই। মুখে হাসি টেনে বললাম—ও তাই
এত রূপ খুলেছে বাঁকাটিপের কি বাহার! এসো
ঠিক করে দি।

ব্যাস্—চাঁদপানা মুখখানা নিয়ে আহ্লাদে গলে
অতসী আর সেই সঙ্গে গলে গেল আমার লেখা।

পরদিন খুব সকালে বাজারে চলে গেলাম।
বৃষ্টি বিশেষ কমে নি। চারদিকে কাদা। বাজারে
মাছের দোকানে গিয়ে আশিসের সঙ্গে দেখা হয়ে
গেল। আমাকে দেখেই বলে উঠল—আজো বোধ
হয় ঘেরাও হবে না। ম্যানেজারের ভাইপো
মরেছে বিষ খেয়ে। এদিকে সবাই বলছে হার্ট
ফেল। তাই মোসাহেব ছোটবাবুও সেখানেই
শোক করছেন।

—ম্যানেজারের ভাইপো? সুজিত? হাত
থেকে বাজারের থলেটা মাটিতে পড়ে গেল।—
তোমায় কে বলল?

—কেন ছোটবাবু কাল একবার এসে বলেই
চলে গেলেন। তুমি থাকো কোন তালে? হাত
পা কাঁপতে লাগল। তা হলে শেষ পর্যন্ত রুমার
নিষ্ঠুরতাই ওর হাতে বিষপাত্র তুলে দিল? আমি
কেন কাল জানতে পারলাম না। নিশ্চয়ই যেতাম
ওর দিদির কাছে। একবার গিয়ে দাঁড়ানো উচিত
ছিল, ছি, ছি।

বাজারে আর দাঁড়ালাম না। তাড়াতাড়ি
চলে এলাম।

সব কথা শুনে অতসী কেঁদে ফেলল।

—আজ আর অফিস যাব না, বন্ধুদের বাড়ি
যাই দেখি শিবপুরেও যেতে পারি ওর' দিদির

কামাই আর সেই শিরপুরে যাওয়া আসা—তা হোক্, তবু এতদিনের বন্ধুটা—

দিলীপের বাড়িই প্রথমে গেলাম। ওর গাড়ি আছে। দরকার হলে গাড়ি করেই যাওয়া যাবে। যেতেই ওর বৌদি বললেন—

—আসুন, আসুন। আপনি যে আর আসেনই না। হ্যাঁ ওর বসবার ঘরেই যান শীলাও আছে। হেসে ফেললেন।

আমার গলা শুকিয়ে গেছে ততক্ষণে। সুজিত দিলীপ শীলা রুমা—আমরা এক কলেজের বন্ধু। এরা কি এখনো খবর পায় নি ?

ড্রয়িংরুমে জানলার ধারে সোফার ওপর পিছন ফিরে শীলা বসে ছিল। সাদা স্যুটে লাল বোতে চমৎকার দেখাচ্ছে দিলীপকে। বেশ আছে এরা। দুদিন বাদে হয়তো বিয়েও হবে।

দিলীপ ছুটে এল—কিরে কি খবর ? আয়। শীলাও স্বাগত জানাল। আমার গলায় স্বর ফুটছে না। অতি কষ্টে বললাম—কি করি কোথায় যাই ভেবে পাচ্ছিনা। আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

দিলীপ প্রথমে আশ্চর্য হয়ে গেল। তারপর খেয়াল হল,—ও, তুই তাহলে খবর দিতেই এসেছিস ?

চাবুক খেলাম যেন। সত্যি এমনি কোনদিন যাই না। আজ খারাপ খবরটা পেয়েই ছুটে গিয়েছি। কিন্তু কি করে বোঝাব যে সুজিতকে আমি ভালোবাসি।

—অশোকের বাড়ি যাবি ? জিজ্ঞেস করলাম।

—কি হবে ? দূর, ওকে খবর দিয়ে কি হবে ? আমি তো কাল বিকেলেই জানি। রুমার দাদা আমায় ফোন করেছিল।—

আমার এত কষ্ট হচ্ছে। কিছু ভালো লাগছে না। আমায় কাল যদি অফিসে ওরা জানাতো তাহলে নিশ্চয়ই ওদের বাড়ি যেতাম। ওরা কি করে জানবে আমাদের ভালোবাসার কথা।

দিলীপ বললে—তা ভালো আর কার লাগে বল্। মরেই যখন গেছে আর কি হবে ? নে নে ডালমুট খা।

শীলা কফি ঢেলে দিল।

—শেষ কালে রুমাটা বড্ডো নিষ্ঠুর হয়ে গিয়েছিল। উঃ সেই গল্পটার শেষ শোনা হলো না। রুমার সেই দার্জিলিং-এর—

—আরে তুইও যেমন সুজিতকে বিশ্বাস করিস। ওর কথা আদ্দেকই মিথ্যে, আমি ওর দাদার কাছে সব শুনেছি। আর ভালো কে কাকে বাসিরে আমরা ? কদিন আর দেখা সাক্ষাৎ হয় আমাদের। প্যাটিস, খা—চল, সিনেমা যাবি ?

সুজিত নিজের গুণে সম্মানের চাকরীটা জোগাড় করেছিল বলে দিলীপের চিরকাল রাগ ওর ওপর। দিলীপের কথাগুলো সত্যি হলেও তীরের মতো বুকে বিঁধতে লাগল। আমার সঙ্গে সুজিতের শেষ দেখা বেশ কিছুদিন আগে। ওদের বিয়ে সুখের হয় নি। দিলীপটা যেন কেমন। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের সমস্ত পরীক্ষার পালা চুকিয়ে যে চলে গেল তার সম্বন্ধে একটু শ্রদ্ধাও কি প্রকাশ করা যেত না ?

নিজেকে এত বোকা বলে মনে হল।

বাসষ্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খুব অধৈর্য হয়ে গেলাম। বৃষ্টিও এল গুঁড়ি গুঁড়ি, পকেটে ঘড়িটা রাখতে গিয়ে দেখি মাত্র ছটা বেজেছে। যাক ভালোই হল। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে লেখা নিয়ে বসতে পারব। ভাগ্যিস,—এই জল কাদায় আবার শিবপুর, হ্যাঃ যত সব—

বাড়ির কড়া নাড়তেই মামাতো ভাই সীতেশ দরজা খুলে দিল। আমাকে দেখেই খুব সন্ত্রস্ত হয়ে বলল—আজ নাকি আপনার বড়ো মন খারাপ। অতসী চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। মিঠুয়াকে সরিয়ে রেখেছে—আজ শুধু শোক।

—তুই কখন এলি ? অপ্রস্তুত মুখে বলতে থাকি—না না আর কি ? আছি পড়ে কোন্ যুগে, বন্ধুরা তো পাত্তাই দিল না।

অতসী চা জলখাবার এনে দিল। সীতেশের অনারে আজ ঘুগ্‌নী হয়েছে। বেশ লাগল। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। অতসী বড়ো ভাল রাঁধে। রাত্তিরে খাওয়াদাওয়া সেরে সীতেশ চলে গেল।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে সিগারেট খাচ্ছিলাম। মনটা আবার খারাপ হয়ে গেল। সুজিতের কথা কথা মনে পড়তে লাগল। সব শেষ হয়ে গেল— কি সুন্দর মনটা ছিল ওর। সব সময়ে বলত,

জীবনটাই তো একটা প্লট। যদি ভাবতে পারিস তবে—

ঠিক। সুজিতের ব্যাপারটা নিয়ে লিখলে কি হয়? উত্তেজনায় উঠে বসলাম। এই তুদিনের কথা? সুজিতের স্মৃতি! লেখাটা কালই দিয়ে আসব নানারঙ্‌ কাগজে।

সুজিতরে, তোকে ভালোবাসি। তোর স্মৃতি থাকবে ছাপার অক্ষরে, সবাই জানবে। আর তুইও তো ভালোবাসিস আমাকে, বলতে গেলে তুই-ইতো প্রেরণা দিলি আমায়। ও মরে গিয়ে এই উপকারটুকু হল আমার। টাকা যা পাব তাতে মিঠুয়ার জামা হবে আর—

সুজিতের যে একটা ছেলে আছে এতক্ষণে মনে পড়ল। মিঠুয়ার দিকে ফিরে তাকালাম। মার বুকের কাছে মাথা রেখে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। অতসীর ঘুমন্ত মুখে কি নির্ভরতা! সিঁদুরের টিপটা জ্বল-জ্বল করছে।

যদি আমার ঐ রকম কিছু—না যদি সুজিতের মতো আমি, নাঃ মাথাটা কেমন ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। এতক্ষণ কী সব ভাবছিলাম। কান দুটো কী গরম!

তাড়াতাড়ি তাক থেকে আয়নাটা নিতে গেলাম মুখটা একবার দেখব। তাকের ওপর ভাঙা আয়নার ফ্রেমটা পড়ে আছে। অতসীর বিয়ের স্মৃতি।

ফ্রেমের ফাঁক দিয়ে ভাঙা দেয়ালের অংশ দেখা যাচ্ছে।

হঠাৎ গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

মিঠুয়াকে ধন্যবাদ। আয়নাটা ভেঙে ফেলেছে ব'লে এই মুহূর্তের জন্যে ওর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

মনের স্বরূপটা এখুনি আয়নায় ধরা পড়ত।

আবাহন

শ্রীআশীষ কুমার গুপ্ত

আসবি কি মা আজকে হেথায়
ধরার পরে আসবি আজ?
ব্যর্থ হবে সকল পূজা ব্যর্থ হবে সকল কাজ।
ভক্তি কই! ভক্তি নেই। ভক্তিবিহীন অন্তরে
কি হবে মা পূজিয়া তোরে কি হবে বৃথা মন্তরে!
বাজবে না আর শঙ্খ ঘণ্টা জ্বলবে না ধূপ মন্দিরে,
করবে কেবা আরতি তোর? বৃথাই তোরে বন্দিরে।
শুনিস, কি শুনিস নি মা আর্তজনের আর্তনাদ
লক্ষ নরের আঁখির বারি আজকে তোরে সাধবে বাদ।
কেই বা করবে পূজা রে তোর পুষ্প-ফল-চন্দনে
আয়রে মাগো শুনতে হেথা বক্ষফাটা ক্রন্দনে।

পুণ্য আজি পরাহত পাপের আজি রাজত্ব
তুচ্ছ হ'ল মানবতা তুচ্ছ হ'ল দেবত্ব।
তাইত আজি দিকে দিকে রোদনভরা ব্যর্থশ্বাস,
শান্তি নেই, স্বস্তি নেই, ঘনিয়ে এলো সর্বনাশ।
ফুল বিল্ব দিয়া কে পূজিবে তোরে,
কে সাজাবে তোরে চন্দনে?
হাহাকারে আজ ভরেছে ভুবন
নিখিল মানব ক্রন্দনে।
যদি মা পারিস ঘুচাতে দুঃখ মুছাতে অশ্রুরাশি
যদি মা পারিস নিখিলজনের অধরে ফুটাতে হাসি।
তবেই আজিকে পূজিব মা তোরে সার্থক হবে পূজা
নিখিল মানবের অন্তরলোকে তবে আয় দশভূজা।

সিঙ্গাপুরে ভারতীয় বাঙ্গালীদের কৃতিত্ব

বিশ্বশ্রী মনতোষ রায়

গত ১৬ই আগষ্ট সিঙ্গাপুরের ১৫০ বৎসর পূর্তি উৎসব উপলক্ষে Lion City Hotel এর Happy Restaurant এ আয়োজিত "Mr pesta swkan" (Internationl Body Building contest) প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় ভারত, মালয়, সিংহল, ইন্দোনেসিয়া, ফিলিপাইনস, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশের দুই জন করে বাছাই প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করেন।

ভারতের শ্রীরবীন চক্রবর্ত্তী "মাসলম্যান' ৬৯"

আখ্যায় ভূষিত হন এবং শ্রীক্ষিতীশ চ্যাটার্জ্জী Runners up posing আখ্যা লাভ করে দুই বাঙালী তরুণ বাংলা তথা ভারতের সুনাম অর্জ্জন করেন।

২৫ বৎসর বয়সের ছেলে শ্রীরবীন চক্রবর্ত্তী ১৯৬৬ সালে ভারতশ্রী আখ্যা লাভ করেন। ব্যায়াম করেন যোগ্যগুরু বিশ্বশ্রী মনতোষ রায়ের তত্ত্বাবধানে Ymca Gymnasium-এ, চাকুরী করেন Ordnance factories Head office 6 Esplanade East এ বিভিন্ন ক্লাবে শিক্ষকতা, অফিস, নিজের ব্যায়াম ও বিভিন্ন স্থানে 'ব্যায়াম প্রদর্শনী' এই নিয়েই তিনি সদাই ব্যস্ত থাকেন। ১৯৭০ সালে জাপানে অনুষ্ঠিত মিঃ এসিয়া প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করবেন ভারতের হয়ে। সকালে ২টি ডিম দুধ পরিজ মধু ও ১টি রুটী খান। দুপুরে মাছ ডাল নানা রকম সব্জীর তরকারী ও দই ভাত এবং বিকালে সয়াবিন সেদ্ধ সালাড কলা ছানা ও রাত্রে মাংস বা মাছের ষ্টু, ডাল ও ৩।৪ খানি রুটী খান। তবে এটা ঠিক কথা যে ভাল মন্দ বেশী খেলেই শরীর ভালো হয় না যদি না সেই খাদ্য ঠিক-মত হজম হয় আর সেই জন্যেই প্রয়োজন নিয়মিত যোগব্যায়াম অভ্যাস করা যার কাজ হলো শরীরের অভ্যন্তরের সব কলকব্জার সুষ্ঠু পরিচালনা করা। শ্রীচক্রবর্ত্তী নিয়মিত যোগব্যায়াম অভ্যাস করেন।

শ্রীক্ষিতীশ চ্যাটার্জ্জী ১৯৬৭ সালে 'ভারত শ্রী' আখ্যা লাভ করেন। বয়স ৩০ বৎসর চাকরি করেন Carco Union Carbide অফিসে, ব্যায়াম সুরু করেন বিশ্বশ্রী মনোহর আইচ মহাশয়ের কাছে। বর্ত্তমানে ইনি বিশেষ ধরনের ব্যায়াম ও পেশীভঙ্গিমার শিক্ষা করছেন বিশ্বশ্রী মনতোষ রায়ের তত্ত্বাবধানে। সংসার, ব্যায়াম, অফিস ছাড়াও শ্রীচাটার্জ্জী বিভিন্ন ক্লাবে শিক্ষকতাও পেশীপ্রদর্শনীতে নিয়মিতভাবে অংশ গ্রহণ করে থাকেন। ইনি সাধারণ খাদ্যের চেয়ে বেশী খাদ্য গ্রহণ করেন না।

কেবল প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের ১ মাস পূর্ব্বে দুধ মাংস ও ফলের পরিমাণ কিছু বাড়িয়ে দেন। ইনিও জাপানে মিঃ এসিয়া প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করার আশা রাখেন।

মলয় রায়—ইনি ১৯ বৎসর বয়সেই কৃতী পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে ভারতের প্রথম সারির ব্যায়ামীদের সঙ্গে একসাথে দাঁড়াবার যোগ্যতা অর্জ্জন করেছেন। মলয় বর্ত্তমানে সিটি কলেজের ছাত্র। পিতার নির্দেশেই সে ব্যায়াম ও পেশীভঙ্গিমা অনুশীলন করছে। যে সব ভঙ্গীমায় পিতা মনতোষ রায় বিশ্বে এক বিস্ময় সৃষ্টি করেছেন সেই সব ভঙ্গীমা আজ মলয়ের করায়ত্ব। মলয় পিতৃগুরু ব্যায়ামাচার্য বিষ্ণুচরণ ঘোষ মহাশয়ের উপদেশ ও নির্দেশ নিতেও ভুলে যায়নি। এর মধ্যেই সে ১৯৬৪-৬৫ সালে বিদ্যালয়শ্রী ১৯৬৪-৬৫ অরবিন্দশ্রী (বিদ্যালয়) ১৯৬৮ জুনিয়ান ইণ্ডিয়া, ১৯৬৮ অরবিন্দশ্রী (কলেজ বিভাগ) এবং এই বৎসর মহাবিদ্যালয়শ্রী হয়েছে এবং ১৯৬৯ 'অর্জ্জুনশ্রী' ও কলকাতাশ্রী আখ্যা লাভ করেন,—

হাতের গুলি পৌনে ১৭ ইঞ্চি, বুক ৪৫ ইঞ্চি

পেট সাড়ে ২৮ ইঞ্চি, উরু সাড়ে ২২ই, পায়ের গুলি পৌনে ১৫ ইঞ্চি। দৈনিক খাদ্য তালিকা সাধারণের চেয়ে মোটেই উচ্চাঙ্গের নয়। এ ব্যাপারে তার সাথে ১১ ডি, ন্যায়রত্ন লেন, কলি-৪ ফোন ৫৫-৮২০১ এ যোগাযোগ করা যেতে পারে।

সুরাচার্য

কার্ত্তিক মাস কেমন যাবে

কার্ত্তিক মাসের গ্রহসংস্থান সুখপ্রদ নয়। ..ধিপতি রবিগ্রহ নীচস্থ হয়ে শনির প্রত্যক্ষ বৈর-দৃষ্টিতে পতিত। বিশেষ করে ১৩।১৪ কার্ত্তিক পর্য্যন্ত রবি ক্রমশঃই শনির সম্মুখীন হচ্ছে। কাজেই ..াপও বৃদ্ধি পাবে বেশী। বিষণ্ণতা, দুশ্চিন্তা ..াশঙ্কা এইগুলি ঘিরে ধরবে। রবি রাজসরকারের ..ক। কাজেই সর্ব্বদেশেই রাজসরকারের উপর ..-দায়িত্ব চাপ বেশী এসে পড়ছে। অনেক ..জসরকারকে অনেক কিছু দাবী দাওয়া অনিচ্ছা-সত্ত্বেও বা অপারগ হলেও ঘাড় পেতে মেনে নিতে ..বে। উচ্চপদস্থ, সম্মানীয় ব্যক্তিদের মনে ..নিরানন্দ দেখা যায়। তাঁদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির ..াস হওয়া সম্ভব। দেশের ও দশের জাঁকজমক ..মে যাবে, কোনরকমে কর্ত্তব্য সেরে মান বাঁচানই ..ব প্রধান।

চন্দ্রগ্রহ মঙ্গলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং ..ও প্রজাপতির সঙ্গে বৈরদৃষ্টির খর প্রভাব নিয়ে ..স্পতির অস্বাচ্ছন্দ্যকর দৃষ্টির দিকে এগিয়ে ..চ্ছে। মঙ্গল শক্তি ও তেজের কারক বটে, তবে ..ঠকারিতারও কারণ। বিশেষ করে বুধের ..তিকুল দৃষ্টিতে চন্দ্রের হিসাব বিবেচনার এলো-মেলো অবস্থা দেখা যায়। পুনরায় প্রজাপতি ..ঃ অদ্ভুতকর্ম্মা গ্রহ। ইহার প্রতিকূলতায় চন্দ্র ..অর্থাৎ সমাজ মন) হঠকারিতা ও দুর্বিনীত ..হাওয়ায় ক্ষতবিক্ষত হবে আশঙ্কা করা যাচ্ছে। শুক্র নীচস্থ ও প্রজাপতি গ্রহদ্বারা আক্রান্ত। নৈতিক চরিত্রের শ্লথভাব আসা সম্ভব। প্রধান শুভগ্রহ গুরু ছেলেমানুষ বুধের গৃহে পড়ে ঢিলে-হয়ে আছে। তার জ্ঞান উপদেশ কাজে লাগছেনা। পুনরায় ধীর, স্থির, কর্ম্মী শনি উগ্র মঙ্গলের গৃহে নীচস্থ ও বক্রী। কাজেই গঠন করবে কে? কেবল বুধ স্বক্ষেত্রে বলবান্। তিনিও ত আমার উৎকট প্রজাপতির অতি সন্নিকটে অধিষ্ঠান করে চন্দ্রের দ্বারা চঞ্চল অবস্থায় পড়ে আছেন। কাজেই তীক্ষ্ণবুদ্ধিই বা কোন্ কাজে লাগবে? এই ত দেখছি কার্ত্তিক মাসের হাল। এখন আপনারা প্রত্যক্ষ ভাবে দেখুন কার্ত্তিক মাস কেমন কায়দায় কাটে।

এবার ব্যক্তিগত মাসফলে আসা যাক্—

বৈশাখ—যাঁদের বৈশাখ মাসে জন্ম (বা যাঁদের লগ্ন কিংবা রাশি মেষ) তাঁদের কার্ত্তিক মাসের গ্রহবার্ত্তা এই—

মনে ত নিরানন্দ চলছে বেশ কিছুদিন ধরে। এখন আরো দায়দায়িত্ব ঝুঁকি এসে পড়ছে। বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার পরিবর্ত্তে ভ্রান্তি ঘটবে বেশী। পেটের দিকটা নজর রাখবেন। দুশ্চিন্তা কমাবার চেষ্টা করুন, তাহলেই পেটটা আপনি ঠিক হয়ে যাবে, ঔষধের প্রয়োজন হবেনা। কোন মানসিক বিলাসিতার প্রশ্রয় দেবেন না, তাতে ডেকে আনবেন অস্বাচ্ছন্দ্য।

বিবাহিত হলে পতি বা পত্নীর সহিত মন কষাকষি চলতে পারে। একজন উত্তরে গেলে অন্যজন যাবেন দক্ষিণে। কাজেই অপরকে সামলাতে না পারলে নিজেকে সামলে রাখার চেষ্টা

করুন। তাতে মতানৈক্য কম হবে। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্য ভাল নয় এটা খেয়াল রাখবেন, এ. ছাড়া তাঁর দায়দায়িত্ব ও দুশ্চিন্তাও অনেক। কাজেই সহযোগ সহানুভূতি তাঁর অনেকটা প্রয়োজন।

ছেলেমেয়েদের শরীর ভাল দেখিনা। তাদের সম্পর্কে নিয়মিত যত্নের প্রয়োজন। বিদ্যার্থীদের পক্ষে পড়াশোনার আবহাওয়া অনুকূল নয়, কাজেই ফলও মনোমত নয়। যাঁরা Speculater তাঁরা Speulation-এর ধারে যাবেন না, কারণ বড় খাড্ডায় পড়ে যাবেন। যাঁদের সম্পত্তিগত আয়বৃদ্ধির ফিকির আছে এ মাস ততটা সুবিধের নয়।

সাহস ছাড়বেন না এবং চেষ্টা চরিত্র সব বিষয়েই করে যান। মনে যতটা বল রাখবেন ততটাই লাভ। তবে দেখবেন ঝোঁকের বশে পড়ে হঠকারিতা না হয়ে যায়।

জ্যৈষ্ঠ—আপনাদের কার্ত্তিক মাসে সাংসারিক অশান্তি এসে যাচ্ছে। মাতার শরীর ভাল থাকবে না। বন্ধু বান্ধবের কাছ থেকে কোন সাহায্য পাবেন না, বরং তাদের জন্য হতে হবে জ্বালাতন। পরীক্ষার পড়ায় বিশেষ সুবিধে করতে পারবেন না। পারিপার্শ্বিক আবহাওয়াই থাকবে বিঘ্নবাধা যুক্ত কাজেই চিত্ত বসাবেন কি করে? ব্যয়ের মাত্রা দেখে আতঙ্কিত হতে হবে, তাও কি পারবেন ঠিক ব্যয় সঙ্কোচ করতে? পিতৃব্যদের অবস্থা বেশ বেকায়দা দেখা দায়। যদি কর্ম্ম-সংক্রান্ত বদলী হন তো মহাফ্যাসাদ এই কার্ত্তিক মাসে। আত্মীয়-স্বজন প্রতিবেশী নিয়েই বা সুখ কোথায়? ছোটখাটো ভ্রমণ বা স্থানান্তর গমনাগমন এড়াবার চেষ্টা করবেন। বাধ্য হয়ে যেতে হলে রাস্তায় সাবধান থাকবেন। এবং অপরিচিত লোকের উপর বেশী ভরসা রাখবেন না।

সন্তানদের পক্ষে ভালই। তাদের বিদ্যা বুদ্ধির উন্নতি আশা করা যায়। তাদের সৎকাজে উৎসাহিত করলে ফল পাবেন বেশী। আপনি নিজেও ধর্ম্মাদি চিন্তায় মন নিয়োগ করতে পারলে তৃপ্তি পাবেন এই অশান্তিকর পরিবেশের মধ্যেও। এই ফলগুলি বৃষরাশি বা বৃষলগ্নের জাতক-জাতিকা মিলিয়ে দেখতে পারেন।

মেজাজ বেশী গরম করে ফেলবেন না। অর্থোপার্জ্জন ভালই হবে, তবে দুম্‌দাম খরচও দেখি। সহোদরাদির সুখ কম, তাঁদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অবহেলা চলবেনা। আত্মীয় পরিজন বা প্রতিবেশী নিয়ে বিশেষ তৃপ্তি পাবেন না। বন্ধু বান্ধব নিয়ে সময় কাটতে পারে বেশী বা সংসারী হলে সংসারের কাজে ডুবে যেতে পারেন। মাতৃসেবারও ঝোঁক দেখি। ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে পরীক্ষা-সংক্রান্ত ফল ভাল। পেটের অবস্থা ভাল নয়। খাওয়া দাওয়ায় নজর রাখা আবশ্যক। Specnlation করে লক্ষ্মীলাভের চেষ্টা অপচেষ্টা হতে পারে। যদি সম্পত্তিগত আয়বৃদ্ধির তালে থাকেন, দেখবেন গ্রহ বেতালের সুর বাজাচ্ছে। সন্তানদের বাগে আনা শক্ত। তারা নিজেদের ধারা সহজে ছাড়বেনা। অবিবাহিতদের হঠাৎ বিবাহ যোগাযোগ আসতে পারে। ব্যবসায়ীরা কাজ বাড়াবার আগে দেখবেন কতটা সামলাতে পারবেন। এই ফলগুলি মিথুন লগ্ন বা মিথুন রাশির জাতক-জাতিকা মিলিয়ে দেখতে পারেন।

শ্রাবণ—আপনার কার্ত্তিক মাসে ঝগড়া ঝাঁটি বেশী হয়ে যেতে পারে। কি দরকার বৃথা রক্তের উত্তাপ চড়িয়ে? কর্ম্ম নিয়ে ডুবে যান, খুব কাজ করতে পারবেন এবং গুরু দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। সন্তানদের বিষয়েও যথেষ্ট কাজের কাজ করতে পারবেন। ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে খেটে পড়াশোনা করলে ফলে নিরাশ হবার কারণ দেখি না। আত্মীয়স্বজন সংক্রান্ত ফল ভালই। সহোদরাদি ও প্রতিবেশীদের সহিত যোগাযোগ অধিক হলে ভালই। সাংসারিক শান্তি তাদৃশ দেখা যায় না, মাতার স্বাস্থ্যও ভাল নয়। বন্ধুবান্ধব নিয়ে সম্ভবতঃ বিব্রত হতে হবে। গৃহবদলের সময় ভাল নয়। মাথায় দায়িত্ব রয়েছে, আরো কিছু বাড়বে। তবে আপনি হেরে যাবেন না এটা ঠিক। কর্কট লগ্ন বা কর্কট রাশির জাতক-জাতিকার পক্ষে কতকটা প্রযোজ্য।

ভাদ্র—আপনার কার্ত্তিক মাসে অর্থোপার্জ্জন ভালই। অন্ততঃ অর্থ ক্লেশ দেখি না। মাঝে মাঝে ঝাঁই ঝাঁই করে ব্যয় হয়ে যাবে এটা ঠিক, তবুও দুধে হাত পড়বে না।

সম্ভবতঃ তাদের জন্য দায়দায়িত্ব ঝামেলা পোহাতে হবে বেশ খানিকটা—অন্ততঃ কার্ত্তিকের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত।

নিজের শরীরও ভাল থাকবে না। ভেতরে দুশ্চিন্তা থাকবে কি করে সব সামলাবেন ভেবে। ব্যবসায়ী হলে ব্যবসা নিয়ে অনেক ঝক্‌মারী অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে। contract বা agreements অনুযায়ী কর্ম্মাদি করলেও ব্যবস্থার পক্ষে টানা পোড়েন। বিবাহিতদের পক্ষে পতির বা পত্নীর স্বাস্থ্য ভাল দেখি না। তাদের মনে চলবে নিরানন্দ। দাম্পত্য মিল থাকবে সন্দেহ নাই, কিন্তু কে কাকে দেখে, নিজেদের দুশ্চিন্তাই ত বেশী। সিংহ লগ্ন বা সিংহ রাশির জাতক-জাতিকার ব্যাপারেও কতকটা খাটবে আশা করি।

আশ্বিন—আপনাদের কার্ত্তিক মাস মোটামুটি ভালই। নানা রকম কাজ কর্ম্মের যোগাযোগ ঘটবে। বহু বিষয়ে নিযুক্ত থাকতে পারবেন আমোদ আহ্লাদেও যোগাদান করতে পারবেন। অর্থকষ্ট কিছু কাল ধরেই চলছে, সেটা থেকে এখনও রেহাই নেই। বরং কার্ত্তিকমাসে ব্যয়অধিক হয়ে গিয়ে খানিকটা চিন্তায় পড়ে যেতে পারেন। প্রয়োজনে ধার পাবেন আর ঋণের জন্য পীড়িত হতে হবে না। ঋণ থাকলেও লোকে সমীহ করে চলবে। আপনি মনের আনন্দে কাজ করে যান, অর্থবান হলে ব্যবস্থা ঠিক্ হয়ে যাবে। নিজে থেকে মাথা খারাপ করে দরকার নাই। কুটুম্বদের নিয়ে খুব তৃপ্তি দেখি না। ধনসঞ্চয়ের বাসনাও ত্যাগ করুন। রূঢ়ভাষী হবেন না। পিঠ চাপ্‌ড়ে দিলেই দেখবেন কাজ হয়ে যাচ্ছে। অবিবাহিতদের বিবাহ যোগাদি ভাল। প্রণয় সংক্রান্ত অগ্রগতিও কম দেখি না। তবে শেষরক্ষার দিকে নজর রাখা দরকার।

সন্তান সংক্রান্ত চিন্তায় উদ্বেগ, দায়-দায়িত্ব থাকবে যথেষ্ট। তবুও যেন ঠিক খাতে আসছে না। নিজের পেটের অবস্থা ভালনয়, অধিককটু-ঝাল খেয়ে তাকে ব্যতিব্যস্ত করবেন না।

কিছু ভাল contract agreements-য়ের সুযোগ আসতে পারে। ব্যবসা ভালই চলবে। কিন্তু ঘরে টাকা ঢুকবে দেরীতে। কন্যা লগ্ন বা কন্যা রাশি যাদের তারা একবার মিলিয়ে দেখুন।

কাজেই কার্ত্তিক মাসের গ্রহসঞ্চার শুধু কার্ত্তিক মাসের ফল নির্দ্দেশ করবে না। পুরো বছরটা কেমন যাবে তার আলোক-পাত দেখা যায়।

তিনটি শুভগ্রহ ব্যয়ভাবে পড়ে গেছে। কাজেই শুভকাজ দিয়ে শুভভাব দিয়ে রাস্তা করতে গেলে বিলম্ব হবে। শনি আপনাকে চাপে রেখেছে কাজেই দায়-দায়িত্ব আছে অনেক। গৃহ সংসার ও লেখাপড়ার ব্যাপারে। সন্তান নিয়ে কেউ কেউ বিব্রত। সন্তানস্থানে রাহু থাকায় সন্তানরা স্বেচ্ছাচালিত হয়ে থাকবে। আপনিও বিদ্যাদি বা ধর্ম্মচিন্তায় মন বসাতে পারবেন না। সামাজিক আকর্ষণ থাকবে বেশী। মঙ্গল আপনার সহায়, কাজেই সাহস উৎসাহ বিক্রম এগুলি সাহায্য করবে। কর্ম্মে প্রতিষ্ঠা ও যোগ্যতা আশা করা যায়। চেষ্টা করলে কিছু সঞ্চয় করতে পারবেন। পিতৃব্যদের ভালই যাবে। আয় সংক্রান্ত উদ্বেগ আছে, থাকবে। অগ্রজের সম্বন্ধেও চিন্তা আসে মাঝে মাঝে। বিদেশে ভাগ্যযোগ দেখা যায়। সুতরাং সুযোগ পেলে নষ্ট করবেন না। বিদ্যার্থীদের পক্ষে সামাজিক আকর্ষণ ছেড়ে বিদ্যায় মনো নিবেশ প্রয়োজন। শরীরের দিকে যত্ন রাখবেন। তুলা লগ্ন বা তুলা রাশির লোকেদেরও কতকটা এইফল খাটার কথা।

অগ্রহায়ণ—কার্ত্তিক মাসে দ্বিবিধ ফল আশা করতে পারেন। কর্ম্ম সংক্রান্ত উদ্বেগের ত শুধু সুরু হয়েছে। কার্ত্তিক মাসে বাড়বে আশঙ্কা হয়। কর্ম্মবদল, কর্ম্মে বদলী, স্থানান্তর গমনা-গমন এই সব দেখা যায়। গৃহ বদলের সময় পড়ে গেছে, চেষ্টা করে যান্ বৎসর দেড়েকের মধ্যে একটা সুবিধে মত ব্যবস্থা হয়ে যেতে পারে। ব্যয় বন্ধ করতে পারবেন না, দেখবেন ধীরে ধীরে অর্থ বেরিয়ে যাচ্ছে। অবশ্য আয় ভালই হবে। পিতৃব্যদের সময় ভাল নয়, তাঁদের নিয়ে সাংসারিক অশান্তি হওয়া সম্ভব। অগ্রজদের অনেক বিষয়ে সুবিধে হতে পারে। জামাতা বা পুত্রবধু লাভ ভালই হতে পারে। সন্তানদের উন্নতি আশা করতে পারেন। বিদ্যার্থীদের পক্ষে ভাল। বৃশ্চিক লগ্ন বা বৃশ্চিক রাশি যাঁদের তাঁদেরও উক্ত ফল আংশিক প্রযোজ্য।

কর্ম্মজগতে সুযোগ সুবিধে—আসবে এবং উন্নতি করতে পারবেন বা যোগ্যতা দেখাতে পারবেন। মধ্যে মধ্যে সাহসেরও তৎপরতার পরিচয় দিতে পারবেন। আয়ের জন্য আপনার চিন্তা রয়েছে,উপযুক্ত আয়ও ঠিক হচ্ছে না। কার্ত্তিক মাসে আয় পথে বিঘ্নবাধা আছে। তবুও উদ্যম ছাড়বেন না। ঝঞ্ঝাটের মধ্য দিয়ে কামাতে পারবেন অগ্রজের সময় ভাল যাচ্ছে না। উপায় নেই,এখনও কিছুদিন চাপ খেতে হবে। বিদ্যার ব্যাঘাত আছে। অবহেলা চলবে না। বন্ধু বান্ধব সংক্রান্ত শুভফল আশা করতে পারেন। তবে তাঁরা ঠিক নিশ্চিন্ত অবস্থার নেই। মা'র শরীর মধ্যে মধ্যে হঠাৎ খারাপ হতে পারে। গৃহ সংক্রান্ত প্রীতিপ্রদ অবস্থায় থাকতে হলে যথেষ্ট সাতর্কতা প্রয়োজন সন্তানদের স্বাস্থ্যাদি ভাল দেখি না। জামাতা বা পুত্রবধূ লাভেও বিলম্ব হবে। যাঁরা অবিবহিত তাঁদের বিবাহের যোগাযোগ পিছিয়ে যেতে পারে। বিবাহিতদের পতির বা পত্নীর স্বাস্থ্য মন ভাল থাকবে না। ধনুলগ্ন বা ধনুরাশি যাঁদের; তাঁরাও একবার ফলটা মিলিয়ে দেখুন।

মাঘ—আপনাদের কার্ত্তিক মাস খুব সুবিধের নয়। নানান্ ঝঞ্ঝাট এসে পড়বে, অবশ্য শেষরক্ষা হয়ে যাবে। মোটা টাকার খরচে পড়ে গেছেন আগষ্ট মাস থেকেই, এখন সেটা চলবে আরো বছর দেড়েক।

সাংসারিক পারিবারিক ব্যয়, বন্ধু নিমিত্ত ব্যয় পত্নী বা পতির কারণে ব্যয়—এই সব নানান্ ব্যয় দেখা যাচ্ছে কার্ত্তিক মাসে। ব্যবসায়ীর ব্যবসা কারণে ব্যয়, অংশীদারের জন্য ব্যয় ; মামলা নিমিত্ত ব্যয় এইসব নানাবিধ ব্যয় দেখা যায়। কাজেই হৈ হৈ করে টাকা বেরুলে থৈ পাওয়া শক্ত হবে। কাজেই 'সামাল''সামাল'রব তুলতে বাধ্য হচ্ছি। ঋণ পীড়াও বোধ হতে পারে, এবং পাওনাদারের তাগিদ্ কিছু পাবার কথা। মৃতের সম্পত্তি পাবার যোগাযোগ থাকলে এই নিয়ে ঝঞ্ঝাট আছে।

কর্ম্মে দায়দায়িত্ব আছে, আরো thanuless job এলে হাজির হতে পারে এবং পিত্তি চটিয়ে দেবার উপক্রম হবে। সহোদরাদির স্থান মন্দের সম্ভব। লোভনীয় contracts, agrements-য়ের প্রস্তাব আস্তে পারে, বুঝে যুঝে করাই ভাল।পিতা মাতার শারীরিক, মানসিক তেমন ভাল দেখা যায় না। পারিবারিক ঝঞ্ঝাট লেগেই থাকবে। তবুও ভাগ্যস্থানে শুভগ্রহ থাকায়, বিপদ্ অনেক পার হয়ে যাবেন। ধর্ম্মচিন্তায় মন বসাতে পারলে ভাল হয়। যাদের মকর লগ্ন বা মকর রাশি তাঁরাও এই ফলগুলি দেখে নিন্।

ফাল্গুন—আপনাদের পতি বা পত্নী সংক্রান্ত উদ্বেগ সুরু হয়েছে আগষ্ট মাস থেকে। এখনও বছর দেড়েক চলবে। কার্ত্তিক মাসে উভয়েরই শরীর ভাল কাকার কথা নয়। কাজের চাপ অনিয়ম এই সবই প্রধান কারণ। দাম্পত্য প্রীতির অবশ্য অভাব দেখিনা যদিও মতের পার্থক্য মধ্যে মধ্যে দেখা দিতে পারে। অবিবাহিত যাঁরা, তাঁরা বিবাহ কররেন কিনা এইটাই ঠিক্ স্থির করে উঠতে পারবেন না। কারণ হ্যাঁ, না'র দোটানা দেখছি কার্ত্তিক মাসে। সহোদরাদি খুব সুখে থাকবে না, আপনার উপরও তার কিছু প্রতিবিম্ব পড়বে। ব্যবসায়ের যোগাযোগ বাড়বে, তবে খাটুনি হবে বেশী, লাভের অঙ্ক কম। অবশ্য সাধারণ আয় আপনার খারাপ দেখি না initiative ও teadersheep ছাড়বেন না। ঘাড় ধরে কাজ করিয়ে নিতে পারবেন অনেক ওস্তাদের। ব্যয় যথেষ্ট হলেও টাকার অভাব পূরণ হয়ে যাবে। পারিবারিক শান্তি কিছু কম হবার কথা। বন্ধু বান্ধবের সাহায্যেও কম দেখা যায়। মাতার শরীর ভাল থাকবে না। বিদ্যায় মনোমত ফল লাভ শক্ত। সন্তানদের ঝঞ্ঝাট থাকবে, যতটা পারেন যত্ন নিন্ এবং নজর রাখুন। যাঁদের কুম্ভলগ্ন বা কুম্ভরাশি তাঁরাও মিলিয়ে নেবেন।

চৈত্র—আপনার অবস্থা দুই ডাকাতের মাঝে, অথচ ক্ষতি কেউই করতে পারছে না। দৈববল, গুরুবল আপনার সহায়। কাজেই আপনার কেশস্পর্শ করে কে ? শত্রু নিয়ে উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে আগষ্ট মাস থেকে এটা সাত্য, এবং চলবে বেশ কিছু দিন। কিন্তু শত্রু তো পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে ; আপনাকে কিছু করতে হবে না. নিজের কলেই

সব মাটি করবেন না। বিবাহিতরা আমোদে থাকবেন বটে কিন্তু মধ্যে মধ্যে দাম্পত্য কলহ ঐ এড়াতেপারবেন কি ? অর্থ ব্যয় অত্যন্ত,সঞ্চয়ের কথা ভুলে যান, বরং টান দেখা দেবে যাতে সটান, বসে থাকা শক্ত হবে। কর্ম্মে দৌড়ঝাঁপ বাড়বে। public কাজও করতে পারেন। কর্ম্মে প্রসার যোগ্যতা সব দেখা যায়। কাজে যতটা ডুবে যেতে পারেন তাই বর্ত্তমানের—এবং আখেরের কাজ হবে। সন্তানদের উন্নতি দেখি। বিদ্যার্থীদের পক্ষে—ভাল ফললাভ দেখা যায়। যাঁদের মীন লগ্ন or মীন রাশি তাঁদেরও কিছু খাটবে।

প্রশ্ন বিচার ও উত্তর

১। শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বালুরঘাট, দিনাজপুর—

(ক) দেনা শোধ করতে পারবেন। তবে সময় লাগবে। ১১ই নভেম্বরের পর থেকে কিছুটা আর্থিক উন্নতি ঘটতে পারে, তখন থেকে আস্তে আস্তে দেনা শোধ করার চেষ্টা করুন। বৎসর দুয়েক সময় লেগে যেতে পারে অনেকটা দেনা মুক্ত হতে হলে।

(খ) প্রশ্ন চক্রে বৃহস্পতির অবস্থা খারাপ দেখলাম। সম্ভব হ'ল একটা মুক্তা ধারণ করার চেষ্টা করবেন। আপনার হাতের ছাপ মোটেই ভাল তুলতে পারেন নি। যাইহোক যা দেখছি ৩২।৩৩ বৎসরের পর থেকে জীবনে উন্নতি হবে।

২। শ্রীহারানচন্দ্র ঘোষ। আসাম—

(ক) আপনার বিবাহের যোগ এখনও পড়েনি। বৎসর খানেক অপেক্ষা করুন।

(খ) স্ত্রী ভাল হবে, এবং দাম্পত্য জীবনে সুখী হবেন।

৩। শ্রীএন্, সরকার—কটক।

(ক) চাকুরীতে উন্নতি করতে পারবেন।

(খ) আরো ৬ মাস ধৈর্য ধরুন।

৪। শ্রী কে, পি, দাস—বিহার।

(ক) বাড়ীর গোলমাল শীঘ্রই মিটে যাবে।

(খ) ভাল টাকা রোজগার করতে পারবেন।

৫। শ্রীআর পালিত—বেনারস।

(ক) আপনার স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভাল চলছেনা। আরো কিছুকাল শারীরিক দুর্ভোগ আছে।

(খ) এখন সন্তান যোগ নাই।

৬। শ্রী পি গোস্বামী—বোম্বাই।

(ক) আপনার কর্ম্মোন্নতি হবে, ব্যস্ত হবেন না। কারো কারো উন্নতি করতে বা সুপ্রতিষ্ঠিত হতেসময় লাগে, আপনার ৩৬ বৎসরের পুর্ব্বে বিশেষ কিছু দেখি না।

৭। শ্রী টি, দাস,—কলিকাতা।

(ক) লেখাপড়ায় সুবিধা করতে হলে আপনার চাই একাগ্রতা। মাস ছয়েক ধরে সেইটারই অভাব দেখছি।

৮। শ্রী এম পাল—বালিগঞ্জ।

শরীরের চর্চা ছাড়বেন না। Diet conroı প্রয়োজন। তা না হলে মেধ-বৃদ্ধি রোগে ভুগবেন।

৯। শ্রী সি মিত্র—

(ক) আপনার বিদেশ যাওয়া হবে। সেখানে থেকেও যেতে পারেন।

(খ) বৎসর তিনেক বাদে যোগাযোগ বেশী।

১০। শ্রী বি, এস্ মুখার্জি—কলিকাতা।

পড়াশোনা General line ছেড়ে দিন। কোন Tachnical qualificatin নেবার চেষ্টা করুণ। এ যুগে Technical line-এই বেশী চাহিদা। টাকার-লালসা বেশী রাখবেন না। বিপদ এসে যাবে কোনদিন।

১১। শ্রী গি, ডি, রায়,—এলাহাবাদ।

নিজে শত্রুতা করে শত্রুতা বাড়াবেন না।

নিজের Principl নিয়ে চলুন, দেখবেন শীঘ্রই ত'ারা বশ্যতা স্বীকার করছেন।

১২ শ্রী বি, ঘোষাল—মেদিনীপুর।

আপনার সন্তান দুটি ভাল। তারা লেখাপড়ায় বেশ উন্নতি করবে।

যাঁরা ডাকটিকিট পাঠিয়েছেন তাদের মধ্যে কয়েক-জনের উত্তর চলে গেছে। বাকী শীঘ্রই দেবার চেষ্টা করছি।

এবারেও দেখলাম কয়েক জন ডাক টিকিট পাঠালাম লিখে টিকিট দিতে ভুলে গেছেন। যাইহোক যাদের টিকিট পেয়েছি তাদের উত্তর কিছু চলে গেছে এবং বাকীটা যাবে।

আপনার ভবিষ্যৎ জানতে চান কি ?

আপনার যদি কোন গুরুতর প্রশ্ন থাকে, তার উত্তর দেবেন সুরাচার্য্য আপনার জন্মসময়, তারিখ এবং জন্মস্থান জানালে। যাঁদের জন্মচক্র, গ্রহের স্ফুট, বিংশোত্তরীর দশা বা চলছে তা জানা আছে তাঁরা এগুলি লিখে পাঠালে, শীঘ্র উত্তর দেবার সুবিধা হবে। Lahiri's Ephemenis বা বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুযায়ী গণনা করা থাকলেই পাঠাবেন। কারণ সুরাচার্য্য এই দুই গণনার উপরই নির্ভর করেন। দুইটীর বেশী প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব হবে না। এই উত্তর "ভারতবর্ষ"-এর পরের সংখ্যায় পাবেন। অবশ্য খুব বেশী অনুরোধ এসে গেলে পত্রের প্রাপ্তি ক্রম অনুযায়ী আস্তে আস্তে পরের সংখ্যাগুলিতে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা হবে। প্রশ্নের সঙ্গে এই পাতার শেষে যে 'কুপন' আছে সেটী ছিঁড়ে পাঠাতে হবে। প্রতি 'কুপন'-এ দু'টী প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হবে।

পত্র লেখার সময় ও তারিখ পত্রে থাকলে অনেক সময় যথার্থ উত্তর দেওয়ার সহায়তা হয়। হাতের ছাপ ও পাঠাতে পারেন প্রশ্নের রহস্যোদ্‌ঘাটনের সহায়তা হিসাবে। দুই হাতের ছাপ প্রয়োজন। ছাপ নেবার অনেক পদ্ধতি আছে। সাধারণ কালিতে ছাপ ভাল হয়না ; Stamp padink-এ চলতে পারে, যদি Stamp pad-এর সাহায্য নেন। Press ink, Cyclostyle ink অর্থাৎ ছাপার কালি সবচেয়ে ভাল। কিন্তু এই কালি হাতে লাগাতে হলে কাঠের বা রবারের রোলার প্রয়োজন। অনেকের এটা যোগাড় করা সম্ভব নাও হতে পারে। ভূষো কালি হাতে লাগিয়ে চেষ্টা করে দেখতে পারেন। পরিত্যক্ত Lip stick বাড়ীতে থাকলে তা দিয়েও হাতের সুন্দর ছাপ নেওয়া যায়। নূতন ব্যবহার করলে বৃথা খরচ বৃদ্ধি হবে এই যা। মনে রাখবেন, কেবল কৌতুক বশতঃ প্রশ্ন করবেন না। তাতে আপনার ও সুরাচার্য্যের দুজনেরই সময় নষ্ট হবে। প্রশ্ন প্রয়োজনীয় বা গুরুতর, বা জানার আগ্রহ যথেষ্ট থাকলে তবে প্রশ্নের উত্তর ভাল পাওয়া যায়। মনে মনে কল্পনা করে প্রশ্ন বার করবেন না। যে প্রশ্নের উত্তর পাবার জন্য মন ব্যাকুল সেই প্রশ্নই প্রশ্ন।

অনেকেই প্রশ্ন ঠিকমত করতে পারেন না। তাঁরা জানতে চান এক, কিন্তু জিজ্ঞাসা করেন আর এক! কাজেই উত্তর সন্তোষজনক পাওয়া যায় না। এজন্য প্রশ্নটা একটু ভাববেন এবং আসল জ্ঞাতব্য কি সেই কথাটাই খুব সরল, সহজ, স্পষ্ট এবং যথাসম্ভব ছোট্ট করে জানাবেন।

ধরুন আপনার বাজারে কিছু দেনা আছে। আপনি ভাবছেন একটা লটারী পেলে দেনাটা শোধ করে ফেলতে পারেন। কাজেই প্রশ্ন করলেন "লটারী পাব কিনা?" লটারী পাওয়া আসলে কিন্তু প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হচ্ছে ঋণ শোধ, কারণ আপনি ঋণ পীড়ায় পীড়িত। কাজেই আপনার প্রশ্ন হওয়া উচিত "দেনা শুধ্‌তে পারবো কি?" "দেনা শুধ্‌তে কত সময় লাগবে?" "দেনা সময়ে পরিশোধ না করলে কি ক্ষতি হয়ে যাবে"—এই সব। কিন্তু লটারী পাবার জন্যে মন সত্যই ব্যাকুল থাকলে তখন জিজ্ঞেস করতে পারেন লটারী পাবেন কিনা। সেই টাকা তখন কী কাজে লাগাবেন সেটা প্রশ্ন নয়।

প্রশ্নের উত্তর সন্তোষজনক ভাবে মিলে গেলে সুরাচার্য্যকে "ভারতবর্ষ"-এর ঠিকানায় জানাবেন।

॥ কুপন ॥

শারদীয়—১৩৭৫

॥ পরলোকে পরিচালক ॥

শ্রী'ঙ্গ'—

বাংলা চলচিত্র জগতের এক দিক্‌পালের তিরোধান ঘটেছে। ইনি হচ্ছেন স্বনামধন্য চিত্র-পরিচালক মধু বসু। বাংলার চলচিত্র-জগতে মধু বসুর অবদান যে কতটা তা চলচ্চিত্র সংক্রান্ত ব্যক্তিরাই শুধু নয়, সাধারণ দর্শকদেরও অজানা নয়।

নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী যেমন বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে নতুন যুগের সূচনা করেছিলেন, তেমনি মধু বসু ও প্রমথেশ বড়ুয়া চলচ্চিত্র জগতে নব-যুগের প্রবর্ত্তন করেন বললে নিশ্চয়ই অত্যুক্তি করা হবে না। মধু বসু তাঁর "আলিবাবা" চিত্রটি নির্ম্মাণ করে চলচ্চিত্র জগতে সর্ব্বপ্রথম তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। মঞ্চ-সফল এই নাটকটিকে নূতন আঙ্গিকে চলচ্চিত্র রূপায়িত করে তিনি বিস্ময়ের সৃষ্টি করেন। এই চিত্রের মাধ্যমেই তিনি বঙ্গ-চিত্র-জগতে নূতন যুগ সূচনার ইঙ্গিত দেন এবং এই চিত্রেই তিনি তাঁর প্রতিভাময়ী নৃত্য-পটীয়সী স্ত্রী শ্রীমতী সাধনা বসুকে মর্জ্জিনার ভূমিকায় মাধ্যমে দর্শক সম্মুখে উপস্থিত করেন। তিনি নিজেও আবদাল্লার ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয় করে দর্শকমন রঞ্জন করেন। মধু বসুর পরিচালনায় এবং শ্রীমতী সাধনার নৃত্য ও অভিনয়ে "আলিবাবা" এক নতুন রাগে, নতুন ছন্দে দর্শক মনকে ভরিয়ে তোলে।

এরপর মধু বসু আরও অনেক চিত্র পরিচালনা করেন ও নব নব সৃষ্টিতে বাংলার চিত্র ভাণ্ডার ভরিয়ে তোলেন। যে বিষয় বা গল্প সাধারণ পরিচালকরা চিত্রে রূপায়িত করতে ভরসা পেতেন না, মধু বসু সেই সব বিষয় ও গল্পকে চিত্রায়িত করতে আনন্দ লাভ করতেন এবং তাঁর প্রতিভার গুণে তা সাফল্য লাভও করত।

শুধু চিত্র-পরিচালক রূপেই কিন্তু মধু বসু পরিচিত নন। নাটক পরিচালনায় ও অভিনয়েও তাঁর প্রতিভার পরিচয় তিনি দিয়ে গেছেন। তাঁর মত প্রতিভাধর চৌকস অভিনেতা ও পরিচালকের মৃত্যুতে বাংলা চিত্র-জগতের ও দর্শক-সমাজের সকলেই গভীর দুঃখ অনুভব করেছেন।

আমরা মধু বসুর পরলোকগত আত্মার শান্তি প্রার্থনা করি এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত সহধর্ম্মিনী শ্রীমতী সাধনা বসুকে জানাই আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি।

খবর বলছি :

এবারকার পূজার উৎসবে চিত্রজগতের নতুন উপহার হলো : চারুচিত্র-র "কমললতা", এস, এম, ফিল্মসের 'মন নিয়ে', নিউ এরা পিক্‌চার্সে'র "অগ্নিযুগের কাহিনী", রূপ কলা পিক্‌চার্সে'র "মহল" এবং বি, আর, ফিল্মসের "ইত্তেফাক্"।

উত্তমকুমার ও সুচিত্রা সেন অভিনীত এবং শ্রীহরিসাধন দাশগুপ্ত পরিচালিত "কমললতা" চিত্রটিই বোধ হয় পূজার বাজারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ।

* * *

উত্তমকুমার ও সুপ্রিয়া দেবী অভিনীত "মন নিয়ে" ছবিটি নিজের লেখা কাহিনী অবলম্বনে পরিচালনা করেছেন শ্রীসলিল সেন। শ্রীগিরীন্দ্র সিংহ প্রযোজিত ছবিটির অন্যান্য ভূমিকায় শিল্পীদের মধ্যে রয়েছেন পাহাড়ী সান্যাল, বিকাশ রায়, ছায়া দেবী, তরুণকুমার, রোমি চৌধুরী প্রভৃতি। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ছবিটির সুরকার।

* * *

বীরেন রায় এম, পি রচিত এবং ভূপেন রায় পরিচালিত বাংলার বিপ্লবী যুগের কাহিনীর ভিত্তিতে তৈরী "অগ্নিযুগের কাহিনী" চিত্রটি। এই ছবিটীর বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন—বিকাশ রায়, মাধবী মুখোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, অজয় গাঙ্গুলী, বিজন ভট্টাচার্য, সুলতা চৌধুরী, গীতা দে প্রমুখ শিল্পীরা। গোপেন মল্লিক ছবিখানির সুরকার।

* * *

প্রণয়, রহস্য ও উৎকণ্ঠা ইত্যাদি উপকরণের সংমিশ্রণে গড়া "মহল" ছবিটির মুখ্য দুই শিল্পী হলেন দেব আনন্দ ও আশা পারেখ। ইষ্টম্যান্ কালারে তোলা ছবিটির অন্যান্য বিশেষ ভূমিকার শিল্পী হলেন—নবাগতা ফরিদা জালাল, সুধীর, অভি ভট্টাচার্য, ডেভিড প্রমুখ শিল্পিবৃন্দ। শঙ্কর মুখার্জি পরিচালিত এই চিত্রটির সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন কল্যাণজী আনন্দজী।

* * *

বি, আর, চোপরার "ইত্তেফাক" ছবিটিও গড়ে উঠেছে একটি রহস্যমূলক কাহিনীর ভিত্তিতে এবং এটিও ইষ্টম্যান্ কালারে তোলা। তবে ফিচার ফিল্ম হিসাবে এ-ছবির বিশেষত্ব এই যে, মাত্র একমাস সময়ের মধ্যে ছবিটির তাবৎ কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। বোম্বাইয়ে তোলা হিন্দী ছবির ক্ষেত্রে একে অভিনব বলা চলে।

নন্দা, রাজেশ খান্না, সুজিৎকুমার, মদনপুরী প্রমুখ শিল্পীরা বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। ছবিটি পরিচালনা করেছেন যশ চোপরা, আর সঙ্গীতপরিচালনার কৃতিত্ব সলিল চৌধুরীর।

* * *

বি-এন-রায় প্রোডাকশন্সের শরৎচন্দ্রের 'অরক্ষণীয়া'-র কাহীনী অবলম্বনে চিত্রায়িত "মা ও মেয়ে" চিত্রটি মুক্তি পাচ্ছে আগামী ১৬ই অক্টোবর। এ-ছবির নায়িকা জ্ঞানদার চরিত্রে মৌসুমী চ্যাটার্জি অভিনয় করেছেন। অন্যান্য ভূমিকায় আছেন—সন্ধ্যারাণী, স্বরূপ দত্ত, ছায়া দেবী, কাজল গুপ্ত প্রমুখ শিল্পীরা। সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় ছবিটির পরিচালক এবং সুরকার সুশীল ব্যানার্জি।

* * *

বনফুল লিখিত ও শ্রীমৃণাল সেন-কৃত "ভুবন সোম" ১৬ই অক্টোবর "এলিট" সিনেমায় মুক্তি লাভ করছে। "ভুবন সোম" সম্প্রতি ভেনিস উৎসবে পুরস্কৃত হয়েছে।

* * *

অজিত গঙ্গোপাধ্যায় পরিচালিত এম-বি প্রোডাক্‌সন্সের 'প্রতিদান' চিত্রটি আগামী ৭ই নভেম্বর রূপবাণী-অরুণা-ভারতী চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করবে। ছবির প্রধান শিল্পী হলেন কাজল গুপ্ত, অনিল চ্যাটার্জি, কালী ব্যানার্জি।

* * *

নবগঠিত জনতা ফিল্মস্ কর্পোরেশনের প্রথম প্রয়াস 'জনতার আদালত'-এর শুভমহরৎ উদ্‌যাপিত হলো। এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন পরিষদ মন্ত্রী শ্রীযতীন চক্রবর্তী

এবং সভাপতি ও প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে শ্রীদেবকীকুমার বসু ও শ্রীদ্বিজেন বসু।

'মধুকর' গোষ্ঠী পরিচালিত ছবিটির সঙ্গীত পরিচালনায় আছেন তরুণ সঙ্গীত পরিচালক বাপী লাহিড়ী।

চিত্রটির প্রধান তিন শিল্পী হলেন শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, অশোক মৈত্র ও নবাগতা চৈতালী দাশগুপ্ত।

* * *

মেট্রো সিনেমায় দেখানো হচ্ছে "দি সোরড ইন দি স্টোন"। ওয়াল্ট ডিজ্নির এই কারটুন-চিত্রটি খুবই উপভোগ্য। এর পূর্ব্বে প্রদর্শিত "হেট্ ফর হেট্" নামক নতুন ধরণের ওয়েষ্টার্ণ চিত্রটিও উপভোগ্য হয়েছিল।

* * *

লাইটহাউসে সম্প্রতি দেখান হচ্ছে "আই অব দি ক্যাট" নামক একটি অপরাধ-চিত্র। এক ধনী মহিলাকে হত্যার চক্রান্ত নিয়ে সাসপেন্সের শুরু। সেই চক্রান্ত শেষ পর্যন্ত বিফল হয়েছে এবং কী ভাবে বিফল হল তা নিয়েই নাটক।

* * *

প্রখ্যাত অভিনেত্রী শ্রীমতী তনুজা দিল্লিতে কর্মরত এক ইঞ্জিনীয়ারের বাগদত্তা। নভেম্বর মাসে বারাণসীতে তাঁদের বিয়ে হবার কথা।

* * *

সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'গুপী গাইন, বাঘা বাইন, ছবিটি অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত অ্যাডিলেড্ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠ পরিচালনা ও মৌলিকতার জন্য পুরস্কার পেয়েছে। এছাড়া একটি 'সিলভার ক্রস' ও লাভ করেছে ছবিটি।

ছবিটির প্রযোজক শ্রীনেপাল দত্ত ওই উৎসবে ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। উৎসবের কর্তৃপক্ষ তাঁকে অকৃত্রিম সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন।

* * * *

মহাত্মা গান্ধীর জীবন কাহিনী অবলম্বনে নির্ম্মিত 'মহাত্মা' ছবিখানি তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে বৃটেনে।

গান্ধী ন্যাশনাল মেমোরিয়াল ফাণ্ডের প্রযোজনায় এই ছবিটি নির্ম্মিত হয়েছে।

বৃটিশ চলচ্চিত্র সমালোচকরা 'মহাত্মা' ছবিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যমূলক ছবি বলে বর্ণনা করেছেন।

জানা গেছে এই ছবির পরিচালক বিঠল ভাই কে জাভেরী সাত বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই ছবির তথ্যাদি সংগ্রহ করে সাড়ে তিন ঘণ্টায় এই ছবিটি তৈরী করেছেন।

* * *

জাস্টিস স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষের পৌত্র অ্যাড্‌ভোকেট বিনয়কুমার ঘোষ (কাকুবাবু) গত ৮ই অক্টোবর সন্ধ্যায় পরলোকগমন করেছেন। তিনি এদেশের চলচ্চিত্র শিল্পের একজন পুরোধারূপে গণ্য। 'আঁধারে আলো', 'মানভঞ্জন', 'চন্দ্রনাথ' ইত্যাদি চিত্র তিনি প্রযোজনা করেন।

উল্লেখযোগ্য যে 'চন্দ্রনাথ' চিত্রেই প্রখ্যাত নট দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম চিত্রাবতরণ করেন।

চলচ্চিত্রের যন্ত্রনির্ভরতা

পশুপতি চট্টোপাধ্যায়

"চিত্রনাট্যের কাজ ছাড়া ছবির অন্য সব কাজেই যন্ত্রের ব্যবহার অপরিহার্য। চলচ্চিত্র একান্তই যন্ত্রযুগের ভাষা। ক্যামেরা নামক যন্ত্রের আবিষ্কার না হ'লে যে এ-ভাষার সৃষ্টি হত না তা নিঃসন্দেহে বলা চলে। আর ছবির ভাষার সঙ্গে ধ্বনির ভাষার যে যোগ সবাকযুগে সম্ভব হল তা শব্দযন্ত্রের আবিষ্কার থেকেই।", বলেছেন সত্যজিৎ রায়। যন্ত্রের ওপর প্রচণ্ড রকম নির্ভরশীল বলেই বিদগ্ধ সমাজের একটি বৃহৎ অংশ চলচ্চিত্রকে আজও শিল্পের মর্যাদা দিতে নারাজ। কিন্তু যন্ত্রপ্রসূত ইমেজ বা রূপকল্প ও ধ্বনির সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন ক'রে একটি আশ্চর্য শিল্পসম্ভার জন্মদান করেন বলেই না চলচ্চিত্র পরিচালক আজকের বৈজ্ঞানিক যুগের শ্রেষ্ঠতম শিল্পী বলে অভিনন্দিত ?

ফোটোগ্রাফীর উদ্ভাবনের ফলে যেদিন নিসর্গশোভা, প্রস্তরমূর্তি, স্থাপত্যের নিদর্শন, গৃহ-অট্টালিকা, জীবজন্তু বা মানুষের স্থিরচিত্র নেওয়া সম্ভব হ'ল, তার পর মুহূর্ত থেকেই মানুষের ভাবনা ধাবিত হ'ল—গতিশীল মানুষ বা জীবজন্তু, চলন্ত যানবাহন বা বেগবতী স্রোতস্বিনীকেও চিত্রের মাধ্যমে ধ'রে রাখার প্রক্রিয়া আবিষ্কারের দিকে। 'ঝটিতি চিত্রগ্রহণ পদ্ধতি' বা স্ন্যাপশট্ দ্বারা কোনো গতিশীল বস্তু বা জীবের একটি বিশেষ অবস্থানের স্থিরচিত্র নেওয়া সম্ভব হ'লেও সেই গতিশীল বস্তু বা জীবের, ধরুন, এক মিনিট কালব্যাপী চলন্ত আলোকচিত্র গ্রহণকে সম্ভব করা যায় কি ক'রে, সেই দিকে মানুষ তার চিন্তাকে নিয়োজিত করল।

মানুষের বিজ্ঞানী মন মানুষের চোখের একটি বিশেষ ক্ষমতাকে এইখানে কাজে লাগাতে চাইল। আমরা জানি যে, আমাদের চোখের সামনে হাতের একটি আঙুলকে—ধরুন, তর্জনীকে—সোজা ক'রে ধ'রে যদি খুব দ্রুত ডাইনে-বাঁয়ে নাড়ানো যায়, তাহলে আমরা দেখতে পাই যে, যতখানি ডাইনে-বাঁয়ে আমরা আঙুলটিকে হেলাচ্ছি, ততখানি জায়গা জুড়ে যেন অনেকগুলি আঙুল পাশাপাশি রয়েছে। আমরা এও দেখেছি যে, একটি তার বা লাঠির এক প্রান্তে কাপড়ের ফালি দিয়ে একটি গোলক তৈরী ক'রে সেটিকে কেরোসিন তেলে ডুবিয়ে নিয়ে প্রজ্জ্বলিত করবার পরে তার বা লাঠিটির অপর প্রান্ত ধ'রে যদি খুব জোরে ঘোরানো হয়, তাহলে ঐ অগ্নি-গোলকটি চোখের সামনে একটি জলন্ত বৃত্ত রচনা করে। বিজ্ঞান বলে, মানুষের চোখের সামনে থেকে কোনো জিনিসকে সরিয়ে নেবার পরেও ১/১৬ সেকেণ্ড কাল ধ'রে ঐ জিনিসের ছাপটি তার অক্ষিপটে মুদ্রিত থাকে অর্থাৎ আসল জিনিসটিকে সরিয়ে নেবার পরেও মানুষ অন্তত আরও ১/১৬ সেকেণ্ড সময় পর্যন্ত ঐ জিনিষটিকে দেখতে থাকে। মানুষের চোখের এই বিশেষ প্রক্রিয়াকেই বলা হয় Persistence of visual impression, আমাদের দৃষ্টিশক্তির এই বিশেষত্বটুকু না থাকলে কোনো দিনই চলচ্চিত্রের জন্ম সম্ভব হ'ত না।

আমাদের দৃষ্টিশক্তির এই বিশেষত্বের কথা মনে রেখেই বিজ্ঞানী মানুষ চিন্তা করেছিল যে, যদি কোনো ধাবমান বস্তু বা জীবের প্রতিটি পরিবর্তিত অবস্থানের 'স্ন্যাপ্‌শট্' গ্রহণ করা সম্ভব হয়, তা হ'লে সেই 'স্ন্যাপ্‌শট্' গুলিকে বা দ্রুত গৃহীত চিত্রগুলিকে লোকের চোখের সামনে দিয়ে দ্রুতগতিতে পর পর চালিয়ে নিয়ে গেলে লোকে বস্তু বা জীবটিকে ছবির মধ্যে দিয়ে ধাবমান অবস্থাতেই প্রত্যক্ষ করবে। আমরা জানি, ১৯২০ সাল পর্যন্ত ক্যামেরার সাহায্যে স্থিরচিত্র গ্রহণের জন্যে ব্যবহৃত হ'ত কাঁচের ফোটোপ্লেট। অথচ একই ক্যামেরায় দ্রুতগতিতে পর পর স্থিরচিত্র গ্রহণের জন্য এই কাঁচের ফোটোপ্লেট ব্যবহার কাজের দিক দিয়ে খুবই অসুবিধাজনক। কাজেই এই কাজের জন্যে অন্য কোনো সুবিধাজনক মাধ্যম উদ্ভাবনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল বহুদিন পূর্বেই।

ইতিহাস বলে, ১৮৮৭ সালের ২১ জুন তারিখে ফ্রীজ-গ্রীণ নামে জনৈক ইংরেজ এমন এক ধরণের দ্রুত কর্মক্ষম

ক্যামেরার 'পেটেণ্টরাইট' বা আইনসম্মত একচেটিয়া অধিকার গ্রহণ করেছিলেন, যাতে ফোটো তোলার জন্যে দু'পাশে ছিদ্রযুক্ত বিশেষভাবে প্রস্তুত সরু কাগজ বা অন্য-কোনো উপযোগী বস্তু নির্মিত ফিতেকে দাঁতওয়ালা রোলারের সাহায্যে লেন্সের পিছন দিয়ে চালানো যায়। যাতে ফোটো উঠবে—সে ফোটোগ্রাফিক সিল্ভার-নাইট্রেট ইমালশান-লাগানো কাঁচের প্লেটই হোক বা অন্য কোনোরকম দ্রব্য নির্মিত ফিতেই হোক—তাকে ক্যামেরার লেন্সের পিছনে মুহূর্তের জন্যে হ'লেও স্থিরভাবে বিন্দুমাত্রও নড়াচড়া না ক'রে দাঁড়াতে হবে। অথচ এই মুহূর্ত মাত্র স্থির থাকবার পরে যখন সেই ফোটো-গৃহীত প্লেট বা ফিতেকে পরবর্তী অংশের জন্যে স্থান ছেড়ে দিয়ে সরে যেতে হবে, তখন সেই সরে যাবার সময়টিতে যাতে লেন্সের ভিতর দিয়ে ওর ওপর কোনো রকম আলো এসে না পড়তে পারে, সে-ব্যবস্থাও সঙ্গে সঙ্গে করা দরকার। কারণ, এটা জানা কথা যে, প্লেট বা ইমালশান-লাগানো ফিতেটি কিছুমাত্র নড়লে তার ওপর আলোকবাহিত দাগ বা ফোটো ঝাপসা বা অস্পষ্ট ভাবে উঠবে। একই ক্যামেরার সাহায্যে কোনো গতিশীল জীব বা বস্তুর অবস্থান বা ভঙ্গী পরিবর্তনের অতি দ্রুত স্থিরচিত্র গ্রহণের সুবিধার জন্যে একই সঙ্গে তিনটি জিনিসের প্রয়োজন অনুভূত হ'ল: (১) ফোটোগ্রাফিক ইমালশান-লাগানো কোনো নরম অথচ টান-সহ ফিতার মতো বস্তু, যাকে সহজেই লেন্সের পিছনে কখনও স্থির রাখা যায় এবং পর মুহূর্তেই স্থির-রাখা অংশটিকে সরিয়ে দিয়ে অন্য এক নতুন অংশকে স্থির ভাবে রাখা যায়; (২) ফোটোগ্রাফিক ফিতার একটি ছোট্ট অংশকে (ফ্রেম) লেন্সের পিছনে মুহূর্তের জন্যে স্থির রাখা ও পর মুহূর্তেই সরিয়ে দিয়ে পরবর্তী অংশকে আবার স্থিরভাবে ধ'রে রাখার প্রক্রিয়াকে পুনঃপুনঃ ক্ষিপ্রভাবে ঘটাবার যন্ত্র এবং (৩) ফিতাটিকে যখন সরানো হচ্ছে, তখন লেন্সের ভিতর দিয়ে কোনো আলো যাতে চলমান ফিতার ওপর না পড়ে, তার জন্যে আবরক যন্ত্র। এই তিনটি জিনিসের প্রথমটি হ'ল, ১৮৮৯ সালে জর্জ ইস্টম্যান আবিষ্কৃত স্বচ্ছ নমনীয় সেলুলয়েড, যার একদিকে মাখানো থাকে ফোটোগ্রাফিক ইমালশান, যা ব্যবসায়িক ছবি তৈরীর জন্যে সাধারণত ৩৫ মিলিমিটার চওড়া হয় এবং যার দু'ধারে সমান দূরত্বে এমন ছোট ছোট চৌকো গর্ত থাকে, যে গর্তগুলি অনায়াসে ক্যামেরার মধ্যে রাখা রোলারের দাঁতগুলিতে ঢুকে যায় এবং রোলারটি যখন ঘুরতে থাকে, তখন ঐ ৩৫ মিঃ মিঃ চওড়া সেলুলয়েডকে সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে বা পেছিয়ে যেতে সাহায্য করে। এই ইমাল্-শানওয়ালা সেলুলয়েডকেই কাঁচা ফিল্ম নেগেটিভ বলা হয়ে থাকে। দ্বিতীয় জিনিসটি হ'ল, ক্যামেরার মধ্যে রক্ষিত মাল্টিস্‌ক্রশ (MALTESE CROSS) নামে দাঁতওয়ালা রোলার, যে যন্ত্রটি ফিল্মকে অর্থাৎ ফিল্মের অংশবিশেষকে একবার লেন্সের পিছনে স্থিরভাবে দাঁড় করায়, আবার পর-ক্ষণেই তাকে টেনে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে পরবর্তী অংশকে দাঁড় করায়। আবার বলি, এই প্রক্রিয়ার দ্রুত পুনরাবৃত্তির ফলেই চলন্ত জীবজন্তু বা ধাবমান যানবাহনের প্রতি মুহূর্তের স্থিরচিত্র গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে অর্থাৎ এক কথায় চলচ্চিত্রের জন্ম সম্ভব হয়েছে। তৃতীয় জিনিসটি হচ্ছে, ক্যামেরার আবরক বা শাটার। এটি লেন্সের সামনে থাকে; যখন ফিল্মটি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তখন এটি খোলা থেকে যে-সজীব বা নির্জীব পদার্থের ফোটো নেওয়া হচ্ছে, তার ওপর প্রতিফলিত আলোকে লেন্সের ভিতর দিয়ে প্রবেশ ক'রে ফিল্মের ইমাল্‌শানে ঐ পদার্থকে প্রতিবিম্বিত হ'তে সাহায্য করে, আর যখন ফিল্মটি গতিশীল হয়ে একটি ফ্রেমকে সরিয়ে দিয়ে পরবর্তী ফ্রেমকে লেন্সের পিছনে আনে, তখন শাটারটি বন্ধ থেকে আলো-কে লেন্সে প্রবেশ করতে দেয় না। যতদূর জানা যায়, শেষ দু'টি জিনিসের উদ্ভাবন করেন টমাস আরমাট্। তিনি ১৮৯৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জর্জিয়ার আটালাণ্টা শহরে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীতে তাঁর 'ভাইটাস্কোপ' যন্ত্র সাধারণ্যে প্রদর্শিত করেন।

মোশান পিকচার ক্যামেরা বা সংক্ষেপে মুভী ক্যামেরা আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে ম্যাজিক ল্যাণ্টার্নের পরিবর্তন ঘটিয়ে দু'টি দাঁতওয়ালা ৩৫ মিঃ মিঃ চওড়া বেলন (sprocket wheel), মাল্টিস্ ক্রশ ও শাটার (আবরক) ইত্যাদি যোগ ক'রে ছবিপ্রক্ষেপণ যন্ত্র বা প্রোজেক্টর তৈরী হ'ল। প্রথম প্রথম ক্যামেরা ও প্রোজেক্টার—দুইই হাতে ঘোরানো হ'ত এবং দুইয়েতেই মাত্র একশো ফুট ফিল্মের

রীল চালানো হ'ত। পরে ঘড়ির স্প্রীংয়ের মতো স্প্রীংয়ের সাহায্যে এদের গতিশীল করা হ'ত। কিন্তু কাহিনী চিত্রের জন্মলাভের সঙ্গে ফিল্মের রীলকে যখন অন্তত চার শো ফুট দীর্ঘ করবার প্রয়োজনীতা অনুভূত হ'ল, তখন থেকে এদের চালাবার জন্যে বৈদ্যুতিক শক্তি প্রয়োগ করবার চেষ্টা চলতে লাগল। কিছু দিনের অভিজ্ঞতার ফলে ও বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে স্থির করা হ'ল যে, প্রতি সেকেণ্ডে যদি এক ফুট ফিল্ম চালানো যায় এবং প্রতি ফুট ফিল্মে সামান্য ব্যবধানে ষোলো খানি ক'রে স্থির চিত্র তোলা যায়, তাহ'লে সেই ফিল্ম নেগেটিভ থেকে মুদ্রিত পজিটিভ ফিল্মটি অনুরূপ গতিতে অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে এক ফুট বা ষোলটি ছবির গতিতে প্রোজেক্টারের ভিতর দিয়ে পর্দার গায়ে প্রতিফলিত করলে দ্রুত পরিবর্তনশীল স্থির চিত্রগুলি চোখের উপর দিয়ে ভেসে গিয়ে ছবিতে-ধরা মানুষ, জীব বা যানবাহনাদির গতিশীলতাকে প্রত্যক্ষীভূত করাতে সক্ষম হবে। জানা থাকে যে, এক ফুট ফিল্মের অন্তর্গত ষোলটি ফ্রেমের প্রতিখানি দু'পাশে সমান দূরত্বে অবস্থিত চারটি ক'রে গর্ত (sprocket hole) থাকে এবং প্রতি দু'টি ফ্রেমের মাঝে দু'টি গর্তের মাঝের পরিমিত সঙ্কীর্ণ স্থানটুকুর (প্রায় তিন মিলি মিটার) ব্যবধান থাকে। আরও জানা থাকে যে, নির্বাক যুগে অর্থাৎ ছবির সঙ্গে যখন শব্দের সমন্বয় সাধন করা হয়নি, তখন প্রতিটি ফ্রেমকে ক্যামেরার লেন্সের পিছনে তার ওপর ফোটো ওঠবার জন্যে স্থিরভাবে ধ'রে রাখা হ'ত ১/২০ সেকেণ্ড এবং একটি ফ্রেম স'রে গিয়ে পরবর্তী ফ্রেমের ঐ লেন্সের পিছনে আসতে সময় লাগত ১/৮০ সেকেণ্ড। এই হিসেবেই প্রতি সেকেণ্ডে ষোলো খানি ছবি উঠত ঐ নির্বাক যুগে। আরও জানা থাকে যে, পুরো ফিল্মটি ৩৫ মিঃ মিঃ চওড়া হ'লেও দু'পাশের গর্তগুলিকে বাদ দিয়ে প্রতিটি ফ্রেমের আকার হ'ত ২৫ × ১৫ মিঃ মিঃ নির্বাক যুগে। সবাক যুগে দাঁড়িয়েছে ২২ × ১৫ মিঃ মিঃ।

নির্বাক যুগেই কাহিনী চিত্র, তথ্য চিত্র বা সংবাদ চিত্র প্রভৃতির দৃশ্যাংশ তোলবার সুবিধার জন্যে এবং দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে যাবার বিবিধ পন্থা অবলম্বনের জন্যে বিভিন্ন শক্তি রকম যন্ত্রাংশ (gadget) সন্নিবেশিত করা হয়েছিল। যেমন, একটি দৃশ্য আরম্ভের সময়ে কালো পর্দার ওপর দৃশ্যটি ধীরে ধীরে ফুটে ওঠা, কোনো দৃশ্য শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যটি ধীরে ধীরে চোখের সামনে থেকে মুছে গিয়ে পর্দা আবার কালো হওয়া, একটি দৃশ্য মিলিয়ে যেতে না যেতে পরের দৃশ্যটি পর্দার ওপর ভেসে ওঠা কিংবা কোনো দৃশ্যের কেন্দ্রে একটি বিন্দু সৃষ্টি হওয়া ও সেটি ক্রমে বৃত্তাকারে বড় হয়ে দৃশ্যটিকে চারদিক থেকে মুছে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তী দৃশ্যটির ঐ ক্রমবর্ধমান বৃত্তের ভিতর দিয়ে দর্শকসমক্ষে উপস্থিত হওয়া প্রভৃতি ধরণের কৌশল নির্বাক যুগে ক্যামেরার সাহায্যেই করা হ'ত।

কিন্তু এই যে ক্যামেরার সাহায্যে চিত্রগ্রহণ এবং অন্ধকারময় প্রেক্ষাগৃহে প্রোজেক্টারের সাহায্যে সেই চিত্রের পর্দায় প্রতিফলন—এই দুই প্রক্রিয়ার মাঝে বেশ কিছুটা কাজ আছে, যাতে যন্ত্রের সাহায্য নিতে হয়। আমরা জানি, ক্যামেরার সাহায্যে ফোটো তোলা হয় প্রথমে নেগেটিভ প্লেটে (স্থিরচিত্র) ও নেগেটিভ ফিল্মে (স্থির বা গতিশীল চিত্র)। এই নেগেটিভে কোন রকমে আলো লাগতে না দিয়ে অন্ধকার ঘরে ফোটো কেমিক্যালের সাহায্যে ডেভেলপ ও ফিক্স (পরিস্ফুটন ও স্থিরীকরণ) করা হয়। চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে এই কাজটা আগে 'র‍্যাক অ্যাণ্ড ট্যাঙ্ক'-এর সাহায্যে হাতেই করা হ'ত অর্থাৎ একটি ৫ × ৩ ফুট কাঠের ফ্রেমে ফিল্মকে জড়িয়ে নিয়ে কেমিক্যালভর্তি চৌবাচ্ছায় ডোবান হ'ত কয়েক মিনিট। কিন্তু নেগেটিভ ফিল্ম থেকে পজিটিভ ফিল্মে মুদ্রণের কাজটার জন্যে প্রয়োজন হয় প্রিন্টিং মেশিনের। এই প্রিন্টিংয়ের কাজও কিন্তু অন্ধকার ঘরেই (কোনো কোনো সময়ে অল্প ঔজ্জ্বল্যবিশিষ্ট লাল আলো জেলে) সম্পন্ন করা হয়।

কাহিনী চিত্রই বলুন আর তথ্য বা সংবাদচিত্রই বলুন, ক্যামেরা মারফত যতখানি নেগেটিভ ফিল্মে ফোটো তোলা হয় অর্থাৎ কলাকুশলীদের ভাষায় এক্সপোজ করা হয়, তার সবখানিকেই রসায়নাগারে ডেভেলপ এবং ফিক্স করা হয় বটে, কিন্তু তার সবটুকুই পজিটিভে মুদ্রিত করা হয় না। একতো চিত্রগ্রহণে ত্রুটির জন্যে কিছু

চিত্রগ্রহণের বা শট্-এর আরম্ভ ও শেষ ভাগ অর্থাৎ ল্যাজা-মুড়ো প্রায়ই বাদ দেবার প্রথা আছে, বিশেষ করে কাহিনী-চিত্রের ক্ষেত্রে। কারণ, শট্টিতে যতটুকু অ্যাকশন (action) বা নাট্যক্রিয়া থাকে, ঠিক ততটুকুই রাখা হয়। কাহিনীচিত্রে কাহিনীকে এবং তথ্যচিত্রে বক্তব্যকে কি ভাবে দৃশ্যের পর দৃশ্যের মাধ্যমে বর্ণনা করা হবে, তাই প্রথমে ঠিক করে নেওয়া হয়; পরে প্রতিটি দৃশ্যকে ক্যামেরা-অবস্থান (দূরে রাখা, মাঝামাঝি রাখা, কাছে রাখা কিংবা খুব কাছে রাখা হবে এবং ক্যামেরা স্থির থাকবে অথবা নড়াচড়া করবে, এই সব বিবেচনা ক'রে) ভেদে ক'টি ভাগে বা শট্-এ নেওয়া হবে, তা' স্থির করা হয়। গৃহীত শট্গুলিকে পর পর সাজাবার সময় নাট্যক্রিয়া অনুসারে শট্-এর পরে শট্-এ যাতে সঙ্গতি ও ধারা বজায় থাকে, সেই অনুসারে কাট-ছাঁট করা হয়। নির্বাক যুগে এই সাজানো ও কাটছাঁট করবার জন্যে সম্পাদক মাত্র একটি ফিল্ম গোটানোর টেবিল, ফিল্ম কাটা যন্ত্র বা স্প্লাইসার, কাঁচি, ফিল্মের প্রান্তভাগ চাঁচবার জন্যে ব্লেড ও জোড়বার জন্যে ফিল্ম-সিমেণ্ট (অ্যাসিটিক এসিড এবং অ্যামিল অ্যাসিটেট-এর সংমিশ্রণে প্রস্তুত তরল বর্ণহীন আঠা জাতিয় পদার্থ) ব্যবহার করতেন।

প্রথম ইয়োরোপীয় মহাসমর শেষ হবার পরেই পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র বেতার মারফত গান, বাজনা, অভিনয়, সংবাদ সরবরাহ ইত্যাদি চালু হবার ফলে চলচ্চিত্রের চরিত্রগুলির মুখে কথা শোনবার জন্যে সকলে লালায়িত হয়ে উঠল—নির্বাক চিত্র বাঙ্ময় হয়ে উঠতে চাইল।

মানুষের মুখের ভাষাকে যন্ত্রের সাহায্যে ধ'রে রাখবার চেষ্টা বৈজ্ঞানিকেরা অনেক দিন থেকেই করে আসছিলেন। ১৮৫৭ সালে ফরাসী বৈজ্ঞানিক লিয়োঁ স্কট তাঁর ফনটোগ্রাফ যন্ত্রের সাহায্যে স্বরতরঙ্গকে ধ'রে রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন বটে, কিন্তু কোনো মতেই তাকে পুনর্ধ্বনিত করতে পারেননি। এ-বিষয়ে প্রথম সাফল্য লাভ করেন টমাস আল্ভা এডিশন। তিনি ১৮৭৭ সালে তাঁর উদ্ভাবিত ফোনোগ্রাফ যন্ত্রের সাহায্যে স্বরতরঙ্গকে ধ'রে রাখতে এবং তাকে পুনর্ধ্বনিত করতে সক্ষম হন। এরই ফলে গ্রামোফোনের জন্ম হয়। এরপরে তাঁর চেষ্টা হয়েছিল মানুষের কণ্ঠস্বরকে পুনর্ধ্বনিত করার সঙ্গে সঙ্গে তার চেহারাকেও সজীব ভাবে দেখবার জন্য। দশ বছর ধরে অক্লান্ত চেষ্টার ফলে তিনি 'কাইনেটোস্কোপ' নাম দিয়ে যে যন্ত্র উদ্ভাবন করেছিলেন, তাতে একজন দর্শক একটি ফোকরে বা গর্তে চোখ রেখে মাত্র পঞ্চাশ ফুট দীর্ঘ চলন্ত ফিল্মের মারফত মানুষ বা জীবজন্তুর নড়াচড়া দেখতে পেত। এই 'কাইনটোস্কোপ'-এর সঙ্গে ফোনোগ্রাফকে জুড়ে এসিডন তৈরী করেছিলেন 'কাইনেটোফোন', যাতে চলন্ত জীবন্ত মানুষকে কথা কইতে বা দু'এক কলি গান গাইতে শোনা যেত। কিন্তু বহু চেষ্ট করেও তিনি মানুষের ঠোঁট নাড়ার সঙ্গে স্বরক্ষেপকে অর্থাৎ ধ্বনিকে ঠিক ভাবে মেলাতে পারেননি। চলচ্চিত্রের প্রোজেক্টার ও গ্রামোফোনকে একই শক্তি দ্বারা চালিত ক'রে সবাকচিত্র দেখাবার প্রচেষ্টা ফ্রান্সের চার্লস প্যাথে, জার্মানীর মেস্টার, ইংলণ্ডের ওরারউইক কোম্পানী প্রভৃতি বহু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের দ্বারাই হয়েছিল; কিন্তু শব্দকে বর্ধিত করবার ও ঠোঁট নাড়ার সঙ্গে স্বরক্ষেপকে সুসমন্বিত করবার অভাবে কোনো চেষ্টাই ফলবতী হয়নি।

এরই মধ্যে উদ্ভাবিত হ'ল ফোটো-ইলেকট্রিক সেল, যা শব্দবিম্বকে বিপুল ভাবে প্রসারিত করতে পারে এবং তাকে পুনর্ব্যক্ত করার কাজেও সাহায্য করে। এই সেলে উদ্ভূত তড়িৎশক্তিকে কার্যকরী ভাবে বর্ধিত করবার জন্যে জন অ্যামব্রোজ ফ্লেমিং উদ্ভাবন করেন 'টু এলিমেণ্ট ভ্যাকুয়াম টিউব' এবং ডক্টর লী, ডি, ফরেস্ট উদ্ভাবন করেন 'অডিওন'। এই ত্রয়ী উদ্ভাবনের ফলে জন্ম নিল অ্যাম্প্লিফায়ার বা শব্দবিবর্ধনী যন্ত্র। এই অ্যাম্প্লিফায়ারের আবিষ্কার মানুষের স্বরকে বহুগুণে বর্ধিত ক'রে বহুজনের শ্রুতিগ্রাহ্য হওয়ার কাজে সহায়তা করেছিল। অপর দিকে অনেক দিন গবেষণা চালাবার পরে ইউজিন লষ্ট নামে জনৈক ইংরাজ শব্দতরঙ্গকে (আসলে শব্দতরঙ্গের পরিবর্তিত রূপ আলোক-তরঙ্গকে) ফিল্মের ওপর রেকর্ড করবার একটি বিশেষ পদ্ধতির পেটেণ্ট নিয়েছিলেন ১৯০৬সালে। ছবি ও শব্দ দুইই ফিল্মে ধৃত হবার ফলে ঠোঁট নাড়ার সঙ্গে শব্দপ্রক্ষেপকে নির্ভুতভাবে মেলাবার (Synchronize করবার) একটি সুনিশ্চিত উপায় পাওয়া গিয়েছিল। একদিকে

শব্দতরঙ্গকে ফিল্মের ওপর ধরবে পারা এবং অন্যদিকে অ্যাম্‌প্লিফায়ার যন্ত্রের সাহায্যে যে-কোনোও শব্দকে বহুজনের শ্রুতিগ্রাহ্য করতে পারা—এই উভয়বিধ প্রক্রিয়া ত্রুটি-বর্জিত হয়ে উঠেছিল ১৯২৫-২৬ সাল নাগাদ। এবং প্রায় তখনই নির্বাক চলচ্চিত্রের প্রযোজনা ত্যাগ ক'রে সবাক চলচ্চিত্রের প্রতি প্রযোজকরা ঝুঁকে পড়েন।

সবাক চলচ্চিত্র শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রদ্ধতি অধিকতর যন্ত্রনির্ভর হয়ে পড়ল। প্রথমেই চলচ্চিত্রের ক্যামেরাকে করতে হ'ল শব্দহীন; কারণ, সামনে ঝোলানো শব্দধর যন্ত্রটি (মাইক্রোফোন) ক্যামেরা চলবার শব্দকেও কুক্ষিগত করলে অভিনেতা অভিনেত্রীর কণ্ঠস্বর পরিষ্কার শুনতে পাওয়ায় বিঘ্ন হবে। প্রয়োজন হয়ে পড়ল ফিল্ম স্টুডিও নির্মাণের। নির্বাক ছবি তোলা হ'ত প্রধানতঃ সূর্য্যালোকে এবং কোনও খোলা জায়গায় কৃত্রিম ঘর ইত্যাদি (Set) তৈরী ক'রে। চতুর্দিকের অবাঞ্ছিত শব্দের হাত থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্যে চতুর্দিক বন্ধ ফ্লোরের প্রয়োজন দেখা দিল এবং সেই ফ্লোরে বাইরে থেকে কোনো শব্দ যাতে ঢুকতে না পায়, সেই রকম সাবধান অবলম্বন করতে হ'ল তার নির্মাণের সময়। তেমনই ফ্লোরের মধ্যে যাতে কোনো প্রতিধ্বনি না ওঠে কিংবা স্বর বিকৃত না হয়, সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হল। বদ্ধ কক্ষে শ্যুটিংয়ের জন্যে কৃত্রিম ইলেকট্রিক আলোর ব্যবহার চালু হল।

পরিস্ফুটনের কাজেও যন্ত্রের ব্যবহার বৃদ্ধি পেল। 'র্যাক্ অ্যাণ্ড ট্যাঙ্ক' প্রথাকে বিদায় দিয়ে তার স্থলে স্থাপন করা হ'ল স্বয়ংক্রিয় ডেভেলপার যন্ত্র। এক হাজার ফুট লম্বা চিত্রধর ফিল্মের সঙ্গে সমান লম্বা শব্দধর ফিল্ম আসায় পরিস্ফুটনের কাজ গেল বেড়ে এবং এ ব্যাপারে সকল কাজকে নিখুঁত ভাবে সম্পন্ন করবার প্রয়োজনও দেখা দিল। ফেড্-ইনা, ফেড্-আউট, মিক্সিং প্রভৃতি কাজ আর ক্যামেরা মারফত না হয়ে রসায়নাগার বা ল্যাবরেটরীতে হতে লাগল। এ ছাড়া কাহিনী চিত্র বা তথ্য চিত্রের প্রয়োজনে নানাবিধ প্রয়োগচাতুর্য সৃষ্টির কাজেও রসায়নাগারের সাহায্য প্রয়োজন হয়ে পড়ল। ছবির সঙ্গে সমবেগে একসঙ্গে চলতে পারে, তার জন্যেও সৃষ্টি হ'ল মুভীওলা যন্ত্র, যার সাহায্যে একসঙ্গে চিত্রধরও শব্দধর ফিল্ম দু'টি সমান গতিতে চালানো যায়। শব্দধর যন্ত্র (sound recording machine) ও চিত্রধরযন্ত্র (camera)কে একগতিতে চালাবার জন্যে যে থ্রিফেজ মোটারের ব্যবহার শ্যুটিংয়ের সময়ে করা হয়, সেই Synchronized motar moviola তেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সম্পাদনার টেবিলে সমগতিসম্পন্ন দাঁতওয়ালা তিন বা চার চাকার যন্ত্র (Synchronized wheels) বসানো হ'ল, যাতে একই সঙ্গে ছবি ও শব্দের নেগেটিভ এবং পজিটিভ চালানো যায়।

ছবিতে গানের ব্যবহার লেগেই আছে। অথচ ছবি তোলার সঙ্গে যেমন পাত্র পাত্রীদের সংলাপ রেকর্ড করা হয়, সেই ভাবে গান রেকর্ড করবার অসুবিধা অনেক। প্রথম, যে-শিল্পীর মুখে গান দেওয়া হবে, তিনি হয় ত গান গাইতেই জানেন না। দ্বিতীয়, জানলেও গানের সব কটি চরণ একই জায়গায় একই শটে গাওয়ালে চলচ্চিত্রের গতি ব্যাহত হয়। কাজেই আবিস্কৃত হ'ল 'প্লে-ব্যাক' যন্ত্র। এই যন্ত্রের সাহায্যে আগে গৃহীত গানকে ক্যামেরা চলার সঙ্গে বাজিয়ে শিল্পীকে ঐ গানের লাইন সঙ্গে সঙ্গে গাওয়ার ভঙ্গী (আসলে ঠোঁট নাড়া) ক'রতে হয়। ফলে গৃহীত গানের সঙ্গে গাওয়া ভঙ্গীওলা ছবি মুদ্রিত করলে শিল্পী নিজেই গাইছেন ব'লে বোধ হয়। 'ব্যাক্ প্রোজেকসান' পদ্ধতির সাহায্যে চলন্ত গাড়ী, ট্রেণ, জাহাজ বা এরোপ্লেনে পাত্র-পাত্রীদের কথা কওয়া তোলার সমস্যার সমাধান হয়। —এই পদ্ধতিতে প্রথমে ক্যামেরার সাহায্যে চলন্ত যান থেকে বাইরের পটভূমি (back-ground) তুলে নেওয়া হয়। পরে স্টুডিওর মধ্যে একটি বড়ো ঘসা কাঁচের মতো উজ্জ্বল অথচ অস্বচ্ছ পর্দার (আকারে ১০/১২ ফুট উচ্চ ও ৮/১০ ফুট প্রস্থ) সামনে নকল গাড়ী, ট্রেন, জাহাজ বা উড়োজাহাজের বসবার আসনে শিল্পীদের রেখে প্রয়োজনমতো সেই আসন কাঁপানো হয় এবং পর্দার পিছনে বা ক্যামেরার পাশে রাখা একটি শব্দহীন প্রোজেক্টারের সাহায্যে পূর্বে গৃহীত পটভূমির পজিটিভ চিত্র প্রতিফলিত করা হয়। উপযোগী শব্দ যোগে ঐ শটকে

থেকে কাছে বা কাছ থেকে দূরে দেখাবার জন্যে আজকাল প্রায়ই 'জুম' (zoom) লেন্সের ব্যবহার করা হয়। ক্যামেরাকে চলন্ত করবার জন্যে আগে মাত্র ট্রাক বা ট্রলি শট ব্যবহৃত হ'ত। আজকাল ক্রেন, ভেলসিলেটার প্রভৃতি ব্যবহার ক'রে ক্যামেরার গতিকে আরও স্বচ্ছন্দ করা হয়েছে। কলা-কৌশলের নানা রকম তাগিদে আজকাল অপ্‌টিক্যাল প্রিণ্টার নামে একটি অঘটন-ঘটন-পটীয়সী যন্ত্র ব্যবহৃত হচ্ছে, যা আসলে ক্যামেরা ও প্রোজেক্টারের সম্মিলিত রূপ। যত রকম দৃষ্টি-বিভ্রমকারী দৃশ্য বা শট্‌ ছবিতে দেখা যায়, তার বেশীর ভাগইএই অপটিক্যাল প্রিণ্টার-এর কেরামতীর ফল।

বর্তমানে ছবিকে রঙীন করা হচ্ছে এবং শব্দকে ঢের বেশী বাস্তব রূপ দেবার জন্যে ষ্টিরিওফোনিক সাউণ্ড সিষ্টেম প্রবর্তন করা হয়েছে। ৩৫ মিঃ মিঃ ত্যাগ ক'রে ৭০ মিঃ মিঃ চওড়া ফিল্মের ব্যবহার ক'রে ছবিকেও দর্শকদের কাছে আরও ঘনিষ্ঠ (intimate) ক'রে তোলা হচ্ছে। সিনেমাস্কোপ, প্যানাভিশন, ভিষ্টাভিশন প্রভৃতিও ঐ ঘনিষ্ঠ করবারই প্রয়াস।

চলচ্চিত্র যখন নির্বাক যুগ পার হয়ে সবাক যুগে পদার্পন করে, তখন বহু পরীক্ষানিরীক্ষার পরে স্থির হয় যে, সেকেণ্ডে ১৬ ফ্রেম বা ১ফুট ফিল্ম চালু করবার পরিবর্তে ফিল্মের গতিকে দেড় গুণ ক'রে দেওয়া প্রয়োজন ঠিক মত শব্দ ধারণ ও প্রক্ষেপনের জন্যে অর্থাৎ সবাক চিত্র তোলবার সময়ে প্রতি সেকেণ্ডে ১½ ফুট বা ২৪ ফ্রেম ফিল্ম লেন্সের পিছন দিয়ে যায়। এতে প্রতিটি ফ্রেম লেন্সের পিছনে ১/৩০ সেকেণ্ড স্থিরভাবে থাকে এবং এক ফ্রেম থেকে পরবর্তী ফ্রেম আসতে ১/১২০ সেকেণ্ড সময় লাগে অর্থাৎ টকী ক্যামেরার মাল্টিন্ ক্রশ'টি' ১/৩০ সেকেণ্ড স্থির থাকে এবং পরবর্তী ১/১২০ সেকেণ্ডকাল চালু থেকে আগের ফ্রেমকে সরিয়ে পরের ফ্রেমটিকে জায়গায় উপস্থাপিত করে।

এই হল আধুনিক চলচ্চিত্রের যন্ত্রনির্ভরতা সম্পর্কে মোটামুটি বিবরণ।

অনিবার্য্য কারণে "পট ও পীঠ" বিভাগের "সাগরপারের ধ্রুপদী চলচিত্র" ও "প্রশ্নের উত্তর" প্রভৃতি লেখা এ সংখ্যায় প্রকাশ করা গেল না। আগামী "কার্ত্তিক" সংখ্যা থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হবে।

—পঃ পীঃ সম্পাদক

সম্পাদক—শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩।১।১, বিধান সরণী, (পূর্বতন কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্
কলিকাতা ৬, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কার্তিক
১৩৭৬

একটি নির্ভরযোগ্য কেশ তৈল
বেঙ্গল কেমিক্যালের
ক্যান্থারাইডিন হেয়ার অয়েল
ভেষজগুণ সম্পন্ন ক্যান্থারাইডিন হেয়ার অয়েল ব্যবহারে আপনার রেশম-কোমল ঘন কাল চুলের কোমলতা ও মসৃণতা অক্ষুণ্ণ রাখবে ও চুল পড়া বন্ধ করতে সাহায্য করবে।
বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর • দিল্লী

ভারতবর্ষের সূচী

সপ্তপঞ্চাশত্তম বর্ষ—প্রথম খণ্ড—পঞ্চম সংখ্যা

কার্তিক—১৩৭৬

লেখ-সূচী

লেখ-সূচী

লেখ-সূচী

লেখ-সূচী

প্রথম খণ্ড

পঞ্চম সংখ্যা,

সপ্তপঞ্চাশত্তম বর্ষ

হিন্দু ধর্ম ঃ একটি ব্যাখ্যা

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

আষাঢ় ১৩৭৬ এর ভারতবর্ষে শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন যে আদি হিন্দু ধর্মের উৎপত্তি উত্তর বা মধ্য এশিয়াতে পরে উহা উত্তর পশ্চিম ভারতে আগমন করে এবং বর্ত্তমান হিন্দুধর্মের রূপ ধারণ করে। আর্য্যগণ বাহির হইতে ভারতে আগমন করেন এই পাশ্চাত্ত্য মত শৈলেন বাবু গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু আর্যগণ যে বাহির হইতে আসিয়াছেন ইহারকোনও প্রমাণ নাই। সেই জন্য কেহ বলেন মধ্য এশিয়া হইতে, কেহ বলেন মধ্য য়ুরোপ হইতে, কেহ বলেন স্কাণ্ডিনেভিয়া হইতে, কেহ বলেন রাশিয়া হইতে. আর্যজাতি যে ভারতেই উৎপন্ন হইয়াছিল তাহার প্রমাণ মহাভারত মনুসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া যায়। মহাভারত বনপর্ব ৮২ ১০২ শ্লোকে আছে

> "অথো গচ্ছেত রাজেন্দ্র দেবিকাং লোকবিশ্রুতাং
> প্রসূতির্যত্র বিপ্রস্য শ্রূয়তে ভরতর্ষভ ॥

নারদ যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন, "অতঃপর বিখ্যাত দেবিকা-তীর্থে যাইবেন যেখানে প্রথম ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হইয়া-

ছিল।" বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ১।৪।১১।১২,১৩, বাক্যে আছে যে প্রথমে ব্রাহ্মণ, তাহার পর ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতি সৃষ্টি হইয়াছিল। এজন্য বুঝিতে পারা যায় যেখানে প্রথম ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হয় সেইখানে আর্য্যজাতির প্রথম উৎপত্তি হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে নারদ বলিয়াছিলেন যে দেবিকা হইতে, দীর্ঘসত্র, সেখান হইতে বিনশন যাইবেন যেখানে সরস্বতী অন্তর্হিত হইয়াছেন। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যে দেবিকা কুরুক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী কোনও তীর্থ। মনু ২।২০ শ্লোকে বলিয়াছেন যে কুরুক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী ব্রহ্মর্ষি দেশেই ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হইয়াছিল, এবং তাহাদের নিকট হইতে পৃথিবীর সকল লোক নিজ চরিত্র শিক্ষা করিবে,—

এতদ্দেশ প্রসূতস্য সকাশাদ্ অগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্বমানবাঃ॥

শৈলেন বাবু যথার্থই বলিয়াছেন যে আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত সত্য প্রেম পবিত্রতা কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে যে কিভাবে জীবনে সত্য প্রেম পবিত্রতা আসে। তিনি যে মনে করিয়াছেন যে হিন্দুরা ব্রত, উপবাস, পূজা, দান, করে এই ভাবিয়া যে ইহার দ্বারা ঈশ্বরকে ভুলাইয়া তাঁহাকে লাভ করিতে পারিবে, ইহা তাঁহার বুঝিবার ভুল। হিন্দুরা ব্রত, উপবাস, পূজা দান প্রভৃতি করে এই উদ্দেশ্যে যাহাতে জীবনে সত্য-প্রেম-পবিত্রতা প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং তাহাতে ঈশ্বরকে লাভ করা সম্ভব হইবে। আমরা যে কর্ম করি তাহার উপর আমাদের চরিত্রের গঠন হয়। শাস্ত্রে যে কর্ম্ম করিতে বলা হইয়াছে, তাহার দ্বারা চরিত্রের উন্নতি হয়। এজন্য ভগবান গীতা ১৬ ২৪ শ্লোকে বলিয়াছেন যে কোন্ কর্ম কর্ত্তব্য কোন কর্ম্ম কর্ত্তব্য নহে এ বিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ "তস্মাৎ শাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থিতৌ"। আমাদের বুদ্ধি এ বিষয়ে প্রমাণ নহে কারণ আমাদের বুদ্ধির ভুল হইতে পারে। ভাগবান গীতা ১৮।৩০, ৩১, ৩২ শ্লোকে বলিয়াছেন যে যাহাদের সাত্ত্বিক বুদ্ধি তাহারা ঠিক মত বুঝিতে পারে কোন্ কার্য্য করা উচিত, কোন্ কার্য্য করা উচিত নহে, যাহাদের রজোগুণ বেশী তাহারা ঠিক মত তাহা বুঝিতে পারে না, যাহাদের তমোগুণ বেশী তাহারা বিপরীত বুঝে, অধর্ম্মকে ধর্ম বলিয়া মনে করে। আমাদের সকলের অল্প বেশী রজো গুণ এবং তমোগুণ আছে এ জন্য আমাদের ভুল হইবার সম্ভবনা আছে। কিন্তু শাস্ত্র বাক্যে ভুল হইতে পারে না। গীতায় শাস্ত্র শব্দ ব্যবহার হইয়াছে আচার্যরা তাহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে শাস্ত্র দ্বিবিধ শ্রুতি ও স্মৃতি। শ্রুতি অর্থাৎ বেদ। স্মৃতি অর্থাৎ বেদমূলক ঋষি প্রণীত গ্রন্থ। বেদ মনুষ্য রচিত নহে। মনুষ্য রচিত হইল ভ্রম প্রমাদের সম্ভাবনা থাকিত। বেদ যে ঈশ্বর প্রণীত তাহার প্রমাণ স্বরূপ আচার্য শঙ্কর ব্রহ্মসূত্র ১।১।৩ এর ভাষ্যে বৃহদারণ্যক উপনিষদ ২।৪।১০ এর বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন "অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতম্ এতদ্ যদ্ ঋগ্ বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্বাঙ্গিরসঃ" অর্থাৎ সেই মহা পুরুষের (ঈশ্বরের) নিঃশ্বাসের ন্যায় ঋগ্বেদ প্রভৃতি চারিবেদ আবির্ভূত হইয়াছে পুনরায় ব্রহ্মসূত্র ৩।১।২৫ এর ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, "ন শাস্ত্রাৎ ঋতে ধর্ম্মাধর্ম বিষয়ং বিজ্ঞানং কস্যচিৎ অস্তি" অর্থাৎ শাস্ত্র ব্যতীত কাহারও ধর্ম্মাধর্ম বিষয়ে জ্ঞান হইতে পারে না। শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন,

"প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি প্রমাণ প্রধান।
শ্রুতি যেই অর্থ কহে সেই সে প্রমাণ॥
জীবের অস্থি আর বিষ্ঠা যে হয় শঙ্খ গোময়।,
শ্রুতি বাক্যে সেই দুই মহাপবিত্র হয়॥

শ্রীচৈতন্যচারিতামৃত ২।৬

(প্রমাণ জ্ঞান লাভের উপায়। শ্রুতি বেদ।) স্মৃতির মধ্যে মনুসংহিতা একটি প্রধান স্মৃতি। বেদ বলিয়াছেন "মনু যাহা কিছু বলিয়াছেন তাহা ঔষধের ন্যায় (হিতকারী) (যদ্ বৈ কিঞ্চ মনুরবদৎ তৎ ভেষজম্—তৈত্তিরীয় সংহিতা (২।২।১০।২)। শ্রীমদ্ভাগবত ১।৪।২০ শ্লোকে বলা হইয়াছে, "ইতিহাস পুরাণং চ পঞ্চমো বেদউচ্যতে" ইতিহাস (অর্থাৎ রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণকে) পঞ্চম বেদ বলা হয়। ইহারা বেদের ন্যায় প্রামাণিক।

কেহ হয়ত বলিতে পারেন, যেখানে শাস্ত্রের সহিত বিবেকের বিরোধ হয় সেখানে বিবেক মানা উচিত, কারণ বিবেক ঈশ্বরের বাণী। কিন্তু বিবেক ঈশ্বরের বাণী হইলে সকলের বিবেক একরূপ নির্দেশ দিত। কিন্তু তাহা হয় না। হিন্দুর বিবেক বলে ঈশ্বরের মূর্ত্তি করিয়া পূজা করিলে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন, খৃষ্টান ও মুসলমানের

বিবেক বলে, এইভাবে পূজা করিলে তিনি সন্তুষ্ট হন না তিনি ক্রুদ্ধ হন। ইহা সত্য যে হিন্দুর শাস্ত্র এবং খৃষ্টান বা মুসলমানের শাস্ত্রে বিরোধ দেখা যায়। ইহার সহজ মীমাংসা এই যে হিন্দু হিন্দুর শাস্ত্র অনুসরণ করিবে, খৃষ্টান খৃষ্টান শাস্ত্র, মুসলমান মুসলমান শাস্ত্র। ইহা সুবিদিত যে আরঙ্গজেব অনেক হিন্দু মন্দির ভাঙ্গিয়া ছিল, কিন্তু শিবাজি কোনও মসজিদ ভাঙ্গে নাই।

হিন্দুধর্মের নিয়মগুলি সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক। কিন্তু বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ সত্য এখনও আমাদের নিকট প্রকাশিত হয় নাই। হিন্দুধর্ম অনুসারে তাম্র পাত্রে জল রাখিতে হয়। প্রথমে ডাক্তার মনে করিতেন ইহাতে জল বিষাক্ত হইবে (copper poisoning) এখন ডাক্তারেরা জানেন তাম্র পাত্রে জল রাখিলে জলের অনিষ্টকর জীবাণু মরিয়া যাইবে, এ জন্য তাম্র নির্মিত নলে জল রাখিয়া sterilize করা হয়। হিন্দুধর্মের কোনও নিয়মের সহিত বিজ্ঞানের মিল না হইলে বুঝিতে হইবে যে বিজ্ঞান এখনও পূর্ণ সত্য লাভ করে নাই।

শৈলেনবাবু বলিয়াছেন কঠোপনিষদের উপাখ্যান বাদ দিতে হইবে। কিন্তু ঐ উপাখ্যানের মধ্যে অনেক ধর্ম তত্ত্ব নিহিত আছে। নাচকেতা প্রথম বর চাহিলেন পিতার প্রসন্নতা, দ্বিতীয় বর চাহিলেন যজ্ঞ করিবার প্রণালী সম্বন্ধে, তৃতীয় বর চাহিলেন আত্মতত্ত্ব বিষয়ে। ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য পিতার প্রসন্নতা সর্বপ্রথম প্রয়োজন, তাহারপর দেবতাদের আরাধনা করা প্রয়োজন, তাহার পর আত্মজ্ঞান লাভ করা সম্ভব।

ধর্মের সার তত্ত্বের মধ্যে শৈলেনবাবু শঙ্করাচার্যের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন,—ব্রহ্মসত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। ইহা অদ্বৈত মত। অন্য মতের আচার্য্য ও সাধুগণ ইহা স্বীকার করেন না। যথা রামানুজ, শ্রীচৈতন্য ও মধ্বাচার্য্য ইহা স্বীকার করেন নাই।

শৈলেনবাবু পূজা, ব্রত, উপবাস, দানের উপর কটাক্ষপাত করিয়াছেন। কিন্তু গীতায় ভগবান বলিয়াছেন (৯.৩৪ শ্লোক)—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥

এখানে ভগবানকে পূজা ও নমস্কার করিতে বলা হইয়াছে। পুনঃ ভগবান বলিয়াছেন, (৯.৩৩) অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্ অর্থাৎ জগৎ অনিত্য ও দুঃখময়, এখানে যখন জন্ম গ্রহণ করিয়াছ তখন আমাকে পূজা কর।

যজ্ঞদানতপঃ কর্ম ন ত্যাজ্যং কার্যমেবতৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিনাম্॥

(গীতা ১৮.৫)

যজ্ঞ, দান ও তপস্যা কখনও ত্যাগ করা উচিত নহে। ইহারা মনীষীদের চিত্ত শুদ্ধ করে।

পতিতা ও পতিতপাবন

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

ষোলো

"বদরীনারায়ণ রওনা হওয়ার আগেই শুধু মা-র মুখেই নয় আরো অনেক যাত্রীর মুখে শুনেছিলাম এই ছেলেটির অপরূপ ভজনের কথা। অনেকেই তাকে উপাধি দিয়েছিলেন 'প্রডিজি'।"

"তবু আমি কেন তার গান শুনতে যাই নি—পরে বলছি। আগে বলি ওর মা কুন্তীর কথা।

শান্তনুর গান শুনে মা শুধু যে মন্দিরে কেঁদে ভাসিয়ে দিতেন তাই নয়, আশ্রমে ফিরেও বলতেন তার আনিন্দ্যকান্তি মধুর কণ্ঠ ও অপরূপ ভাবরসে কথা। ওর টানেই তিনি যেচে গিয়ে কুন্তীর সঙ্গে আলাপ করেন, কারণ কুন্তী মন্দিরে আসত না। কেন—ক্রমশঃ প্রকাশ্য। মা-কে দরদী পেয়ে কুন্তী তার দুর্ভাগ্যের সব কথাই খুলে বলেছিল। সব কথা বলবার সময় হবে না, তবে তার সারমর্ম এই:

কুন্তী ছোট-ঘরের মেয়ে হলেও ছেলেবেলা থেকেই ছিল তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও উচ্চশিল্পী। ওর বাপ কলকাতায় জুতোর ব্যবসায় যথেষ্ট উপায় করত। মা-রও ছিল মেয়ে অন্ত প্রাণ। ফলে কুন্তীর মাথা বেশ একটু গরম হয়ে ওঠে—আরো এই জন্যে যে, ম্যাট্রিকে কুড়ি টাকার বৃত্তি পেয়ে আই-এ তেও পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়।

"ও গান গাইতে পারত চমৎকার। প্রতিভা বলতে যা বোঝায় তা নয়, তবে ওর সুরেলা মধুর ও দরদী কণ্ঠ শুনে সকলেরই মন আর্দ্র হয়ে উঠত। স্বভাবে ছিল ও বিষম উচ্চাশিল্পী ভাবত ও প্লে-ব্যাক গায়িকা হ'য়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেবে। 'ছোট ঘরের মেয়ে! ফুঃ! মানুষ বড় হয় বুদ্ধিতে ও কৃতিত্বে ধনে মানে কি বংশে নয়'...এই ধরণের কথা কলেজে ওর সহপাঠিনীদের মুখেও শুনতে শুনতে ওর স্বাভাবিক অহঙ্কার পুষ্ট হয়ে ওঠে। ও পণ নেয় এক, বিবাহ করবে না; দুই নিজের পায়ে দাঁড়াবে; তিন গান গেয়ে নাম করবে।"

অসিত টোকে। "ওর গুণের কথা বললে তো ভাই, ফলিয়েই, কিন্তু রূপের কথা চেপে গেলে কি ইচ্ছে করেই?"

ভীম হাসে। "না রে ভাই, কারণ আগুন যে ছাই চাপা থাকে না এটি হ'ল একটি আপ্তবাক্যেরই সামিল। বলতে কি, ওর রূপই হয়েছিল ওর কাল। ঠিক সুন্দরী বলতে যা বোঝায় তা নয়, কিন্তু ওর ছিল সেই অনির্দেশ্য সম্পদ, 'চার্ম'—যার সংজ্ঞা দিয়েছেন খ্যাতনামা নাট্যকার ব্যারি—তাঁর 'what Every woman knows' নাটকে। বলেছেন: 'If you have it, you don't need to have anything else; and if you don't have it, it doesn't much matter what else you have.*

অসিত হাসে: "জানি। এ-নাটকটি আমি বিলেতে মঞ্চে দেখছিলাম। তবে এর বাংলা নামটাও সার্থক—চটক। আমি একদা কেম্ব্রিজে এক সভায় এ-নাটকটির এমেচার স্টেজে অনুবাদ করেছিলাম!

চটক তোমার যদি থাকে, তবে না থাকলে
কোন কিছুই আর—
থাকবে না কোনো পরোয়া—
অপিচ চটক যদি না থাকে তোমার,
আর সব কিছু থাকলেও এ-ধরায়
আসবে না কোনো কাজেই লো বালা, হায়!"

ভীম হো হো করে হাসে। "এমন না হ'লে দরদী! তাই তো থেকে থেকে তোর সঙ্গ চাই রে দাদা! হ্যাঁ, ওর ছিল এই চটক, বিশেষ ক'রে গড়ন আর কালো চোখের দৌলতে। কিন্তু না, প্রগলভতারও বাড়াবাড়ি ভালো নয়। তাই শোন।

"যৌবনশ্রী, গুণ, বুদ্ধি, চটক এই সম্পদ চতুষ্টয় আছে যে-বালার তার মাথা তো একটু গরম হবেই ভাই। ফলে হ'ল ওর বিপর্যয় অহঙ্কার। আর তাতেই ডুবল। হ'ল কি, উনিশ বছর বয়সে যখন ও বি-এ পড়ছে তখন ওদের ঘরে অতিথি হ'য়ে আসে এক সুদর্শন সাধু। শুধু সুদর্শন নয়,তার ওপর চমৎকার গাইয়ে তথা কথক, যাকে বলে gift of the gab—বিশেষ ক'রে হিমালয়ের নানা গল্প বলার আর্ট। কুন্তী ছেলেবেলা থেকেই ছিল 'রোমান্টিকা' বিশেষ করে ভ্রমণের রোমান্স ওর মন টানত দারুণ।' হিমালয়ের সম্বন্ধে কত বইই যে পড়েছিল ইংরেজি ও বাংলায়। মনে মনে ঠিক করেছিল বি এ পাশ করার পরেই কোনো বন্ধু বা বান্ধবী পর্যটকের সঙ্গে যাবে কেদারবদরী অমরনাথ এমন কি তিব্বতের কথা ভাবতেও ও ভয় পেতনা। এহেন মেয়ের কাছে এল এক সুপুরুষ 'চার্মিং' সাধু হিমালয় যার নখদর্পণে তার উপর সে ভজন গাইতও চমৎকার। বলতে কি, কুন্তী ওর কাছে ভজন শিখতে শিখতেই ওর প্রেমে পড়ে যায়। একেবারে over head and ears যাকে বলে।

"সাধুটি ছিল ডাকসাহিটে লম্পট তথা দুর্বৃত্ত। ওকে ভুলিয়ে ওর গহনার বাক্স হাতিয়ে ওকে নিয়ে গেল হরিদ্বারে সেখানে ওকে বিবাহ করে হিমালয়ের নানা তীর্থে নিয়ে যাবে কথা দিয়ে। তারপরে সে অনেক কাণ্ড সব না-ই বললাম। শুধু ট্রাজিডির শেষ অঙ্কটির কথা বললেই চলবে। সে ওর গহনার বাক্স নিয়ে আর একটি মেয়েকে ভুলিয়ে ওকে পথে বসিয়ে দিল চম্পট মাসখানেকের মধ্যেই।

"কুন্তী চোখে অন্ধকার দেখল। ভাগ্যক্রমে এক বৃদ্ধ সাধু যিনি ওর গান শুনে ওকে ভালোবেসেছিলেন তিনি ওকে আশ্রয় দিলেন তাঁর কুঠিয়ার পাশে একটি খালি কুঠিয়ায়।

কুন্তী তখনকার মতন মাথা গুঁজবার একটা জায়গা পেয়ে বেঁচে গেল বটে, কিন্তু সাধুর ভিক্ষান্নে ভাগ বসাবে কেমন করে? ভিক্ষার 'পরে ওর বিপর্যয় ঘৃণা। সাধু ভেবেচিন্তে ওকে কয়েকটি মন্দিরে গানের ব্যবস্থা করে দিলেন। কিন্তু গান করে সে যা প্যালা পেত তাতে অর্ধাশনে থাকতে হত। ও সেলাইয়ের কাজ জানত। নানা পরিবারের মেয়েদের জন্যে জামা সেলাই করে কিছু উপায় করা সুরু করল। কোনোমতে কায়ক্লেশে দিন গুজরান হত। কিন্তু হায়রে, মাস তিনেক পরে ও আবিষ্কার করল ও গর্ভবতী। সঙ্গে সঙ্গে, রটে গেল সর্বত্র মেয়েদের কলঙ্কের খবর বাতাসেরো আগে ছোটে, সব দেশেই। ফল হল যা হবার—মন্দিরে গান করা ওর বন্ধ হ'ল, মেয়েরাও ওকে আর কোন কাজ দিত না। অভিমানিনী মেয়ের দর্প চূর্ণ হ"ল বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে সব আশার আলোই নিভে গেল।

"একমাত্র পথ ছিল—কলকাতায় ফিরে যাওয়া। কিন্তু বলেছি ও ছিল প্রকৃতিতে স্বাবলম্বিনী, চাইত, নিজের পায়ে দাঁড়াতে। তাই ও ঠিক করল—আত্মহত্যা করবেই করবে। কারণ এভাবে সকলের চোখে ঘৃণ্যা অস্পৃশ্যা হয়ে বাঁচবার কথা ও ভাবতেই পারত না। বৃদ্ধ সাধুটি ওকে বোঝাতেন—আত্মহত্যা মহাপাপ, কিন্তু কোনো ব্যবস্থা করা তাঁর সাধ্যের বাইরে ছিল। শেষে একদিন সকালে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান ক'রে ফিরে মহানন্দে বললেন 'মা বিখ্যাত দয়াল মহারাজ দেবপ্রয়াগ থেকে কাল নেমেছেন, আছেন তাঁর এক শিষ্যের কাছে। চলো, আমি তোমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাচ্ছ।' কুন্তী বেঁকে বসল: 'না, কোনো মহারাজের কাছেই আমি ভিক্ষা করব না।' সাধুটি বললেন মিনতি ক'রে 'কিন্তু তাঁকে গান শোনাতে বাধা কী? ওঁর কৃপায় অনেক নিরন্নেরই অন্নসংস্থান হয়েছে ভিক্ষে না ক'রেও, তোমারও হ'য়ে যেতে পারে তো।"

"কুন্তী একটু ভেবে বলল: আচ্ছা।

"গুরুদেব সেদিন সকালে ভাগবতের পাঠ দিচ্ছিলেন। মাত্র তিন চারজন ধর্মার্থী শুনছিল চাতালে ব'সে। সাধুজির সঙ্গে কুন্তী উপস্থিত হ'তেই গুরুদেব উঠে তাঁকে প্রণাম ক'রে পাশে বসালেন। তারপর কুন্তী তাঁকে প্রণাম ক'রতে কোমল কণ্ঠে বললেন: 'একটি গান গাও তো মা!'

"কুন্তী আশ্চর্য হ'য়ে তাঁর চোখের দিকে তাকাতেই তিনি বললেন: 'ভয় নেই মা। আমি ভিক্ষে দেব না। তুমি গাও।" কুন্তী আরো আশ্চর্য হ'য়ে একটি তুলসীদাসী ভজন সুরু করল। গাইতে গাইতে মূর্ছা।

"জ্ঞান ফিরে এলে দেখে—সে একটি খাটে শুয়ে। শিয়রে গুরুদেব। তিনি ওকে আশীর্বাদ করে বললেন: 'মা, আত্মহত্যা ক'রে কারুর কোনদিন কর্মভোগ কাটে নি। দুর্ভোগ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার কেবল একটিমাত্র উপায় আছে: অনুতাপে শুদ্ধিস্নাত করে ঠাকুরের চরণে শরণ নেওয়া—দ্রৌপদীর প্রার্থনা: ত্রাহি মাং কৃপয়া দেব! শরণাগতবৎসল! কুন্তী চমকে উঠল কিন্তু বলল: 'সাধুজি, আমি মিথ্যা বলতে চাই না, তাই বলতে পারব না আমি সত্যি অনুতপ্ত। যাকে ভালোবেসে ঘর ছেড়েছিলাম তাকে স্বামী বলেই বরণ করেছিলাম সে সব কথা—' গুরুদেব থামিয়ে বললেন: 'সেসব কথা সাধুজি আমাকে খুলে বলেছেন। তুমি তাকে ভালোবেসে কোনো পাপ করো নি মা, কিন্তু বাপমাকে না বলে তার সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে অন্যায় করেছ। তোমার এতই যদি সাহস তবে বাপ মাকে খোলাখুলি বললে না কেন সাবিত্রীর মত—ইনিই আমার স্বামী জীবনে মরণে? মা, পাপের নানা রূপ আছে, কিন্তু একটি অতি কদাকার রূপ হল অহঙ্কারী স্বেচ্ছাচার, কারুর কাছেই নত হতে না চেয়ে বলা আমার ভুল হতেই পারে না। তোমার দারুণ অহঙ্কার হয়েছিল—তুমি নিজের পথ একাই কেটে চলতে পারো ভেবে। কিন্তু স্বৈরাচারের সমাপ্তি রসাতলে। অনুতাপের তর্ক এখন থাক, তুমি শুধু ভাগবানকে ডাকো ব্যাকুল হয়ে। বলো—প্রভু, আমি যদি ভুল করে থাকি ক্ষমা করে ঠিক পথের দিশা দাও। আমি আত্মঘাতী হতে চাইছিও গর্ববশে—তুমি রক্ষা করো। যদি মন-মুখ এক করে এ-প্রার্থনা করতে পারো—দেখতে পাবে অচিরেই নির্দিশায় শুধু যে পথ পাবে তাই নয়, পাথেয়ও মিলবে।'

কুন্তী শুনে খানিকক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর বলল, 'সাধুজি, আমি অহঙ্কারে অন্ধ হয়েছিলাম। কলেজে সংস্কৃতে পড়েছিলাম: অজ্ঞান-তিমিরান্ধকে যিনি জ্ঞানের শলাকা দিয়ে চোখ ফুটিয়ে দেন—তাঁরই নাম গুরু। আমি আপনাকে গুরুবরণ করতে চাই—আপনিই আমাকে দৃষ্টিবর দিয়েছেন বলে। আপনি যদি আমাকে দয়া করে দীক্ষা দিয়ে শিষ্যা করে নিতে রাজী হন তবে আপনাকে আমি—' গুরুদেব বললেন হেসে: 'অত দ্রুত নয় মা। দীক্ষা চাট্টিখানি কথা নয়, তার জন্যেও প্রস্তুতি চাই। সবকথা তুমি এখন বুঝতে পারবে না, তাই শুধু বলি—তোমার উচ্চাশা এখনও খুব প্রবল, তুমি চাও গান গেয়ে নাম করতে।' কুন্তী বলল 'এ উচ্চাশাও কি অন্যায়?' গুরুদেব বললেন 'না, সংসারীর পক্ষে এ-উচ্চাশা তার বিকাশের মস্ত সহায় হতে পারে, অনেক সময়ে হয়েও থাকে। কিন্তু যোগার্থীর পক্ষে সাংসারিক ধনজনযশ-মানের লোভ বিষ। মা, দু-নৌকোয় পা দিয়ে চলার উপমাটি স্মরণ করো। যদি দীক্ষা চাও তবে শুধু ঠাকুরকে চাইতে হবে, আর কিছুই নয়। এ-চাওয়াও মনে ফুটে ওঠে না তাঁর কৃপা বিনা। আর সবচেয়ে বড় কথা ভোগের ইচ্ছা প্রবল হলে দীক্ষা নিয়ে অনেক সময়েই উল্টো উৎপত্তি হয়।' কুন্তী বলল 'ভোগের ইচ্ছার কাটান কী?' গুরুদেব বললেন 'শুধু তাঁকে ডাকা আর ডাকা আর ডাকা। প্রার্থনা: ঠাকুর, ভোগের পথে তৃপ্তি নেই, অমৃত নেই—আছে যে-যোগের পথে আমাকে সেই পথেই নিয়ে চলো। ব্যস, শুধু এইটুকু। শুধু তাঁর নামগান আর প্রার্থনা।' কুন্তী কেঁদে বলল: 'কিন্তু শুধু নামগান করে চলবে কেমন করে সাধুজি? প্রাণে বাঁচতে হবে-তো। আমার যে অবস্থা তাতে বেশ্যাবৃত্তি বা ভিক্ষা ছাড়া বাঁচার কোনো পথ নেই। কিন্তু বেশ্যা বা ভিখিরি হয়ে বাঁচার চেয়ে মরাই ভালো।' গুরুদেব খুশী হয়ে ওকে আশীর্বাদ করে বললেন: 'আমি কাল ফিরছি দেবপ্রয়াগে, তুমি চলো আমার সঙ্গে। আমি তোমার সব ব্যবস্থা করব—কারণ তোমার সত্যনিষ্ঠা ও তেজস্বিতায় আমি মুগ্ধ হয়েছি। তোমার কোনো ভাবনা নেই মা, আর আমার কথা যদি শোনো তো তোমাকে ভিক্ষা করতে হবে না, কথা দিচ্ছি।'

"ওকে তিনি নিজে সঙ্গে করে এনে দেবপ্রয়াগে এক কুঠিয়ায় রেখে ওর তদারকে রঘুবীরকে মোতায়েন করলেন। সে ছিল লক্ষ্ণৌয়ের পাশ করা ডাক্তার। কুন্তীকে দিলেন আশ্রমে কিছু সেলাইয়ের কাজ। এছাড়া এখানে ওখানে গান করেও সে কিছু পেত।

"যথাকালে শান্তনু ভূমিষ্ঠ হল। কুন্তী কেঁদে বলল 'এখন এ-শিশুর হাঙ্গাম পোহাবে কে গুরুদেব?' গুরুদেব ওর কান্নায় কান না দিয়ে বললেন: হাঙ্গাম নয় মা,

তারক—তারক। হাঁ, ও এসেছে তোমার দুর্দিন কাটিয়ে সুদিন আনতেই, বলছি আমি, পরে মিলিয়ে নিও। বড় সুলক্ষণ শিশু, লাখে না মিলয়ে এক। বলে ওর 'শান্তনু' নামকরণ করে বললেন: নবজাতকের জন্য যা যা দরকার সবই তিনি জোগাবেন। তবে উপস্থিত কিছু-দিন সিধে-র ব্যবস্থা করা ছাড়া উপায় নেই।'

"কুন্তীর ফের মন খারাপ হ'য়ে গেল। বলল; 'গুরুদেব, সিধে তো ভিক্ষেরই নামান্তর। আপনি যদি আমাকে দীক্ষা দিতেন তাহ'লে অবিশ্যি সব গোলই চুকে যেত, কারণ গুরুর কাছে শিষ্যা সন্তানের চেয়েও বেশি, তাই গুরুর দান হ'য়ে ওঠে বর দান, ভিক্ষ দান নয়। কিন্তু আপনার শিষ্যা না হ'য়ে সিধে নেব কেমন ক'রে?' গুরুদেব বললেন; 'এ যাত্রা তুমি ভুল বলো নি মা, কিন্তু তোমাকে আমি দীক্ষা দেব কথা দিতে পারি যদি তুমি আমার কথা শুনে চলো।' কুন্তীর মুখ আলো হ'য়ে উঠল। বলল হেসে; 'কী আনন্দ! দীক্ষা পাব আপনার চরণে? কিন্তু কবে গুরুদেব?' গুরুদেব হেসে বললেন; 'মা, তুমিই একটি কীর্তন গাও; "রাই, ধৈর্যং, রহু ধৈর্যম্—আমাদের ঘরোয়া প্রবচনটি আরো সরেস—সবুরে মেওয়া ফলে। তুমি এসব সাত পাঁচ ভেবে মনের বাজে খরচ না ক'রে ঠাকুরকে ডেকে যাও। নামের বীজ বুনলে দীক্ষার দিনও এগিয়ে আসবে।'

"কুন্তী মহানন্দে রঘুনাথ মন্দিরে ফের গান গাইবে ঠিক করল। কিন্তু মুস্কিল হ'ল শান্তনুকে নিয়ে—ওকে রাখেকার কাছে। গুরুদেব বললেন একটি ধাত্রী রাখবেন, কিন্তু কুন্তী রাজী হ'ল না। বলল; 'আমি আপনার গলগ্রহ হ'য়ে আছি গুরুদেব, কোনো কাজেই লাগি না, দীক্ষাও পাই নি আজো। এক্ষেত্রে আশ্রয়ের ভার বাড়াতে পারব না ধাত্রী রেখে। শান্তনু একটু বড় হ'লে তখন মন্দিরে গাইব—সেই ভালো।' গুরুদেব মৃদু হাসলেন, কিছু বললেন না।

"কিন্তু ঝোঁকালো মেয়ে তো—তার ওপর রোখালো। গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা না ক'রেই গুরুদেবের অনুমতি না নিয়েই রঘুবীরকে সাফ ব'লে দিল; 'আমার আর তদারক করতে হবে না কারুর—'I Can take care of myself,'

"দর্প এলেই দর্পহারী উঁকি মারেন। রঘুবীর প্রস্থান করার সঙ্গে সঙ্গেই দেবপ্রয়োগের কয়েকটি ডাকসাইটে দুসমন লাগল ওর পিছনে। শেষে একদিন রাতে ওর কুটিরের দোর ভেঙে ঢুকল এক মাতাল। সোজা এসে কুন্তীকে চেপে ধরতেই কুন্তী তার হাত কামড়ে ধরল। সে যন্ত্রণায় 'উঃ' ব'লে ওকে ছেড়ে দিতেই কুন্তী ঘরের কোণে বঁটি নিয়ে দাঁড়ালো রণরঙ্গিণী মূর্তিতে। মাতাল রংবাজের নেশা ছুটে গেল।

'বাপরে!' ব'লেই চম্পট।

"পরদিন গুরুদেবের কাছে সব বলতেই তিনি বললেন কুন্তীকে: 'তোমাকে কি বলি নি মা, আমার কথা শুনে চলবে? আমাকে জিজ্ঞাসা না ক'রে রঘুবীরকে ডিশমিশ করার নাম কি কথা শোনা? কিন্তু সে যাক্, স্বেচ্ছাচারের ফল যখন হাতে হাতে পেয়েছ তখন তোমাকে আর ধমকাব না। কেবল দুদিন হ'ল তোমার পাশে ঐ যে চালাঘরটি তুলেছি, সেখানে আমার এক শিষ্যকে পাঠাব। তুমি না কোরো না। আমি খবর পেয়েছি ওরা তোমাকে লুট নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। দুতিন জন যদি হঠাৎ এসে চেপে ধরে মা—'ব'লে হেসে—'তখন আর বঁটিতেও সামলাবে না।'

"রঘুবীর যেতে চাইল না ফের কুন্তীর রক্ষক হ'তে। কিন্তু প্রসাদ বুক ফুলিয়ে এগিয়ে এল। বলল: 'আমি ওদের শায়েস্তা ক'রে দেব গুরুদেব। কিছু ভাববেন না।' গুরুদেব ভেবে চিন্তে মত দিলেন, কিন্তু একটু দোমনা হ'য়েই, কারণ আর কেউই এগুতে চাইল না এ-সংকটে।

"তারপর ঘটল অনেক কিছু। সব, বলার সময়ও নেই, দরকারও দেখি না। তাই শুধু বলি—প্রসাদ নিজেকে মহাবলী ভেবেই ডুবল। ফের ঐ যাকে বলে দর্পচূর্ণ। ঘটল এক রীতিমত নাটক, লীলাময়ের লীলার পার কে কবে পেয়েছে তাই To cnt a long story 2hort, প্রসাদ পড়ে গেল কুন্তীর প্রেমে, আর সঙ্গে সঙ্গে কুন্তীরও মন উঠল দুলে। এর বেশী বললে পরচর্চা হ'য়ে দাঁড়াবে, তাই শুধু বলি: কুন্তী ছোঁওয়া দিয়েও ধরা দিতে রাজী হ'ল না, বলল প্রসাদ ওকে বিবাহ না করলে আত্মসমর্পণ করবে না কিছুতেই।

"প্রসাদ পড়ল মহা ফাঁপরে। দশবৎসর সাধনা ক'রে নিজেকে আকুমার ব্রহ্মচারী তথা কামজয়ী মহাসাধক ব'লে

পরিচয় দিয়ে শেষে এক ছোট জাতের পতিতা মেয়েকে বিয়ে করলে সভ্যসমাজে মুখ দেখাবে কেমন ক'রে? অথচ এদিকে কুন্তীর মোহও ওকে বেশ ধরেছে ভূতের ম'তই। ওর উভয় সঙ্কটের কথা আর ফলিয়ে নাই বললাম।"

অসিত বলল: "কিন্তু প্রসাদ যদি কামজয় না ক'রে থাকে তবে গুরুদেব তাকে মোহিনী যুবতীর রক্ষকের পদে মোতায়েন করলেন কেন? তিনি কি জানতেন না—এপথে রক্ষক কত সহজে ভক্ষক হ'য়ে দাঁড়ায়?"

"পরে শুনেছিলাম রঘুবীরের কাছে যে, গুরুদেব চান নি প্রসাদকে এ-পিছল পথে ঠেলতে। নন্দন হেসে আমাকে বলেছিল যে, সদ্‌গুরুরা কখনো কখনো শিষ্যদের পরীক্ষাও করেন তো। প্রসাদ বড় বেশি জাঁক করত সে কামজয় আকুমার ব্রহ্মচারী—তাই তিনি হয়ত চেয়েছিলেন ওকে একটু শিক্ষা দিতে। তবে গুরুদেব যে ঠিক কী ভেবে ওকে কুন্তীর চৌকিদার পদে বাহাল করেছিল আমরা কেউই নিশ্চিত জানি না ভাই। কারণ মনে রাখিস এ প্রায় ন দশবৎসর আগেকার কথা—যখন শান্তনু ছিল কচি শিশু। আমরা দেবপ্রয়াগে আসি—যখন শান্তনু পাঁচবছর বয়সে সবে গান গাওয়া সুরু করেছে। যাকগে, যা বলছিলাম এর পরে প্রসাদকে যে বেশ কিছুদিন ভুগতে হয়েছিল একথা সকলের কাছেই ফাঁশ হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এসব ফালতো কথা আর না। তোর মন খারাপ ক'রে দিতে তো এ-গল্প ফাঁদি নি, তুই মনে জোর পাবি ভেবেই বলা। তাই এ-অধ্যায় আর ফলিয়ে না বলে প্রসাদের মোহভঙ্গের পরে কি হ'ল।"

"একটু বোসো ভীমদা। প্রসাদের মোহভঙ্গ হ'ল কি তোমাদের গুরুদেবের কৃপাই বলবে?"

"ওরে খল সংশয়ী! আমাকে দিয়ে কী বলিয়ে নিতে চাচ্ছিস শুনি? যে, গুরুকৃপায় অসম্ভব সম্ভব হয়? কিন্তু তোর ফাঁদে আমি পা দিচ্ছি নি কেবল বলব—সাধারণ ভাবে, ধরা ছোঁয়া না দিয়ে—যে, গুরুকৃপায় যে অঘটন ঘটে, প্রতি সাধকেরই একটি অকাট্য অভিজ্ঞতা। এক্ষেত্রে অঘটনটি ঘটল কী ভাবে তাও আজ বলব না তোকে কিছুতেই—তুই ফের অবিশ্বাসের হাসি হাসবি। তাই শুধু বলব—গভীর মনস্তাপের পরে প্রসাদের সুমতি [illegible] ও বাইরে অনেকের কাছে নানা অর্ধসত্য বললেও গুরুদেবের কাছে কিছুই না লুকিয়ে সব খুলে বলল। কিন্তু হ'লে হবে কি, একটা ক্ষোভ ওর মনে বাসা বাঁধল যার ফল পরে হয়েছিল শোচনীয়—কিন্তু যাক্ সেকথা, উপস্থিত কুন্তীর কথাই বলি একটানা।

"প্রসাদকে আশ্রমে ফিরিয়ে আনার পর—যাকে বলা যায় ঘরের ছেলের ঘরে ফিরে আসার পরের পর্বে—গুরুদেব তাঁর এক গৃহস্থ দারোগা, শিষ্যকে মোতায়েন করলেন কুন্তীর তদারক করতে। ফলে তখনকার মত অন্ততঃ ওর সমস্যার একটি সুরাহা হল।"

ভীম হেসে হেসে বলে; "এম-এ তে আমাদের পাঠ্য ছিল সেক্সপীয়রের হ্যামলেট। তাঁর একটি কথা আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছিল;

when sorrows come they eome not single spics, But in battalions *

বেচারী কুন্তীর জীবন এ-উক্তির প্রত্যক্ষ ভাষ্য। একটা বিপদ কাটে তো আর একটা চড়াও হয় সৈন্যদের মতন ঝাঁকে ঝাঁকে হানা দিতে। নৈলে কে ভেবেছিল যে, প্রসাদ প্রবীণ সাধক হ'য়েও এক একান্ত অসহায়ার পিছনে এভাবে লাগবে কোমর বেঁধে? এখানে ওখানে ওর চিত্ত-চাঞ্চল্যের খবর রটেছিল—রটবেই তো—ছোট শহরে এ-জাতের শ্রুতিরোচক খবর বাতাসেরো আগে ছোটে, কে না জানে? ফলে ও অগ্নিশর্মা হ'য়ে যত্র তত্র ব'লে বেড়াতে লাগল যে, কুন্তী শুধু পতিতা ও অস্পৃশ্যাই নয় আর ওপরে ডাকসাইটে মিথ্যুক, তাই প্রসাদের বিরুদ্ধে কলঙ্ক রটাচ্ছে। শুধু তাই নয়, সে মন্দিরের পাণ্ডাদের তথা এক শাস্ত্রীপুঙ্গবের কাছে—যাঁর কথা পরে বলছি—গিয়ে বলল যে, কুন্তী মিথ্যা বলেছে যে, সে বিধবা। শান্তনু জারজ, আর কুন্তী দেহপণ্যা—না, গণিকারও অধম, নৈলে কি যোগীদের প্রলুব্ধ করতে যায়?

"গুরুদেব আমাদের প্রায়ই বলেন যে, আমাদের স্বভাব এমনিই অসঙ্গতিতে ভরা যে, উল্টোপাল্টা ঘটনা আমরা যুগপৎ সমান আগ্রহেই বিশ্বাস ক'রে বসি। তাই প্রসাদের চিত্তচাঞ্চল্য নিয়ে হাসাহাসি করা সত্বেও বহু পরচর্চাপ্রিয় যাত্রী পাণ্ডা—বিশেষ করে মেয়েরা—মিথ্যেযোগী বক-ধার্মিককে কুন্তী প্রত্যাখান করেছে, বেশ হয়েছে, যেমন

কুকুর তেমনি মুগুর'—ইত্যাদি বিদ্রূপ করার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস ক'রে বসল যে, বৈরিণী দেবপ্রয়োগে এসেছে যোগীদের যোগভ্রষ্ট করতেই—ছি ছি! ধিক্। ভেবে দেখ্—প্রসাদকে ভণ্ড ব'লে হাসাহাসি করতে যাদের বাধল না, তারাও কুন্তী বেচারীকে এতটুকুও সাবাস দিতে রাজী হ'ল না যে, সে প্রসাদকে মুঠোর মধ্যে পেয়েও না বলতে পেরেছিল!

অসিত বলে; "আহা, বেচারী মেয়ে! তবে তুমি তো ভাই জানো—পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের ঢের বেশি সইতে হয় একই অপরাধে।"

ভীম হেসে বলে জানি বলে "জানি বলে জানি দাদা, জানি হাড়েহাড়ে। গল্পটা আর একটু এগুলেই বুঝতে পারবি সে কেমন জানার মত জানা।"

বলে মুখে আর একটা পান পুরে ভীম বলে চলে: "প্রসাদের প্রপাগাণ্ডার ফলে কুন্তীর পক্ষে বাইরে বেরুনোও হয়ে উঠল দুর্ঘট। এমন কি, আমাদের আশ্রমে এলেও গুরুদেবের নানা শিষ্যা আপত্তি করত। তাদের কথায় অবশ্য তিনি কান দিতেন না, কিন্তু ভাগবত পাঠের সময় যখন মেয়েরা আঙুল দিয়ে কুন্তীকে দেখিয়ে ফিসফাস করত তখন সবাইকেই একটু বিপন্ন হতে হত। তাই গুরুদেবকে বলে কুন্তী শেষটায় আশ্রমে আসাও ছেড়ে দিল। অতঃপর গুরুদেবকেই সময় করে প্রতি সপ্তাহে যেতে হল তার কুঠিয়ায় ভাগবত বা গীতার পাঠ দিতে—রঘুবীর চন্দন ও আরো দু'চারটি শিষ্যকে নিয়ে যারা কুন্তীর দুঃখে দুঃখ পেত।

"রঘুনাথজির মন্দিরেও সে আর গাইত না?"

"তুই ভালো প্রশ্ন করলি! বলি নি—প্রসাদ সর্বত্র প্রপাগাণ্ডা করে বেড়াত কুন্তীর নামে। একথা সত্যি, কুন্তীকে একটা মিথ্যা কথা বলতে হয়েছিল যে, সে বিধবা। কিন্তু মানুষের এমনি স্বভাব যে ভাই যে সে উঠতে বসতে মিথ্যা বললেও কাউকে মিথ্যা বলতে দেখলে বিষম রেগে ওঠে। কাজেই কুন্তী কুলত্যাগিনী হয়েও বিধবা বলে নিজের পরিচয় দিয়েছে এতে সত্যবাদী যুধিষ্ঠিরের দল আগুন হয়ে উঠলেন—ওর সত্যি সত্যিই পথে ঘাটেও মুখ দেখানো ভার হয়ে উঠল। তবে ও পড়তে ভালোবাসত তাই কতকটা বেঁচে গেল, কারণ গুরুদেব তাঁর লাইব্রেরি থেকে নানা সদ্‌গ্রন্থ পাঠাতেন, ও পড়ত মন দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতও ভালো করে পড়া সুরু করল, বিশেষ করে ভাগবত পড়তে। বাকি সময়টা নবজাতককে নিয়েই কাটত—আনন্দেই বলব। বাধাই হয়ে দাঁড়ালো ওর বিকাশের সহায়।

"কিন্তু এর পরে হানা দিল ফের এক নতুন বিপদ—ঐ সেই কুচক্রী সৈন্যদের মতনই আচমকা। বেগতিক দেখে সেই দারোগাজি সরে পড়লেন।

"কিন্তু রাখে কৃষ্ণ মারে কে? সদ্‌গুরু যার সহায় আসুরিক চমূ তার কী করবে? হল কি, গুরুদেব প্রসাদ-ঘটিত এই কেলেঙ্কারির কয়েক মাস আগে আশ্রম থেকে আধমাইল দূরে চারবিঘে জমি কিনে দুটি ঘর তুলেছিলেন। জমিটিতে নানা শাকসবজির চাষ বসিয়েছিল এক নিপুণ মালী—সস্ত্রীক। কিছু ফলের গাছও ছিল—আম আতা পেয়ারা লেবু···। গুরুদেব কুন্তীকে মালীর পাশের ঘরে মোতায়েন করলেন সহকারিণী মালিনী। এতদিনে বেচারী মেয়ের একটা স্থায়ী মতন ব্যবস্থা হল। পঞ্চপ্রবীর অবিশ্যি আপত্তি করেছিল, কিন্তু গুরুদেব তাদের রুক্ষকণ্ঠে দাবড়ানি দিলেন: 'কে কোথায় কী করছে না ভেবে নিজের সাধনার চরকায় তেল দাও।'

"কুন্তী উপস্থিত আর একটা আবর্ত থেকে নিস্তার পেল বটে—অন্ততঃ তখনকার মত, কিন্তু মুস্কিল হ'ল—এর পরে তার মন কিছুতেই মানা মানতে চাইল না ব'লে। নীতিবাদীরা তাকে এ জন্যে দোষ দেবেন নিশ্চয়ই, কিন্তু ছেলেবেলা থেকে যে উদ্দেশ্য মনে পুষে এসেছে, সে নৈতিকতার নিষেধ মানতে চায় না। বলেছি কুন্তী দশবারো বৎসর বয়স থেকেই গাইতে পারত চমৎকার। ঠিক প্রতিভা বলা যায় না, তবে ওর মধুর সুরেলা ও দরদী কণ্ঠের গানে সকলেরই মন ভিজে উঠত। ওর উদ্দেশ্য ছিল ও প্রোফেশ্যনাল গায়িকা হবে। সে-আশায় ছাই পড়লেও গান গেয়ে নাম করবার উচ্চাশাকে ছাড়তে পারল না। প্রথম প্রথম রঘুনাথজির মন্দিরে গান গেয়ে খাতির পেত ব'লে কিছুটা খুশী ছিল, কিন্তু যখন ভ্রষ্টা ব'লে রেগে দিয়ে পাণ্ডারা ওকে মন্দিরে আসতে বারণ ক'রে পাঠাল তখন

* বেদনা বিপদ যবে দেয় হানা—হায়
দুরন্ত সৈন্যের মত আসে দলে দলে।

ও দুঃখে ক্ষোভে নিরাশায় কেবলই ভাবত—আত্মহত্যা করা ছাড়া আর পথ নেই। এক কথায় এ-ভাবে সবার অস্পৃশ্যা হ'য়ে শুধু এক বাগানে মালিনীর নীরস কাজে ওর মন বসল না।

"গুরুদেব অন্তর্যামী, ওকে আশ্বাস দিলেন যে, ফের ওর সুদিন আসবে যদি ঠাকুরকে সত্যি ডাকতে পারে। ও প্রার্থনা সুরু করল—নামজপও। কিন্তু তবু কোথাও গান গাইতে না পেয়ে ও সর্বদাই মনমরা হ'য়ে থাকত। গুরুদেব তখন ওকে মাঝে মাঝেই আশ্রমে ডেকে ওর গান শুনতেন আমাদের সঙ্গে। কিন্তু দুচার দিন পরে প্রসাদ ভাংচি দিয়ে দিবাকর পিণাকী রাধীর ও বিষ্ণুদাসকে বিমুখ ক'রে তুলল। ওরা ডেপুটেশনে এসে গুরুদেবকে বলল কোরাসে যে, মেয়েদের গান শুনলে ওদের সাধনার ক্ষতি হয়। গুরুদেব মৃদু হেসে বললেন পদাবলীর কীর্তন শুনে যে কেউ ডুবেছে এমন কথা কখনো শুনি নি। তবে যখন আমাদের সাধনার ক্ষতি হয় না তখন আমরা শুনব।

"অতঃপর কুন্তীর কীর্তন গুরুদেব শুনতেন চন্দন ও রঘুবীরের সঙ্গে। আমি ও মা তখনো দেবপ্রয়াগে আসি নি।"

"শান্তনু তখন কত বড় ?"

"তিন কি চার বৎসর। রঘুবীরের মুখে শুনেছি গুরুদেব তাকে কী যে আদর করতেন, কখনো কখনো কোলে করে খাওয়াতেন, বলতেন 'ও এসেছে ভাঙা ঘরে চাঁদের আলো—মা-র ত্রাতা হয়ে।'

পঞ্চপ্রবীর আরো জ্বলে উঠে বলত যা তা। তবে ধরা ছোঁওয়া দিয়ে নয়। যাকে বলে লুকিয়ে কাদা ছোড়া।

গুরুদেবের ভবিষ্যদ্বাণী ফলল: পাঁচবছর বয়স যেতেই শান্তনু গাইতে আরম্ভ করল। বছর না ঘুরতেই কত গানই যে শিখে ফেলল সে এক অবাক কাণ্ড! দেখে অনেকেই বলত 'প্রডিজি'। গুরুদেব বলতেন 'আরো বেশি, ওর সন্ন্যাসযোগ আছে—born yogi যাকে বলে।'

"গুরুদেব প্রায়ই উদ্ধৃত করেন পরমহংসদেবের একটি বিখ্যাত উক্তি। এক নিঃস্ব তাঁর কাছে এসে একবার বলে 'ঠাকুর, আমার কেহ নেই।' তাকে ঠাকুর, খোলা হেসে হাততালি দিয়ে বলছিলেন 'তুমি ধন্য, কারণ যার কেউ নেই, তার ঠাকুর আছেন।'

অসিত হেসে বলে "কথাটা আমাদের কৃষ্ণঠাকুরও বলেছিলেন তাঁর পাটরাণী রুক্মিণী দেবীকে—তবে খোলা হেসে নয়, মুচকী হেসে:

নিষ্কিঞ্চনা বয়ং শশ্বৎ নিষ্কিঞ্চনজনপ্রিয়াঃ।
তস্মাৎ প্রায়েণ ন হ্যাঢ্যা মাং ভজন্তি সুমধ্যমে!

অর্থাৎ কিনা—

রাণী, অকিঞ্চন আমি গো ভালো, অকিঞ্চনে বাসি
তাই ধনীরা প্রায় পূজে না হায় আমাকে উচ্ছ্বসি"।"

ভীম হাততালি দিয়ে বলে: "বা বা! Parallel passage যাকে বলে। আর কথাটা সত্যিও বটে, মানতেই হবে। নৈলে কি অকিঞ্চন কুন্তীকে আশ্রয় পাবার জন্যে আসতে হ'ত প্রথম এক অকিঞ্চন গুরুর আশ্রমে—পরে আরো অকিঞ্চন শিশুপুত্রের প্রতিভার আওতায়? আর প্রতিভা ব'লে প্রতিভা—ভাব একবার মাত্র পাঁচবৎসরের শিশু প্রডিজি—"

অসিত বলে: "তবে প্রডিজিরা তো শিশুই রয় দাদা। জার্মানিতে—যেখানে প্রডিজিদের দেখা মেলে সবচেয়ে বেশি ওদের নামকরণটাও তাই বেশি মানায়: wunderkind, কিনা অদ্ভুত শিশু—wonder child, যথা মোজার্ট —যিনি চারবৎসর বয়স পিয়ানো বাজাতেন, বীটোভেন যিনি ন' বৎসর বয়সে kappelmeister কিনা conductor হয়েছিলেন, শুবার্ট, হ্যণ্ডেল, মেণ্ডেলসন - কিন্তু মরুক গে এসব কালতো কথা, তোমার গল্পটাই চলুক।"

"তুই জর্মনদের দৃষ্টান্ত দিয়ে ভালোই করেছিস, কারণ আমি সত্যিই জানতাম না শিশুরা এত অল্পবয়সে প্রতিভাধর হ'তে পারে। তাই আরো অবাক্ হ'তাম শান্তনুর গান শেখার অদ্ভুত কৃতিত্বে। আর শুধু কারিগরির, নানা আলাপের কৃতিত্বই নয়, গায় সে যে কী দরদ দিয়ে! রঘুবীরের কাছে শুনেছি—রঘুনাথজির মন্দিরে তার গান শুনতে ভিড় জ'মে যেত তার পাঁচ ছবছর বয়স থেকেই। তাই তো এমন কি দুর্ধর্ষ শাস্ত্রীজীও তাঁর অনুগত পাণ্ডারাও শান্তনুকে মন্দিরে গাইতে দিতে আপত্তি করেন নি—তার প্রসাদে তাঁরাও বেশ দুপয়সা কামাতেন ব'লে। ঐ একরত্তি ছেলে যা প্যালা পেত তার অর্ধেক তাঁরা ভাগ বসালেও মা ও ছেলের চ'লে যেন স্বচ্ছন্দেই—কুন্তীর ভিক্ষা করতে হয় নি একদিনও। এই সূত্রে একবার ভেবে দেখ

তাঁর লীলা—বলে না, 'ওস্তাদের মার শেষ রাত্রে।' যে ছেলে এসেছিল অবাঞ্ছিত অতিথি হ'য়ে—মা-র চলার পথে কাঁটা—সেই কিনা দেখতে দেখতে ফুটে উঠল গোলাপ হয়ে—একেবারে অক্ষরে অক্ষরে!"

অসিত বলল; "তোমার উপমাটি জুৎসৈ হয়েছে মানতেই হবে যদিও এটি তুমি রবীন্দ্রনাথের গান থেকে ধার করেছ। কেবল একটা কথা মনে হচ্ছে আমার—" ব'লেই থেমে; "না, কাজ নেই দাদা, সংশয়ী ব'লে আমার যে-দারুণ দুর্নাম রটেছে, আশীর্বাদ করো—তব দৃশ সরল বিশ্বাসীর ছোঁয়াচে তার রক্তকাঁটাও ভক্তি গোলাপ হয়ে ফুটে উঠুক তোমার গুরু ভক্তির জয়ধ্বনিতে দোয়ার দিতে দিতে।"

ভীম খিল খিল ক'রে হেসে ওঠে; "শুধু দোয়ারের জোরেই কি কাঁটায় গোলাপ ফোটে দাদা! চাই বিশ্বাসের নিষ্ঠার সাধনা। কিন্তু তোর বাধছে ঠিক কোথায় বলবি? শান্তনু যে গান গেয়ে কুন্তীকে ভিক্ষা করার গ্লানি থেকে বাঁচিয়েছিল একি ঠাকুরের করুণার একটা অকাট্য প্রমাণ নয় বলতে চাস্?"

অসিত একটু চুপ ক'রে থেকে বলল; "আমি যা বলতে চাই গুছিয়ে বলা খুব সহজ নয়। তাই থাক এ-তর্ক। তাছাড়া আমার সংশয় কাটল বা না কাটল—কী যায় আসে বলো?"

ভীম চম্‌কে ওঠে; "যায় আসে না? বলিস কি তুই? আমাদের তীর্থ পথের সবচেয়ে বড় বাধা যে-সংশয় —Lion in the path—তাকে জয় করতে না পারলে লক্ষ্যসিদ্ধি হবে কেমন ক'রে শুনি? তাই বল্ তুই, যা প্রাণ চায়।"

অসিত বলে: "আমার কোথায় বাধছে তাহ'লে খুলে বলি শোনো। আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, করুণা মাঝে মাঝে ওপর থেকে আলোর আশীর্বাদের মতন উড়ে এলেও তারপরেই যে ফের আঁধারের অভিশাপ নিয়ে থেকে আরো কালো হ'য়ে ছেয়ে আসে—তার কি? কাঁটা গোলাপ হবার পরেও ফের যে তক্ষক গোলাপের মধ্যে ঢুকে পড়ে গাঢাকা হ'য়ে থাকে, ফলে গোলাপের গোলাপ হ'য়ে ওঠা স্থায়ী হয় কই? দাদা, সংসারে ত্রিতাপদগ্ধ জীব ঠিক কী চায়? শোক পেয়ে একটু সান্ত্বনা পাবার পরে আরো বেশি শোক পেয়ে আরো গভীর সান্ত্বনা পেতে, না বীতশোক হ'য়ে জীবন্মুক্তের পদবী পেতে? এক কথায়, বুদ্ধদেবের ভাষায়, দুঃখনিবৃত্তি। না শোনো ভীমদা, আমাকে ভুল বুঝো না, লক্ষীটি! আমি সত্যিই মানি—করুণা নিঃস্বকে আশ্রয় দেয়, ভক্তি দুর্বলকে বল জোগায়, সাধনার পথের বাধা কাটে, সুমতি দুর্মতির প্রলোভন থেকে রক্ষা করে। কিন্তু করুণা ভক্তি সাধনা সুমতি বিকায় কোন্ হাটে বলবে? আরো একটা কথা বলি ভয়ে ভয়ে—যখন চাগিয়ে দিয়েছ বলতে 'যা প্রাণ চায়', কথাটা এই যে শান্তনু পেয়েছিল গুরুদেবের করুণা, কুন্তী ভক্তির পাথের—এ আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি, কারণ জানি তুমি সত্যনিষ্ঠ, বিবেকী ভেবেচিন্তেই কথা ব'লে থাকো। কিন্তু খতিয়ে দাঁড়ালো কী? ওদের পথের বাধা কি কাটাল, না বাধার পর বাধার দুর্দান্ত তাপে গিরিশ ঘোষের ভাষায় 'সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল?' কোন্‌টা?"

"তুই চাস সস্তা উপন্যাসের happy ending—ফাঁড়া কাটার সঙ্গে সঙ্গে নায়ক নায়িকার মিলন—যবনিকা পতন—যার পরে ভাবা শুধু স্বপ্নকুঞ্জেই হেসে খেলে রামধনুর ঝাণ্ডা উড়িয়ে গান গেয়ে চলবে: 'যে দেখেছি যা শুনেছি তুলনা তার নাই।' আমার মনে হয়, জীবনবিধাতা কোনোদিনই মানুষের জীবনকে এভাবে চালান নি, আজও চালাচ্ছেন না। গুরুদেবের শ্রীমুখে এই কথাই শুনে এসেছি যে, প্রেমের সাধনায় বহু বাধা জয় ক'রে সিদ্ধিলাভ ক'রে কৃতকৃত্য হ'তেই ঠাকুর আমাদের জীবনের আখড়ায় পাঠিয়েছেন বীর হ'তে। যে এ-সাধনা বরণ করে সে-ই কেবল পদে পদে বাধা ডিঙিয়ে শেষে মনের প্রাণের কাঁটাবনে সাজানো বাগানের পত্তন ক'রে ধন্য হ'তে পারে। কিন্তু এ ধন্য হবার পথ তো একটানা আমোদ আহ্লাদের পথ নয় ভাই। বহু সংশয়ের অন্ধকার, শোকতাপের কাঁটাবন, নীরসতার মরু পার হ'য়ে তবে মানুষ অমৃত হয় প্রেম মন্ত্রে দীক্ষা নিলে। এ-দীক্ষা নিতে যে নারাজ তারও গতি হবে—কেবল অনেক জ্বালাযন্ত্রণায় নাকাল হ'য়ে তবে।"

অসিত করুণ হাসে: "কিন্তু প্রেমভক্তির পথেও কি মানুষ কম নাকাল হয় ভীমদা?"

ভীমও হাসে: "হয় বৈ কি ভাই, ভুক্তভোগী মাত্রেই

মানবে। কেবল ভক্তির পথে নাকাল হওয়ায় বেসুর ও বেতাল একটু ভিন্ন। কারণ সাধক যখন সাধনার পথে হোঁচট খেয়ে পড়ে তখন বিষম ঘা খেলেও একটি কথা জানেই জানে—যে, প্রেমের ঠাকুর বাইরে প্রকট না হলেও অন্তরে আছেন পতিতকে পাবন করতে সান্ত্বনা দিয়ে, বল দিয়ে—সবচেয়ে বড় কথা: দিশা দিয়ে ঠিক পথে চালাতে। এক কথায় ভয়ের ভূমিকম্পেও সে অভয় পায়।"

"ঠিক কী ভাবে—একটু খুলে বলবে ভাই? আমি সত্যিই জানতে চাই।"

ভীম একটু ভেবে বলে: "গুরুদেব পরচর্চা করতে মানা করেছেন বলেই বাধছে—তা হোক, এ তো ঠিক পরচর্চা নয়, তুই যখন অবুঝ সংশয়ী হলেও খাঁটি জিজ্ঞাসু। তাই শোন্: তোর চ্যালেঞ্জের জবাব দেবই দেব—যার ফলে হয়ত তুই দেখতে পাবি—গুরুকে ভালবাসলে কী ভাবে অচলাও সেই প্রেমের প্রেরণায় টাল সামলে আসক্তির ঢালুপথ ছেড়ে মুক্তির ঊর্ধ্বপথে চলবার শক্তি পায়।

"বলেছি—প্রসাদ কুন্তীর পাশের ঘরে থেকে পাহারাওয়ালা হয়ে ছিল মাসখানেক। হল কি, ক্রমশ: কুন্তীর যৌবনশ্রী, কণ্ঠ, হাবভাব, চটক, চাহনি গড়ন তাকে একেবারে উতলা করে তুলল, একথাও বলেছি। যেটুকু বলিনি সেটা এই যে, সে কুন্তীকে নানা স্তোকবাক্যে ভুল বোঝাতেও সঙ্কোচ বোধ করেনি। আর কী সাংঘাতিক স্তোকবাক্য: যথা, নীরসতার মধ্যে নরনারীর একটু রসস্পর্শ চাওয়ার ফলে যোগ সমৃদ্ধই হয়ে ওঠে। সঙ্গে-সঙ্গে এমন আভাষও দিয়েছিল যে, অন্তরে সে স্পষ্ট শুনেছে যে, কুন্তীই তার শক্তি। এইতেই কুন্তীর মন দুলে উঠেছিল—শুধু তার 'যৌবননিকুঞ্জে' ঘুমজাগানিয়া পাখী' নিরন্তর ডাকত বলে নয়—রঙিন আশার সোনার সকাল জীবন তাকে সবচেয়ে নরম জায়গাটিতে ঘা দিয়েছিল বলেও বটে। এ-রঙিন আশার স্বরূপটি হয়ত আমরা পুরুষেরা ঠিক ধরতে পারব না, কেন না আমাদের মন ঠিক কুমারীদের মতন রংবিলাসী নয়—কিন্তু এটুকু বুঝতে আমাদেরও বেগ পাবার কথা নয় যে, ও গভীর বেদনায় মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল—যখন যাকে ওর কুমারী হৃদয় বিশ্বাসের তিলক ও প্রেমের মালা দিয়ে অকুণ্ঠে বরণ করেছিল সে-ই হানল ওকে মর্মান্তিক শক্তিশেল—শুধু যে ওকে পথে বসিয়ে পালালো তাই নয়—পালালো আর একটি মেয়ের সঙ্গে। আলো ওর চোখে সত্যিই কালো হয়ে গেল।

"কিন্তু যৌবনের রঙিন কামনা মরেও মরে না। তাই একটু একটু করে ফের ও জল্পনা কল্পনা সুরু করল কোনো সৎ প্রেমিককে নিয়ে নীড় বাঁধার। ধুরন্ধর প্রসাদ ওর এই অতৃপ্ত কামনার তারে ঘা দিয়েই ওকে চঞ্চল করে তুলেছিল, ভরসা দিয়ে যে, কুন্তীই তার শক্তি, তাই সে ঠিক করেছে যে সে একটি চমৎকার আশ্রম গড়ে তুলবে ওকে আশ্রমমাতার পদবী দিয়ে। কোথায় এ নব-আশ্রম পাতবে বলে নি, কেবল বলেছিল উপস্থিত একথা গোপন রাখতে—এমন কি, গুরুদেবকেও যেন না বলে—'মন্ত্রগুপ্তি বিনা সিদ্ধ হয় না ভাগবতে আছে—ইত্যাদি।

(ক্রমশঃ)

কঠোপনিষদের সাধন পথ

শ্রীঅরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

অষ্টম মন্ত্র (১।২।৮)

মন্ত্র—ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষ সুবিজ্ঞেয়ো,
বহুধা চিন্ত্যমানঃ
অনন্যপ্রোক্তে গতিরত্র নাস্ত্যনীয়ান্
হ্যতর্ক্যমণু প্রমাণাৎ ॥

অর্থ—"অবর" মানুষের দ্বারা উপদিষ্ট হইলে ইনি (=এই আত্মা) সুবিজ্ঞেয় হ'ন না, কারণ বহুভাবে ইহাকে চিন্তা করা হয়। অবর ছাড়া অন্য শ্রেষ্ঠ আচার্য্য দ্বারা উপদিষ্ট না হইলে আত্মতত্ত্বে গতি নাই।

ব্যাখ্যা—কোন "অবর" মনুষ্য ইহাকে ভাষায় জ্ঞাপন করিতে পারিবে না যাহাতে অপরে সে উপদেশ গ্রহণ করিয়া উপকৃত হইতে পারেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মনুষ্য আচার্য্যের পক্ষে আত্মার উপদেশ সহজ নহে। আচার্য্য স্বয়ং দেবতা হওয়া চাই; তবে ত তিনি দিবেন ও আমরা পাইব। কারণ "অবর" বলিতে সেই সকল মনুষ্য যাঁহারা আত্মার কাছ হইতে বর পান নাই বা তাঁহার দ্বারা বৃত হ'ন নাই। তবে মনুষ্য যদি পরা বরের (মুণ্ডক উপ, ২।২।৮ দ্রষ্টব্য) দৃষ্টিলাভ করিয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি তাঁর প্রেরণা দ্বারা বাক্যের কতক যোজনা করিতে পারেন যাহাতে অজ্ঞ ব্যক্তিরও জানিবার রুচি জন্মাইতে পারে। সে রুচি না থাকিলেত জানা যায় না। কিন্তু মনুষ্য আচার্য্য সাধারণতঃ আত্মার বার্ত্তা কেন দিতে পারেন না? তিনি ভাবিয়া ভাবিয়া বলেন, অনেক মেপে জুপে গভীর চিন্তা করে বলেন। আত্মা যেমন অব্যক্ত, সেইমত তিনি অচিন্ত্য (গীতা ২।২৫)। যে মানুষ ভেবে চিন্তে বলে "ভালবাসি" বা "চিনি" সে কি যথার্থ ভালবাসে বা চেনে? যে চেনে না ও আর একজনের কাছ হইতে জানিয়া বলে সে কোনমতে জানাতে পারে কিন্তু চেনাবে কেমন করিয়া? আর যে আত্মাকে চিনিয়াছে সে ত আত্মা হইয়া গিয়াছে, আর মনুষ্যপদবাচ্য নহে। তাই প্রকৃত আচার্যকে দেবতা বলা হয়, কেহ কেহ পরম দেবতা বলেন সত্যের প্রতি কৃতজ্ঞতায়। আর একটা কথা। চিন্তার মূল্য কতখানি? চিন্তা করি মন দিয়া। মনের হ্রাস বৃদ্ধি হয়। অতএব ইহা অনিত্য। আত্মা নিত্য, তাহাকে অনিত্য বস্তু কি করিয়া স্পর্শ করিবে? প্রাণ সে হিসাবে নিত্য, তাহার মানব জীবনে ক্ষয় বৃদ্ধি নাই। যখন সে আসে, একেবারেই আসে, যখন সে চলিয়া যায় একেবারেই যায় ও মানুষ মৃত্যু মুখে পড়ে। তাহা ছাড়া প্রাণ অপাপ; তাহাকে কোন কালেই পাপ স্পর্শ করে না (বৃহ উপ, ১।৩।৭), বাক্য ও মনকে পাপ স্পর্শ করে। যে অপাপ সেই শুদ্ধ স্বরূপ আত্মাকে পায় ("শুদ্ধম্ অপাপবিদ্ধম্", ঈশ, উপ ৮ মন্ত্র) তাই প্রাণই আত্মার সমীপে অগ্রসর হইতে পারে। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছেন, "মন দিয়ে যাঁর নাগাল নাহি পাই, গান দিয়ে তাঁর চরণ ছুঁয়ে যাই"। (এখানে কবির ইঙ্গিত মত গানের মধ্যে মন বাক্য ও প্রাণের সুসঙ্গত সমন্বয় পাওয়া যায়।) তাই কেবলমাত্র মন দিয়া মনের কাছে আত্মার বারতা কোন মতেই জানান যায় না। কিন্তু যাঁহার প্রাণ আছে ও সে প্রাণের দ্বারা, আত্মার দয়ায়, তাঁহার (আত্মার) ভাষা ও ভাব আয়ত্তে পেয়েছেন, তিনি তাহা জ্ঞাপন করিতে পারেন। কিন্তু সে রকম শ্রোতা পাইলে ত? যিনি হইবেন, তাঁহার মধ্যে

বক্তাকে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। নিজের প্রাণ দিয়া শিষ্যের প্রাণের সেই স্পন্দন জাগাইতে হইবে যাহাতে শিষ্য সেই প্রাণস্পর্শী ভাষা ও ভাব ধরিতে পারেন। এইরূপ অবস্থা সেই গুরু সৃজন করিতে পারিবেন যিনি শিষ্যের সহিত নিজকে অভেদ দেখিবেন। (মাতা যেমন শিশুকে চুম্বন করিয়া তাহার মুখে মাতৃ ভাষার স্পন্দন জাগান)। নিজের খাওয়ার অন্ন শিষ্যের মুখে তুলিয়া দিতে পারিবেন। নিজের মনের অস্থিরতা ও গোপন ভালবাসা শিষ্যের সত্তায় ইনজেকসনের (injection এর) মত ঢালিয়া দিতে পারিবেন। নিজের জীবনের প্রতি মায়া থাকিবে না, শিষ্যের প্রাণ বাঁচাইতে উন্মুখ হইবেন। যদি প্রয়োজন হয়, নিজ দেহ ছাড়িয়া শিষ্যের দেহে প্রবেশ করিয়া সেখানে ব্রহ্মজ্ঞানের সঞ্চার করিবেন। যমের মত গুরু ছাড়া কে ইহা করিবে? নচিকেতার মত শিষ্যও কোথায় পাওয়া যাইবে? ইহাও যেন মনে হয়, আত্মার সংযোগ আত্মার দ্বারাই সম্পাদিত হয়। নচেৎ সাম্পরায় দেশ যে জনহীন হইয়া যায়। মনুষ্য গুরু যদি নিজের শক্তি দ্বারা শিষ্যের অন্তর জয় করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে যাদুবিদ্যার মত, কিছুটা ফল হইতে পারে, কিন্তু তাহা অস্থায়ী হয়। শিষ্যের অন্তরে কোথাও একটু অন্ধকার রহিয়া যায়, যাহা আবার সর্ব্বগ্রাসী হয়। তাই মনুষ্য গুরু তর্ক দ্বারা শিষ্যকে অধিকার করিতে পারেন না। আলো বাহির হইতে আসিলে কি হইবে, অন্তরে যদি আলোক গ্রহণ করিবার সামর্থ্যের বিকাশ না হয়।

বাহিরের আলো ঠাঁই পায় না।

নবমমন্ত্র (১।২।৯)

মন্ত্র—নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া
প্রোক্তাহ ন্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ।
যাং ত্বমাপঃ সত্যধৃতির্বতাসি
ত্বাদৃঙ্‌নো ভূয়ান্নচিকেতঃ প্রষ্টা॥

অর্থ—হে প্রিয়তম, এই মতি তর্কের দ্বারা লভ্য নহে। তার্কিক ভিন্ন "অন্য" দ্বারা উপদিষ্ট হইলেই সুজ্ঞান লাভ হয়। নচিকেতা, তুমি সত্য ধৃতিবান্‌। তোমার মত প্রশ্নকারী যেন আমাদের কাছে আসে।

ব্যাখ্যা—এই মন্ত্রে আত্মাকে কি প্রকারে লাভ করা যায় তাহা বলা হইতেছে। প্রথম পঙ্‌ক্তিতে বলা হইল যে বাদানুবাদ (socratic method) দ্বারা এ কাজ সম্ভব নহে। 'যিনি তার্কিক নন, যিনি তত্ত্ব হিসাবেও ব্যবহারিক জীবনে (in theory as well as practice) আত্মা ছাড়া কিছু জানেন না, অর্থাৎ আত্মাকেই সুচারুভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনিই তাঁহার অনুরাগও বীতরাগে ইঙ্গিতের মত তাহা ব্যক্ত করিতে পারিবেন অর্থাৎ অনুমোদন বার্ত্তা দিতে পারিবেন। তৃতীয় পঙ্‌ক্তিতে ঘোষণা করা হইল যে নচিকেতা আত্মাকে জানিয়াছেন বলিলে কম বলা হইবে, তিনি আত্মাকে চিনিয়াছেন সত্যের সাহায্যে ও ধৃতি দ্বারা (by adherence to truth) এবং সেই উপলব্ধি হইতে বিচ্যুত হইতে চান না। চতুর্থ পঙ্‌ক্তিতে যম বলিতেছেন এক্ষণে তাঁর নিকট হইতে শুধু অনুমোদন (verification) পাবার জন্য নচিকেতা সচেষ্ট, আর কিছু নয়, এবং এইরূপ প্রশ্নকারী শিষ্যই আদরণীয়।

আত্মজ্ঞানের পথগুলি জানা হইল। কিন্তু সবচেয়ে বড়কথা যমরাজ এইমন্ত্রে সর্ব্বপ্রথম নচিকেতাকে প্রেষ্ঠ বা "প্রিয়তম" বলিয়া সম্বোধন করিলেন। নচিকেতা হইলেন যমের প্রেয় এবং যম হইলেন নচিকেতার শ্রেয়। এইরূপ যুগলমিলন যেখানে হয় সেই খানেই আত্মার প্রসার উপলব্ধ হয় এবং উভয় পক্ষ একযোগে সংসারেই আত্মধাম প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন। প্রেয় এবং শ্রেয়ের এই অভেদ ভাব আত্মার রাজ্যের আভূষণ। নচিকেতাকে শিষ্য হইবার জন্য শ্রেয়ের পানে যাইতে বলা হইয়াছিল। অথচ যমরাজ মনে মনে শিষ্যকে কাছে পাইবার জন্য তাহাকেই প্রেয় বলিয়া জানিতে ছিলেন; তাহা এক্ষণে সুস্পষ্ট হইল। অতএব আমরা বলিব শিষ্য শ্রেয়ের জন্য আকুল হ'ন কিন্তু গুরু যেন শিষ্যরূপ প্রেয়ের জন্য পাগল হ'ন। তবেই আত্মার অনুসন্ধান সার্থক হয়।

এইরূপ হইলে আত্মা সেখানে সৎবুদ্ধি রূপে প্রকাশ হ'ন উভয়ের অন্তরে। বুদ্ধি উভয়ের মধ্যে বিকশিত হয় শূন্যতার দিকে। বুদ্ধি যোগ হইলে বুঝিতে হইবে, যিনি সৎ তিনি উভয় অঙ্গে কৃপা করেছেন পূর্ণতা লাভের জন্য। সেই পূর্ণতা যে

গুরুর নিকট হইতে প্রকট হইবে, জানিতে হয়, তাঁহার মধ্যে সৎ যিনি তিনি পূর্ব্ব হইতেই শিষ্যের জন্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। তাই সাধারণতঃ বলা হয়, শিষ্যের বুদ্ধি থাকা চাই এবং গুরুর সৎ-বুদ্ধি থাকা চাই। কিন্তু যম পূর্ণ সত্যটি প্রকৃত আচার্য্যের মত জানাইয়া দিলেন যে গুরু ও শিষ্য উভয়ের সৎবুদ্ধি থাকা চাই।

উভয়পক্ষের সৎবুদ্ধি থাকিলে, উপদেশের কৌশলেরও প্রয়োজন হইবে না। আত্মা যেমন "ঈক্ষণ" দ্বারা জগৎ সম্পর্ক সৃষ্টি করেন, সেইরূপ গুরু দৃষ্টি দ্বারা শিষ্যের মধ্যে চক্ষুদান করিতে পারেন। বহুদিনের সাক্ষাৎ বা জানা শোনার প্রয়োজন হয় না। অনেক চিঠি পত্র বা ধর্ম্ম পুস্তকের ভার কোন পক্ষকেই বহন করিতে হয় না। কেবল গভীর ভাবে নিরীক্ষণ করিলে, সতৃষ্ণ নয়নের দৃষ্টি পাত হইলেই সেই শুভ দৃষ্টিতে গুরু ও শিষ্যের হৃদয়ের আদান প্রদানের সঙ্গেই নূতন জগতের নির্ম্মাণ আরম্ভ হয়। দিব্য ধামের যাত্রীদের দৃষ্টির মধ্যে যে ভাষা ও ভাব থাকে তাহাকেই আধ্যাত্মিক ভাষা ও ভাব বলিয়া জানিতে হয়। তাহারই বিনিময় সে দেশে চলে, একজনের আর একজনের সঙ্গে। কারণ মূলতঃ তাহারা অভিন্ন, একই পরমাত্মার যুগলরূপে আবির্ভাব।

এইরূপ দৃষ্টির মধ্যে মোহ নাই, কামনা নাই, লোভ নাই, মান অভিমান নাই, আছে শুধু আত্মদানের প্রাচুর্য্য। গুরু শিষ্যের নিকট আত্মদান করেন, শিষ্য গুরুর কাছে আত্মদান করেন। সে দেশ ধন্য হয়, যেখানে এইরূপে গুরু শিষ্যের মহামিলনে, পরমাত্মার সুর দেশবাসীর শ্রবণে ও জ্ঞানে নূতন স্রোতে প্রবাহিত হয়।

(ক্রমশঃ)

ওরা কুলী ওরা রেজা *

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

গড়ছে ওরা গড়ছে
পৃথিবীটা ওরা গড়ছে,
ভাঙছে পাথর ভাঙছে,
দুর্গমে পথ ভাঙছে
গ্রামেতে নগর,
বনেতে গ্রাম
নিত্যই ওরা গড়ছে।
চৈত্রের রোদ শ্রাবণের ধারা
মানে না গো ওরা মানে না,
বাধা বিপদের সামনে দাঁড়াতে
এতটুকু ভয় জানে না।

ওরা কুলী, ওরা রেজা
প্রাণের আবেগে তাজা,
যাহা পায় তাই খেয়ে বেঁচে রয়
আরো দাও বলে কাঁদে না।
শত যাতনার মাঝেও ওদের
হাসতে কখনও বাধে না।

গড়ছে ওরা গড়ছে,
রিক্ত ধরার শূন্য কুটীর
ধান্যে শস্যে ভরছে,
অনটনে আর অনাদরে কত
ঘরে ঘরে, ওরা মরছে।

কোন ম্যানেজার ইনজিনিয়ার
গঠনে করেছে সরদারি,
তার নাম লেখা ফলকে ফলকে.
রয়েছে ধরায় বিস্তারি।

কত কুলী কত রেজা যে মরেছে
বন-পাহাড়ে প্রান্তরে,
তার খতিয়ান আছে বল কোথা,
কেবা জানে তার অন্ত রে?

* মধ্যপ্রদেশের মেয়ে-কুলিদের রেজা বলে।

অমরতীর্থ অমরনাথ

শ্রীনরেশচন্দ্র বসু

তুষারতীর্থ অমর নাথ। কত আসা, কত আকাঙ্ক্ষার উদয় তোরণ। কত সাধু কত তপস্বীর পদরেণুতে পূর্ণ—অমরনাথ। কেদার বদরীর স্থায় বৎসরের ছয়মাস দর্শনের সময় নয়, শ্রাবণী পূর্ণিমায় একটি দিন মাত্র দর্শন—তারপর নিশ্চল, নিথর প্রস্তরের বুকে জাগে না সাড়া, পথ মুখরিত হয় না যাত্রীর কোলাহলে, অশ্বের হ্রেষারবে।

১৯৬৬-র অগাষ্ট। কাশ্মীর সরকারের প্রচার বিজ্ঞপ্তি অনুসারে এই বৎসর পথ ভালো থাকায় পুরা অগাষ্ট মাস অমর নাথের পথ খোলা থাকবে। এই সুযোগ ছাড়তে মন রাজী নয়। সহধর্মিণী দুর্গম বিপদ সঙ্কুল পথে পা বাড়াতে রাজী নন্, বিশেষতঃ পাঁচ বৎসরের কন্যার কথা চিন্তা করে। কিন্তু আমি যে শুনি সারা আকাশে বাতাসে তাঁর নিমন্ত্রণ। মন আবদ্ধ হয়ে থাকতে চায় না ঘরের মধ্যে, তাই ভেসে পড়ি একাই দুর্গমের হাতছানিতে, আত্মীয় পরিজন বন্ধু বান্ধবদের শত বাধা নিষেধের গণ্ডীকে উপেক্ষা করে। ব্যতিক্রম আশ্চর্য্যরকম ছোট মাসীমা। আশীর্বাদ করে বলেন মন যখন যাবার জন্য ব্যাকুল হয়েছে তখন ঘরের কথা, সংসারের কথা চিন্তা করিস্ না। যেটুকু ইতস্ততঃ করছিলাম, মাসীমার কথায় সেইটাও মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিলাম। এবং একেবারে শেষ মুহূর্ত্তে অর্থাৎ যাত্রার আগের দিন এক ভাইপো সমীর কুমার ঘোষ ওরফে কাকু ও তার বন্ধু নিরঞ্জন ভৌমিক আকস্মিক ভাবে আমার সঙ্গী হয়ে ট্রেনে উঠে বসলো।

২২শে অগাষ্ট শিয়ালদহ থেকে পাঠানকোট এক্সপ্রেসে যাত্রা। পথের সঙ্গী ট্রেনের সহযাত্রী শিকদার বাগান ষ্ট্রীটের মিঃ ভাদুড়ী ও তাঁর স্ত্রী এবং তাঁর এক ভাই ও তার স্ত্রী। এই সর্বপ্রথম চিন্তার অবধি নেই। মিথ্যা স্তোক বাক্য দিয়ে লাভ নেই, তাই বলি এই পথ দুর্গম শুনেছি এবং তার জন্য প্রস্তুতও হয়ে এসেছি, কিন্তু কি কি নতুন উপসর্গ দেখা দেবে তা এই পথে বলা শক্ত। ২৪শে অগাষ্ট ভোরবেলা পাঠানকোট পৌঁছাই। ষ্টেশনের বাইরেই সরকারী ও বেসরকারী বাস-যাত্রীদের নিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত। যাঁরা ট্রেন ভাড়ার সঙ্গে বাসের ভাড়াও জমা দিয়েছেন তাঁদের জন্যই কেবলমাত্র সরকারী বাসের ব্যবস্থা।

সেকালে কাশ্মীরে যাবার অনেকগুলো পথ-ছিল, সেগুলো এখন সব পাকিস্থানের মধ্যে। সুতরাং আমরা যে পথ দিয়ে যাব, সেটা নতুন তৈরী করতে হয়েছে। জম্মু অবধি রেল লাইন ছিল। সেটাও এখন বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে গেছে। তার বদলে বাস হয়েছে। প্রচলিত নিয়মানুসারে পাঠানকোট থেকে শ্রীনগর। সেখান-থেকে পহলগাঁও। কিন্তু এইবৎসর পাঠানকোট থেকে পহলগাঁও এর জন্য সরাসরি বাসের ব্যবস্থা হওয়ায় এই সুযোগ গ্রহণ করলাম। ফলে সময় ও অর্থ দুটোরই সাশ্রয় হোল।

পাঠানকোট থেকে যখন বাস ছাড়লো তখন প্রায় ৯টা। পথ এ দিকে সমতল। মাঝে মাঝে সামরিক গাড়ী আমাদের অতিক্রম করে যাচ্ছে। কোন কোন জায়গায় ভারতের সব প্রজেক্টের মডেল তৈরী করে রাখা হয়েছে। গাড়ী একটা সেতুর ওপর দিয়ে চললো। তলায় শুকনো নদীর বুকে অঢেল নুড়ি। শুনলাম এই "রাভী"। বাস ছুটে চলেছে। তার আগে আগে মন। মাঝে মাঝে সেনা নিবাস। বেলা প্রায় সাড়ে বারোটায় জম্মু। মধ্যাহ্নের স্নান আহারের জন্য প্রায় এক ঘণ্টার বিরতি। পুনরায় যাত্রা। মাঝে মাঝে বাস

তৈরী করা হচ্ছে। আমাদের বাসে সিকদার বাগানের ভাদুড়ী দম্পতি ছাড়া বিহারের একলক্ষ পতি চলেছেন, সঙ্গে এক মোসাহেব। হঠাৎ একটা পাহাড় ফাটলো আমাদের বাসের সামনে। মোসাহেবতো ভয়ে এক লাফে বাসের সামনে। কিন্তু সকলে হেসে ওঠায় বল্লেন লালাজী কি রকম ভয় পেয়েছিল, সেইজন্যই না লাফিয়ে তাঁকে ধরতে গিয়েছিলাম। এই মোসাহেবের লা-লা-জী-ঈ ডাকটা এখনও কানে বাজে। কুর্দে বৈকালিক চা পানের জন্য বাস থামলো, তখন ঘড়িতে ৪টে বাজে। আধঘন্টার পর বাস আবার চল্ল। টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি হচ্ছিল, এখন অঝোরে ঝরছে। বাটোটে যখন পৌঁছুলাম তখন সূর্য্যের আলো ম্লান হলেও একেবারে মুছে যায়নি। রাত্রি-বাস আজ এখানে। সাধারণতঃ যাত্রীরা কুর্দে অথবা বাটোটে রাত্রিবাস করেন। কুর্দের জল হাওয়া খুবই স্বাস্থ্যকর। এখানে বন্দী করে শেখ-আবদুল্লাকে রাখা হয়েছিল। এ খবর শোনালেন বাসের ড্রাইভার শম্ভুসিং। কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ ড্রাইভারী করছে বলে পরিচয় দিতে লজ্জা পায়। গাল গল্পে কখন আমাদের অন্তরঙ্গ হয়ে গেছে বুঝতেও পারি নি। বাটোটে বাস থামতেই কাকু ছুটলো রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করতে। ভালো ডাক-বাঙলো আছে। থাকবার অসুবিধা নেই, কিন্তু খাবারের ব্যবস্থা বাইরের হোটেলে করতে হোল। পরদিন চা পানের পর যাত্রা। চীনাব নদীর ওপর সামরিক কর্তৃপক্ষ নতুন পুল তৈরী করেছেন। বাস সেই পুল পার হয়ে এসে থামলো রামবাণ পাহাড়ের পাদদেশে। পুলের ফটো নেওয়া নিষেধ বলে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া আছে। চীনাব নদীতে প্রচুর কাঠ ভেসে যেতে দেখলাম। শুনলাম জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে চিহ্ন করে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। মালিক সেই চিহ্ন ধরে সংগ্রহ করে নেয়। আধ-ঘন্টার পর বাস ছাড়লো। এবার এলো সেই বিখ্যাত বানিহাল টানেল। নতুন বানিহাল সুড়ঙ্গ ৭২০০ ফুটের মাথায়। পথ কমে গেছে ১৮ মাইল। এই নতুন সুড়ঙ্গের আগে আরও ওপর দিয়ে যাবার পথ ছিল।

কিন্তু বরফে বেশীর ভাগ সময় সেইপথ ঢাকা হোক ঘড়ি ধরে এই সুড়ঙ্গটুকু পার হতে পুরো পাঁচ মিনিট লাগলো। গাড়ী যখন একদিক দিয়ে ঢোকে অপর দিকের মুখে লাল আলো জ্বালিয়ে অন্য গাড়ীর প্রবেশ নিষেধ করা হয়। ভেতরে হলদে আলো জ্বলায় রাস্তা দেখবার সুবিধা হয়। পাহাড়ের গা দিয়ে দু'ধারে অঝোরে জল পড়ছে। গাড়ি এসে এবার থাম্‌লো ইসলামাবাদে, এখানে কাশ্মীরী জিনিসপত্র বিক্রি হচ্ছে দেখলাম। সহরের সব কিছুই ইসলামাবাদে লভ্য। মধ্যাহ্ন ভোজের পর পুনরায় যাত্রা। বেলা ৩টায় পহল গাঁও এ পদার্পণ।

পহল গাঁও। প্রথম গ্রাম, না দুস্তর প্রস্তরের বেড়া ডিঙিয়ে মেষ পালকের যেখানে সাক্ষাৎ মিলতো—সেই মেষ পালকদের গ্রাম। নীল বর্ণা লীডার নদীর তীরে ছোট্ট সহর পহলগাঁও। চোখে কল্পনার কাজল মেখে দেখা নয় সত্য সত্যই পহল গাঁও অপরূপা। প্রস্তরে প্রস্তরে গগন ভেদী গর্জনে সফেন উন্মত্তধারায় বয়ে চলেছে লীডার নদী, জল তার নীল বর্ণ। নীল ধারা থেকে লীহ্ধার তা থেকেই লীডার কি? সে প্রশ্নের জবাব ভাষাতত্ত্ব-বিদদের জন্য তোলা রইল। যাই হোক বহু দেশ পর্য্যটনকারীর মুখেও পহলগাঁও এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনেছি।

পরবর্ত্তী কাজ টুরিষ্ট অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করা। পূর্বেই আমাদের প্রয়োজনীয় তাঁবু, মাল বইবার কুলি, চেয়ার ইত্যাদির জন্য চিঠি দেওয়া ছিল। তার উল্লেখ করতেই অফিসার বল্লেন পাশেই অনেক দোকান আছে। আপনাদের প্রয়োজন মত জিনিস দেখে নিন। পার্শ্বের সহযাত্রীটি বললেন আমি যে টাকা পাঠিয়েছিলাম মাদ্রাজ থেকে? অফিসারটি বললেন—টাকা ফেরৎ নিয়ে নিন। তিনি বললেন আপনারা ব্যবস্থা করে রাখবেন বলেই টাকা পাঠিয়ে ছিলাম, নইলে আপনারা সহরে পাওয়া যাবে বলে বিজ্ঞপ্তি দিলেই পারতেন, শুধু শুধু যাত্রীদের এ হয়-রানির প্রয়োজন ছিল না। বিভিন্ন যাত্রীদের নানান অভিযোগ। সুতরাং উপায়ান্তর না দেখে নেমে পড়লুম পথে। দুধারেই ভাড়া দেবার জিনিসের দোকান। একটি দোকান থেকে ডবল ফ্লাই তাঁবু (১০´×১০´) ২০, টাকা হিসাবে দুটি ৫´×৫´ ত্রিপলের টুকরা ৫, লিঃ ১০, টাকা দিয়ে ভাড়া

বলতেই বললো, যারা পহলগাঁও এ লীডারের ধারে থাকে তাদের জন্য ঐ সব ভাড়া দেওয়া হয়. অমর নাথ যাত্রীদের নয়। ট্যুরিষ্ট অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করেও ব্যর্থ হই। সুতরাং ঐগুলি ঘাড়ে করে লীডারের একেবারে কিনারায় আস্তানা গাড়লাম। একজন কুলি এসে তাঁবু টাঙিয়ে দিয়ে গেল। কাকু ও নিরঞ্জনের খুব উৎসাহ। ওরা টাঙ্গাবার কলা কৌশল দেখে নিল। কারণ দু'দিন পর থেকেই নিজেদের রোজ তাঁবু খাটাতে ও তুলতে হবে। আগে থেকেই রিহার্সাল দেওয়া সুরু হোল। ত্রিপলের টুকরা দু'টির ওপর হোল্ড অল বিছিয়ে বিছানা. নতুবা মেঝের ঠাণ্ডায় অসুখের সম্ভাবনা। পহলগাঁওএ বেশ শীত। নদীর জল বরফের মত ঠাণ্ডা, হাতে বেশীক্ষণ রাখলে হাত অসাড় হয়ে যায়। বহু যাত্রী আমাদের মত তাঁবুর মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে। কারণ হোটেলের এত অত্যধিক চার্জ যে সাধারণের ক্ষমতার বাইরে। তাঁবুতে বিছানা বিছিয়ে চুপচাপ শুয়ে শুয়ে নদীর বিভিন্ন ভঙ্গীমার নৃত্য দেখি আর কুলু কুলু ধ্বনি নয় ভীম গর্জনে তার আর্ত্তনাদ শুনি। একজন তাঁবুতে মালপত্তর পাহারা দেয়, বাকিরা পাঞ্জাবী হোটেলে রাত্রের আহার সেরে আসে। টিপ্ টিপ্ বৃষ্টির বিরাম নেই।

পরদিন ঘুম ভাঙালো আজানের শব্দে। বাইরে বেরিয়ে দেখি সকালের মিঠে রোদ সারা জায়গায় তার আসন পেতেছে। তাড়াতাড়ি উঠে ভিজে জামা কাপড় রোদে শুকুতে দিই। অগণিত যাত্রী নদীর জলে স্নান করছে, জামা কাপড় পরিষ্কার করছে। বিভিন্ন ব্যাপারী শাল, আপেল, গহনার পাথর নিয়ে তাঁবুতে তাঁবুতে বিক্রি করছে। প্রাতঃকৃত্যাদি সারার পর কাকু ও নিরঞ্জন চা খেতে হোটেল গেল। ফিরে এসে খবর দিল একটী মাল বইবার জন্য ঘোড়া ৫০৲ দিয়ে ও একজন কুলি ৩০৲ দিয়ে ভাড়া করে টাকা জমা দিয়ে এসেছে। রাস্তায় রাস্তায় যাত্রীর ভিড়। কেহ ঘোড়ায় চাড়ায় অভ্যস্ত হচ্ছেন, কেহ বা কেডস্ পরে হাঁটছেন। শুকনো ফল, মিষ্টি অর্থাৎ এলাচদানা জাতীয় জিনিস, মেওয়া, আখরোট, শুকনো নারকেল ইত্যাদি পূজার সামগ্রী হিসাবে বিক্রি হচ্ছে। অনেকটা কোলকাতায় পূজার বাজারে পাট বসে গেছে। মাইকে বার বার ঘোষণা করা হচ্ছে যে শুভযাত্রা আগামী ২৭শে অগাষ্ট প্রত্যূষে সাড়ে তিনটার সময়। ছড়ি সাহেব ঐ সময় যাত্রা করবেন। সকলেই যেন প্রস্তুত থাকেন। প্রত্যেকেই যেন চাল, ডাল আলু পেঁয়াজ কেরাসিন তেল, মোমবাতি ইত্যাদি সঙ্গে রাখেন। কারণ পথে কিছুই পাওয়া যাবে না। যাদের সঙ্গে বেশী টাকা আছে তারা নিকটস্থ ব্যাঙ্কে জমা রাখতে পারেন। সামান্য অর্থের পরিবর্ত্তে অমর নাথের পথের অপ্রয়োজনীয় জিনিস পত্র ট্যুরিষ্ট ব্যুরো অফিসে জমা রাখা যায়। মোবাইল ভ্যান থেকে মাইকে বার বার ঘোষণা করা হচ্ছে কখন কি ভাবে যাত্রা হবে। মালপত্র কি ভাবে রাখবেন। চোরেদের থেকে সাবধানে থাকবেন। তাঁবু খালি রেখে কেউ যাবেন না ইত্যাদি। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ছড়ি যা সঙ্গে যাবে গোছগাছ করে বাকি সব ট্যুরিষ্ট অফিসের জমা দিয়ে এলাম। যাত্রার জন্য মনেরও একটা প্রস্তুতি আছে। আমরা দেহমন সব দিক দিয়ে প্রস্তুত হয়ে পরদিবসের প্রতীক্ষায় রইলাম। কি ভীষণ উত্তেজনা, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। কাকুকে আগেই বলেছিলাম যে রাত সাড়ে তিনটার সময় বেরোতে পারব না। সকাল হলে চা-টা খেয়ে যাত্রা করব। যাত্রীরা কবে কোথায় থাকবে তার নির্দিষ্ট তালিকা পূর্বেই প্রকাশ করা হয়। সরকার হতে সেই ভাবেই সামরিক সৈন্য পুলিশ ডাক্তার, আলো ও অন্যান্য জিনিসের ব্যবস্থা রাখা হয়। যাত্রীরা নির্দিষ্ট দিনে না পৌঁছাতে পারলে সমূহ বিপদ। কারণ সকালে একটা পুরো সহর বসলো, পরদিন সকালেই সেই সহরকে ভেঙে যাত্রা। বিলম্বে বা অগ্রে গমনের অর্থই কোন জিনিস না পাওয়া ও পথঘাটে বিপদের সম্ভাবনা। স্বামী বিবেকানন্দ এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে কি বিস্ময়কর এই ক্যান্‌ভাস্ সহর যা প্রত্যেক বিশ্রামস্থলে গজিয়ে ওঠে আর ভোরের সঙ্গেই মিলিয়ে যায়।

শনিবার দ্বাদশী তিথি। পহলগাঁও থেকে যাত্রা সুরু হোল। রাত ৩॥ টায় ছড়ি সাহেব যাত্রা করলেন। তাঁর যাত্রার সঙ্গে কাড়া, নাকাড়া,

না করলেও, উঠে অন্ধকারের মধ্যেই প্রাতঃ-কৃত্যাদি সেরে ফেলতে বেড়িয়ে পড়লাম। কারণ বিছানায় শুয়ে থাকলেও ঘুম আর আসবে না। ফর্সা হোল, মাল পত্র বেঁধে বসে আছি কুলি বা ঘোড়াওয়ালার দেখা নেই। তাঁরা এলেন প্রায় সাড়ে সাতটায়। ঘোড়ার পিঠে তাঁবু ও বেডিংটা চাপিয়ে দিলাম। কুলির মাথায় আমাদের খাবারের জিনিস-পত্র ও একটা স্যুটকেশ, চাপিয়ে দিলাম। কিন্তু কুলি বল্ল এত ভারী জিনিস পত্র সে একা নিয়ে যেতে পারবে না শেষ মুহূর্তে অনন্যোপায় হয়েই আর একটা কুলি করলাম। কেদার বদরী পথের ন্যায় এখানের কুলীরা সেই রকম কষ্ট সহিষ্ণু নয় এবং বেশী মালের অজুহাতে পথে দেরী করাটাও এদের স্বভাব। প্রায় আটটার সময় অমরনাথজীর নাম স্মরণ করে যাত্রা করা গেল। ঐ সব মাল ছাড়াও আমার সঙ্গে ছুটো ক্যামেরা, থার্মোস, কাকুর পিঠে হ্যাভার স্যাকে ওষুধ পত্র, নিরঞ্জনের কাঁধে জলের বোতল ও দুরবীণ। কাকুর ও তার বন্ধু নিরঞ্জন একত্রে গল্প করতে করতে এগোতে লাগলো, আমি পেছনে আস্তে আস্তে চল্লাম। কেউ ডাণ্ডী করে, কেউ ঘোড়ায়, কেহ বা পদব্রজে চলেছে। সকলেরই লক্ষ্য পরবর্ত্তী আস্তানা—চন্দনবাড়ী। মাঝে মাঝে ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। ছোট ছোট গ্রাম পথের প্রান্তে। মাটি লেপা কুঁড়ে ঘরের মধ্য থেকে লাল টুক্ টুকে আপেলের মত রঙ আর রঙীন পোষাক পরে মেয়েরা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখছে। এক ভদ্রলোক ঘোড়ায় করে যাচ্ছিলেন হঠাৎ কি হোল ঘোড়া যাত্রীকে মাটিতে ফেলে দিল। ভদ্রলোক অল্পের জন্য খাদে পড়া থেকে বেঁচে গেলেন। সাবধানে চলেছি। ডাণ্ডীর হাত থেকে বাঁচিয়ে ঘোড়ার কাছ থেকে শত হস্ত না হলেও দূরে দূরে হাঁটছি। একটা পাকদণ্ডী দিয়ে উঠতে গিয়ে ঠোক্কর লেগে থার্মোস টা ভেঙে গেল। কাকুদের দেখতে পাচ্ছি না। ওরা দৃষ্টির বাইরে চলে গেছে। জলতেষ্টা পাচ্ছে। জলের বোতল নিরঞ্জনের কাছে। তৃষ্ণায়, ক্ষুধায় রাগে ব্রহ্মতালু জ্বলে যেতে লাগলো। সঙ্গে যে আপেল ছিল তাই খেলাম। আশ্চর্য্য রকম জলতৃষ্ণা কমে গেল। এখানে কেদার বদরীর মত মাঝ পথে থামবার উপায় নেই। ধুঁকতে ধুঁকতে ১৩ কিলোমিটার পার হয়ে দূরে চন্দন বাড়ীর লাল টালি দেওয়া ঘর দেখতে পাই। আর দেখি নদীর উপর একটি ছোট্ট সাঁকোর ওপর কাকু বসে আছে। আমায় দেখে বল্লে—তোমার জন্যই অপেক্ষা করছি। তাঁবু খাটিয়ে রান্না শেষ করে নিরঞ্জনকে বসিয়ে রেখে এসেছি। এই হাজার হাজার তাঁবুর মধ্যে আমাদেরটা খুঁজতে কষ্ট হবে বলে এইখানে অপেক্ষা করছি। তাঁবুতে এসে যে টুকু মেজাজ গরম হয়েছিল, গরম হরলিকস ও তারপর ঘি দিয়ে ভাত খেয়ে তা ঠাণ্ডা হোল, কাকু-দের ওপর রাগ হলেও বকতে পারলাম না। বৃষ্টির বিরাম নেই। তার মধ্যেই একবার পলকের জন্য রোদ উঠলো। ঘুরে ঘুরে আসপাশটা দেখে এলাম। কুণ্ডু বাবুর যাত্রীদের জন্য ঐ ঝড় জলের মধ্যেও ছাঁকা তেলে আলু ভাজা হচ্ছে দেখে লোভ লাগতে লাগলো। তাঁবুর পর তাঁবু—পা বাড়াবার উপায় নেই। তারপর প্রাতঃকৃত্যাদি সারবার জন্য জায়গার অভাবে স্ত্রী পুরুষ লাজ লজ্জা বিসর্জন দিয়ে যে যেখানে পারে বসে যায়। ফলে তাঁবুর মধ্যেও গন্ধে টেঁকা ভার। বাইরে বেরোলে মেপে মেপে পা ফেলতে হয়। এই অসুবিধাটা চন্দন বাড়ীতে যতটা ভোগ করেছিলাম অন্যত্র ততটা নয়। কারণ যাত্রীদের থেকে একটু দূরে থাকতাম। খাওয়া দাওয়ার পালা চুকলে বিছানায় শুয়ে পড়-লাম। আজকে রাতের মত নিশ্চিন্দ।

রবিবার, ত্রয়োদশী তিথি। সকাল ৭টার মধ্যেই প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। আজকে যাত্রার অন্যতম কঠিন পরীক্ষা 'পিস্থুর চড়াই' পার হওয়া। এর সম্বন্ধে এত লোকের কাছথেকে এতো বেশী শুনেছিলাম যে পিস্থুর চড়াই পার হওয়ার সময় কিন্তু অতটা কঠিন ব্যাপার বলে মনে হয় নি। পাহাড়ে ওঠবার পথে নরম মাটি, ছোট ছোট পাথরের টুকরো ছড়িয়ে আছে। সেই পাথরে পা পড়লে পা হড়কাতে বাধা আর তার অর্থই একে-বারে খাদে নেমে যাওয়া। বিশেষ করে যারা ঘোড়ায় চেপে যাচ্ছেন তাদের করুণ অবস্থা দেখলে দুঃখও হয়, হাসিও পায়। দুঃখ হয় কি বিপদ-জনক অবস্থার মধ্য দিয়ে তাঁরা এক পা এক পা করে এগোচ্ছেন, আর হাসি পায়, মৃত্যু ভয়ে তারা কেউ ঘোড়ার গলা দু'হাতে জড়িয়ে ধরছেন,

কেউবা ভয়ে ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে পদব্রজে ওঠবার চেষ্টা করছেন এবং তাঁদের অসহায় দৃষ্টি ও হাস্যকর পরিস্থিতি উপভোগ করবার মত। আমরা যতদূর সম্ভব এই পথ ত্যাগ করে ছোট ছোট গাছের ডাল ধরে, অনেকটা বাঁদরের এক ডাল থেকে আর এক ডালে লাফ দেওয়ার মত উপরে উঠতে লাগলাম। এতে পরিশ্রম একটু বেশী হলেও তাড়াতাড়ি পৌছে গেলাম, প্রায় পাঁচহাজার ফুট ওপরে একটা উপত্যকায়। সেখানে একটু বিশ্রাম করে আবার চলতে শুরু করলাম। পথ যদিও সমতল এবার তবে সঙ্কীর্ণ ও সুদীর্ঘ। এই উপত্যকাটিকে "যোজপাল" বা যশপাল বলা হয়। ঘাসে ঘাসে ফুল ফুটেছে। ছোট্ট ছোট্ট নাম-না-জানা ফুল, কিন্তু তাদের রঙের বাহার মনকে টানে। এখন মাটির ওপর দিয়েই হাঁটছি। একদিকে খাড়া পাহাড়, অন্যদিকে বিরাট খদ। মধ্যখানে ৮।১০ ফুট চওড়া রাস্তা। কিন্তু রুক্ষ প্রান্তর ছাড়া সামনে কিছু দৃষ্টি গোচর হচ্ছে না। পিঁপড়ের মত সারি সারি লোক চলেছে। গতকাল কাকুরা এগিয়ে যাওয়ায় খুব অসুবিধা হয়েছিল। আজ ওরা এগিয়ে গেলেও একেবারে দৃষ্টির বাইরে যাচ্ছে না। হাত নেড়ে ইসারা করলে এগোচ্ছে নয়ত আমার জন্য অপেক্ষা করছে। এই ভাবে এগোতে এগোতে হঠাৎ যেন দিগন্তের পূর্বদ্বার খুলে গেল। চোখের সামনে মস্তকে তুষার কিরীট পরে নগরাজ হিমালয়, আর তার পাদদেশে নীলাভ বর্ণ বিশাল হ্রদ। একটি তুষার নদী হ্রদে নেমেছে, আর একটি বেরিয়ে গেছে হ্রদ থেকে। পাহাড়ের কোলে হ্রদের পাঁচটি মুখ। কেউ কেউ বাসুকির পাঁচ মাথার সঙ্গে এর তুলনা করে বলেন যে বাসুকি এখানেই ছিলেন। বহু যাত্রী স্নান করতে নেমে গেলেন প্রায় এক মাইল উৎরাইয়ের পথে। কিন্তু পিঠে ভারী ক্যামেরা নিয়ে ঠিক সাহস হোল না সেই জল স্পর্শ করে আসতে। দু'একজন সাধকের ভ্রমণ বৃত্তান্তের মধ্যে পড়েছি তাঁরা এই জলে সাপ বিচরণ করছে দেখেছেন। সে কথা কতদূর সত্য জানি না।

খুব হাওয়া দিচ্ছে। বেশ শীত করছে। এই অবস্থায় বায়ুযানে এসে পৌছালাম। শেষ নাগ থেকে বায়ুযান প্রায় দেড় মাইল দূরত্বে অবস্থিত। ঘড়িতে তখন প্রায় দুটো। কাকু তাঁবু টাঙাবার জায়গা পছন্দ করে জিনিস পত্র রেখে নিরঞ্জনকে বসিয়ে ফিরে এল। বায়ুযানে প্রবেশ পথে একটা পাথরের ওপর বসে বসে আমি ক্ষণে ক্ষণে মেঘ ও রৌদ্রের সঙ্গে শেষ নাগের রূপ পরিবর্তন অবাক বিস্ময়ে দেখছিলাম। এই সঙ্গে চোখ রাখছিলাম আমাদের মালবাহীকুলি বা ঘোড়া আসে কি না। সকালেরই সেই এক গ্লাস হরলিকস্ ছাড়া পেটে কিছু পড়েনি। দূরে দোকানে খাবার রয়েছে। কিন্তু তার দাম ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ মনকে সেদিক থেকে দূরে সরিয়ে রাখল। বেলা ৩টা, ৪টে গড়িয়ে ৫টা বাজল। তবু কারুর দেখা নেই। বসে বসে শেষ নাগের শোভা নিরীক্ষণ করি আর মানস পটে ভেসে ওঠে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের কথা। বোধ হয় এই রকম শোভা দেখছিল আমার মতই কোন হতভাগ্য। এদিকে আকাশে যে মেঘ এসে ভিড় করেছে সেদিকে খেয়াল নেই। হঠাৎ মুষলধারে বৃষ্টি নামলো, তার সঙ্গে তুষারপাত। দেখতে দেখতে সেই তুষারপাতে উদ্‌ভ্রান্ত যাত্রারা সমাধিস্থ হোল, চিরদিনের মত। খবর কে পাঠিয়েছিল জানি না, সাহায্য এসে মৃতদেহগুলো টেনে বের করা ছাড়া আর কোন সাহায্যে লাগেনি। সেই থেকে একদল মিলিটারী, ডাক্তার প্রতিবছর আসে যাত্রীদের সঙ্গে। এইসেই বায়ুযান। ঠাণ্ডায় সারা শরীর অবশ হয়ে আসছে। ক্ষিদের জ্বালায় হাতে গড়া গরম রুটি শুধু কিনে খেলাম সন্ধ্যে হয়ে গেল তখনও কারুর দেখা নেই, সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ খাবারের ঝুড়ি, বেডিং ইত্যাদি নিয়ে কুলি দুটো এলো। শুনলুম কর্তৃপক্ষ পিস্যু চটি আগে যাত্রীদের পার করিয়ে, তারপর কুলি ও তারপর ঘোড়াওয়ালাদের ছেড়েছে। ফলে এই বিলম্ব। কিন্তু তাঁবু তো ঘোড়ার পিঠে। তাঁবু এলো যখন তখন প্রায় রাত ৯টা। রান্না কিছু করা যায় নি, ঠাণ্ডা হাওয়ার দাপটে। গ্লাস ভর্তি হরলিকস্ ও বিস্কুট খেয়ে গভীর নিদ্রায় ঢলে পড়লাম। সেই দিন রাত ভোর যাত্রীরা এসেছে। তাঁবু জিনিস পত্রের অভাবে বহু যাত্রীকেই খোলা আকাশের নীচে রাত কাটাতে হয়েছে। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঘুম ভেঙে গেল। উঠে দেখি রাতের তারারা তখনও টিপ টিপ করছে। উঠে পড়লাম।

আস্তে আস্তে ফর্সা হোল। জিনিস পত্র গুছিয়ে নিয়ে কুলি ঘোড়া সব ছেড়ে দিলাম।

আজ সোমবার চতুর্দ্দশী তিথি। বেরোতে যাব এক পাঞ্জাবী মহিলা এসে কেঁদে পড়লেন। তাঁর পেটে অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে। জিজ্ঞেস করতেই বললেন যে ভোরবেলা ঐ বরফগলা নদীতে স্নান করে বেরিয়েছেন। কোন ওষুধ থাকে তো দিতে বললেন। পাশের ভদ্রলোকদের কাছ থেকে এক কাপ গরম দুধ চেয়ে এনে তাতে ব্রাণ্ডি মিশিয়ে খেতে দিলাম, তাতে যন্ত্রণার কিছু উপশম হোল। তখন তিনি বললেন আমরা যদি তাঁকে একটু ওষুধ দিয়ে কিছুক্ষণ সেবা করি তিনি নিশ্চয়ই সুস্থ হয়ে যাবেন। আমাদের বেরোতে এদিকে দেরী হয়ে যাচ্ছে। তখন নিরঞ্জনকে পাঠালাম হাসপাতালে খবর দিতে। নিরঞ্জন ষ্ট্রেচারহই দুটি ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে এল। মহিলাকে সেই ষ্ট্রেচারে তুলে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে ডাক্তারকে সব বলে বেরিয়ে এলাম। ভদ্রমহিলা চীৎকার করতে লাগলেন, বাবুজী! আমাকে ছেড়ে যাবেন না। কিন্তু এ পথে পেছনে তাকালে চলে না। এগিয়ে যেতে হবে। মানুষ বড়ই স্বার্থপর হয়ে ওঠে। আজ কিন্তু কিছুদূর চলবার পরই বুকে ভীষণ কষ্ট হতে লাগলো। মাঝে মাঝে থামি, কাকুরা আমায় উৎসাহ দেয়, আবার পথ চলি কিন্তু যন্ত্রনার উপশম হওয়াতো দূরের কথা আরও বেড়ে যেতে লাগলো। ক্রমে ক্রমে আমরা একটা উঁচু টিলার ওপর এসে দাঁড়ালাম। এর নাম মহাগুনস্, ১৪০০০ ফিট উচ্চে অবস্থিত। এত উঁচুতে অক্সিজেন ছাড়া আসার জন্য নিঃশ্বাসের কষ্ট হচ্ছিল। তাঁবু টাঙিয়ে একটা ছোট হাসপাতাল এখানে তৈরী হয়েছে। প্রয়োজনে লোককে অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে। নির্দেশ দেওয়া আছে যেন যাত্রীরা এখানে অপেক্ষা না করেন, তাড়াতাড়ি এই উচ্চতা থেকেনেমে যান। সুতরাং পাচালিয়েনেমেপড়লাম। এইখানে পাঞ্জাব থেকে আসা একদল কলেজের ছাত্রের সঙ্গে দেখা। তার মধ্যে একজন বাঙালী ছাত্রও ছিল। সারা রাস্তা তারা গল্প গুজবে, নাচে গানে সরগরম করে পথ চলছিল। ক্রমে ক্রমে পথ সরু হয়ে এলো। আর চোখের সামনে এক নুড়ি ভরা, শুকনো নদী দেখলাম। নদীর বিস্তীর্ণ চর পার হয়ে ভৈরব পর্বতের পাদদেশে পৌঁছালাম। এই পঞ্চতরণী। আজ এইখানেই রাত্রিবাস। পঞ্চতরণীতে তাঁবুর মধ্যে বসে যাত্রী প্রবাহ দেখছি। ঘোড়া ছুটিয়ে গুর্জরা আসছে। ঘোড়ার পায়ের ক্ষুরের ধুলোয় সূর্য্য চাপা পড়ে যাবার মত। ইংরাজী ছবিতে যেমন দস্যুদের ঘোড়া ছুটিয়ে ধুলো উড়িয়ে আসতে দেখি—ঠিক সেই দৃশ্য। কোলকাতায় গিয়ে খবর দেব out door shooting এর জন্য। আজ মাইকে আগামী কাল অমরনাথের দর্শন কি ভাবে হবে বারে বারে নির্দেশ দিচ্ছে। ঘোড়া এখানেই থাকবে। ঘোড়ায় করে কেউ আর যেতে পারবেন না। ডাণ্ডী বেলা দশটার পর যাত্রা করবে। ভোর তিনটা থেকে যাত্রীদের যাবার ব্যবস্থা থাকবে। প্রয়োজনীয় কিছু ওষুধ বিনামূল্যে বিতরণ করা হচ্ছে।

মঙ্গলবার, পূর্ণিমা তিথি। আজ রাত তিনটের মধ্যেই উঠে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে নিলাম। সঙ্গে একজন কুলিকে মালবাহক হিসাবে নিলাম বাকি জিনিসপত্র তাঁবু সব ঘোড়াওলা ও আরে-একটি কুলির জিম্মায় রইল। ক্যামেরা দুটো, স্নানের জিনিস, পূজা সামগ্রী, ঘাসের চটি সবকিছু গুছিয়ে নিয়ে রাত চারটেয় বের হয়ে পড়লাম। কিছুদূর যাবার পরই দেখি বিরাট এক লাইন পড়ে গেছে। আস্তে আস্তে এগোতে লাগলাম। দেখি যে একদিকে পাহাড় বরফে ঢেকে আছে অন্য দিকে অতল খাদ। মাঝে দেড়কুট দুফুট জায়গা। বরফে পিচ্ছিল পথ যাত্রীদের মৃত্যুমুখে আহ্বান জানাচ্ছে। খাদের দিকে তিন চারজন মিলিটারী দড়ি ধরে দাঁড়িয়ে যাত্রীদের পথটুকু পার হতে সাহায্য করছেন। মাঝে মাঝে, পা যাতে না হড়কে যায় গাঁইতি দিয়ে পথটুকু কুপিয়ে দিচ্ছেন। আস্তে আস্তে পথটুকু পার হলাম। এইরকম পিচ্ছিল পথ প্রায় একশো ফুট। রাস্তা আজকে সর্বত্র পিচ্ছিল। কোথাও কাদা, কোথাও বরফ। ক্রমে ক্রমে বরফের রাজ্যে এসে পড়লাম। যেন বড় একটা গুহার মধ্য দিয়ে হাঁটছি। চারধারে বরফ। ক্রমে সেই বরফের রাজ্য পার হয়ে এক ক্ষীণকায়া নদীর ধারে এসে পড়লাম। পাথরের মধ্য দিয়ে কুলকুল করে বয়ে চলেছে, এরই

নাম অমর গঙ্গা। দূরে বেশ কিছু লোক স্নান করছে। আমরা বুঝতে পারলাম গুহার কাছে এসে গেছি। সুতরাং একটু দূরেই সেই হাঁটুজলের মধ্যে একটা মগে করে জল তুলে মাথায় ঢেলে স্নান করলাম। প্রথম মগ ঢালবার পর মনে হোল মাথাটা বোধ হয় অবশ হয়ে গেছে। যাই হোক, স্নানের জামা কাপড় কুলির কাছে রেখে ঘাসের চটি পায়ে দিয়ে এগোতে লাগলাম। গুহাটী বেশ একটু ওপরে। যাত্রীরা সার বেঁধে উঠে যাচ্ছে। গুহার তলায় নদীর ধারে বসে তর্পণ করলাম। তারপর তিনজনে গিয়ে ধাকাধাক্কির মধ্যে গুহায় প্রবেশ করলাম। গুহাটা একশো ফুটের মত লম্বা ও ত্রিশফুটের মত চওড়া। শিক দিয়ে গুহার মুখ ঘেরা। একটা শিকের দরজা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করা যায়। গুহাটা দু'ভাগে বিভক্ত। অর্থাৎ ১৫ফুট চওড়া ও ৫০ফুট লম্বা একটা চাতাল, তার ওপর দুটো ধাপ উঠেই আবার একটা চাতাল। প্রথম জায়গায় বহু সাধু সন্ন্যাসী বসে জপ করছেন, হোম করছেন। দ্বিতীয় জায়গায় উঠে দেখি একটা লম্বা বেদী। তার ওপর কয়েক খণ্ড লাল কাপড়ের টুক্‌রো ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ঢাকা দেওয়া আছে। তার ওপর ফুল, বেলপাতা দিয়ে লোকে পূজো করছে। কিন্তু অমরনাথের তুষার লিঙ্গ মূর্ত্তি কৈ? শুনলাম এবার পূর্ণিমা এগিয়ে পড়ায় তুষার লিঙ্গ গলে গেছে! মূল অমরনাথের কয়েক ফুট দূরে গণেশ, ভৈরব, পার্বতীর তুষার লিঙ্গের স্থান। মন হতাশায় ভরে গেল। এতকষ্ট করে এসেও মূর্ত্তিদর্শন হোলনা। যে মূর্ত্তি দর্শন করে স্বামী বিবেকানন্দ নিশ্চল হয়ে গিয়েছিলেন এবং ইচ্ছামৃত্যু বর পেয়েছিলেন সেই মূর্ত্তি অদেখা রয়ে গেল। যাই হোক সঙ্গের পূজা সামগ্রী দিয়ে পূজো, করলাম তারপর তিনজনে একত্রে "শিবাষ্টক স্তোত্র" পাঠ করলাম। ঘুরে ঘুরে একটু দেখে অমর গঙ্গার জল, গুহার খড়ি মাটি ইত্যাদি সংগ্রহ, করে ফটো তুললাম। দুঃখের বিষয় ভীড়ে বৃষ্টির মত জলের ধারার মধ্যে ফটো আশানুরূপ হলো না। এবার ফেরার পালা। আর রইল না এগিয়ে চলার উত্তেজনা। আজই পহল গাঁওএ ফিরে যাব। বেলা ১২টার মধ্যে পঞ্চতরণীতে ফিরে এলাম। খেয়ে দেয়ে বেরিয়ে পড়লাম পহল গাঁওয়ের উদ্দেশ্যে। মহাগুনসে যখন এসে পৌঁছলাম তখন টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি আরম্ভ হোল। আরও জোরে চলতে লাগলেম। সঙ্গে সঙ্গে আকাশ কাল করে বৃষ্টির ধারা নামলো। কাকু, নিরঞ্জন ও আমি তিনজনে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম। আগে থাকতেই স্থির ছিল আবহাওয়াখারাপ হলে বায়ুযানেই আজ রাত্রিবাস করব। অন্ধকারে কখন এসে বায়ুযানে পৌঁছে গেছি বুঝতে পারি নি। হঠাৎ আমার ও কাকুর নাম কেউ চেঁচিয়ে ডাকছে শুনে থমকে গেলাম। টিলাটার ওপর উঠে দেখি নিরঞ্জন। বল্ল প্রায় একঘণ্টা ধরে আপনাদের খুঁজছি। জলে ভিজে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে তারপর কাকুকে খুঁজতে বের হলাম। অনেক কষ্টে প্রায় এক ঘণ্টার পর কাকুকে পেলাম। শুনলাম সে থানায় গেছিল আমাদের জন্য লোক পাঠাবার ব্যবস্থা করতে। থানা থেকে বলেছে আজতো ফেরবার দিন নয়, আপনারা ফিরেছেন কেন? এর দায় দায়িত্ব আমাদের নয়। যাইহোক লোক, দড়ি, টর্চ প্রভৃতি কাকুর সঙ্গে শেষ অবধি থানা থেকে দিয়েছিল। তাদের ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় দিলাম। শীতে মনে হোল শরীরের কোন অংশে সাড় নেই। বারোআনা একটাকা দিয়ে বড় বড় গ্লাস গরম চা গলায় ঢেলেও শীতের কাপুনির হাত থেকে রেহাই পেলাম না। পরদিন শুনলাম গতকালের তুষার ঝড়ে বহু লোক প্রাণ হারিয়েছে। বহু ঘোড়া ঠাণ্ডায় মরে গেছে। পরদিন পুনরায় যাত্রা। পথে বহু ঘোড়া মরে পড়ে আছে দেখলাম। দুই তিনটি মৃতদেহ সামনে দিয়ে নামিয়ে নিয়ে গেল। বেলা ১২টার মধ্যে চন্দনবাড়ী, বেলা ৩টার মধ্যে পহলগাঁও পৌঁছে গেলাম। চন্দন বাড়ীর পর বহু স্থানে যাত্রীদের সরবৎ, পুরি তরকারি দিয়ে অতিথি সেবা করা হচ্ছে। পহলগাঁও-এর প্রায় প্রবেশ পথে এক স্থানে সামিয়ানা টাঙ্গিয়ে পুরি, তরকারি, মিষ্টি, চাট্‌নি প্রভৃতি খুব যত্নের সঙ্গে বসিয়ে খাওয়ানো হচ্ছে। এই এলাহী ব্যাপার দেখে ভেতরে একটু খোঁজ খবর করলাম। একজন কাশ্মীরী লক্ষপতি ব্রাহ্মণ নিজ তত্ত্বাবধানে খাবার করিয়ে অতিথিদের সেবা করছেন। সবচেয়ে ভালো লাগলো তাঁর শুভ্র চেহারার সঙ্গে

শুভ্র মনের পরিচয় পেয়ে। পহলগাঁও থেকে জিনিসপত্র নিয়ে তাঁবু প্রভৃতি ফেরৎ দিয়ে সেই দিনই শ্রীনগরের পথে যাত্রা।

অমরনাথ দেখে এলাম। দেখে এলাম বল্লে ভুল হবে কেন না স্বাভাবিক তুষারলিঙ্গের দর্শন পাইনি। রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুরা যাঁরা আষাঢ় মাসের পূর্ণিমায় গেছিলেন তাঁরা কিন্তু পূর্ণ মূর্ত্তি দেখে এসেছেন। তবে কি চন্দ্রের হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে এই তুষার লিঙ্গের সত্য সত্যই যোগ আছে। জানি না। তবে পথের সৌন্দর্য মনকে ভরিয়ে দিয়েছে। পুনরায় যাবার ইচ্ছে ও এই বিশ্বাস নিয়ে ফিরে এসেছি যা স্বামীজী নিবেদিতাকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন। স্বামীজি নিবেদিতাকে বলেছিলেন যে, তুমি হয়ত বোঝো নি ঠিক, কিন্তু তীর্থযাত্রা তুমি করেছ এবং এর ক্রিয়া চলবে আর ফল তুমি পাবে। পরে তুমি আরও ভাল ভাবে বুঝতে পারবে। যখন ফললাভ ঘটবে।

স্তব্ধ-আঘাত

দিলীপ দাশগুপ্ত

সেই স্বর্গ বহুবার চরণের তলে
ঐশ্বর্যের উপহারে—অনুরাগে—বহু অশ্রুজলে
আমাকে তপস্যা ক'রে গেছে স্তব্ধ হ'য়ে।

দম্ভের তিলক নিয়ে, সর্ব শোক স'য়ে
প্রজ্ঞালোক দীপ্ত তেজে আমি সর্বক্ষণ
নিজে স্রষ্টা হ'য়ে তাই করেছি বপন
আমার সৃষ্টির বীজ : নব স্বর্গধামে
শুনেছি যে জয়ধ্বনি আমারই সে নামে।
কটুগন্ধী কুসুমের মালা কণ্ঠে পরিনিতো নিজে।
তবুতো বাসনা কীট সুন্দরকে ব্যথা দিয়ে কী যে
বিস্মরণ-তীর থেকে ভুলে থাকা অতীতের ব্যথা
জীবন-জোয়ারে এনে অশান্তের দীর্ঘ আকুলতা
ভোলাতে চেয়েছে হায়!
চেয়ে দেখি বসন্তের কান্না ভেঙে যায়
আমার আনন্দ ঘন হাসির আকাশে।
আর চারপাশে
সুধাপাত্র শূন্য ক'রে প্রত্যাখ্যাতা কোন সর্বনাশী
নাগিণীর বিষ ঢেলে হাসে এক মোহময়ী হাসি।

তবুতো অটল আমি। স্বর্গ আর ঈশ্বরের বুকে
সুকঠিন বজ্রঘাত হেনে যাই বিপুল কৌতুকে।
লজ্জাগুলো ছুড়ে দেই—সঙ্গে দেই শুধু অপমান
তাই নিয়ে পাষণ্ডেরা গেয়ে ওঠে প্রেম-জয় গান।

মনের মধ্যে মন

শ্রীসমীরণ রুদ্র

আগের অনেক কিছু চিত্তগ্রাহী জিনিসের মতো আড্ডাও যেন দিন দিনই কমে আসছে। যাক্ সেদিন সন্ধ্যার পর আমরা মাত্র চারজন সভ্য ক্লাবে উপস্থিত ছিলুম—আমি, সারদা, বরদা, এবং অনীশ। শ্রাবণের আবক্ষ জলে আকাশ নক্ষত্রহীন ছিল। আর বাইরে বৃষ্টির নীলাম্বরী সুর। অনীশ একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল "ঘেন্না ঘেন্না যত কেচ্ছা কি বড়লোকের ঘরে? গরিব মানুষেরা ভাই ঢের ভালো। গরিবের ঘরে অত কেলেঙ্কারি নেই। উনপাঁজুড়ে লক্ষ্মীছাড়া এক মাষ্টার ঐ হল ছেলের গৃহ শিক্ষক গো, তারই সঙ্গে কেমন জুটে গেছে দেখগে ঘরের গিন্নী। অনীশ একটা ভাল ফার্মের ইঞ্জিনিয়ার। সে একাধারে জীবন শিল্পী, প্রেমিক, বিপ্লবী এবং রূপকার। ওর কথা কিছু বুঝতে না পেরে আমরা সকলেই ওর মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকালুম। অনীশ ফের বললে "মালতীকে তোমরা চিনলে না? কত বড় ঘরের মেয়ে। বাপ নামকরা ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। এখন মারা গেছেন। বাপের অঢেল পয়সা। মেয়েকে স্কুল ও কলেজে কত পড়িয়েছেন। মেয়ে অনেক বিদ্যেও শিখেছে নাকি। কিন্তু ঝাড়ু মাড়ি ঐ বিদ্যের মুখে। আর মাষ্টারটাই বা কি রকম ভদ্রলোক। এম-এ পাশ! এর নাম তুই শিক্ষিত। এক ভদ্রলোকের মেয়ে, ভদ্রলোকের স্ত্রী ও বৌ, তার সঙ্গে তুই ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে অবৈধ প্রেম করলি! পরস্ত্রীকে সোহাগ জানালি! সুখের সংসার নষ্ট করে দিলি!"

একটু থেমে একমুখ সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে অনীশ আবার বলল "এই দেহ যখন পবিত্র, এই দেহের অনুশীলন যখন সুখদায়ক। তখন একে লজ্জাকর ভাবে কালো কালি মাখানোর কি প্রয়োজন বলতে পার? একে নোংরা করার অধিকার কারো নেই। এই দেহমন্দিরে ভগবানের বাস, একে অপবিত্র করে কি লাভ? আমি জীবন শিল্পী। আমি রক্তগোলাপের স্বপ্ন দেখি। আমি আশাবাদী. নোংরামি ভালবাসিনে।"

সারদা একটা ভাল কলেজের অধ্যাপক। খালি চায়ের কাপটা মাটিতে নামিয়ে রেখে সে বলল "অনীশ ঠিকই বলেছে। আজকের দিনে যে বিরাট অশান্তি আর অস্থিরতা বিশ্বসংসারে হাহাকার এনে দিচ্ছে সেটার মূলে হল লোভ আর কাম। যাকে বলে কামার্ততা আর ভোগলোলুপতা। একে ক্ষমা করা যায় না। আজকের দিনে সবচেয়ে বড় জীবনজিজ্ঞাসা হল এই যে সংযম না কামকে আমরা জীবনে বড় স্থান দেবো?" আমি খবরের কাগজের দিকে চোখ রেখে চুপ করে বসেছিলুম। আমার মনে হল আজ বৃষ্টির নূপুরে বুঝি কাঁদছে এ যুগের তামসী বেদনা। বরদা হল সাংবাদিক। এক টিপ নস্য নিয়ে সে বলল "সত্যই বাঙালীর সমাজজীবনে, রাষ্ট্রীয় জীবনে, শিল্পে সর্বত্র আজ একটা শৃঙ্খলাহীন উদ্ধতপনা এবং অসহনীয় অস্থিরতা ব্যাধির মত বা সামুদ্রিক ঝড়ের মত বিপর্য পর বিপর্যয় সৃষ্টি করছে ও করেছে। এর সঙ্গে আমরা দেশের শিক্ষিত লোকেরা এবং যুবশক্তি প্রমত্ত হয়ে প্রমত্তের মত নাচতেও পারি অথবা এর সঙ্গে মানুষের শৃঙ্খলায় আমাদের ভবিষ্যৎকে বাঁচাতে আমরা যত্নবান হতে পারি আত্মদানও করতে পারি। জানিনা কোন্‌টা হবে আমাদের পক্ষে কল্যাণকর। দেশের যুবশক্তি এ নিয়ে ভাবুন এবং এর উত্তর দিন।" আমি এতক্ষণ চুপ করে বসে ওদের কথা শুনছিলুম। এবং আমি বললুম "আমাদের কৃষিভিত্তিক ও সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা বদলে আজ শিল্পভিত্তিক এক নতুন সমাজ ব্যবস্থা রূপ নিচ্ছে। সেই সঙ্গে এসে পড়েছে মানুষের জীবনের নব মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা। অর্থাৎ অশ্লীলতা অথবা শ্লীলতা? একথা আমিও তোমাদের সঙ্গে এখন এক-বাক্যে স্বীকার করছি। কিন্তু ঐ শিক্ষিত ও আদর্শচ্যুত

মাষ্টারের আর তার অনন্ত রঙ্গিনী এবং স্বপ্ন সঙ্গিনী ভ্রষ্টা নারীর কথা ও কাহিনীটা আগে শোনাও। অনীশ, তুমি ঐ দেবীর বিষয়ে কিছু আলোকপাত কর। অনীশ বলল "মালতীর স্বামী সুমথনাথ যৌবনে রূপবান ও গুণবান ছিলেন। কি সুন্দর তাঁর গায়ের রং যেন সর্বঅঙ্গে গোলাপের আভা বেরুচ্ছে। এমন রাঙা ঠোঁট সচরাচর পুরুষের হয়না। চোখের পাতায় যেন কাজল মাখানো। মাথাভর্তি ঘন কালো কোঁকড়া চুল। এখন যদিও বা প্রৌঢ়, তবুও বুকের গড়ন যেন ছেনি দিয়ে কুঁদে বার করেছে। আর গুণ? এম-এতে উনি ফাষ্ট ক্লাস পেয়েছিলেন। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন। এর পরই নিজ গুণে মোটা মাইনের সরকারী চাকরী পেলেন। এই সময়তেই ওঁর মালতীর সঙ্গে বিয়ে হল। ছেলেবেলা থেকেই সুমথনাথের প্রতি আমার আকর্ষণ ছিল দুর্নিবার। তার কারণ হল উনি সত্যের অনুপম পূজারী। আমি চিনেছি ওঁর জীবনের সোনার মত নিষ্কলঙ্ক সততা, আমি জেনেছি ওঁর আগুনের মত পাপদাহকারী পবিত্র চরিত্র, এবং আমি দেখেছি ওঁর নির্ভয় দুর্বার কর্মশক্তি। সরকারের আবগারী বিভাগের উনি সর্বময় কর্তা ছিলেন। কিন্তু কোনদিন একপয়সাও কারো কাছ থেকে ঘুঁষ উনি নেননি। দুর্নীতির মরণ ফাঁদে কোনদিন উনি জড়িয়ে পড়েন নি। আশ্চর্য ছিল ওঁর নিষ্ঠা ও বিশ্বাসের সততা। এই মানুষকে কিন্তু মালতীর পছন্দ হয়নি।"

সারদা বলল "প্রেম সেই আদিকাল থেকে কখনো অতীন্দ্রিয়তায়, কখনও বা কামকেলির উদ্দামতায়, কখনো হৃদয়ের গভীরতায়, কখনও বা যৌবনবৃত্তির তাড়নায় বিভিন্নরূপ ধারণ করেছে। এখানে তো আমরা দেখছি যৌনবৃত্তির তাড়না হে। এখানে সেই কামকেলির উদ্দামতা। এ হল নোংরামি। যাকে বলে নৈতিক অশুচিতা, উচ্ছৃঙ্খলতা। পরকীয়া প্রেমের দায়ে মানুষ পারেনা এমন কাজ নেই। বিশেষ করে মেয়েমানুষ। অভিসারিকা রাধাই তার সাক্ষী। রাধারা চিরকাল এই পথেই চলে। না কি বলো তোমরা?" বরদা বলল "এ হল রুচির কথা। স্বামী মাত্রই যে স্ত্রীর প্রিয় হবে সতীত্ব মেনে চলতে বাধ্য হবে এ কথাই বা কে বললে?"

আমি বললুম "ঠিক বলেছ। স্বামী যেখানে ঠকায়, সেখানে একদিন, দুদিন, না হয় দশদিন—ব্যস্ ধরা পড়ে যায়। কিন্তু স্ত্রী,—সে ত মেয়েমানুষ। সে যদি চির জীবন ধরে ঠকায়—ধরবে কার সাধ্যি? সে সন্তানকে শিখিয়ে দেয় ছোটবেলা থেকে ঐ যে অমুক দাঁড়িয়ে তোর সামনে, ওকে তুই 'বাবা' বলবি। তবেই না ভদ্রলোক বাবা হয়। কিন্তু অসতী মেয়ে ঠিকই জানে, সত্যিকার বাবা কে? এসব কি কেউ ধরতে পেরেছে কোনোদিন? যে মেয়ের স্বভাব চরিত্র যত সন্দেহজনক, সে তত বেশী স্বামীর মন ভোলাতে চেষ্টা করে। তবে আশার কথা এই যে মানে মেয়ে জাতটাই স্বাভাবিক ভাবে সৎ, আন্তরিক ও ধৈর্য্যশীলা হয়, সতী হয়। অসতী হয় লাখে দুএকটা। আমি বিশ্বাস করি নারীর আত্মা পৃথিবীর মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যাবে উর্ধ্ব থেকে উর্ধ্বে।"

বাইরে তখনো রিমঝিম শব্দে বৃষ্টি পড়ছে। সেই বাদল ধারার গান, কিছুক্ষণ, চুপ করে শুনে অনীশ আবার বলল "শোন তবে ঘটনাটা। উদ্ধত যৌবনের স্বাক্ষরে কলঙ্কিত একটি মেয়ের কথা। মালতীর স্বামী সুমথ দার বাবা ছিলেন মস্ত বড় ডাক্তার, সুমথদার, এক ভাই উকিল, আর একভাই অধ্যাপক। সকলেই সুশিক্ষিত, সুউপায়ী। ওদের সুখের সংসার। বিদুষী মালতী এল ঐ বাড়ীতে যেন স্তব্ধ বিষাদ প্রতিমা,—সকলে মনে করলে মেয়েটার কি ডিগ্‌নিটি, কি প্রেসটিজ। স্বামীর বদলির চাকরী। ভারতের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়াতে হবে। মালতীর বায়না বা আদিখ্যেতা হল এই যে সেও স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে দেশে দেশে ঘুরবে। কেউ ধরতে পারেনি তার কপটতা। ঘুরবে তা ঘুরুক। কিন্তু এইভাবে বাঘিনী ঐ যৌথ পরিবারে, সুখের সংসারে আগুন জ্বেলে দিলে। স্বামীর সঙ্গে সেই যে বাইরে গেল আর কোনদিন শ্বশুর বাড়ীতে ফিরলো না, স্বামীকেও ফিরতে দিলে না, সংসারে একটি পয়সাও কখনো পাঠালে না। শ্বশুর বাড়ীর কাকেও ওর পছন্দ

তাঁর স্ত্রীও খুব সুন্দরী ও বড় লোকের মেয়ে, সেই মেয়ে কিন্তু সকল নিয়ে মিলেমিশে বেশ হাসিখুশি হয়ে শ্বশুর বাড়ীতে ঘর সংসার করতে লাগলেন, উকিল ভায়ের স্ত্রীও তাঁর স্বাভাবিক সহৃদয়তা দিয়ে সেই সংসারের সকল সুখ দুঃখ ও বেদনার অংশ নিয়ে ছিলেন। তাঁর মনেও কোনও রকম নোংরা প্যাঁচ ছিল না। যাক কয়েক বছর পর সুমথদা নানা দেশ ঘুরে এবারে কোলকাতায় বদলি হয়ে এলেন। তখন মালতী বৌদির দুই ছেলে ও এক মেয়ে। বড় ছেলে স্কুলের ক্লাস এইটে পড়ে, তারপর মেয়ে সেও ক্লাস সিক্সে পড়ে, সবার যে ছোট সে ছেলে, সেও ক্লাস ফোরে পড়ে। বছর চারেক কোলকাতায় একটানা সরকার থেকে দেওয়া কোয়ার্টারে থেকে সুমথদা আবার বাইরে বদলি হলেন। কিন্তু মালতী বেদি আর কোলকাতার বাইরে যেতে চাইলেন না। উনি বল্লেন—"ছেলেমেয়েদের পড়ার ক্ষতি হবে। আমি এদের নিয়ে কোলকাতায় বরঞ্চ থাকি। তুমি একাই যাও, ছুটিতে ছুটিতে এসে দেখে যাবে। সরকারী বাড়ী ছাড়তে হবে জানি। তা হোক। আমরা বাড়ী ভাড়া করেই থাকবো।" অগত্যা তাই হল। ভাল পাড়ায় ভাল বাড়ী ভাড়া নেওয়া হল। যথাসময়ে সুমথদা চলে গেলেন কর্মক্ষেত্রে, মালতী বৌদি রয়ে গেলেন দুই ছেলে ও এক মেয়ে নিয়ে কোলকাতাতেই। এরই কিছু আগে এসেছেন সেই মাষ্টার—ছেলেমেয়েদের পড়াবার ভার নিয়েই এসেছেন। নাম অনিমেষ। এম এ পাশ, সুন্দর বুদ্ধিমান প্রতিভাদীপ্ত ছেলে কিন্তু তার জীবনে এ সবের কার্যকরী মূল্য কিছু নেই। কারণ অনিমেষ অসৎ ও চরিত্রহীন। সে শীঘ্রই মনিব গিন্নীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে মিশে গেল। সুমথদা চলে যাবার পর সে বাড়ীতে সর্বক্ষণের জন্য গৃহশিক্ষক অর্থাৎ হোল টাইম টিউটর হয়ে রইল। তাইতেই নাকি সুবিধা বেশী, অনেক সুযোগ। মনিব যখন বিদেশে গৃহশিক্ষক তখন গুটি গুটি পায়ে পায়ে এগিয়ে এসেছিল—শেয়ালের মতো। ধূর্ত লোভী শেয়ালের মতো হাতে পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে এসেছিল মনিব পত্নীর বিছানার দিকে। তা শেয়াল বেচারার আর দোষ কি বলো যদি স্বয়ং বাঘিনীই গুহার মধ্যে। মালতী বৌদির বেশবাস চিরদিনই ফ্যাশন দুরস্ত ছিল। কি রকম ঘেন্নালাগে দেখতে যখন দেখি উনি হৃদয়ের পুঁজ জড়োয়া গয়নায় ঢেকে রেখেছেন। কি রকম খারাপ লাগতো ভাই দেখতে যখন দেখতাম মাষ্টার মালতী বৌদির সঙ্গে লেপ্টে আছে আঠার মতো। আর ব্রহ্ম দৈত্যের মতো চেপে বসেছে মাষ্টার ওই বাড়ীতে যে বাড়ীতে ওর কোনদিন কোন অধিকারই নেই। সুমথদার চোখে কতোদিন আমি দেখেছি অপরিসীম এক বেদনা, আর মালতী বৌদির চোখে?—দেখেছি সুমথদার জন্য হিম, কিন্তু মাষ্টারের জন্য ভ্রমর। আমার বুকের মধ্যে ঝড় উঠতো। ভাবতাম সুমথদার মতো এক মহান, ক্ষণজন্মা মানুষ, আর—তার বদলে একটা উল্লুক—একটা দু পেয়ে জানোয়ারকে মালতী বৌদির মতো একজন রুচিমতী মেয়ের ছিঃ ছিঃ ঐ শিক্ষিতা মেয়ের শেষে এই টেস্ট। অবাক লাগতো। সুমথদা বুঝতে পেরেছিলেন সব, ওঁর আত্মীয় স্বজনেরাও টের পেয়েছিলেন সব। আড়ালে হাসাহাসিও করতেন এই নিয়ে। অপমানে লাঞ্ছনায়, এবং এই প্রকার সামাজিক অপযশে বেচারা সুমথদার মাথা তোলবার উপায় ছিল না। কিন্তু ভারতীয় আচার ও নিষ্ঠায়, ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে সুমথদার, চিরদিনই অন্ধ শ্রদ্ধা। হিন্দুবিবাহকে তিনি অটুট মনে করেন। তাই কথায় কথায় স্বামী বা স্ত্রী বদল করা তাঁর রুচিতে বাধে। বিবাহ বিচ্ছেদ আনলেন না। অবশেষে তিনি ঐ পৈশাচিক নরককুণ্ড থেকে ওঁর বড় ছেলে ও মেয়েকে একদিন নিয়ে পালালেন। ছোট ছেলে মায়ের কাছেই রয়ে গেল। এর পর স্ত্রীর সঙ্গে ওঁর সম্পর্ক কিছু ছিল না। শুধু মাসে মাসে টাকা পাঠানো ছাড়া। উনি বাইরে বাইরেই কর্মস্থলে থাকতেন। না, বিবাহ আর উনি করেন নি। রক্ষিতাও রাখেন নি। বলেছি তো আগেই যে ওঁর নৈতিক শুচিতা বোধ ছিল খুব উচ্চ। ওঁর মধ্যে আমরা সেই পরম পুরুষকে প্রকাশিত দেখতাম যিনি সত্যের সাধক। যিনি অনাড়ম্বর, সহজ ও সরল, অন্তরে যিনি পবিত্র, এবং শান্ত, যিনি দুঃখে ও বিপদে একান্ত অনুদ্বিগ্ন, জীবনকে যিনি ভালবাসেন এবং মৃত্যুকে যিনি ভয় পাননা। ওঁর

উনি বিয়ে দিয়েছেন। পুত্রবধূও খুব ভাল। শ্বশুরকে খুব ভক্তি শ্রদ্ধা করেন। ওঁর মেয়ে কিন্তু ওঁর খুব প্রিয়, যাকে বলে গলার হার। মেয়েও বাপকে তেমনি ভালবাসে। বাবার সেবা ও যত্ন সব কিছু সে নিজের হাতে করে। মেয়ে এম এ পাশ করেছে। ভাল ইঞ্জিনীয়ার পাত্রের সঙ্গে সেই মেয়ের বিয়েও দিয়েছেন। কিন্তু বাপকে ছেড়ে মেয়ে কোলকাতার বাইরে কখনো যায়নি। তাই জামাই কোলকাতার বাইরে ভাল চাকুরী পাওয়া সত্বেও কোলকাতাতেই রয়ে গেছেন। মেয়ের নাম চিত্রিতা, জামায়ের নাম শান্তনু। শান্তনুদের কোলকাতায় নিজস্ব বাড়ি ও গাড়ি আছে। সুমথদার বড় ছেলের নাম সুশীল। সে ডাক্তারিতে খুব নাম করেছে, ভাল পশার জমিয়েছে। সুমথদা তিনখানি বাড়ী রিটায়ার করে কিনেছেন। প্রভিডেণ্টফাণ্ডের টাকা অনেক পেয়েছিলেন। তাইতেই কিনেছেন। অবশ্য কিছু ছেলেও দিয়েছে কিছু জামাইও দিয়েছে। সেই বাড়ীর একখানি বড় ছেলে সুশীলকে উনি দিয়েছেন, একখানি মালতী বৌদি ও ছোট ছেলেকে দিয়েছেন। তারা সেই বাড়িতেই বাস করে। আর একখানি মেয়ে চিত্রিতাকে দিয়েছেন। মেয়ে জামাইএর তো নিজেদেরই বাড়ি আছে, তাই সুমথদা উপস্থিত অর্থাৎ যতদিন বাঁচবেন এই বাড়িতেই বাস করেন। ওঁর মৃত্যুর পর মেয়ে এই বাড়ি পাবে। আর এই বাড়ীতেই উনি আমাদের ক্লাবের জন্য একখানি ঘর বিনা ভাড়ায় ছেড়ে দিয়েছেন। তোমরা কেউ জানো না যে এই বাড়ি সুমথদার। তোমরা সকলে জানো যে বাড়িওলা হল শান্তনু বোস। ইনিই কিন্তু সুমথদার জামাই। সুমথদাকে আমি বলেছিলাম একখানি ঘরের জন্য। তা উনি বাইরের এই ঘর খানি আমাদের জন্য এক কথায় ছেড়ে দিলেন। আমায় বড় ভালবাসেন উনি। এই বাড়িরই পিছনদিকে উনি থাকেন। চিত্রিতা রোজ দুবেলা এসে বাপের খোঁজ খবর নিয়ে যায়। একটু শরীর ওঁর খারাপ হলেই চিত্রিতা তখন কয়েকদিন ধরে এখানে এই বাড়িতে বাপের কাছে থেকে যায়। নচেৎ বাবাকে টেনে নিয়ে যায় নিজেদের বাড়িতে। সেখানেই রেখে দেয় ওঁকে কয়েকদিন। বড় ছেলেও রোজ এসে দেখে যায় বাবাকে। পুত্রবধূও আসে খোঁজ খবর নিয়ে যায়। আসবার হুকুম নেই শুধু মালতী বৌদির। বৌদির সেই পাপের সঙ্গী মাষ্টার মশাই এখন কোথায় কেটে পড়েছে। বৌদির সেই উদ্ধত যৌবন এখন আর নেই। প্রৌঢ়া। ওঁর বাড়িটা যেন পাথর পুরী, নিরানন্দ। কত বড় গর্হিত কাজ জীবনে উনি করেছেন তা এখন উনি বোঝেন, ঝড়ের মত উত্তাল হয়েছিল যে জীবন তা আবার ঝড়ের পরের অরণ্যানীর মতই স্থির হয়ে গেছে। উনি অনুতপ্ত। সম্ভবতঃ অগ্নিশুদ্ধ।"

সারদা বলল আজকাল বহুমেয়েই এই রকম বিপথগামিনী হচ্ছেন। পরে ভবিষ্যতে অনেক কষ্ট পাচ্ছেন। আমার ধারণা মেয়েদের মনের গতি একমুখী, তা একজনকে উজার করে দিলে আর এমন উদ্বৃত্ত কিছু থাকে না যা নিয়ে বহুমুখী হওয়া যায়। আমার মনে হয় যিনি বিপথে যান, তিনি কোন একজনকে ফেলে আসা আত্মদান করতে পারেন না বলেই নানা জন নানা দিক থেকে তাঁকে টানে। এখানে মালতী বৌদি সুমথদাকে ষোল আনা আত্মদান করতে পারেন নি। তাই ওঁর মন, ওঁর ভালবাসা একমুখী না হয়ে বহুমুখী হয়েছিল।"

বরদা বলল শুধু আমাদের বাংলা দেশ নয়, সারা ভারতবর্ষ জুড়ে, সারা পৃথিবী জুড়ে আজ এই ছবি। বিগত কালের যা কিছু ভাল—যেমন শুচিতা, শুদ্ধতা, সহিষ্ণুতা, উদারতা, সতীত্ব—সব খুলে, খসে, ভেঙে পড়ে যাচ্ছে। সামাজিক ক্ষেত্রে সমাজের অস্তিত্বই আজ বিলুপ্ত হতে চলেছে। এ কথা ঠিক যে, প্রাচীন সমাজকে ভাঙতেই আমরা চেয়েছিলাম কারণ প্রাচীন সমাজ সৌধে অনেক কিছু হেজে মজে বিষাক্ত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তাইরে শুধু ভাঙাই আমাদের হল সে আর গড়া হল না। একথা যেন আজকের যুবশক্তি উপলব্ধ করেন।"

আমি বললুম "হ্যাঁ, মানুষের, হৃদয়লোক, বা অন্তর লোকেও মানুষ আজ নিঃস্ব, রিক্ত, সর্বস্বান্ত। ঈশ্বর, পাপ, পুণ্য ইত্যাদি থাক বা না থাক আজকের বিবাহ অর্থাৎ আজকের ভালবাসাহীন চুক্তিসর্বস্ব নরনারীর মিলনকে নিষ্প্রাণ বলতেই হবে, আজকের জীবনের পথ যেন সেই মুখেই ছুটেছে। এ যুগ, অশান্ত, ক্ষুব্ধ ও উত্তপ্ত। কিন্তু আজ আর বেশী আলোচনা নয়। এখন তর্ক থাক। অনেক রাত হয়েছে। প্রায় দশটা বাজে। বৃষ্টিও

থেমেছে। চলো আমরা যে যার বাড়ি যাই। আর যাবার আগে সুমথদার মত মহান পথ প্রদর্শককে আমরা প্রণাম করে যাই।"

বাইরে তখন বৃষ্টি থেমে গেছে। আমার প্রস্তাবে সকলেই খুশি হয়ে রাজি হল আর বলল "আমরা ওঁকে আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা জানিয়ে যাই চলো। অনীশ তুমি আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলো। আমরা এ বাড়ির ভিতরে কখনো যাই নি।"

আমরা গেলাম, গেট পেরিয়ে একটু বাগান। তারপর উঠোন, তারপর প্রশস্ত দালান, সেই সান বাঁধানো দালানে একটি ইজি চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছেন সুমথদা, এক সৌম্য শান্ত প্রৌঢ় মূর্তি। মাথা ভর্তি সাদা চুল, জোছনার মতই স্নিগ্ধ, রজনীগন্ধার সুবাসের মতই মনোহর। আরো দেখলাম, একটু দূর থেকেই আমরা সকলে দেখলাম, তাঁর পায়ে মাথা রেখে বিস্রস্তভাবে পড়ে আছেন মালতী বৌদি। আর সুমথদা ওঁর মাথায় নিজের ডান হাতখানি রেখেছেন। এক সময়ের পূর্ণ যুবতী আজ প্রৌঢ়। অবশ্য এখানো রূপ সম্পূর্ণ ঝরে যায়নি। কিন্তু সেই মুহূর্তে তাঁকে পাংশু ও বিবর্ণ দেখাচ্ছিল। চোখের কোলে কালি, গলার চামড়া যেন ঢিলে। আমরা আর একপাও অগ্রসর হলাম না। ঐখানে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে কানপেতে কথাবার্তা শুনতে লাগলাম। ওঁরা আমাদের দেখেন নি। মালতী বৌদি আতুর কণ্ঠে বলছেন "আমি শুনলুম তুমি নাকি তীর্থ ভ্রমণে যাবে। তারপর আর কোলকাতায় ফিরবে না। কাশীবাস করবে। এই বয়সে ওখানে তোমায় কে দেখবে? তাছাড়া আমি তো এখানে আর তোমাকে ছেড়ে একা থাকতে পারবো না। আমি শুধু তোমার সঙ্গে যাবো। আমাকে এই শেষ বয়সে আর দূরে সরিয়ে রেখো না। তোমার সেবা করবো অনেক দিনের এই আকাঙ্ক্ষা আমার পূর্ণ করো।" তাঁর দু'গাল বেয়ে চোখের জল ঝরে পড়ছিল টসটস করে। তিনি আবার বললেন "তুমি এ অভাগীরে মার্জনা করো। দুঃখের তাপে জলেজলে আমি এখন খাঁটি হয়েছি। শুদ্ধ হয়েছি। তুমি এবার ক্ষমা করো যত আমার স্খলন, পতন, ত্রুটি। আমি তোমার ভক্ত উপাসিকা। আমি জানি আমি তোমারই। তুমি আমারই। তুমি আছ তাই আমি আছি। তোমার অভাবে আমি অস্তিত্ব বিহীন, আমি তোমার মন, তুমি আমার দেহ। তুমি জ্যোতির্ময় আমার সত্তায়। তুমি জীবনে নিরাসক্ত যোগী। তুমি আমার সকল মাধুরীর প্রতীক। আমিতো আর কোনদিন তোমায় ছেড়ে থাকতে পারবো না। আমায় তাড়িয়ে দিও না।" অশ্রু দেখেই বুঝলাম তিনি সত্যই অনুতপ্ত। বুঝলাম বহির্মুখী কাম এখন অন্তর্মুখী প্রেম হয়ে গেছে! দেখলাম এক নির্দোষ নিষ্কলঙ্ক কাম-হীন স্বর্গীয় প্রেমের ছবি। কারণ ব্যাকুলতাই যে প্রেম সাধনার প্রধান সোপান। এতে ভক্তির উদয় হয়েছে। মালতীবৌদির জীবন অমৃত হয়ে গেছে। সুমথদসত্নে তুলে ধরলেন মালতীবৌদিকে। নিজের কোঁচার খুঁট-দিয়ে মুছিয়ে দিলেন মালতী বৌদির চোখের জল। তারপর ধীরে ধীরে কম্পিত কণ্ঠে বললেন "চলো তুমি আমার সঙ্গে তীর্থ ভ্রমণে। চলো আমার সঙ্গে কাশীবাস করবে। এতে আমি খুব আনন্দ পাবো। আর আমাদের বিছিন্ন বাস নয়। একাগ্র চিন্তার দ্বারা তোমার আত্মশুদ্ধি হয়েছে। তুমি সত্য ও চিরন্তনের স্পর্শ পেয়েছ। আশীর্বাদ করি শিবম্ শান্তম্ ও সুন্দরমের সাধনা তোমার জয়যুক্ত হোক।"

একটু থেমে প্রসন্ন স্নিগ্ধহেসে তিনি আবার বললেন "আমি জানি মানুষের সাধনা সকল দুর্নীতিকে ছাড়িয়ে ওপরে ওঠে। সব আবর্জনা, সব প্রবৃত্তি, জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মানুষইতো যোগাসনে বসতে জানে। আশীলক্ষ ইভ-লুশনের ভিতর দিয়ে মানুষ চলে এসেছে শুধু একটি মাত্র তপস্যায় সিদ্ধিলাভের জন্য। তা হল এই নোংরা স্থূল কাম জর্জর মাংসপিণ্ডের বাইরে দেহাতীত কিছু একটা লক্ষ্যের দিকে এগোবার জন্য। তুমি বুদ্ধিকে প্রশস্ত করো, হৃদয়কে প্রসারিত করো, নিজেকে দীন ও দরিদ্র বলে মনে করোনা, দুর্বল বলে মেনো না। দুঃখকে বরণ করো। সত্যকে সকলের ঊর্দ্ধে স্বীকার করো, আর ব্রহ্মের আনন্দে জীবনকে পরিপূর্ণ করে অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ করো। এই আমার আশীর্বাদ।"

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে সুমথদা আবার বললেন "সত্যের ও সততার সংজ্ঞা নিয়ে যুগেযুগে বিরোধ হয়,

পরিবর্তন হয়, কিন্তু ওই মূল সূত্র অর্থাৎ তার চিত্তের ও মনের সত্য-অভিমুখিনতার কোন পরিবর্তন হয় না। মানুষের জীবন সত্য তাই মৃত্যুকে স্বীকার করে না। মৃত্যু থেকে সে অমৃতে যেতে চায়। অসভ্য বা অসততা থেকে সে সত্যে বা সততায় যেতে চায়। সে বলে অসতো মা সদ্গময়'! তাই অমৃত পুত্রের কণ্ঠে সদাই ধ্বনিত হচ্ছে 'আমি বাঁচতে চাই, শুধু বাঁচা নয়—আমি সৎ হয়ে বাঁচতে চাই, আমি শুদ্ধ হয়ে বাঁচতে চাই, আমাকে বাঁচতে দাও, বাঁচাও। তাই না মানুষের ইতিহাস এতো মহিমান্বিত।" তিনি চুপ করলেন। আকাশে বাতাসে জলে স্থলে বৃক্ষের পাতায় কেঁপে উঠছিল তাঁর কথাগুলো। ধ্বনির প্রতিধ্বনি হয়ে উঠছিল। বেদনার গভীরে তাঁর এই জীবনানুভব। মনে হল প্রতীক্ষা এবং প্রার্থনার আলোকে বুঝি তাঁর জীবনদর্শন চিরভাস্বর হয়ে আছে। আমাদের চোখেও জল এল। আনন্দাশ্রু না বেদনাশ্রু তা আমরা জানি না। মনে হয় আনন্দের অশ্রুই। আমরা তাঁদের দুজনের উদ্দেশ্যে ওখানে থেকেই বারবার প্রণাম জানিয়ে নীরবে নিঃশব্দে আমাদের বাড়ীর পথ ধরলাম। জীবনের দুস্তর মরু পেরিয়ে শ্রাবণ বর্ষার এই শুভলগ্নে ওঁদের আবার মিলন হয়েছে।

ব্রহ্মসূত্র কাব্যানুবাদ

পুষ্পদেবী, সরস্বতী, শ্রুতিভারতী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

কর্ম হিসাবে সুখ দুখ পায় কারো এতে সংশয়
কত সাধুজন বিনা অপরাধে দুঃখ কত যে পায়
তাই কেহ বলে ইহা ঠিক নয়
সৃষ্টির আগে বিভাগ না রয়
সৃষ্টির আদি বলে কিছু নয় ইহা জেনো ঠিক নয়
যা পাবার তাই লভিছে সকলে সুবিচার ঠিক হয়।
উপপদ্যতে চ অপি উপলভ্যতে (২।১।৩৬)
যুক্তির দ্বারা উৎপন্ন যে হয় এই নিশ্চয়
শাস্ত্রের মাঝে জ্ঞানী গুণী জন জেন এই কথা কয়
অনাদি যে এই হয় সংসার
সৃষ্টি প্রলয় হয় বারেবার
পূর্বজন্মে যেজীব যা করে সেই মত গতি হয়
বলি করজোড়ে কর হরিনাম জীবে শিব জ্ঞানময়।
সর্ব্ব ধর্ম্মোপপত্তেশ্চ (২।১।৩৭)
কনশঙ্কর সব ধর্মের উপপত্তি যে হয়
ঈশ্বর সেই জগতকারণ উপাদান নিশ্চয়
সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বশক্তি
ধরে সেইজন লভিতে মুক্তি
তাঁহারি চরণ করগো শরণ অন্য উপায় নাই
হরিময় হোক সবার জীবন দুখীরে জানিও ভাই।
দ্বিতীয় অধ্যায় প্রথম পাদ সমাপ্ত

—০—

(ক্রমশঃ)

'জাতীয় পরিচ্ছন্নতা দিবস'

শ্রীননী ভট্টাচার্য্য,
স্বাস্থ্য মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ।

১৯৬০ সাল থেকে মহাত্মা গান্ধীর জন্ম দিনটি জাতীয় পরিচ্ছন্নতা দিবস রূপে পালিত হয়ে আসছে। এই দিনটি পরিচ্ছন্নতা দিবস হিসেবে পালনের তাৎপর্য্য হলো, মহাত্মাজি জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম নায়ক যেমন, তেমনি ব্যক্তিগত জীবনে শুচিতা ও পরিচ্ছন্নতার প্রতীকও তিনি। নিজের জীবনে ও যে কোন পরিবেশে পরিচ্ছন্নতাকে তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন। গান্ধীজীর জীবন চর্যার বড় একটা অঙ্গ ছিল...সমাজ থেকে সব রকম অপরিচ্ছন্নতা দূর করা। হরিজন পল্লীতে গিয়ে তাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য তাদেরই সঙ্গে ঝাড়ু হাতে কাজ করতেও তিনি দ্বিধা বোধ করেন নি।

সুস্থ মন ও সুস্থ দেহ মানুষ মাত্রেরই কাম্য। দেহ ও মনের স্বাস্থ্য নির্ভর করে অনেক কিছুর উপর। যে সমাজে দারিদ্র্য চিরসঙ্গী, মানুষের ন্যূনতম ব্যবহারিক প্রয়োজন যে সমাজে অপূর্ণ থেকে যাচ্ছে, মুষ্টিমেয় ধনিক ও বণিক শ্রেণীর আগ্রাসী লোভ যেখানে অসংখ্য মানুষকে অর্ধমানবিক স্তরে যুগ যুগ ধরে রেখে চলেছে সেখানে দেহ মনের স্বাস্থ্যের প্রয়োজনে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দিকে এগুতেই হবে। এ ছাড়া উপায় নাই। এই মূল প্রশ্ন সত্বেও প্রশ্ন আছে যে পরিবেশে আমরা বাস করি, যে সব জায়গায় আমরা বেশীর ভাগ সময় থাকি, তা যদি পরিষ্কার না হয়, তবে মনই বা পরিচ্ছন্ন হবে কি করে? আর দেহই বা সুস্থ থাকবে কি করে? মানসিক এবং শারীরিক সুস্থতা নির্ভর করছে পারিপার্শ্বিক পরিচ্ছন্নতার উপর। দেহ ও মনের স্বাস্থ্য, শক্তি ও সৌন্দর্য্য লাভ তাতো কিছু ব্যয়সাধ্য ব্যাপার নয়, যতটা ইহা নিজের ঐকান্তিক আগ্রহ ও চেষ্টা সাধ্য। অলসতা ও নিশ্চেষ্টতা কোন ওজর দ্বারা সমর্থিত হয় না। আসুন আমরা এ বিষয়ে সচেতন হয়ে পরিষ্কার থাকার এবং পরিচ্ছন্ন অভ্যাস গড়ে তোলার সঙ্কল্প গ্রহণ করি।

শিশুকালে নানা অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে গড়ে ওঠে পরিচ্ছন্নতা বোধের অভ্যাস। এই অভ্যাসের গঠন নির্ভর করে প্রধানতঃ পিতামাতা ও শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীর উপর। তাঁদের প্রভাবে যে অভ্যাস গড়ে ওঠে তারই প্রভাব পড়ে পরবর্ত্তী কালে নাগরিকদের জীবনে ও পরিবেশে। সেজন্য ছোট বেলা থেকেই ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য নীতির অভ্যাসগুলি আয়ত্ত করা একান্ত প্রয়োজন। স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে আজকাল দাঁতের পোকা, মাড়িফুলে রক্ত ও পুঁজ পড়া সব চেয়ে বেশী দেখা যাচ্ছে। এর প্রধান কারণ দাঁত ও মুখ ধুতে অবহেলা। মুখের ভেতর ভাল করে পরিষ্কার না রাখলে পরবর্ত্তীকালে নানা রকমে রোগ যেমন টনসিলাইটিজ, ডিস্‌পেপসিয়া, আরথ্রাইটিজ, (Tonsilitis, Dyspepsia, Artheritis) হৃদরোগ-প্রভৃতির সৃষ্টি হতে পারে। আমাদের দেশে যক্ষ্মা রোগ বেশ ছড়িয়ে পড়েছে। এই রোগ প্রধানতঃ থুথু, গয়ের, শিকনি দ্বারা ছড়ায়। দেখা যায় কেহ কেহ ঘরের মেঝেতে ও দেওয়ালে, ট্রেনে বা কোন গাড়ীর মধ্যে থুথু ফেলছেন। ঐ থুথুতে যদি যক্ষ্মার জীবাণু থাকে তবে ঐ জায়গার বাতাসে ধুলায় সে আশ্রয় নেয়, এবং নিঃশ্বাসের সঙ্গে অন্যের দেহে প্রবেশ করে। সেজন্য যে সব জায়গায় লোকে থাকে বা যাতায়াত করে সেখানে থুথু ফেলা কখনও উচিত নহে। থুথু ফেলার পাত্রে বা নর্দমায় থুথু ফেলুন। কাশি বা হাঁচি হলে রুমাল দিয়ে নাক ও মুখ আলতোভাবে ঢেকে কাশবেন বা হাঁচবেন। কেননা নাক ও মুখ থেকে নির্গত নানা রোগের জীবাণু চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে পারে। বাতাসে যে সব ধুলো

বালি ওড়ে তার খানিকটা আমাদের শরীরের ওপর এসে পড়ে। ঘামে লেপ্‌টে যায়। লোমকূপের মুখ বন্ধ করে দেয় এবং ঐ সব জায়গায় ময়লা জমতে থাকে। নানা রকমের জীবাণুরা তখন ঐ ময়লায় বাসা বাঁধে। আর এই জবাণুগুলি বৃদ্ধি পায় ময়লায় ও নোংরায়। কাজে কাজেই ঐ সব ময়লা পরিষ্কার করবার জন্য প্রত্যহ আমাদের স্নান করা দরকার। সাবান দিয়ে স্নান করাই ভাল। শরীর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখলে খোস, পাঁচড়া, দাদ, চুল্কানি প্রভৃতি রোগে কষ্ট পেতে হয় না।।

রান্নাঘর ও খাবার ঘরের ভার গৃহিণীদের হাতেই থাকে, কাজেই এ বিষয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সম্বন্ধে তাঁরা বিশেষ সতর্ক হবেন। শাকসব্জী প্রভৃতি যেখানে সঞ্চয় করে রাখা হয় সেই স্থানটি পরিষ্কার রাখা দরকার। শাকসব্‌জী খলের মধ্যে রাখবেন না। তাতে দূষিত আবহাওয়ার সৃষ্টি হতে পারে। খেতে বসার আগে ভালরূপে সকলকে হাত ধুতে হবে। ভোজবাড়ীতে খাওয়ার পর মুখ ধোয়ার প্রথা একরকম উঠে যেতে বসেছে। এই অভ্যাস স্বাস্থ্যহানিকর। পরিবেশন করবার বাসনপত্র; চামচ প্রভৃতি পরিষ্কার রাখা চাই। কেননা অপরিষ্কার জিনিষ থেকে রোগের বীজাণু সহজেই সংক্রামিত হতে পারে। যে কোন রান্না করা খাবার, কাটা তরিকরকারী, দোকানের খাবার ও ফল সব সময় ঢেকে রাখবেন। কাটা তরিতরকারীর খোসা বা পরিত্যক্ত অংশ, রান্নাঘরের আবর্জনা বা জঞ্জাল, খাবার ঘরের পরিত্যক্ত উচ্ছিষ্ট খাবার প্রভৃতি ঢাকা টিনের মধ্যে রেখে সময়মত নির্দিষ্ট জায়গায় বা ঝাড়ুদারের গাড়ী এলে ফেলে দিতে হবে। কেউ খেয়ে গেলে তক্ষুণি তা পরিষ্কার করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে আবর্জনা আমাদের প্রধান শত্রু, এই আবর্জনা নির্মূল না করলে তার কুফলের হাত থেকে আমরা অব্যাহিত পাব না।

গ্রামের দিকে তাকালে আমাদের পরিচ্ছন্ন অভ্যাসের ব্যতিক্রমই চোখে পড়ে। অথচ স্বাস্থ্যই গ্রামের লক্ষ্মী। গ্রামের যুবকেরা কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে সারা গ্রাম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই লক্ষ্মীশ্রী ফিরে আসবে। এক এক দলে মিলে বিশুদ্ধ জলের জন্য নলকূপ বসানো, ঘরে ঘরে কুঁয়ো পায়খানা প্রবর্তন করা নর্দমা কেটে জল নিকাশের ব্যবস্থা করা। নোংরা খানা, ডোবা ও গর্ত ভরাট করা, গোবর বা আবর্জনা গর্ত করে জমিয়ে মাটি চাপা দেওয়া, রাস্তা মেরামত করা, ঝোপ জঙ্গল কেটে তরিতরকারী বা ফলের বাগান করা এবং গ্রামের সর্বত্র পরিষ্কার রাখা সমষ্টিগত পরিচ্ছন্নতার অতি প্রয়োজনীয় কাজ। প্রথমেই সচেতন হতে হবে মাঠে, ঘাটে, যেখানে সেখানে মল ত্যাগ না করার ব্যাপারে। মানুষের মলে নানারকম রোগের লক্ষ লক্ষ জীবাণু আছে। এমন কি অনেক রুগীর ঠিক ভাবে রোগ নির্ণয় করতে হলেও মল মূত্রের পরীক্ষার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। মলের মধ্যে যে সব রোগের জীবাণু থাকে তারা অতি সহজেই অন্যের শরীরে প্রবেশ করতে পারে। কলেরা (Cholera), টাইফয়েড (Typhoid), আমাশা (Dysentry), হুকওয়ার্ম (Hook Worms), ক্রিমি (Worms) প্রভৃতি রোগের জীবাণু মল থেকেই ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু আমরা যদি একটু সাবধান হই ও যেখানে সেখানে মলমূত্র ত্যাগ করে রোগের জীবাণু না ছড়াই, তা'হলে আমরা এই সব রোগ বন্ধ করতে পারি।

কলেরা (Cholere), টাইফয়েড্ (Typhoid) ও আমাশা (Dysentry) রোগের জীবাণু সাধারণতঃ দূষিত জলের মধ্যে থাকে। পল্লীগ্রামে নদী, খাল বা পুকুর প্রভৃতির জল প্রায়ই দেখা যায় দূষিত। হয়ত গ্রামের কোন লোক কলেরা (Cholera), বা টাইফয়েড্ (Typhoid), বা আমাশা (Dysentry) রোগে ভুগছে, আর তার মলমূত্র সমেত কাপড় চোপড় পুকুরের জলে কাচা হচ্ছে, এবং ঐ পুকুরের জল খাওয়াও হচ্ছে। ইহা খুবই অন্যায়। গ্রামে যদি কোন নলকূপ না থাকে বা অকর্মণ্য হয়ে যায় তবে পানীয় জলের জন্য আলাদা পুকুরের বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন। আর যখন কলেরা (Cholera), টাইফয়েড্ (Typhoid) বা আমাশা রোগ গ্রামে প্রবেশ করে, তখন খাবার আগে জল ফুটিয়ে নিলে এই সব রোগের জীবাণু মরে যায়। মানুষের মল মূত্র রোদে শুকিয়ে গেলেও হুকওয়ার্ম্ এবং ক্রিমি রোগের জীবাণু মরে না। মাঠের ধুলোর সঙ্গে মিশে লোকের শরীরে প্রবেশ করে। হুকওয়ার্ম এবং ক্রিমির জীবাণু খালি পায়ের গোড়ালি দিয়েই মানুষের দেহে প্রবেশ করে

ও শরীরে রোগের সৃষ্টি করে। এই সব রোগের জীবাণু জাতি সহজে ও ভালভাবে নষ্ট করা যেতে পারে। জমির স্তরে যে মাটি থাকে তাতে সহস্র সহস্র অন্য জীবাণু বাস করে। এই জীবাণুগুলি কলেরা, আমাশা প্রভৃতি ব্যাধির জীবাণুগুলিকে নষ্ট করতে পারে। মাটিতে যে জীবাণু থাকে সেইগুলি মানুষের মলমূত্রের সঙ্গে মিশে কার্‌বন্ (carbon) হাইড্রোজেন (hydrogen) ও নাইট্রোজেন (nitrogen) প্রভৃতি পদার্থের সৃষ্টি করে ও রোগের জীবাণুগুলিকে মেরে ফেলে। মাটির জীবাণু দ্বারা রোগের জীবাণুকে নষ্ট করার শক্তিকেই সেপ্টিক্ এ্যাক্‌সন্ (septic action) বলা হয়। এই সেপ্টিক্ এ্যাক্‌সন্ (septic action) অনেক রকমেই হতে পারে। গর্ত পায়খানা এইভাবে রোগের জীবাণু নষ্ট করবার একটি সহজ উপায়। এই পায়খানা করতে ১২ ইঞ্চি চওড়া ও ১২।১৪ ফুট গভীর একটি গর্তের দরকার। এবং চারদিকে ঘিরে নিতে হয়। এই গর্ত পায়খানা পুকুর বা পাতকুয়ো থেকে অন্তত ৫০ ফুট দূরে করলে পুকুর বা পাতকুয়ার জল নষ্ট হতে পারে না। এই গর্ত পায়খানা ১৮ জন লোকের জন্য ৬মাস পর্য্যন্ত বেশ চলতে পারে। গর্তটি গভীর হওয়ার জন্য কোন দুর্গন্ধ হয় না ও মশা, মাছি প্রভৃতির অত্যাচারও বন্ধ হয়।

সহর বা নগরের অপরিচ্ছন্নতা তো আজ চরমে উঠেছে। স্বল্প পরিসর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহরে অগণিত লোকের বাস। যন্ত্র সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠেছে বস্তী অঞ্চল, নানারকম লোকের বাস এই সব অঞ্চলে, যাদের আচার ব্যবহার ও অভ্যাস বিভিন্ন প্রকৃতির। এই সব নগরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা ছিল, তাও প্রয়োজনের তুলনায় ক্ষীণ হয়ে পড়েছে। নাগরিক কর্তব্য সম্বন্ধেও আমরা উদাসীন হয়ে পড়েছি বহুলাংশে। ময়লা ফেলার নির্দ্দিষ্ট জায়গা থাকা সত্বেও এদিক সেদিক ময়লা ছিটিয়ে ফেলা, যেখানে সেখানে কফ, থুতু ফেলা, ড্রেনের মধ্যে নোংরা ছাই, মাছের আঁশ, তরিতরকারীর খোসা প্রভৃতি ফেলা, রাস্তার ধারে শিশুর মল ফেলা এসব তো নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা আমরা দেখি এবং নিজেরাও করি। কিন্তু একটু ভেবে দেখুন এই পরিচ্ছন্ন পরিবেশ গড়ে তোলা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে আমাদের নিজেদের ওপরই। আপনার বাড়ীর সব জঞ্জাল ও আবর্জনা একটি মুখ ঢাকা টিনে জমা করে রাস্তার আবর্জনা ফেলার জায়গায় বা ঝাড়ুদারের গাড়ী এলে সেখানে ফেলে দিতে পারেন। বাড়ীতে যদি খাটা পায়খানা থাকে তবে তাকে সেপ্টিক ট্যাঙ্ক (septic tank) পায়খানায় পরিবর্তিত করুন। নিজের বাড়ী এবং পাড়াপড়শীর বাড়ীর আশে-পাশেও যেন আবর্জনা নোংরা জমে না ওঠে সেদিকে নজর রাখুন। আমরা প্রত্যেকে যদি এই ভাবে একটু সচেতন হই তবে যেখানে সেখানে জঞ্জাল স্তূপ জমে উঠে সহরের নাগরিক জীবনকে এমন বিপর্য্যস্ত করে তুলতে পারে না। রাস্তার ড্রেন, আবর্জনা, পরিষ্কার করবার দায়িত্ব পৌর প্রতিষ্ঠানের হলেও সব সময় আমরা পৌর সভার উপর নির্ভর করে থাকবো কেন? ঝাড়ুদার জমাদার, ইত্যাদি পৌর প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীগণের সঙ্গে সহযোগিতা করে পাড়ার স্বাস্থ্য যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সেদিকে আমাদেরই নজর রাখতে হবে। সভ্য জগতের মানুষ হিসেবে নিজের বাড়ীঘর পরিষ্কার রাখার সঙ্গে সঙ্গে পারিপার্শ্বিকও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব কি আমাদের সকলের নয়?

ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার অভ্যাসই, সামাজিক পরিচ্ছন্ন পরিবেশ গড়ে তোলে। প্রত্যেক নাগরিক যদি ব্যক্তিগত ভাবে, এ বিষয়ে কতকগুলি অভ্যাস আয়ত্ত করতে পারেন তবেই সমাজ ও সংসার আপনাতেই পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠবে। ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা বোধের চেতনার মাধ্যমেই সমষ্টি-গত বা সামাজিক পরিচ্ছন্নতার চেতনা জাগিয়ে তোলা সম্ভব। আর তার থেকেই গড়ে ওঠে পরিচ্ছন্ন গ্রাম, পরিচ্ছন্ন নগর, পরিচ্ছন্ন দেশ। তাই আমাদের এমন পরিচ্ছন্ন পরিবেশ গড়ে তোলার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করতে হবে।

মেঘদূত-মাধুরী

শ্রীসুধীর গুপ্ত

(১)

কত শত বর্ষ আগে কবি কালিদাস,
শিপ্রা-তটে কুঞ্জ-ছায়ে তুলি' কলভাষ
সারস্বত যন্ত্র-যোগে মেঘদূত-গীতি
গেয়েছিলে উদ্বোধিতে পূর্ব-প্রেম-স্মৃতি
পুঞ্জিত যা' নর-চিত্তে হ'য়ে ধীরে ধীরে—
সঞ্জীবিত হয় শেষে মেঘান্ধ তিমিরে।
মেঘ-মল্লারের সাথে বিরহীর গান
দিনে দিনে ভারাতুর করে শুধু প্রাণ ;
তা' যে কেহ কভু আর ভোলে সাধ্য নাই ;
যুগে যুগে কবি-কণ্ঠে বাজে নিত্য তাই।
এবে মেঘ-ভারে যবে মহাশূন্য ভরে,
'মেঘদূত'-দৌত্য-কথা শুধু মনে পড়ে।
এই গুপ্ত দৌত্য যা'র বাণীতে বিধৃত—
তাহারে কি হ'তে পারে এ বিশ্ব বিস্মৃত!

(২)

আষাঢ়-প্রারম্ভ-দিনে মত্ত মেঘ হেরি'
বপ্রক্রীড়ারঙ্গময় মাতঙ্গের মত
তা'রেই প্রেমার্ত প্রাণে দিলে দৌত্য-ব্রত ;
হায় যক্ষ—যক্ষ-স্রষ্টা, স'হিল না দেরি!
আসিবে শ্রাবণ-মেঘ স্নিগ্ধ শূন্য ঘেরি'
শ্যাম-কান্ত, অনুদ্‌ভ্রান্ত, সম্প্রীতি-সন্নত,
পরিপক্ক, সেবা-দক্ষ ; সে নহে উদ্ধত ;
নাহি তা'র আষাঢ়ের প্রচারের ভেরি।
বিদগ্ধ দৌত্যের সে যে যোগ্য অধিকারী ;
বার্তা তা'র—প্রেমিকের, প্রিয়ার সান্ত্বনা।
প্রগল্‌ভ আষাঢ়-মেঘ আড়ম্বর ছাড়ি'
দৌত্য কি করিতে পারে? দৌত্য যে সাধনা।
শ্রাবণের মেঘই পারে হ'তে মর্মচারী।
মেঘদূতে দৌত্য কোথা, সবই তো কল্পনা!

(৩)

মহাকবি কালিদাস মন্দাক্রান্তা-তালে
অমর প্রেমের কাব্য আনন্দে রচিয়া,
যুগ-যুগ-প্রবাহিত মানবের হিয়া
সুতৃপ্ত করিছে মর্ত্যে নিরবধি কালে।
যে বিরহে চিত্ত দহে, ভাব-স্বপ্ন-জালে
সে অতনু প্রেমে নিত্য রস-মূর্তি দিয়া
'রামগিরি'-'অলকারে' দিয়াছে ভরিয়া ;—
কল্পনার 'মেঘদূত' সেই বার্তা ঢালে।
প্রেমে তাপ, প্রেমে তৃপ্তি ; প্রেমে কাঁদে, হাসে
নর-নারী রঙ্গময় জঙ্গম ধরায় ;
প্রেম হেথা মৃত্তিকার যত ভার নাশে ;
স্বর্গে—মর্ত্যে গড়ে সেতু পূর্ণ মহিমায়।
তনুর বার্দ্ধক্য—নাশ আছে কাল-গ্রাসে ;
তনু-সার প্রেম কাব্যে অমৃত বিলায়।

(৪)

সহসা পড়িল মনে যক্ষ-যক্ষিণীরে।
রামগিরি-নির্বাসন-বিরহ যাপিয়া,
বর্ষান্তে আবার যক্ষ প্রেমাপ্লুত হিয়া
প্রিয়া-পাশে অলকায় আসিয়াছে ফিরে।
মেঘদূত যে বারতা দিলো প্রেয়সীরে
যক্ষের সে মর্ম-কথা সঙ্কেতে শুনিয়া
আশাবন্ধে এত কাল বিরহিণী প্রিয়া
যাপিয়াছে প্রেম-দীর্ণ বিশীর্ণ শরীরে।
নির্বাসন-বিরহাগ্নি দারুণ দহনে
পুট-পাক হ'য়ে প্রেম হোলো প্রেম-সার।
ব্যবধানে প্রেম-ধ্যান যুগল জীবনে
অবলুপ্ত করিল যে সকল বিকার।
প্রভু-শাপ—শাপ নহে,—বুঝিল দু'জনে ;
স্বাধিকার-প্রমত্ততা ঘটিবে না আর।

অসংসারী

শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

*

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

তেইশ

মাস দেড়েক পরের ঘটনা। সমীরের সংসারে নতুন এক অঘটন ঘটল।

রোজ তারিখেই সমীর দুপুরে বাড়ী ফেরে বারোটা থেকে একটার মধ্যে, আবার আড়াইটে তিনটে নাগাদ বেরোয়। রেণু সেই অনুসারেই ধীরে সুস্থে রান্না বাড়া করে, কিন্তু আজ সমীর হন্তদন্ত হয়ে বাড়ী এলো নটার সময়। দরজায় শব্দ শুনে রেণু দরজা খুলতেই সমীর বলে, দেখ, রেণু, যা বলে'ছলুম, ঠিক তাই। এই দেখ, চিঠি এসে গেছে।

কিসের চিঠি দাদা, রেণু অবাক হয়ে সমীরের মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

পিসিমার ভাসুরপো চিঠি লিখেছে, পিসিমা বৃন্দাবনে দারুণ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তার অফিসের ছুটি নেই এবং বৃন্দাবন কলকাতা থেকে অনেক দূরও বটে, অতএব দিল্লী থেকে আমি যেন গিয়ে পিসিমাকে দেখাশুনা করি।

ওমা সেকি, পিসিমা এখনও কাশীতে ফেরেন নি ?

না। পিসিমার গুরুভাই সেই হাঁপানী কাসির বুড়োটা ফাঁকি দিয়ে আমার কাছ থেকে গোছা গোছা টাকা মেরে দিয়েছে। সেইজন্যেই সে লিখ্‌তো, তার নামে টাকা পাঠাতে, তা নাহলে সে শা—রে ফৌজদারীতে জড়িয়ে পড়তো।

বল্‌তে বল্‌তে তোয়ালেটা কাঁধে ফেলে সমীর দৌড়ে গিয়ে কল ঘরে ঢুকলো।

রেণু কলঘরের দরজায় এসে বাইরে থেকে জিজ্ঞাসা করলে, দাদা কি এমনই বৃন্দাবন যাবেন ?

ভোর থেকে জবাব এলো হ্যাঁরে, যত আছে এখুনি দিয়ে দে, খেয়ে নিয়ে এখুনি বেরুতে হবে।

রেণুর তখন মাত্র ডালটা হয়েছে, কোন তরিকারিও চড়েনি, এবং ভাত হওয়া ত দূরের কথা, চাল ধোয়া পর্যন্ত হয় নি। সে মনে মনে প্রমাদ গন্‌লে।

তিন মিনিটের মধ্যেই সমীর স্নান সেরে দৌড়ে বেরিয়ে এল। রান্নার অবস্থা শুনে সমীর বল্লে, তবে থাক, দোকানে খেয়ে নেব।

রেণু বল্লে, দাদা; চট্‌পট্ পরোটা আর ডিমভাজা করে দেব ?

কতক্ষণ লাগবে, পনর মিনিটের মধ্যে করে দিতে পারবি ?

পারবো, রেণু দৌড়ে রান্না ঘরে গেল।

সমীর ঘরে ঢুকে জামাপ্যান্ট পরে টাকাকড়ি যা ছিল সব গুছিয়ে নিয়ে নিজের সেই পুরানো হ্যাভার স্যাকে লুঙ্গি গামছা ভরে জলের জায়গাটায় জল ভরে একেবারে তৈরী হয়ে রান্না ঘরে খেতে এসে দেখ্‌লে রেণু থালা পেতে বাটীতে ডাল এবং গেলাসে জল দিয়ে ডিম ভেজে পরটা ভাজতে সুরু করে দিয়েছে।

খেতে খেতে সমীর বল্লে, কি ব্যাপার ভালো বুঝতে পারলাম না। পিসিমা সেই যে কাশী থেকে চলে এসেছিল আর কাশীতে ফেরে'নি। তারপর পিসিমার অসুখের খবর কে একজন অচেনা লোক কলকাতায় তার ভাসুর-পোকে জানায়,সে আমার ঠিকানা জানে না তবে শুনেছিল, যে আমি অমুক ডিপুটী মিনিষ্টারের অফিসে কাজ করি। সেই মিনিষ্টারের ঠিকানায় তার কেয়ার-অফে আমায় চিঠি লিখেছে। সেই চিঠি চারদিন পরে ঘুরতে ঘুরতে আমার

অফিসারের বাড়ীতে কাল সন্ধ্যের পরে এসে পৌঁচেছিল। আজ সকালে ঐ চিঠি দেখে ত আমি অবাক্। অফিসারকে বলে দুদিনের ছুটি করিয়ে তাই তাড়াতাড়ি বাড়ীর চলে এলুম। এখন কি করা যায় বল দেখি?

রেণু বল্লে, নিয়ে আসুন। নইলে অসুস্থ লোককে কার কাছে রেখে আসবেন! আর না হয় ত আমি গিয়ে সেখানে থাকতে পারতুম, কিন্তু—

সে হয় না, তোকে দেখলেই পিসিমা ক্ষেপে যাবে। কিন্তু এলেও কি--

সে ভার আমার ওপোর দাদা, আমি পিসিমাকে ঠিক হাত করে নেব।

যেমন আমায় করেছিস্, হাসতে হাসতে সমীর উত্তর দিলে।

কি যে বলেন দাদা—

আহারাদি শেষ করে হাত ধুয়েই সমীর এক কাঁধে ঝোলা অন্য কাঁধে জলের জায়গাটা ঝুলিয়ে নিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে গেল। যাবার সময় রেণুকে বলে, টাকাকড়ি কিছু ঐ টানার মধ্যে রইল, যা দরকার হয় নিস্। রেণু এর কোন জবাব দিল না, অস্ফুট কণ্ঠে শোনা গেল, দুর্গা শ্রীহরি, দুর্গা দুর্গা দুর্গা।

সারা দিন ধরে রেণুর কাজের আজ অন্ত নেই। যে ঘরটায় রেণু থাক্‌তো, সেই ঘরটাকে ভালো করে ঝেড়ে মুছে লেপ কম্বল সমস্তই বিছানা মধ্যে পেতে পিসিমার জন্য বন্দোবস্ত করে নিজের যৎসামান্য জিনিস রান্নাঘরের একটা তাকে গুঁজে রেখে বিকেল থেকে সে অপেক্ষা করে বসে আছে, কখন ওরা আসে। এমনি করে সন্ধ্যা হয়ে গেল। সন্ধ্যা দেখিয়ে রেণু শাঁখ বাজালে। এই শাঁখ সে এ বাড়ীতে আসার ক'দিন পরেই সমীরকে অনেক তাগিদ এবং খোসামত করে আনিয়েছে। তারপর রাত্রি যখন ৯টা বাজলো তখন রেণু ভাবতে লাগল উনুনে আগুন দেবে কিনা? এতক্ষণে তার মনে মনে গভীর সন্দেহ হতে লাগলো, ওরা আজ রাত্তিরে ফিরবে কিনা? রাত্রি দশটার সময় রেণু কিছু চিড়ে নিয়ে সকালের ডাল মেখে লবণ দিয়ে সেই চিড়ে গলাধঃকরণ করে শুয়ে পড়লো। ঘি-ময়দা সবই ছিল বটে কিন্তু নিজের জন্য আর উনানে আগুন দিতে রেণুর ইচ্ছে হোল না।

রাত্রি তখন বোধ হয় এগারটা হবে, একখানা গাড়ী এসে ওদের বাড়ীর দরজার দাঁড়ালো। এখন বেশ গরম পড়ে গেছে রেণু আজ সমীরের ঘরের মেঝেয় তার বালিশটি মাথায় দিয়ে একখানা সতরঞ্চি পেতে খালি গায়েই শুয়েছিল। শোয়ার আগে সে অনেক ভেবেছিল, রান্নাঘরে শোবে কি না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঠিক করলে, না, দাদার ঘরেই শোবে, কারণ দাদার ঘরে অনেক টাকা কড়ি থাকে এবং দুষ্টু লোকেরা নিশ্চয়ই খবর রাখে যে, আজ রেণু এ বাড়ীতে একলা আছে। তার একটু ভয় ভয়ও করছিল। কাজেই দাদার ঘর তালা বন্ধ রাখা নিরাপদ নয় মনে করে সে নিজেই এই ঘরে এসে শুয়েছিল। একটু সজাগও ছিল। বাইরে মোটরখানা দাঁড়িয়ে একটু গর্জন করে থেমে যেতেই রেণু উৎকর্ণ হয়ে রইলো। তারপর গাড়ীর দরজা খোলার শব্দ এবং তারপরেই বাইরের দরজায় সমীরের অভ্যস্ত করাঘাত।

রেণু ধড়মড় করে উঠেই দরজা খুলে দিলে। সমীর বল্লে, রেণু, বাইরে আয়ত, পিসিমাকে গাড়ী থেকে নামাতে হবে।

ওরা দুজনে ধরাধরি করে পিসিমাকে গাড়ী থেকে নামালে। পিসিমা কোনরকমে দুজনের ওপোর ভর দিয়ে ঘরে এসে ঢুকেই বিছানার দিকে যেতেই রেণু বললে, পিসিমার জায়গা ও ঘরে করে রেখেছি। ধরাধরি করে পিসীমাকে রেণুর ঘরের বিছানায় নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিয়েই সমীর দৌড়ে বাইরে গেল। গাড়ী থেকে পিসিমার পুঁটলি, লাঠি নিজের ঝোলা, ইত্যাদি সমস্ত নিয়ে ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে সে যখন এসে আবার পিসিমার ঘরে ঢুকলো, তখন পিসিমা ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, একটু জল দেনা সমীর।

রেণু তাড়াতাড়ি কুঁজো থেকে গেলাসে করে জল আনতেই পিসিমা বললে, ওর হাতের জল আর কেন, তুই একটু দে না বাবা।

রেণু দু'পা পিছিয়ে গেল। সমীর রেণুর মুখের দিকে চেয়ে দেখে নিজে তাড়াতাড়ি কুঁজোটা তুলে নিয়ে পিসিমার কাছে এগিয়ে এল। পিসিমা তার কম্পমান হাতে গণ্ডুষ করে জল নিয়ে নিজের মাথায় থাবড়ে দিয়ে বললে একটু জল খাব। অন্য গেলাস থাকেত তাইতে করে, না হয়ত আমার ঘটিটা ধুয়ে দে।

রেণু কাঠের মত জলের গেলাস হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েই রইলো। সমীর তাড়াতাড়ি পিসিমার পুটলী থেকে ঘটি বার করে বললে, রেণু এটা ধুয়ে দেত, বলেই সামলে নিয়ে বললে, আচ্ছা আমিই ধুয়ে দিচ্ছি, বলে সেই কুঁজো নিয়ে ঘরের বাইরে এসে ঘটি ধুয়ে আধ ঘটি জল কুঁজো থেকে ঘটিতে ঢেলে পিসিমার কাছে নিয়ে এল। পিসিমা কাৎ হয়ে সেই ঘটিতে মুখ দিয়ে সামান্য একটু জল খেলেন। তাঁর ঠোঁট দুটো থর্‌থর্ করে কাঁপছিল।

জল খেয়ে বিছানায় শুয়ে পিসিমা একটু সুস্থ হয়ে বললেন, বাবা সমীর, তুই যে এমনি করে আমাদের সর্ব্বনাশ করবি, তা কি আগে জানতুম? আমি যে কাশীতে ফিরে আজ গেলুম না সে তো তোরই জন্যে। আঠারো টাকা মাসোহারায় কি আর কাশীতে আজকালকার বাজারে বেঁচে থাকা যায়। তা তুই যে টাকা পাঠিয়েছিস আর সেই মুখপোড়া যে এইভাবে ফাঁকি দিয়ে টাকা নিয়েছে, তা আর আমি কি করে জানবো বল।

সমীর বললে, যাক্‌গে পিসিমা, ওসব কথা এখন থাক্, তুমি একটু সুস্থ হও।

আর সুস্থ! এখন মানে মানে যেতে পারলেই হয়। তোর এই অধঃপতন দেখার আগে গেলেই ছিল ভালো। কিন্তু তা ত আর হোল না। ভগবান যে সবটাই দেখাবেন আমাকে। একটু থেমে বললেন, মঙ্গলময়ের ইচ্ছা, আমি আর কি বলবো বল।

সমীর বললে, পিসিমা এখন আর কোন চিন্তা কোরো না। এখন ভালো হয়ে ওঠো, তারপর ধীরে ধীরে বুঝতে পারবে, রেণু কত ভালো মেয়ে।

সে বুঝে আর কাজ নেই বাবা, সে বুঝে আর কাজ নেই, পিসিমা মাথা নাড়তে নাড়তে বলতে লাগলেন। ও সব বোঝাবুঝি আর আমি কিছুই করতে চাইনা, কেবল এইটি কোরো, যে কদিন উঠতে না পারি, সে কদিন যেন ও আমার কাছে না আসে, আর আমার জল পথ্য যেন ও না ছোঁয়।

সমীর আর থাকৃতে পারলে না। বললে, পিসিমা কুঁজোর জলটা-ত ওই তুলে রেখেছিল।

তাত রাখবেই, তাত রাখবেই, ওই-ত এ বাড়ীর সর্ব্বেসর্ব্বা, তবে স্পষ্ট চোখের সামনে দেখে ওর দেওয়া জলটা আর কি করে নিই বল: একটু থেমে বললেন, ও সমীর, তুই আমার শেষ জীবনে বড় দাগা দিয়ে গেলি বাবা, বড় দাগা—

রেণু চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। রান্না চড়াবে কি না, দাদাকে জিজ্ঞাসা করার সাহস পর্য্যন্ত তার নেই, অথচ দাদাকে আলাদা ডেকে নিয়ে যে জিজ্ঞাসা করবে, সেটাও পিসিমার সামনে অভাবনীয়। সে বেচারা আস্তে আস্তে পিছু হটে বাইরে বেরিয়ে জলের গেলাসটা নামিয়ে রেখে সমীরের ঘরের দরজা দিয়ে ওর ঘরে এসে সতরঞ্চি আর বালিশটে নিঃশব্দে তুলে নিয়ে রান্নাঘরের সামনে জড়িয়ে রেখে দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলো কি করা যায়।

সমীর একসময় সাঁ করে বেরিয়ে এসে বললে, কি রে উনানে আগুন-টাগুন আছে? রেণু ভয়ে ভয়ে বললে, উনান ধরাবে দাদা।

হ্যাঁ, ধরা। পিসিমার জন্যে বার্লি করতে হবে, আর আমারওত সেই সকালের পর থেকে আর কিছুই খাওয়া হয় নি।

কিন্তু বার্লি, এই পর্য্যন্ত বলেই রেণু থেমেগেল।

হ্যা হ্যা বার্লি। ভয় নেই আমি এক কৌটো বার্লি কিছু মিশ্রী এ সবই কিনে এনেছি। আমার ঐ ঝোলাটার মধ্যেই সব আছে। তুই আগে বার্লি করে পিসিমাকে দে, তারপর আমার খাবার করিস।

কিন্তু আমি করলে উনি খাবেন কি?

আমি নিয়ে গিয়ে ওকে দেব'খন, বলব তখন আমি করেছি, বলে হাসতে হাসতে সমীর ও ঘরে ঢুকে নিজের ঝোলাটা নিয়ে বললে, পিসিমা, তুমি শোও আমি কাপড় চোপড় ছেড়ে হাত মুখ ধুয়ে নিই।

তাই ধোও বাবা, তাই ধোও। উঃ কি কষ্ট, ভগবান। এত দুঃখও দিলে।

রেণু উনানে আগুন দিয়ে হাত ধুয়ে সমীরের ঘরে এসে ঝোলাটা নিয়ে মিশ্রী, বার্লি, লেবু সমস্ত বার করে নিয়ে গেল। আধঘণ্টার মধ্যেই বার্লি তৈরী শেষ করে সমীরকে ইসারায় ডাক দিলে। সে পিসিমার বিছানার ধারে চেয়ার নিয়ে বসে আস্তে আস্তে কত কি সব কথা বলছিল। সমীর এসে একটুখানি অপেক্ষা করে

বার্লি নিয়ে ঘরে গিয়ে ঢুকলো, বল্লে পিসিমা, বার্লি তৈরী করলুম।

পিসিমা বল্লেন, আহা বাবা, এই রাত্তিরে আবার বার্লি! তা করেছ বেশ করেছ, কিন্তু আমায় যে গাড়ীর কাপড়,—ছাড়তে হবে যে।

পিসিমার পুঁটলী থেকে আর একটা থান বের করে দিতেই পিসিমা বল্লেন, ওগুলো সবই কাচ্‌তে হবে, সবই ত গাড়ীর কাপড় বাবা। তুমি আমার ঐ কেটের কাপড়খানা বার করে দাও, ঐটে কোমরে জড়িয়ে বার্লিটা খেয়ে নিই, আর বাকীগুলো সব কেচে দিতে হবে।

পবিত্র কেটের কাপড়টা কোনো কালেও বোধহয় কাচা হয় নি। সেটা থেকে এত দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে যে, সেখানা পুঁটলী থেকে টেনে বার করেই সমীর বল্লে, ওঃ, এটা যে ভয়ানক নোংরা পিসিমা।

পিসিমা ম্লান হেসে বল্লেন, কেটের কাপড় কি আর নোংরা হয় বাবা, ঐটে আমায় দাও। বলে কাঁপতে কাঁপতে উঠে বসে সেখানা হাত বাড়িয়ে নিয়ে কোমরে জড়িয়ে পরণের কাপড়খানা পুঁটলী পাকিয়ে মেঝের ফেলে দিয়ে কুঁজোর জলে হাত ধুয়ে বার্লিটা খেয়ে একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বল্লেন. উঃ, সেই দুপুরবেলা একটু মিশ্রীর জল খেয়েছিলুম, তারপর এই খাচ্চি।

পিসিমাকে শুইয়ে দিয়ে সমীর বল্লে, তাই বুঝি পিসিমা গাড়ীতে জল পর্য্যন্ত খেলে না—

কি করে খাই বল বাবা, গাড়ীর চাকা যে কত নোংরা জিনিষের ওপোর দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে, গাড়োয়ান কি আর কিছু দেখেশুনে চালায়, না চালাতে পারে?

সমীর বল্লে, কিন্তু পিসিমা, এ বাড়ীতে এসেই যে তুমি জল খেলে. তাতে দোষ নেই?

ঐ সব তোমরা আজকালকারের ছেলেরা বড্ড কথার ছল ধরো। তখন কি করবো বল, আতুরে নিয়ম নাস্তি, এ ত আমাদের শাস্ত্রেরেই আছে বাবা।

হাস্‌তে হাস্‌তে পিসিমার ছাড়া কাপড় আর পুঁটলীর সুতী কাপড়গুলো নিয়ে সমীর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে কলঘরে যেতেই রেণু কাছে এসে অস্ফুট কণ্ঠে বললে দাদা. ও সব নিয়ে কি করবেন?

কাচতে হবে।

রেণু ফিস্‌ফিস্ করে বললে, ওগুলো রাখুন ত, আমি কাচলেও চলবে। আপনি আসুন। আপনার খাবার হয়েছে।

সমীর কাপড়গুলো কলঘরের দরজার সামনে রেখে রান্নাঘরের সামনে খেতে বস্‌লো। খেতে খেতে বললে তোর খাওয়া দাওয়া সব হয়ে গেছে ত?

হ্যা, রেণু অস্ফুট কণ্ঠে উত্তর দিলে।

কি করেছিলি? পরোটা? এ বাড়ীতে আসার পর থেকে সমীর রেণুর জন্য নিজের সঙ্গে একই রকম পরোটা করিয়ে তবে ছেড়েছে।

রেণু বললে, না, আমি আর কিছু করি নি। সকালের ডাল দিয়ে চাট্টি চিঁড়ে খেয়েছিলুম।

বলিস্ কি রে! ওঃ, কি কুড়ে তুই! আমি বাড়ীতে নেই বলে উনুনই ধরাস্ নি? কি করলি সারাদিন ধরে?

ঘুমালুম, রেণু হাস্‌তে হাস্‌তে উত্তর দিলে।

বেশ করেছিস্, তাহলে এখন খাবার করেছিস ত?

নাঃ, এত রাত্তিরে খাবো না।

সে কি? সমীর বিস্মিত হোল। তবে আমি আর খাবো না, এই চারখানা তুই খাবি। দাদার পাতে খেতে কোন দোষ নেই, আর এতেত মাছ ডিম কিছুই নেই।

ব্যস্ত হয়ে রেণু বললে, না না দাদা, ও আপনি খেয়ে নিন, ও আপনি—

স্মিতমুখে সমীর বললে, বেশ তবে আমি চুপ করে বসে রইলুম, তুই আগে নিজের খাবার কর তবে আমি খাব।

রেণু বললে, না দাদা, এ বড় অন্যায়।

নির্ব্বিকার মুখে সমীর বললে, এ রকম অন্যায় কাজ আমি করেই থাকি, তুমি আগে নিজের খাবার কর, তারপর আমি এগুলো খাচ্ছি।

বাবা বাবা, এত কষ্টও দিতে পারেন দাদা, বলে পরম তৃপ্তিমুখে রেণু ঘর থেকে কিছু আটা এনে জল ঢেলে সমীরের সামনেই মাখতে বস্‌লো। বললে, এবার খাও, এইত আমার খাবার করছি।

আহারাদি শেষ করে সমীর বললে, আজ আর পান নেই? সমীর এই কিছুদিন হোল পান খেতে সুরু

করেছে। হ্যাঁ, আছে বইকি, আজ দুপুরের পান ত আপনি খান নি, একটু হেসে রেণু বললে কিন্তু দাদা, কাল সকালেই বাজার চাই, কারণ আজ বিকালেত আর বাজার করে আনেন নি।

সমীর বললে, আচ্ছা।

পিসিমার ঘরে গিয়ে সমীর দেখলে, পিসিমা ঘুমুচ্ছেন। আস্তে আস্তে আলোটা নিভিয়ে দিয়ে সমীর আবার রান্নাঘরে এলো। রেণুর তখন পরোটা ভাজা শেষ হয়ে গেছে।

সমীর বললে, শোয়ার ব্যবস্থা কোথায় করেছিস্‌রে?

সে আমি করে নিয়েছি, রেণু উত্তর দিলে।

আমার ঘরের মেঝেয় থাকতে পারিস্।

বাপরে, রেণু হেসে উঠলো। পিসিমা তাহলে—

সমীরও হেসে উঠলো। বললে, বুড়োমানুষকে নিয়ে বড় বিপদ সমীর। সিগারেট ধরালে বললে, সারাদিন সিগারেট খেতে পাইনি। এক গাড়ীতে আসছি যে।

থালায় করে পরোটা নিয়ে খেতে বসে রেণু বললে বেশ হয়েছে, অত সিগারেট খান কেন। একটু থেমে বললে, কিন্তু দাদা, পিসিমা যাই বলুন, আপনি যেন আমার জন্য ওঁকে একটাও কড়া কথা বলবেন না।

না রে না, কিন্তু তোর ওপোর লাঞ্ছনা গঞ্জনা অনেক চলবে, সব সহ্য করতে পারবি ত?

হাসিমুখে। পিসিমার সেবা করবো, এ ত আমার সৌভাগ্য!

একটু চুপ করে থেকে সমীর বললে, ওঃ রেণু, তোকে আমি যত দেখছি তত অবাক হয়ে যাচ্ছি। ভগবান তোকে কি মাটী দিয়ে তৈরী করেছিল রে?

গোবরমাটী দাদা, একদম গোবর, বোধ হয় ষাঁড়ের নাদ! হাসতে হাসতে রেণু উত্তর দিলে। সমীর বললে, ঠিক তাই। ষাঁড়ের নাদ, যা দিয়ে বামুনের ছেলের পৈতে হয়, যেটা না হলে সত্যিকার ব্রহ্মচারী তৈরী হয় না।

রেণুর খাওয়া শেষ হওয়ার পর সমীর ঘর থেকে উঠে গেল।

বাইশ দিন পরে। ডাক্তারী চিকিৎসায় পিসিমা বেশ একটু শক্ত হয়ে উঠলেন। সন্ধ্যার পর ডাক্তার এসে ভালো করে দেখে বললেন, আর কোন গোলমাল হবে না, কাল দুটি ভাত খান না।

ওষুধ পত্তর? সমীর জিজ্ঞাসা করলে।

থাকনা ওষুধ আর কি দরকার? তবে ঐ বড়িটা আরও দিন পনের চালিয়ে যান। ফির টাকাগুলো পকেটে পুরে বাঙালী ডাক্তার নিজের গাড়ীতে গিয়ে বসলেন।

পরের দিন সকালে পিসিমার আদেশমত রেণু তোলা উনুন ধরিয়ে ভেতরের বারাণ্ডায় ব্যবস্থা করে দিলে। পিসিমা নিজে কল থেকে জল ধরে কোনমতে নিজের ভাতটা চড়িয়ে দিলেন। সমীর সকালে যথারীতি বেরিয়ে গেল।

রেণু দূরে বসে বললে, পিসিমা, এবরে দাদার একটা বিয়ে দিন। বুড়োবয়সে আপনি আর নিজে কাঁহাতক রাঁধাবেন। এবার বৌ-এর রান্না ভাত খান।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে পিসিমা বললেন, সবই ত হয়, আগে তুমি কালামুখী এ বাড়ীথেকে বেরোও, তবে ত। নইলে কোন্ ভদ্রলোকের মেয়ে এ বাড়ীতে ঢুকবে?

হাসিমুখে রেণু বললে, আমি ত তৈরীই আছি, পিসিমা। দাদা সংসারী হোন, আমার ব্যবস্থা আমি নিজেই করে নেব।

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে পিসিমা রেণুর মুখের দিকে চেয়ে বললে, ও সব ছলনায় আমি ভুলিনা রে কানি, ও সব ছলনা আমার কাছে করিস নি। ও সব ঐ বোকাটার কাছে করিস। রেণু জানে, সমীর বাড়ীতে থাকলে পিসিমা তবু একটু ভদ্রভাবে কথা বলেন, কিন্তু সমীর বেরুলে পিসিমা রেণুকে গালাগালি না দিয়ে কোন কথাই বলেন না। তবে রেণুর সেগুলো এই কদিনেই অভ্যাস হয়ে গেছে।

ঘুঁটেউলি এসে পাশের দরজা ঠেলে উঠানে ঘুঁটের ঝুড়ি নামালে। বললে, গৈঠা লেবে দিদিমণি?

রেণু বললে, হাঁা, আট আনার ঘুঁটে দিয়ে যাও।

রান্নাঘরের পাশে ছোট একটা চালা আছে, তার মধ্যে গুনে গুনে ঘুঁটে দিয়ে সে বললে, আট আনার দিয়েছি দিদিমণি।

রেণু সমীরের ঘর থেকে পয়সা এনে ঘুঁটেউলিকে দিয়ে দিলে।

এখানে ঘুঁটে কত করে, পিসিমা প্রশ্ন করলে।

আনায় তিনখানা, রেণু উত্তর দিলে।

ও বাবা, এত দাম ঐত ছোট ছোট ঘুঁটে! তা বাছা তুমি ত গুনে নিলে না।

ও ঠিকই দেবে।

হুঁ, যার যাক, তার যাক তোমার কি, ফাটে না ফোটে। বেশ আছিস কালামুখী, কোন হিসেব নেই, পত্তর নেই, বেশ দুপয়সা বাগিয়ে নিচ্ছিস এখানে।

রেণু এ কথার কোন জবাব দিলে না।

পিসিমা উচু হয়ে বসেছিলেন। দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে পা-টা ছড়িয়ে বললেন, হ্যাঁরে কালি, সমীরের টাকা পয়সা সববুঝি তোর কাছেই থাকে।

রেণু বললে, না, আমার কাছে থাকবে কেন পিসিমা। তাঁর টাকা তিনিই রাখেন।

তবে যে ঐ ঘুঁটের দাম দিলি?

খরচের টাকা কিছু আছে ও ঘরে, সেইখান থেকে দিলুম।

যার ধন তার ধন নয়, নেপোয় মারে দই, পিসিমা আপন মনেই কথাগুলো উচ্চারণ করলেন। বেগতিক দেখে রেণু রান্নাঘরে চলে গেল। একটু পরে কিছু কাঁচা তরকারী আর বঁটি এনে বললে পিসিমা, তরকারী কি আমি কুটে দেব?

তোমার দয়া, পিসিমা উত্তর দিলেন।

রেণু কুটতে বসতেই পিসিমা বললেন, এখানে আলুর কি দর রে?

তা ত জানিনা পিসিমা

এ সব বাজার করে কে?

দাদাই করেন।

কেন তুমি ভুম্বো হাতী গতর নিয়ে বসে থাকো, আর ও একলা মানুষ দুবেলা অফিস করবে, বাজার করবে, এতে কি তোমার ভালো হবে?

কি করবো পিসিমা, দাদা যে আমায় বাড়ী থেকে বেরুতে দেন না?

আর দাদা-দাদা করিস নি, ও সব কথা কানে শুনলেও পাপ। এক বাড়ীতে ঝি খাট্‌তে খাট্‌তে এ বাড়ীতে এসে রাণী হয়ে বসেছেন। আবার বগ্‌ করে চুল ছাঁটা হয়েছে!

বগ্‌ করে কি পিসিমা?

ঐ যে কি বলে বাপু আমি অতশত জানি না। ঐ মেমমাগীগুলো যেমন বগ্‌ করে চুল ছাঁটে, ঝমর ঝমর করে—

হেসে রেণু বল্লে, বগ করে ছাঁটি নি পিসিমা, সেই যে প্রয়াগে মাথা মুড়িয়ে ছিলুম, তারপর এই ক'মাসে এইটুকু আবার হয়েছে।

যা-যা,আবার মাথা মুড়ুগে যা তুই যদি সত্যিই বিধবা হোস, তাহলে আবার অত মাথার বাহার কেন রে। এ দিকে ত রূপের ধুম্রলোচন; কানী কোথাকার! পিসিমা একটা বিশ্রীরকম মুখভঙ্গী করলেন।

তরকারী কোটা শেষ করে রেণু বল্লে, এ গুলো ধুয়ে আনি পিসিমা।

না বাবা রক্ষে কর, আমি নিজেই ধুয়ে নিচ্ছি।

পিসিমার জন্যে সমীর একটা নতুন বালতী কিনে এনেছিল। তাইতে এক বালতী জল ধরে সমীর স্বহস্তে পিসিমাকে দিয়ে গেছে সকালে বেরোবার আগে। সেই জলে তরকারীগুলো ধুয়ে নিয়ে পিসিমা থালার ওপোর রেখে আপন মনেই বল্লেন, ওঃ, কি পাপের ভোগেই যে পড়েছি।

রেণু বল্লে, পিসিমা একটা কথা বল্‌বো?

বলো।

রেণু নিজের বাঁ হাতের নখ গুলো দেখ্‌তে দেখ্‌তে ধীরে ধীরে বল্লে,পিসিমা, আমি ভালো ব্রাহ্মণের মেয়ে, এবং আমি খারাপও নই, কিছুই নই। সমীর বাবুকে সত্যিই দাদার মত দেখি—

থাম্‌ থাম্‌, কালামুখী আর বলিস্‌ নি। যতই রোগে ভুগি না কেন চোখ আমার এখনও আছে। যেদিন প্রথম এলুম, সেদিন কি আমি দেখিনি? সমীরের ঘরের বাসর শয্যা পেতে কে শুয়েছিল? বাবু আসবে, হাত ধরে তুলবে, আদর যত্ন করবে—ছিঃ, আবার কথা বল্‌তে এসেছে! রেণু তাড়াতাড়ি পিসিমার সামনে থেকে পালিয়ে গেল। পিসিমা আপন মনে বলে চল্লেন, আবার বিনিয়ে বিনিয়ে বল্‌তে এসেছে আমি খারাপ নই। আমি আমাতে কানীর বুকখানা ফেটে যাচ্ছে, আমি কি

পড়েছে। যত সব বিষ কুম্ভ পয়োমুখ! তুমি আমাকে এসেছ বোকা বানাতে! একটু থেমে বল্লেন, কি করবো, বিধির বিপাক, বলে পড়েছি হারামের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে, আমার হয়েছে তাই। এ পোড়া অদৃষ্টে যে আরও কত কি আছে এই বলে পিসিমা আরও' সব কত কি গজ্ গজ্ করতে লাগ্লেন।

রেণু রান্নাঘরে এসে দুহাত কপালে ঠেকিয়ে বল্লে, ভগবান, সহ্য করবার ক্ষমতা বাও, যেন একবারের জন্তও কোন কটূ কথা না বলে ফেলি। তার চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ করে জল পড়তে লাগ্লো। এক ঘণ্টার মধ্যে সে আর পিসিমার সামনে এলো না।

পিসিমার রান্না শেষ হয়ে গেছে। পিসিমার দুধের বাটী ও তরকারীটা নিজের ঘরের মধ্যে এনে রেখে আবার বাইরে এসে ভাতের হাড়ীটা নিয়ে ঘরে যেতে গিয়ে হঠাৎ দরজার কাছে বোধ হয় দুর্ব্বলতা বশতঃই মুখ থুবরে পড়ে গেলেন। একটা শব্দ হোল, উঃ।

রেণু দৌড়ে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসেই দেখে ভাতের হাড়িটা পড়ে গেছে তার উপর পিসিমা হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছেন। গরম ভাতের ভাপ উঠ্ছে চারদিক দিয়ে। বুড়ো মানুষ পাছে পুড়ে যান সেই ভয়ে সে তাড়াতাড়ি এসেই পিসিমার হাত ধরে উঠিয়ে সযত্নে জিজ্ঞাসা করলে, পিসিমা, লাগে নি ত?

রেণুর হাতে ভর দিয়ে উঠেই পিসিমা হাঁউম'উ করে কেঁদে বল্লেন, কালামুখী, আমায় ছুঁয়ে দিয়ে আমার ভাতটা নষ্ট করলি ত? রেণুকে হরে কাঁপ্তে কাঁপ্তে একটু সরে গিয়ে বসে চীৎকার করে কেঁদে উঠে বল্লেন ওঃ কি শত্তুরই যে সমীর বাড়ীতে এনে পুরেছে। কতকাল পরে আমি আজ দুটি ভাত খাব সেই সকাল থেকে কানী যেন ছট্‌ফটিয়ে মরছে। এখন হোলত, আমার ভাত খাওয়াটা ঘুচিয়ে দিলি ত? হাঁপাতে হাঁপাতে পিসিমা বল্লেন, তোর মনস্কামনা সিদ্ধ হয়েছে ত? তবু আমি আমার ভাইপোর অন্ন খাচ্ছি, আর কারুর নয়।

পিসিমার চীৎকার বেশ একটু জোরেই হয়েছিল। রেণু ব্যস্ত হয়ে কি বলে যে পিসিমাকে স্তোকবাক্য দেবে ভেবে পাচ্ছিল না, কাছে দাঁড়িয়ে সে যেন ভয়ে কাঁপছিল, এমন সময় ভেতরের উঠানের খোলা দরজা দিয়ে এ বাড়ীতে এসে ঢুকলেন, পাশের বাড়ীর বাঁকুড়া জেলার সুপারিন্‌টেণ্ডেটের স্ত্রী। তিনি এ বাড়ীতে এই প্রথম পদার্পণ করলেন, তবে এ বাড়ীতে যে সমীর বাবুর পিসিমা অসুস্থ হয়ে বৃন্দাবন থেকে এসেছেন, সে খবর তিনি দশ বারো দিন আগেই কর্ত্তার কাছ থেকে পেয়েছিলেন। এ-বাড়ীতে সকাল সন্ধ্যে ডাক্তার আসায় পাড়ার সকলেই সমীরকে জিজ্ঞাসা করিত ব্যাপার কি? দুষ্টু লোকেরা মুখ বেঁকিয়ে বলেছিল, আরও কত ডাক্তার আসবে, হয়ত লেডি ডাক্তার পর্য্যন্ত।

পাশের বাড়ীর গিন্নি এসে বিনা ভনিতায় রোয়াকে উঠে বল্লেন, ওমা, উকি, ভাতের হাঁড়ি কাৎ হয়ে ভাত ছড়াছড়ি. পিসিমা কান্নাকাটি করছেন, ব্যাপার কি?

পিসিমা তার মুখের দিকে চেয়ে তার জাঁদরেল চেহারায় আকৃষ্ট হয়ে যেন কতকালের চেনা এই ভঙ্গিতে বল্লেন, এসো মা, এস। কি পাপের ভোগেই যে পড়েছি, তার আর কি বল্‌বো। এখন দেখ্‌ছি, এই করতেই সমীর আমাকে এখানে এনেছিল।

সেই গিন্নী ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বল্লে, কি হোল, আজ? আমি কদিন থেকেই শুনছি, আপনি বৃন্দাবন থেকে অসুখ নিয়ে এসেছেন, ছেলেদের মুখ থেকে আপনার খবর সব পাই, কিন্তু পোড়া সংসারের কাজ চুকিয়ে এ এদিকে আসবার সময় আর পাই না। তা আজ কি হোল আপনার?

আর আমার বরাৎ! পিসিমা কপালে করাঘাত করে বল্লেন, আমার বৃন্দাবন যাওয়াও ওঁর জন্যে, আর এতদিন পরে আজ দুটো পথ্য করতে বলে গেছে; তা সেও ঘুচে গেল ওর জন্তে, বলে সামনের দাঁড়িয়ে থাকা নতমুখী রেণুর দিকে আঙুল দিয়ে পিসিমা দেখিয়ে দিলেন।

কেন কেন, কি ব্যাপার? গিন্নী রেণুর দিকে কট্‌মট্‌ করে চেয়ে পিসিমাকে জিজ্ঞাসা করলেন।

তোমায় আর কি বল্‌বো মা, পিসিমা কান্নার সুরে বল্লেন, ঐ ভাইপোকে এতটুকু রেখে ওর মা গেল মরে। ওর বাপ ওকে আমার কাছে দিয়ে বল্লে, দিদি, তুমি যদি না দেখ, তাহলে এই একরত্তি দুধের বাছাকে বাঁচাতে পারবো না। তা কত্তা ছিলেন মাটীর মানুষ, তিনি বল্লেন বাপ্‌রে। সে কি কথা। তোমার নিজের পেটে ত

ভগবান কিছুই দিলেন না। ভাইয়ের ছেলেকেই নিজের করে নাও। তারপর মা, একপিঠ-রুইকে একপিঠ ভুঁইকে দিয়ে ঐ মা-মরা দুধের ছেলে মানুষ করে তুললুম। তিনটে পাশ করলে ঐ ছেলে, তারপর দেশ দেশ করে কংগ্রেসের কাজ নিয়ে জেল খাটলো, কত কি যে বিপদ গেল, তা আর কি বল্‌বো। শেষে যাহক এই দিল্লীতে এসে ভগবানের কৃপায় ভালো চাকরী হোল, কিন্তু কোথা থেকে যে ঐ পাপ এসে ঘাড়ে পড়লো, তা আর কি বল্‌বো মা। মাগী একবাড়ীতে ঝিয়ের কাজ করতো, ও এসে বাছাকে ভুলিয়ে তার কাঁধে চড়ে চং করে গেল কিনা কাশীতে আমার কাছে আদর কাড়াতে। আমি মা সেখানে পাঁচটা ভদ্দরলোকের মধ্যে কাশীবাস করি, ভাগ্যে আমার ভাইপোরই এক বন্ধুর বউ আমাকে আগে থেকে চিঠি লিখে সব জানিয়েছিল, তাই ওকে আমার ঘরে ঢুকতে দিইনি, নইলে আগে না জান্‌লে ত ও সবই মজিয়ে দিয়ে আস্‌তো। কি বল মা, লোকে বলে অজান্তে সাপের বিষ তা আমারও হয়েছে তাই। তা সেই রাগে মাগী কিনা সমীরকে বলে আমার মাসোহারা বন্ধ করে দিলে। রেণু ইতিমধ্যেই ওখান থেকে পালিয়ে পরিত্রাণ পেয়েছে।

পাশের বাড়ীর গিন্নী রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সমস্তই শুনছিলেন পিসিমা থাম্‌তে তিনি বল্লেনঃ ও বাবা, এতদূর? তারপর?

তারপর মা, আমি ত আতান্তরে পড়লুম। আমি বুড়ো হয়েছি, ঠাকুর দেবতা আছে, অসুখ বিসুখ আছে, পাল পার্ব্বণে এটা ওটা খরচ আছে। আমার মা এক ভাসুরপো আছে, সে দেয় আমাকে আঠারো টাকা করে আর এই ভাইপো চাকরী হওয়ার পর থেকেই আমাকে দিত পঞ্চাশ টাকা করে। ভাইপোর টাকাটাই মোটা টাকা। এটা বন্ধ হতে আমি মা দৌড়ে এলুম এই দিল্লীতে সে প্রায় ছ' সাত মাস হতে চল্লো। কত কষ্ট করে ভাইপোকে খুঁজে বার করলাম, তা সে কিনা সোজা হাঁকিয়ে দিলে! কি করবো মা, বুঝলাম কালনাগিনী মন্তর দিয়ে বশ করে রেখেছে, ও আর কি করবে! বলে ভ্রষ্টার মায়া আর শকুনির দয়া, এ পড়লে আর কারুর রক্ষা আছে! ঐ ভাসুরপোর মাসিক আঠারো টাকা বৃন্দাবনে তখন থেকে দুঃখু ধান্দা করে থাকতে গিয়ে বুড়ো বয়সে কি আর এত কষ্ট সহ্য হয়, তাই রোগে পড়ে গেলুম। তা আমার মা এখানে খবর দেওয়ার ইচ্ছেই ছিল না। আর এখানকার ঠিকানাও ত কেউ দেয় নি আমায়। আমাদের ছত্তরেরই একজন লোক দয়া করে আমার ভাসুরপোকে চিঠি দিতে সে কত চেষ্টা করে তবে একে খবর দেয়। তখন, কি জানি দয়া করে ভাইপো গিয়ে আবার পিসিমা বলে আমায় নিয়ে এলো। তা আমি মা আস্‌তে চাই নি। বল্লুম, তোমার ত সেই কালনাগিনী বসানো আছে, আমি যাবো না। তা ভাইপো বল্লে, না সে ভালো লোক সে আর কি করবে, এই রকম কত কি? তা দেখ, এখানে এই কদিনই বা এসেছি, তা ও যেন পারে ত আমাকে নখে তুলে টিপে মারতে যায়। জানি, ওর সুখে বাধা পড়ছে, তা আমি বল্‌ছি কি বাপু একটু সবুর কর, দুদিনের মধ্যে একটু উঠে দাঁড়াতে পারলেই আমি আবার চলে যাবো। আমি কি আর বুড়ো বয়সে ধর্ম্ম সব তীর্থ ছেড়ে এই মেলেচ্ছের দেশে ভ্রষ্টার সংসারে বসে থাক্‌তে পারি। তা ঐ কানীর আর তর সইছে না। ও কিনা স্বচ্ছন্দে আমার ভাতের হাঁড়িটা ছুঁয়ে দিলে। বলো আমি ওর জলটুকু পর্যন্ত নিই না, সকালে কল থেকে নিজে হাতে জল এনে ভাত চড়িয়েছি, আমার বাছা নিজ হাতে করে ঐ বালতীতে জল ধরে দিয়ে গেছে, এইসব করে বুড়ো মানুষ এই অসুস্থ শরীরে সারা সকাল ধরে বসে বসে রান্না করতে আমার ঘাড় পিঠ সব টন্‌টনিয়ে গেল, আর এই বাড়া ভাত ছুঁয়ে দিয়ে ও কিনা স্বচ্ছন্দে আজকের খাওয়াটা আমার নষ্ট করে দিল। ওঃ, আজ প্রায় এক মাস পরে পথ্য করবো, আর তাতে কিনা বাধা।

পিসিমা হাঁপাতে লাগলেন। পাশের বাড়ীর গিন্নী যথাসাধ্য স্তোকবাক্য দিয়ে রান্নাঘরের দিকে মুখ করে উদ্দেশে রেণুকে দু'চারটে কটু কথা শুনিয়েবল্লেন, পিসিমা, আপনি যখন এসেছেন,তখন ঐ কানীকে দূর করে দিয়ে এবার ভাইপোর বিয়ে দিন, দিয়ে ভাইপোকে মানুষ করে তুলুন, আর একবার আপনাকে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে হবে, নইলে এমন ছেলে আপনার, সে কি এমনি করেই ভেসে যাবে!

আর ভেসে যাবে! পিসিমা কেঁদে উঠে বল্লেন, ওর কি আর পদার্থ আছে, ও একেবারেই শেষ হয়ে গেছে।

গিন্নী বল্লেন, কিছু শেষ হয়নি পিসিমার, পুরুষমানুষ কি আর শেষ হয়। ঐ মাগীকে তাড়িয়ে দিয়ে একটি ভালো মেয়ে এনে ভাইপোর বিয়ে দিন, সব ঠিক হয়ে যাবে।

পিসিমা কপালে হাত চাপ্‌ড়ে বল্লেন, ভাইপোকে বলেছিলুম, তা সে বলে কি জানো বলে ও কোথায় যাবে, ওর যে কেউ নেই।

পাশের বাড়ীর গিন্নীটি ব্যঙ্গ করে বল্লেন, ওঃ, দরদ দেখ একবার! কেন বাবা, আপনার ভাইপোর সাথে দেখা হওয়ার আগে ঐ কানী তো ঐ সামনের বাড়ীতে রান্না, বাসন মাজা সব কাজই করতো। ওদের আবার কাজের অভাব! কত বাড়ীতে ওর চাকরী জুটে যাবে। তা নয় একটা ভালো লোকের সংসার নষ্ট করে—

পিসিমা বল্লেন, কোন্ বাড়ীতে কাজ করতো মা, কোন্ বাড়ীতে?

গিন্নি বল্লেন, ও মা, তা বুঝি জানেন না! ঐ শিববাবুর বাড়ীতে, যে বাড়ীতে, আপনার ভাইপো সব প্রথম এসে দিন কতক ছিল। ঐ শিববাবুই ত ওর বন্ধু, ঐ বাড়ীতে ত ও প্রথম ঐ কানীকে দেখে।

ওমা, তাই নাকি! এই সাম্‌নের বাড়ী? তা মা, আমি ত এখানে কাউকে জানিও না, কাউকে চিনিও না। তা তুমি মা একটা কাজ করে দাও না। ঐ শিব বাবুর বউটিকে একবার ডেকে দিও না মা। আহা সতীলক্ষ্মী মা আমার, ভাগ্যে চিঠি লিখে আগে থেকে সবটা জানিয়ে দিয়েছিল, না হলে ত আমার জাতজন্ম সমস্তই খেয়ে আস্‌তো ঐ কানী। তুমি মা আজ দুপুরে ওকে বলে পাঠিও যে সমীরের পিসিমা এখানে এসেছে, তোমার সঙ্গে একবার দেখা করতে চায়। আর তুমিও মা সেই সঙ্গে আর একবার এসো, কেমন মনে থাকবে ত?

ওমা তা আর মনে থাকবে না? আপনার জন্য এই টুকুও করতে পারবো না? খুব পারবো। তা পিসিমা, আজ দুপুরে কি খাবেন? ভাত ত সব গেল, আবার না হয় চারটি ভাত চড়িয়ে দিন।

আর পারি না, বুঝবো যে বিধি আমার ভাত আজ মাপান নি।

তাহলে?

ঐ দুধটুকু আছে, আর সমীর কিছু ফল এনে দিয়েছিল। ঐ যা হয় খেয়ে আজকের দিনটে কেটে যাবে। বলে তুমি যাও বঙ্গে, তোমার বরাৎ যায় সঙ্গে। বরাতে না থাকলে কি আর অন্ন জোটে মা? আর তাও বলি, তাও ভালোই হোল। এ বাড়ীতে অন্ন গ্রহণ না করাই ভালো। দেখি যদি অন্য কোথাও ব্যবস্থা করতে পারি। একটু থেকে খুব চুপি চুপি বল্লে, আমার মা এ বাড়ীতে এক দিনও থাকতে ইচ্ছে হয় না। ঐ কানী বুকের ওপোর বসে বসে যত সব গিন্নীপনা করবে আর আমাকে তাই জুল্ জুল্ করে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌তে হবে? আর বল্‌বো কি মা, আমার ভাইপোর টাকাপয়সা জিনিষ পত্তর সমস্তই ঐ মাগীর মুঠোর ভেতর, আর কি নষ্টই যে করছে, তার কোন ঠিক-ঠিকানাই নেই। আজ আট আনার ঘুঁটে কিনলে, তা কোন দরদস্তর করা নেই, গোনাগুনতি করা নেই ঘুঁটেউলি যা দিলে তাই নিয়ে দুম্ করে পয়সা ফেলে দিলে। বলে, ফাটে না ফোটে, যায় যায়, তার যায়। তা এ সব কি আর আমি চোখ দিয়ে দেখ্‌তে পারি মা!

পাশের বাড়ীর গিন্নী সায় দিয়ে বল্লেন, তা বটেই ত পিসিমা তা বটেই ত। আপনার নিজের সংসার, নিজের জিনিষ। এরকম অপচয় স্বচক্ষে আর দেখ্‌বেন কি করে? তা পিসিমা, আমি এখন উঠি, দেখি আবার আমার বাড়ীতে কি কাণ্ড হচ্চে। মা ষষ্ঠীর দয়ায় শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে অনেকগুলি বাচ্ছা-কাচ্ছার সংসার ত, এক মিনিট বেরুলেই একেবারে হৈ-হৈ কাণ্ড বেধে যায়।

তা হবেই ত মা, তা হবেই তো। তা এসো মা, এসো, পিসিমা স্মিতমুখে তাকে বিদায় দিয়ে বল্লেন, কিন্তু মা মনে করে ঐ বউটিকে নিয়ে দুপুরে একবার এসো, ভুলো না যেন।

গিন্নী-বল্লেন, আস্‌বো, নিশ্চয় আস্‌বো কিন্তু আপনার ভাইপো রোজ দুপুরে বাড়ী আসে কি না সেই জন্যে—

পিসিমা বল্লেন, হ্যাঁ আসে, আবার দুটো আড়াইটে নাগাদ বেরোয়, তা তুমি মা তিনটের সময় এসো, তাহলে আর কোনো অসুবিধে হবে না।

গিন্নী বল্লেন, আচ্ছা তাই হবে বলে ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ করে রেণুর উদ্দেশে বল্লেন, কেন আর বুড়োমানুষটাকে কষ্ট দাও বাছা, যে দু'দিন আছে একটু যত্নই কর না। পরকাল বলে ত একটা কিছু আছে অত দম্ভ, অত তেজ ভালো নয়।

রেণুর কোন সাড়া পাওয়া গেল না। পিসিমা ঘর থেকে বল্লেন চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী মা, চোরাকে আর কি শোনাবে। গিন্নী একটা দুঃখসূচক মুখভঙ্গী করে এ বাড়ীর উঠান পার হয়ে ওধারের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। [ক্রমশঃ]

"পেক্‌টিন"

ডাঃ গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

ভারতবর্ষ কৃষি প্রধান দেশ। দেশের আর্থিক সমস্যার সমাধানের একমাত্র সোপান কৃষি শিল্পের উন্নয়ন। সভ্য জগতের উন্নতিশীল বৈদেশিক জাতির ইতিহাস হইতে পরিচয় পাওয়া যায় যে তাঁহারা দেশের কৃষিশিল্পকে একমাত্র কেন্দ্র করিয়া আজ এত দ্রুত সমৃদ্ধিশালী হইতে সক্ষম হইয়াছেন। দেশের অভ্যন্তরে খাদ্য দ্রব্যের অনটন ঘটিলে কোন প্রকার নূতন শিল্প পরিকল্পনার প্রচেষ্টা সুদূর পরাহত। ভারতবর্ষ এমনই একটি দেশ যেখানে বিবিধ প্রকার শস্য, ফল, মূল প্রভৃতির প্রাচুর্য্য। ইহার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উৎপাদন, রক্ষণ ও বিবিধ ব্যবহার একান্ত প্রয়োজন।

ফলের প্রয়োজনীয়তা ও তাহার উপকারিতা মোটামুটি ভাবে অল্প বিস্তর সকলেরই জানা আছে। ফলের ভিতর একরকম আঠার মতন পদার্থ আছে যাহার সংযোগে জ্যাম, জেলি ইত্যাদি নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য তৈয়ারী করা সম্ভব হয়। এই আঠা পদার্থটীর নাম "পেক্‌টিন"।

বৈদেশিক শাসনকালে ভারতবর্ষ তাহার সকল প্রকার শিল্পের পরিচালনার জন্য পরমুখাপেক্ষী থাকিত এমন কি জ্যাম, জেলি প্রভৃতি তৈয়ারীর জন্য ক্ষুদ্র শিল্পগুলিও বিদেশীয় সাহায্য ব্যতীত পঙ্গু হইয়া পড়িত। জ্যাম, জেলি ইত্যাদি প্রস্তুতির মৌলিক পদার্থ "পেক্‌টিন্"। পেকটিনের চাহিদা মিটাইতে পারে ভারতে এমন কোন ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান ছিল না, বিদেশ হইতে বহুল পরিমাণে পেকটিন আমদানী করা হইত। স্বাধীনতা অর্জ্জনের পর ভারতবর্ষ তাহার শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে দ্রুত-গতিতে উন্নতির শীর্ষস্থানে উপনীত করিবার আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে। এই দেশের বৈজ্ঞানিকরা দেশের শ্রীবৃদ্ধির জন্য বিবিধ পরীক্ষার দ্বারা ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারে বিশেষ যত্নবান এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পেকটিন প্রস্তুতির নানাপ্রকার প্রযোজনা উদ্ভাবন করিতেছেন। তাঁহারা ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান-গুলিকে আধুনিক স্বয়ংসম্পুর্ণ যন্ত্রপাতির দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া বিভিন্ন শিল্পের প্রতিষ্ঠানের জন্য গবেষণায় নিমগ্ন।

বিভিন্ন ঋতুতে স্বাভাবিক ভাবে বিভিন্ন ফল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। রাসায়নিক পরীক্ষার দ্বারা বৈজ্ঞানিকরা প্রমাণিত করিয়াছেন যে পেক-টিন সব ফল হইতে কম বেশী পাওয়া যাইতে পারে। সকল ফলের মধ্যে পেয়ারাতে বেশী পরিমাণে পেকটিন আছে। সময় মত যদি ঠিক দৃষ্টি রাখিয়া পেকটিন তৈয়ারী করা হয় তাহা হইলে ভারতবর্ষে জ্যাম, জেলি প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্যের মূল্য বেশ কিছু মাত্রায় হ্রাস পাইবে। অতি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত রাসায়নিক পরীক্ষাগারে দেখা গিয়াছে যে পেঁপে, লেবু, আপেল, পেয়ারা, কাঁঠালের খোসা, বেল, আমলকী, টেপারী প্রভৃতি হইতে প্রচুর পরি-মাণে পেকটিন পাওয়া যায়। লেবুর বীচি (albe-do) এ্যাসিডের সহিত সংমিশ্রণ করিয়া গরম করিলে, প্রোটোপেকটিন সেলুলোজের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যায়, ও তখন পেকটিন জলের সহিত মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রদেশে যথা বোম্বাই, মাদ্রাজ, অন্ধ্র প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, বিহার ও আসামে লেবু ও লেবু জাতীয় ফল অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়। বৈজ্ঞানিকরা বিভিন্ন উপায়ে ফল, তাহার খোসা ও বীচি হইতে পেকটিন প্রস্তুতির নিত্য নূতন পন্থা অবলম্বন করিয়া অল্প দামে উৎপাদন করিতে সক্ষম হইতেছেন। বিভিন্ন ফলে কিরূপ পরিমাণে পেকটিন আছে তাহার মান নিম্নে দেওয়া হইল।

বিভিন্ন ফল	পেক্‌টিন (ফল প্রতি)			
বিবিধ আনারস	৪'০২	হইতে	৫'14	(অনুমানিক)
„ কমলা লেবু	৮'১১	„	১২'৬	„
„ পাতিলেবু	৩,৮৫	„	৯২৫	„
„ পাকাকলা	১'২৬	„	১'৫৪	„
„ পেয়ারা	১৬'৮3	„	২০'০১	„
„ পেঁপে	৫'৭২	„	১০'৫১	„

ইত্যাদি

পেকটিন, কার্ব্বন ও হাইড্রোজনের (carohydrate) একটি যোগিক রাসায়নিক পদার্থ। ইহা পলিগ্যালকটুরেনিক অম্লের (Galacturonic acid) সহিত বিভিন্ন মানের এস্‌ট্রারিফিকেসান (different degree of esterification) এবং জলের সহিত সহজেই মিশ্রিত হয়। ইহা কোষের আভরণের মধ্যে অবস্থিত থাকে। শর্করা (চিনি), জল ও পেকটিন জাতীয় অম্লের পরিমিত মিশ্রণে জ্যাম, জেলি প্রভৃতি তৈয়ারী করা হয়।

পেকটিন তৈয়ারীর করার প্রণালী এখানে মোটামুটিভাবে বর্ণনা করা হইতেছে। সবুজ রং-য়ের পেয়ারা (কাঁচা পেয়ারা) গাছ হইতে তুলিয়া পরীক্ষাগারে ধুইয়া এবং এবং ১% ইথানল সলুশন এ (Ethanol solution) রাখিয়া পরে পরিষ্কার কাপড় দিয়া মুছিয়া লইতে হয়। প্রথমতঃ পেয়ারাগুলি ছোট ছোট টুকরা করিয়া ১০০'c উত্তাপে হাইড্রোক্লোরিক এ্যাসিড সহিত মিশ্রিত অবস্থায় প্রায় এক ঘণ্টা গরম করা হয়। এখন সংমিশ্রণে পেয়ারাগুলিকে নিষ্কাশন যন্ত্রের দ্বারা নিষ্কাশন করিয়া পরিষ্কার পাতলা কাপড় দিয়া ছাকিয়া লইতে হয়। ইহার পর নিষ্কাশণ তরল পদার্থটী একটি আধারে রাখিয়া ঠাণ্ডা করিতে হইবে। শতকরা ৯৫ ভাগ এ্যালকোহল জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া নিষ্কাশন তরল পদার্থের সংমিশ্রণ করিলে পেকটিন যথাযথভাবে পাওয়া যায়।

পেক্‌টিনের ব্যবহার সম্বন্ধে আগে বলা হইয়াছে যে ইহা জ্যাম, জেলি প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুতির একমাত্র সহায়ক। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য খাদ্য দ্রব্য প্রভৃতির সহিতও ইহার ব্যবহার প্রচুর পরিমাণে দেখা যাইতেছে, যেমন লজেন্স, স্যালাড্ (salard dressing), চাট নি (cordiment), আইসক্রিম প্রভৃতি। বিভিন্ন তেলের সহিত জলের সংমিশ্রণের জন্য পেকটিন অবদ্রবক (Emulsifier) হিসাবে ব্যবহার হয়। নানাপ্রকার আঠা ও এই জাতীয় জিনিষেতে বহুলাংশে পেকটিনের প্রয়োজন হইতেছে। অদূর ভবিষ্যতে পেকটিনের ব্যবহার কেথোয় যে হইবে না তাহা কল্পনার বাহিরে। তাই পেকটিন যাহাতে প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত করা যায় সেদিকে লক্ষ্য দেওয়া উচিত।

॥ রুবীর তাজমহল ॥

—আবু আতাহার

তাজমহল দেখার ইচ্ছে. ছিল অনেকদিনের। রুবীর সে অনুরোধ কেউ শোনেনি। বাবা ব্যস্ত মানুষ। একদিন বলেছিলেন; ভালো করে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলটা দেখা হ'লোনা তো তাজমহল! কেরাণীর চাকরির আর এক নাম টাকা তৈরীর কমদামী মেশিন। একটু গড়বড় হ'লে, সময়মতো তেল দিতে না পারলে ঘ্যাচাং!

বাবার কথা শুনে হাসি পেয়েছিল কিন্তু ইচ্ছেটা মরেনি। তাই বিয়ের পর ফিরোজ যেই জিগ্যেস করলো, হানিমুন করতে কোথায় যাবে বলো!

—আগ্রা তাজমহল দেখব।

উত্তর তৈরী ছিল, বেরিয়ে এল সঙ্গে সঙ্গে। ফিরোজ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলো। হয়তো বা হিসেব করছিল। বাজেট কষছিল তাই সেই মুহূর্তে হ্যাঁ কি না কিছু বললো না। এবং রুবীকে আদর করার ইচ্ছে জাগলেও হাত বাড়ালোনা কারণ ওর মনে হ'লো রুবীর এই ইচ্ছেটা আগে পুরণ করা উচিত!

—কিছু বলছনা যে!

—ভাবছি।

—কি!

—ওখানে গিয়ে তুমি যদি বলো আমি মমতাজ হ'তেচাই! কারণ তাজমহল দেখলেই মেয়েরা নাকি মরতে চায় শুনেছি অমন একটা কবর সৌধের লোভে। আমি তো শাজাহান হ'তে পারবোনা।

—ভয় নেই। তোমাকে ছেড়ে আমি মমতাজ, ক্লিয়োপেট্রা কিছু হ'তে চাইনা, বুঝেছ।

—সত্যি!

—সত্যি গো সত্যি!

এবার ফিরোজ প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো, অল রাইট, রিকোয়েষ্ট এ্যাকসেপটেড।

ঠিক তো!

—ইয়েস।

এবার দু হাতে রুবী ওরফে রাবেয়া বেগমকে জড়িয়ে ধরলো ফিরোজ। হাসতে হাসতে বললো, বিয়ের আগে আমার নানি [দিদিমা] বলেছিলেন, নতুন বৌয়ের কথা প্রথম প্রথম শুনতে হয়!

আগ্রায় এখন বেশ শীত পড়েছে। গায়ে লেপ দিতে হয়। সন্ধ্যের সময় ওরা পৌছলো! সকালে উঠেই তাজমহল যাবে। মোটামুটি প্রো'গ্রাম ঠিক করে নিল।

রুবীর চোখে ঘুম আর আসতে চায়না। ছোটবেলায় মাষ্টার মশাইয়ের কাছ থেকে তাজমহলের কথা শুনেছিল। আর তখনই কেমন যেন একটা দারুণ ইচ্ছে গেঁথে গেছিল মনে। তাজমহলের কোন গল্প, কোন কবিতা, ইতিহাস যা হাতের কাছে পেত তাই পড়তো রুবী। তাজমহল যেন সব সময় হাতছানি দিত ওকে। চোখ বুজলেই তাজমহলকে দেখতে পেত যেন। সাদা মার্বেল পাথরের চুড়ো। জ্যোৎস্না রাতে ধব ধব করছে। শাজাহানের সেই গভীর ভালোবাসার কথা মনে হতো। ভাগ্যবতী মমতাজের কথা মনে হ'তো। তাজমহলকে ভালবেসে ফেলেছিল রুবী।

ফিরোজ ঘুমুচ্ছে। হাসি পেল রুবীর। একটা জলজ্যান্ত জোয়ান পুরুষ তার পাশে। এই কিছুদিন আগেও যাকে ও চিনতো না। জানতো না। এমন কি চেহারাও দেখেনি যার। সেই ছেলেটি কি নিশ্চিন্তে তার পাশে ঘুমুচ্ছে! ভাবতেও কেমন লাগছে যেন। একবার চোখের কাছে হাত নিয়ে গেল রুবী। দুষ্টুমি করে চোখ

বুজে প'ড়ে নেই তো! তাহ'লে হাতের ছোঁয়ায় পিটপিট করবে চোখ!

না। ভালোই ঘুম এসেছে। আহা ঘুমোক! এই ছেলেটার জন্যেই তো আজ তার তাজমহল দেখা হ'লো। উঁহুঁ দেখা হয়নি তো! হ'য়ে যাবে। কাল সকালেই। আর কঘণ্টাই বা বাকী! সেই ছোটবেলা থেকে যে সখ ছিল ফিরোজ তা পূরণ করেছে, কৃতজ্ঞতায় চোখ ভিজে এল রুবীর। ঘুমন্ত ফিরোজের একটা হাত উঠিয়ে গালে রাখলো ও।

আচ্ছা এখান থেকে তাজমহলটা কতোদূর! দেখা যায়না! চাদর জড়িয়ে ব্যালকনিতে এল রুবী। সমুখে পথ। ময়াল সাপের মতো ঘুমুচ্ছে যেন। এখন অনেক রাত। চারিদিক নিঝুম, নীরব। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। বেশ ভালো লাগছে। নতুন বিয়ের আবেশটাও মনের ভেতর। এখন যেন সারা দেহমন কোন এক মিষ্টি ফুলের সুগন্ধে সুরভিত।

উত্তেজনায় বুকের ভেতরটা কেমন যেন করছে। কাল। আগামীকাল। এই রাতটা শেষ হ'লেই ব্যস। তাজমহল, তার স্বপ্নের তাজমহল তার সামনে। কতোদিন থেকে যার কথা ভাবছে ও। কতোজনকেই না তার ইচ্ছের কথা জানিয়েছে। সেই মনের ভেতর পুষে রাখা খাঁচার পাখির মতো সাধটা এবার যেন মুক্তির আনন্দে ডানা মেলছে। রুবী চোখ বন্ধ করে সেই খুশী খুশী সাধটা একবার অনুভব করে। আঃ, আমার তাজমহল!

সারা রাত এইভাবে কাটুক না ক্ষতি কি! ঘুম তো আসবেনা? ঘুমন্ত রাতকেই দেখা যাক। ফিরোজকে একবার ওঠানোর ইচ্ছে হ'লো ওর। আদর খেতে মন চাইলো কিন্তু কি ভেবে এগোলনা, দুচোখের দৃষ্টিটাকে আলো-আঁধারিতে যতোদূর যায় ততো দূরে মেলে ধরলো, আর ঠিক তখুনি কাঁধে একটা হাতের চাপ পড়ায় ভীষণ চমকে মুখ ফেরালে রুবী।

ফিরোজ নয়।

একটা তরুণ! পাজামা, পাঞ্জাবী, সাদা শাল গায়ে। চোখে কালো ফ্রেমের চশমা, মুখে অদ্ভুত হাসি। এবং যার নাম শামিম!

সেই মুহূর্তে কিছু বলতে পারলোনা রুবী। কারণ কি বলা যায় ভেবে পেলনা। ওকে চুপ দেখে শামিম বললো, চিনতে পারছ তো! চশমাটা খুললো ও, এবার? চশমাটা ইদানিং নিয়েছি।

—তু-আপনি এখানে!

—উঁহু আপনি কেন? তুমি! তুমিই তো বলতে! সম্বন্ধ কেটে দেব বললেই তা কাটেনা!

শামিম সিগারেটা ধরলো একটা, সন্ধ্যে বেলায় তোমরা এলে দেখলাম তোমার বরটা ভালোই। মোটা মাইনের চাকরি করে তা দেখলেই বোঝা যায়। তোমার তো সেইরকমই ইচ্ছে ছিল। ডাক্তার, ইন্‌জিনিয়ার, চার্টার্ড এ্যাকাউণ্টট্যাণ্ট! তা মিষ্টার ফিরোজ আমেদ কি!

নাম জানলে কি করে! এবার কথা বললো রুবী!

—হোটেলের খাতায়। যাক্‌গে, কি করেন

—ব্যাঙ্কে চাকরি করে।

—ডাক্তার, ইনজিনিয়ার জোটাতে পারোনি তাহলে! বিদ্রূপের সুরে বললো শামিম! ওদের বাজার দর তো অনেক। তোমার আব্বা (বাবা) তা দিতে পারবেন না জানি। তোমার রূপ, যৌবন, বিদ্যেটাই সম্বল।

রুবী কিছু বললো না! কারণ বলার মতো কিছু ছিলনা তার। এই দুর্বল মুহূর্তে এবং যার কাছে একদা অনেক দুর্বল হয়েছিল সেই শামিমের সামনে কিছু বলার সাহস পেলনা ও!

শামিম সিগারেট টানছিল একমনে এবং রুবীকে দেখছিল! আগ্রার একটা হোটেলে এতদিন পর এইভাবে ওর সঙ্গে দেখা হবে ভাবতে পারেনি ও। আশ্চর্য্য সাক্ষাৎ। ঘুরতে ঘুরতে সে-ও এই সময় আগ্রাতে! জীবনের অনেক কটা মাস, প্রায় ২।৩ বছর রুবীর সঙ্গে একটা মিষ্টি সম্বন্ধ ছিল তার। কোলকাতার পথে পথে এখনো অনেক স্মৃতি। কিন্তু শামিম বুঝতে পেরেছিল তার মতো অল্প মাইনের সামান্য চাকরি করা একটা ছেলেকে নিয়ে ঘর বাঁধতে চায়না রুবী। কথায় ভাব ভঙ্গিতে তাও জানয়ে দিয়েছিল এবং একদিন সরে গেছিল ওর জীবন থেকে। শামিমের কিছু করার ছিল না। কারণ সে তখন নিজের অর্থনৈতিক চিন্তায় ব্যস্ত। মনে হ'য়েছিল সত্যিই তো রুবীর আর কি দোষ! এমন লোকের সঙ্গে

এ যুগের কজন বুদ্ধিমতী মেয়েই বা ঘর বাঁধতে চায়!

—বিয়ে করেছ!

রুবী জিগ্যেস করলো।

—না! একটু হেসে জবাব দিল শামিম। মনে হচ্ছে কেমন যেন একটা দুষ্টু বুদ্ধি ওর মনে বাসা বাঁধছে। বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ। রুবীর ভীষণ ভয় করছিল। বুক কাঁপছিল। এখন যদি ফিরোজ ওঠে। তাকে এইভাবে এত রাতে এক জন ছেলের সঙ্গে ব্যালকনিতে গল্প করতে দেখে! অথচ কি করবে ভেবেও পাচ্ছিল না!

—যাক্‌গে শোন! সিগারেটটা ফেলে দিয়ে শামিম বললো, তাজমহল দেখতে এসেছ নিশ্চয়ই! তোমার তো অনেকদিনের সখ। মনে পড়ছে নিশ্চয়ই আমি বলছিলাম, বিয়ের পর তোমাকে নিয়ে তাজমহল দেখতে যাবো, প্রথম তামহল দর্শন তুমি, আমি, অন্য কেউ নয়! মনে পড়ছে!

রুবী কিছু বললোনা!

—ভুলে যাওনি তা আমি জানি। বিয়ের পর পুরোণ প্রেমের কথা মেয়েরা ভুলে যেতে চেষ্টা করে। ধরা পড়লে বরকে বলে ওটা মোহ। ওর সঙ্গে আমার কিছুই হয়নি। তবে আমি বিয়ে করলে বৌকে বলব, রুবীকে আমি ভালোবাসতাম, বুঝেছ!

—ছেলেরা যা পারে, মেয়েরা তা পারেনা।

—উল্টো কথা শুনছি মনে হচ্ছে! আজ কাল তো সব মেয়েরাই বলে ছেলেরা যা পারে মেয়েরাও তা পারে। এখন এমন কথা কেন সখি? যাক্‌গে স্টপ ইট্। খোদার ইচ্ছে পুরণ হ'য়েছে। আমাদের দুজনের দেখা হ'য়েছে অদ্ভুত ভাবে। তাজমহল আমরা একসঙ্গে দেখবো!

—এঁ্যা!

—ঘাবড়িওনা। প্রতিজ্ঞা করেছ পুরণ করতে হবে। তোমার বরের সঙ্গে নয় আমার সঙ্গে সর্ব-প্রথম তাজমহল দেখবে তুমি!

ভয়ে কেঁপে উঠলো রুবী। এ কি বলছে শামিম! এতদিন পর এভাবে ও দেখা দেবে ভাব-তেও পারেনি। এড়িয়ে গেছিল নিজের ভালো ভেবে। কিন্তু হঠাৎ এইভাবে দেখা দিয়ে ওর দাবী জানাবে এ মনেও হয়নি কোনদিন। এখন কি করবে ভেবে পেলোনা। ভীষণ কান্না পেল ওর। এবং ঐ সামান্য আলোয় ওর চোখের জলের দিকে চোখ পড়লো শামিমের।

—কাঁদছ মনে হচ্ছে। হুঁ! সেদিন আমিও কেঁদেছিলাম। মনে হয়েছিল আমার অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ বলে তুমি আমার ভালোবাসাকে লাথি মেরে চলে গেছ! তাহ'লে ভালোবাসার আর এক নাম কি 'মানি'! আজ আমি ছাড়বো না! কখ্‌খনো না! আমার বাক্সে তোমার সেই ছবি যাতে লেখা আমার শমিমকে দিলাম। তোমার সেই নিজেকে উজাড় করে লেখা প্রেমপত্র —সব আছে। বুঝতেই পারছ তোমার অবস্থা। যাক তোমার সর্বনাশ করতে চাইনা। কিন্তু তাজ-মহলটা আমার সঙ্গে প্রথম দেখতে হবে তোমাকে!

কাল সকালে তো ফিরোজের সঙ্গে যাবে। খুব ভোরে। তার আগে আর সময় কই! রুবী ভেবে পেলনা কিছু। তার মাথাটা কেমন যেন গোলমাল করছে! মনে হচ্ছে বাঘের সামনে পড়েছে সে। একদা যাকে দেখলে চোখ মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠতো, মনের ভেতর পুলক ছড়াতো, এখন তাকে দেখে ভয়ে বুক কাঁপছে!

—কি করে যাবো? কাল সকালেই তো ওর সঙ্গে—! ধীরে ধীরে ভয়ে ভয়ে কথাগুলো বললো রুবী!

—হুঁ! কি যেন ভাবলো শামিম তারপর বললো, তাহ'লে এখুনি!

এঁ্যা এই এত রাতে!

—এ ছাড়া প্রথম দর্শনের আর তো উপায় নেই! কাল ভোরেই তো তুমি দেখবে। আর তাহ'লেই সেটা পুরোন হয়ে গেল। আমি তা চাই না! অতএব—

—তোমার এ আবদার কি করে রাখা সম্ভব! আমাকে এমন বিপদে নাই বা ফেললে। কষ্ট দিয়ে কি লাভ?

—এ কথা সেদিন যদি তুমি ভাবতে তাহ'লে তো ঝামেলাই চুকে যেত! অপেক্ষা করতে পারলে না! এই তো আমি আজ ভালো চাকরি করছি। তোমার বরের চেয়েও বেশী মাইনে পাই, বুঝেছ! অফিসের কাজেই এখানে আসা!

—আমাকে মাফ করো শামিম। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো রুবীর [illegible]।

—ঘর ভাঙলে ঘর হয় কিন্তু মন ভাঙলে! আমার মন ভেঙেছ তুমি?

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলো রুবী। ও বোধ হয় বুঝতে পারছিল এর কাছ থেকে ছাড়া পাওয়ার কোন উপায় নেই! রাত অনেক হ'য়েছে শীতটাও বাড়ছে! রুবী বললো, কিন্তু হোটেল তো বন্ধ। পথেও গাড়ি নেই!

সব ব্যবস্থা করে ফেলছি!

—না হ'লে কি হয়না!

হাসলো শামিম, তুমি যেমন সেদিন নিষ্ঠুর হ'য়েছিলে আমাকেও আজ তা হ'তে হবে! তোমাদের মতো মেয়ে যারা ভালোবাসাকে স্পোর্টস্ মনে করে তাদের শাস্তি পাওয়া উচিত!···তাহ'লে রেডি। আমি ম্যানেজারকে বলছি গিয়ে!

শামিম! রুবী দুটো হাত জড়িয়ে ধরলো এবার। ও যদি জানতে পারে আমার সব শেষ হ'য়ে যাবে। এবার মাফ করো। দোষ করেছি অন্য শাস্তি দাও! কিন্তু এই রাতে—!

—হ্যাঁ এই রাতেই যেতে হবে।

চ্যাঁ! ভ্যাঁ! একটা বাচ্চা ছেলের কান্না ভেসে এল শামিমের ঘর থেকে! রুবী আর একবার অবাক হ'লো! শামিম হেসে উঠলো, ধ্যাৎ তেরি, এমন নাটকটাই নষ্ট করে দিল। তোমাকে একটু জ্বালাবো ভেবেছিলাম।

—কি হ'লো! রুবীর চোখে মুখে প্রশ্ন তখন।

—বৌ। আর ছেলে!

—তোমার!

—আমার ঘরে অন্যের বৌ থাকবে নাকি! ইয়ে শোন এখুনি তো ঝি উঠে পড়বে। চলি! দেখলে কেলেঙ্কারি! কাল ভোরে বুঝলে—পা বাড়ালো শামিম—বৌকে পাঠাবো তোমার সঙ্গে ভাব করতে আর আমিও ফিরোজ সাহেবের সঙ্গে। মানে ইয়ে—পেছন ফিরে ঘর দেখলো শামিম—তোমার আমার সম্বন্ধে কেউ জানবে না অবশ্য! তারপর একসঙ্গে যাবো তাজমহল দেখতে। আমরা বিকেলে এসেছি। আমারো দেখা হয়নি তাজমহল। প্রতিজ্ঞাও পূরণ হবে-বুঝেছ···চলি।

ভ্যাঁ ভ্যাঁ! আবার শব্দটা শোনা গেল!

—ধ্যেৎ তেরি। তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকলো শমিম। রুবী অবাক! একটু পরেই ভীষণ হাসি পেল ওর। এতক্ষণ পর আবার তাজমহলটা ভেসে উঠলো চোখের সামনে। ফিরোজের পাশে গিয়ে ঘুমুতে চেষ্টা করলো ও।
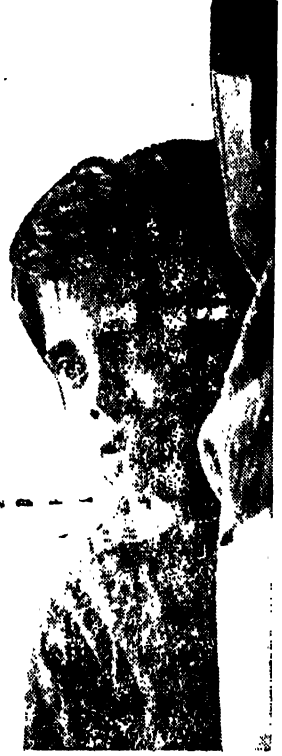
ভক্তি ও ভগবান্

—শ্রীজ্ঞান

বাংলা দেশের পূজার মরশুম সুরু হয়ে গেছে। দেবী দুর্গার মহাপূজা সমাপ্ত হয়ে গেছে। মা লক্ষ্মীর পূজাও হয়ে গেছে। মহাকালীর পূজাও শেষ হল। জগন্মাতা জগদ্ধাত্রীর পূজাও সমাগত। তারপর কিছুকাল বিরতির পর আসবে তোমাদের সবচেয়ে আদরের, সবচেয়ে আনন্দের অনুষ্ঠান মা সরস্বতীর পূজা।

এই সব পূজা অনুষ্ঠানে তোমাদের প্রায় সকলেই সক্রিয় অংশ নিয়ে থাক। চাঁদা আদায় করা, প্রতিমা সজ্জিত করা, আলোর রোশনাই করা, মাইকে সঙ্গীত পরিবেশনের ব্যবস্থা করা, সেচ্ছাসেবকরূপে যানবাহন নিমন্ত্রণ করা, ইত্যাদি অনেক কাজই তোমরা সুসম্পন্ন করে থাক। এ-সব কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য তোমরা অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু আজকালকার এই সব কর্ম্মঠ, প্রাণচঞ্চল কিশোর-কিশোরীদের কাজের প্রশংসা করেও একটা কথা সর্ব্বদাই মনে হয় যে তোমরা পূজা বলতে বোধ হয় এই সব জাঁকজমক, আলোকসজ্জা এবং মৃন্ময়ী প্রতিমা নির্ম্মাণের শিল্প কুশলতাকেই সব বলে মনে কর। তাই না? কিন্তু পূজা বলতে কি তাই বোঝায়? এ প্রশ্ন কি তোমাদের মনে উদয় হয়? মনে হয় কি যে পূজার প্রধান অঙ্গ হচ্ছে ভক্তি? ভক্তিবিহীন যে পূজা সে পূজা পূজাই নয়। কিন্তু সত্যকথা বলতে কি, আমার মনে হয়, আজকাল প্রায় সর্ব্বত্রই এই "পূজা" নামে একরূপ ভক্তিবিহীন পূজার অনুষ্ঠানই হয়ে থাকে। অবশ্য তোমরা বলবে যে কেন সকলেই তো ঠাকুরকে প্রণাম করে, পুষ্পাঞ্জলি দেয়। ঠিক কথা—প্রণাম অবশ্যই করা হয় এবং পুষ্পাঞ্জলিও দেওয়া

হয়। কিন্তু সত্যকার ভক্তি তাতে কতটা থাকে? প্রার্থনা অবশ্য থাকে—পাশ করিয়ে দাও, পরীক্ষায় যেন ভাল ফল করতে পারি, অমুকটা পাইয়ে দাও, অমুক বিষয়ে যেন সাফল্য লাভ করতে পারি, ইত্যাদি। কিন্তু প্রার্থনা তো ভক্তি নয়। ভক্তকে ভাগবান সব কিছু দিয়ে থাকেন, কিন্তু ভক্তিহীন প্রার্থনা পূরণ করবেন কেন তোমরাই বল। তাই তোমাদের যত সব প্রার্থনা তা পূরণ করাতে হলে চাই আন্তরিক ভক্তি। ভক্তের ভক্তিই হচ্ছে ভগবানের সব চেয়ে বড় পূজা-উপচার। জাঁক-জমক-জৌলুষ এসব বাইরের ভড়ং। এতে ভগবান ভোলেন না। ভগবান শুধু ভোলেন ভক্তিতে। তোমরা সেই ভক্তি দিয়ে ভগবানের পূজা কর, দেখবে তোমাদের মনস্কামনা ভগবান পূর্ণ করবেন।

মেঘ-বাদলের খেলা

স্বপন বুড়ো

ঘোষক—দারুণ গ্রীষ্মের তাপে সারা দেশটা যেন জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে। নদী-নালা সরোবর আর পুকুরের জল শুকিয়ে গেছে। গাছের পাতাগুলি রোদের তাপে ঝলসে যাচ্ছে, কুঁকড়ে যাচ্ছে। কোথাও এতটুকু ছায়া নেই। গোটা দেশটার যেন পিপাসা পেয়েছে। তোমরা আবার কারা গো, নাচতে নাচতে আর গাইতে গাইতে আসছ?

ছেলেমেয়েদের দল—আমরা দেশের ছেলে-মেয়ের দল—

(ছেলমেয়েদের গান)

পিপাসাতে পরাণ যে যায় এক ফোঁটা জল চাই
নদী নালা সায়র পুকুর কোথাও যে জল নাই
হায় বিধাতা কি তাপ দিলে
গাছের পাতা শুকিয়ে নিলে
কোলের ছেলে কাঁদছে গাইয়ের বাঁটেতে
দুধ নাই
গলায় মোদের সুর জাগেনা কেমনে গান গাই?

ঘোষক—সারা দেশের ছেলেমেয়েরা পিপাসায় কাঁদছে। কোথাও পান করবার শীতল জল নেই। আকাশে রদ্দুর গনগন করে জ্বলছে। তোমরা আবার কারা গো? নানা রঙের ফুল না কী?

মেয়েরা—ঠিক বলেছ। গ্রীষ্মকালের ফুল।

(গ্রীষ্মকালের ফুলেদের গান)

মোরা গ্রীষ্মকালের ফুল
হালকা বায়ে সুবাস ছড়াই দুলি দোদুল দুল
এবার কি যে অনাসৃষ্টি
এক ফোঁটা নেই রে বৃষ্টি
তপ্ত তপন চোখে মুখে ফোঁটায় যেন হুল।
বাদল ঝরার তরে মোরা স্বপ্ন দেখি রোজ
জল বিহনে মরছি, সবাই কেউ রাখেনা খোঁজ।
আয়রে শ্যামল মেঘের ছায়া
দে বিছিয়ে মধুর মায়া
বর্ষারাণী এলেই মোদের ভাঙবে মনের ভুল।

ঘোষক—গ্রীষ্মকালের ফুলেরা ত' তাদের মনের কথা জানিয়ে চলে গেল। একি একি! আকাশে মেঘের গর্জন শোনা যাচ্ছে যে! সারাটা আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে গেল—মেঘদল যেন মাদল বাজাচ্ছে। (মেঘের গর্জন) সেই কালো মেঘের ভেতর দিয়ে সাদা মালার মত তোমরা কে ভেসে আসছ?

বলাকা—আমরা শ্বেত বলাকার দল। মেঘের ইসারা পেয়েছি তাই তো ঘরে ফিরে যাচ্ছি—

শ্বেতবলাকার গান

শ্বেতবলাকার মালা গাঁথি নিকষকালো মেঘে
ঝোড়ো হাওয়া আর না দেবে পক্ষীরাজের বেগে।
আমরা উড়ি দিক্‌বিদিকে
বৃষ্টি আসার গানটি লিখে
পাখায় মোদের বাদল ধারায় ছন্দ আছে জেগে।

ঘোষক—শ্বেত বলাকার দল ঠিক সাদা মালার মতই উড়ে চলে গেল। ওরা বোধহয় বৃষ্টি আসার খবর পেয়েছে—তোমরা আবার কারা পেখম মেলে নাচতে নাচতে এগিয়ে আসছ?

ময়ুর দল—আমরা উত্তরবনের ময়ুর দল। বর্ষারাণীর আসবার খবর পেয়েছি। তাই তো খবর পৌঁছে দিচ্ছি দোরে দোরে।

ময়ুরের গান

আমরা ময়ুর—মেঘের ডাকে পেখম ছড়াবো
ইন্দ্রধনুর রঙটি দিয়ে স্বপন গড়াবো
আসব মোরা কদম বনে
নাচবো মোরা সবার সনে
বর্ষারাণীকে আসার পথে মশাল ধরাবো।

ঘোষক—বা! বা! ময়ুরের নাচের কি অপরূপ দৃশ্য! আকাশে মেঘ জমেছে—তাই ময়ূরের দল পেখম তুলে নাচ্ছে। গুরু গুরু মেঘের ডাক—বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। আরো আরো মজার ব্যাপার—শিল পড়ছে, শিল—

শিল॥ হ্যাঁ আমরা শিলের দল এগিয়ে এসেছি আকাশ থেকে।

(শিলদের গান)

শিল—শিল—শিল!
বরফের ডিম মোরা খোলা যে রে দিল!
তর্ তর্ করে নামি তীব্রগতি
বেলোয়াড়ি চুড়ি যেন—ঠুন্‌কো অতি।
আকাশের স্বপ্নের খুলে দিই খিল
শিল—শিল—শিল

ঘোষক—ছেলেমেয়ের দল ভিজে ভিজে শিল কুড়িয়ে নিচ্ছে—। কী মজা—কী মজা! আবার দেখছি ঝোড়ো হাওয়া উঠ্‌লো। তোমরা যে সবাই মাথা নাড়িয়ে দুলছ। কে তোমরা?

গাছের দল॥ আমরা বনের গাছের দল। ঝোড়ো হাওয়ায় আমাদের ডালপালা উড়ছে—

(গাছেদের গান)

আমাদের ডালপালা হাওয়ায় ওড়ে
শিকড় পারবে কি গো রাখতে ধরে
আসে ঝড় সন্ সন্
মাথা করে বন্ বন্
বাসুকীর ফণা যেন পাতাল ফোঁড়ে—
শিকড় পারবে কি গো রাখতে ধরে।
এলো মেলো হাওয়া বয় শাখা যে দোলে
বাসা বাঁধা পাখিগুলি রয়না কোলে!
ভাঙে শাখা দুদ্দাড়
সব ভেঙে চুড়মার
এ ঝড়ে পরাণ টাকে রাখে কে ধরে!

গুলি বুঝি ভেঙে গেল। (গাছ পড়ার শব্দ। ঝড়ের শে —শো শব্দ—মেঘের গর্জন)

তোমরা আবার কারা নাচতে নাচতে এগিয়ে আসছ?

বৃষ্টি ধারা—আমরা বৃষ্টিধারা। তপ্তধরণীকে আমরা শীতল করবো। তাইতো আমরা এগিয়ে এলাম ঝম্ ঝম্ শব্দে।

(বৃষ্টির ছড়া)

আয় বৃষ্টি ঝেঁপে
ধান দেব মেপে
আর বৃষ্টি জোরে
গয়না দেব তোরে
আয় বৃষ্টি নেমে
উঠবি তবে ঘেমে।
আয় বৃষ্টি ধীরে
ভরবো বাটি ক্ষীরে।
আয় বৃষ্টি কাছে
তবেই পরান্ বাঁচে
আয় বৃষ্টি আয়
মেঘ যে ডেকে যায়।

(মেঘের গর্জন ও বৃষ্টির শব্দ)

ঘোষক—এইবার বনে বনান্তরে পাহাড়ের বুকে নদী নালায় বৃষ্টির মাতামাতি সুরু হল। ভাসিয়ে নিয়ে গেল মানুষের ঘর বাড়ী খোকা খুকুর খেলাঘর গেল ভেসে। দুরন্ত বর্ষারাণী এবার জেগেছে। তোমরা দুটী কারা এই মাতামাতির ভেতর গান গাইতে গাইতে এগিয়ে আসছ?

কদম-কেয়া। আমরা কদম আর কেয়া। বর্ষার মধুর পরশে মাটি মায়ের স্নেহে জেগে উঠেছে

কদম-কেয়ার গান

আমরা যে গো কদম-কেয়া বর্ষারাণীর ফুল
ঝরো ঝরো বরিষণেই, দুলে যেদোদুল দুল।
ভালোবাসী বাদল ধারা—
তাতেই পরাণ আপন হারা
বরষণের পরশমেই ভাঙ্‌বে মনের ভুল॥

ঘোষক। তোমরা আবার কারা এলে ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে? তোমাদের এলোচুল বেয়ে জল ঝর্‌ছে।

মেয়ের দল—আমরা ধরার মেয়ে। বাদল

জঞ্জাল সব ধুয়ে মুছে নিয়ে যাবে—বৃষ্টি ধারা। মেদিনী আবার শ্যামল হবে। শুকনো মাটি আবার সোনার ফসল ফলাবে—মানুষ আবার নতুন করে বাঁচবে—

ঘোষক—তাহলে ধরার মেয়ের দল, শোনাও তোমাদের গান—। বৃষ্টিধারাও যোগ দাও সেই সঙ্গে

(বৃষ্টি ধারার গান)

(ধরার মেয়ের গান)

(সমবেত গান)

ঝমঝম ঝমঝম
হরদম বৃষ্টি
ভাসে মাঠ ভাসে ঘাঠ
ভেসে যায় সৃষ্টি
নদী নালা খাল বিল
পুকুর যে ডুবল
ভেজে খোকা, ভেজে খুকি
শুধু গায় ডুব্‌লো।

ঝমঝম হরদম জল শুধু ঝরছে—
কেয়া বনে টুপটাপ জল ধরা পড়ছে।
পুলকেতে ভেজে চাষী ভিজে মাটী পেয়েগো
ক্ষণে ক্ষণে আনমনে উঠছে সে গেয়ে গো
কলসীর দলগুলি চোখ মেলে জাগছে
জেলেদের ঘরে ঘরে কোলাহল লাগছে।
কেবা আজ নৌকায় তুলে দেয় সাদা পাল
থাকিস নে বসে কেউ ফেলোদাঁড় ধরো হাল।

স্মৃতি পূজা

শ্রীফকিরচন্দ্র শুকুল

*সুদীর্ঘ জীবন ব্যাপি সাধনা তোমার
*খর স্রোতা নদী সম চির অফুরান্—
*ললিত কলার চর্চা, সাহিত্য সেবায়
*তাবৎ কিশোর লাগি নিবেদিত প্রাণ।
*রাখিবে তোমার সৃষ্টি তব পুণ্য নাম
*ওগো শিশু—মরমিয়া তোমারে প্রণাম।

*কবিতাটির প্রতি লাইনের প্রথম অক্ষরগুলি পর পর সাজিয়ে নিলে যে নাম পাওয়া যাবে, তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যেই

মাছেদের ঘ্রাণ শক্তি

গৌর আদক

বছরের অন্যান্য সময় অপেক্ষা বর্ষার সময়েই সব চেয়ে বেশী লোককে হাতে ছিপ নিয়ে মাছ ধরতে যেতে দেখা যায়। সেদিন আমাদের পাড়ার অমলেন্দুদাকেও এমনিই হাতে ছিপ নিয়ে যেতে দেখলাম, যাবার সময় আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, অমলেন্দুদা আজ কোথায় যাচ্ছেন? এই ভাই একটু চাম্পাহাটি যাবো; আমার এক বন্ধুর বাড়িতে। এই কথা বলেই অমলেন্দুদা হন্ত-দন্ত হয়ে ছুটতে লাগলেন বালিগঞ্জ ষ্টেশনের দিকে।

মনে মনে ভাবলেম এই এক পাগল লোক। মাছ ধরার এমনই বাতিক যে, জল নেই ঝড় নেই হাতে ছিপ-নিয়ে চলেছে মাছ ধরতে। আজ এখানে, কাল সেখানে, পরশু ওখানে, এ যেন লেগেই আছে। এটা যেন তাঁর একটা নেশায় দাঁড়িয়ে গেছে।

মাছ ধরাটা যেমন তাঁর একটা নেশায় দাঁড়িয়ে গেছে, তেমনি মাছ ধরতেও তিনি খুব পটু। এমন সুন্দর ভাবে তিনি চার ও টোপ তৈরি করেন যে পুকুরের মাছ চারের গন্ধে এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ছুটে আসে।

কিন্তু এখন তোমাদের মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, শুনেছি জলের মধ্যেতো বাতাস নেই কিন্তু কেমন করে তারা এই গন্ধ অনুভব করে? এটা খুবই সত্য কথা যে জলের মধ্যে বাতাস বহেনা তবু তারা কি করে, বিভিন্ন গন্ধ অনুভব করে। এটা শুধু তোমাদেরই প্রশ্ন নয়, যাঁরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ছিপ হাতে নিয়ে পুকুর ধারে সাদা ফত্‌নার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন, তাঁদেরও প্রশ্ন বলা চলে; কেনো না আমার মনে হয় তাঁরাও বোধ হয় এর সঠিক উত্তর দিতে পারবেন না। তাঁরা শুধু মাছ শিকার করে তার সাধ নিবারণই করে থাকেন। মাছ শিকার করে তার সাধ নিবারণ করলেই মাছ সম্বন্ধে সব কিছু জানা যায় না। মাছ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানার আছে তার মধ্যে মাছেদের গন্ধ অনুভব করার কারণটিও একটি।

পৃথিবীতে মানুষ ছাড়াও যত প্রকার জীব-জন্তু আছে

কিন্তু মাছের বেলায়, তাদের ঘ্রাণ শক্তি অনুভব করার জন্য ভগবান তাদের একটা আলাদা শক্তি দিয়েছেন। তাদের মাথার ঠিক উপরেই দুটি গন্ধ বহন শিরা আছে সেই শিরার দ্বারাই মাছেরা ঘ্রাণ শক্তি অনুভব করে। এখন তোমাদের মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগতে পারে তবে কি মাছেদের নাক নেই? মাছেদের নাক আছে ঠিকই তবে তারা নাকদিয়ে ঘ্রাণ শক্তি অনুভব করে না। মাথার উপকার শিরার দ্বারাই তারা গন্ধ অনুভব করে। মাছেদের ঘ্রাণ শক্তি অন্যান্য জীব-জন্তু অপেক্ষা ভীষণ প্রবল; বহুদূর থেকেই এরা যে কোন গন্ধ অনুভব করতে পারে। বিশেষ করে নদীর ছোট ছোট মাছেরা ঘ্রাণ শক্তির দ্বারা দূরের বিপদ আপদ ও খাদ্য সম্পর্কে অনুমান করতে পারে, আবার তেমনি নিজের দলের কে কোথায় আছে বা কাছা কাছি কোন শত্রু আছে কিনা তাও অনুমান করতে পারে। এছাড়া মাছেদের মধ্যে যদি কোন মাছ কোন রকম ভাবে আহত হয় সেই আহত স্থান থেকে তারা এমন এক প্রকার গন্ধ নির্গত করতে থাকে যে সেই গন্ধ অনুভব করেই মাছেরা কাছা কাছি কোন বিপদের আশঙ্কা অনুমান করে এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেরা সাবধান হয়ে যায়।

পৃথিবীতে যত রকমের মাছ আছে সব মাছের কিন্তু ঘ্রাণ শক্তি এক রকম নয়, বিভিন্ন মাছের বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। কারো কম কারো বেশী তবে, যে সমস্ত মাছ সবচেয়ে কম ঘ্রাণশক্তি অনুভব করে, তাদের ঘ্রাণশক্তি কিন্তু পৃথিবীর যে কোন জীব-জন্তু অপেক্ষা অনেক বেশী।

মাছেদের ঘ্রাণ শক্তি সম্বন্ধে প্রমাণ করতে গিয়ে জার্মান প্রাণী-বিজ্ঞানী অধ্যাপক ফনফ্রিস অনুমান করেন যে, মাছেরা নাক দিয়েই ঘ্রাণ অনুভব করে, তবে তাঁর এই প্রমাণটি কিন্তু অনুমানই বলা চলে।

অচিন পথের যাত্রী

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চৌধুরী

(পূর্ব প্রকাশিতর পর)

গটেনবার্গ বন্দর থেকে স্পিজবার্জেন দ্বীপ অনেক দূরের পথ। এণ্ড্রি তাঁর বন্ধুদের নিয়ে "ভির্গো" জাহাজের ডেকে বসে সেই জলপথ অতিক্রম করছিলেন তাঁদের বেলুন যাত্রাকালীন সমস্যা আলোচনা করে। কখনো ডেকের উপর বসে তাঁরা অন্তহীন জলরাশির দিকে তাকিয়ে থাকেন; আবার কখনও আকাশের গায়ে ছড়িয়ে থাকে শাদা কালো মেঘের অপরূপ দৃশ্যের মাধুর্য্যে মুগ্ধ হন। রূপালি ঢেউয়ের উপর সূর্য্যের সোনালী রোদ জলের উপর নেচে নেচে খেলে; দেখে দেখে তাঁদের চোখ যেন ভরে যায়।

প্রথম কয়েকদিন নির্ব্বিঘ্নেই কেটে গেল। তারপর একদিন ভোর থেকেই আকাশের অবস্থা আশঙ্কাজনক হয়ে উঠলো। সমুদ্রের সুদূর দক্ষিণাংশে বিপুল জলোচ্ছাস দেখা যেতে লাগলো। জাহাজের সারেঙ্গ অনেকক্ষণ ধরে চারিদিক লক্ষ্য করে এণ্ড্রিকে বললেন—"আশঙ্কা হচ্ছে প্রবল ঝড় আসছে।"

এণ্ড্রি বললেন—"ক্ষতি কি! ঝড়ে আমরা যেদিকে যাচ্ছি সেই দিকেই নিয়ে যাবে। আমাদের সময় বাঁচবে।"

একথা শোনার পর সারেঙ্গের মুখে আর কথা বেরুল না।

ঝড় এলো। যেমন ভীষণ ঝড়—তেমনি মুষলধারে বৃষ্টি, বৃষ্টির জল যেন বরফের মত শক্ত। জাহাজের ডেকে পড়ে সেই বরফ ছিটকে এসে যাত্রী আর নাবিকদের চোখে মুখে লাগতে লাগলো। এমন দুর্য্যোগ বুঝি কেউ কখনো দেখেনি। বাতাসের এমন হাহাধ্বনি বুঝি আর কেউ শোনেনি। আর কী ভীষণ সমুদ্রের ঢেউ! পর্ব্বত প্রমাণ ঢেউ বারে বারে এসে "ভির্গো" জাহাজকে গ্রাস করার চেষ্টা করতে লাগলো; আবার এক একবার ঢেউ এর স্পর্শত্যাগ করে জাহাজ শূন্যে উঠতে লাগলো। কিন্তু "ভর্গো"জাহাজ ডুবলো না, তুফানে নক্ষত্র বেগে অগ্রসর হতে লাগলো।

রাত্রিবেলা যখন ঝড়ের বেগ আরও বৃদ্ধি পেলো, তখন সারেঙ্গ অন্যান্য নাবিকদের সঙ্গে পরামর্শ করে এণ্ড্রিকে বললেন—"আমার মনে হয় কাছের কোন বন্দরে জাহাজ ভেড়ানো ভালো। নতুন বিপদ ঘটতে পারে।"

এণ্ড্রি বললেন—"আমারও তাই মনে হচ্ছে।"

সারেঙ্গ জিজ্ঞাসা করলেন—"কোন বন্দরে যাবো"

এণ্ড্রি বললেন "আমি তো শুধু একটা বন্দরের নাম-ই জানি। সেটা স্পিজবার্জেন।"

উত্তর শুনে সারেঙ্গ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তারপর বললেন—"তাই হবে। আমরা স্পিজবার্জেন বন্দরেই যাবো।"

"ভির্গো" জাহাজ যেমন যাচ্ছিল, তেমনি চলল। দুইবার ডুবতে ডুবতে বেঁচেও গেল। কিন্তু জাহাজের ছাদের একদিকটা উড়ে গেল! প্রভাতে বাতাসের বেগ ক'মে এল—আকাশ অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার হল। এণ্ড্রি বললেন—"আমরা সময় মতই পৌঁছে যাব মনে হচ্ছে।"

এণ্ড্রির অনুমান মিথ্যা হলো না। ক্রমে একদিন "ভির্গো" জাহাজ নির্বিঘ্নে এসে স্পিজবার্জেন বন্দরে নোঙর ফেলল।

এণ্ড্রির ধারণা হলো, তাঁর অভিযান ব্যর্থ হবে না। মেরুর বুকে প্রথম পড়বে একজন সুইডেনবাসীর পায়ের চিহ্ন, উড়বে সুইডেনের জাতীয় পাতাকা মেরুর আকাশে বাতাসে। মনের আনন্দে তিনি তাঁর মাকে লিখ্‌লেন—

"যে রকম নির্বিঘ্নে সমস্ত ব্যাপার সম্পন্ন হচ্ছে, তাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ভাগবানের দয়ায় আমারা জয় গৌরব নিয়ে ফিরবো—সেদিন খুব দূর নয়…।"

এণ্ড্রির অনুমান মিথ্যা হয় নি। তিনি শুধু জান্‌তেন না প্রথম প্রচেষ্টায় সাফল্য লাভ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না; আর তিনি যখন সগৌরবে দেশে প্রত্যাবর্তন করবেন রাজোচিত মর্য্যাদায় তখন তাঁর দেহে জীবন থাক্‌বে না।

স্পিজবার্জেন বন্দরে পৌঁছেই জাহাজ থেকে জিনিষ পত্র নামানো আরম্ভ হলো। নামানো হলো জামা কাপড়, বিছানাপত্র, যন্ত্রপাতি খাদ্যদ্রব্য আর গুলিবারুদ ও বন্দুক। সবশেষে নামানো হলো অধিকায় বেলুন ঈগলকে।

ধীরে ধীরে "ঈগলের ফাঁপা জায়গায় গ্যাস পূর্ণকরা হ'লো—ফুলে ফেঁপে বেলুন আকাশের গায়ে দুলতে লাগলো—নির্বিঘ্নে দোতলা গণ্ডোলা বেলুনে বেঁধে তাতে যাত্রীদের জিনিষপত্র তোলা হ'লো—যথারীতি সাজানোও হ'য়ে গেল সে সব। আকাশের বাতাসকে যাতে নিজের সুবিধা মত কাজে লাগাতে পারেন—যাতে বেলুনকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিজের পথে নিতে পারেন—সেজন্য এণ্ড্রি বেলুনের গায়ে তিন দিকে তিনখানা পাল বেঁধে দিলেন। সুইডেনের জাতীয় পাতাকাও বাঁধা হল একখানা বেলুনের গায়ে।

আয়োজন সম্পূর্ণ হ'লো, "ঈগল" বেলুন আকাশের গায়ে দুলে দুলে উড়তে লাগলো—বাঁধন খুলে দিলেই বেলুন উড়ে যাতে ভাল ভাবে আকাশে উঠে সুমেরুর দিকে রওনা হ'তে পারে, তার সমস্ত ব্যবস্থা নিখুঁত ভাবে করা হলো।

কিন্তু যাত্রা করা আর হলো না।

ক্রমে বাতাস একেবারেই থেমে গেল। যে বাতাস তীব্র বেগে আগের কয়েকদিন বয়েছিল, যার বেগে ভির্গো জাহাজের ছাদও উড়ে নিয়েছিল, সমুদ্রে এত ঢেউ উঠেছিল, তার আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না। যাত্রী দল তখন প্রার্থনা করছিলেন বাতাস—বাতাস আর একটু বাতাস!

কিন্তু তাঁদের আশা পূর্ণ হ'লো না! সামান্য বাতাস যা-ও বা দেখা দিল, তা তাঁদের উদ্দেশ্যের সহায়ক নয়; যে দিকে থেকে জোড় হাওয়া বইলে সুমেরুর দিকে যাওয়া যেতো, তা পাওয়া গেল না।

ষ্ট্রীণবার্গ আর ফ্রেণকেল ক্ষোভে দুঃখে আর্তনাদ করে উঠলেন, তাঁরা এণ্ড্রির দিকে কাতর দৃষ্টিতে চাইলেন। এণ্ড্রিও তাঁদের দিকে একবার তাকালেন বটে, কিন্তু সে দৃষ্টি ধীর, স্থির, রোষ কলঙ্ক শূন্য—সে দৃষ্টির মধ্যে উদ্বেগের চিহ্ন পর্য্যন্ত ছিল না।

এইভাবে কয়েকদিন কাট্‌লো। আকাঙ্ক্ষিত বাতাসের দেখা পাওয়া গেল না। ক্রমে যাত্রার সময় বয়ে গেল; যে সময়ে রওনা দিলে শীতঋতুর পূর্ব্বেই সুমেরু পৌঁছে ফিরে আসার চেষ্টা করা যেত, সে সময় উত্তীর্ণ হয়ে

গেল। ধীর নিষ্কম্প স্বরে এণ্ড্রি বল্লেন—"এবার ফিরতে হবে; সুইডেনে।

ষ্ট্রীণবার্গ আর ফ্রেণকেন দুইহাতে আপন আপন মাথা চেপে ধরলেন, সমস্ত পৃথিবী যেন তাঁদের সম্মুখে ঘুরতে লাগলো। তাঁদের মুখ দিয়ে কথা বেরুল না। তাঁরা এণ্ড্রির দিকে তাকাতে পর্যান্ত পারলেন না। শুধু ভাব্লেন—"কী শোচনীয় পরাজয়! এত উদ্যোগ, এত আয়োজন, সব ব্যর্থ হয়ে গেল! .

কিন্তু বিধি যেখানে বিরূপ, মানুষ সেখানে কি করতে পারে?

নিরুপায় এণ্ড্রি বেলুন থেকে জিনিষপত্র নামিয়ে ভারে ভারে আবার তা' জাহাজে তুলতে লাগলেন,—দড়ির মৈ, মশাল, কুডাল, থন্তা, গুলিগোলা, খাদ্যদ্রব্য সবই বেলুন থেকে নামিয়ে জাহাজে তোলা হলো। সকলের শেষে বেলুনের মুখ কেটে গ্যাস বের করে দেওয়া হলো, ভাঁজ করে বেলুনটাকেও জাহাজে তোলা হ'ল। সব জিনিষ তোলা হ'লে এণ্ড্রি বল্লেন—"ছাড়ো জাহাজ! দেশে ফিরে চলো।

প্রথমপ্রচেষ্টায় ব্যর্থ হ'য়ে নিতান্ত ভগ্ন মনে মুখ নীচু ক'রে এণ্ড্রি দেশে এলেন। জয়ধ্বনি হ'ল না। কেউ জয়মাল্যও দিল না। এণ্ড্রির বিরুদ্ধ পক্ষের লোকেরা বল্তে লাগ্লো—"দেখ্লে তো! এমন যে হবে তা'ত আমরা আগেই জানি!"

প্রথম সুযোগ ব্যর্থ হ'য়ে গেলেও এণ্ড্রি হতাশ হলেন না। দিনের পর দিন নিখুঁত হিসেব করে সমস্ত পূর্ব্ব অভিজ্ঞতার ভুলক্রটীর সংশোধন ক'রে নূতন ক'রে যাত্রার আয়োজন করলেন তিনি। ষ্ট্রীণবার্গ আর ফ্রেণকেনও তাঁর সঙ্গে ছাড়লেন না। তাঁরা ছিলেন সেই শ্রেণীর লোক, যাঁরা কথা বলেন কম—কাজ করেন বেশী।

ইউরোপের নানা দেশ এণ্ড্রির প্রচেষ্টাকে, প্রথম ব্যর্থতাকে নিন্দা কুৎসার গ্লানিতে ভরিয়ে তুললো। তারা প্রচার করলো একবারে আশা মত টাকা পাওয়া যায় নি, তাই আর একবার ধোঁকা দিয়ে টাকা মারার ফন্দীতে আছেন এণ্ড্রি!

কিন্তু অন্যে যে যাই বলুক—সুইডেন তার বীরপুত্র এণ্ড্রিকে খুব ভাল ক'রেই চিন্তো। তাই দ্বিতীয়বার যাত্রা করবার সময় আবার যতটাকার দরকার হ'লো, তা' অতি অল্পদিনের মধ্যেই উঠে গেল।

গটেনবার্গ বন্দরে এসে এণ্ড্রি শেষবারের মতো তন্ন তন্ন ক'রে সমস্ত আয়োজন মিলিয়ে দেখে নিলেন,... সব ঠিক আছে, এবার সোজা গন্তব্যের দিকে।

এক বছর পরে জাহাজ ছাড়বার মুখে এণ্ড্রি একখানা চিঠি লিখ্লেন তাঁর মাকে—"আমার জন্য চিন্তা ক'রো না। তোমার স্নেহময় মমতাভরা চোখ তো সারা সময়ই আমার দিকে চেয়ে আছে। তোমার আশীর্ব্বাদই আমায় সকল বিপদ থেকে রক্ষা করবে। তুমি ভেবো না মা। তোমার আশীর্ব্বাদে সফল আমি হবোই। আর সুমেরুটা জয় ক'রে সেই গৌরবের মুকুট তোমার পায়ে এনে দেবো!"

জাহাজ আবার যথাসময়ে এসে স্পিজবার্জে'ন বন্দরে নোঙর ফেলল। আবার জিনিষপত্র সবই জাহাজ থেকে নামানো হ'লো। অতিকায় বেলুন "ঈগলকে" মাটীতে নামানো হ'লো। তার নীচে গণ্ডোলা বাঁধা হ'লো—গ্যাসে পরিপূর্ণ হ'য়ে বেলুন আকাশে উড়তে লাগলো, জিনিষ পত্র সব গণ্ডোলায় তু'লে যাত্রীদল রওনা হ'বার জন্য প্রস্তুত হয়ে রইলেন।

আকাশ পথে বেলুনে ভ্রমণ নিশ্চিন্ত যাত্রা। নিরুদ্বেগ নিঃশঙ্ক যাত্রীরা দূরবীন তুলে দেখ্লেন। রৌদ্র-ময়ী রাত্রির আলোয় ঐ দূরে ঝিক মিক করছে তুষার মহাদেশের প্রান্তরেখা। আশায় উদ্বেল হলো তাঁদের মন।

তবুও তাঁদের যাত্রা পথে বাধা পড়লো—এলো প্রকৃতির এক নূতন বাধা! ঝড়ের বেগে বাতাস এলো উত্তর-পূর্ব্ব কোণ থেকে—অর্থাৎ সুমেরুর বিপরীত দিক থেকে।

যাত্রীরা প্রমাদ গণলেন। (ক্রমশঃ)

সুলতার মন

তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়

আগে কিছুই বোঝা যায়নি।

বিয়ের আগে দু'বার দেখেছিল সুকান্ত। প্রথম বার একা আর দ্বিতীয় বার বৌদি আর রাঙাদিকে সঙ্গে নিয়ে সুলতাকে দেখতে এসেছিল। সুন্দর চেহারা। চেহারার মধ্যে কোথাও একবিন্দুও অশুভ চিহ্ন তারা কেউ খুঁজে পায়নি। খুঁজে পায়নি সুকান্ত ফুলসজ্জার মধুর রাতে। দাম্পত্য জীবনের প্রথম রাত হাসি গল্পর ভেতর দিয়ে সকালের রোদের বুড়ি তাদের ছুঁইয়ে দিয়েছিল। কথা বলার ক্লান্তির ঢল যখন তাদের ঠোঁট জোড়ায় আশ্রয় নিয়েছিল, তখন একটি ঠোঁট হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল আর ঠোঁটের বুকের ওপরে। প্রথম পাওয়ার আনন্দে বুঁজেছিল চোখের পাতা। এমনি লঘুছোঁয়া দিয়েই চারটা রাতকে দিন করেছিল সুকান্ত আর সুলতা। বিয়ের পরে এমনি সহজ ছবি ঘটতে পারে ভাবেনি দিদি বৌদিদিরা আসল ছবি দেখে তাই তাদের মনের সলতে নিবে এসেছিল। মন-মরা মন নিয়ে তাই সবাই আড়ি পাতার ডিউটি ছেড়ে নিজের নিজের ঘরে ঢুকে খিল এঁটেছিল।

পঞ্চম রাতে সুলতার পাশে শুয়ে সুকান্ত বুঝেছিল আজ দরজার ঠিক ওপাশে খুট খাট শব্দ আর কিলকিলে হাসি জেগে নেই। তবুও সঠিক জানার তাগিদে নিঃশব্দে খাট থেকে নেমে আচমকা ভাবে দরজাটা একটানে খুলে হাট করেছিল। বেরোতে না পারা নেংটি ইঁদুরটা খালি এক ছুটে মিলিয়ে গিয়েছিল ফাঁকা দালানের মধ্যে।

মুচকি হাসতে হাসতে দরজা বন্ধ করেছিল সুকান্ত। ফিরে এসেছিল, খাটে শুয়ে পড়েছিল সুলতার কোল ঘেঁসে। চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা সুলতার দেহটা ঘুরিয়ে নিয়েছিল নিজের দেহের ওপরে। সুলতার বুকের কাছে হাত জোড়াটা এসে আঁকুপাঁকু করে উঠেছিল। শাড়ীর বেশ কিছুটা অংশ খসে পড়েছিল, নখের আঁচড়ে ছিড়ে গিয়েছিল ব্লাউজের একটা টিপকল। 'তুমি ভারী অসভ্য,' বলে সুলতা নিজেকে ছাঁড়াতে চেয়েছিল। কিন্তু তার কৃত্রিম চেষ্টা চাপা পড়েছিল স্বামীর আকর্ষণ দংশনে। তালগোল পাকানো দেহটা তাই কেমন যেন সুকান্তর দেহের নীচে চাপা পড়তে বসেছিল। আলো আঁধারে ডোবা কড়িকাঠগুলো আস্তে আস্তে ঘুরতে শুরু করেছিল সুলতার মনের মধ্যে। মাথা ঘোরার ভারেই গুলিয়ে উঠেছিল গাটা। বমি বমি ভাবটা চাপা দেবারজন্যই স্বামীর বুকে মুখটা চেপে ধরেছিল সে। এতে বমিভাবটা কেটে ছিল, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই শুরু হয়েছিল কাশি। ছোট এক টুকরো কাশি নয়। বড় বড় টানা টানা কাশি একটানে কেশেই চলেছিল সুলতা।

স্বামীর দেহ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে বাথরুমে গিয়েছিল সুলতা। বেশিনটা আঁকড়ে ধরে কয়েকমুহূর্ত্ত কাসার পরই ফল পেয়েছিল, খানিকটা তাজা রক্ত ঝলকে ঝলকে ছিটিয়ে পড়েছিল সাদা বেসিনটার ওপরে। এক চিলতে রক্ত কশ থেকে গড়িয়ে এসে থেমেছিল থুতনির নীচে। কাশির কষ্টে নেমে আসা চোখের জলটা নেমেছিল আরও নীচে।

চোখের সামনে তাজা রক্ত দেখে ভয়ে শিউরে উঠেছিল সুলতা। তাড়াতাড়ি বেসিনের ওপর

থেকে চোখটা তুলে নিয়েছিল। চোখের সামনে বড় আয়নাটার ওপরে নিজের প্রতিচ্ছবির কশে রক্ত দেখে প্রচণ্ড ভয়ে সে আরও বেশী কুঁকড়ে যেতে বসেছিল।

দালানে পায়ের শব্দ পেয়ে সুলতা তাড়াতাড়ি বেসিনের কলটা খুলে মুখটা ধুয়ে নিয়েছিল। রক্তটা চালান করে দিয়েছিল নর্দমার মধ্যে। চোখে জলের ঝাপটা দিয়ে সুকান্তর সাথে ফিরে গিয়েছিল ঘরে। স্বামীকে ও কিছু নয়, কাশির জন্য সামান্য বমি হয়ে গেল। বাশি মাছ খাওয়াতে বোধ হয় অম্বল হয়েছে,' বললেও নিজের মনকে কোন সান্ত্বনার কথা বলতে পারলো না সুলতা। মুখ থেকে তাজা রক্ত ঝরেছে, সেতো সাংঘাতিক কাণ্ড! তার এতো সুন্দর দেহের ভেতর ও রকম কুৎসিৎ কোন রোগ থাকতে পারে সেটা বিশ্বাসই করা যায় না। অবিশ্বাসী মন তাই বিশ্বাসীমনকে বুঝিয়ে রায় দিল 'ও কিছু নয়, কাসতে কাসতে গলা চিরে গিয়ে রক্ত ঝরেছে। এতে এতো ভয় পাবার কি আছে? সুলতা খানিকটা আশ্বস্ত হতেই তার ক্লান্ত দেহটা মনের অজান্তেই এলিয়ে পড়ে ছিল ঘুমের কোলে।

শুধু একটি রাতের একবারের ঘটনা নয়। পরবর্ত্তী দিনে ঘটল আবার সেই একাই ঘটনা। বিকালে বড়জার কাছে বসে চুল বাঁধতে বাঁধতে হঠাৎ শুরু হয়ে গেল কাশির তাণ্ডব নৃত্য। কালকের ঘটনা ঘটবে ভেবেই সুলতা তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়ে চেপে ধরল মুখটা। মুখ চাপলেও রক্ত থামল না। কালকের মতনই খানিকটা তাজা রক্ত গড়িয়ে এসে ভিজিয়ে দিল সুলতার শাড়ীর আঁচলের খুঁট। ঐ অবস্থায় শাড়ীটা জড়োসড়ো করে উঠে পালাতে চাইল সে কিন্তু পালাতে সে পারল না! পুলিশ চোর ধরার মতই সে বন্দী হয়ে ধরা পড়ে গেল বড়'জার হাতে।

কথাটা কানে যেতেই হাতে পা ছুঁড়ে মড়া কান্না শুরু করে দিয়েছিলেন বাসন্তী দেবী। টানা ঘণ্টা কয়েক জুড়ে কান্নার রোল ওঠা নামা করেছিল। রাত্রে সুকান্ত বাড়ী ফিরলে তার কাছে সমস্ত ব্যাখ্যা করে তবে তাঁর কান্না থেমেছিল। মায়ের মুখ থেকে এতো কথা শুনে একটা কথারও উত্তর দেয়নি সুকান্ত। শুধু তার মুখটা ক্রমশঃ বাশি মাছের রঙে রূপান্তরিত হয়েছিল। ভারী পা জোড়াকে কোন ক্রমে হেঁচড়ে টেনে নিয়েগিয়েছিল নিজের ঘরের দিকে।

বিছানার ওপরে উপুর হয়ে পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদছিল সুলতা। পেছনে সুকান্ত এসে দাঁড়িয়েছে বুঝেও সে মুখ তুলে তাকায়নি। স্থির ভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল সুকান্ত। পরে আস্তে করে এগিয়ে গিয়ে হাতটা রেখেদিল স্ত্রীর পিঠের ওপরে।

কূল ভাঙ্গা বন্যার মতন স্বামীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সুলতা। বন্যার প্লাবনে প্লাবিত উচ্ছল জলধারার মতন তার অশ্রুর ধারা ফুলে-ফুলে কেঁপে কেঁপে কঁকিয়ে উঠছিল। নিজের বুকের ওপর থেকে স্ত্রীর মাথাটা দু'হাত দিয়ে তুলে ধরেছিল সুকান্ত। মুখের সামনে মুখটা এনে সান্ত্বনার সুরে বলেছিল, 'এতে ভয় পাবার কি আছে? কাল ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করিয়ে আনবো'।

পরপর দু'জন ডাক্তারই পরীক্ষা করে একই রায় দিলেন। আর তাদের রায় অনুযায়ী কদিনই হাসপাতালে ভর্ত্তি হয়ে গেল সুলতা। মাত্র পাঁচ পাঁচটা দিন শ্বশুর বাড়ীর ঘর করার পর পুরো পাঁচ মাসের জন্য হাসপাতালের ঘরে বন্দিনী হয়ে বসল সে। সামান্য একটা স্পট নয়, এক্সরে যন্ত্রে যা ধরা পড়েছে তা মারাত্মক ব্যাপার। দু'লাঙ্গেই বেশ খানিকটা করে ঘা দগদগ করছে। এ রোগ সহজে সারবার নয়। একে সারাতে হলে প্রয়োজন প্রচুর ওষুধ আর অনেক পথ্যের।

অর্থের ব্যাপারে কোন কার্পণ্যকেই মনে স্থান দিল না সুকান্ত। অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজনের অতিরিক্তই সে ব্যয় করে বসল হাসি মুখে। সাত কাজের মধ্যেও প্রতিদিন ট্রাম বাসে যুদ্ধ করতে করতে ছুটে আসে হাসপাতালে। ছোট্ট টুলটাকে যতদূর সম্ভব বিছানার কাছে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে বসে সুলতার কোল ঘেঁসে। বহুদিনের দাম্পত্য জীবনের মতনই লঘু হাসি ঠাট্টায় ভরিয়ে তোলে সুলতার সহজ মনের ফুলের ডালিকে। তার এই এক ঘণ্টার সান্নিধ্য তাই সুলতার মনে বেশ কয়েক ঘণ্টার মধুর রেস তানপুরার সুর বাজায়। ডাক্তারী অভিধানে যে সুর শোনার একান্ত প্রয়োজন যক্ষ্মা রোগীদের। এ রোগ যে শুধু দেহের নয়, মনেরও

বটে। মনকে তাই সহজ করে রাখলেই সহজ ভাবে এ রোগ সারতে শুরু করবে।

মাসখানেক যেতে না যেতেই ধীরে ধীরে সারতে শুরু করেছে সুলতা। এখন তাই হাসপাতালের অনুমতি নিয়ে ছুটির দিন সে খানিকটা বেড়াতে যায় সুকান্তর সঙ্গে।

আজ রবিবার। কাল যাবার সময় সুকান্ত বলে গেছে আজ পরেশনাথ মন্দিরে বেড়াতে যাবে তারা। স্বামীর কথামত ঠিক সময়ে সুলতা সাড়ী বদলে, মুখে প্রসাধনের প্রলেপ এঁকে তৈরী হয়ে নিল। তখনও চারটে বাজতে কিছু বাকি আছে, সুকান্ত আসার সময়ও তখন হয়নি; কিন্তু সে না এলেও বিনা নোটিশে বৃষ্টি এসে গেল আকাশ কালো করে। প্রাকৃতিক দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে সুলতা বুঝলো আজ আর বেড়াতে যাওয়া হবে না। বেড়ানো তো চুলোয় যাক্ এই প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে সুকান্ত কেমন করে আসবে সেই কথাই ভাবতে বসে সুলতার মুখটা বাইরের আকাশের মতন কালো হয়ে উঠালো। চোখের কোণে চিকিমিকি রেখা জাগলো। 'কি এখনও তুমি তৈরী হওনি'? কাক-ভেজা হয়ে সুলতার পেছন থেকে ডাক দিয়ে তার আনমনা মনটাকে চমকে দিল সুকান্ত।

'একি তুমি, কখন এলে? বৃষ্টিতে কি সাংঘাতিক ভিজেগেছ তুমি,' সুলতার মেঘকালো মনের ওপরে আনন্দের বিদ্যুৎ ঝলসে উঠলো।

'বৃষ্টি কই'? কপট অবাকে ভেঙ্গে পড়ল সুকান্ত।

'ওগুলো তাহলে বুঝি রোদ ঝরছে,' জানালার গরাদের মাঝে চোখ ঘোরালো সুলতা। নতুন কিছু দেখার লোভেই যেন স্ত্রীর চোখের সাথে নিজের চোখ জোড়াকেও বাইরের দিকে চালান করতে চাইল সুকান্ত। আচমকা ভাবে যেন একমুঠো অবাক বিস্ময় ঝলকে ঝলকে গড়িয়ে পড়ল সুকান্তর মন থেকে। মনটা তার জানলা অবধি যায়নি। ঠিক জানলার আগেই এসে থেমে গেছে। থেমে গেছে বাইশ নম্বর বেডের পেসেন্টের ওপরে এসে। এতোদিন বাদে জয়ন্তীকে এমন কঙ্কালসার রূপে এই হাসপাতালে দেখবে তা স্বপ্নেও কোনদিন ভাবেনি সুকান্ত। তাই বেশ কয়েক বছর বাদে সে আবার জয়ন্তীকে নিয়ে ভাবতে বসল। বাইরের বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটাগুলো যেন এক একটা প্রশ্ন হয়ে সুকান্তর মনের মধ্যে ঝরতে লাগল। ঝরা প্রশ্নগুলো অবশেষে জমে গিয়ে মনের নর্দমা বন্ধকরে তার বুদ্ধি চিন্তার ভাণ্ডারে জল ঢুকিয়ে ছাড়ল।

সুলতা স্বামীকে লক্ষ্য করল। তার মনের আনমনা ছবিটা পড়ে নিয়ে তার চোখের সাথে চোখ মিলিয়ে তাকালো জয়ন্তীর দিকে। জয়ন্তীর কিন্তু কোন দিকে হুঁস নেই। আধবোজা চোখ জোড়াটা কড়িকাঠের ওপরে ছেড়ে দিয়ে কি যেন বিড় বিড় করে সে বকে চলেছে আপন মনে।

যে কথার সুর দিয়ে সুকান্ত কথা বলতে বলতে ঢুকেছিল সে সুরটা যেন ধীরে ধীরে বেসুরো ভাবে সুলতার কানে বাজতে লাগল। মুখে অসংলগ্ন কথা বললেও তার স্বামীর চোখটা যে ঐ বাইশ নম্বর বেডের ওপর নিবদ্ধ সেটা বেশ সহজ ভাবেই লক্ষ্য করল সে।

মুখে কিছু না বললেও সুলতা তার কৌতূহলী মন নিয়ে পরপর তিন দিনই লক্ষ্য করে দেখল যে সুকান্ত এসে আগের মতনই তার কোল ঘেঁষে বসলেও তার মনটা কিন্তু চলে যায় দূরে, বাইশ নম্বর বেডেরওপরে। এক দৃষ্টে তাকিয়ে না থাকলেও মিনিট মিনিট অন্তর সে আড়চোখে একবার দেখে নেয় বাইশ নম্বর বেডের রোগিণীকে; পর মুহূর্তেই আবার চোরা চাহনি মেলে দেখে সুলতা তার এই চোর চোর খেলাটা ধরতে পেরেছে কিনা।

স্বামীর এই ভাবান্তর দেখে, এক পাগলী যক্ষা রোগিণীর প্রতি লক্ষ্য ভাব দেখে সুলতার কৌতূহলী মনটা বিস্ময়ের চাদরে ঢাকা পড়ে যায়।

বিয়ের পরও বহু পুরুষ সুন্দরী মেয়ে দেখলে নগ্নভাবে তাকায়, এবং এই তাকানোটা স্বাভাবিকই। সব সুন্দরীই পুরুষের মনের পূজারী। মনে মনে রাগ করলেও মুখ ফুটে কোন স্ত্রী এতে বাধ্য দেয়না সুলতা ও দিত না যদি সুকান্ত সুন্দরী যুবতীর দিকে মাঝে মধ্যে নগ্ন চোখে তাকাতো। কিন্তু একটা পাগলী যক্ষা রুগীনির দিকে স্বামীকে এমন ভাবে প্রতিদিন তাকাতে দেখে তার মনের বাক্সে রহস্যের পরশ পাথর ঢোকাল। ভাবলো এই রহস্যের সত্যতা তাকে খুঁজে বার করতেই হবে। এ বিষয়ে সুকান্ত

তাকে কিছুই বলবে না। বলবার হলে অন্ততঃ তার চোখকে ফাঁকি দিয়ে এমন ভাবে ওকে দেখতো না। সুতরাং এ রহস্যের কিনারা করতে হলে অপর পক্ষের সাহায্যের প্রয়োজন।

মেট্রনের মানা আছে বাইশ নম্বরের সাথে কেউ যেন প্রয়োজনের বাইরে কোন কথা না বলে, আর কোন পেসেন্টের পুরুষ ভিজিটার যেন ভুলেও তার বেড়ের কাছে না যায়। পুরুষ দেখলেই বাইশ নম্বরের মুখের চোহারাটা কেমন পাল্টে যায়। মনের বিকৃত রূপটা যেন বেশী করে তখন চাড়া দিয়ে ওঠে। ছোট টেবিলের ওপরে রাখা কুজো আর কাঁচের গ্লাসটা টুকরো টুকরো হয়ে যায় মাটিতে আছাড় খেয়ে। সেই অবস্থায় তাকে সামলানো দায় হয়ে পড়ে। ডাক্তাররা জোর করে ঘুমের ইনজেকসন দিয়ে তাকে নিঝুম করে তবে ওয়ার্ডকে শান্ত করে। এই কারণেই ওয়ার্ডের কোন রোগিণী বাইশ নম্বরের সাথে কথা বলে না। শুধু কথা কেন, এই পুরো ওয়ার্ডের কোন রুগীই তার নাম জানে না। অবশ্য হাসপাতালে রুগীদের নাম জানার দরকার হয় না। বেড নম্বরটাই ডাক নাম হিসাবে তাদের কাছে পরিচিত হয়ে ওঠে, যতদিন তারা হাসপাতালের শয্যায় শুয়ে থাকে; তারপর রোগ সারিয়ে যখন তারা ফিরে বাড়ী তখন নিজেদের হাসপাতালের ডাক নামটা দান করে যায় আগামী অতিথিকে।

আজ কদিন ধরে সুলতা লক্ষ্য করে দেখেছে বাইশ নম্বর খুব ভোরে উঠে স্নান সেরে নেয়। সে যখন বাথরুমে ঢোকে তখন সারা ওয়ার্ড ঘুমে আচ্ছন্ন থাকে। সুতরাং বাইশ নম্বরের সাথে কথা বলার উপযুক্ত সময় ভোরে। ভোরের হাওয়ায় সারা ওয়ার্ডের রুগীনিরা ঘুমের কোলে লুটিয়ে থাকে কঠিন যক্ষ্মা রোগের কাশিকে বশ মানিয়ে।

আবছা অন্ধকারের মধ্যে চোখের পাতা সামান্য খুলে সুলতা দেখলো বাইশ নম্বরের রুগী বিছানা ছেড়ে উঠে গিয়ে ঢুকলো বাথরুমে। মিনিট কয়েক পরে সুলতা গুটি পায়ে উঠে গিয়ে দাঁড়াল বাথরুমের সামনে। দরজায় আলতো করে গোটা দুয়েক টোকা দিয়ে বলল: বাথরুমে কে?

প্রথম ডাকে সাড়া মিলল: আমি?

'আমি কে'? সহজ গলায় আবার প্রশ্ন করলো সুলতা। প্রশ্নের উত্তর কয়েক মিনিট নিরুত্তর রইল, পরে শান্ত গলায় উত্তর এলো, 'আমি, মানে—মানে মিস জয়ন্তী বসু'? বাইশ নম্বরের নামটা জানতে পেরে আনন্দে কিলবিলিয়ে উঠল সুলতার জিজ্ঞাসু মনটা।

'ও ঠিক আছে,' বলে সুলতা অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করল। ভাবলো বাথরুম থেকে জয়ন্তী বের হলেই তার সঙ্গে অন্য কথায় আলাপ জমাবে। কিন্তু দেখা গেল কার্য্যক্ষেত্রে তা হ'ল না। অনেকক্ষণ বাদে জয়ন্তী বাথরুম থেকে স্নান সেরে বেরোল বটে, কিন্তু সুলতার আলাপী হাসিকে সম্পূর্ণভাবে অপরিচিতার ভ্রূকুটি হেনে পুরোপু'র উপেক্ষা করেই নিজের বেডে ফিরে গেল।

বেশ কয়েকদিন সকালে উঠে নানানভাবে চেষ্টা করেও যখন জয়ন্তীর সঙ্গে সুলতা আলাপটা জমাতে পারলো না, তখন তার জিজ্ঞাসু মনের সলতেটা ধীরে ধীরে নিবতে বসলো।

অনেকদিন হল সুলতা এই হাসপাতালে ভর্ত্তি হয়েছে। কিন্তু এই অনেক দিনের মধ্যে এক দিনও জয়ন্তীর কোন ভিজিটারকে আসতে দেখে'নি। আজ হঠাৎ তার বেডের কাছে গোটা চারেক ভিজিটারকে ঘিরে থাকতে দেখে সুলতা অবাক হ'ল? পাশের বেডের রমা'দির কাছে খোঁজ নিয়ে জানলো কাল রাতে বাইশ নম্বরের মুখ দিয়ে প্রচুর ব্লাড পড়েছে। কথাটা জানিয়ে ওর বাড়ীতে খবর পাঠানো হয়েছিল; তাই বাড়ী থেকে আজ ওকে দেখতে এসেছে।

দেখতে আসা ভিজিটারদের মধ্যে একটি বছর বাইশের মেয়ে চোখ ঘুরিয়ে এদিকে—ওদিকের পেসেন্ট দেখছিল। তার দেখার ভাব দেখে মনে হ'ল হাসপাতাল বোধ হয় সে এই প্রথম দেখছে। চোখ ঘোরাতে ঘোরাতে সুলতার চোখের ওপরে তার চোখ পড়তেই সুলতা চোখ কুঁচকে হাসলো, হাসির মধ্য দিয়ে মেয়েটিকে আমন্ত্রণ জানালো তার কাছে আসতে।

প্রথম দিন শুধুমাত্র হাসির আমন্ত্রণ হাসি দিয়ে ফিরিয়ে দিলেও পরের দিন মেয়েটি সুলতার বেডের কাছে এসে হাসিমুখে প্রশ্ন করলো; 'আপনি কেমন আছেন': 'আমি ভাল আছি। আপনার

উনি কেমন আছেন,' বাইশ নম্বরের দিকে ইশারা করে জানতে চাইলো সুলতা।

'উনি আমার দিদি। একই রকম আছেন,' বিষণ্ণতায় মুখ কালো করলো মেয়েটি।

ও তাই বুঝি, বোন পরিচয় পেয়ে মনেমনে খুশী হল সুলতা। ভাবলো এই ছোট বোনের সঙ্গে আলাপ জমিয়েই জেনে নেবে বড় বোনের জীবন রহস্যটি। যে রহস্যর সঙ্গে কোন না কোন ভাবে জড়িয়ে আছে সুকান্ত।

প্রথম দু'চারদিন অবশ্য সুলতা তেমন কিছু প্রশ্ন করেনি। মামুলি আলাপ দিয়েই বন্ধুত্বটা মজবুত করে নেয় শুধু। তারপর একদিন সুযোগ বুঝে প্রশ্নটা করে বসে, 'আচ্ছা ভাই তোমার দিদির একসঙ্গে দুটো রোগ হ'ল কেমন করে' ?

'একসঙ্গে দুটো রোগ হয়নি। একটা রোগ সারাতে গিয়েই আর একটা রোগ হয়ে বসেছে। প্রথমদিকে সামান্য মাথা খারাপের লক্ষণ দেখে বাবা ইলেকট্রিক ট্রিটমেণ্টের ব্যবস্থা করেছিলেন। ইলেট্রিক চার্জটা ভুল ভাবে দেওয়াতে ব্রেনের ধাক্কা গিয়ে লাগে একেবারে বুকে। প্রচণ্ড ভাবে লাংসে আঘাত লাগাতেই বুকে জল জমতে শুরু করে। তারপরই ধীরে ধীরে দেখা দেয় এই রোগ। ওদিকে মাথা খারাপের লক্ষণটাও বেশ চাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। প্রথমদিকে অবশ্য ওকে বাড়ীতে রেখেই চিকিৎসা হচ্ছিল কিন্তু ইদানিং ও এতো বারাবারি শুরু করেছিল সে বাড়ীতে রাখা দায় হয়ে উঠেছিল। অপরিচিত কোন পুরুষকে দেখলেই ও আক্রমণ করে বসতো। শেষে নিরুপায় হয়েই ওকে এই হাসপাতালে রেখে যেতে হয়েছে। হয়তো ওর বাকী জীবনটা এখানেই শুয়ে কাটাতে হবে,' হবেরুমাল দিয়ে মেয়েটা চোখ মুছতেই সুলতা বুঝতে পারলো দিদির ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেই মেয়েটার চোখে জল এসে গেছে। অন্যকথা দিয়ে তাকে শান্ত করে সবে সুলতা সেই কথাটা পারতে যাবে যে কেন মেয়েটির মাথা খারাপ হ'ল, ঠিক সেইমুহূর্তেই তার বেডের সামনে এসে হাজির হোল সুকান্ত। সুকান্তকে দেখেই মেয়েটা তাড়াতাড়ি টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে 'আজ চলি' বলে চলতে লাগল বাইশ নম্বর বেডের দিকে।

'উনি কে,' সন্দিগ্ধ গলায় প্রশ্ন করলো সুকান্ত।

'বাইশ নম্বর বেডের ভিজিটার' সহজ গলায় উত্তর দিল সুলতা।

'তোমার এখানে কেন,' স্বরে কৈফিয়ত তলব করলো সুকান্ত।

'বারে, আসতে নেই বুঝি,' অভিমানের আবদারে ঝরে পড়লো সুলতা।

'না মানে…,' মানেটা আর লজিক দিয়ে বোঝাতে পারলোনা সুকান্ত। তবে এর একটা মানে সুলতা করে ফেলেছে। স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছে বাইশ নম্বর পেসেণ্টের সঙ্গে সুকান্তর একটা যোগ আছে। আর এই যোগ ফলকে বিয়োগ করে কাল সে বুঝে নেবে জয়ন্তী বসুর ছোট বোনের কাছ থেকে।

'সেই লোকটাকে আমরা কখনও দেখিনি, তবে লোকমুখে শুনেছিলাম ও নাকি দিদির সাথে এম, এ, ক্লাসে পড়তো। এই পড়ার মাধ্যমেই দিদির সাথে ওর পরিচয়। পরিচয়টা পরে বন্ধুত্বের বুড়ি ছুঁয়ে প্রেমে রূপান্তরিত হয়। দিদিকে ও বিয়ে করবে বলে কথা দিয়েছিল। আর সেই মিথ্যা কথাতেই ভুলে দিদি তার জীবনের চরম ভুলটা করে বসেছিল। অনেকদিন অবধি আমরা এ সব কথা ঘুণাক্ষরে জানতে পারিনি। হয়তো কোনদিনও জানতে পারতামনা যদি সেদিন দিদি অমন ভাবে বাথরুমে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান না হয়ে যেতো। ডাক্তার সেন সেদিন দিদিকে দেখতে এসে নাড়ী দেখেই বলেছিলেন, ও কিছু নয়, প্রথম ইস্যু কিনা তাই সামান্য মাথা ঘুরে পড়েছেন'। সেদিন কথাটা শুনে আমাদের সারা বাড়ীর লোকেদের মাথা ঘুরে গিয়েছিল। বাবা সারারাত গুম হয়ে বসেছিলেন তার লাইব্রেরী ঘরে। আমি বিছানায় পড়ে সারারাত কাঁদতে কাঁদতে শুনেছিলাম পাশের ঘরে মায়ের অনুরোধ, উপরোধ, 'জয়' যা হয়েছে সেতো হয়েছেই, এখন বল কে তোর এই সর্বনাশ করলো' ?

দিদি একটা কথাও সেদিন বলেনি। আজ অবধি সেই নামটি করেনি, কে নামধারী শয়তানটা তার এতোবড় সর্বনাশ করেছে। তবে এর কদিন পর থেকেই দেখলাম দিদি কেমনউল্টো-পাল্টা বকছে কথার মধ্যে কেমন বিকৃত অংশ জেগে রয়েছে,' ওরা বামুন রায় বাহাদুরের ছেলে, কায়স্থর মেয়েকে

বিয়ে করবে কেন ? প্রেম করতে পারে ওরাই, প্রেমের ফলে যদি সন্তান আসে পেটে তাকে নষ্ট করার জন্য টাকা দিতে পারে, কিন্তু বিয়ে, সন্তানের বাপের পরিচয় দেওয়া—হাঃ হাঃ হাঃ' এরপরই কান্নায় ভেঙ্গে পড়তো দিদি।'

নিজের মনের প্রচণ্ড কান্নাটাকে অনেক কষ্টে চাপা দিয়ে খানিকটা ধরা গলায় সুলতা জানতে চাইলো, 'আচ্ছা ঐ লোকটা কে তোমারা জানতে পারোনি ?' 'দিদিতো কোনদিন নাম বলেনি। তবে আমরা খানিকটা আন্দাজ করতে পেরেছিলাম। 'এ্যবর্সন' করার জন্য যখন দিদিকে নার্সিং হোমে ভর্ত্তিকরা হয়েছিল, তখন আমি দিদির আলমারী ঘেঁটে একটা সঞ্চয়িতা পেয়েছিলাম সঞ্চয়িতার প্রথম পাতায় লেখা ছিল, 'আমার জয়ন্তীর জন্ম-দিনে, সুকান্ত মুখার্জী, বালীগঞ্জ।'

শেষের কথাগুলো আর সুলতার কানে যায়নি। স্বামীর নামটা কাঠগড়ায় আসামীর গড়ায় উঠে যাওয়ার পরেই কে যেন গরম শিসে দিয়ে তার কান দুটো কালা করে দিয়েছে। ভোঁতা করে নিয়েছে তার ভাগ্যকে। ভাগ্যকে আগে যানতো-না সুলতা। প্রথম জানলো যখন বিয়ের কয়েকদিন বাদেই তার মুখদিয়ে রক্ত বার হোল। সেই পুরানো ভাগ্যকে আজ আবার নতুন করে সে মানলো যখন বুঝলো তার স্বামীর ভালোবাসায় সোঁয়া পোকা লেগে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে। প্রচণ্ড কান্নায় ফুলে ফুলে সুলতা ভাবলো তার দেহের এরোগ হয়তো একদিন সেরে যাবে, কিন্তু তার স্বামীর ভালোবাসার মধ্যে যে গরল আগে থেকে মিশে গেছে তাকে কোন্ পবিত্রতার ছাকনি দিয়ে সে ছেঁকে তুলবে। কে ভালো করে আনতে তার স্বামীর সখের খেলায় হেরে যাওয়া সঙ্গিনী জয়ন্তী বসুকে। জগতে একজনই পারে তাকে আবার সহজ সরল মানুষ করে আমাদের সমাজে ফিরিয়ে আনতে। এই ফিরিয়ে আনার পেছনে প্রয়োজন ঐ একজনের প্রচণ্ড ভালোবাসা আর আপনকরে ফিরে নেওয়ার সাহসটুকু। সুলতা বেশ ভালো ভাবেই জানে ঐ একজনের নাম সুকান্ত মুখার্জী। তবে এ সংসারে তার কি প্রয়োজন ? মাঝরাতে বিছানা ছেড়ে উঠলো সুলতা। প্যাডের কাগজে কি যেন খসখস করে লিখে সেটা খামের মধ্যে পুরে মুখ বন্ধ করে রেখে দিল বালিশের নীচে। বিছানা থেকে নেমে ছোট আলমারী থেকে দুটো বড়ি বার করলো। প্রতিবেতের আলমারী ঘেঁটে চুরি করে আনলো এমনতরো আরও দশটা বড়ি। এরপর উঠে এলো বিছানায়।

ফোনে খবরটা শুনে বিশ্বাস করেনি সুকান্ত। 'এ্যবসার্ট' বলে ফোনটা রেখে দিয়েই ছুটে এসেছে হাসপাতালে। কিন্তু না 'এ্যবসার্ট' নয়, সত্যি সত্যিই আত্মহত্যা করেছে সুলতা। মৃত্যুর পূর্বে বালিশের তলায় রেখে গেছে স্বামীকে লেখা প্রথম চিঠি। নার্সের হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে চোখের সামনে মেলে ধরলো সুকান্ত। গোটা গোটা হরফে লেখা, আমি চললাম। যাবার আগে একটা ভিক্ষা চাইছি। বাইশ নম্বরকে স্ত্রীর মর্য্যাদা দিয়ে আবার সুস্থ করে সংসার কোর ?

আর্য্য সঙ্গীতে শ্রুতি ও স্বর

শ্রীতুলসীচরণ ঘোষ

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

ষড়জ স্বর সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। এখানে ঋষভ স্বর সম্বন্ধে কিছু আলোচনার প্রবৃত্ত হইতেছি।

ঋষভ

"প্রপ্নোতি হৃদয়ং শীঘ্রমন্যস্মাদৃতঃ স্মৃতঃ।
স্ত্রীগবীষু যথা তিষ্ঠন্বিভাতি ঋষভো মহান্।
স্বরগ্রামে সমুৎপন্নঃ স্বরয়োঋষভস্তথা।
এক বক্ত্রঃ চতুর্হস্তঃ পাণিভ্যাং কমলে দধৎ॥
বীণাং বিভ্রৎকরাভ্যাং চ ঋষভো নীলবর্ণভৃৎ।
অগ্নিস্তুদৈবতংগাতা তু পদ্মভূঃ॥
রস হাস্যোঽস্ত যানং গৌরীতি শৃঙ্গারহারকে।
নাভে সমুদিতো বায়ুস্তালু জিহ্বাগ্র সংহতঃ॥
ঋষভস্তুদতে যৎ তস্মাদৃষভ উচ্যতে॥"

শীঘ্র অন্য স্বরের সহিত হৃদয়ে উপস্থিতি হেতু ইহাকে ঋষভ বলা হয়। স্ত্রী গবীর পার্শ্বে বৃষ যেরূপ শোভাপায় সেইরূপ ইহারও স্থিতি। স্বরগ্রামে উৎপন্ন হেতু ইহাকে ঋষভ আখ্যা দেওয়া হয়। ইহা একমুখ বিশিষ্ট চতুর্হস্ত যুক্ত। ইহার দুই হস্ত কমল শোভিত এবং দুই হস্তে বীণা ধৃত। ইহার বর্ণ নীল। ইহার গায়ক ব্রহ্মা এবং অগ্নিদৈবত। ইহার রস হাস্য এবং শৃঙ্গার রসেও গেয়। ইহার বাহন বৃষ। নাভি হইতে বায়ু উদিত হইয়া তালু ও জিহ্বাগ্রে সংহত হইয়া উচ্চারিত হয়। বৃষের ন্যায় শব্দ বলিয়া ঋষভ নামে অভিহিত করা হয়।

এই ঋষভস্বর রতিকা নাম্নী সপ্তম শ্রুতি অবলম্বন করিয়া অবস্থিত। সপ্তম নক্ষত্র হইল অদিতি যাহা হইতে আদিত্য উৎপন্ন। আদিত্যই অগ্নিস্বরূপ। রবির দেবতা শিব ও অগ্নি। বেদে রুদ্রই অগ্নি। অতএব ঋষভ হইল অগ্নিদৈবত।

গান্ধার

"বাচং গানাত্মিকাং ধত্ত ইতি গান্ধার সংজ্ঞকঃ।
গন্ধর্ব্ব সুখহেতুত্বাদ্গান্ধারো ব্যভিধীয়তে।
গান্ধার স্তেক বদনো গৌরবর্ণঃ চতুষ্করঃ।
বীণাফলাব্জঘণ্টাভৃৎকরঃ স্যান্মেষবাহনঃ।
শঙ্করোদৈবতং সুজর্ব্বিজং কুলম্।
বিষ্ণুর্গাতা রসোবীরো জ্ঞেয়োঽথ মধ্যমঃ।"

বাক্য গীতরূপ ধারণ হেতু গান্ধার সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়াছে। গন্ধর্ব্বদিগের সুখকারক হেতু গান্ধার নামে অভিহিত করা হয়। গান্ধার স্বরের একবদন, গৌরবর্ণ ও চারিহস্ত। হস্ত সমূহ বীণা, ফল, পদ্ম ও ঘণ্টা দ্বারা শোভিত। মেষ ইহার বাহন। দেবকুলোদ্ভব হইয়া শঙ্কর দৈবতে অবস্থিত। ইহার মুখ্য রস বীর এবং ইহার গায়ক বিষ্ণু। ইহা হইতে মধ্যমকে জানা যায়।

গান্ধার ক্রোধানাম্নী নবম শ্রুতি আশ্রয় করিয়া অবস্থিত। নবম নক্ষত্র হইল অশ্লেষা। উহা সন্ধি নির্দ্দেশ করা হেতু কেতুর জন্ম নক্ষত্র এবং মনরূপ চন্দ্রের গ্রহে অবস্থিত। চন্দ্রকেতু হইল শঙ্করের নাম। সুতরাং গান্ধার হইল শঙ্করদৈবত। এবং ক্রোধ হইল বীররসের পরিচায়ক।

মধ্যম

"স্বরাণাং মধ্যমত্বাচ্চ মধ্যম স্বর উচ্যতে।
যদ্বা মমধিয়ো যোগ ইতি মধ্যম শব্দতঃ।
যদ্বা সমুত্থিতাদ্বায়ো র্বক্ষচিত্তে সমথত্তাৎ।
মধ্যস্থান মবত্যস্মাত্মধ্যমং পরিকীর্ত্তিতঃ।
মধ্যমস্ত্বেক বক্ত্রঃ স্যাদ্দেহ বর্ণ চতুঃস্বরঃ।
সবীণা কলাসৌহস্তৌ সপদ্ম বরদৌ তথা।
ভারতী দৈবতং বংশঃ সুপর্ব্বজঃ।
গাতা চন্দ্রো রসঃ শান্তঃ ক্রৌঞ্চযানমস্তু।"

স্বরসমূহের মধ্যস্থানে অবস্থান হেতু এইস্বরকে মধ্যম বলা হয়। পীড়া যেমন স্বীয় বোধকে বিকাশ করে সেইরূপ শব্দও মধ্যম স্বরকে প্রকাশ করে। অথবা বায়ু যখন উত্থিত হইয়া বক্ষচিত্তে অবস্থিত হয় এবং মধ্যস্থানে

স্বরসমূহের মধ্যতা করা হেতু মধ্যম আখ্যা প্রদান করা হয়। মধ্যম একমুখ বিশিষ্ট, হেমবর্ণ ও চারি হস্তযুক্ত। হস্তসমূহ বীণা, কমল ও পদ্ম শোভিত এবং বর মুদ্রাযুক্ত। ইনি দেবকুলজাত এবং ভারতী দৈবতে অবস্থিত। ইহার গায়ক চন্দ্র এবং ইহার রস শান্ত। ক্রৌঞ্চ ইহার বাহন।

"আর্য্যসঙ্গীতে শ্রুতি" নামক প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে মধ্যমস্বরকে "অর্দ্ধ" স্বর বলা হয়। কারণ ইহা সপ্তকটীকে দুইটী সমান অর্দ্ধেক অংশে বিভাগ করে এবং ইহা মার্জ্জনী নামক ত্রয়োদশ শ্রুতিতে অবস্থান করিয়া স্বর সপ্তককে ধারণ করিয়া অবস্থিত।

ত্রয়োদশ নক্ষত্র হইল কন্যা রাশিস্থ ধারণক্ষম হস্তা নক্ষত্র যাহার দেবতা সবিতৃ। উহাই আর্য্যদিগের একাধারে গায়ত্রী, সাবিত্রী ও সরস্বতী। সুতরাং মধ্যম হইল ভারতী দৈবত।

পঞ্চম

"স্বরান্তগণং বিস্তারং যোমিমীতে স পঞ্চমঃ।
পাঠক্রমেণ গণনে সংখ্যায়াং পঞ্চমোঽথবা।
নাভিহৃৎকণ্ঠোমূর্দ্ধাস্তৌষ্ঠান্নাতরিশ্বনঃ।
পঞ্চস্থানসমুদ্ভূতঃ কথ্যতে পঞ্চমস্তদা।
পঞ্চমোপ্যেকবদনো ভিন্নবর্ণশ্চাষ্ট করঃ।
বীণাকরদ্বয়ে শঙ্খবাপিচ বরাভয়ৌ।
স্বয়ম্ভূদৈবতং পিতৃ বংশজঃ।
কোকিলবাহনং গাতা নারদঃ প্রথমো রসঃ।

স্বরসমূহের যে বিস্তার করে তাহাকে পঞ্চম বলে। অথবা সংখ্যাপাঠে পঞ্চম স্থানে অবস্থিত বলিয়া পঞ্চম নামে অভিহিত হয়। পঞ্চাঙ্গ যথা নাভি, হৃদয়, কণ্ঠ, মূর্দ্ধি ও ওষ্ঠ চালনা হেতু ইহা উচ্চারিত হয় বলিয়া ইহাকে পঞ্চম বলা হয়। ইহার এক বদন এবং বর্ণ ভিন্ন অর্থাৎ শ্যাম ও ছয় হস্ত বিশিষ্ট। দুই হস্তে বীণা ও দুই হস্তে শঙ্খ শোভিত এবং দুই হস্ত বর ও অভয় মুদ্রা যুক্ত। ইহা পিতৃগণ হইতে উদ্ভূত ও স্বয়ম্ভুদৈবতে অবস্থিত। কোকিল ইহার বাহন নারদ ইহার গায়ক এবং রস আদি অর্থাৎ প্রথম।

ইহা আলাপিনী নামক সপ্তদশ শ্রুতি আশ্রয় করিয়া অবস্থিত। বৃশ্চিক রাশির সপ্তদশ নক্ষত্র হইল অনুরাধা যাহার দেবতা মিত্র—যাহা স্নেহকে ক্ষেপণ করে। ইহা রবির জন্ম নক্ষত্র এবং কিরণ ক্ষেপণ হেতু সূর্য্যের একটা নাম মিত্র। ইহা সকলেরই জানা আছে যে রবি এইখানে আসিলে মিত্র পূজা (ইতু) আরম্ভ হয়। যে স্বরে আত্মার বিশেষ ক্ষেপণ হইয়া উদ্ভূত হয় তাহাই স্বয়ম্ভুদৈবত অর্থাৎ স্বয়ং উদ্ভূত। সেই জন্য পঞ্চম হইল স্বয়ম্ভূদৈবত এবং আদিরসে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

—ধৈবত—

ধীর্য্যাস্তান্তি স ধীমানস্ততঃ সম্বন্ধী ধৈবত স্মৃতঃ।
পৃষ্ঠ স্থানে ধৃতো যস্মাৎ ততো বা ধৈবত স্মৃতঃ॥
ধৈবতো গৌরবর্ণস্যাদেক বক্ত্র শ্চতুর্ভুজঃ।
বীণাস্বকমল খট্টাঙ্গ ফলশোভিতস্তকরঃ॥
শম্ভুস্ত দৈবতং স্যাদৃষিজং কুলং।
রসো ভয়ানকশ্চ ঘোষানং গাতা তু তম্বরুঃ॥"

ধী অর্থে বোধ ও চিত্ত অর্থাৎ বোধ ও চিত্ত জন্য ও জনকের মত সম্বন্ধে আবদ্ধ বলিয়া ধৈবত বলা হয়। এবং যেহেতু পৃষ্ঠস্থানে ধৃত সেই হেতু ধৈবত বলা হয়। ইহার বর্ণ গৌর। ইহা এক মুখ বিশিষ্ট ও চারি হস্ত যুক্ত। বীণা, কমল,মুদ্গর ও ফল সমূহের দ্বারা হস্ত সকল শোভিত। ইনি ঋষি কুলোদ্ভব ও শম্ভুদৈবতে অবস্থিত। ইহার রস ভয়ানক এবং ইহার গায়ক তম্বরু। ইহার বাহন হয় অর্থাৎ অশ্ব। বিংশ নক্ষত্র হইল নিঋতি।

রম্যা নামক বিংশ শ্রুতি অবলম্বন করিয়া ধৈবত অবস্থিত। ধনু রাশিস্থ বিংশ নক্ষত্রের দেবতা আপ্ যাহা আপ্যায়িত করে। ইহাই মঙ্গলের জন্ম নক্ষত্র। শম্ অর্থে মঙ্গল এবং ভু অর্থে হওয়া। সেই কারণ ধৈবত স্বর শম্ভূদৈবত। যাহা জ্ঞান দেবতা রূপে ধীশক্তির সম্বন্ধ করে তাহাই শম্ভুদৈবত।

নিষাদ

নিষীদন্তি স্বরাঃ সর্ব্বে নিষাদস্তেন কথ্যতে।
নিষাদোগজ বক্ত্রঃ স্যাৎ চিত্র বর্ণশ্চতু র্ভুজঃ॥
ত্রিশূল পদ্ম পরশু বীজ পূরকস্তকরঃ।
গণেশো দৈবতঃ বংশঃ সুপর্ব্বজঃ॥
গাতা তু তম্বুরুঃ শান্তঃরসঃ স্যাদ্বাহনং গজঃ।
নিষীদন্তি স্বরাঃ সর্ব্বে নিষাদস্তেন কথ্যতে॥

নিষাদ অর্থে ব্যাধ। ব্যাধ কথাটী ব্যধ্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। ব্যধ অর্থে হনন বা অন্তকরা। যে প্রাণীগণের

রবের অস্ত করিয়া দিনান্তে অবস্থিত হয় সেই নিষাদ। স্বর সপ্তকের এই অন্তস্বরটী স্বর সমূহের অন্তিমে অবস্থান করিয়া স্বর সমূহকে অন্ত করা হেতু ইহাকে নিষাদ আখ্যা দেওয়া হয়। নিষাদের মুখ গজের ন্যায় এবং ইহার বর্ণ চিত্রিত ও ইনি চতুর্ভুজ। হস্ত সমূহে ত্রিশূল, পদ্ম, পরশু ও বীজ শোভিত। ইনি দেব বংশ সম্ভূত ও গণেশ দৈবতে অবস্থিত। তম্বরু ইহার গায়ক। ইনি শান্তরস জ্ঞাপক ও গজ ইহার বাহন।

নিষাদ দ্বাবিংশ শ্রুতি ক্ষোভিণীকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত। শ্রুতি সমূহ গণনায় দ্বাবিংশ সংখ্যা, যাহা গণন বা গণ বিভাগ করে তাহাই গণ দেবতা গণেশ। সুতরাং নিষাদ স্বর গণেশ দৈবত।

মকর রাশিস্থ দ্বাবিংশ নক্ষত্র হইল শ্রবণা। ইহার দেবতা বিষ্ণু যাহার ত্রিপাদ হেতু গতি বুঝায়। দ্বাবিংশ শ্রুতি হইল ক্ষোভিণী। ক্ষোভিত অর্থেচালিত, আন্দোলিত, ধর্ষিত ইত্যাদি। শক্তিতেই ভাবের আন্দোলন ও আলোড়ন হইয়া থাকে।

এই স্বর সমূহ বিশুদ্ধ। ইহারা কেহ বিকৃত নহে। ইহা হইতে যাহা বিকৃত তাহাই হইল বিকৃত স্বর। এই স্বর সমূহ কোন্ কোন্ শ্রুতিতে অবস্থিত হইবে তাহা যথা—

আদি শ্রুতৌ চতুর্থ্যাংতু স্বরঃ ষড়জোধিষ্ঠিত।
সপ্তম্যাং ঋষভস্তদ্বৎ গান্ধারস্য স্থিতিঃ পুনঃ॥
নবম্যাং তু এয়োদশ্যাং মধ্যমঃ পঞ্চমস্ততঃ।
সপ্তদশ্যাং ধৈবতস্তু বিংশামথ নিষাদকঃ॥
দ্বাবিংশ্যামিতি মন্দ্রস্থাং স্বরা সপ্ত প্রকীর্তিতাঃ॥
ঈদৃশ্যেব স্থিতি মধ্যে তারে চৈবেদৃশী স্থিতিঃ॥

—সঙ্গীত বিলাস—

অর্থাৎ আদি শ্রুতি হইতে চতুর্থ শ্রুতিতে ষড়জ, সপ্তম শ্রুতিতে ঋষভ, নবম শ্রুতিতে গান্ধার, ত্রয়োদশ শ্রুতিতে মধ্যম, সপ্তদশ শ্রুতিতে পঞ্চম, বিংশ শ্রুতিতে ধৈবত এবং দ্বাবিংশ শ্রুতিতে নিষাদ এইভাবে স্বর সমূহকে শ্রুতি-সকলে বসাইতে হইবে। এইরূপ ভাবে স্বর মন্দ্র, মধ্য ও তার স্বনে স্বর সপ্তক বসিবে।

এই যে স্বর স্থাপনা দেখান হইল ইহার সহিত আধুনিক স্বর স্থাপনার কোন সামঞ্জস্য নাই। আধুনিক স্বর স্থাপনার পাশ্চাত্য tempered scale এর ওজনে হওয়া হেতু প্রাচীনদের সহিত এত পার্থক্য এবং সেই কারণ বশতই সঙ্গীতের যাহা প্রকৃত উদ্দেশ্য তাহা হইতে বিচ্যুত। এই সমস্ত কারণ হেতু আর্য্য সঙ্গীতের এত অবনতি ও রসাভাব পরিলক্ষিত হয়।

আনন্দ

শুচিস্মিতা দাশগুপ্তা

ফুলের বনে জুটলো অলি
মধুর লোভে,
গাছে গাছে ফুটলো কলি
কেমন শোভে!
জ্যোৎস্নাধারা লুটিয়ে পড়ে
নদীর কূলে,
জলের মাঝে ঝিকিমিকি
উঠছে দুলে।
হাওয়ায় হাওয়ায় ফুলের সুবাস
আসছে ভেসে,
তারাগুলো দেখছে খালি
মুচকে হেসে।
ফুলের সাথে চাঁদের কত
চলছে খেলা,
মাঝে মাঝে মেঘ দেখে যে
ভাসিয়ে ভেলা।
পূব আকাশে চড়লো রবি
সোনার রথে
ঊষা দিল আলোর ছটা
বিছিয়ে পথে।

দরবারী সঙ্গীত

শ্রীজয়দেব রায়

ভারতীয় উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের সমজদার ছিলেন চিরকালই রাজা মহারাজা, আর আমীর ওমরাহরা। সুলতান-বাদশাহের দরবারে যে সঙ্গীত ধারার উদ্ভব আজ তারই প্রচলিত রূপ দরবারী সঙ্গীত।

প্রাচীন মার্গসঙ্গীত নামে হিন্দু সঙ্গীতের যে রূপের চলন ছিল তার রূপরেখা আজ আমাদের কাছে অপরিচিত বললেই হয়। রাগ রাগিণীর নামগুলি কিন্তু সেই হিন্দুযুগ থেকেই চলে আসছে, গাইবার ভঙ্গী ও ভাবের রূপের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে বলে মনে হয়।

হিন্দুযুগের সঙ্গীতের রূপরঙ্গের অনেক পরিবর্তনই শুধু ঘটে নি, রসরূপেরও রূপান্তর ঘটেছে—আর তো সেই যুগের সেই বিশুদ্ধ হিন্দুসঙ্গীতকে কোথাও পাওয়া যাবে না। কিন্তু আজ যে প্রচলিত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত তার অঙ্গে অঙ্গেই বিরাজ করছে সেই বিস্মৃত সময়ের অপরিচিত সুরধারা।

যে সব রাজা মহারাজা আর আমীর ওমরাহদের সযত্ন প্রয়াসে আজকের দরবারী সঙ্গীত ধারার উদ্ভব হয়েছে তাঁদের কয়েকজনের কথা এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে। এই সব উৎসাহী নরপতিদের অনেকেই নিজেরাও কৃতী গুণী সঙ্গীত শিল্পী ছিলেন।

তাঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুপ্রসিদ্ধ গোয়ালিয়রের কছদ রাজা রাজামান। ১৪৮৬ থেকে ১৫১৬ তাঁর জীবৎকাল। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বিচিত্র শিল্পীরূপে তাঁর খ্যাতি ছিল অপরিসীম। সংকীর্ণ শ্রেণীর রাগবৈচিত্র্যে তাঁর কৃতিত্ব আজও স্বীকৃত। গুর্জরী, মালগুর্জরী, বাহাল গুর্জরী এবং মঙ্গল গুর্জরী এই চারটি রাগিণী তাঁর সৃষ্ট বলে কথিত।

মালবের রাজা বাজবাহাদুর আর একজন কৃতী সুরগুণী। ১৬০০ সালে মালবের সিংহাসনে তিনি প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। গলা ছেড়ে চড়াগলায়গাইবার প্রথা তাঁরইপ্রবর্তন। তাঁরই নাম অনুসারে এই পদ্ধতির নাম হয়েছে বাজখাই গলায় গান।

জৌনপুরের সুলতান হোসেন সির্দীকে খেয়াল গানের স্রষ্টা ব'লে উইলার্ড সাহেব জানিয়ে গিয়েছেন। খেয়ালের সাধারণত দুটি তুক আস্থায়ী ও অন্তরা প্রচলিত। খেয়ালের দুটি তুকের অতিরিক্ত ধ্রুপদের মতো চার তুকে (আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী এবং আভোগ) দিয়ে বিশিষ্ট খেয়াল 'ওলাক' তাঁর সৃষ্ট।

মুসলমান সুলতান বাদশাহরা অনেকেই বেশ সঙ্গীতের সমজদার ছিলেন। তাঁরা গুণী সঙ্গীতজ্ঞদের দরবারে সসমাদরে আশ্রয় দিতেন। মুসলমান ধর্মের অনুশাসনে সঙ্গীতের চর্চা নিষিদ্ধ হলেও চিরকালই ওস্তাদরা সঙ্গীতের ধ্যানে নিরত ছিলেন। পারস্য দেশের রাগরাগিণী এদেশের রাগরাগিণীর সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে ভারতীয় সঙ্গীতের মধ্যে নবপ্রেরণা এনে দিয়েছিল।

ভারতীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এই নবপ্রেরণার নব প্রবাহ এনে দিয়েছিলেন আমীর খসরু। বস্তুত দরবারী সঙ্গীতের তিনিই স্রষ্টা। পারস্য দেশের অধিবাসী খসরু বলবানের রাজত্বকালে এদেশে এসে দিল্লীদরবারের সভা গায়করূপেই বাকীজীবন উৎসর্গ করে গিয়েছেন। মুসলমানী রাগ-রাগিণী তাঁর কল্যাণেই এদেশী রূপ পায়। এইভাবে পার্সী মোকামগুলি হিন্দুরাগরাগিণীর অঙ্গে সংযুক্ত হয়।

ভারতীয় ৩৬ রাগিণী ও ৬ রাগের সঙ্গে পার্সী ১২টি মোকাম ২৪টি শুস্থা ও ৪৮টি গোভাকে আমীর খসরুই তাঁর খেয়াল অঙ্গের গানে প্রথম সম্মিলিত করেছিলেন।

আচার্য ক্ষেত্র মোহন গোস্বামী তাঁর গ্রন্থে এ সম্পর্কে বড় চমৎকার মন্তব্য করেছেন—"পরন্তু মুসলমানদিগের রাজত্বকালে আমাদের সঙ্গীত অনেক পরিবর্তিত হইয়া যায়। তাহারা আমাদিগের সঙ্গীতই নিজমতের অনুগত করিয়া লয়। তাহাদিগের নিজের সঙ্গীত ছিল না, কারণ তাহা-

দিগের ধর্মশাস্ত্র কোরাণেই তৎপরিশীলনের বিশেষ নিষেধ আছে। সুতরাং ভারত-সঙ্গীতই তাহাদিগের সঙ্গীতের আদর্শ এরূপ নিষেধ থাকিলেও সঙ্গীতের মনোহারিতা ও মহোপকারিতা দর্শন করিয়া মুসলমান সম্রাটদিগের উৎসাহে আমাদিগের সঙ্গীতের অনুকরণ করিয়া তাহারা সঙ্গীতানুশীলন করিত।"

আর এই ভাবে মুসলমান দরবারে ভারতীয় সঙ্গীতের অবিরাম চর্চা শুরু হল। দরবারের গানে তানসেন চিরস্মরণীয়। তিনি আকবরের দরবারের সভাগায়ক। নানা বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে তিনি পুরানো রাগিণীগুলিকে নতুন করে পরিবেশন করেন।

তানসেন পূর্বে রেওয়ার মহারাজা রাজারামের সভাগায়ক ছিলেন। আকবর তাঁকে নিজের দরবারে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসেন। তানসেন এবং সুরদাস উভয়ই ছিলেন সমসাময়িক। তাঁরা প্রাচীন রাগিণীগুলিকে নবনব রূপদান করেন। মল্লার তাঁদের দুজনের হাতে দুটি নতুন রূপ পেয়েছিল মিঞাকি মল্লার, সুরদাসীমল্লার।

ধ্রুপদ গানের তাঁরা দুজনই নব স্রষ্টা। হিন্দু ধ্রুপদী সুরদাসের ধ্রুপদের নাম 'বিষ্ণুপদ'। ধ্রুপদের একটি প্রাচীন রূপ চিরকালই আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল। জয়দেবের প্রবন্ধ সঙ্গীত গুলিও ধ্রুপদ নামে পরিচিত হয়ে আছে। অনেকে অনুমান করেন গোয়ালিয়র অঞ্চলের সাধারণ নাগরীরা ধ্রুপদ ধরনের লোক সঙ্গীত গাইত। তানসেন, সুরদাস প্রভৃতি গুণিজনের উদ্যমে সেই গান সুমার্জিত হয়ে দরবারে স্থান পেয়েছে।

ধ্রুপদ গানের চারটি বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়-গবহার বাণী, খাণ্ডার বাণী, ডগর বাণী এবং নওহর বাণী। দরবারেই এগুলি সৃষ্ট। গবহর বাণী রীতির গানই মূলত ধ্রুপদ রীতি। গৌড়বাণী সম্ভবত গবহারবাণীরই অপভ্রংশ। এই বাণীর গতি মন্থর এবং মূল ভাব শান্ত রসের।

খাণ্ডার বাণী রীতির গান সেনী ঘরোয়ানারই নবাৎ খাঁর প্রবর্তন। অত্যন্ত প্রখর এবং দ্রুত এর গতি; কালোয়াতী ওস্তাদের রীতিমত বিক্রম বীর্য প্রকাশ পায় খাণ্ডার বাণী ধ্রুপদে।

সেনী পরিবারের মহম্মদ আলি খাঁ ও উজীর খাঁর আধুনিক প্রচলিত ধ্রুপদের প্রবর্তক ব'লে পরিচিত। ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ সুর স্রষ্টা রূপে পরিচিত হয়ে আছেন বৈজু বাওরা, গোপাল নায়ক, মীরা, হরিদাস স্বামী, বাবা রামদাস প্রভৃতি।

মহম্মদ সাহের রাজত্বের সময়ে সদারঙ্গ ও তাঁর পুত্র অদারঙ্গ দরবারী সঙ্গীতে নতুন রূপের প্রবর্তন করেন। সেনী ঘরোয়ানার সদারঙ্গের আসল নাম নিয়মাৎ খাঁ। আধুনিক প্রচলিত খেয়ালের স্রষ্টারূপে তাঁরা সুপ্রসিদ্ধ।

দরবারের আসলের পূর্বেও তো ভারতীয় হিন্দুসঙ্গীতের একটি রূপ ছিল, তার পরিচয় আজ আর আমাদের জানবার উপায় নেই। স্বামী প্রজ্ঞানন্দ এ বিষয়ে বলেছেন "সঙ্গীতের আকার কিরূপ ছিল তা-ও আমরা সঙ্গীত শাস্ত্র হইতে জানিতে পারি। যদিও মুসলমান যুগের পূর্বেও রচনা বা ভাষার পার্থক্য ছিল, তথাপি রাগরাগিণী ও আলাপাদি যে শুদ্ধ মূর্তিতে প্রচলিত ছিল, তাতে আর সন্দেহ কি?"

অরুণকুমার দত্ত

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

প্রিন্সেস ষ্ট্রীট এডিনবরার প্রধান রাস্তা। চারপাশের দোকানগুলোর ঝলমলে সোকেস, চটকদারি বিজ্ঞাপন, নিয়নের বৈচিত্র্যময় আলোর ঝরণা, বড় বড় অফিস, সব মিলিয়ে একটা গমগমে আভিজাত্যের নিশানা।

রাস্তাটার ইষ্ট এণ্ডে 'নর্থ ব্রিটিশ হোটেল' এডিন-বরার সব চেয়ে বড় হোটেল। হোটেল বিল্ডিংয়ের ওপরের টাওয়ার ক্লকটা অনেকদূর থেকে দেখা যায়। হোটেলের নীচে এডিনবরা ওয়েভারলি ষ্টেশন।

ওয়েষ্ট এণ্ডে আবার ক্যালেডোনিয়ান হোটেল আর ষ্টেশন।

রয়েল টেরাস কিন্তু ইষ্ট-এণ্ডের খুব কাছেই।

পাঁচটা বাজার পনেরো মিনিট আগে থেকেই শঙ্কর নর্থ ব্রিটিশ হোটেলের নীচে অপেক্ষা করছিল শার্লির জন্যে। হোটেলটার বিপরীত দিকের উল-ওয়ার্থের দোকান থেকে কাঁচের দরজা বার বার খুলছিল আর বন্ধ হচ্ছিল একগাদা ক্রেতার আনা গোনায়।

শঙ্কর দেখছিল লাল ভেলভেটের জামা পরে দশবার বছরের একটা ছেলে তার ঠাকুমার হাত ধরে যাচ্ছে। দুজন পূর্ণযৌবনা যুবক যুবতী আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ হয়ে বিপরীত দিক থেকে আসছিল। খট্ খট্ করে হাই-হিলের আওয়াজ তুলে পনেরো ষোল বছরের কিশোরীরা হাত ধরাধরি করে প্রিন্সেস ষ্ট্রীট ধরে চলেছে। কিন্তু শঙ্কর লক্ষ্য করল হাত ধরাধরি করে দুজন কি তিনজন ছেলে একসঙ্গে একদম যাচ্ছে না।

যদিও মাঝে মাঝে টেডি বয়েদের দেখা যাচ্ছে দঙ্গল বেঁধে চলেছে। কিন্তু ছাড়াছাড়া ভাবে।

—শঙ্কর তুমি কি অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছ?

চমকে ঘাড় ঘুরিয়ে শঙ্কর দেখে ওয়েভারলি ষ্টেশনের সিড়িতে দাঁড়িয়ে শার্লি জিজ্ঞেস করছে।

এই মিনিট পনেরো হলো দাঁড়িয়ে আছি। ঘড়িতে কাঁটায় কাঁটায় তখন পাঁচটা।

শঙ্কর, এস আমার সঙ্গে। তোমাকে এক জায়গায় নিয়ে যাব। যেটা তুমি রোজই দেখ অথচ যার কিছুই দেখনি।

সে আবার কোথায়?

রয়েল টেরাসের খুব কাছেই। কাল্টন হিলে। তুমি গেছ কখনও ওখানে?

না।

তাহলে এস।

তারা কিন্তু রয়েল টেরাস ধরে কাল্টন হিলে উঠলনা। রিজেন্ট ষ্ট্রীট ধরে কাল্টন হিলে ওঠার বিপরীত দিকের রাস্তা দিয়ে উঠতে লাগল।

আশ্চর্য্য সপ্রতিভ মেয়ে শার্লি। সে কিন্তু দু'মিনিটেই সহজ হয়ে গেছে। যেন কতদিনের চেনা। শঙ্করের ভীরু হাতটাকে নিজের মুঠোর মধ্যে ধরে চলতে আরম্ভ করল।

শঙ্করের সারা শরীরে, পদক্ষেপে কিন্তু একটা জড়তা আর ভীরুতা জড়িয়ে রইল। কে কখন তাকে এ ভাবে দেখে ফেলে সেই ভয়ের সঙ্কোচনে। যদিও তার সমস্ত দেহমন জুড়ে একটা অনাস্বাদিত পূর্ব্ব অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ল।

এমন সময় শঙ্কর দেখল বিপরীত দিক থেকে বিনয় ব্যানার্জ্জী আসছে। সে কিন্তু তাদের দেখল না। অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে উৎরাইয়ের ওপরের হলিরুড প্যালেস লক্ষ্য করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

কাল্টন হিলকে শঙ্কর ভেবেছিল জঙ্গলাকীর্ণ। কিন্তু দেখল আসলে তা একেবারেই নয়। পাহাড়ের ওপর সুন্দর সবুজ সমতল ভূমি। চার পাশে ফাঁকা ফাঁকা দাঁড়ানো পাইন পপলার আর সিলভার-বার্চ গাছের সারি।

পাহাড়ের ওপরের সমতল ভূমি কিন্তু একেবারে অন্ধকার নয়। তার কারণ দুপাশ দিয়ে পাহাড়ে ওঠবার সর্পিল রাস্তার মোড়ে মোড়ে উজ্জ্বল ইলেকট্রিকের লাইট রয়েছে। পাহাড়ের ওপর কিন্তু কিছু নেই। খালি আলো আঁধারের খেলা।

শঙ্কর লক্ষ্য করল পাহাড়ের ওপর খালি তারা নয় জোড়ায় জোড়ায় ইতস্ততঃ ছড়িয়ে শুয়ে বসে দাঁড়িয়ে রয়েছে অনেক যুবক যুবতীর দল, বিভিন্ন ভঙ্গিমায়।

শার্লি শঙ্করের হাত আকর্ষণ বলে এখানে বস শঙ্কর। তারা একটা পাথরের থাঁজের ওপর বসল। চার পাশে হু হু করা ঝোড়ো হাওয়া, কিন্তু আশ্চর্য্য, ঠাণ্ডা লাগছে না। আরও আশ্চর্য্য এত নর নারী এখানে বসে আছে কিন্তু এমন ভাবে জায়গাটা তৈরী যে কেউ কাউকে দেখতে পারছে না।

কি ভাবছ শঙ্কর ?

ভাবছি ইংরাজেরা বড় রসিক জাত। বাইরে থেকে তাদের গোমড়া মুখ দেখে খুব সিরিয়াস আর স্নব মনে হয় কিন্তু তোমরাও যে জীবনটাকে ভোগ করতে জান সেটা এইরকম ব্যবস্থা দেখলে মনে হয়।

শঙ্কর, প্রথমেই বলি আমরা ইংরেজ নই স্কচ, যদিও তোমরা এই তফাৎটা ধরতে পার না। কিন্তু ইংরেজ বললে অনেক স্কচ মনে মনে বিরক্ত হয় যদিও আমি তাদের দলে নই।

আর দ্বিতীয় কথার উত্তরে আমি বলব ব্রিটিশ জাতকে যদি তুমি বল খালি কাজের মধ্যে ডুবে থাকে তাহলে খুব ভুল হবে। ব্রিটিশরা যখন কাজে থাকে তখন পুরোদস্তুর কাজ করে আর যখন ছুটি পায় তখন গভীর ভাবে ছুটি উপভোগ করে।

আসলে আমরা হচ্ছি সাদা চিউইং গামের মত। ওপর থেকে বর্ণহীন, সাদা, কিন্তু যত চিবোবে তত রস আমরা খুব আরাম প্রিয় জাত। যখন উপভোগ করি গভীর ভাবে উপভোগ করি। কিন্তু তুমি এসব কথা বলছ কেন শঙ্কর ?

—এই জায়গাটা দেখে। যিনি তৈরী করেছেন তিনি খুব রসিক লোক। চার পাশে এত ছেলেমেয়ে, কিন্তু আমাদের কেউ দেখতে পাচ্ছে না, আমরাও কাউকে দেখতে পাচ্ছি না ; নীচে, পাশে, পেছনে এত আলো কিন্তু এখানে আমাদের পীড়াদায়ক, অস্বস্তিকর আলোর আভাসও নেই।

ওহো…হো শঙ্কর, তোমাকে আমি যতটা নাইভ ভেবেছিলাম ততটা তুমি নও তাহলে।

—জান এ জায়গাটার নাম হচ্ছে Lovers, bough, এটা এজন্যেই তৈরী। বুড়োদের এখানে দেখতে পাবেনা।

তারপর একটু গম্ভীর হয়ে শার্লি বলে, আচ্ছা শঙ্কর পাশ করেই তুমি কি দেশে ফিরে যাবে ?

হ্যাঁ, আমরা বেশীর ভাগ ছাত্ররাই তাই।

শঙ্কর, তোমার আমাদের দেশটাকে খুব খারাপ লাগে ; তাই না ?

না ঠিক তা নয়, কিন্তু পদে পদে এই কালচার আর ম্যানার্সের বেড়া ডিঙ্গোতে ডিঙ্গোতে অস্থির হয়ে যাই মাঝে মাঝে। অথচ এই ইংলিশ কালচার শেখবার জন্যে সাত সমুদ্র পেরিয়ে আমি ইংল্যাণ্ডে স্কটল্যাণ্ডে আসিনি। আমি এখানে সায়েন্স শিখতে এসেছি।

—জান শঙ্কর, আমি তোমাকে প্রথম দিনই লক্ষ্য করে বুঝেছিলাম তুমি আমাদের দেশের ম্যানার্স জান না। সে জন্য আরও তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চেয়েছিলাম, যাতে তুমি ভবিষ্যতে ঠোক্কর না খাও।

কেন ? কেন ?

শঙ্কর, এক হপ্তা আগে নটিংহাম থেকে যে ইংলিশ দম্পতি আর্ডেন হোটেলে এসেছিলেন তাদের সঙ্গে তোমাকে ইনট্রোডিউস করে দিয়েছিলেন মিসেস কামরোভস্কি, তখন তুমি কি ভাবে তাদের সঙ্গে আলাপ সুরু করেছিলেন ;—তোমার মনে আছে ?

কেন,—হাউ ডু ইউ ডু বলে করমর্দ্দন করেছিলাম

সেটা উচিত হয় নি। তাদের সঙ্গে তোমাকে যখন ইনট্রোডিউস করে দেওয়া হচ্ছে তখন তারাই সে কথা বলবেন আগে। প্রত্যুত্তরে তুমিও বলবে। তারা না বললে নয়।

এতক্ষণে শঙ্কর বুঝতে পারে কেন সেদিন নটিংহাম থেকে আসা ইংরেজ দম্পতী মুখ কাল করে ডাইনিং হল ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। আর কেনই বা মিসেস কামরোভস্কি তারপর থেকে শঙ্করের সঙ্গে আর কথা বলেন না। ওই অজ্ঞানতার জন্যে কতজনে যে তার ওপর কখন চটেছে কে জানে?

শঙ্কর, আমি তোমাকে সাহায্য করব যতখানি পারি। বলে শার্লি শঙ্করকে আরও ঘন ভাবে জড়িয়ে ধরে। মনে রেখ তুমি ইংলিশ কালচারের গ্লাসটা না ছুঁয়ে, সায়েন্সের জল খেতে পারবে না।

কেন তুমি আমার জন্যে এত করবে?

কুমার মঙ্গলমের জন্যে। তুমি তার দেশের লোক।

কুমার মঙ্গলম্ কে?

...আট বছর আগে যখন আমি বার বছরের কিশোরী তখন গ্যালাসিলের পলিটেকনিকাল স্কুলে কুমার পড়তে আসে। পেয়িং গেষ্ট হয়ে আমাদের বাড়ীতে থাকত।

কুমার খুব হাসিখুশী, মিশুকে ছিল। সে আমাদের নিয়ে প্রায়ই বেড়াতে যেত। গ্যালাসিলের প্রান্তে একটা পুকুর ছিল। সেখানে আমরা স্কুলের ছেলেমেয়েরা মঝে মাঝে এসে মাছ ধরতাম।

একদিন এভাবে মাছ ধরছি। গরমের বিকেল বেলায়। এমন সময় পা পিছলে পুকুরে গভীর জলে পড়ে যাই।

কুমার পাড়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সে জলে লাফিয়ে পড়ে আমাকে তুলে বাঁচায়। সেই থেকেই আমি ইণ্ডিয়ানদের দেখলেই সাহায্য করি।

...কার্লটন হিল হেমন্তের হাওয়ায় কাঁপছে! মাথার উপর কাস্তে চাঁদের অস্পষ্ট আলো। নীচের শহরের কোলাহল, গীর্জার ঘণ্টা সমুদ্রের গর্জনের মত কানে এসে লাগছে। চারপাশে এক মন্দির পরিবেশ।

কঁকর...কঁকর কে যেন কাঁদছে।

শার্লি বুঝতে পেরে বলে নাইটিঙ্গেল পাখী ডাকছে। বাচ্ছা ছেলের কান্নার মত শোনায়।

শঙ্কর তুমি বড় ছেলেমানুষ। নাইভ...এখনও চুপ করে বসে আছ!

শঙ্কর বুঝতে পারে, শার্লির হাতটা তার কোমর বেষ্টন করেছে।

আরও ঘন হয়ে ওঠে তাদের আশ্লেষ। শার্লির পীনোন্নত বক্ষ পিষ্ট হয়ে যায় শঙ্করের দেহের পেষণে। অধরে অধর এসে হয় মিলিত। নাইটিংগেল পাখীটা ডেকেই চলে। আর নীচে শহরের কোলাহল দূর শ্রুত সমুদ্রের গর্জনের মত বার বার কার্লটন হিলের উপত্যকায় আছড়ে পড়তে থাকে।

রয়াল টেরাসে এসে যখন তারা পৌছাল তখনও সাপারের টাইম হয়নি।

দরজাটা ভেজিয়ে জামা-কাপড় ছেড়ে সোফার ওপরে এলিয়ে বসে শঙ্কর।

একগাদা চিন্তা মাথার মধ্যে জট পাকাতে থাকে। এয়ারোগ্রামটা খুলে পড়ে। সন্ধ্যের ডাকে দেশ থেকে এসেছে।

মা লিখছেন—"যত তাড়াতাড়ি পার পাশ করিয়াই দেশে ফিরিয়া আসিবে। তোমার ওপর ভরসা করিয়া আমি ইটাচুনায় আজও পড়িয়া আছি। তোমার বোন শ্রীমতির বিবাহের চেষ্টা করিতেছি। আমার বিশ্বাস তুমি বিপথে যাইবে না। খারাপ কিছু করিবে না। অসৎ সঙ্গে মিশিবে না। জনার্দ্দন তোমার সহায় হোন।"

টক্ টক্ টক্। দরজায় কে নক করছে। শঙ্কর উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেয়।

হাসিমুখে হেমদত্ত ঘরে ঢোকে। তারপর কি হল নাকি চ্যাপ। সব খুলে বল। গলার স্বরে তার একরাশ কৌতূহল ঝরে পড়ে।

বলছি জলটা খাই আগে।

সে রাতেও তাদের সাপার খাওয়া হল না। ডুবন্ধুতে বসে বসে জল্পনা শুরু হয়। সব শুনে হেম বলে শঙ্কর তুমি প্রথম টেষ্টেই সেঞ্চুরী করলে।

তারপর আগ্রহের সঙ্গে বলে শার্লিকে ধরে আমার জন্যে একজন গার্লফ্রেণ্ড জোগাড় করে দাও।

* * * *

ব্রিটিশ কাউনসিলে সে রাত্তিরে সোশ্যাল ড্যান্স। নজরুল ইসলামের প্রভাবে পড়ে শঙ্করও ব্রিটিশ কাউনসিলের মেম্বার হয়েছে।

শঙ্করের সঙ্গে এসেছে হেম দত্ত। নাচ সুরু হল। কুইক ষ্টেপ ড্যান্স।

বেশীর ভাগই ইণ্ডিয়ান আর আফ্রিকান্ ছাত্র। তারাই গার্লফ্রেণ্ড নিয়ে এসেছে নাচের আসরে। কাউনসিল খালি নাচের ফ্লোর ছেড়ে দিয়েছে তাদের জন্যে।

শঙ্কর দেখল তারই মত বেশীর ভাগ। নাচতে ভাল জানে না। নিছক ফানের জন্যে নাচতে, হলে এসেছে।

এমন সময় শার্লি আর একজন উনিশ কুড়ি বছর বয়সের যুবতীকে নিয়ে হলে ঢুকল। তারপর বলল গুড ইভনিং শঙ্কর এণ্ড হেম। মে আই ইনট্রোডিউস নর্মা রাইট উইথ ইউ প্লিজ। বলে তাদের দুজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল।

পরিচয় বিনিময়ের পালা শেষ হতে শার্লি শঙ্করকে বলল, এস আমরা নাচ সুরু করি। ওদের দুজনকে একটু অন্তরঙ্গ হবার সুযোগ দেওয়া যাক।

—কিন্তু আমি যে নাচতে জানি না শার্লি।

স্যাথ শঙ্কর, তোমরা ইনডিয়ানরা যে কেউ নাচতে জান না আমি ভাল করেই জানি। কিন্তু চেয়ে দেখ, নাচের ফ্লোর ভরে গেছে। হল ভর্ত্তি ডান্সিং ফ্লোরে কেউই নাচতে পারে না। সব ফান লুটতে এসেছে। কাজেই লজ্জার খোলস ছেড়ে উঠে এস।

ডায়াসের ওপর রেকর্ড প্লেয়ারে একগাদা রেকর্ড চাপান ছিল। একটার পর একটা বেজে যাবে। ঝাড়া তিন ঘণ্টা যে পার পার্টনার নিয়ে এরই ফাঁকে ফাঁকে নেচে যাও। তিন ঘণ্টা বাদে যখন ঘড়িতে বারোটা বাজবে তখন সব শেষ হয়ে যাবে।

একটা পপ সং হচ্ছিল। "জলি···মাই লাভ্··· লেট আস ওয়াক···থ্ দি মিডো···ও···ও"

তাতে কেউ টুইষ্ট করছে, কেউ কুইক নাচ নাচছে, কেউ বা স্লো ডান্স করছে। অত ভীড়ে কেউ কিন্তু নাচতে পারছে না।

শার্লি আর শঙ্কর একটা কোণ ধরে নাচতে লাগল। স্লো ওয়ালজ।

শঙ্কর নাচতে পারছিল না। শার্লি তার কোমর ডান হাতে জড়িয়ে ধরে ঝাঁকাতে লাগল আর নাচের ষ্টেপ আশে পাশে কেউই কিন্তু তাদের লক্ষ্য করছে না। সকলেরই সমান অবস্থা।

জান শার্লি, আমি সামনের সপ্তাহ থেকে ইষ্টার্ণ জেনারেল হসপিটালে ট্রেনিং নিতে যাব।

সে ত অনেক দূরে। পোর্টোবেলার কাছে। সমুদ্রের তীরে। পোর্টোবেলায় তুমি কখনও গেছ কি?

না। সে কোথায়?

এডিনবরার ইষ্ট এণ্ডে। পোর্টোবেলার এডিনবরার বন্দর। চমৎকার জায়গা। ইষ্টার্ণ-জেনারেল হসপিটালটা তারই কাছে। তোমার কিন্তু রয়াল টেরাস থেকে একটু দূর হবে। জায়গাটা শহরের কেন্দ্র থেকে বেশ কয়েক মাইল দূরে।

নাচটা শেষ হতেই কিছুক্ষণের বিরতি দেওয়া হল। যে যার নিজের নিজের চেয়ারে বসল গিয়ে।

আরে একি! হেম আর নর্মা কোথায় গেল? শঙ্কর বলে।

শার্লি মুখ টিপে হেসে বলে তোমরা না নাচবার জন্যে আজকের স্যোসালে এসেছিলে। যাকগে ভেবনা ওরা হারাবেনা। ঠিকই হাজির হবে।

বারোটা বাজতেই নাচের বাজনা বন্ধ হয়ে গেল। যে যার ওভারকোট পরে বাইরে বেরোতে লাগল। এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে নর্মা আর হেম এসে পৌঁছাল।

তারপর গায়ে নিজেদের ওভারকোটগুলো চড়াল।

কি ব্যাপার! এতক্ষণ কোথায় ছিলে? আমি ভেবে মরি। শঙ্কর জিজ্ঞেস করে।

আরে ভাবনার কি আছে। ভেতরকার গরমে মাথা ধরাতে আমরা একটু বাইরে ঠাণ্ডা হাওয়ায় গিয়েছিলাম।

নর্মা ব্লাশ কর না। আমি জানি তোমরা কোথায় গিয়েছিলেন। শার্লি হাসতে হাসতে বলে।

জানলার বাইরে আঙুল দেখিয়ে বলে, ঐ ঝাউ গাছটার নীচে তোমরা এতক্ষণ ছিলে। নর্মার চুলে ঝাউয়ের পাতা দেখেই আমি ধরেছি। আর হেমের জ্যাকেটের হাতায় লিপষ্টিকের ছাপ। রুমালেও নিশ্চয় পাওয়া যাবে।

কাজেই বুঝছ ব্যাপারটা। বলে রুমালে মুখ চাপা দিয়ে খুক খুক করে হাসতে থাকে শার্লি। আর নর্মা ব্লাশ করেই চলে। [ক্রমশঃ

হাতের কথা

স্বরাচার্য

এবারেও এক অদ্ভুত জীবনের হাতের আলোচনা করছি। ভদ্রলোকের দুটি হাতের রেখাগুলি দেখুন বিভিন্ন রকমের। কাজেই তাঁর জীবনের যে অনেক পট পরিবর্ত্তন হয়েছে এবং অনেক নূতন ভাবের সমাগম হয়েছে এ কথা সহজেই বোঝা যায়। বাঁ হাত থেকে আমরা পাই জন্মগত ব্যবস্থা জন্মগত প্রকৃতি, স্বভাব, সুযোগ ইত্যাদি। ডান হাত দেখায় মানুষ নিজের চেষ্টায় কী অবস্থায় দাঁড়ালো কারণ বাঁ হাতকে বলা হয় বংশগত হাত। ডান হাতকে ধরা হয় ক্রিয়াশীল, পরিবর্ত্তন সূচক হাত।

বাম
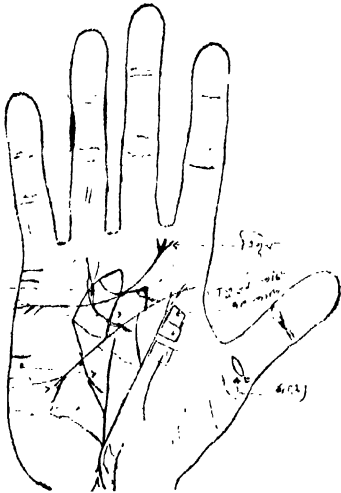
প্রথমেই দেখুন বাঁ হাতটি পুষ্ট চৌরস আঙুলগুলি সরল ও সোজা। চৌকো হাতের লক্ষণ সর্ব্ব বিষয়ে সমদৃষ্টি, সামাজিকতা, মানান্ সই বুদ্ধি বিবেচনা, রক্ষণশীলতা, পারিবারিক সুব্যবস্থা, বিনা প্রমাণে কোন জিনিসকে গ্রহণ না করা, কিন্তু এই হাতে মস্তিষ্ক রেখা অনেকটা ঝুঁকে পড়ায় বাস্তববাদিতা পূর্ণমাত্রায় থাকতে পারে না। বরং কাল্পনিক প্রভাব এসে পড়ে, এবং নূতনের আস্বাদন এবং নূতন দৃষ্টিভঙ্গী জাগিয়ে তোলে। কাজেই ভদ্রলোক বাহ্যতঃ বাস্তববাদী হলেও কল্পনার অনুসরণ করবেন। এবং এইসব বিষয়ের চর্চা করতে যা তাঁর বংশে কোনদিন ছিল না। বাড়ীর অবস্থা খুবই ভাল ছিল। (আঙুলের নীচে পর্ব্বতগুলি উঁচু)। প্রায় ২৭ বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত পিতৃদেবের পর্ব্বত আড়ালে ছিলেন এবং নিজের খেয়ালে চলবার বেশ সুযোগ পেয়েছিলেন।

তাস, দাবা, কেরম বিলক্ষণ খেলতেন। ঘরের বাহিরে ফুটবল, ক্রীকেট, ব্যাডমিণ্টন, সাইকেল নিয়ে লম্বা পাড়ি এই সব sports recreation-য়ে তাঁর সক্রিয় উৎসাহ দেখা যেত। বাঁ হাতের মস্তিষ্ক রেখার শেষে তিনটি শাখা থাকায় সর্ব্বতোমুখী চেষ্টা ও উৎসাহ ছিল, ছোটবেলা থেকেই নানা খেলাধূলায় উৎসাহ ছিল। কতকটা পারদর্শিতাও ছিল। অবশ্য উৎকর্ষ অধিকদূর অগ্রসর হয়নি। পড়া লেখাতেও ছাত্র খারাপ ছিলেন না। বিদ্যালয়ে প্রথম কয়েক জনের মধ্যেই থাকতেন। অবশ্য কলেজের লেখা পড়ায়—উচ্চাঙ্গের কিছু হয়নি, সাধারণ ভাবে বি, এ পাশ করেন।

graduate হয়ে তিনি ভাবলেন—যাক্ বাঁচা গেল! আর পরীক্ষায় বসতে হবে না। কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে আসল পড়াশোনা, ঠিক ছাত্রের মত, সুরু হোল তখন থেকে। ডান হাতের মস্তিষ্ক রেখা ২১ বৎসর বয়স হতেই তেজের সহিত নূতন ধারায় প্রবাহিত।

উভয় হাতে ভাগ্য রেখা ভগ্ন। কাজেই ভাগ্য ভঙ্গ হোল। মজাসে সাবেকি চাল যা চলছিল তাতে পূর্ণচ্ছেদ এসে পড়ল। বড় বাড়ী ছেড়ে ছোট বাড়ীতে বাস সুরু হোল। Jonit family ভেঙ্গে Small unit হোল। ডান হাতে ভঙ্গ পিতৃরেখা (Life lines ইংরেজি মতে) তার প্রমাণ দিচ্ছে। এই ভঙ্গ পিতৃরেখা পুনরায় পৈতৃক সম্পত্তির ক্ষয়, ক্ষতি, অপচয় ইত্যাদি জানাচ্ছে।

বাঁ হাতের হৃদয় রেখা বিশেষ প্রবল ও বলবান। কাজেই স্নেহমায়া ভালবাসা দিয়ে তাঁর জীবন গড়া। পিসি মাসী খুড়ী জেঠি অনেকেই খুব স্নেহ করতেন, এবং অন্যান্য আত্মীয়গণও স্নেহ দিয়ে আগলে রাখতেন। ডান্ হাতে ভঙ্গ হৃদয় রেখা স্নেহপুষ্ট জীবনের উপর প্রচণ্ড কোপ হানলে। স্বাস্থ্যহানি করলো এবং মানসিক বল ও সাহস খর্ব্ব করলো। ডান হাতের আকৃতি দেখুন, বাঁ হাতের মত চৌরস নয়। আঙুলের নীচে পর্ব্বতগুলি অপেক্ষাকৃত কমস্থান অধিকার করার জন্য ছোট দেখাচ্ছে। কিন্তু হাতের মধ্যখানে দুইটি মঙ্গলের ক্ষেত্র সমেত জায়গাটি ফেটে পড়েছে। কাজেই মঙ্গলের লড়াই ভদ্রলোকের জীবনে এসে গেল। মস্তিষ্ক রেখাও গভীর ও বলবান হওয়ায় নিজের চিন্তাধারার বলিষ্ঠ রূপ ও চেষ্টা দেখা যায়।

তাঁর বাঁ হাতের মস্তিষ্ক রেখায় বুদ্ধির দীপ্তি আঁচ পাওয়া যায়। কিন্তুদুর্বল আত্মবিশ্বাস তার সঙ্গে জড়িত। কাজেই শান্ত পরমুখাপেক্ষী ভাব নিয়ে কাটল বাল্যকাল। শনির স্থান উচ্চ থাকায় তিনি ছিলেন ধীর, স্থির গম্ভীর প্রকৃতির। আপন ভাবে তন্ময় হয়ে থাকতেন। সব কিছুরই গভীরতার দিকে ঝোঁক ছিল তাঁর বেশী। কি পড়া কি খেলা সবেতেই ছিল বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ। দায়িত্ববোধ ছিল যথেষ্ট, অথচ দায়িত্ব পালন করার উপযুক্ত ব্যবহারিক জ্ঞান বিশেষ ছিলনা। এই অবস্থায় শুধু পৈতৃক সুযোগ নষ্ট হলো না, স্বাস্থ্য ভঙ্গ হোল নানান গৃহ বিশৃঙ্খলায়। মনে ছিল উচ্চাশা, অনেকটা কাল্পনিক বলা যেতে পারে। যাইহোক্ দেহ হার স্বীকার করলেও মন চাইলো ঠেলে উঠতে নূতন পথ ধরে। এই সময় তাঁর নজরে পড়ে যায় Cheiro'র অমরবানী—"To belive is to perceive either by the senses or the soul"
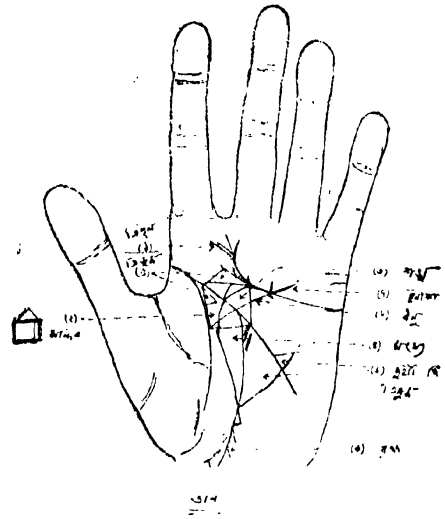
কথা কয়টি এক নূতন উন্মাদনা ও জাগরণ সৃষ্টি করলো তাঁর অন্তরাত্মায়। তিনি আরো পড়লেন

The greatest truth may lie in smallest things
The greatest good in what we most despise
The greatest light may break from darkest skies
The greatst chord from e'en the weakest strings

জীবনটা যে ব্যর্থ নয়, তার একটা বিশেষ মূল্য ও প্রয়োজন আছে, এই বোধ জেগে উঠলো এই কবিতাটি পড়ে। সত্যই Cheiro এনে দিলেন এক নূতন আলোকের সন্ধান। তাই ভাঙ্গা হাটে আলোর মালা দেখা গেল।

বা হাতে গুহ্য ক্রশ, মস্তিষ্ক রেখা ও হৃদয় রেখার মাঝে। কাজেই তিনি গুহ্য বিদ্যায় ব্রতী হলেন।

হস্তরেখা, জ্যোতিষ, সংখ্য-বিজ্ঞান (numero-

logy) হস্তলেখা বিচার (graphology), যোগ ব্যায়াম, ধর্ম্মসাধনা এই সব নিয়ে পড়লেন। বা হাতের মস্তিষ্করেখা উচ্চ চন্দ্র ক্ষেত্রের দিকে ধাবমান বুধের ক্ষেত্র উচ্চ এবং কনিষ্ঠাঙ্গুলী দীর্ঘাকার, শনির স্থানও উচ্চ। কাজেই বিরাট গুহ্য ক্রশ নানান বিষয়ের গুহ্যবিদ্যায় অনুরাগী করলো। ডানহাতেও গুহ্য ক্রশ থাকায় ভিতরের প্রেরণা কার্য্যে পরিণত হোল। বিশেষ করে হৃদয়রেখা ভঙ্গ হয়ে যে চন্দ্ররেখা উৎপন্ন করেছে এটি কেহ কেহ হস্তরেখা বিদ্ বলেন—"Singular aptitude of occult earning"

ডান হাতের তর্জ্জনী একাকী আলাদা ও আপন জোরে দণ্ডায়মান থাকায় ভদ্রলোকের মতবাদ নিজস্ব ও স্পষ্ট। তাঁর কাজও উপদেষ্টার। অনামিকার অগ্রভাগ চওড়া হয়ে যাওয়ায়, হাস্যরসিক ও ব্যঙ্গভাব বর্ত্তমান। কোন কিছুকে ভাল করে সাজিয়ে বলতে বা দেখাতে পারেন যাতে telling effect হয়। ডান হাতের আঙুলগুলি পাকিয়ে গোলাকার হয়ে গেছে, কাজেই নিজের অনেক ads এসে পড়েছে। সকলের সঙ্গে মিশেও তিনি যেন আলাদা। ডান হাতে ভাগ্যরেখা বৃক্ষাকারে শাখা প্রশাখা নিয়ে উঠেছে। কাজেই তাঁর কর্ম্মধারাও নানান্ দিকে ব্যাপৃত হয়ে যাচ্ছে। রবি রেখা ডান হাতে হৃদয়রেখা থেকে ভালই উঠেছে, বিশ্ব ছাপে তেমন ভাল দেখা যাচ্ছে না। পর্ব্বতের মধ্যে শুক্র, বুধ, শনি, চন্দ্র, মঙ্গল Negative) বলবান্। বৃহস্পতি উচ্চতায় মাঝারি রিসর ভাল, বাঁ হাতের রবিস্থান দাবা, কাজেই সাহায্যকারী পারিপার্শ্বিক পান নি।

এবার কতকগুলি চিহ্ন দেখুন।

বাঁ হাতে মধ্যমার নীচে ত্রিশূল হৃদয় রেখা ও মস্তিষ্ক রেখা এমন কি জীবনী রেখা ত্রিশূলাকারে প্রাপ্ত, মস্তিষ্ক রেখা ও হৃদয় রেখার মাঝে মধ্যমার নীচে শঙ্খ তার গায়েই হেলান বড় মন্দির চিহ্ন যার শীর্ষ ভাগ শনি রবি পর্ব্বতের মধ্যস্থানে। পুনরায় মস্তিষ্ক রেখার ঠিক নীচে মস্তিষ্ক রেখা ও জীবনীরেখা নিয়ে বড় মন্দির চিহ্ন রয়েছে। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠতে মৎস্যচিহ্ন দেখুন। ডান হাতে ত্রিশূল, ত্রিভুজ, মন্দির, মৎস্য চিহ্ন লক্ষ্য করুন, বিশেষ করে ধনু ও নৌকা চিহ্ন। এখন দেখুন হাতে বাস্তবিকই শুভাশুভ চিহ্ন থাকে, এগুলি নিছক গাঁজাখুরী কথা নয়। চিহ্ন যখন আছে তখন কি তারা বিনা মানে নিয়ে বসে আছে বলতে পারেন? মানে প্রত্যেকেরই আছে এবং থাকে বিশিষ্টভাবে।

ত্রিভুজ চিহ্ন বুদ্ধির কুশলতা প্রদান করে। এবং লোক চালনার ক্ষমতা দেয়। চতুষ্কোণ নিরাপত্তা ও অধিকার সূচক যা প্রতিষ্ঠার সহায়তা করে। মৎস্যরেখা সমৃদ্ধি ও অভাবহীনতা, শঙ্খ সুনাম, যোগ্যতা, পরামর্শ দাতৃত্ব, ধনু রেখা উচ্চাভিলাষ ও চেষ্টা, মন্দির চিহ্ন সদ্ভাব সৎকাজ। ক্রশ চিহ্ন বিপর্য্যয়, কিন্তু শুভভাবে থাকলে বিপর্য্যয়ের অভিজ্ঞতায় লাভ। তারকা কতকটা চমৎকার বা বিস্ফোরণ কারক বা চিহ্নের শুভাশুভ আকারের উপর অর্থাৎ চিহ্নের দীপ্ত কি বিকৃত অবস্থা প্রমাণ করে। বৃক্ষ সমৃদ্ধি প্রসার ও পরোপকার প্রভৃতির নির্দ্দেশক, ত্রিশূল সততা ও ধর্ম্মসাধনায় উন্নতি।

এই ভদ্রলোকের জীবনে যদি সংঘাত না আসতো, তাহলে ইনি সংসার যাত্রায় সুখে কাল কাটিয়ে সাধারণ আত্মকেন্দ্রিক জীবন যাপন করতেন বড় জোর। কিন্তু দারিদ্র্যের ও বিপদের সংঘাত ও নিষ্পেষণে তার ভিতরের রস নিঙড়ে বার করে এনে স্বকীয় উপলব্ধির ও জন কল্যাণকর কতকগুলি যোগ্যতা ও বৃত্তির উদয় ঘটালো। এবং জীবনের বাস্তবিক তাৎপর্য্য কি এই অনুসন্ধান তাঁর ক্রমাগত চলেছে। কাজেই দারিদ্র্য বা পরিবর্ত্তন নিন্দনীয় বা ভয়াবহ নয়। সংরক্ষণশীলতা অনেকাংশে ভাল হলেও সবটা ভাল নয়। জীবনের ঘটনা পরম্পরার যে নুতন প্রবাহ এবং তার প্রয়োজন আছে তা অস্বীকার করা যায় না। যুগের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ, সংস্কার, মন, পরিবেশ ইচ্ছা অভিরুচি সবই বদলাচ্ছে। কাজেই এই গতির প্রবাহে অন্ধ স্থিতি সম্ভবপর নয় এবং বাঞ্ছনীয়ও নয়। এবং গতির প্রবাহ আছে বলেই যে স্থিতির মূল্য বা প্রয়োজন নাই এটাও ভুল ধারণা। মিলিয়ে চলাই প্রয়োজন, তবে নিজের সত্ত্বাকে ভুলে নয়, সত্ত্বার অস্তিত্ব রেখে। কাজেই পুরুষকার দরকার, সবটা অদৃষ্টে ফেলে চলেনা আর সবটাও পুরুষকার লব্ধ নয়। কাজেই সামঞ্জস্য

একমাত্র বার্ত্তা। হাতের চিহ্নগুলি সেই বার্ত্তার দ্যোতক। কেহ অদৃষ্টবলে গ্রহণ করেছেন, কেহ পুরুষকার বলে গ্রহণ করেছেন ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ বা রুচি অনুযায়ী। মোট কথা যেমন ভাব, তেমন লাভ। এটা অবশ্য নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, হাতের চিহ্নগুলি পড়া দরকার তাদের বার্ত্তা কি জেনে কাজে লাগাবার জন্যে। তা না হলে অন্ধকারের ঢিল ছুঁড়তে ছুঁড়তে অর্দ্ধেক জীবন কেটে যাবে, বোধ যখন আসবে তখন দেখা যাবে কবর খোঁড়ার সময় এসে গেছে। কাজেই এ শাস্ত্রের বার্ত্তা অবহেলা করে লাভ কি? হস্তরেখার আলোকরেখা আপনাকে নিশ্চয়ই সাহায্য করবে, এটুকু জোর করে বলতে পারি।

এই ভদ্রলোক জীবন আরম্ভ করেছিলেন High living, plain thinking'য়ের platfromয়ে। তিনি এখন এগিয়ে চলেছেন তার একেবারে উল্টো রাস্তা দিয়ে। কারণ হিনি উপলব্ধি করেছেন। plain living high thinking'ই জীবনের আসল পথ। ত্রিশূল, শঙ্খ, মন্দির এই সব চিহ্নগুলি এই চেষ্টা ও সাধনায় যথেষ্ট সাহায্য করছে। গতানুগতিক ভোগ মার্গ হতে জ্ঞান মার্গে অভিযান এটা এই দুই হাতে স্পষ্ট রেখায় দেখিয়ে দিচ্ছে। আমাদের দরকার চোখ কান খুলে রাখা, এবং প্রকৃতির ইঙ্গিত উপলব্ধি করার জন্য যথার্থ সচেষ্ট হওয়া।

অগ্রহায়ণ মাস কেমন যাবে?

কার্ত্তিক মাসের সাধারণ রাষ্ট্রগত ফলাফল যা লিখেছিলাম তা পড়ে থাকবেন। রাজনৈতিক আবহাওয়া কিরকম গেল এবং অন্যান্য দাঙ্গা হাঙ্গামা লুঠ তরাজ যা কার্ত্তিক মাসে ঘটেছে তা অনেকেই দেখে থাকবেন বা পড়ে থাকবেন। এ থেকেই বুঝতে পারছেন জ্যোতিষ দৃষ্টিতে আগামী ঘটনার ছায়াপাত বা রেখাপাত হয় কিনা। সমগ্র পৃথিবীতেই অত্যন্ত অশান্তিকর অবস্থা চলেছে। মত বিরোধ, দ্বন্দ্ব দিকপালদের মধ্যে ঘটে উলুখাকড়ার প্রাণ যাচ্ছে। বোধ হয় এই চিরাচরিত প্রথা বা ইতিহাস। যাইহোক এখন রাষ্ট্রগত অগ্রহায়ণ মাসের গ্রহ ফল কি দেখা যাক্।

গ্রহরাজ রবিগ্রহ ক্রূর বরুণগ্রহের সঙ্গে মিলিত হচ্ছেন এবং উভয় পার্শ্বে মঙ্গল ও প্রজাপতি গ্রহদ্বয় দ্বারা বৈর দৃষ্টিতে আক্রান্ত। কাজেই পৃথিবীর সর্ব্বত্র রাজসরকারের অবস্থা সহজ এবং সুখময় থাকা সম্ভব নয়। উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের অবস্থাও সঙ্কট জনক চলবে। কার ঘাড়ে কী রকম কোপ কখন পড়ে, বলা শক্ত। কতক রাজশক্তি টলটলায়মান হবে। মঙ্গল ও প্রজাপতি গ্রহদ্বয় রক্তপাত, দুর্ঘটনা, হঠাৎ তুমুল আলোড়ন প্রভৃতির কারক, কাজেই একটা নুতনধরণের অদ্ভুতপরিস্থিতি এনে ফেলতে পারে। তার মধ্যে থাকবে অনিশ্চয়তা উদ্বেগ রেষারেষি ও নানাবিধ উৎকট অশান্তি। গুপ্তচক্র, মন্ত্রণা, ambwsh ইত্যাদি প্রচুর বৃদ্ধি পাবে। এক কথায় বিশ্বাস বস্তুটি দুর্ল্লভ হয়ে পড়বে, দেখা দেবে সে যায়গায় বিশ্বাসঘাতকতা এবং নানাবিধ Torpedo-like action, কাজেই আজ যিনি বুক ফোলাচ্ছেন কালকেই তিনি অজ্ঞাত কারণে চিৎ বা কাত হয়ে পড়বেন। এই গ্রহফলে দেশের দশের ও বিশ্বের অবস্থার উন্নতি সম্বন্ধে, ক্ষীণ আশা দেখা যায়। বিশেষ করে কলিকাতায় নানা দুর্বিপাক ঘটতে পারে। সিংহ লগ্ন বা সিংহ রাশির লোকেরও দিকদারি বিলক্ষণ হতে পারে।

বুধগ্রহ রবিগ্রহের ন্যায় আক্রান্ত হওয়ায় উগ্র বুদ্ধির প্রভাব সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে। আপোষ মিলন চিন্তা অপেক্ষা যুদ্ধং দেহি ভাবই ভবমঞ্চে তরোয়াল ঘোরাবে। এর মধ্যে যদি সামান্য কিছুও ভাল হয় ত অনেক জানবেন।

এখন ব্যক্তিগত মাসফল সংক্ষেপে বলি।

বৈশাখে জন্ম যাঁদের—তাঁদের অগ্রহায়ণ মাস কর্ম্মময়। ঝামেলা অনেক থাকবে সন্দেহ নাই, কিন্তু সব ঠেলে যোগ্যতা দেখাতে পারবেন। নিজের কাজের প্রচার করার এই সময় মুখ বুঁজে বসে থাকবেন না, নিজের trumpetয়ে ঘন কাঠি বাজান কারণ সত্যের ভিত্তিতেই এটা বাজান হবে। Speculation করলে নুকসান হিন্দি ভাষার বলতে গেলে। উদর যাতে ভাল থাকে তার জন্য খাওয়া দাওয়ার নিয়ম মানা বাঞ্ছনীয়। সন্তান সম্বন্ধীয় ফল সুখকর নয়। জ্ঞাতি আত্মীয় প্রতি-

শী নিয়েও সুখ দেখিনা। চিঠি পত্র বুঝে সুঝে যত ভাষায় লিখবেন এবং কোথায় কি সই রেছেন, দেখে নেবেন। পরের কথায় ধপাধপ ই দেবেন না। যদি অবিবাহিত হন, বিবাহের পারে এগিয়ে আসুন। যদি ব্যবসায়ী হন, blic relation বাড়াবার চেষ্টা করুন।

আপনাদের এবার আয় বাড়ার পথে, চিন্তার রণ নাই।

জ্যৈষ্ঠে জন্ম যাঁদের—আপনাদের অপব্যয় কমে বে, চেষ্টা করলে হয়ত কিছু জমাতেও পারেন। চিন্তা ঝঞ্ঝাট যাই থাক, সব সামলে নিতে রবেন। শত্রু দমনের চিন্তা ত্যাগ করুন, জের কিসে ভাল হয় সেইদিকে লক্ষ্য রাখলে তরে ভিতরে solid base করতে পারবেন। মায়িক ভাবে চলাই বাঞ্ছনীয়। সাংসারিক শৃঙ্খলা, পারিবারিক অশান্তি, সম্পত্তিগত গোল-গ, বন্ধুদের সহিত মনোমালিন্য এই সব এসে ড়তে পারে। কর্ম্মে নজর রাখুন এবং সাহসে র করে এগিয়ে যান। বিবাহিতদের পতি বা নীর স্বাস্থ্য মন ভাল থাকবে না। অবিবাহিতদের বাহ এই মাসে avoid করতে পারলেই ভাল। মি অবশ্য স্থিরীকৃত বিবাহের বাক্‌ভঙ্গের ক্ষপাতী নই। যদি কথা দিয়েই থাকেন, ভগবৎ শ্বাসে এগিয়ে যান। মাতার স্বাস্থ্য ভাল না কার কথা। বিদ্যালাভে বিঘ্নবাধাও রয়েছে।

আষাঢ়—আপনাদের ভাগ্য বৃদ্ধির পথে। গ্যস্থ রাহু লাভস্থ শনি আপনাদের প্রতিষ্ঠার ল ব্যবস্থা করছে। বৃহস্পতি শুক্র তুলায় এসে পনাদের আরো উন্নতি করবে। তৃতীয় স্থান াল দেখিনা, ভাগ্যাধীশও বেশ বেকায়দায়, কাজেই াতি আত্মীয় প্রতিবেশী থেকে সুখ দেখিনা, দের নিয়ে অনেক সময় মাথা ব্যথা হতে পারে। রত পক্ষে ছোটখাটো ভ্রমণ বাদ দেবেন, এবং গজে পত্রে বুঝে সুঝে সই দেবেন বা কোন ব্য করবেন। সাংসারিক সুখও তেমন দেখছিনা পনাদের। নানারূপ চুরি-চামারি দ্বারা আপনা-র কিছু ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। কাজেই দের জিনিসে সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন। বন্ধু বান্ধব ছু অধিক Smart হয়ে আপনার মাথায় কাঁঠাল ঙতে পারে। কাজেই যদি দেখেন কাঁঠাল হাতে এগোচ্ছে, মাথা খানা হেলিয়ে দিয়ে বন্ধুবরের অপচেষ্টাটি পণ্ড করে দেবেন। শুভবুদ্ধি আপনার মাথায় অনেক এসে হাজির হবে, অবশ্য কতকগুলির উপর সন্দিহান হয়ে পড়বেন বা ব্যস্ত সমস্ত হয়ে সেগুলিকে যথাযথ সমাদর করতে বা কার্য্যকারী করতে নাও পারেন। শত্রুর নিপাত হবে সত্যি, কিন্তু আপনার মাথায় আগুনের হল্কা কি কম বইবে। দুঃসাহসের কাজ করে ফেলে নিজের জীবনকে বিপন্ন করবেন না। বিবাহ না করে থাকলে বিবাহে আর আপত্তি কেন? কর্ম্মে বদলী হলে আশ্চর্য্য হবেন না।

শ্রাবণ—আপনার যাতে ব্যবসা বাণিজ্য বৃদ্ধি পায় সেই দিকে চেষ্টা চালিয়ে যান। কর্ম্মে যথেষ্ট দায়িত্ব থাকলে অনেক বোঝা হাল্কা করতে পারবেন। পড়াশোনায় যতটা পারেন মনোনিবেশ করুন। তবে লাভ যা হবে তাতে মন ভরবে না। জ্ঞাতি আত্মীয় বা প্রতিবেশীদের সহিত ব্যবহার ভাল ভাবেই করবার চেষ্টা করুন। কর্ম্মযোগ্যতা দেখানোর কোন অসুবিধা দেখিনা। বিবাহ বা প্রণয় ব্যাপারে সুখী হতে পারবেন। তবে হঠ-কারিতা কোরবেন না। সবুর করুন, মেওয়া ফলতে পারে। সন্তান যাঁদের আছে তাঁরা সন্তান সম্বন্ধে সর্ববিষয়ে যত্ন নেবেন, অবহেলা করবেন না। বাড়ীতে শুভ অনুষ্ঠান লাগতে পারে।

ভাদ্র—আপনাদের আর্থিক অবস্থা সঙ্কটজনক থাকবে। টাকাকড়ি ধার দেবেন বুঝে সুঝে। বিশ্বাসের ভরসায় এগিয়ে গেলে দেখবেন বিশ্বাসের মুণ্ডচ্ছেদন হয়ে গেছে। বন্ধুদের ব্যবহার অতি অপ্রীতিকর বা তাদের কারণে অন্যবিধ ক্ষতি এসে যেতে পারে। সাংসারিক কারণে প্রচুর ব্যয় বেড়ে যাবে। পারিবারিকবিশৃঙ্খলা অশান্তিই বা কম কিসে? বাধা বিঘ্ন যাই থাক ভাগ্য বৃদ্ধি কিছুটা হবেই। অল্প গোলমালে ভড়কে যাবেন না, সাহসের লাঠি হাতে নিয়ে এগিয়ে যান। আলো পথ দুই-ই পাবেন।

আশ্বিন—জগতে আত্মীয় প্রতিবেশী নিয়ে অগ্রহায়ণ মাসে আপনার বেশ বেকায়দা। অধিক তেজ দেখিয়ে শুভ সুযোগগুলি হারাবেন না। আবহাওয়া আপনার অশান্ত ও থমথমে। বুদ্ধির তৎপরতা দিয়ে অনেক কিছু manage করতে

হবে, পারবেনও। লাভ মোটামুটি খারাপ দেখি না। বেশী অশান্ত হয়ে পড়ে নিজের tension বাড়াবেন না! শত্রুতা কেউ বেশী করলে, দু এক ঘা রদ্দা দিলেই অনেকটা কাজ হবে। বিস্তার চেষ্টা বাড়ান। সন্তান সংক্রান্ত care নেবেন। তারা কেউ কেউ লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে বিপদ না ডেকে আনে।

কার্ত্তিক—আপনার পারিপার্শ্বিক দুশ্চিন্তা অনেকটা কাটবে; শনি রাহুর দৃষ্টিতে মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য এতদিন মোটেই পাচ্ছিলেন না। বৃহস্পতি শুক্র আপনার রবি রাশিতে এসে আপনার অনেক আশঙ্কা দূরীভূত করবে। যাঁরা বিবাহিত তাঁদের দাম্পত্য সুখ বৃদ্ধি পাবে এবং স্বামী বা স্ত্রীর স্বাস্থ্য, মন ভাল থাকবে। এবং যাঁরা অবিবাহিত তাঁদের বিবাহ যোগ ভালই এসে পড়ল। 'শুভস্য শীঘ্রং' বুঝে নিয়ে অযথা এই ব্যাপার postpone করবেন না। আয় সংক্রান্ত আপনার উদ্বেগ আছে, এটার বিশেষ লাঘব দেখি না। বরং হাতে পয়সা রাখাই সমস্যা। তবে হ্যাঁ, বে-কায়দার অবস্থা এসে পড়লে কোথা থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ এসে গিয়ে আপনার দুশ্চিন্তা দূর করে দেবে। গৃহবাটী পরিবর্ত্তনের পক্ষে সময় ভাল। যাঁদের পয়সা কিছু বেশী এবং সম্পত্তি বৃদ্ধির দিকে নজর রাখেন তাঁরা এই বিষয়ে উৎসাহী হলে কাজ এগোবে।

অগ্রহায়ণ—আপনাদের মাথার উপর দিয়ে অনেক ঝড় বয়ে যাবে। তবু স্থির থাকতে পারবেন আশা করি। সাহস ও তেজ হারাবেন না। এই দুটোই আপনাদের প্রধান সম্বল। উপস্থিত বুদ্ধিও আপনাদের অনেকটা সাহায্য করবে। বাড়ী ঘর বদল করার ইচ্ছা থাকলে সচেষ্ট হন। পিতার কারণে উদ্বেগ চলছে। তাঁর শারীরিক দুর্ভোগ অধিক দেখা যায়। কর্ম্ম জীবনে বা চাকুরীতে বিশেষ শান্তি নাই, এই মাসে আরো একটু খারাপ হতে পারে। সাংসারিক পারিবারিক ব্যাপারে কিছু উন্নতি সাধন করতে পারবেন। কর্ম্ম জীবনের প্রসারতায় বাধা দেখছি। ছোটখাটো ভ্রমণের সুযোগ পেলে নিয়ে নেবেন। তাতে অনেক দিক দিয়ে ভাল বোধ করবেন। জ্ঞাতি আত্মীয় প্রতিবেশী এঁদের ব্যাপারে উৎসাহী হলে মান আনন্দ দুই পাবেন। কোন সহোদর বা সহোদরার হঠাৎ অনর্থ ঘটতে পারে।

পৌষ—আপনাদের ভাল আয় আশা করি। তবে ব্যয়ের মাত্রাও কম নয়। আপনার ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা ভালই থাকবে। অনেকে হুকুম তামিল করতে দ্বিধা করবে না। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্য ভাল দেখি না; সে কারণে অনেক ব্যয়ও দেখা যায়। মামলা মকদ্দমা avoid করুন। বিদেশ সংক্রান্ত কোন ব্যাপারই সুবিধাজনক দেখি না। গৃহের দায়দায়িত্ব কিছু বাড়বে। কর্ম্ম সংক্রান্ত মাথা ব্যথা মধ্যে মধ্যে এসে পড়বে। ব্যস্ত হবেন না, স্থির হয়ে কাজ করলে অনেক বিষয়ে সুবিধা করতে পারবেন।

মাঘ—কর্ম্ম ব্যাপারে অনেক সুযোগ সুবিধা এসে পড়বে। কিছু মান সম্ভ্রমও বৃদ্ধি পাবে, অবশ্য দায়-দায়িত্ব যেটা আছে সেটা এড়ানো যাবে না। সাহস ও তৎপরতার সহিত এগিয়ে যান, অনেক বাধা দূর হয়ে যাবে। অর্থনাশ যা ঘটছিল তা এবার কিছুটা কমবে, আয়ও বৃদ্ধি পাবে। পারিবারিক গোছগাছ যা ভাল তা করবার জন্য সচেষ্ট হন। পাকা ভিত্তিতে গৃহাদি ব্যাপারের অনেক সুবিধা করে নিতে পাবেন। যাঁদের সামর্থ্য আছে তাঁরা ফল বা উন্নতি করতে পারবেন। মধ্যে মধ্যে হজমের গোলমাল দেখা দিতে পারে। কতকটা নিয়মের মধ্যে থাকাই বাঞ্ছনীয়। অবিবাহিত যাঁরা তাঁদের বিবাহ যোগ হঠাৎ এসে পড়তে পারে। যাঁরা বিবাহিত তাদের পতি বা পত্নীর মেজাজ একটু কড়া থাকবে মনে হয়।

ফাল্গুন—কর্ম্ম বিষয়ে আপনাদের খুব তৎপর থাকতে হবে এই অগ্রহায়ণ মাসে। অনেক ঝঞ্ঝাট ঝামেলা এসে পড়তে পারে। গুপ্ত শত্রুতা করার চেষ্টা করবে কেউ কেউ। তবুও আপনাদের প্রতিষ্ঠা ও সুনাম বজায় থাকবে। অন্যবিধ ভাগ্যোন্নতি ঘটবে, আশাকরি। অর্থ সংক্রান্ত শুভফল হবে। ধর্ম্ম ব্যাপারে উন্নতি করতে পারবেন; তীর্থপর্য্যটনে অনুরাগী হলে সে বিষয়ে কৃতকার্য্য হবেন। গৃহাদি ব্যাপারে অভিলাষ চরিতার্থ হবে। সম্ভব স্থলে যানবাহন যোগও দেখা যায় সহোদরদের কিছু সুবিধা ঘটতে পারে। এবং তাঁদের সহিত প্রীতির বন্ধন বাড়তে পারে। পুনশ্চ সহোদরাদির

হঠাৎ ঝঞ্ঝাট ভোগ হতে পারে। অবশ্য মোটের উপর তাদের অবস্থার উন্নতি আশাকরা যায়। সন্তান সংক্রান্ত উদ্বেগ এসে পড়বে, তাদের tension কিছু থাকতে পারে। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্য, মন ভাল থাকবে না। অবিবাহিতদের এই মাসে বিবাহের পক্ষে অনুকুল নয়। ব্যবসায়ী যাঁরা তাঁদের ব্যবসায় অনেক অন্তরায় এসে পড়তে পারে। public relations suffer করতে পারে।

চৈত্র—আপনাদের চতুর্দ্দিকে নরম হাওয়া। নিজেও কতকটা বেপরোয়া হয়ে যেতে পারেন। অর্থসংক্রান্ত লাভ উন্নতি আশাকরি। অপব্যয় কিছু কমবে। পাকে-চক্রে আপনার শত্রুধ্বংস হবে, আপনার বিশেষ কিছু করার প্রয়োজন হবেনা। আয় ভাল হবে। মাথাও খুলবে বেশী। সাহস ও তৎপরতার সহিত কাজওকরতে পারবেন। ধর্ম্মব্যাপারে উন্নতির আশা কম। পারিবারিক ঝঞ্ঝাট অনেক এসে পড়বে। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্য ভাল থাকবে না। অবিবাহিতদের বিবাহে বিঘ্ন-বাধা এসে পড়তে পারে। মামলা মকদ্দমায় সুফল দেখিনা। ব্যবসায়ে মধ্যে মধ্যে অনর্থ এসে দেখা দেবে। ৪.১১.১৯

প্রশ্ন বিচার ও উত্তর

১। শ্রীসঞ্জীব ভট্টাচার্য্য—খায়াই।

আপনার পত্র পাইয়াছি। জ্যোতিষ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছেন জানিয়া আনন্দিত হইলাম। প্রশ্নের উত্তর আলাদা পাঠাইতেছি।

২। শ্রীমণিলাল নন্দী, শালকিয়া, হাওড়া।

আপনার পত্র পাইয়াছি। আমার লেখা মনোযোগ সহকারে পড়েন জানিয়া সুখী হইলাম। প্রশ্নের উত্তর শীঘ্রই পাঠাইয়া দিতেছি।

৩। শ্রীদীপঙ্কর চৌধুরী বর্দ্ধমান।

আপনার ৩০শে অক্টোবরের পত্র পাইয়াছি। শরীর যাহাতে ভাল থাকে সেদিকে সচেষ্ট হউন। আপনার প্রশ্নের উত্তর আলাদা পাঠাইতেছি।

৪। শ্রীবিমলকান্তি দত্ত,—বালেশ্বর।

আপনার ২৯শে অক্টোবরের পত্র পাইয়াছি। আপনার পড়ালেখায় উৎসাহ আছে জানিয়া সুখী হইলাম। আপনার প্রশ্নের উত্তর আলাদা পাঠাইতেছি।

৫। শ্রীকল্যাণকুমার ব্যানার্জ্জী, সালকিয়া, হাওড়া।

আপনার ২৬শে অক্টোবরের পত্র পাইয়াছি। অর্থনীতিতে আপনি এম, এ পাস করিয়াছেন জানিয়া সুখী হইলাম। আপনার প্রশ্নের উত্তর আলাদা যাইতেছে।

৬। শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী,—আলিপুর রোড কলিকাতা।

আপনার ২৪শে অক্টোবরের পত্র পাইয়াছি। আপনার প্রশ্নের উত্তর আলাদা পাঠাইয়া দিতেছি।

৭। কুমারী বিজয়া মুখার্জ্জী,—শাহরাণপুর।

আপনার ২৬শে অক্টোবরের পত্র পাইয়াছি। আপনি হাতের ছাপটি বেশ সুন্দর লইয়াছেন। উচিত ছিল নীচে আপনার নাম লিখিয়া রাখা।

এর আগের সংখ্যাগুলিতে যাঁদের প্রশ্ন গণনা করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিলাম, তাঁহাদের নাম এই।

১। শ্রীমণিমোহন পাল।
২। শ্রীঅজয়কুমার বসুমল্লিক।
৩। শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।
৪। কুমারী স্বাধীনা ভট্টাচার্য্য।
৫। শ্রীহৃষীকেশ নন্দী।
৬। শ্রীনরেশচন্দ্র বসু।
৭। শ্রীতড়িৎকুমার গোস্বামী
৮। শ্রীভূপেন্দ্রনাথ পাইক।

আশা করি এঁরা সকলেই যথা সময়ে পত্র পাইয়াছেন এবং জিজ্ঞাস্য বিষয়ের উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

আপনার ভবিষ্যৎ জানতে চান কি ?

আপনার যদি কোন গুরুতর প্রশ্ন থাকে, তার উত্তর দেবেন সুরাচার্য্য আপনার জন্মসময়, তারিখ এবং জন্মস্থান জানালে। যাঁদের জন্মচক্র, গ্রহের স্ফুট, বিংশোত্তরীয় দশা যা চলছে তা জানা আছে তাঁরা এগুলি লিখে পাঠালে, শীঘ্র উত্তর দেবার সুবিধা হবে। Lahiri's Ephemenis বা বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুযায়ী গণনা করা থাকলেই পাঠাবেন। কারণ সুরাচার্য্য এই দুই গণনার উপরই নির্ভর করেন। দুইটীর বেশী প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব হবে না। এই উত্তর "ভারতবর্ষ"-এর পরের সংখ্যায় পাবেন। অবশ্য খুব বেশী অনুরোধ এসে গেলে পত্রের প্রাপ্তি ক্রম অনুযায়ী আস্তে আস্তে পরের সংখ্যাগুলিতে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা হবে। প্রশ্নের সঙ্গে এই পাতার শেষে যে 'কুপন' আছে সেটী ছিঁড়ে পাঠাতে হবে। প্রতি 'কুপন'-এ দু'টি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হবে।

পত্র লেখার সময় ও তারিখ পত্রে থাকলে অনেক সময় যথার্থ উত্তর দেওয়ার সহায়তা হয়। হাতের ছাপও পাঠাতে পারেন প্রশ্নের রহস্যোদ্ঘাটনের সহায়তা হিসাবে। দুই হাতের ছাপ প্রয়োজন। ছাপ নেবার অনেক পদ্ধতি আছে। সাধারণ কালিতে ছাপ ভাল হয়না; Stamp pad ink-এ চলতে পারে, যদি Stamp pad-এর সাহায্য নেন। Press ink, Cyclostyle ink অর্থাৎ ছাপার কালি সবচেয়ে ভাল। কিন্তু এই কালি হাতে লাগাতে হলে কাঠের বা রবারের রোলার প্রয়োজন। অনেকের এটা যোগাড় করা সম্ভব নাও হতে পারে। ভুষো কালি হাতে লাগিয়ে চেষ্টা করে দেখতে পারেন। পরিত্যক্ত Lip stick বাড়ীতে থাকলে তা দিয়েও হাতের সুন্দর ছাপ নেওয়া যায়। নূতন ব্যবহার করলে বৃথা খরচ বৃদ্ধি হবে এই যা। মনে রাখবেন, কেবল কৌতুক বশতঃ প্রশ্ন করবেন না। তাতে আপনার ও সুরাচার্য্যের দুজনেরই সময় নষ্ট হবে। প্রশ্ন প্রয়োজনীয় যা গুরুতর বা জানার আগ্রহ যথেষ্ট থাকলে তবে প্রশ্নের উত্তর ভাল পাওয়া যায়। মনে মনে কল্পনা করে প্রশ্ন বার করবেন না। যে প্রশ্নের উত্তর পাবার জন্য মন ব্যাকুল সেই প্রশ্নই প্রশ্ন।

অনেকেই প্রশ্ন ঠিকমত করতে পারেন না। তাঁরা জানতে চান এক, কিন্তু জিজ্ঞাসা করেন আর এক! কাজেই উত্তর সন্তোষজনক পাওয়া যায় না। এজন্য প্রশ্নটা একটু ভাববেন এবং আসল জ্ঞাতব্য কি সেই কথাটাই খুব সরল, সহজ, স্পষ্ট এবং যথাসম্ভব ছোট্ট করে জানাবেন।

ধরুন আপনার বাজারে কিছু দেনা আছে। আপনি ভাবছেন একটা লটারী পেলে দেনাটা শোধ করে ফেলতে পারেন। কাজেই প্রশ্ন করলেন "লটারী পাব কিনা?" লটারী পাওয়া আসলে কিন্তু প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হচ্ছে ঋণ শোধ, কারণ আপনি ঋণ পীড়ায় পীড়িত। কাজেই আপনার প্রশ্ন হওয়া উচিত "দেনা শুধতে পারবো কি?" "দেনা শোধ করতে কত সময় লাগবে?" "দেনা সময়ে পরিশোধ না করলে কি ক্ষতি হয়ে যাবে"—এইসব। কিন্তু লটারী পাবার জন্যে মন সত্যিই আকুল থাকলে তখন জিজ্ঞেস করতে পারেন লটারী পাবেন কিনা। সেই টাকা তখন কী কাজে লাগাবেন সেটা প্রশ্ন নয়।

প্রশ্নের উত্তর সন্তোষজনকভাবে মিলে গেলে সুরাচার্য্যকে "ভারতবর্ষ"-এর ঠিকানায় জানাবেন।

॥ কুপন ॥

কার্তিক—১৩৭৬ গ্রহ-জগৎ

গোঁফ ও রত্নাবাঈ

সমীর চট্টোপাধ্যায়

বউবাজার অঞ্চলে একটা কাঠের দোকানে কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে গিয়ে হঠাৎ অভাবনীয় ভাবে জয়চাঁদলালজীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটল। জিনিস পত্র নিয়ে দোকান থেকে বাইরে আসতেই একটা মিষ্টি সুরের ডাক শুনতে পেলাম,—কিতাব বাবু!

ডাক শুনে চমকে পিছন ফিরে তাকালাম। ঐ নামে শুধু একজনই আমাকে ডাকত, সে বারাণসীর বিখ্যাত জয়চাঁদলাল ঠাকুর।

ওখানকার সকলে যাকে ডাকত ঠাকুরজী বলে। বারাণসীর গোধূলীয়ায় একটা অতিথি-নিবাসের মালিক। তাছাড়া প্রচুর জমি আর বাড়ী ছিল তার বাবার,—আর একমাত্র ছেলে হিসাবে ঠাকুরজীই সব সম্পত্তির একমাত্র অধিকারী হবার কথা,—অন্ততঃ আমি তাই জানতাম। শুধু জানাই নয়, এই আমার মনে দৃঢ় ধারণা ছিল। কিন্তু অতবড় জমিদারের একমাত্র তনয় যে আজ একটা দোকানে হেঁট মুণ্ডে বসে, নাকের ডগায় একটা চাঁদির চশমা লাগিয়ে নিবিষ্ট মনে ক্যাশমেমো কাটতে পারে, এমন কল্পনা আমি কখনও করিনি।

কিন্তু এসব কথা ভেবেও আমি তত বিস্মিত হইনি, যতটা হয়েছিলাম জয়চাঁদ লালের মুখের দিকে তাকিয়ে। তার সেই নির্লোম মুখটা দেখতে দেখতে বারাণসীতে দেখা আগের সেই জয়চাঁদ লালের কথা মনে পড়ল। ছ'ফিটের ওপর লম্বা একটা বলিষ্ঠ মানুষ। পাকা সোনার মতন গায়ের রঙ। মাথায় বাবরি চুল। খাঁড়ার মতন বাঁকা—নাকের নীচে ঝুলে থাকা দ্বিতীয়—বন্ধনী চিহ্নের মতন ঈষৎ লালচে একটি বিরাট গোঁফ, যেটি জয়চাঁদ লালের সযত্ন-লালিত। পরমযত্নে যেটিকে সে পরিচর্যকরতো। তার বিন্যাসকরতো। তাকে সাজাতো গোছাতো। তারপর বাড়ী থেকে যথারীতি বেশভূষা করে বার হবার সময় সেই গোঁফে সুগন্ধি চামেলী আতর মাথাতো। তার সারা দেহের মধ্যে বোধ হয় সব থেকে বেশী যত্ন ছিল ঐ বিরাট গোঁফ-টার প্রতি। ভালোও বাসতো সে সব থেকে বেশী ঐ-টাকেই। জগতে এত বেশী সে আর কাউকে ভালোবাসত না। আবার ঐ গোঁফই একদিন তার সামনে এক বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। জয়চাঁদ লালের জীবন নাট্যে তখন রত্না বাঈয়ের আবির্ভাব ঘটেছে।

কর্মোপলক্ষে বারাণসীতে আমাকে বেশ কিছুকাল থাকতে হয়েছিল। জয়চাঁদ লালের অতিথি নিবাসেই উঠেছিলাম। সেখানে থাকা খাওয়ার সব ব্যবস্থাই আছে। সব কথা বার্তা হবার পর জয়চাঁদ লাল তার বিরাট গোঁফে দুবার হাত বুলিয়ে, খুব চিন্তিত ভাবে ভাঙ্গা বাংলা আর হিন্দি মিশিয়ে বলেছিল,—লেকিন বাবু, ইথানে আপনার খানা—পিনার অসুবিস্তা হোবে নাতো? বলেছিলাম,—কেন?

জয়চাঁদ লাল বলেছিল,—আপনি কোলকাত্তার বাংগালী বাবু, মছলী না হোলে তো চোলবে না!

বলেছিলাম,—একেবারেই চলবে না এমন কথা বলতে পারি না ঠাকুরজী! আর আমি ওসবের বড় একটা ভক্ত নই!

—বোলেন কী!—তবেতো আপনি আমাদের দলে নাম লিখিয়েছেন—বলেই তার সেই বিরাট গোঁফ নাচিয়ে হো হো করে হেসে উঠেছিল সে।

পরে জেনেছিলাম, ঐ অতিথি নিবাসটা জয়চাঁদ লালের কিছুটা সখের কারবার। ওটা থেকে তার আয়ের চেয়ে ব্যয়ের ভাগই বেশী। ক্রমেই তা টের পাচ্ছিলাম। খাবার দাবারের ব্যবস্থা অতি উচ্চ পর্যায়ের। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঘর আসবাব পত্র। অতিথি নিবাসটা সে করেছিল আরও একটা কারণে, সে কথায় ক্রমে আসব।

প্রচুর ঐশ্বর্যশালী জয়চাঁদলালের বাবা কিষেণচাঁদ ঠাকুর। বারাণসীর গোধূলীয়া আর গণেশ মহল্লায় তার কম করে অন্ততঃ খানদশেক বড় বড় বাড়ী।

করে

সেই বাড়ীর প্রায় বেশীর ভাগই দখল করে বসে আছে বারাণসীর নামজাদা বাঈজীরা। সারা ভারত জুড়ে তাদের নাম—ডাক। তাদের এক একটা মুজরোর মূল্য কম করে পাঁচশো টাকা। এক একজনার তিন চার খানা করে গাড়ী,—নানা রকমের।

তার মধ্যে মোটরও আছে. আবার সাবেকী ব্রুহাম, আর ল্যাণ্ডেলেটও আছে।

ভাড়ার তাগাদা করতে সেই সব বাঈজীদের কাছে জয়চাঁদ লালের যাতায়াত ছিল। কিষেণচাঁদ গোঁড়া লোক। তিনি ও সব বাঈজীদের ধারে কাছে ঘেঁসতেন না। জয়চাঁদ লালের কিন্তু বাঈজীদের সঙ্গে বেশ মহরম—মহরম চলত। গান বাজনা খুব ভালোবাসত জয়চাঁদ লাল। সে তার বাবার মতন ফতুয়া—ধুতি পরত না। সে পায়জামা আর গিলে—হাতা চুড়িদার পাঞ্জাবী প'রে, গোঁফে আতর দিয়ে যেত বাঈজী পাড়ায়। মাঝে মাঝে বড় বড় জলসা হয়। নানা দেশ থেকে আরও অনেক বাঈজীরা আসেন। তারা অনেকদিন ধরে থাকেন বারাণসীতে। সেই সব জলসায় গান শুনতে আসেন অনেক বড় বড় লোক। তারা এসে উঠতেন ঐ অতিথি নিবাসে। সে সময়ে বাইরের লোকের ওখানে আর জায়গা হ'ত না। এমনি একটা জলসায় যোগ দেবার সৌভাগ্য আমারও হয়েছিল। তখন দেখতাম অতিথি নিবাস জমজমাট। বড় বড় নামজাদা বাঈজীরা সব এসে উঠতেন। সদা সর্বদা তানপুরার টুং টাং বাঁয়া তবলার তেরে কেটে ত্রিতালের বোলে অতিথি নিবাস সরগরম হয়ে থাকত। বাইরের অতিথিরাও এসেছেন। তাঁরা সব ঐ জলসার সমঝদার শ্রোতার দল। বাঈজীদের জন্য সব পৃথক ঘর, পৃথক ব্যবস্থা। তারা থাকতেন অন্দরের দিকে। তাদের সঙ্গে থাকত সারেঙ্গী আর তবল্‌চি। সে সময়ে আমাদের মতন নতুন কোন অতিথি এলে তাদের কাছে হাত জোড় করে নিজের অক্ষমতা জানাতেন জয়চাঁদ লালজী। সে' সময় তার মন জুড়ে ৺ গান আর গান। বাজনা আর বাজনা। সে ‵ মোটা অঙ্কের টাকা খরচ করত জয়চাঁদ লাল। ‵নক পুরানো অতিথিকে অতিথি নিবাস ছেড়ে ‵ত্র। আমাকে কিন্তু তাদের দলে পড়তে হয়নি, কারণ আমি তখন জয়চাঁদ লালের মনে কিতাব বাবু হয়ে গাঁট হয়ে জেঁকে বসে গেছি। আমি যে একজন সাহিত্যসেবী এ পরিচয় পাবার পর থেকে জয়চাঁদ লাল আমাকে ভিন্ন চোখে দেখতে সুরু করেছিল। সে আমাকে বলত, আপ্‌নি কিতাব লেখেন, আমাকে কুছু গান লিখে দিবেন বাবুজী ? নানা রকমের মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করার ফলে সে অন্য ভাষাও বুঝতে পারত। আমার কথা বুঝতে তার মোটেই অসুবিধা হত না।

আমি বলতাম,—আমিত গান লিখিনা ঠাকুরজী, ওসব আমার আসেনা। আমি গল্প লেখক। ঠাকুরজী কিন্তু কিছুতেই সে কথা মানতে চাইত না। তার ধারণা, যিনি কলম ধরতে জানেন তিনি সব কিছুই লিখতে জানেন। অতএব আমিও চেষ্টা করলেই গান রচনা করতে পারি।

জলসার সময় অতিথি নিবাসে আমার ঠাঁই অটুট ছিল। কয়েক রাত ধরে আমিও জলসায় শ্রোতা হয়েছিলাম। আর তেমনি এক জলসায় আমি দেখে-ছিলাম লক্ষ্ণৌর সবথেকে সেরা বাঈজী রত্নাবাঈকে। ঐ রত্নাবাঈকে নিয়েই আমার আজকের এই গল্প। সেদিন যদি ঐ জলসায় আমি উপস্থিত না থাকতাম, তাহলে রত্নাবাঈকে দেখার সৌভাগ্য আমার আর কোনদিনই হত না। আমার এই গল্প লেখাও সম্ভব হত না।

সারাদিন অতিথি নিবাস তানপুরা, সারেঙ্গী আর তবলার শব্দে মুখর। রাতেও এক একদিন আমার কানে আসত সেই সব বাজনার শব্দ। তারই মধ্যে কখনও শুনতে পেতাম মধুর সুরে কয়েক কলি গান। কিংবা কিছুটা সরগম, কিছুবা আলাপ।

জয়চাঁদ লালজীর দর্শনও তখন আমার কাছে প্রায় দুর্লভ হয়ে উঠেছিল। সব সময় সে জলসার আয়োজনেই ব্যস্ত থাকত। মধ্যে মধ্যে মাত্র কিছুক্ষণের জন্য সে আসত অতিথি নিবাসে সকলের অভাব অভিযোগের তদারক করতে। তারপর আবার একসময় চলে যেত।

জয়চাঁদলালের সঙ্গে জলসা শুনতে গিয়ে রত্নাবাঈকে দেখেছিলাম। শুধু দেখা নয় তার সঙ্গে আলাপও হয়েছিল। ঠাকুরজীই তার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। তার পরেও আমি অনেকবার তার গান

শুনেছিলাম। জলসা শেষ হয়ে গেল। একে একে সকলে অতিথি নিবাস ছেড়ে চলে গেল। বাঈজীরাও যে যার দেশে ফিরে গেল, গেলনা শুধু একজন। লক্ষ্ণৌর রম্ভাবাঈ এই বারাণসীতে এসে তখন জয়চাঁদলাল ঠাকুরের প্রেমে পড়ে গেছে।

অনেকদিন হয়ে গেল ঠাকুরজী আর অতিথি নিবাসে আসেন না। নানা জনের কাছে নানা কথা শুনতে পাই। তারমধ্যে ভালো মন্দ অনেক রকমই থাকে। জয়চাঁদ লাল নাকি রম্ভাবাঈকে বিয়ে করার জন্য পাগল হয়ে উঠেছে। আবার কখনও শুনি জয়চাঁদ লাল তাকে বিয়ে করে গোধূলীয়ার তার নিজস্ব বাড়ীতে নতুন সংসার রচনায় ব্যাস্ত।

কথাটা ঠিকই। দুপক্ষেই বিয়ের প্রস্তুতি প্রায় পাকা হয়ে গেছল, কিন্তু হঠাৎ এক বিরাট বাধা এসে দাঁড়িয়েছে তাদের পরস্পরের মন দেওয়া নেওয়ার মধ্যে। এক অদ্ভুত প্রস্তাব করে বসেছে রম্ভাবাঈ ঠাকুরজীর কাছে। প্রস্তাবটা অবশ্য এমন কিছু নয়, ভয়ানক নয়, আর কাজ-টাও কিছু কঠিন নয়,—স্ত্রীরত্ন লাভ করার জন্য যুগ-যুগ ধরে তো কতো পরীক্ষাই না দিতে হয় পুরুষকে। ত্রেতা যুগে রামচন্দ্রকে হরধনু ভাঙতে হয়েছিল। দ্বাপরে অর্জুন বিঁধেছিলেন মাছের চোখ। তারপর এই কলিতেও অষ্টম এড্ওয়ার্ডের ভাইকে তো সিংহাসনই ছাড়তে হল। আর এত তুচ্ছ একটা জিনিস। সামান্য একটা গোঁফ। রম্ভা-বাঈ নাকি বলেছে ঠাকুরজীকে বিয়ে সে করবে কিন্তু তার আগে ঠাকুরজীকে তার ঐ বিরাট গোঁফটি সম্পূর্ণ কামিয়ে ফেলতে হবে। রম্ভাবাঈ নাকি গোঁফ রাখা একেবারেই পছন্দ করেন না। বড় বড় গোঁফওয়ালা লোক তার চক্ষুঃশূল। ঠাকুরজী যদি সত্যিই তাকে ভাল-বাসে, তাহলে তার ঐ প্রস্তাবও তাকে মানতে হবে।

অন্যের রুচিবোধ নিয়ে বিশ্লেষণ করা চলেনা। রম্ভা-বাঈ গোঁফ রাখা পছন্দ করে না। গোঁফকে সে রীতিমত ঘৃণা করে। অতএব তার প্রেমাস্পদের মুখে যদি এমনই একটি ঘৃণ্য বস্তু দিবারাত্র শোভা পায়, তাহলে তার সান্নিধ্য কেমন করে সে কামনা করতে পারে? সুতরাং ঠাকুরজী অতি শিগ্গির তার ঐ বিশ্রী গোঁফটি নির্মূল করুক।

মারাত্মক এক প্রস্তাব, অন্ততঃ জয়চাঁদলাল ঠাকুরের মতন একজন গুম্ফপ্রিয় ব্যক্তির কাছে। কথাটা শুনে চমকে উঠেছিল ঠাকুরজী। ক্রমে ঐ কথাটি বারাণসীর পথে-ঘাটে সর্বত্র সকলের মুখে মুখে আলোচিত হতে লাগল অম্ল-মধুর হয়ে। সকলে বলতে লাগল, দেখাই যাক, এবার কি হয়,—কাকে রাখবেন এবার ঠাকুরজী,—গোঁফ না রম্ভাবাঈ!

ঠাকুরজী কিন্তু গোঁফ ছাড়তে রাজি হয়নি, কোন মতেই। গোঁফকে সে ভীষণ ভালোবাসে। বোধহয় নিজের প্রাণের চেয়ে বেশী। তাছাড়া আরও এক সমস্যা আছে। জয়চাঁদ লালজীর বাবা কিষেণচাঁদ এখনও জীবিত। বাবা জীবিত থাকতে গোঁফ কামানো চলেনা। এটা ধর্মীয় সংস্কারের বিরুদ্ধতা করা।

অতিথি নিবাসে আবার ঘন ঘন আসতে লাগলেন ঠাকুরজী। তার মুখে দুশ্চিন্তার কালো ছায়া। আমার কাছে কোন কথাই গোপন রাখেন না। রম্ভাবাঈয়ের সম্পর্ক সমস্ত কথাও আমার কাছে খুলে বললেন। রম্ভাকে না পেলে তাঁর জীবন বরবাদ হয়ে যাবে এমন কথাও। বলতে বলতে তার দুচোখের পাতা ছলছলিয়ে এল। তার জন্য সমস্ত কিছুই করতে রাজি আছেন রম্ভার কিন্তু ঐ এক অদ্ভুত প্রস্তাব; গোঁফ কামাতে হবে ঠাকুরজীকে। সে যদি রম্ভাকে সত্যিই ভালোবাসে তাহলে অবশ্যই সে ঐ কাজ করতে দ্বিধা করবে না। লোকে প্রেমের জন্য কত কি ত্যাগ স্বীকার করে, আর এতো সামান্য একটা গোঁফ। ঠাকুরজী রম্ভাকে নাকি একথাও বলেছে, যে ঐ কাজ করলে সমাজে তার দুর্নাম হবে। রম্ভাও তার প্রত্যুত্তর দিয়েছে, বেশ তাহলে ঠাকুরজী তার সমাজ নিয়েই থাকুন। সমাজই তাহলে তার কাছে বড় হল, রম্ভার প্রেম সম্পূর্ণ গৌণ।

কিন্তু যেটাকে রম্ভাবাঈ সামান্য কাজ বলে মনে করে-ছিল, ঠাকুরজীর কাছে সেটা যে এক বিরাট পর্বতের মতন বাধা, একথা কেমন করে জানবে রম্ভাবাঈ?

ঠাকুরজীও বললে,—কভ্ভী নেহি! মোচ্ কামাবো কি! সামান্য একটা মেয়েছেলের জন্য আমার সমা-জের বিরুদ্ধে যাবো আমি? তাছাড়া এটা তার প্রাণা-ধিক প্রিয় বস্তু! এতদিন ধরে একে সে সযত্নে রক্ষা করে

আসছে। একে সে কিছুতেই ফেলতে পারবে না। অনেক বোঝালে সে রত্না বাঈজীকে। অনেক অনুনয় বিনয়, অনেক মিনতি। বলল, তার কাছে ঠাকুরজীর ভালবাসা বড়, না সামান্য একটা তুচ্ছ গোঁফ বড়। একটা তুচ্ছ গোঁফ তাদের পারস্পারিক ভালবাসাকে মিথ্যা করে দেবে?

কিন্তু রত্না বাঈ এক ভয়ানক জেদী আর এক গুঁয়ে প্রকৃতির। আর হবেই বা না কেন? তার অভাব কিসের? ভগবান তাকে সমস্ত কিছু দিয়ে এ'জগতে পাঠিয়েছেন। তার যেমন অপূর্ব রূপ আছে, তেমনি গুণও আছে। বিখ্যাত গায়িকা সে। সারা ভারত—জুড়ে তার সঙ্গীতের খ্যাতি, তার নাম ডাক।

গান গেয়ে প্রচুর অর্থ সে উপার্জন করে। ঠাকুরজীর মতন দশটা লোককে অঙ্গুলী হেলনে চালনা করতে পারে। বড় বড় রাজা মহারাজারা পর্যন্ত তার গান শোনার জন্য, তার সান্নিধ্য পাবার জন্য সব সময় উন্মুখ হয়ে আছেন।

সেই রত্নাবাঈ ঠাকুরজীর মতন সামান্য এক জায়গীর দার পুত্রের তোয়াক্কা রাখবে কেন? ঠাকুরজীর কোন অনুনয়—বিনয়ই শুনল না রত্নাবাঈ। তার ঐ এক জেদ, যদি তুমি সত্যিই আমাকে পেয়ার করো, তাহলে আমার কথাও তুমি রাখবে। জগতে প্রেমের বিনিময়ে মানুষ কত কি করে আর এতো সামান্য একটা গোঁফ।

আরও কিছুদিন পরের কথা। আমার ইতি মধ্যে একটা নোটিশ এসে গেছে, যে কাজের জন্য আমার বারাণসীতে আসা তা প্রায় সম্পূর্ণ, অতএব আর মাত্র দিন কয়েক আমাকে এখানে থাকতে হবে। বারাণসীতে আমি এই প্রথম এসেছি। থাকলাম ও অনেক দিন। আবার কবে আসবো, কিংবা আর আসাই হবে না, এই সব ভেবে সেদিন একটু বেড়াতে বার হয়েছিলাম। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, আর বিড়লা মন্দির ঘুরে গোধূলীয়ায় ফিরে আসতেই পথে ঠাকুরজীর সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল। টাঙ্গার ভাড়া মিটিয়ে অতিথি নিবাসের দিকে যাচ্ছিলাম। ঠাকুরজীও আমার সঙ্গে এল। আমার ঘরে এসে চুপ করে বসে থাকলে কিছুক্ষণ। অত্যন্ত বিষাদগ্রস্ত। মুখটা থমথমে, আষাঢ়ের আকাশের মত। যেন এখনই প্রবল বর্ষণ সুরু হবে। একটা দীর্ঘ শ্বাস ফেলে ঠাকুরজী বলল, রত্না লক্ষ্ণৌতে চলে যাচ্ছে কিতাব বাবু।

চমকে তার মুখের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললাম,—সে কি!

ঠাকুরজী বললে,—আপনি তো সবই জানেন কিতাব বাবু? রত্নার ঐ অদ্ভুত প্রস্তাব আমি রাখিনি। তাই সে রাগ করে লক্ষ্ণৌ চলে যাচ্ছে। লেকিন বাবু, বলেই আমার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল। তারপর অস্ফুট স্বরে বললেন,—কিতাব বাবু, রত্না যে আমার প্রাণে এমন করে দাগা দিয়ে চলে যেতে পারে, এ আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। আপনি একবার তাকে বুঝিয়ে বলুন কিতাব বাবু। বললাম,—আমার মতন লোকের কথা সে শুনবে কেন ঠাকুরজী?

অল্পক্ষণ কি ভাবল ঠাকুরজী, বলল, সাচ্ বাত্। আপ্নি ঠিক বলেছেন, যা জেদী মেয়ে! মিছামিছি—আপনার কোথার খেলাপ হোবে! তারপর অল্পক্ষণ নীরব থেকে বললে,—আমিও আজ বেশ কড়া কথা বলে এসেছি কিতাব বাবু। রত্নাকে বললাম,—আমার ঘরের বহু হলে তোমাকে জনমের মত বাঈজীর কাম ছোড়তে হোবে রত্না, পারবে তুম্?

বললাম,—শুনে কি বললে বাঈ?

ঠাকুরজী বললে,—কুছু বললো না।

রত্না বাঈয়ের জন্য ঠাকুরজী তার অতি প্রিয় সেই গোঁফটি সত্যিই নির্মূল করেছিলেন কিনা, কিম্বা রত্নাঠাকুরজীর ঘরের বউ হয়েছিলেন কিনা, সে কথা আমি জানতে পারিনি কারণ তার আগেই আমাকে বারাণসী ছেড়ে কলকাতায় চলে আসতে হয়েছিল।

তারপর হঠাৎ এমন আকস্মিক ভাবে কলকাতার এক কাঠের দোকানে জংচাঁদ লালকে আবিষ্কার করে রীতিমত চমকে গেলাম। চোখে চাঁদির চশমা লাগিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, কিতাববাবু, নমস্তে।

আমি বললাম,—নমস্কার ঠাকুরজী। কথা বলতে বলতে আমি নির্বাক বিস্ময়ে তার মুখের দিকে দেখছিলাম। ভাবছিলাম, এ জগতে অসম্ভব বলে কোন কিছুই সত্যই আছে কি না। এ' যেন গল্পের চেয়েও আরও বেশী চমকপ্রদ, আরও বেশী বিস্ময়কর ঘটনা।

অল্প হেঁসে ঠাকুরজী বলল,—আপনি খুব অবাক হয়ে গেছেন না কিতাব বাবু?—লেকিন আজ আপনি যা দেখছেন সেটাই সত্যি, আর যা কুছ্ তা বিলকুল ঝুট্। সেদিন যে ঠাকুরজীকে আপনি দেখেছিলেন সে আজ আর নেই।

বললাম,—কিন্তু তুমি হঠাৎ এই কলকাতায় একটা কাঠের দোকানে কাজ করতে কেন এলে জয়চাঁদ লালজী? তোমার অত ঐশ্বর্য—

আমার সে কথার উত্তর দিল না সে। প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে দিয়ে বলল,—আপনি দাঁড়ান,—এই বলে দোকানে গিয়ে ঢুকল সে, তারপর আবার আমার কাছে এসে বলল চলুন কিতাব বাবু, আপনাকে আমার মাকানে লিয়ে যাই। কতোদিন পরে আপনার দেখা পেলাম। বেশীদূর যেতে হলনা, কাছেই একটা সরু গলির মধ্যে কয়েকটা সারি সারি ঘর। তারই খানদুয়েক নিয়ে থাকে জয়চাঁদ-লাল। বাইরের ঘরখানায় আমাকে বসালো। ভিতর দিকের দরজায় একটা পর্দা ঝুলছে। তার ওপাশে বোধ হয় অন্দরমহল। ভিতরে চলে গেল সে। পরক্ষণেই বাইরে এসে আমাকে বলল, আপনি বসেন কিতাববাবু, হামি জলদি আসছি,—এই কথা বলে দ্রুতপদে পথে নেমে পড়ল সে।

আমি বসে বসে ঘরের চারিদিকে চোখ বোলাচ্ছি। পিছনের পর্দাটা দুলে উঠল। পর্দাটা সরিয়ে একটি মহিলা এসে দাঁড়ালেন ঘরে, মিষ্টি কণ্ঠে বললে,—কিতাব বাবু, নমস্তে! ভালো আছেন? হাত তুলে আমায় নমস্কার জানালে সে। চিনতে পারলাম,—রত্নাবাঈ। আগের থেকে অনেক বদলে গেছে। পোষাকে-আষাকে তো বটেই, চেহারাতেও। সেদিনের সেই সালোয়ার, পাঞ্জাবী, আর ওড়নায় ঘেরা চটুল মেয়েটি আর নেই, পরিবর্ত্তে তাঁর পরণে আজ চওড়া লাল পাড় তসরের শাড়ি আলগা করে বাঁধা খোঁপার ওপর ঘোমটা দেওয়া, তার ফাঁক দিয়ে সিঁথির জলজলে সিঁদুর আমার চোখে পড়ল।

বললাম,—তুমি কেমন আছ? রত্নাবাঈ বলল, ভালো, তারপর অল্প হেসে ভাঙ্গা বাংলায় বলল, আমাদের কিছু না বোলে আপনিও তো বেণারস ছোড়লেন।

বললাম,—সত্যি, অন্যায় করেছিলাম, সেজন্য আমাকে মাফ করো। কিন্তু সেদিন গোঁফ গোঁফ করে দুজনে যা লড়াই বাধিয়েছিলে আমারতো রীতিমত ভয়ই ধরে গেলো!

আমার কথায় এবার খিল খিল করে হেসে উঠে বলল রত্নাবাঈ,—ওটাকে আপনি সত্যি সত্যি লড়াই বলে মনে করেছিলেন নাকি?

বললাম,—তবে?

রত্নাবাঈ মাটির দিকে মুখ নামিয়ে ধীরস্বরে বলল, —ঠাকুরজীর ভালোবাসা আসলি না নকলি তাই পরখ করেছিলাম! কিতাববাবু, হাজার হাজার রূপেয়া খরচ কোরে লোকে আমাদের গানা শোনে, রঙ তামাশাভি করে, কেউ কেউ প্রেম-ভালোবাসার কোথাও শোনায়! লেকিন আমি জানি, সেগুলির কোনটাই আসলি নয়, সবই ঝুটা—সবই মামুলি : ভেবেছিলাম ঠাকুরজীও বোধ-হয় আমার রূপে গানে বেহুঁস হয়ে আমার সাথে তেমনি খেলায় মেতে উঠেছেন। তাই আমি ঠাকুরজীর ভালো-বাসার পরীক্ষা নিলাম। আমি জানতাম, ঠাকুরজী তার ঐ মোচকে কতো ভালোবাসেন। বহুদিন সে কোথা তিনি আমার কাছে বোলেছিলেন। আমিও তাঁকে বোললাম যদি তিনি আমার কোথায় তাঁর ঐ অমূল্য সম্পদ ত্যাগ কোরেন তাহলে আমি বুঝবো যে তিনি সত্যিই আমাকে পেয়ার কোরেন। আমার কথায় রাজি হলেন, কিন্তু তিনিও বোললেন, তোমার কথায় আমি রাজি, তবে তোমাকেও আমার একটা কোথা রাখতে হোবে। আমি বোললাম কোন্ কোথা?

তিনি বোললেন,—তোমার কোথায় আমি আমার মোচ ফেলতে রাজি আছি। তোমাকেও বাঈজীবৃত্তি ছোড়তে হোবে বরাবরের জন্য। শাদির পর পাঁচজনার সামনে বোসে গানা গাওয়া আর চোলবে না, ওতে আমাদের বংশের মুখ পুড়বে!

কিন্তু বাবু, ঠাকুরজীর পরিবার আমাকে তাদের ঘরের বহু বোলে মেনে নেয়নি। এমনকি সম্পত্তি থেকেও ঠাকুরজী বঞ্চিত হোয়েছেন।

আমি মুজরো করা ছোড়ে দিলাম। ফলে আমার রোজগারের পথ বন্ধ হয়ে গেল। আমার যা রূপেয়া ছিল তাই নিয়ে দুজনে চোলে এলাম এই কলকাতায়। দু'কামরাওয়ালা এই ছোট বাড়িটা কিনলাম। ঠাকুরজী কাঠের দোকানে কাজ নিলেন। আমার জন্য ঠাকুরজীকে সব কুছ হারাতে হোল কিতাববাবু!

বললাম,—সব কিছুর বিনিময়েও যা পাওয়া যায় না তাই পেয়েছে ঠাকুরজী।'

রত্নাবাঈ বলল,—কি?

বললাম, তোমার মত লক্ষ্মী স্ত্রী।

বিচিত্র বিশ্ব

শ্রীপরিমল ভট্টাচার্য্য

জ্যোতিষীর অভ্রান্ত গণনা

অনেক কাণ্ড করে, নানান গলিপথ ঘুরে শেষে কালিঘাটের কালী বাড়ীতে এসে সেই বিখ্যাত জ্যোতিষীর মোটামুটি একটা হদিস পাওয়া গেল। নইলে কোথায় বেলেঘাটার শেষ প্রান্ত আর কোথায় কালিঘাটের আদিগঙ্গার তীরবর্তী বটবৃক্ষ। কন্যাদায় গ্রস্ত বৃদ্ধ তারিণী বাবু অনেক কষ্টে সেই বটবৃক্ষের গোড়া খুঁজে বার করলেন। দেখলেন খানিকটা জায়গা বেদীর মতন করে খান কয়েক ইট দিয়ে কোন রকমে বাঁধান। তারি উপরে একখানি কম্বলাসন বিছিয়ে সংসার বিবাগী এক বৃদ্ধ বসে আছেন। বয়স বোধ হয় ৮০,৮৫র উপর হবে। মাথার সব চুল একেবারে রেশমের মত সাদা। দাড়ি গোঁফ কামান। বেশ সুন্দর জ্যোতির্ময় চেহারা। মুখে মৃদু হাসি। শরীরের গঠন দীর্ঘ এবং সুগঠিত। গায়ের রং অত্যন্ত ফর্সা। দেখলেই মনে একটা ভক্তিভাব আসে।

ইনিই বিখ্যাত জ্যোতিষী, কালীচরণ বাবা, সাক্ষাৎ সরস্বতীর বরপুত্র, অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী, অভ্রান্ত নাকি এঁর ভবিষ্যৎ বাণী। কেউ কেউ বলেন সাদা কাপড় পড়ে থাকলেও ইনি নাকি গোপনে তন্ত্রসাধনা করেন।

এখনও সন্ধ্যার অন্ধকার নামেনি। অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম দিক। সনটা এখন আর ঠিকমত স্মরণ নেই, বোধ হয় ১৩৩০ হবে।

তারিণীবাবু অত্যন্ত সাত্ত্বিক এবং নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, যজমানী করে সামান্য যা কিছু আয় করেন, তাতে ঠিক মত সংসার চলে না। একটু বেশী বয়সে বিবাহ করেছিলেন, বর্তমানে সন্তান চারটি, প্রথম তিনটি কন্যা এবং শেষেরটি পুত্রসন্তান। এ ছাড়া সংসারের আর একজন বিধবা ভগ্নী আছেন, অর্থাৎ মোট পোষ্য সাতটী, তাই সংসারের চাকা ঘোরাতে তারিণীবাবু একেবারে হিমসিম খেয়ে গেছেন। এর উপর কন্যাদায়ের চিন্তা। বড় মেয়ে সুহাসিনীর বয়সই তো প্রায় বিশ পেরিয়ে একুশে গিয়ে ঠেকলো, পরের দুটিকেও এই সঙ্গে পার করতে পারলে ভাল হয়।

'ও মশাই শুনছেন, বাবা যে আপনাকে ডাকছেন'—একজন ভক্ত তারিণীবাবুর ধ্যান ভঙ্গ করে ডাকলেন।

কথাটা শুনে রীতিমত লজ্জিত হলেন তারিণীবাবু। তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে মাথা নত করে একপাশে বসলেন। অনেক আশা করে এসেছেন, কে জানে পূর্ণ হবে কিনা।

'ছক বা কুষ্টি এনেছো'—এবার প্রশ্ন করলেন খোদ কালীচরণ বাবা।

হ্যাঁ, এই যে—আমার বড় মেয়ের —কত বিয়ের সম্বন্ধ এল আর গেল, কিন্তু বিয়ের ফুল কিছুতেই ফুটলো না। দেখুন তো বাবা বিবাহ আদৌ হবে কিনা, অবিশ্যি নিজেও বুঝি মেয়ে আমার সুশ্রী নয়, রং কালো,কেই বা নেবে—পছন্দ করবে।

ততক্ষণে কুষ্টিখানা মেলে ধরেছেন কালীচরণবাবা। দৃষ্টি তাঁর স্থির ভাবে বদ্ধ হয়ে আছে জাতিকার জন্মকালীন গ্রহ সমাবেশের উপর।

তারিণীবাবু প্রশ্নের আবেগ রুদ্ধ করে কালীচরণ বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন উত্তরের আশায়। সবাই কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারিণী বাবু খুঁটের কাপড়ে চোখের চশমা খুলে বার কয়েক মুছে নিলেন। ভেতরে

ভেতরে বেশ খানিকটা অস্বস্তিবোধ করছেন, কি জানি মেয়ের সম্বন্ধে কি না কি বলে ফেলেন।

ধীরে ধীরে কন্যাদায়গ্রস্ত বাপের মুখের দিকে চোখ তুলে তাকালেন কালীচরণ বাবা। একটু হেসে বললেন —ভয়কি, হোক কালো, তবু তোমার এ মেয়ে রাজরাণী হবে। কয়েক লক্ষ টাকার মালিক হবে। গাড়ী হবে বাড়ী হবে, বিলেত ফেরৎ ইঞ্জিনীয়ার স্বামী হবে। যাও —বাড়ী গিয়ে নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমোও, সময় হলে সব কিছু ঘটনা ম্যাজিকের মত একের পর এক ঘটে যাবে আগামী আট মাসের মধ্যে। শুধু তোমার কন্যাদায় মুক্ত হতে বছর পাঁচেক দেরী হবে।

এমন তাজ্জব এবং অবিশ্বাস্য কথা শুনে তারিণীবাবু হাসবেন কি কাঁদবেন, বুঝে উঠতে পারল না। শুধু অসহায় ভাবে কালীচরণ বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

কালীচরণ বাবার কিন্তু বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে কথাগুলো দীন-দরিদ্র কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার কর্ণকুহরে অবিশ্বাসের সুরেই ধ্বনিত হচ্ছে।

যার নাকি বেলেঘাটা থেকে কালীঘাট পর্য্যন্ত আসতে আটগণ্ডা পয়সা রাহা খরচ অনেক কসরৎ করে সংগ্রহ করতে হয়েছে, তার ঘরে নাকি রাজরাণী জন্মেছে, লাখ লাখ টাকা হবে, গাড়ী হবে,বাড়ী হবে আর কত কি হবে?

তারিণীবাবুর মানসিক প্রশ্নোত্তরের জবাবে কালীচরণ বাবা তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন—'কথাটা অবিশ্বাস্য হলেও, সত্যের খাতিরে বিচারে যা পেয়েছি, তাই বলেছি। যদি জন্মসময়, সন, তারিখ—এসব ঠিক থাকে, তবে যা বলেছি আমি ফিরিয়ে নিতে পারব না।

বিস্মিত, হতভম্ব তারিণীবাবু শুষ্ক তালুর চারপাশে জিবটাকে দু'একবার ঘুরিয়ে এনে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—'সারাজীবন দুঃখ কষ্ট পেয়েছি, আপনাকে বলতে লজ্জা নেই, গোটা একটা রূপার টাকা খুব কম দিনই রোজগার হিসেবে হাতে পেয়েছি। যজমানী করে পাই, আণী, দুয়াণী, বড়জোর সিকি, এর বেশী কেউ দেয় না। আমি চাইতেও পারি না।

কালীচরণবাবা উত্তর দিলেন—সে তোর কপাল দেখেই বুঝেছি, সময়ে অসময়ে ধারে ঠোঙ্গা বানিয়ে সংসার চালাতে হয়েছে। কত দিন ঠায় উপোস করেছিস্, আর ভগবানকে ডেকেছিস্। বলনা সত্যি কিনা?

কথাটা শুনে তারিণীবাবুর চোখে জল এল। কালীচরণবাবা একেবারে সরস্বতীর সিদ্ধ বরপুত্র—সর্বজ্ঞ পুরুষ। তৃতীয় নয়নের দৃষ্টি-পথেই সব কিছু দেখতে পারেন মনে হয়।

হ্যাঁ,বাবা আপনি ঠিক বলেছেন—সব নির্ম্মম সত্য, দারিদ্র্য, অভাব, দুঃখ কষ্ট—এ সবই আমার অঙ্গ ভূষণ. ভগবানের কাছে তোদিনরাত কাঁদি। সৎপথেইতো থাকতে চেষ্টা করি, তবুও দুঃখ আমার ঘোচে না কেন?—কি আমার অপরাধ—জানি না!

কালীচরণ বাবা উত্তর করলেন কি করে জানবে—তোমার ঐ দেহ খোলটির মধ্যে সবই ছিল, একমাত্র পুরুষকার ছাড়া। তোমার ভেতর ঐটের বড় অভাব। ভাগ্যের সঙ্গে বিপুল বিক্রমে লড়তে পারছ না তাই হার মেনেছ। একবার সিংহের মত জেদ করে পুরুষকারকে কাজে লাগিয়ে দেখতো বাবা—যাও,বাড়ী যাও—আর আজ থেকে যত আনী. দুয়ানী আর সিকি পাবে—ঘরে ফেরার পথেইতা গরীব দুঃখীকে দান করে দেবে। খবরদার,কখনও ট্যাকে গুঁজে ঘরের চৌকাট ডিঙ্গোবে না। এতে উপোস করতে হয়—করবে। ভয় পাবে না। আর প্রথম যেদিন রূপোর টাকা হাতে পাবে সেই টাকাটা বাড়ী ফিরে হাত-পা ধোয়ার আগে এই মেয়ের হাতে দিয়ে বলবে যা তোকে মিষ্টি খেতে দিলুম…তারপর সে যা ভাল বোঝে তাই করবে, যাও।

'আপনি যা বললেন তাই করব আজ থেকে। শুধু দু'বেলা দু'মুটো যেন খেতে পাই।'

'ফের মেয়েলি নাকে কান্না সুরু করলে! এই না শেখালুম ভাগ্যবিধাতাকে কেমন করে জয় করতে হয়।

'হ্যাঁ, বাবা ঠিক বলেছেন। আর না—আজ থেকে আমি অন্যমানুষ হব। আপনার কথা অভ্রান্ত হলে চিরকাল আপনার কেনাদাস হয়ে থাকব।'

'উঠলি'—কালীচরণবাবা যেন তেড়ে উঠলেন। ছল ছল চোখে উঠে দাঁড়ালেন তারিণীবাবু. কি জানি কেন কোথা থেকে একটা আশার সঞ্চার হচ্ছে, মনে হচ্ছে আর এই ভিক্ষাবৃত্তি বেশীদিন করতে হবেনা।

কালীচরণবাবাই উত্তর দিলেন তারিণীবাবুর মনের কথাটার।

'বল্লামতো, তোমার দুঃখের দিন শেষ হয়েছে। মুখের ভাত খেয়েই মরবে—শুধু তোমার প্রথম নাতনীটির নাম তোমার তারিণী নামের সঙ্গে মিলিয়ে নাম রাখবে নিস্তারিণী। কারণ ঐ খোলে গিয়েই তো তোমাকে আবার ঢুকতে হবে। যা যা পালা হ্যাকা মেয়েছেলের মত আমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকিস্ নি।

কালীচরণবাবার এই ভবিষ্যৎ বাণী শুনে তারিণীবাবুর মনে অনেক প্রশ্ন একসঙ্গে ভীড় করে এল। কিন্তু তাড়িয়ে দেবার ভঙ্গী দেখে আর সাহস হল না। শুধু মুখে উত্তর দিলেন—শেষ পর্য্যন্ত যদি বাবা আপনার কথা ফলে, মেয়ে আমার রাজরাণী হয় আর ঐ বিপুল ধনসম্পত্তি লাভ করে তাহলে আমার মেয়েকে মরার আগে নিশ্চয়ই বলে যাব তার প্রথম কন্যার নাম আমার তারিণী নামের সঙ্গে মিলিয়ে নিস্তারিণী রাখতে।

কালীচরণবাবা একটু হেসে বললেন—হবেরে তোর মেয়ে রাজরানীই হবে—গত জন্মে সে রাজরানীই ছিল। এজন্মে সে তার পূর্ব-জন্মের সঞ্চিত ধন-রত্ন ফিরে পাবে—যা সে গত জন্মে ভোগ করতে পারেনি। দেখবি—আমার কথাটার প্রমাণও পাবি—তোর মেয়ের ঠিক থুতনির নিচে মধ্যিখানে একটা বড় কালো জরুল আছে না—

হাঁ্যা,—মন্ত্রমুগ্ধের মত জবাব দিলেন তারিণীবাবু।

ঐ—ঐটেই হল ওর দুই জন্মের একমাত্র যোগসূত্র, যা চোখ কান খোলা রেখে চলবি—তাহলেই সব বুঝতে পারবি। যা বাড়ী গিয়ে ক্ষ্যাপা পরিবারকে ঠাণ্ডা করগে যা।

তারিণীবাবু আর কোন উত্তর দিলেন না। পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালেন। কুষ্টিখানা পকেটে পুরে ধীরে ধীরে গলিপথ বেয়ে এগিয়ে চললেন বড় রাস্তার দিকে।

বাড়ীতে ফিরে রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর গোপনে সব কথা খুলে বললেন স্ত্রীকে। তিনি শুনেতো হেসেই খুন। বললে—ঐ জন্যেই বলি, সাধু-সন্নেসী আর মাতালদের কাছে কখনও ভর সন্ধ্যে বেলায় যেতে নেই। নানারকম নেশাভাঙ করে থাকে, ওদের কি মাথার ঠিক থাকে, কি বলেছে তার ঠিক নেই। সেই শুনে তুমি একেবারে অহ্লাদে আটখানা। মেয়ে তোমার রাজরানী হবে, তাহোক, ভাল তখন আমি না হয় পাড়ার পাঁচজনকে ডেকে জোর গলায় বলবো—আমি রাজমাতা হয়েছি।

কথাটা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই দেওয়ালে টাঙ্গান পুরনো আমলের দেওয়াল ঘড়িটার আড়াল থেকে টিকটিকিটা ডেকে উঠলো। টিক্ টিক্ টিক্ টিক্।

তারিণীবাবু যেন আদালতে নিজের সাক্ষী পেশ করলেন বললেন,—ঐ শোন—সত্যি সত্যি ফলবে কিনা?

এতে স্ত্রী সুধাময়ী দেবী আরও ক্ষেপে গেলেন। বললেন,—হাঁ্যা, তুমি ঐ টিকটিকিটার ডাকের ভরসাতেই সারাজীবন নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমোও—আর আমি সারাজীবন ঠোঙ্গা বানাই, ঘুটে দি, আর পাঁচবাড়ীর ফাই ফরমাশ খেটে তোমার সামনে ভাত বেড়ে দি।

অসহ্য জ্বালায় তারিণীবাবু মুখ ফিরিয়ে রইলেন। কিন্তু এবার আর স্থির থাকতে পারলো না সুহাসিনী—তারিণীবাবুর বড় মেয়ে। এতক্ষণ দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে বাবার সব কথা সে মন দিয়ে শুনছিল। নাইবা ফললো জ্যোতিষীর কথা। তবু বাবাকে এমন করে কটু কথা মায়ের না বললেও চলতো।

ঘরে ঢুকে সুহাসিনী বললে—মা সংসারে শুধু একা তুমি খাটনা—আমরাও সাহায্য করি। বাবাও বসে খান না, রোজগার করেন। অতএব দুঃখ করে লাভ নেই, ভাগ্যে যদি সুখ লেখা না থাকে—চীৎকার করে কি হবে মা?

বাপের হয়ে কথা বলাতে এবার মায়ের রাগ মেয়ের উপর গিয়ে পড়লো—ওরে আমার বাপসোহাগী মেয়ে, রূপের তো ঐ বাহার। বলি কোন্ রাজপুত্র জুটবে—তোর জন্যেই তো এত চিন্তা একেবারে গলায় কাঁটার মত বিঁধে আছিস্।

'আমায় এক গ্লাস জল দে মা—শুষ্ক তালু ভেজাতে মেয়ের কাছে জল চাইলেন তারিণীবাবু।

সুহাসিনী জল আনতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। শুধু যাবার আগে বলে গেল—'বেশ, বাবার কথার জের টেনেই বলছি, আটমাসের মধ্যে সত্যি যদি কোন পরিবর্ত্তন না আসে, আমি নিশ্চিত তোমাদের মুক্তি দিয়ে যাব।

সুধাময়ী দেবী এরপর আর এগোতে সাহস করলেন না। বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। তারিণীবাবু হ্যারিকেনের আলোটা একটু উজ্জল করে দিয়ে দেওয়ালের টিক্‌টিকিটার দিকে একদৃষ্ট তাকিয়ে রইলেন।

রাত্রি প্রভাত হতেই সুরু হল তারিণীবাবুর জীবনের ভাগ্য আর পুরুষকারের লড়াই। চাল-কলা, ফলফলাদি যা পান সবই গামছায় বেঁধে নিয়ে আসেন। আনেন না শুধু নগদ কড়ি—অর্থাৎ আনী, দুয়ানী আর সিকিগুলো রাস্তার গরীব-দুঃখী ছেলেমেয়েদের হাতে দিয়ে আসেন। বাড়ী ফিরে প্রতিদিনই প্রতি মুহূর্ত্তেই আশঙ্কা করেন স্ত্রী সুধাময়ীর মুখে বোমা ফাটার। কিন্তু আশ্চর্য্য একদিনও একটু টুঁ শব্দটী পর্য্যন্ত হলনা। যাক—অনেকটা স্বস্তিবোধ করলেন তারিণীবাবু। দিনগুলো একরকম করে কাটছিলও মন্দনা। কিন্তু রহস্যটা উদ্‌ঘাটিত হল ঠিক একুশ দিনের মাথায়। গামছায় বাঁধা নৈবেদ্যর বোঝাটা বারান্দার উপর নামিয়ে রেখে পা ধুতে যাচ্ছিলেন কলতলার দিকে। এমন সময় ঘরের ভেতর থেকে বড় মেয়ে সুহাসিনী হাতের ইসারায় বাবাকে কাছে ডাকলো। ঘনীভূত বিপদের আশঙ্কা করে বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠলো তারিণীবাবুর। সুধাময়ী দেবী রান্নাঘরে টুকিটাকি কাজে ব্যস্ত ছিলেন টের পাননি। কাছে এসে দাঁড়াতেই সুহাসিনী মুখ টিপে হেসে বললো—বাবা, তুমি যেন মাকে বলে দিওনা যে দক্ষিণার পয়সাগুলো রাস্তায় গরীব দুঃখীদের রোজ বিলেয়ে দিয়ে আস—তাহলে আর মা তোমায় আস্ত রাখবেনা।

তারিণীবাবু বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন—তাহলে এতদিন গোটা আছি কি করে? দক্ষিণার পয়সা সেতো একদিনও হাতে পায়নি।

কে বললে? আমার জমান পয়সা থেকে রোজ কিছু কিছু পয়সা নিয়ে আমি নৈবেদ্যর মধ্যে চুকিয়েদিতাম। কিন্তু বাবা আজ আর আমার হাতে কোন পয়সা নেই। প্রায় ৬।৭ টাকা জমিয়ে ছিলাম, সব ফুরিয়ে গেছে। কাল সকালেই কিছু ধার পাব ব্যবস্থা করেছি। তুমি মাকে বলবে যে দক্ষিণের পয়সাটা একজনকে ধার দিয়েছো সে সকালেই ফেরত দিব।

কথাটা শেষ করে সুহাসিনী বাপের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগলো।

কিন্তু সুহাসিনীর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে পারলেন না তারিণীবাবু, চোখে জল নেমে এল। মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—ভগবান দিন দিলে, তোর কাছেই যেন সন্তান হয়ে ফিরে আসি মা। জ্যোতিষী বাবার কথাই যেন ফলে।

সুহাসিনী লজ্জায় ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, তারিণীবাবু সস্নেহে কাছে ডেকে বললেন—না মা, আজ আর ছেলের জন্যে মাকে দুঃশ্চিন্তা করতে হবে না। নে মা,—আজ আবার অনেকদিন পরে একটা গোটা রূপোর টাকা পেয়েছি দক্ষিণা হিসেবে। তুই রাখ, মিষ্টি খাস। বাপ হয়ে কোনদিনতো তোদের হাতে একটি কানাকড়িও দিতে পারিনি।

বিস্মিত হয়ে সুহাসিনী বাপের মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো গোটা একটা টাকা পেয়েছ বাবা? দাও এর থেকে চার আনা খরচ করে একটা লটারীর টিকিট কিনবো, তুমি কিন্তু বকতে পারবেনা। আজই সকালে বরানগরের ভূপেনকাকা এসে জোর করে একখানা টিকিট গছিয়ে গেছে।

নিশ্চয়ই, এটা তোর টাকা মা, যা ভাল বুঝবি করবি। আমায় একটু তামাক সেজে দে মা, হাত পা ধুয়ে আসি। কথাটা শেষ করে তারিণীবাবু কলতলার দিকে এগিয়ে গেলেন।

সুহাসিনীর হাতের তালুতে তখনও রূপার টাকাটা দিব্যি চক চক করছে।

এরপর মাস দুই পরের ঘটনা, ডাকে একখানা চিঠি এল বড় মেয়ে সুহাসিনীর নামে। হাজার দুঃখ কষ্টের মধ্যেও সুহাসিনী কিন্তু পড়া ছাড়েনি। দশম শ্রেণীতে পড়ে, একটা পাশ করে যাতে বাবাকে কিছুটা অন্ততঃ সাহায্য করতে পারে, সেই সাধনাতেই সুহাসিনী মেতে ছিল। মাঝে মাঝে সবাইকে আড়াল দিয়ে দু'একখানা দরখাস্তও করত এদিকে ওদিকে, কি জানি যদি বেড়ালের ভাগ্যে সিকে ছেঁড়ে কখন।

চিঠিখানা খুলে বার বার পড়তে লাগলো সুহাসিনী,

কিছুতেই যেন বিশ্বাস হচ্ছেনা। গায়ে জ্বর নিয়ে ঘরের ভেতর শুয়েছিলেন তারিণীবাবু। দু'একবার অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞেস করলেন কে চিঠি দিয়েছেরে খুকী—তোর হারাণ-মামা?—নাকি বর্দ্ধমান থেকে তোর কৈলাসখুড়ো? পুরী থেকে তোর শেফালিমাসী লিখেছে বুঝি? কিরে, উত্তর দিচ্ছিসনা কেন—কোন খারাপ খবর নাকি?

ঘরের ভেতর ছুটে এল মেয়ে বাপের কাছে। চিঠি-খানা মুখের সামনে তুলে ধরে বললো—না বাবা, ওসব কিছুনা, চার আনার লটারীর টিকিটে আমি দশহাজার টাকা পেয়েছি বাবা, দ্বিতীয় পুরস্কার, ভাল করে পড়তো বাবা, ঠিক যেন বিশ্বাস করতে পারছিনা। কোন ভুল ভ্রান্তি হয়নি তো?

এঁ্যা—বলে দশ দিনের জ্বরে ভোগা, পথ্যহীন দুর্বল শরীরটাকে মুহূর্ত্তের মধ্যে সোজা করে বিছানার উপর একলাফে উঠে বসলেন তারিণীবাবু। চিঠিখানার প্রতিটি শব্দ দু'বার করে উচ্চারণ করে পড়তে লাগলেন।

হ্যাঁ, সত্যিইতো, সুহাসিনীর নামে দশহাজার টাকা উঠেছে। টিকিটটা যথাশীঘ্র জমা দিতে বলেছে। জয় বাবা জ্যোতিষীবাবার জয়। তোর মাকে এখানে ডাক, ওর নাকে আমি ঝামা ঘষে দেব—বলে কিনা জ্যোতিষীর বাক্য ফলবেনা।

চোখজোড়া উজ্জল হয়ে উঠল তারিণীবাবুর। উত্তে-জনায় দুর্বলতায় সর্বঅঙ্গ তার কাঁপতে লাগলো।

'একটু জল দে মা—মাথাটা কেমন ঘুরছে, সুহাসিনী ব্যস্ত হয়ে পড়লো—তুমি শুয়ে পড় বাবা, আমি এখুনি জল আনছি। আর আমাদের দুঃখ করতে হবে না। সবাই খেয়ে পড়ে বাঁচবো। কারও বাড়ীতে আর হাত পাততে হবে না। তুমি সুস্থ হলে চল বাবা কালীঘাটের সেই বিখ্যাত জ্যোতিষীকে একবার স্বচক্ষে দেখে আসি।

তারিণীবাবু চোখ বুজে বললেন—তাত যাবই মা, তাঁর কথা ধীরে ধীরে ফলতে আরম্ভ করেছে। বাকিগুলোও নিশ্চয়ই ফলবে। তাঁকে প্রণাম করে আসবো। মেয়ে আমার লাখপতি না হোক হাজারপতি তো হয়েছে। রাজপুত্র নাহোক সুপুত্র দেখেও তো বিয়ে দিতে পারবো আজ।

তারিণীবাবু যেন চোখজোড়া বন্ধ রেখেও সেই আদি গঙ্গার তীরবর্ত্তী বটগাছের নীচে বসে থাকা কালীচরণ-বাবাকে দেখতে পাচ্ছেন—একেবারে স্পষ্ট মুখ, তা'তে স্বর্গীয় হাসি ছড়ানো।

এরপর আরও মাসখানেক কেটে গেল পুরস্কারের টাকাটা হাতে এসে পৌছুতে। অর্থাৎ প্রায় মাস চারেকের মধ্যে সুহাসিনীদের সংসারের কিছুটা দুঃখ কষ্ট ঘুচলো। জানিনা এর পরে ঘটনার স্রোত কোনদিকে বইচে। তবে তারিণীবাবু এঁচে রেখেছেন। এই টাকার মোটা অংশটি দিয়ে ছোটখাট একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই করবেন। আর বাকিটা দিয়ে ব্যবসা। যাই হোক কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ—সবই কালীচরণ বাবার ইচ্ছায় হবে।

টাকাটা হাতে পাওয়ার তিনদিনের মধ্যেই পাঁচশো টাকা হাতে নিয়ে বাপ আর মেয়ে একদিন সন্ধ্যায় সেই আদিগঙ্গার তীরে বটগাছের নিচে গিয়ে দাঁড়াল। কালী-চরণবাবা বসে ছিলেন চোখ বুজে। সেদিন ভক্তের সংখ্যা একটু কম ছিল। নোট পাঁচখানা পায়ের কাছে রেখে মাথা নত করে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলো সুহাসিনী বাবার নির্দ্দেশ মত।

চোখ খুলে দুজনকে দেখে মৃদু হাসলেন বাবা। সুহাসিনীর মুখের দিকে কয়েক মূহূর্ত্ত তাকিয়ে থেকে বললেন—হ্যাঁ, জন্ম সময়, সন, তারিখ—সবই ঠিক আছে। হুবহু মিলছে। সবই ফেরত পাবি মা, কিছুই নষ্ট হয়নি।

পরে টাকাগুলোর দিকে তাকিয়ে বললেন—আমাকে দিয়ে কি হবে মা—তার চেয়ে আর একদিন সকালে আসিস, এই গঙ্গাতীরে নিজে হাতে খিচুড়ী রেঁধে সামনের ঐ বস্তিটার সবাইকে পেট ভরে খাওয়াবি। খবরদার এঁটো পাতা কারুকে ফেলতে দিবিনা। নিজে হাতে ফেলবি। তাহলে গতজন্মের পাপের দরুণ যেটুকু প্রায়শ্চিত্ত বাকি আছে, তাড়াতাড়ি শেষ হবে। নে টাকা তুলে রাখ মা। যা বাড়ী যা। সুখী হবি।

প্রস্তাবটা শুনে সুহাসিনী উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। জিজ্ঞেস করলো—তাহলে বাবা কবে আসবো, আপনি আদেশ করুন।

মা হয়ে ছেলেদের খাওয়াবি, এতে আর দেরী ক—কাল সকালেই আয়।

তাই হবে—কালই সকালে আসবো। শুভ কাজে রী করতে নেই।

আনন্দিত চিত্তে বাপ আর মেয়ে জ্যোতিষী বাবাকে ণাম করে উঠে দাঁড়াল এবং ধীরে ধীরে পা বাড়াল লি পথ ধরে বড় রাস্তার দিকে।

এরপর নির্দ্দিষ্ট দিনে দরিদ্র নারায়ণ সেবা ভাল বেই মিটে গেল। লোকও হোল প্রচুর। কালীচরণ-বা ও তার ভক্ত শিষ্যরা সবাই প্রসাদ পেলেন াদরে।

আরও মাসখানেক পরে তারিণীবাবুর বিধবা ভগ্নী তিবেশীদের সঙ্গে কাশীধামে বেড়াতে গিয়ে এক সুখবর য়ে এলেন যে সেখানে নাকি বাঙ্গালীটোলায় খুব সস্তায় কখানা পুরনো ছোটখাটো বাড়ী বিক্রী আছে। দাম াত্র ৬০০০৲ টাকা। বাড়ী দেখে পছন্দ হলে কলকাতায় সেই কেনাকাটা চলতে পারবে।

বাপ আর মেয়ে আবার ছুটলেন কালীঘাট—কালী-রণ বাবার পদপ্রান্তে। গিয়ে শুনলেন বাবাও নাকি বিশ্বনাথ দর্শনের অভিপ্রায়ে দিনকয়েক আগে সশিষ্য াশী রওনা হয়ে গেছেন।

ভারী আশ্চর্য্য লাগলো তারিণীবাবুর। ইঙ্গিতটা ন একেবারে ঝেড়ে ফেলার মত নয়।

বাড়ী ফিরেই পরামর্শ করে কাশী রওনা হলেন নে। বাড়ী দেখে পছন্দ করে ফিরে এলেন, কিন্তু নেক খোঁজাখুঁজি করেও কাশীতে কালীচরণবাবার কান হদিশ করতে পারলেন না। মোটামুটি একটি ভদিন দেখে বাড়ী কেনাও হয়ে গেল ক্রমে কথাটা নে গেল প্রতিবেশীদের। তারাও নানান কথা বলে ত্যক্ত করতে লাগলেন তারিণীবাবুকে।

শেষে সত্যি সত্যিই একদিন কলকাতায় বাস বার বাসনা ত্যাগ করে কাশীবাসী হওয়ার সঙ্কল্প করে লেন তারিণীবাবু। বেলেঘাটার বাসা ছেড়ে দিয়ে পরিবারে চলে গেলেন কাশী।

কালীচরণবাবার কথামত আটমাসের মধ্যে ছ'মাস কেটে গেল তারিণীবাবুর সপরিবারে কাশীবাসী হতে—অবিশ্যি সত্যি কথা বলতে গেলে এখন পর্য্যন্ত সব কিছু ম্যাজিকের মতই ঘটে গেছে বলতে হয়।

কিন্তু সব চাইতে বড় ম্যাজিক বোধহয় অপেক্ষা করছিল এরপর, যেটা সুহাসিনীর জীবনের সব চাইতে রোমাঞ্চকর অধ্যায়।

কালীচরণবাবার কথামত সুহাসিনীর লাখপতি হওয়ার যোগের আটমাসের মধ্যে যখন আর মাত্র দিন ৫।৭ বাকি, ঠিক সেই সময়ে, কোজাগরী লক্ষ্মী পূজার দিন সকালে সুহাসিনী বাজার থেকে এক লক্ষ্মী প্রতিমা কিনে এনে হাজির।

বাবাকে ডেকে বললো—জান বাবা, সেই তোমার দেওয়া একটা রূপার টাকার মধ্যে এক সিকি খরচ করে একটা লটারীর টিকিট কিনেছিলুম। আর যে বাকি বারো আনা আমার কাছে ছিল, তাই দিয়ে আজ এই লক্ষ্মী প্রতিমাটি কিনে এনেছি। ভাল করে পূজা করবে বাবা।

তারিণীবাবুও অত্যন্ত উৎসাহিত হলেন, স্ত্রীকে ডেকে সব আয়োজন করতে বললেন। দিব্যি ধুমধাম করে পূজা হয়ে গেল। কিন্তু তার পরদিন বিসর্জনের পর প্রতি-মাটিকে স্থায়ী ভাবে রাখার জায়গা নিয়ে সমস্যা বাধলো। শয়নের ঘর মাত্র দু'খানি। তাও জীর্ণদশাপ্রাপ্ত, যেখান-সেখান থেকে যখন-তখন চুনবালি খসে পড়ে। চৌকো চৌকো পাথরের টালী আলগা হয়ে যায়।

তারিণীবাবু এখন এক-এক সময় ভাবেন, না কিনলেই ভাল হত। এত পুরনো যে আগাগোড়াই রীতিমত সংস্কার করা দরকার। তাছাড়া স্থানীয়লোকের কাছে দু'চারদিন হল জানতে পেরেছেন—এটা নাকি বহুবছর আগে আসলে এক বিখ্যাত বাইজীর বাড়ী ছিল। কোন এক রাজা দানস্বরূপ বাড়ীটি সেই বাইজীকে দেয়। কথাটা শোনার পর থেকে তারিণীবাবু কেমন যেন একটা অস্বস্তিবোধ করছেন।

মেয়েকে ডেকে বললেন—ঠিক আছে, অন্য কোন জায়গা তোর পছন্দ না হলে তোর ঘরের কুলুঙ্গীটা পরিষ্কার করে সেখানে মাকে সাজিয়ে রাখ।

সুহাসিনী দ্বিগুণ উৎসাহে কুলুঙ্গী পরিষ্কার করতে লেগে গেল। আশ্চর্য্য যতবার ভেতরটা ভাল করে ঝেড়ে

পরিষ্কার করে ততবার আবার ভেতরে চুনবালি ঝরে পড়ে। শেষে রেগে গিয়ে নিজেই দু'হাত দিয়ে চুনবালির আলগা আস্তরটাকে ভেঙ্গে ফেলতে লাগলো। ঠিক এমনি সময় হঠাৎ একটি অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটলো।

ভেতর দিকের একখানা পাথরের টালী পাশে কাত হয়ে পড়তেই চোখে পড়লো একটি লোহার সিন্দুকের শক্ত হাতল। সুহাসিনী সভয়ে দু'হাত পিছিয়ে এল।

দিনের বেলায় কেমন যেন গা ছমছম করে ভয় করতে লাগলো। চীৎকার করে পাশের ঘর থেকে বাবাকে ডেকে এনে দেখাল। তারিণীবাবুও ভয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগলেন হাতল দেখে। ভগবান জানেন ওর ভেতর কি আছে। তিনি শুনেছেন কতরকম অপদেবতা নাকি ভর করে থাকেন নানান অবাঞ্ছিত টাকা পয়সা তবু কালীচরণবাবার ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ করে ঘরের দরজা-জানলা সব বন্ধ করে দিনের বেলায় ঘরের ভেতর আলো জালিয়ে সেই হাতল ধরে বাপ আর মেয়ে—দুজনে মিলে প্রাণপণ শক্তিতে টান দিলেন। মুহূর্ত্তের মধ্যে জীর্ণ সিন্দুকের ডালা খুলে মাটিতে গড়িয়ে পড়লো পুরনো আমলের সহস্র সহস্র সোনার মোহর আর নানান মূল্যবান মণিমুক্তা বসান জড়োয়া গহনা—কত ভরি হবে কে জানে?

বিস্ময়ে, আনন্দে, উত্তেজনায় দিশেহারা হয়ে গেলেন দুজনে। কালীচরণবাবার ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলেছে। এতসোনা, গহনা, টাকা, ধনরত্ন—সিন্দুকের ভেতর থেকে সব একে একে বাইরে বার করে আনলেন তারিণীবাবু আর সুহাসিনী। সব শেষে বের হল সর্বশেষ বিস্ময়ের বস্তু—অতি জীর্ণ একখানি ফটো।

সুহাসিনী অবাক বিস্ময়ে ফটোখানি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলো, ফটোটী একজন সুন্দরী বাইজীর তবে রং চটে কিছু কিছু জায়গা অস্পষ্ট এবং বিবর্ণ হয়ে গেছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এই বাইজীরও মুখে, ঠিক থুতনির নিচে মধ্যি-খানে একটা বড় কালো জড়ুল রয়েছে।

ফটোখানা হাতে নিয়ে সুহাসিনী কাঁপতে লাগলো থর থর করে। কেবলি তার মনে হতে লাগলো এই বাইজীর মুখখানা তার অনেক কালের চেনা—হয়তো বা চিরকালের হবে। তাহলে কি কালীচরণবাবার কথাই ঠিক, আগের জন্মে সে এই বাইজী ছিল? আর কিছু ভাবতে পারলোনা সুহাসিনী। মাথা ঘুড়ে বাবার বুকের মধ্যে অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য অজ্ঞান হয়ে রইল।

আমার এই সত্য কাহিনীটির যবনিকাপাত এখানেই ঘটলো। শুধু শেষ কথাটা জানিয়ে রাখি একটি গরীব মেধাবী যুবককে নিজেদের টাকায় বিলেত থেকে ইঞ্জি-নীয়ারিং পাশ করিয়ে এনে সুহাসিনীর সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন তারিণীবাবু।

অবিশ্যি এর জন্য বাস্তবিকই পাঁচ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

বিবাহের কিছুদিন পরেই তারিণীবাবু সজ্ঞানে দেহ ত্যাগ করেন।

যথাসময়ে সুহাসিনী একটি কন্যা সন্তান প্রসব করে।

পিতার আদেশ মত সুহাসিনী তার নাম রাখে নিস্তারিণী।

তবে শেষ পর্য্যন্ত তারিণীই নিস্তারিণীর চরিত্রে ধরা-ধামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন কিনা বলতে পারবো না।

কেরলের নূতন মন্ত্রী—

গত কয়েক বৎসর কেরলে শ্রীনাম্বুদ্রিপাদের মুখ্যমন্ত্রীত্বে বাম কমিউনিষ্ট মন্ত্রীসভা চলিতেছিল। মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে নানারূপ অভিযোগ হওয়ায় কয়েকজন মন্ত্রী পদত্যাগ করেন ও মন্ত্রীসভা ভাঙ্গিয়া যায়। সম্প্রতি ডান-কমিউনিষ্ট দল কংগ্রেস দলের সহিত এক যোগে কেরলে নূতন মন্ত্রীসভা গঠন করিয়াছেন। শ্রীঅচ্যুত মেনন নূতন মুখ্যমন্ত্রী হইয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

পাঞ্জাবে রাজধানী লইয়া বিবাদ—

পুরাতন পাঞ্জাব প্রদেশের একটা অংশ পাকিস্থানে পড়িয়াছে। বাকী অংশটি ভাগ হইয়া দুইটি রাজ্য হইয়াছে। একটির নাম পাঞ্জাব দ্বিতীয়টি হরিয়ানা। চণ্ডীগড়ে যে নূতন রাজধানী কয়েক কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হইয়াছে তাহা কে পাইবে তাহা লইয়া পাঞ্জাবের শিখেরা অনশন করিতেছে। চণ্ডীগড হরিয়ানা এলাকার মধ্যে পড়িয়াছে। ঐ সমস্যা সমাধানের ভার প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। এখনও পর্যান্ত কোন মীমাংসা হয় নাই।

গুজরাটে দাঙ্গা-হাঙ্গামা—

গুজরাট রাজ্যে সমুদ্রতীরের স্থানগুলিতে ভীষণ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইয়া প্রায় একলক্ষ লোক মারা গিয়াছে। তাহা থামাইবার জন্য ভূতপূর্ব উপ-প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই রাজকোট যাইয়া কয়েকদিন অনশন করেন। গুজরাটের রাজ্যপাল শ্রীমণ নারায়ণ বিশেষ চেষ্টা করিয়া অল্পদিনের মধ্যে দাঙ্গা থামাইয়াছেন। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীহীতেন্দ্র দেশাইও রাজ্যপালকে একার্য্যে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাদের আমন্ত্রণে সীমান্তগান্ধী খান্ আবদুল গফুর খাঁন গুজরাটে যাইয়া কয়েকদিন গ্রামে গ্রামে সভা করিয়া শান্তির বাণী প্রচার করিয়াছিলেন। তাহার ফলে উত্তেজিত মুসলমান-সম্প্রদায় কতকটা শান্ত রহিয়াছে।

বিহারে মন্ত্রী সভা গঠনে সংকট—

বিহাররাজ্যে কংগ্রেসী নেতা শ্রীহরিহর প্রসাদ সিং-এর নেতৃত্বে যে মন্ত্রীসভা ছিল তাহা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় তথায় রাষ্ট্রপতির শাসন চলিতেছে। রাজ্যপাল শ্রীনিত্যানন্দ কানুনগো বিহারে শাসন কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন। শ্রীহরিহর প্রসাদ আবার কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠনের আয়োজন করিয়াছেন, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত সফল হন নাই। বিহারে কংগ্রেসীদের অধিকাংশ শ্রীমতী ইন্দিরা-গান্ধীর অনুরক্ত। কাজেই মনে হয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সভার বিপদ কাটিয়া গেলেই বিহারেও কংগেসী মন্ত্রীসভা গঠিত হইবে।

অন্ধ্ররাজ্যে অসন্তোষ—

দক্ষিণভারতের কয়েকটি স্থান লইয়া বর্ত্তমানের যে অন্ধ্রপ্রদেশ গঠিত হইয়াছে সেখানেও একদল অধিবাসী ভাষার ভিত্তিতে রাজ্যকে দুইভাগে ভাগ করিবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন। গত অক্টোবরমাসে কয়েকদিন বর্ত্তমানব্যবস্থার বিরোধীরা রাজ্যের বহু স্থানে নানা প্রকার অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অশান্তি কমিয়া গেলেও একেবারে দূর হয় নাই। বর্ত্তমান মুখ্যমন্ত্রী কড়া শাসনে দেশের শান্তি স্থাপনের ব্যবস্থা করিতেছেন।

অন্ধ্রে ভীষণ ঝড়বৃষ্টি—

অন্ধ্রপ্রদেশের সমুদ্রতীরস্থ কয়েকটি জেলায় গত ৭ই নভেম্বর ভীষণ বড় বৃষ্টির ফলে বহু লোক মারা গিয়াছে, অনেকগুলি গ্রাম জলে ডুবিয়া

গিয়াছে ও কত ক্ষতি হইয়াছে তাহা সত্বর স্থির করা যাইবেনা। শস্যক্ষেত্র নষ্ট হওয়ায় দশকোটি টাকা মূল্যের খাদ্যশস্য ডুবিয়া গিয়াছে, তাহা ছাড়া রেল, ঘরবাড়ী, পথ, বিজলীর তার ও পোষ্ট প্রভৃতি নষ্ট হওয়ায় কয়েক কোটি টাকার ক্ষতি হইবে বলিয়া মনে হইতেছে।

কলকাতায় জলাভাব—

হঠাৎ টালার পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা অচল হইয়া যাওয়ায় ২৫শে ও ২৬শে অক্টোবর সারা কোলকাতা শহরকে দারুণ জলকষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে। গঙ্গানদী হইতে যাহারা দু-এক মাইল দূরত্বের মধ্যে বাস করে তাহারা প্রায় সকলেই বাধ্য হইয়া গঙ্গা স্নান করিয়াছে। শহরে এখন বহু সরকারী ও বেসরকারী নলকূপ হওয়ায় প্রত্যেক অধিবাসী নলকূপ হইতে জল সরবরাহ করিয়া পানীয় জল ও রন্ধনের জলের ব্যবস্থা করিয়াছে। কলিকাতা কর্পোরেশনের কর্ম্মকর্ত্তাগণ অবশ্য বিপন্ন অধিবাসীদের জল-সরবরাহের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছে। যাহা হউক তৃতীয় দিনে জলসরববাহ ব্যবস্থা আবার ঠিক হওয়ায় লোক নিশ্চিন্ত হইয়াছে।

দুর্গাপূজা ও কালীপূজা

১৩৭৬ সালে কলিকাতা শহর ও শহরতলীতে দুর্গাপূজার সংখ্যা বেশ বাড়িয়াছিল। কালীপূজার সংখ্যা আবার তাহা অপেক্ষা অধিক বাড়িয়াছে। এত সংখ্যক অধিক কালীপূজা পূর্বে শহরবাসীরা আর কখন দেখে নাই। দুর্গাপূজার সময় ইলেকট্রিক কোম্পানী খুব বেশী আলোর ব্যবস্থা করিয়া সারা সহরটিকে রাত্রি কালে দিনের মত উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিলেন।

কালীপূজায় আলোকসজ্জা আরও অধিক এবং নূতন ধরণের হইয়াছিল। সর্বত্র কালী-পূজার মণ্ডপগুলি ভারতের নানাস্থানের দেবমন্দিরের অনুকরণে নির্মিত হইয়া মানুষের ভীড় আকর্ষণ করিয়াছে। দুঃখের কথা এত কালীপূজা, কিন্তু কোথাওই প্রায় প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা দেখা যায় নাই।

সাগরপারের ধ্রুপদী চলচ্চিত্র

শ্রীনরেশচন্দ্র বসু

জার্মানী ১৯২৭

"ইঁটের পর ইঁট তার মাঝে মানুষ কীট"—কবির এই দুঃখ, বেদনা মানুষের মনে সাড়া জাগায় না, "অটল হয়ে বসে আছে, ইঁটের আসন পাতা"। এবং "শীত বসন্ত সমানভাবে করে ঋতুযাপন"। চোখের সামনে চলচ্চিত্রের ছবির মত শ্যামল প্রান্তর শূন্যে মিলিয়ে যায়, আর তার জায়গায় গড়ে উঠে বড় বড় কল-কারখানা, বড় বড় প্রাসাদ। মানুষ হয়ে পড়ে কলের হাতে পুতুল, হারিয়ে ফেলে তার আপন সত্বা।

শিল্পে ব্যবসা বাণিজ্যে ধর্ম ও সংস্কৃতিতে নূতন চিন্তাধারার প্রবর্ত্তনে জার্মানী পৃথিবীর অন্যান্য জাতি অপেক্ষা বহু অগ্রসর। আজও জার্মানীর "The Bavarian film city of Geiselgastiz forms are of the largest blocks oi studios in Europe. ধর্মক্ষেত্রে মার্টিন লুথার, সমাজতত্ত্ববিদ কার্ল মার্কস্, এঞ্জেলস্ দর্শনে হেগেল প্রভৃতি মনীষিগণ পৃথিবীর সংস্কৃতিক্ষেত্রে আপন আপন প্রতিভায় দীপ্যমান। একটি নূতন বলিষ্ঠ সমাজ গঠনে তার ভূমিকা, যাহা ভাল কি মন্দ তর্কের বিষয় হ'লেও দূরদৃষ্টিতার যে পরিচায়ক তাহাতে সন্দেহ নাই। ইতিহাসের দৃষ্টিতে ও শিল্প-গত বিচারের ক্ষেত্রে চলচ্চিত্রেরও যে একটি নিজস্ব আসন আছে, তাহা অস্বীকার করা যায়না। জার্ম্মানীর চিত্র প্রযোজকদের নূতন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করবার যে প্রবণতা তা মানুষের চিন্তা-ধারাকে যান্ত্রিক করে তোলবার পক্ষপাতী। ক্যামেরা, যা দিয়ে চলচ্চিত্র তোলা হয়, তার অগ্র-গতির ক্ষেত্রেও জার্মানীর দান অনস্বীকার্য্য। মারনৌ (Murnau) যিনি "ডলি সট"কে পরি-পূর্ণতা দিয়েছিলেন, তিনি ক্যামেরাও যে মানুষের মত গতিশীল তার নিদর্শন দিলেন। ১৯২২ খ্রীঃ Karel Capek মানুষের মত কাজ করতে পারে এমন স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের ব্যবহার দেখালেন। যাদু-বিদ্যার দ্বারা মৃতকে বাঁচানো বা ফ্রাঙ্কেষ্টাইনের মত কবরের মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চার অথবা প্রস্তরবৎ মূর্ত্তিকে প্রাণবন্ত করার মত কিছু না থাকলেও, মানুষের ন্যায় স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে এঁর দান অপরিসীম। "Matropolis"এ রক্ত মাংসে গড়া কারখানার শ্রমিক যন্ত্রের দাস হয়ে পড়েছে এবং ডাঃ ক্যালীগরীর মত যেন কারুর দ্বারা চালিত হচ্ছে।

১৯১৪-১৮ খৃষ্টাব্দের মহাযুদ্ধের পর জার্মানীর অর্থনৈতিক অবস্থা দ্রুতগতিতে পূর্বাবস্থায় ফিরে আসছিল। Fritz Larz এর "Metopolis" মহা-যুদ্ধের মধ্যবর্ত্তীকালীন ঘটনার উপকথা, শিল্প ব্যবসা বাণিজ্যের মন্দাবস্থা দূরীভূত হয়ে আলাদিনের প্রদীপের ন্যায় আশ্চর্যভাবে পূর্বাবস্থায় ফিরে আসার পথপ্রদর্শক। সূত্রটি মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে মিলনের এক নূতন ঐকতান। Tycoon (জাপানের ভূতপূর্ব সেনাপতিকে বলা হলেও এখানে বিশেষ অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে) জানতেন জাল মারিয়া (Maria) কে তৈরী করেছে। একটা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র স্ত্রীলোকের মূর্ত্তিতে (ধনতন্ত্রের প্রতীক) আসল মারিয়াকে (শ্রমিকের প্রতীক) কাজে বাধা দিতে বদ্ধপরিকর। আসল মারিয়া দরিদ্র, শোষিত, জনগণের বন্ধু। বর্ত্তমান জগতের কাজ, দারিদ্র্য, বিলাসিতা, খেলা, বিশ্রাম সবই এখানে রূপকারে পরিবেশিত। বহিরাবরণে মেট্রোপলিস্এর সঙ্গে Brughels-এর Tower of Babel-এর সাদৃশ্য আছে। বহুতল বিশিষ্ট প্রাসাদগুলি আজকের সহরে দিনের পর দিন মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। এই প্রাসাদ যেমন

সত্য, সবুজের বিলুপ্তিও তেমনিই সত্যএবং শ্রমিকের দুঃখ দুর্দশা এখানে গোপন করা হয়েছে কারণ 'যে বস্তু আসবে, তার কোন নির্দেশ এখানে নেই, উপরন্তু অর্থনৈতিক অব্যবস্থা জার্মানীর উপরিভাগেও দানা পাকিয়ে উঠছিল।

হিটলার ও তাঁর প্রচারমন্ত্রী গোয়েবলস্ "মেট্রোপলিস" দেখেছিলেন এবং ক্ষমতাসীন হয়েই হিটলারের নির্দেশে গোয়েবলস্ Larzএর কাছে লোক পাঠিয়েছিলেন এবং সরকারের তথ্য চিত্র তোলবার জন্য তাঁকে প্রস্তাব দেওয়া হয়। এর কারণ এই নয় যে যন্ত্রপুরীর শাসন ব্যবস্থা তিনি নিখুঁতভাবে দেখাতে পেরেছিলেন. উপরন্তু এই ব্যবস্থা মানুষের অধিকারে কিভাবে রূপান্তর ঘটাতে পারে তার নিদর্শনও দিয়েছিলেন।

Freder মেট্রোপলিসের ঐশী শক্তি সম্পন্ন নায়ক যিনি শিল্পপতির পুত্র, তিনি দরিদ্রের বন্ধু-মারিয়াকে ভাল বেসেছিলেন এবং পিতার বিরুদ্ধাচরণ করে শ্রমিকদের পক্ষে বিদ্রোহে যোগদান করেছিলেন। শিল্পপতি মারিয়ার এক গোপন বৈঠক উপস্থিত থেকে নকল স্বয়ংক্রিয় মারিয়াকে নিয়োগ করে শ্রমিকদের মধ্যে ভাঙ্গনের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সে ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছিল। মারিয়া ও ফ্রেডারের মধ্যে ভালবাসা Tycoonকে সম্মতিদানে বাধ্য করেছিল এবং কারখানার ফোরম্যানের সঙ্গে নাটকীয়ভাবে তিনি বন্ধুত্ব অর্জন করেছিলেন।

হিটলারের সরকার ল্যাংএর ছবিগুলিকে প্রচার কার্য্যের নূতনতম দিগ নির্দেশক বলে গণ্য করেন। কিন্তু কি সেই দিগনির্দেশক ? এই চিত্রের নাটকীয় প্রসাদগুণ আজ আর নেই।

কিন্তু মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে জনগণের সঙ্গে এর যোগাযোগ ছিল না বলেই একে অবজ্ঞা করা যায় কি ?

পরবর্ত্তী যুগের ইতিহাসে এই চিত্রের পদধ্বনি কি শুনতে পাওয়া যায়নি ? উদয় শঙ্করের 'কল্পনা'য় যন্ত্র ও শ্রমিকের যে সংঘাত, তাঁর যান্ত্রর উপর বিখ্যাত নৃত্যগুলি কি এর ওপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছিল ? ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র মালিক ও শ্রমিকের বিরোধের সর্বপ্রথম চিত্র হিসাবে Fritz Larzএর 'Metropolis' চলচ্চিত্রের ইতিহাসে আপন প্রতিভায় চির ভাস্বর থাকবে।

প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন—নীপা চৌধুরী

আবুল হায়াৎ—মুর্শিদাবাদ

দেশের বন্যাপীড়িত অঞ্চলের জন্য কোন্ কোন্ চিত্রশিল্পী সাহায্য করেছেন ?

০ এদেশে চিত্রশিল্পী বলতে ক্যামেরাম্যানদেরই বোঝায়। বাংলা ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্রীর বর্ত্তমান যা অবস্থা তাতে চিত্র শিল্পীদেরই বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে একটা charitible fund খোলা উচিত।

* * *

সত্যেন গুহ—রানাঘাট

ওয়েষ্ট ইণ্ডিস এর অধিনায়ক গ্যারী সোবার্স আংটি বিনিময়ের পরও অঞ্জু মহেন্দ্রকে বিয়ে করলেন না কেন ?

০ আংটি এবং প্রেম দুটোই গিল্টি করা ছিল বলে বোধ হয়।

* * *

অসীম গুপ্ত—রাজভবন—কলিকাতা

(১) দুঃস্থা মহিলা শিল্পীদের জন্যে মহিলা শিল্পীমহল যে বাসস্থান নির্মাণ করলেন তার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ তাঁদের প্রাপ্য। শুনেছি আমাদের দেশে অনেক দুঃস্থ পুরুষ শিল্পীও আছেন। অভিনেতৃ সংঘ কিংবা শিল্পী সংসদ তাদের জন্যে কিছু করেছেন কি ?

০ বর্তমানের পুরুষ শিল্পীরা যাতে ভবিষ্যতে দুঃস্থ না হন সেজন্যেই অভিনেতৃ সংঘ এবং শিল্পী সংসদ গড়া হয়েছে। বর্ত্তমানে যে সব দুঃস্থ শিল্পী আছেন তাদের জন্যে খরচা করবার মত সময় এদের কারোরই নেই।

(২) কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চের "নটী বিনোদিনী" আমার খুব ভাল লেগেছে। অথচ 'ঘরের' মত একটি নাটক যেখানে দিনের পর দিন চলেছে, সেখানে "নটি বিনোদিনী" বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ কি ?

০ মালিক পক্ষের অন্তঃকলহই "নটি বিনোদিনী" বন্ধ হয়ে যাওয়ার একমাত্র কারণ।

(৩) আমার প্রিয় চরিত্রাভিনেতা কানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের খবর কি ?

০ শোনা যাচ্ছে উনি বর্ত্তমানে যাত্রার আসরে যোগদান করেছেন।

* * *

অরুণ রায়—ফার্ণ রোড—কলিকাতা

"আঁধার সূর্য্য, তীরভূমি, চেনা অচেনা, বন জ্যোৎস্না" প্রভৃতি ৪-৫ খানি ছবি মাস কয়েকের মধ্যে ফ্লপ করেছে। জুলাই আগষ্টকে বাংলা ছবির ফ্লপ মাস বলা যায় না ?

০ বললেও অত্যুক্তি হয় না। জুলাই আগষ্ট হচ্ছে বর্ষার মাস। নেহাৎ দায়ে না পড়লে কোন প্রযোজকই বর্ষাকালে ছবি রিলিজ করতে রাজী হন না। কারণ বর্ষাকালে কোন শো বিজনেসরই ব্যবসা ভাল চলে না।

* * *

জয়শ্রী হাজরা—বেণী নন্দন ষ্ট্রীট কলিকাতা

সাগিনা মাহাতোর বহুদিন কোন খবর নেই। ছবিটি কি শেষ হয়ে গেছে ?

০ বেশ কিছুদিন বন্ধ থাকার পর সাগিনা মাহাতোর সুটিং ইদানীং আবার শুরু হয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে।

* * *

মণীষা লাহিড়ী—আরামবাগ—হুগলী

চলচ্চিত্রে চুম্বন ও নগ্ন দৃশ্য উপস্থাপনা কি খুব স্বাস্থ্যকর হবে ? এমনিতেই আমাদের দেশের লোকেরা স্বাস্থ্যহীনতায় ভোগে তার ওপর এই সব দৃশ্য দেখলে কি হবে ভাবতেও ভয় করছে।

০ রুচি সম্মত এবং শিল্প সম্মত ভাবে উপস্থাপন করলে ভয় পাবার কিছুই নেই। সে ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ভাল হবারই সম্ভাবনা বেশী। অবশ্য যারা সিনিক অথবা বদ হজমের রোগী তাঁদের কথা স্বতন্ত্র।

* * *

লিলি ব্যানার্জী—নাকতলা রোড—কলিকাতা

অজয় করের পরবর্ত্তী ছবির খবর কি ? নায়ক নায়িকা কে ?

০ পরবর্ত্তী ছবি রবীন্দ্রনাথের "মাল্যদান" অজয় বাবু নভেম্বর মাস হতে শুরু করবেন বলে শোনা যাচ্ছে। নায়ক যথাক্রমে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও নন্দিনী মালিয়া।

* * *

সন্ধ্যা ঘোষ—কালিঘাট রোড—কলিকাতা

আপনারা অভিনেতা অভিনেত্রীদের জীবনী ছাপেন না কেন ?

বাজারে অনেক পত্রিকাই তো আছে। খামোখা আমাদের আবার ও দলে টানা কেন ?

* * *

জয়ন্ত সেন—রামাপুরা—বেনারস

'অরণ্যের দিনরাত্রি' কবে মুক্তি পাবে ?

০ সময় হলেই।

সোমা লাহিড়ী—বেলতলা রোড—কলিকাতা

তনুজার পরবর্ত্তী ছবি কি ?

০ উত্তম কুমারের বিপরীতে "যমুনা কে তীর" (বাংলা) ছবিতে ও অভিনয় করছে।

* * *

জ্যোতি ভট্টাচার্য—তিলজলা রোড—কলিকাতা

চলচ্চিত্রে চুম্বন সম্বন্ধে উত্তম কুমারের মতামত দেখবার পর জানতে ইচ্ছে করছে নায়িকারাও যদি উত্তম কুমারের সম্বন্ধে ডাক্তারের রিপোর্ট চায় তবে কি হবে ?

০ নায়িকারা কোনদিনই নায়কের সম্বন্ধে কারুরই রিপোর্ট চায়ও না ও গ্রাহ্যও করে না।

* * *

বাণী ব্যানার্জী—নেতাজী সুভাষ রোড—কলিকাতা—৪৭

ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে যে তুলকালাম কাণ্ড ঘটে গেল তা নিয়ে খুব ভালো একটা নাটক ও চিত্রকাহিনী লেখা যায়, তাই না ? হলে রাষ্ট্রপতির পার্ট কে করবেন ?

০ কোন এক রাজনৈতিক (অভি) নেতা হয়ত।

* * *

প্রদীপ সরকার—রাসবিহারী এভিনিউ—কলিকাতা

"চুণী পান্না হীরে"র নায়ক লেখক সুখেন দাস বেশ করিৎকর্মা বলে মনে হচ্ছে। নতুবা এই দুর্দিনে কাহিনীকার ও নায়ক হওয়া সোজা নয়। আপনি কি বলেন ?

০ সুখেনবাবু কতখানি করিৎকর্ম্মা তা আমি জানি না। "চুণী পান্না হীরে" মোটামুটি ভাল ছবিই হয়েছে এবং সুখেনবাবুর অভিনয়ও ভাল হয়েছে শুনেছি।

* * *

বরুণ হালদার—গোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা

আম কাঁচা অবস্থায় টক কিন্তু পাকলে মিষ্টি। কাঁচামিঠে আমের কথা অবশ্য আলাদা. প্রেমের বেলায় তার উলটো, কারণ কি ?

০ প্রেমের ব্যাপারে সবটাই কাঁচামিঠে। তার সব কিছুই নির্ভর করে মনের ও বয়সের ওপর। প্রেমের স্বাদ আমের মতন কি না এর উত্তর একমাত্র এ ব্যাপারে যারা বিশেষ অজ্ঞ তারাই দিতে পারবেন।

প্রকাশ ধর—বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী রোড—কলিকাতা

হ্যাঁ, না, হচ্ছে, হবে না, এই রকম দায় সারা উত্তর দেন কেন?

০ উত্তরটা নির্ভর করে প্রশ্নের উপর বলেই।

* * *

গায়ত্রী সেনগুপ্ত—যশোহর রোড—দমদম

কোন্ কোন্ সাহিত্যিক সিনেমায় নেমেছেন?

০ কাজী নজরুল—ধ্রুব, নৃপেনকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়—কবি কালিদাস, শৈলজানন্দ—কথা কও, মন্মথ রায়—রাজনর্ত্তকী, সুধীরঞ্জন মুখার্জী—উপহার, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়—চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, বারীন্দ্রনাথ দাস—উল্টোরথ, শৈলেশ দে—শ্রীশ্রী'নত্যানন্দ প্রভু, হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—গুপী গাইন, বাঘা বাইন, পার্থ চট্টোপাধ্যায়—নায়িকা সংবাদ,—এর বেশী বর্ত্তমানে আর জানা নেই।

* * *

সুজিৎ সরকার—বীরেন রায় রোড, ওয়েষ্ট—কলিঃ

অসীমা ভট্টাচার্য্যের মেম সাহেবের খবর কি?

০ এখনও অবধি কোন খবর নেই।

* * *

কল্যাণ রায়—শরৎ ঘোষ গার্ডেন রোড—কলিকাতা

চলচ্চিত্র বর্ত্তমান যুব সমাজকে যে ভাবে প্রভাবিত করেছে, তাতে আমাদের উচিৎ সমাজের দিকে তাকিয়ে সংগঠন মুলক ছবি তৈরী করা। আপনার এই বিষয়ে কি ধারণা?

০ এ বিষয়ে আমারও কোন দ্বিমত নেই। কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘণ্টাটা বাঁধবে কে? ওই ধরনের ছবি করলে প্রযোজকদের পেট ভরবে কি? বিপ্লবের পর রাশিয়াতে সংগঠন মুলক অনেক ছবি করা সম্ভব হয়েছিল কারণ সমাজ ব্যবস্থার আমুল পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছিল ওরা।

০ ০ ০

প্রতাপ অধিকারী—আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড—কলিকাতা

"পরিণীতা" চিত্রের ছাতের দৃশ্যগুলি ক্রেন থেকে নেওয়া না পাশের বাড়ীর ছাত থেকে গৃহীত?

০ ষ্টুডিওর অভ্যন্তরে গৃহীত।

০ ০ ০

রমলা ঘোষ—মহেন্দ্র গোস্বামী লেন—কলিকাতা

খোসলা কমিটির রিপোর্টের আগেই "ভানমোল মোতি" তোলা হয়েছিল না পরে?

০ সেন্সার বোর্ডের কর্তারাই এর জবাব দিতে পারবেন।

০ ০ ০

নাজির হোসেন ও অন্যান্যরা—লোয়ার রেঞ্জ—পাকসার্কাস—কলিকাতা

(১) ইসরায়েলে আল আক্সা মসজিদ পোড়ানোর ব্যাপারটা অত্যন্ত নারকীয় কাণ্ড। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ লোকই এই ব্যাপারে অত্যন্ত ব্যথিত হবেন ও প্রতিবাদ জানাবেন। তাই নয় কি?

০ নিশ্চয়ই। আপনাদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে আমিও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। ধর্মস্থান, তা সে যে কোন সম্প্রদায়েরই হোক না কেন, অপবিত্র করাটা অত্যন্ত জঘন্য কাজ সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। রাষ্ট্রবিপ্লব বা যুদ্ধের সময়কার কথা স্বতন্ত্র। তখন মানুষের স্বাভাবিক বিচার বুদ্ধিটা লোপ পায়, প্রতিহিংসা নেবার স্পৃহাটাই প্রবল হয়ে ওঠে। এ ধরণের ঘটনা এদেশে বহুবার ঘটেছে। গজনীর মামুদ [illegible]ক গুজরাটের সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠন ও অপবিত্র করন, [illegible] মন্দির মসজিদে রূপান্তরিত করন, এবং খুব বেশী [illegible]নের কথা নয় ১৯৪৬ সালের দাঙ্গার সময় পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাঞ্জাবের বহু মন্দির ধ্বংস করা ও অপবিত্র করা হয়েছে। ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি মাত্রেই এই ধরনের ঘটনায় ব্যথিত হয়েছেন কোন সন্দেহ নেই প্রতিবাদে কেউ কর্ণপাতও করেন নি, কেননা পাশব শক্তির প্রাধান্যটা যেখানে প্রবল সেখানে প্রতিবাদে নীরবে মাথাকুটে মরা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর [illegible]।

(২) বাংলা চলচ্চিত্রে [illegible] ভানু ব্যানার্জিকে দেখা যায় না কেন?

০ বর্ত্তমানে তাঁর উপযুক্ত কোন চরিত্র নেই বলেই।

০ ০ ০

কানু বড়াল—ক্রীক রো—কলিকাতা

পিয়ালী ফিল্মস, প্রিয়া সিনেমার মালিকদের নাকি?

০ পাইয়োনিয়ার ব্যাঙ্ক (অধুনালুপ্ত), পাইয়োনিয়ার পিকচার্স (চন্দ্রশেখর), পূর্ণিমা পিকচার্স, প্রিয়া সিনেমা, পিয়ালী ফিল্মস, এ সব কিছুরই একচ্ছত্র অধিপতি হচ্ছেন শ্রীনেপাল দত্ত ও অসীম দত্ত।

০ ০ ০

সম্পাদক—শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩।১।১, বিধান সরণী, (পূর্বতন কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট) কলিকাতা ৬, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন

১৩৭১

৫৭-তম বর্ষ

দ্বিতীয় খণ্ড

একটি নির্ভরযোগ্য কেশ তৈল
বেঙ্গল কেমিক্যালের
ক্যান্থারাইডিন হেয়ার অয়েল
ভেষজগুণ সম্পন্ন ক্যান্থারাইডিন হেয়ার অয়েল ব্যবহারে আপনার রেশম-কোমল ঘন কাল চুলের কোমলতা ও মসৃণতা অক্ষুণ্ন রাখবে ও চুল পড়া বন্ধ করতে সাহায্য করবে।
বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর • দিল্লী

বিজ্ঞপ্তি

১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিষ্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) আইনের ৮ ধারা অনুযায়ী "ভারতবর্ষ" পত্রিকার মালিকানা ও অন্যান্য বিষয়ক বিবরণ

১। প্রকাশনার স্থান—২০৩।১।১, বিধান সরণী, (পূর্বতন কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট), কলিকাতা—৬।

২। প্রকাশনার সময়-ব্যবধান—মাসিক।

৩। মুদ্রাকরের নাম—শ্রীকুমারেশ ভট্টাচার্য
জাতি—ভারতীয়
ঠিকানা—২০৩।১।১, বিধান সরণী, (পূর্বতন কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট), কলিকাতা—৬।

৪। প্রকাশকের নাম—শ্রীকুমারেশ ভট্টাচার্য
জাতি—ভারতীয়
ঠিকানা—২০৩।১।১, বিধান সরণী, (পূর্বতন কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট), কলিকাতা—৬

৫। সম্পাদকের নাম—(১) শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
জাতি—ভারতীয়
ঠিকানা—কামারহাটি, ২৪ পরগণা।
(২) শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়
জাতি—ভারতীয়
ঠিকানা—২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬

৬। যে সকল অংশীদার মোট মূলধনের এক-শতাংশের অধিক অংশের অধিকারী তাঁহাদের প্রত্যেকের নাম ও ঠিকানা—

(১) শ্রীসরোজকুমার চট্টোপাধ্যায়—২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬, (২) শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়—২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬, (৩) শ্রীরমেনকুমার চট্টোপাধ্যায়—২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬, (৪) শ্রীদীপেনকুমার চট্টোপাধ্যায় ওরফে শ্রীপ্রদীপকুমার চট্টোপাধ্যায়—২০৩।১।১ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬, (৫) শ্রীমতী প্রভা দেবী—২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা ৬।

আমি শ্রীকুমারেশ ভট্টাচার্য এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি, উপরোক্ত বিবরণসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

...া মার্চ্চ, স্বাক্ষর—শ্রীকুমারেশ ভট্টাচার্য
...৭০ সাল প্রকাশক

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের

সাময়িক পত্রপত্রিকা

পশ্চিমবঙ্গ

সচিত্র বাংলা সাপ্তাহিক। এতে সরকারের জনকল্যাণমূলক কার্যকলাপের সংবাদ ছাড়াও নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয় নানা তথ্য সম্বলিত প্রবন্ধ ও সরকারী বিজ্ঞপ্তি।

প্রতি সংখ্যা—১০ পয়সা O ষাণ্মাসিক—২'৫০ টাকা

বার্ষিক—৫ টাকা

ওয়েস্ট বেঙ্গল

সচিত্র ইংরেজী সাপ্তাহিক। সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কিত সংবাদ, তথ্যমূলক প্রবন্ধ, সরকারী বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হয়ে থাকে।

প্রতি সংখ্যা—২০ পয়সা O ষাণ্মাসিক—৫ টাকা

বার্ষিক—১০ টাকা

গ্রাহক হবার ও বিজ্ঞাপন প্রকাশের জন্য নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

বিজনেস ম্যানেজার, তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার, রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা-১

-পঃ বঃ (তথ্য ও জনসংযোগ) বি······৪৬৪···/৭০-

ভারতবর্ষের সূচী

সপ্তপঞ্চাশত্তম বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড—১ম, ২য়, ৩য় সংখ্যা

পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন—১৩৭৫

লেখ-সূচী

লেখ-সূচী

লেখসূচী

লেখসূচী

ইউবিআই এর ঋণদানের মাপকাটিতে

বিরাট পরিবর্তন

ছোট ছোট শিল্পোদ্যোগী, চাষী, খুচরা দোকানদার, পরিবহন পরিচালক বা অন্যান্য ঋণ দেওয়ার ব্যাপারে তাঁদের যে গুণটি প্রধান ব'লে গণ্য হয় তা হ'ল ঋণ পরিশোধ ক্ষমতা, যার অর্থই হ'ল

- কারিগরি বিদ্যা
- পরিচালন পারদর্শিতা
- উৎপন্ন দ্রব্যের বা সেবার বিপণন-ব্যবস্থা
- ব্যক্তিগত সততা

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া

হেড অফিস : ৪, নরেন্দ্র চন্দ্র দত্ত সরণি
(পূর্বতন ক্লাইভ ঘাট স্ট্রীট)
কলিকাতা-১

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের

আধুনিকতম উপন্যাস

সরোবর

সবেমাত্র প্রকাশিত হ'ল।

অভাবগ্রস্ত একটি ছোট্টসংসার—তার তরুণ দম্পতীর জীবনে পড়েছে নৈরাশ্যের ছায়া। দৈনন্দিন অভাব-অভিযোগ তাদের দুটি মনের মাঝখানে এক দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর খাড়া ক'রেছে—তাদের পারস্পরিক আকুতিকে যেন সফল হ'তে দিচ্ছে না। জীবনের মূল্যায়নে তাহ'লে কি ঐশ্বর্যের স্থানই সব চেয়ে বড় ? 'সরোবর'-এ পাওয়া যাবে তারই উত্তর।

দাম—২'৭৫

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের

সতীশঙ্কর রায়ের সম্বন্ধে নানা লোকে নানা কথা বলে কেউ বলে, তিনি ছিলেন পরোপকারী, পরের জন্যে অনেক কিছু করেছেন, বাড়ির চাকরকে অফিসের বেয়ারা ক'রে দিয়েছেন। কেউ বলে তিনি ছিলেন একজন ডাকাত, পরের ধন লুটেপুটে খাওয়াটাই ছিল তাঁর কাজ। লোকে তাঁকে ভয় ক'রতো যেন সাপ বা বাঘের চেয়েও বেশি। আবার কেউ বলে মেয়েদের নিয়ে তিনি অনেক ঘাঁটা-ঘাঁটি ক'রেছেন—ব'লতে গেলে একেবারে পোকা ছিলেন।

উৎপলের কাছে সতীশঙ্কর এক বিষম সমস্যা। কার কথা শুনে সে তাঁর জীবনী লিখবে ? যে লোক প্রথম জীবনে দেশের জন্যে জেল খেটেছেন, পরবর্তী জীবনে অধিষ্ঠিত হ'য়েছেন যশ ও প্রতিষ্ঠার উচ্চ আসনে, তিনি আবার সহসা আততায়ীর হস্তে নিহতই বা হ'লেন কেন ? এই "কেন" সম্বন্ধে তাঁর সুন্দরী তরুণী বিধবা স্ত্রী-ই বা

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম সংখ্যা,

সপ্তপঞ্চাশত্তম বর্ষ

ধর্ম ও বিজ্ঞান মহামিলনের পথে।

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

(হিন্দুধর্মের সারতত্ত্ব ও অনুষ্ঠানগুলির প্রকৃত উদ্দেশ্য)

হিন্দু ধর্মের সারতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রাথমিক কথা।

হিন্দুধর্মের সহিত বিজ্ঞানের প্রকৃত সম্বন্ধ বুঝিতে হইলে, হিন্দুধর্মের সারতত্ত্বগুলি জানিতে ও হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে, এবং সেই সঙ্গে তাহার অসংখ্য অনুষ্ঠানগুলির প্রকৃত উদ্দেশ্যও হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। সেজন্য কতকগুলি প্রাথমিক বিষয় উপলব্ধি করিতে হইবে, এবং সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে।

১। ধর্মের সারতত্ত্ব সম্বন্ধে (১) সাধারণ জ্ঞান, ও (২) উপলব্ধি হইতেছে দুটি পৃথক বস্তু। ধর্মের সারতত্ত্ব কেবল মাত্র জানিলে চলিবে না। সেগুলি প্রকৃত ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। উহা ভক্তি ও অনুরাগের সহিত বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব একজন প্রকৃত ঈশ্বর-দ্রষ্টা পুরুষ ছিলেন। এই বিষয়ে তিনি বলিয়াছেন—

ঈশ্বরীয় কথা শুনে গেলে কিছু হয় না। আবার তৎক্ষণাৎ

উহা ভুলিয়া যাওয়া হয়। যদি মনের ভিতরে অনুরাগ ভক্তিরূপ কালী মাখান থাকে, তবে সে কথাগুলি ধারনা হয়। নচেৎ, উহা শুনে আর ভুলে যায়।

২। পৃথিবীর সকল জীবের এবং সকল ধর্মের ন্যায়, হিন্দু ধর্মে কতকগুলি গুণ ও কতকগুলি দোষ আছে। ইহার দোষগুলি জানিয়া ও স্বীকার করিয়া, উহা বর্জন করিতে হইবে, এবং গুণগুলি উপলব্ধি করিয়া সেগুলি যথা-সাধ্য অনুশীলন করিতে হইবে। প্রকৃত দোষগুলি স্বীকার না করা নির্বুদ্ধিতা, এবং পক্ষপাতদুষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীর প্রমাণ। আমাদিগকে ধর্মে সফলতা লাভ করিতে হইলে, আমাদের ধর্মের দোষগুলি ত্যাগ করিয়া গুণগুলি অনুশীলন করিতে হইবে। আমাদের ধর্মে অতি মহৎ গুণাবলী আছে।

৩। আমাদের শাস্ত্র বাক্যের মধ্যে কতকগুলি (১) চিরন্তন সত্যতত্ত্ব, এবং (২) অন্য প্রকারের সত্যতত্ত্ব আছে। সেগুলি প্রত্যেক হিন্দুর প্রতি বাধ্যকর। সেই সকল তত্ত্ব জানিতে ও হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে।

৪। আমাদের শাস্ত্র বাক্যে কতকগুলি (১) উপা-খ্যান, (২) অতিরঞ্জন, (৩) ভুল, (৪) কুসংস্কার ও (৫) কুপ্রথা আছে। আমাদিগের কর্তব্য হইতেছে—

(ক) উপাখ্যান ও অতিরঞ্জন বিষয়ক বাক্যের সার গ্রহণ করিয়া, উহাদের আক্ষরিক সত্যতা উপেক্ষা করা, এবং

(খ) ভুল, কুসংস্কার ও কুপ্রথা-যুক্ত বাক্যগুলি বর্জন করা। (মন্তব্য। উপাখ্যানের মঙ্গলময় সার তত্ত্ব গ্রহণ করা ভাল। তবে তাহা বাদ দিয়া শাস্ত্র গ্রন্থ) পড়িলে চলিবে।

৫। আমাদের শাস্ত্রে অনেক শব্দ একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। উহাদের মধ্যে কোন্ শব্দ কোন্ ক্ষেত্রে বা কি ভাবে ব্যবহার হইয়াছে তাহা বুঝিতে হইবে। নতুবা, উহাদের প্রকৃত অর্থ জানা যাইবে না, এবং তাহার ফলে শাস্ত্র পাঠে বিভ্রান্তি হইবে।

৬। শাস্ত্র বাক্যের মধ্যে অনেক পরস্পর বিরোধী অথচ সত্যতত্ত্ব যুক্ত বাক্য আছে। ইহার কারণ গুলি এই—

(১) বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন মানসিক ও আধ্যাত্মিকস্তরে অবস্থিত থাকেন।

বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রকারগণ ও বিভিন্ন ধর্মশিক্ষকগণ বিভিন্ন স্তর হইতে এবং বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে আমাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন। তদুপরি তাঁহারা ধর্মানুশীলনকারী-গণের বিভিন্ন স্তর ও উপযুক্ততা বিবেচনা করিয়া তাঁহাদিগকে বিভিন্ন পথে বিভিন্ন ভাবে ও বিভিন্নমতে সাধন ভজন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। আমাদের কর্তব্য হইতেছে (১) তাঁহাদের বিভিন্ন স্তর ও বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ উপলব্ধি করা, এবং (২) তাঁহাদের উপদেশ বাক্যের মধ্যে সত্যতত্ত্বগুলি, আমাদের নিজ নিজ স্তর ও মানসিক অবস্থা অনুসারে গ্রহণ করিয়া সাধন ভজন করা।

(২) একই মানুষ, ধর্মানুশীলন বিষয়ে, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নস্তরে অবস্থান করেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন পূর্বক, বিভিন্ন পথে, ভাবে ও মতে ধর্মানুশীলন করিয়া থাকেন। আমাদের শাস্ত্রে বলা হইয়াছে যে, আন্তরিকতার সহিত যে কোন পথ ভাব বা মত অনুশীলন করিলে, ঈশ্বরের কৃপায়, আমাদের প্রকৃত ধর্মলাভ হইবে। হনুমান রামকে বলিয়াছিলেন—"আমি যখন নিম্নস্তরে থাকি, তখন মনে করি আমি দাস, তুমি প্রভু। আবার আমি যখন উচ্চস্তরে থাকি, তখন মনে করি আমি আর তুমি এক।"

৭। শাস্ত্রবাক্যগুলি প্রকৃতভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, সেগুলি ভক্তি ও সাহসের সহিত বিচার বুদ্ধি ব্যবহার করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

শাস্ত্র বাক্যে ভক্তি।

পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে, আমরা অনেকে শাস্ত্রবাক্যের প্রতি ভক্তি হারাইয়াছি। ভক্তিহীনতার সঙ্গে অবিশ্বাস আসে। ভক্তিহীন ও বিশ্বাসহীন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া শাস্ত্রপাঠ করিলে উহার সারতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হইবে না।

শাস্ত্রপাঠে সাহস।

(১) আমাদের অধিকাংশ শাস্ত্রগ্রন্থ বহু শতবৎসর পূর্বে সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইয়াছিল। আমরা অধিকাংশ ব্যক্তি সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ। অথচ আমাদের অধিকাংশের মনে অল্পবিস্তর ধর্মভাব আছে, এবং সেই সকল শাস্ত্রের প্রতি মোটামুটী ভাবে শ্রদ্ধা আছে। এই অবস্থায়, আমাদের শাস্ত্রশিক্ষকগণ আমাদের মঙ্গলার্থে আমাদের মনে শাস্ত্রবাক্যের প্রতি একটি ভক্তি বিশ্বাস ও ভয় আনাইয়া দিয়াছেন। পাছে, আমরা নিজ নিজ

সীমাবদ্ধ বুদ্ধি ব্যবহার করিয়া শাস্ত্রবাক্যের ভুলব্যাখ্যা করি এবং ভুলপথে ধর্ম অনুশীলন করি, অথবা স্বাভাবিক দুর্বলতার বশবর্তী হইয়া শাস্ত্রবাক্য লঙ্ঘন করি, সেইজন্য তাঁহারা একটি কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিতেন—

"হিন্দুশাস্ত্রের প্রত্যেকটি বাক্য (১) নির্ভুল সত্য, এবং (২) প্রত্যেক হিন্দুর প্রতি বাধ্যকর।"

তাঁহাদের এই বাক্যে, আমাদের অনেকের মোটামুটী মঙ্গল হইয়াছে। তবে, ইহাতে আমাদের প্রকৃত মঙ্গল অল্পই হইয়াছে। কিন্তু, এই বাক্য সত্য নহে, এবং ইহার ফলে, আমাদের অনেক অমঙ্গল হইয়াছে। শত শত বৎসর ধরিয়া, শাস্ত্রবাক্যের নির্ভুলসত্যতা এবং সেগুলি আমাদের প্রতিবাধ্যকর জানিয়াও আমরা অধিকাংশ ব্যক্তি, শাস্ত্র বাক্যলঙ্ঘন করিয়া কাম ক্রোধ লোভ হিংসা প্রভৃতিতে আজও বহু পরিমাণে হিংস্র বন্য পশুর ন্যায় জীবন যাপন করিতেছি। এবং সেই সঙ্গে আমরা শাস্ত্রের দোহাই দিয়া বহু কুসংস্কার কুপ্রথা ও নৃশংসতার আচরণ করিতেছি।

(২) তবে, ঈশ্বরের কৃপায়, আমাদের মধ্যে অনেক ব্যক্তির মানসিক সুপরিবর্তন আসিয়াছে। অনেকের মন হইতে শাস্ত্রবাক্যের প্রতি অহৈতুকী ভয় কাটিয়া যাইতেছে অনেকেই ভক্তিযুক্ত সাহসের সহিত ধর্মতত্ত্ব ও ধর্মঅনুষ্ঠানগুলি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে বিবেচনা করিতেছেন, এবং তজ্জন্য তাঁহাদের ধর্মানুশীলনে উপকার ভিন্ন অপকার হইতেছে না। শাস্ত্র বাক্যগুলি সঠিক ভাবে বুঝিতে হইলে, আমাদিগকে শাস্ত্রবাক্য সম্বন্ধে ভয়ের ভাব সম্পূর্ণ ভাবে ত্যাগ করিয়া, সাহসের সহিত সেগুলি বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে। এই বিষয়ে, আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বেদের একটি বাক্য সর্বদা মনে রাখিতে হইবে। তাহাতে বলা হইয়াছে "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" অর্থাৎ ঈশ্বরলাভ করিতে হইলে, ভয় ত্যাগ করিয়া সাহস অবলম্বন করিয়া ধর্মানুশীলন করিতে হইবে।

শাস্ত্রবাক্যে বিচার বুদ্ধি ব্যবহার।

(১) শাস্ত্রবাক্যগুলির সারমর্ম গ্রহণ করিতে হইলে, আমাদিগকে, ভক্তি ও সাহসের সহিত, বিচার বুদ্ধি ব্যবহার করিয়া সেগুলি পড়িতে বা শুনিতে হইবে, এবং তারপর সেই সারমর্মের পথে ধর্মানুশীলন করিতে হইবে। অবশ্য ইহা সত্য যে, বিচার বুদ্ধি ব্যবহার করিতে গিয়া আমাদের কখনও কখনও ভুল হইবে। কিন্তু তাহাতে আমাদের বিচলিত হইবার কোন কারণ নাই। যদি আমরা, আন্তরিক ভক্তির সহিত সাহসপূর্বক বিচার বুদ্ধি ব্যবহার করিয়া, শাস্ত্রবাক্য বুঝিতে কোন ভুল করিয়া ফেলি এবং সেই সঙ্গে নীতিপথে জীবন পরিচালিত করিয়া আন্তরিকতার সহিত সাধন ভজন করিতে থাকি, তাহা হইলে পরমদয়াময় ঈশ্বর আমাদের সেই সকল ভুল সংশোধন করিয়া দিবেন, অথবা ক্ষমা করিবেন।

(২) শাস্ত্রবাক্য রচনায় এবং অনুশীলনে যে বিচার বুদ্ধি ব্যবহার করা যাইতে পারে, তাহার কয়েকটি প্রমাণ দিতেছি—

ক। হিন্দুধর্মে ষড়্দর্শন নামক ছয়খানি শাস্ত্র গ্রন্থ আছে। তাহাদের প্রত্যেক খানিতেই, শাস্ত্র বাক্য সম্বন্ধে যথেষ্ট বিচার বুদ্ধি ব্যবহার করা হইয়াছে।

(ক) পূর্বমীমাংসা-দর্শন সম্পূর্ণভাবে বিচার বুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাহার পূর্ব প্রচারিত শাস্ত্র বাক্যগুলির মধ্যে কোন্‌টি গ্রহণীয় এবং কোন্‌টি গ্রহণীয় নহে, তাহা উহাতে বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া স্থির করা হইয়াছে।

(খ) হিন্দুধর্ম ঈশ্বরের অস্তিত্বের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা জানিয়াও সাংখ্য দর্শন প্রণেতা কপিল মুনি, বিচার বুদ্ধি ব্যবহার করিয়া তাঁহার ঐ দর্শনে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—"উপযুক্ত প্রমাণ না থাকায়, ঈশ্বর তত্ত্ব অসিদ্ধ"। সেজন্য সেই দর্শনকে নিরীশ্বর সাংখ্য শাস্ত্র বলা হয়। এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত সাহসিকতাপূর্ণ বিচারসম্ভূত। ইহা সত্বেও, হিন্দু ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ "গীতা" শাস্ত্রে, শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"আমি সিদ্ধ পুরুষগণের মধ্যে কপিল মুনি," অর্থাৎ সাংখ্য দর্শন প্রণেতা।

খ। "গীতা শাস্ত্রে হিন্দু ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ সারতত্ত্বগুলি সন্নিবেশিত আছে। সেই গ্রন্থে, হিন্দু ধর্মের সকল পূর্ববর্তী শাস্ত্র গ্রন্থ মন্থন করিয়া, অপূর্ব বিচার কৌশলের সাহায্যে, বহু চিরন্তন সত্যতত্ত্ব ও অন্যান্য আবশ্যকীয় সত্যতত্ত্ব সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা হইয়াছে।

গ। শঙ্করাচার্য্য, মাধ্বাচার্য্য ও রামানুজাচার্য্য নামক

বিখ্যাত হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থকারগণ, পূর্ব প্রকাশিত হিন্দুশাস্ত্র বাক্যগুলিতে নিজ নিজ বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া, হিন্দু শাস্ত্রের ভিত্তির উপর স্থাপিত করিয়া, অদ্বৈতবাদ—বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-দ্বৈতবাদ নামক, তিনটি পৃথক ধর্মমত প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের গ্রন্থাবলীতে অনেক বিভিন্ন ও বিরুদ্ধমত আছে, কিন্তু সবগুলিই হিন্দু শাস্ত্র বাক্যের প্রতি বিচার বুদ্ধি ব্যবহার করিয়া প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে।

ঘ। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিয়াছেন—

ধর্মপথে সফলতা লাভ করিবার জন্য, নিজ নিজ বিচার বুদ্ধির সাহায্যে শাস্ত্রীয় উপদেশগুলির মধ্যে সৎ ও অসৎ অংশের পার্থক্য বুঝিয়া ধর্মানুশীলন করিতে হইবে।

৮। "প্রত্যেকটি শাস্ত্রবাক্য (১) নির্ভুল সত্য, ও (২) বাধ্যকর"—এই উক্তি সত্য নহে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, আমাদের ধর্মশিক্ষকগণ আমাদের মঙ্গলার্থে এই উক্তিরূপ কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন। তবে, ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, যদিও এই উক্তি সত্য নহে, তথাপি শাস্ত্র বাক্যের মধ্যে অনেক (১) চিরন্তন সত্য তত্ত্ব ও (২) অন্য সত্যতত্ত্ব আছে এবং সেই তত্ত্বগুলি নির্ভুল সত্য ও আমাদের প্রতি বাধ্যকর। শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে সেই সত্যতত্ত্ব খুঁজিয়া বাহির করাই হইতেছে ধর্ম-শাস্ত্র পাঠের সার্থকতা। "গীতা" শাস্ত্রে যে, ধর্মানুশীলনের পথে ভগবান শাস্ত্রকে প্রমাণ বলিয়াছেন, তাহাতে শাস্ত্র বাক্যের মধ্যে সত্যতত্ত্বকে প্রমাণ বলিয়াছেন। সকল বিরুদ্ধ বাক্য ও নিকৃষ্ট শাস্ত্র বাক্যকে "প্রমাণ" আখ্যা দেন নাই।

প্রত্যেকটি শাস্ত্র বাক্য যে নির্ভুল নহে, এবং আমাদের প্রতি বাধ্যকর নহে, তাহা নিম্নের আলোচনা হইতে পরিষ্কার বোঝা যাইবে।

হিন্দু শাস্ত্র গ্রন্থ।

হিন্দুশাস্ত্র বলিতে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত সংস্কৃত গ্রন্থগুলি বুঝায়—

(১) চারি বেদ ও শতাধিক উপনিষদ।

(২) ধর্মশাস্ত্র ও ধর্মসূত্র। সেগুলি হইতেছে মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি রচিত "ধর্মশাস্ত্র", এবং গৌতম প্রভৃতির রচিত "ধর্মসূত্র"।

(৩) ষড়দর্শন শাস্ত্র—ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, পূর্বমীমাংসা ও বেদান্ত দর্শন।

(৪) তন্ত্র শাস্ত্রগুলি।

(৫) পুরাণ শাস্ত্রগুলি—সেগুলির মধ্যে আছে (ক) রামায়ণ ও (খ) মহাভারত। "গীতা" মহাভারতের অংশ।

শাস্ত্র বাক্য বিশ্লেষণ।

(১) শাস্ত্র শিক্ষকগণ বেদ উপনিষদাদির নাম দিয়াছেন "শ্রুতি"। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, ঐ সকল গ্রন্থের বাক্যগুলি মনুষ্য রচিত নহে। ঐ কথাগুলি স্বয়ং ঈশ্বর সমাধি লব্ধ মানুষের নিকট নিজে বলিয়াছিলেন, এবং সেই "শ্রুত" কথাগুলি ঐ সকল শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে। তাঁহারা আরও বলিয়াছেন—(ক) বেদ অভ্রান্ত সত্য, এবং (খ) বেদের প্রত্যেকটি কথা আমাদের প্রত্যেকের প্রতি বাধ্যকর।

(২) শাস্ত্র শিক্ষকগণ 'ধর্মশাস্ত্র' ও 'ধর্মসূত্র' নামক শাস্ত্রগ্রন্থগুলির নাম দিয়াছেন "স্মৃতি"। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, ঐ সকল গ্রন্থের বাক্যগুলি ঋষিগণ ঈশ্বরের নিকট শুনিয়া,পরে তাঁহাদের "স্মৃতি" হইতে উদ্ধার করিয়া ঐ সকল শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

(৩) প্রকৃত ঘটনা এই যে, আমরা অনেকেই জানিনা "বেদ" কি বস্তু। "বেদ" শব্দের অর্থ-জ্ঞান, এবং আমাদের চারিবেদ ও উপনিষদগুলি আমাদের পূর্ব পুরুষগণের লব্ধ-জ্ঞানের একটি সমষ্টিমাত্র। সেই জ্ঞানগুলিকে একভাবে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়—

(ক) ঈশ্বর বিষয়ক চিরন্তন সত্যতত্ত্ব যাহা ঋষিগণ ঈশ্বরে মন সমাহিত করিয়া জানিয়াছিলেন, এবং (খ) অন্য সকল উচ্চ সত্যতত্ত্ব। সেগুলিকে অন্যভাবে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়—(ক) তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ক, (খ) উপাসনা বিষয়ক, এবং (গ) যজ্ঞাদি কর্ম বিষয়ক।

(৪) কোন একসময়ে, সেই সকল জ্ঞানরাশি একত্র সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা হয়। সেই সকল সংগৃহীত জ্ঞানকে "বেদ" বলা হয়। প্রথমে সেগুলিকে ঋক-সাম-যজু নামক তিনখানি বেদে বিভক্ত করা হয়। পরে, অথর্ব নামক একখানি বেদ সংগ্রহ করিয়া ঋক-সাম-যজু-অথর্ব নামক চারিবেদ জগতে প্রচলিত হয়। সেই সময়ে বহু উপনিষদ সংগ্রহ করা হয়। সেগুলিতে ঈশ্বর এবং ঈশ্বরের সহিত জীব

ও জগতের সম্পর্ক বিষয়ক বহু চিরন্তন সত্য সন্নিবেশিত আছে।

(৫) বিভিন্ন বেদের বিভিন্ন অংশে এত বিভিন্ন ও বিরুদ্ধ উপদেশ আছে যে, তাহাদের মধ্যে কোনটি গ্রহণীয় এবং কোনটি উপেক্ষণীয়, তাহা সহজে বুঝা যায় না। সেই জন্য মহাভারতে বলা হইয়াছে—

বেদাঃ বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা ॥

অর্থাৎ, বেদবাক্যগুলির বিভিন্ন মত হইতে ধর্মানুশীলনকারীগণের কর্তব্য পথ স্থির করা কঠিন। সুতরাং আমাদের কর্তব্য হইতেছে, শাস্ত্র বিশ্লেষণ না করিয়া, ধার্মিক মহাজনগণের পথে ধর্ম অনুশীলন করা।

(৬) বেদ-উপনিষদের শ্রেষ্ঠ অংশ হইতেছে উপনিষদ গ্রন্থগুলি। সেগুলির বাক্যাবলী ঈশ্বরের মুখ নির্গত বলিয়া গ্রন্থগুলিতে বলা হয় নাই। উহাদের মধ্যে অনেক গুরুশিষ্য সংবাদ আছে। তাহাদের মধ্যে গুরু বলিয়াছেন—

(ক) আমি নিজে যতটুকু জানি তাহাই বলিতেছি,

(খ) আমি যাহা অন্যের মুখে শুনিয়াছি তাহাই বলিতেছি।

(৭) চারি বেদের ভিতর, ঋষিগণের সত্যতত্ত্ব উপদেশ আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে (ক) বহু প্রার্থনা আছে—"হে ঈশ্বর, আমাদিগকে স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন দাও, আমাদিগকে শস্য ও ধন দাও, আমাদিগের শত্রু বিনাশ কর" ইত্যাদি। এবং (খ) মারণ, বশীকরণ প্রভৃতির উদ্দেশ্যে বহু নিম্নশ্রেণীর উপদেশ আছে।

(৮) স্মৃতিগুলির ভিতর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব আছে। কিন্তু সেই সঙ্গে, বহুপ্রকার সাংসারিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে উপদেশ আছে।

(৯) স্মৃতিগুলির মধ্যে গৌতম 'ধর্মসূত্রের' দ্বাদশ অধ্যায়ের চতুর্থ পাদে বলা হইয়াছে—

(ক) যদি কোন শূদ্রজাতীয় ব্যক্তি বেদ পাঠ করে, তাহা হইলে তাহার জিহ্বা টানিয়া ধরিয়া, তাহা উত্তপ্ত লৌহ শলাকার দ্বারা বিদ্ধ করিবে।

(খ) যদি কোন শূদ্র জাতীয় ব্যক্তি বেদপাঠ শ্রবণ করে, তাহা হইলে তাহার কর্ণে উত্তপ্ত সীসা ঢালিয়া দিবে। এইপ্রকার নৃশংস বাক্য—ঈশ্বরের বাক্য বা সত্য হইতে পারে না।

মন্তব্য—উপরের কথাগুলি হইতে পরিষ্কার ভাবে বুঝা যাইতেছে যে, "প্রত্যেকটি শাস্ত্রবাক্য (১) নির্ভুল সত্য ও (২) বাধ্যকর"—এই উক্তি সত্য নহে। আমাদের শাস্ত্র শিক্ষকগণের এই উক্তি আমাদের মঙ্গলার্থে প্রচারিত হইলেও, ইহার দ্বারা আমাদের ভীষণ অমঙ্গল হইয়াছে, এবং এখনও হইতেছে। ঐ উক্তির ফলে আমরা অহৈতুকী ভয়ের অধীন হইয়া বিচার বুদ্ধিতে জলাঞ্জলি দিয়া জীবন কাটাইতেছি। আমরা শাস্ত্রানুসারে বহু প্রকার ব্রত, উপবাস, পূজা, দান প্রভৃতি করিয়া থাকি। কিন্তু শাস্ত্রের নীতি বাক্যগুলি উপেক্ষা করিয়া আসিতেছি। যদি আমরা সত্য-প্রেম-পবিত্রতা যুক্ত নীতির পথে জীবন পরিচালন করিয়া ব্রত-উপবাস-পূজা দান করি, তাহা হইলে আমাদের পরম মঙ্গল হয়। কিন্তু আমরা অধিকাংশ ব্যক্তি দুর্নীতি মগ্ন জীবন যাপন করিয়া, ঐ সকল সৎ অনুষ্ঠান করি বলিয়া আমরা তদ্দ্বারা ধর্মপথে বিশেষ অগ্রসর হইতে হইতে পারি না। তথাপি, আমরা অধিকাংশ ব্যক্তি ঐ প্রকার ভুল পথে ঐ সকল সৎ অনুষ্ঠানগুলি অনুশীলন করি এবং মনে ভাবি যে আমরা ঐ ভাবে চলিয়া ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করিব। আমাদের সেই ধারণা একটি আত্মপ্রবঞ্চনার পরিষ্কার উদাহরণ।

হিন্দুধর্মে কয়েকটি ভীষণ দোষযুক্ত প্রথা।

ক। হিন্দুধর্মে জন্মগত জাতিভেদ প্রথা।

১। হিন্দুধর্মে একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠা হওয়ার পূর্বে, আমাদের আর্য্য পূর্বপুরুষগণ তাঁহাদের বিভিন্ন কার্য্য সুচারুরূপে নিষ্পন্ন করিবার জন্য এই ভারতবর্ষের হিন্দুগণকে গুণ-কর্ম অনুসারে, প্রথমে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নামক তিনজাতিতে বিভক্ত করিয়াছিলেন। শিক্ষা, পূজা প্রভৃতির জন্য ব্রাহ্মণ জাতি, রাজকর্ম ও রাজ্যরক্ষার জন্য ক্ষত্রিয় জাতি, এবং শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্যের জন্য বৈশ্যজাতি সৃষ্টি করিয়াছিলেন। পরে তাঁহাদের সকলের সুবিধার জন্য শূদ্র নামক একটি দাস জাতি সৃষ্টি করিয়া সকল হিন্দুকে চারি জাতিতে বিভক্ত করিয়াছিলেন। তাহার পর হইতে এ পর্য্যন্ত অনেক নূতন খণ্ড জাতি

সৃষ্টি হইয়াছে, এবং বহু জাতি ও খণ্ড জাতির মধ্যে নানা প্রকার সংমিশ্রণ হইয়াছে।

২। এই ত্রিজাতি ভেদের প্রথমদিকে উহা হিন্দুগণের পরম মঙ্গলময় ভাবে কাজ করিতেছিল। এমনকি, পরবর্ত্তী-কালে শূদ্রজাতি সৃষ্টি হওয়ার পরও উহা বহুদিন পরম মঙ্গলময় ছিল। অনেক পাশ্চাত্য মনীষী এই কর্ম-ভিত্তিক জাতিভেদের উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু কিছুকাল পরে, এই জাতিভেদ নানা কারণে জন্মগত জাতিভেদে পরিণত হইল, এবং তাহার পর হইতে এই জন্মগত জাতিভেদে হিন্দুগণের সর্বনাশ আরম্ভ হইল।

(১) হিন্দুগণ পূজা উপাসনা প্রভৃতিতে পবিত্রতা রক্ষা করিবার জন্য স্বাভাবিক কারণে, অপবিত্র ও অপরিষ্কার দ্রব্য উহা হইতে দূরে রাখিতেন। শূদ্রজাতীয় ব্যক্তিগণ সাধারণতঃ অপরিষ্কার ভাবে থাকিতেন ও অপরিষ্কার বস্ত্রাদি পরিয়া থাকিতেন বলিয়া, উচ্চজাতীয় হিন্দুগণ তাঁহাদিগকে ঐ সকল পূজা প্রভৃতি হইতে দূরে রাখিতেন। তবে প্রথমের দিকে, সেইজন্য তাঁহাদিগের প্রতি উচ্চ-জাতীয় ব্যক্তিগণ কোন ঘৃণা প্রদর্শন বা অত্যাচার করিতেন না।

(২) পরে ঐ উচ্চজাতীয় ব্যক্তিগণের পূজাদি সম্বন্ধে অস্পৃশ্যতা জ্ঞান সৎবুদ্ধির সীমা ছাড়াইয়া গেল।

(ক) দ্রব্য অস্পৃশ্য হইতে, মানুষ অস্পৃশ্য হইল। কোন কোন জাতীয় মানুষ যত পরিষ্কার ভাবে থাকুন না কেন, সেইজাতীয় প্রত্যেক ব্যক্তি অস্পৃশ্য বলিয়া গণ্য হইলেন। এমনকি, নিম্নজাতীয় নিষ্পাপ শিশুগণও উচ্চজাতীয় ব্যক্তির নিকট অস্পৃশ্য হইল।

(খ) বহুপ্রকার হৃদয়হীনতার সঙ্গে, উচ্চজাতীয় ব্যক্তি-গণের পক্ষে নিম্নজাতীয় ব্যক্তির ছায়া মাড়ানও দোষযুক্ত মনে করিয়া নিষিদ্ধ হইল। কোথাও কোথাও রাজপথে হাটিবার সময়, ঐ সকল অস্পৃশ্য নিম্নজাতীয় ব্যক্তিকে গলায় ঘণ্টা বাঁধিয়া চলিতে হইত, এবং পাছে কোন উচ্চজাতীয় ব্যক্তি তাঁহার ছায়া মাড়াইয়া ফেলেন, সেইজন্য তাঁহাদিগকে সাবধান করাইবার জন্য, ঐ ঘণ্টা বাজাইতে হইত।

(৩) আজি হইতে বহু সহস্র বৎসর পূর্বে এই প্রকার ঘৃণা ও অত্যাচার আরম্ভ হইয়াছিল। তখন ঐ অস্পৃশ্য জাতি দরিদ্র অশিক্ষিত ও অসঙ্ঘবদ্ধ ছিল, এবং তখন ভারতবর্ষে হিন্দুধর্ম ব্যতীত অন্য কোন উল্লেখযোগ্য ধর্ম ছিল না। সেইজন্য তাঁহারা বাধ্য হইয়া সেই সকল অত্যাচার সহ্য করিতেন। পরে, যখন এদেশে বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম আবির্ভূত হইল এবং আরও পরে যখন খৃষ্টধর্ম ও ইসলাম ধর্ম ভারতবর্ষে প্রবেশ করিল, তখন অসংখ্য নিম্নজাতীয় ব্যক্তি ধর্মান্তর গ্রহণ করিলেন। এবং স্বভাবতই, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে উচ্চজাতীয় হিন্দুগণের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিতে লাগিলেন। এই ভাবে বহু সংখ্যক হিন্দু মুসলমান হইয়া যাওয়ায় ভারতের ইংরাজ শাসকগণ, ভারতবর্ষ ছাড়িয়া যাইবার সময়, ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে, ভারতবর্ষকে জন্মগত জাতিভেদের ভিত্তিতে দ্বিখণ্ডিত করিয়া হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান নামক দুটি পরস্পর বিরোধী রাজ্যে পরিণত করিয়া গেলেন।

৩। এই মর্মান্তিক ঘটনার পর, অনেক উচ্চজাতীয় হিন্দুর ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এবং তাঁহাদের মধ্যে বহু ব্যক্তির মনে এই বিষয়ে, সত্য উপলব্ধি ও উদার ভাব আসিয়াছে। ইতি মধ্যে, ভারতবর্ষে অস্পৃশ্যতা নিবারক আইন প্রণয়ন ও প্রচলন হইয়াছে। কিন্তু, তথাপি, এখনও নানাস্থান হইতে অস্পৃশ্যতাজনিত ঘৃণা ও অত্যাচারের সংবাদ আসিতেছে। আমরা নির্বোধের ন্যায়, অহংকার ও কুসংস্কারের অধীন হইয়া, জাতিভেদের মহৎ উদ্দেশ্য ও গুণাবলী ভুলিয়া গিয়া, উহার দোষের দিকে আকৃষ্ট হইয়া আজিও সেই দোষযুক্ত কাজ করিয়া আমাদের নিজেদের, আমাদের জাতির ও আমাদের দেশের সর্বনাশ করিতেছি।

৪। এখন, আমাদের মধ্যে উচ্চজাতীয় হিন্দুগণের কর্ত্তব্য হইতেছে—এই ভাবে এই সর্বোৎকৃষ্ট ধর্মের নামে কৃত অধর্মের ও পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা। আমাদিগকে হয় (১) এই অস্পৃশ্যতা, ঘৃণা ও অত্যাচার সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ করিতে হইবে, নতুবা—(২) এই বর্ত্তমান আকারের, জন্মগত জাতিভেদ প্রথা সম্পূর্ণভাবে লোপ করিতে হইবে।

খ। হিন্দুধর্মে সতীদাহ প্রথা।

১। হিন্দু ধর্মাবলম্বীগণের ভিতর স্ত্রীজাতির স্বামীভক্তি একটি উজ্জ্বল গৌরবময় ঐতিহাসিক সত্য। স্বামীর মৃত্যু-শোক সহ্য করিতে না পারিয়া, ভারতবর্ষের নানাস্থানের অনেক স্ত্রীলোক স্বইচ্ছায় স্বামীর সহিত সহমরণে জীবন

বিসর্জন দিয়া গিয়াছেন। রাজস্থানের কোন একটি যুদ্ধে রাজপুত সৈন্যের পরাজয় হইয়াছে, এবং অনেক রাজপুত যোদ্ধা তাহাতে মারা গিয়াছেন, এই সংবাদ শুনিয়া বহুসংখ্যক রাজপুত রমণী, তাঁহাদের স্বামীদের মৃত্যু হইয়াছে মনে করিয়া, স্বইচ্ছায় অগ্নিতে পুড়িয়া জীবন বিসর্জন দিয়াছিলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এইপ্রকার স্বামীভক্তির দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষের বাহিরে আর কোথাও নাই।

২। পরবর্ত্তী কালে, নানাকারণে ঐ প্রকার মানসিক দৃষ্টি ভঙ্গীর পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। একদিকে, অনেক হিন্দুস্ত্রী স্বইচ্ছায় মৃত স্বামীর সহিত এক চিতায় পুড়িয়া জীবন বিসর্জন দিতে লাগিলেন, অন্য দিকে অনেক স্ত্রী তাঁহাদের স্বামীদের মৃত্যুতে তাঁহাদের সহিত স্বইচ্ছায় সহমরণে প্রাণ বিসর্জন দিতে অস্বীকার করিতে লাগিলেন। কিন্তু আমাদের সমাজশিক্ষকগণ ইহা সহ্য করিতে পারিলেন না। অথচ, তাঁহারা একই স্বামীর বহুস্ত্রী গ্রহণ এবং একটি স্ত্রী মরিলে এক বা একাধিক অন্য স্ত্রী বিবাহ করিয়া আনার কোন দোষ দেখিতে পাইলেন না। এই অবস্থায় তাঁহারা কোন স্ত্রীলোকের স্বামী বিয়োগ হইলে, তাঁহার সেই স্বামীর মৃতদেহের সহিত তাঁহাকে বলপূর্ব্বক শ্মশানে লইয়া যাইতেন, এবং তাঁহার অনিচ্ছা ও আপত্তি-সত্ত্বেও, তাঁহাকে জোর করিয়া তাঁহার স্বামীর চিতায় দড়ি দিয়া বাঁধিয়া সেই মৃতদেহের সহিত জীবন্ত পুড়াইয়া মারিতেন। স্বভাবতই, সেই স্ত্রীলোক জলন্ত চিতায় চীৎকার করিয়া কাঁদিতেন। পাছে, ঐ হৃদয় বিদারক ক্রন্দনে কেহ তাঁহাকে সাহায্য করিতে যান, সেই ভয়ে আমাদের সেই সমাজশিক্ষকগণ সেই সময়ে বিরাট শব্দ পূর্ব্বক ঢাক ঢোল প্রভৃতি বাজনার শব্দ করিয়া তাঁহাকে, এবং তাঁহার ন্যায় শত শত হিন্দু বিধবাকে জীবন্ত পুড়াইয়া মারিতেন। ধর্মের নামে এই প্রকার নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড পৃথিবীর ইতিহাসে ভারতবর্ষের বাহিরে আর কোথায়ও হয় নাই।

৩। এই অবস্থা চলিতে থাকায় বহু বৎসর পরে, রাজা রামমোহন রায়, তদানীন্তন ইংরাজ শাসকগণকে বুঝাইয়া আইন প্রণয়ন করাইয়া এই সতীদাহ রূপ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের কুপ্রথা বন্ধ করিয়া দিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, এবং তদ্দারা হিন্দু ধর্মের একটি ভীষণ দোষ দূর করিয়াছিলেন। সেই জন্য আমরা সকল হিন্দু তাঁহার কাছে চির ঋণী।

মন্তব্য। হিন্দুস্ত্রীগণ সহমরণে না গেলেও, তাঁহাদের স্বামী ভক্তি এখনও অনেক পরিমাণে প্রবল আছে। তাহার একটি দৃষ্টান্ত হইতেছে যে, গত ৬ই জানুয়ারী ১৯৭০ সনে, শ্রীমতি শিবানী সিংহ নামক এক ৩২ বৎসর বয়স্কা রমণী তাঁহার স্বামীর মৃত্যুর তিন দিন পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচতলার ছাদ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া মৃত্যু বরণ করিয়া স্বামীর শোক অপনোদন করিয়াছিলেন।

গ। হিন্দুধর্মে বাল বৈধব্যের প্রথা।

১। হিন্দুধর্মে, সমাজের মঙ্গলার্থে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল, এবং এখনও অল্প পরিমাণে উহা চলিতেছে। যৌবনে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই মেয়েদের বিবাহ দেওয়া হইত। তাহাদের মধ্যে যে সকল মেয়ে অল্পবয়সে বিধবা হইত, তাহাদিগকে আজন্ম কঠোর বৈধব্য শাসন ভোগ করিতে হইত। (১) তাহাদিগকে সারাজীবন মৎস্য মাংসাদি বহুখাদ্য হইতে বঞ্চিত করা হইত। (২) তাহাদিগকে প্রতিমাসে নানা প্রকার উপবাস করিতে হইত। (৩) ভীষণ গ্রীষ্মের দিনে একাদশী তিথিতে, তাহাদিগকে তো অনাহারে রাখা হইতই। উপরন্তু, তাহাদের তৃষ্ণায় বুক ফাটিয়া গেলেও, ঐ দিন দিবারাত্রের মধ্যে তাহাদিগকে এক ফোটাও জল খাইতে দেওয়া হইত না। অপর দিকে, অনেক সময় ঐ প্রকার বালবিধবার পিতা একসঙ্গে একাধিক স্ত্রী রাখিয়া আনন্দভোগ করিতেন, এবং একটি স্ত্রী মরিতে না মরিতে আর একটি বা একাধিক মেয়েকে বিবাহ করিয়া আনিতেন। সেই সকল বাল বিধবার চোখের সম্মুখে ঐ সকল ঘটনা ঘটিত। কিন্তু, আমাদের সমাজ শিক্ষকগণ, তাহাদের প্রতি, শাস্ত্রবাক্যের দোহাই দিয়া, এই প্রকার নৃশংস ব্যবহার করিতে আদৌ কুণ্ঠা বোধ করিতেন না।

১। হিন্দুবিধবাদের নানা প্রকার অসহ্য অবস্থা দেখিয়া কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দুঃখে ও ক্ষোভে লিখিয়া গিয়াছেন—

'ওরে কুলাঙ্গার হিন্দু দুরাচার,
হয়ে আর্য্যবংশ অবনীর সার,
রমণী বধিছ পিশাচ হয়ে।'

৩। এই অবস্থা চলিতে থাকায় বহুবৎসর পরে পণ্ডিত

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, তদানীন্তন ইংরাজ শাসকগণকে বুঝাইয়া, বিধবাবিবাহ প্রচলনের আইন প্রণয়নকরাইয়া, এই সকল অত্যাচার অনেক পরিমাণে কমাইয়া দিয়া গিয়াছেন। সে জন্য আমরা সকল হিন্দু তাঁহার নিকট চিরঋণী।

ঘ। হিন্দু ধর্মে নরবলি প্রথা।

হিন্দু ধর্মে নানা প্রকার তান্ত্রিক পূজা প্রচলিত আছে। অনেকের বিশ্বাস ঐ সকল পূজার মন্ত্রে এক এক প্রকার অলৌকিক শক্তি নিহিত আছে, এবং সেই শক্তি জাগরিত করিতে পারিলে অসামান্য ফল লাভ করা যায়। একপ্রকার পূজায় ঈশ্বরকে প্রসন্ন করিবার জন্য জীবন্ত মানুষ বলি দেওয়ার নিয়ম আছে। এই নিয়ম অনুসারে পূর্বে অনেক নরবলি হইত। এখন, নানা কারণে তাহা একপ্রকার অপ্রচলিত হইয়াছে। তথাপি নরবলি প্রথা একেবারে বন্ধ হয় নাই। মধ্যে মধ্যে বিভিন্ন দেশ হইতে নরবলির সংবাদ আসিয়া থাকে। সম্প্রতি এই ১৯৭০ সালের জানুয়ারী মাসে, একটি নরবলির সংবাদ খবরের কাগজে বাহির হইয়াছে, এবং সম্ভবতঃ হত্যাকারীগণের মধ্যে কেহ কেহ পুলীশের হাতে ধরা পড়িয়াছে। এই প্রথা আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থের মধ্যে কোন না কোন বাক্য অবলম্বন করিয়া চলিয়া আসিতেছে। আমাদের বিচারবুদ্ধি বর্জিত, শাস্ত্রবাক্যের প্রতি নির্বিচারে সকল বিষয়ে অন্ধ বিশ্বাস ও ভয়ের জন্য এই প্রকার কুপ্রথা চলিয়া আসিতেছে।

মন্তব্য। আমাদের ধর্মে এই প্রকার কুসংস্কার, কুপ্রথা, শাস্ত্রবাক্যে বিচার বিহীন অন্ধ বিশ্বাস ও ভয় প্রভৃতি নানা দোষগুলি, মনুষ্যদেহের নানা প্রকার অসুখের ন্যায় বিবেচনা করিয়া সে সকল দোষ সম্বন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। সাধারণ দোষগুলি সাধারণ ভাবে চেষ্টা করিয়া বর্জন করিতে হইবে। তবে, বিশেষ আবশ্যক হইলে যেমন অসুস্থ দেহের কোন অংশ কাটিয়া বাদ দিতে হয়, তেমনই অত্যন্ত দোষযুক্ত ধর্মীয় প্রথা ও অনুষ্ঠানগুলি ধর্মানুশীলনের সাফল্যের জন্য সম্পূর্ণভাবে বাদ দিতে হইবে। আমাদের ধর্মের দোষগুলি দেখিয়া চিন্তিত ভীত বা হতাশ হইবার কোন কারণ নাই। ঐ সকল দোষ অদূর ভবিষ্যতে চলিয়া যাইবেই। সকল প্রকার দোষ সত্ত্বেও, এই উৎকৃষ্ট হিন্দুধর্ম আমাদের সকলের পরম মঙ্গলের ও পরম গৌরবের বিষয়। ভবিষ্যতে সকল প্রকার দোষমুক্ত হইয়া, হিন্দুধর্ম ও হিন্দুধর্ম অনুশীলন সারা পৃথিবীকে সূর্যের ন্যায় দীপ্তি প্রদান করিবে।

হিন্দু ধর্মে-কয়েকটি ভুলধারণা।

ক। স্বর্গ ও নরক।

১। হিন্দু শাস্ত্রে ও অহিন্দু শাস্ত্রে স্বর্গ ও নরকের কথা বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু, প্রকৃত পক্ষে স্বর্গ ও নরকের কোন বাস্তব অস্তিত্ব নাই। হিন্দু শাস্ত্রকারগণ এবং হিন্দু শাস্ত্র শিক্ষকগণ, আমাদের মঙ্গলের জন্য, কল্পিত স্বর্গের ও নরকের অবতারণা করিয়াছেন। আমাদিগকে সৎকার্য্যে উৎসাহিত করিবার জন্য স্বর্গ সুখের লোভ দেখাইয়াছেন, এবং আমাদিগকে অসৎকার্য্য হইতে বিরত করিবার জন্য নরকের শাস্তির ভয় দেখাইয়াছেন। এ বিষয়ে কয়েকটি প্রমাণ উল্লেখ করা যাইতেছে—

(১) আমাদের কোন কোন শাস্ত্রগ্রন্থেই বলা হইয়াছে যে, স্বর্গ ও নরকের কোন বাস্তব অস্তিত্ব নাই। সৎকার্য্য জনিত মনের আনন্দই স্বর্গ, এবং অসৎকার্য্য জনিত মনের দুঃখই নরক। এই ভাবের উক্তি ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের ঊনবিংশ অধ্যায়ে এবং ভক্তিশাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লেখ আছে।

(২) স্বামী বিবেকানন্দ, শাস্ত্রবাক্য বিশ্লেষণ করিয়া, স্বর্গ ও নরকের বাস্তব অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন।

(৩) যীশুখৃষ্ট বলিয়াছেন—স্বর্গ মানুষের মনের মধ্যে অবস্থিত।

(৪) পরবর্তী যুগের খৃষ্টধর্ম শিক্ষকগণের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়াছেন—স্বর্গ ও নরক কোন বাস্তব স্থান নহে। ইহা মানুষের নিজস্ব মানবিক অবস্থা মাত্র।

(৫) বহু মানব পৃথিবীর পৃষ্ঠে সর্বত্র ঘুরিয়াও, এবং পৃথিবীর বাহিরে আকাশ পথে পৃথিবীর চতুর্দিকে বহু ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত ঘুরিয়াও, স্বর্গ বা নরকের অস্তিত্বের কোন সন্ধান পান নাই।

২। স্বর্গের দেবতা।

স্বর্গের অস্তিত্ব না থাকায়, দেবতাদেরও কোন বাস্তব অস্তিত্ব নাই। কিন্তু বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া, দেবদেবীর আলোচনা ও উপাসনা করিয়া, নানা প্রকার দেবদেবীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে ধর্মানুশীলনকারীগণের মনে অতি দৃঢ়ভাবে একটি বিশ্বাস অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। তদুপরি, পৌত্তলিক

পূজার দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্ত্তিত হইয়া, সেই সকল দেবদেবীর মূর্ত্তি পূজা ঈশ্বরের প্রতীক পূজা বলিয়া গৃহীত হওয়ায়, নানা দেবদেবীর উপাসনা হিন্দু ধর্মানুশীলনের একটি স্থায়ী অঙ্গ হইয়াছে। এই অবস্থায় ঈশ্বরের কৃপায় মূর্ত্তিপূজকগণের মধ্যে আন্তরিক ভক্তগণ নিজ নিজ উপাস্য মূর্ত্তিতে দেবদেবীর দর্শন ও অনুগ্রহ পাইয়া আসিতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব কলিকাতার নিকট দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে মা কালীর প্রস্তর মূর্ত্তি আন্তরিক ভক্তি সহকারে উপাসনা করিয়া, চিন্ময়ী মায়ের দর্শন পাইয়াছিলেন, এবং তাঁহার সহিত কথোপকথন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতে স্বর্গের বা দেবতার অস্তিত্ব প্রমাণ হয় না। ইহাতে প্রমাণ হয় যে, ঈশ্বর পরমদয়ালু, এবং তাঁহার আন্তরিক ভক্ত যে মূর্ত্তিতে বা যে রূপে তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন, তিনি সেই মূর্ত্তিতেই বা সেই রূপেই দেখা দেন। গীতা শাস্ত্রে একদিকে স্বর্গের উল্লেখ আছে, এবং অন্য দিকে, তাঁহার আন্তরিক ভক্তগণের আকাঙ্ক্ষিত মূর্ত্তিতে দেখা দেওয়ার কথা বলা হইয়াছে। তদুপরি, যে কোন স্থানে বা মন্দিরে, আন্তরিক ভক্তগণ ঈশ্বরকে ডাকিয়া থাকেন-সেই সকল স্থান পবিত্র হইয়া যায়, এবং সেই সকল স্থানে ঈশ্বরের নানা প্রকার কৃপার সংবাদ পাওয়া যায়।

খ। অবতার বাদ।

১। আমাদের ধর্ম শিক্ষকগণ আমাদের মঙ্গলার্থে, মহাপুরুষগণের প্রতি আমাদের মনে শ্রদ্ধা ও ভক্তি আনাইবার ও বাড়াইবার জন্য, পূর্বোক্ত "অতিরঞ্জনের সাহায্যে অবতারবাদ কল্পনা করিয়াছেন। সে জন্য তাঁহারা যুগে যুগে স্বর্গ হইতে ঈশ্বরের বিভিন্ন অবতারের আগমনের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু স্বর্গের কোন বাস্তব অস্তিত্ব নাই, ঈশ্বর স্বর্গে বা কোন নির্দিষ্ট স্থানে থাকেন না, তিনি সর্বব্যাপী, সর্বত্র থাকেন।

২। প্রকৃত অবস্থা এই যে, ঈশ্বর তাঁহার জগৎ পরিচালনার জন্য, এবং মানবগণকে সৎশিক্ষা দিবার জন্য, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে কোন কোন মানুষকে অসাধারণ সৎ প্রবৃত্তি ও সৎ শক্তি দিয়া থাকেন। সেই সকল অসাধারণ ব্যক্তিগণ "অবতার" নহেন।

৩। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতি সকলেই মহামানব ছিলেন, তাঁহারা উচ্চ সৎবৃত্তি, এবং উচ্চ সৎ শক্তি সম্পন্ন মানুষ ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহই তথাকথিত "অবতার" ছিলেন না।

(১) তাঁহাদের প্রত্যেকের জীবনের ইতিহাস, অন্ধ বিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, নিরপেক্ষ ভাবে বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে যে, তাঁহারা অল্প দোষ মিশ্রিত মহৎ গুণ সম্পন্ন মানুষ ছিলেন।

(২) যদিও তাঁহারা সাধুগণের পরিত্রাণের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাদের সাধু-পরিত্রাণ ও দুষ্কৃত বিনাশের শক্তি সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিয়া অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তি প্রকৃত সাধু হইয়াছিলেন।

৪। আমাদের ধর্মানুশীলনের উদ্দেশ্য হইতেছে, আমাদের নিজ নিজ মনে ধর্মভাব উদ্দীপিত করা, এবং তাহার সাহায্যে ঈশ্বর লাভ করা। 'অবতার' সম্বন্ধে এই সত্য জানিলে আমাদের ধর্মানুশীলনের কোন ক্ষতি হইবে না। বরঞ্চ, সত্য বস্তু জানিয়া ধর্মঅনুশীলন করা বাঞ্ছনীয়।

৫। মনে ধর্মভাব উদ্দীপন নানা ভাবে করা যায়—

(১) "অবতার" পুরুষের বিষয় চিন্তা করিয়া, কিংবা (২) অতি মানবের বিষয় চিন্তা করিয়া, অথবা (৩) কল্পিত উচ্চ চরিত্র ব্যক্তির সম্বন্ধে উপাখ্যান পড়িয়া অথবা অভিনয় দেখিয়াও, মনে ধর্ম ভাব উদ্দীপিত করা যায়,

৬। অবশ্য ইহা সত্য যে, শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণকে ঘিরিয়া, সর্বভারতের হিন্দুগণের মধ্যে অপূর্ব "রামলীলার" ও "রাধাকৃষ্ণ" লীলার মাধ্যমে যে ধর্মভাব উদ্দীপনকারী অসীম ভক্তির বন্যা বহিয়া গিয়াছে, এবং এখনও যাইতেছে, তাহার তুলনা আছে কিনা সন্দেহ। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্তগণও ধর্মভাব উদ্দীপনকারী ভক্তির স্রোত বহাইয়া দিয়াছেন এবং আজিও দিতেছেন। সেজন্য বলিতে হয়, "অবতার" বাদ আক্ষরিক ভাবে সত্য না হইলেও, ধর্মানুশীলন কারীগণের পক্ষে বিশেষ মঙ্গলকর।

৭। "অবতার" বাদ সম্বন্ধে দুজন মহাপুরুষের বক্তব্য উল্লেখযোগ্য।

(১) স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—

অবতার পুরুষেতেই ঈশ্বরকে দেখিতে হইবে। আমাদের ভিতরেও ঈশ্বর আছেন বটে, কিন্তু অবতার পুরুষের মধ্যেই তিনি বেশী প্রকাশ।

(২) শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের অন্য একজন শিষ্য, স্বামী বিজ্ঞানানন্দ বলিয়াছেন—

"অবতার" পুরুষ বলিয়া কেহ নাই। শ্রীরামকৃষ্ণদেব অবতার ছিলেন না। তিনি একজন "প্রথম শ্রেণীর আত্মা" ছিলেন।

তিনি অতি অল্প বয়সে শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের কৃপা পাইয়াছিলেন। তিনি বুদ্ধিমান, বিদ্বান, চির কুমার, সত্যবাদী, ব্রহ্মচারী ছিলেন। তিনি তাঁহার গুরুদেবের উপদেশে কঠোর পরিশ্রম করিয়া দীর্ঘকাল এলাহাবাদে ও অন্যত্র সাধন ভজন করিয়াছিলেন। তিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের একান্ত ভক্ত ছিলেন। তাঁহার উপরোক্ত উক্তি ও দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য, তাঁহার গুরুভক্তি তিলমাত্রও কম ছিল না।

মন্তব্য। এ পর্য্যন্ত হিন্দুধর্মের সারতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রাথমিক কথাগুলি আলোচিত হইল। এক্ষণে সেই সারতত্ত্বগুলি বিশ্লেষণ করা হইতেছে। হিন্দুধর্মের সারতত্ত্বগুলি খুব বেশী না হইলেও, এই প্রবন্ধে তাহাদের সবগুলি আলোচনা করা অসম্ভব। বিশেষতঃ এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় হইতেছে—ধর্ম ও বিজ্ঞানের মিলন। তদুপরি, হিন্দুধর্মের সারতত্ত্বের মধ্যে প্রধান তত্ত্ব হইতেছেন ঈশ্বর। তাঁহার দর্শন লাভ না হইলে তাঁহার সম্বন্ধে সকল তত্ত্ব জানা যায় না। এবং সেইভাবে যতটুকু জানা যায়, তাহাও অন্যের নিকট পরিষ্কার ভাবে বর্ণনা করা যায় না। সেইজন্য শাস্ত্র গ্রন্থের বাক্য হইতে, এবং শাস্ত্র শিক্ষকগণের উপদেশ হইতে যাহা জানা যায়, তন্মধ্যে সাধারণ পাঠক পাঠিকার জন্য আবশ্যকীয়তত্ত্ব (ও অনুষ্ঠানগুলির উদ্দেশ্য), আমার নিজ সীমাবদ্ধ জ্ঞান বুদ্ধির সাহায্যে এখানে নিবেদন করিতেছি।

হিন্দুধর্মের সারতত্ত্ব।

ঈশ্বরতত্ত্ব।

১। শাস্ত্রে বলা হইয়াছে যে, ঈশ্বর বাক্য-মনের অতীত। অর্থাৎ, আমাদের মনের দ্বারা তাঁহাকে উপলব্ধি করা যায় না, এবং বাক্যের দ্বারা তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করা যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ইহা স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন—(১) সাধন ভজনের দ্বারা মন শুদ্ধ করিতে পারিলে, সেই শুদ্ধ মনে তাঁহাকে উপলব্ধি করা যায়, এবং (২) ঈশ্বরের স্বরূপ যে কি তাহা মুখে বলা যায় না, অর্থাৎ ঈশ্বর কখনও উচ্ছিষ্ট হয়েন নাই।

২। তাঁহার সম্বন্ধে শাস্ত্র বাক্যে যে সকল সীমাবদ্ধ বর্ণনা করা হয়, তাহার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বর্ণনা এই—

(১) তিনি সৎ-চিৎ-আনন্দ অর্থাৎ তিনি চিরস্থায়ী, চৈতন্য শক্তি এবং আনন্দপূর্ণ।

(২) তিনি সত্য-জ্ঞান-অনন্ত অর্থাৎ, তিনি একমাত্র সত্য পদার্থ, চৈতন্যময় ও অনন্ত।

(৩) তিনি সত্য-শিব-সুন্দর-অর্থাৎ তিনি সত্য, মঙ্গলময় ও সৌন্দর্য্যের আধার।

(৪) তিনি সত্য-প্রেম-পবিত্রতাস্বরূপ—অর্থাৎ, তিনি এই তিনটি গুণের প্রতীক। তাঁহাকে লাভ করিতে হইলে, আমাদের জীবনে নীতির পথে (ক) সত্য অনুশীলন, (খ) সকল জীবের প্রতি—ভালবাসা প্রদর্শন, এবং (গ) সকল প্রকার অপবিত্রতা বর্জন, করিয়া চলিতে হইবে।

(৫) তিনি নিরাকার ও সাকার—অর্থাৎ, তিনি সম্পূর্ণ নিরাকার। তবে, তিনি পরম ভক্তের প্রার্থনায়, তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত মূর্ত্তিতে বা রূপে দেখা দেন—এই অর্থে তিনি সাকার।

(৬) তিনি নির্গুণ ও সগুণ অর্থাৎ, তিনি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির পূর্বে নির্গুণ ছিলেন, এবং এখনও নির্গুণ আছেন। তবে, সৃষ্টি করিবার জন্য কোন কোন গুণ ধারণ করেন বলিয়া তিনি এক হিসাবে সগুণও বটে। অবশ্য তিনি নির্গুণ অবস্থায় চৈতন্য শক্তির ও আনন্দের আধার।

(৭) তিনি এক ও অদ্বিতীয় অর্থাৎ, এইজগতে তিনিই একমাত্র সত্যবস্তু। তিনি ভিন্ন অন্যকোন বস্তুর পৃথক অস্তিত্ব নাই। অন্য যাবতীয় বস্তুই তিনি, অথবা তাঁহার দ্বারা কৃত। এই "একেশ্বরবাদ" বহু সহস্র বৎসর পূর্বে পৃথিবীর মধ্যে সর্বপ্রথমে এই ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত ও প্রচারিত হইয়াছিল।

(৮) সর্বখল্বিদং ব্রহ্ম এই জগতে যাহা কিছু আছে, সবই তিনি—সেই নির্গুণ ও সগুণ ঈশ্বর। সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা, অন্য গ্রহ নক্ষত্রাদি, পৃথিবী, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, সকল স্থাবর ও অস্থাবর দ্রব্য, মনুষ্য প্রভৃতি সকল জীব,

মানুষের ভিতরে পঞ্চভূত, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র, ষড়রিপু, মন, বুদ্ধি, বিবেক, চিন্তাশক্তি, অনুভব শক্তি, ক্রিয়াশক্তি, পুণ্য-পাপ, ধর্ম-অধর্ম, আনন্দ নিরানন্দ, সুখ-দুঃখ জন্ম-মৃত্যু, জন্মান্তর প্রভৃতি এই জগতে যাহা কিছু দেখিতে,শুনিতে,চিন্তা বা কল্পনা করিতে পারা যায়—সকলই তিনি। সেগুলি তাঁহার ভিতর হইতে আসিয়াছে, এবং তাঁহার দ্বারা সৃষ্টি হইয়াছেন, তিনি সেই সকল দ্রব্যের ভিতর ওতপ্রোতভাবে রহিয়াছেন এবং তাহাদের বাহিরেও রহিয়াছেন। সমস্ত বস্তু তাঁহার ইচ্ছার অধীনে পরিচালিত হইতেছে, কিন্তু তিনি কাহারও অধীন নহেন। উপমা স্বরূপ বলা হইয়াছে, মাকড়সা যেমন নিজের শরীরের ভিতর হইতে লালা জাতীয় একপ্রকার পদার্থ বাহির করিয়া, তদ্দ্বারা সুতা প্রস্তুত করিয়া তাহার দ্বারা জাল-বুনিয়া,সেই জালের উপর বসিয়া সকল কার্য্য করে, তেমনই ঈশ্বর তাঁহার ভিতর হইতে যাবতীয় পদার্থ বাহির করিয়া এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। সেইজন্য বলা হয় যে, ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ এবং উপাদান কারণ। তিনি সর্বব্যাপী ও সর্বনিয়ন্তা।

(৯) তিনি সুখ-দুঃখ রহিত, জন্ম মৃত্যু রহিত—অর্থাৎ তিনি চিরস্থায়ী ও অপরিবর্ত্তনীয়। তাঁহার জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই, তিনি সুখদুঃখের অতীত, চির আনন্দময়!

(১০) তিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কারণ—তিনি অনাদি অতীত কালে এই জগৎসৃষ্টি করিয়াছিলেন-কিছু-কাল সেই সৃষ্ট জগৎ তিনি ধারণ করিয়া, পরে তাহা ধ্বংস বা লয় করেন। পরে, তিনি পুনরায় সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করেন। এবং এই ভাবেই অনন্তকাল ধরিয়া উহা করিয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমান জগৎও একদিন সম্পূর্ণ-ভাবে লয় হইবে।

সৃষ্টিতত্ত্ব।

১। কল্পনার সীমার বাহিরে, কোন অনন্ত অতীতকাল পূর্বে, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড, অথবা আমরা যাহা দেখিতে, শুনিতে, চিন্তা বা কল্পনা করিতে পারি, তাহার কিছুই ছিল না। সেই সময় কেবলমাত্র এক নিরাকার ও নির্গুণ ব্রহ্ম ছিলেন।

২। পরে আজি হইতে কোন অনন্তঅতীতকালে, সেই-ব্রহ্ম (ঈশ্বর) একা থাকা অবস্থায় 'বহু' হইতে ইচ্ছা করিলেন, তখন তিনি, ক্রমে ক্রমে, বিবর্ত্তনবাদের ও ক্রমবিকাশের নিয়ম প্রবর্ত্তন পূর্বক, এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করিলেন।

৩। সেই নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টি করিবার জন্য, কোন কোন গুণ ধারণ করিয়া এক হিসাবে সগুণও হইলেন।

৪। সেই সগুণ ঈশ্বর প্রথমে দুটি প্রকার দ্রব্য সৃষ্টি করিলেন। একপ্রকার দ্রব্য হইল তিনটি শক্তি বা তিনটি গুণ- সত্ত্ব রজ ও তম। অন্য প্রকার দ্রব্যটি হইল একটি পুরুষ। ঐ পুরুষ ব্রহ্মের (ঈশ্বরের) চৈতন্য শক্তির অংশ বিশেষ, এবং তাহার সহিত ঐ সকল শক্তির বা গুণের বিশেষ পার্থক্য ছিল। তবে, ঐ পুরুষ বা আত্মা বা জীবাত্মা ঈশ্বরের চৈতন্যের অংশ হইলেও, এবং অমর হইলেও, ঐ পৃথক অবস্থায় তাঁহার ন্যায় সম্পূর্ণ স্বাধীন ও শক্তি সম্পন্ন নহে।

৫। ঈশ্বর প্রথমে ঐ তিনটি গুণকে মিলিত ও স্থির ভাবে রাখিয়াছিলেন। পরে, ঐ পুরুষের সান্নিধ্যে ঐ তিনগুণের স্থিরতা নষ্ট হইয়াছিল। সেই তিনগুণের সাহায্যে এবং তাহাদিগকে বিভিন্নভাবে ও বিভিন্ন পরিমাণে সংমিশ্রিত করিয়া, ঈশ্বর ক্রমে ক্রমে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত দ্রব্য সৃষ্টি করিলেন। এবং সেই সঙ্গে ঐ ত্রিগুণহইতে 'মায়া' নামক আর একটি শক্তি সৃষ্টি করিলেন। মোটামুটী ভাবে বলা যায়—(১) সত্ত্বগুণ সকল সৎবৃত্তির সমষ্টি, (২) রজগুণ সৎ ও অসৎ কর্য্যে প্রবণতা যোগায়, (৩) তম গুণ আলস্য, নির্বুদ্ধিতা ও অসৎ গুণের আধার এবং (৪) মায়া-অবিদ্যা, ভুল ধারণা, ও অসৎ কার্য্যে প্রবণতা যোগায়।

৬। মনুষ্য মাত্রই সুখের আকাঙ্ক্ষা করে, এবং দুঃখ নিবৃত্তি চায়। প্রকৃত সুখ, শান্তি ও আনন্দ লাভের একমাত্র উপায় হইতেছে ঈশ্বর লাভ। সেইজন্য, মনুষ্য মাত্রেরই শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য হইতেছে ঈশ্বর লাভের চেষ্টা করা। সেইপথে, আমাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য, ঈশ্বর আমাদিগকে (অর্থাৎ আমাদের দেহমধ্যেস্থিত জীবাত্মাকে)একটি করিয়া অসীম শক্তি সম্পন্ন মন দিয়াছেন। সে তাহাদিগকে ভাল ও মন্দ পথে লইয়া যাইতে পারে ও তাহার চেষ্টা শেষ করে। আমাদের কর্ত্তব্য হইতেছে (১) সেই মনকে অধীন রাখিয়া, (২) মনের সাহায্যে ষড়রিপু দমন করিয়া, (৩) মায়ার বন্ধন

ছিন্ন করিয়া, ক্রমে ক্রমে, উত্থান পতনের মধ্য দিয়া, ঈশ্বর লাভের পথে অগ্রসর হওয়া।

৭। ঈশ্বর লাভ করিতে হইলে—

(১) মনকে জাগতিক সমস্ত বিষয় হইতে উঠাইয়া আনিতে হইবে, অর্থাৎ মনে সম্পূর্ণ বৈরাগ্য ভাব সৃষ্টি করিতে হইবে,

(২) সেই বৈরাগ্য যুক্ত মনকে সম্পূর্ণ একাগ্র করিতে হইবে, এবং

(৩) সেই একাগ্রতা যুক্ত মন ঈশ্বরে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করিতে হইবে।

৮। উপরোক্ত ভাবে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করা অত্যন্ত কঠিন। সেজন্য, আমাদের পক্ষে একান্ত আবশ্যক হইতেছে—

(১) সত্য-প্রেম-পবিত্রতার পথে, নৈতিক জীবন যাপন করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা, এবং

(২) বহুদিন ধরিয়া, নিয়ত বহু পরিশ্রম করিয়া, ব্যাকুলভাবে ঈশ্বরের সাধন ভজন অভ্যাস করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা।

মন্তব্য। ধর্ম সাধনার পথে, উপরোক্ত যুক্ত চেষ্টাকে পাতঞ্জল দর্শনে ও গীতাশাস্ত্রে—"অভ্যাস" ও "বৈরাগ্য" বলা হইয়াছে। যতদিন পর্য্যন্ত আমাদের মনে এই প্রকার কঠোর পরিশ্রম করিবার জন্য জলন্ত আগ্রহ না আসিবে, ততদিন পর্যন্ত আমাদের সার্থক ধর্ম লাভের সময় আসে নাই বলিয়া বুঝিতে হইবে।

৯। প্রত্যেক মানুষের ভিতর, তাহার নিজ আত্মা (জীবাত্মা) এবং সর্বব্যাপী ঈশ্বর (পরম আত্মা) পাশাপাশি অবস্থান করিতেছেন। পরমাত্মা হৃদয়ের মধ্যে আছেন, এবং আমাদের পক্ষে তাঁহাকে সেই স্থানেই চিন্তা ও ধ্যান করা আবশ্যক।

১০। জীবাত্মা কখনও মনের ও মায়ার অধীন হইয়া কুপথে চলিয়া যায়, আবার কখনও তাহাদের অধীনতা হইতে মুক্ত হইয়া সুপথে অগ্রসর হয়। পরমাত্মা জীবত্মার পাশে থাকিয়া, তাহার উত্থান-পতন এবং ঈশ্বর লাভের চেষ্টা দেখিতেছেন, এবং তাহার ঈশ্বর লাভ, অর্থাৎ তাহার পরমাত্মার সহিত মিলন দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। ইহাই মানুষের সহিত তাঁহার একটি অপূর্ব খেলা বা "লীলা"।

১১। অবশ্য, ঈশ্বরের লীলার বহু বিষয় আমরা জানিনা এবং শাস্ত্রকারগণও পরিষ্কার ভাবে জানান নাই। তিনি কেন পাপ, দুঃখ সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি কেন আমাদিগকে কুমতি দিয়াছেন, তিনি কেন আমাদিগকে কুকার্য্যের জন্য ক্ষমা না করিয়া ভোগ কর্মফল ভোগ করান, ইহার সন্তোষ জনক উত্তর নাই।

১২। হিন্দুধর্মে, মানুষ সৃষ্টির মধ্যে দুটি উল্লেখ যোগ্য নিয়ম হইতেছে (১) জন্মান্তর বাদ, ও (২) কর্মফল বাদ। মানুষের মৃত্যু হইলে তাহার দেহ ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুৎ-ব্যোম নামক পঞ্চভূতে মিশিয়া যায়। তখন তাহার আত্মা, মনের সহিত এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সূক্ষ্ম সংস্কারের সহিত, দেহ হইতে বাহির হইয়া, প্রথমে কম বেশী কিছুদিন আকাশে বাস করে। তাহার পর, পূর্বজন্মকৃত কর্মফলের জন্য, সেই আত্মা সেই মন সহ অন্য দেহে প্রবেশ করে। তবে, কর্মফল অনুসারে, সেই নূতন দেহ, মানুষের বা অন্য জীবের অথবা উদ্ভিদের দেহ হইতে পারে।

১৩। আমরা নিজ নিজ কর্মের ফল হিসাবে সুখ-দুঃখ প্রভৃতি ভোগ করি। কিন্তু ঈশ্বর কর্মফল দাতা ও সর্ব শক্তি সম্পন্ন। তিনি যখন ইচ্ছা, যাহাকে ইচ্ছা, কর্মফল হইতে মুক্ত করিতে পারেন, এবং সর্বদাই তিনি তাহা করিয়া থাকেন। আন্তরিক ভক্তির সহিত ও কাতরতার সহিত তাঁহাকে ডাকিলে, তিনি ভক্তের প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। সারা জগতে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা, এবং সেজন্য তাঁহার দয়া, এই কর্মফল হইতে অব্যাহতির প্রমাণ।

সাধন ভজনের নানা পথ।

১। হিন্দু শাস্ত্রে সাধন ভজনের নানা পথ, নানা ভাব ও নানা মত উল্লেখ আছে।

(১) জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম, রাজযোগ প্রভৃতি বিভিন্ন পথ।

(২) শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর প্রভৃতি বিভিন্ন ভাব।

(৩) শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপত্য, অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, নিরাকারবাদ, সাকার-নিরাকারবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন মত।

২। যাঁহার যেটি উপযুক্ত বা উপকারী বলিয়া মনে

হইবে, তিনি নিজে বিবেচনা করিয়া, অথবা গুরু শিক্ষক প্রভৃতির নিকট উপদেশ লইয়া, সেইটিই অনুশীলন করিতে পারেন। আবশ্যক হইলে, তিনি একটি হইতে অন্যটিতে যাইতে পারিবেন। তিনি উহাদের মধ্যে সম্ভাব্য মিশ্রিত পথ, ভাব ও মত অনুশীলন করিতে পারেন। আন্তরিকতার সহিত যে কোন মত,পথ বা ভাব অবলম্বন করিয়া, যথাসাধ্য পরিশ্রম পূর্বক ধর্ম অনুশীলন করিলে, ঈশ্বরের কৃপায় যথাসময়ে ঈশ্বর লাভ হইবে। ইহার একটি কারণ এই যে, প্রত্যেকটি পথ ও মতের এবং ভাবের ভিতর সত্য নিহিত আছে।

৩। বিভিন্ন মত ও পথ সম্বন্ধে, দুটি কথা মনে রাখিতে হইবে—

(১) বিভিন্ন পথ বা ভাব পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন বস্তু নহে। একপথের সাধনার সহিত অন্য পথের সাধনার সংযোগ আছে। জ্ঞানপথ অনুশীলনকারীর পক্ষে, কিছু ভক্তি ও কর্ম অনুশীলন আবশ্যক। ভক্তিপথে, জ্ঞান ও কর্মের আবশ্যক আছে। কর্ম পথে, জ্ঞান ও ভক্তির আবশ্যক আছে। বিভিন্ন ভাবের সাধনায়ও কিছু কিছু সংযোগ আছে।

(২) নিজ নিজ অনুসৃত মত ও পথ সত্য ইহা ঠিক। কিন্তু অন্য মত বা পথ ঠিক নহে, এই ধারণা ভুল।

হিন্দু ধর্মের অনুষ্ঠানগুলির প্রকৃত উদ্দেশ্য।

১। আমাদের ধর্ম-শিক্ষকগণ, আমাদের মঙ্গলার্থে, বৈদিক যুগের যাগ যজ্ঞ, পরবর্তীকালের তান্ত্রিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি নানা প্রকার অনুষ্ঠান প্রচলন করিয়া গিয়াছেন। ঈশ্বর লাভের জন্য সাধন ভজনের সময়, আমাদের মনকে জাগতিক বিষয় হইতে উঠাইয়া আনিবার জন্য চেষ্টা করিবার পথে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে বিবিধ ধর্মানুষ্ঠান করিবার জন্য তাঁহারা আমাদিগকে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন।

২। যাহাতে আমরা অধিক সময় নানা প্রকার পূজা অনুষ্ঠানে কাটাইতে পারি, এবং সেই সময় ঈশ্বর চিন্তায় মনোনিবেশ করিতে পারি, সেই উদ্দেশ্যে তাঁহারা আমাদের জন্য বহুক্ষণস্থায়ী বহু অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ঐ অনুষ্ঠানগুলির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ধ্যান, অর্থাৎ ঈশ্বরের চিন্তা।

৩। হিন্দুধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান হইতেছে গায়ত্রী মন্ত্র জপ। ঐ মন্ত্রে বলা হয়েছে—"যে ঈশ্বর এই পৃথিবী, আকাশ ও গ্রহ নক্ষত্র সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যিনি আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি দিয়াছেন, তাঁহার বরণীয় জ্যোতি আমরা ধ্যান করি।"

ইহা হইতে আমাদের আর্য্য ধর্মের মহান আদর্শ ও উপাসনা পদ্ধতি পরিষ্কারভাবে জানা যায়। এই গায়ত্রী মন্ত্রের ভিতর নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিশেষ প্রণিধান যোগ্য—

(১) ইহাতে আমাদিগকে ধ্যান করিতে বলা হইয়াছে। সকল প্রকার ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে ঈশ্বরের ধ্যান সর্বাপেক্ষা আবশ্যক।

(২) ইহাতে "নিরাকার" ঈশ্বরের ধ্যান করিতে বলা হইয়াছে।

(৩) ইহাতে ঈশ্বরের "নিরাকার জ্যোতির" ধ্যান করিতে বলা হইয়াছে। ঈশ্বর লাভের পূর্বে, তাঁহার নিরাকার সত্তার সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্মগুণ আমাদের পক্ষে ধ্যানের উপযুক্ত, এই জ্যোতি।

(৪) এই ধ্যান ফলপ্রসূ করিবার জন্য, সাধককে ঈশ্বরের অসীমত্ব জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তিনি এই পৃথিবী-আকাশ-গ্রহ-নক্ষত্রযুক্ত সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা সর্বদা মনে রাখিয়া ধ্যান করিতে বলা হইয়াছে।

(৫) এই ধ্যানের মধ্যে কোন প্রকার জাগতিক বস্তু প্রাপ্তির প্রার্থনা, বা অন্য কোন প্রার্থনা নাই।

(৬) এই ধ্যানের কোন সম্ভাব্যফলের কোন ইঙ্গিত নাই। সাধককে এই মন্ত্রে ধ্যান করিয়া যাইতে বলা হইয়াছে, এবং ফলাফল ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার ঐ প্রকার ধ্যান করিয়া যাইতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

৪। হিন্দুধর্মের অনুষ্ঠানগুলির সম্বন্ধে উপরোক্ত কথাগুলি মনে রাখিয়া, এবং নৈতিক জীবন যাপন করিয়া, ধ্যান পূজা প্রভৃতিতে মন সংযুক্ত করিয়া উহাদিগকে অনুশীলন করিলে, আমাদের সাধন ভজন সফল হইবে, এবং তখন আমরা সেই সকল অনুষ্ঠানের প্রকৃত উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব।

৫। আমাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে, কোন কোনটিতে মন্ত্রশক্তি আছে, আবার কোন কোনটি

দোষযুক্ত আছে। আমাদিগকে ভক্তিযুক্ত সাহসের সহিত বিচার বুদ্ধি ব্যবহার করিয়া, সেই সকল দোষযুক্ত অনুষ্ঠান বর্জন করিতে হইবে।

* অদ্বৈতজ্ঞান, নৈতিক জীবন, আত্ম বিশ্লেষণ।

যে কোন পথে বা মতে সাধন ভজনের সফলতার জন্য একান্ত আবশ্যক হইতেছে—(১) অদ্বৈতজ্ঞান, (২) নৈতিক জীবন যাপন, ও (৩) আত্মবিশ্লেষণ।

ক। অদ্বৈতজ্ঞান—সর্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, সকলের চরম সাধনের বস্তু হইতেছেন—এক ঈশ্বর, যিনি জগতের সমস্ত জীবের ও দ্রব্যের ভিতর সর্বদা বিদ্যমান আছেন। তাই, শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন—অদ্বৈতবাদ আঁচলে বেঁধে যে কোন পথে সাধন করিতে হইবে।

খ। সত্য—প্রেম—পবিত্রতা পালন না করিলে সাধন ভজনে সুফল হইবে না। তবে, প্রথমে সত্য পথ রূপ একটি নৈতিক পথ অনুসরণ করিলে, অন্য সকল নৈতিকগুণ ক্রমে ক্রমে আয়ত্তে আসিবে। একটি উদাহরণ—পানা পূর্ণ পুকুরের একদিকের পানা ধরিয়া টানিতে থাকিলে, ক্রমে ক্রমে সমস্ত পানা চলিয়া আসিবে, এবং পুকুরটি নির্মল হইবে।

গ। প্রতিদিন চিন্তা করিতে হইবে—আমি কি কাম—ক্রোধ—লোভ—অহংকার—স্বার্থপরতা বিষয়ে পূর্বদিন অপেক্ষা উন্নতি করিতে পারিয়াছি? পারিয়া থাকি আর না পারিয়া থাকি, আমি যেন আগামী কল্য, উহার জন্য বেশী চেষ্টা করি।

মন্তব্য—জন্মান্তরবাদী হিন্দুশাস্ত্রের মত এই—সারা জীবনের কৃত ভাল ও মন্দ কার্য্য অনুসারে, মৃত্যুকালের মানসিক অবস্থা স্থির হয়, এবং সেই মৃত্যুকালীন মানসিক অবস্থার উপর আমাদের পরজন্মের অবস্থা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে। আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য হইতেছে, এমন ভাবে সারা জীবন কাজ করিয়া যাওয়া, যাহাতে মৃত্যুর সময়ে কেবল মাত্র ঈশ্বরের চিন্তা মনে স্থান পায়, আর অন্য কোন চিন্তা না আসিতে পারে।

অবতার-বাদ ও বিজ্ঞান।

(১)। হিন্দুধর্মের দশ অবতারের নাম হইতেই দেখা যায় যে, তাঁহারা "অবতীর্ণ" ঈশ্বর নহেন। প্রথম তিনটি অবতার হইতেছেন—(১) মৎস্য, (২) কূর্ম, (৩) বরাহ। এই তিনটি জীব পৃথিবী সৃষ্টি হওয়ার পর, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় জীব।

২। বিজ্ঞান বলিয়াছে যে, সূর্য্যের নিকট হইতে একটি ভীষণ উত্তপ্ত গ্যাস জাতীয় দ্রব্য-বাহির হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে ক্রমে শীতল হইয়া জল মাটি প্রভৃতিতে পরিণত হইয়া অবশেষে এই পৃথিবী সৃষ্টি হয়। তাহাতে প্রথমজীব জলের ভিতর সৃষ্টি হয়। সেই মৎস্য জাতীয় জীব আমাদের মৎস্য অবতার। তারপর সৃষ্টজীব কূর্ম, যে স্থলে থাকিত ও জলেও যাইত, সেই জীব আমাদের কূর্ম অবতার। তারপর সৃষ্টজীব বরাহ, যে স্থলে ও কাদায় থাকিত। সেইজীব আমাদের বরাহ অবতার। তার পর, বিবর্ত্তন বাদের নিয়মে, ক্রমে ক্রমে, অন্যান্য জীবজন্তু ও সর্বশেষে মনুষ্য সৃষ্টি হয়।

৩। আমাদের শাস্ত্রকারগণ এই সৃষ্টিতত্ত্ব ও বিবর্ত্তনবাদের নিয়ম জানিতেন। তাঁহারা তাহাই আমাদিগকে উপরোক্ত দশঅবতারের দ্বারা রূপকের সাহায্যে জানাইয়া গিয়াছেন। আমরা বিচারবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া সেইগুলির আক্ষরিক সত্যে বিশ্বাস করিয়া চিরকাল ভুল করিয়া আসিতেছি। হিন্দুধর্ম যে বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত, এই অবতারবাদ তাহার একটি প্রমাণ।

হিন্দুধর্মের উৎপত্তি ও ইতিহাস।

হিন্দুধর্মের সারতত্ত্ব ও অনুষ্ঠানগুলির উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, তাহার উৎপত্তি ও ইতিহাস কতক পরিমাণে জানা আবশ্যক। নতুবা, সে সম্বন্ধে একটি সর্বাঙ্গীন জ্ঞান লাভ করা কঠিন হইবে। এ বিষয়ে বহু গবেষণা ও পুস্তক রচনা হইয়াছে, এবং বেদ—উপনিষদ প্রভৃতি হিন্দু শাস্ত্র গ্রন্থে অনেক তথ্য নিহিত আছে। সহৃদয় পাঠক পাঠিকার নিকট সংক্ষেপে সে বিষয়ের সিদ্ধান্তগুলি নিবেদন করিতেছি।

হিন্দুধর্মের উৎপত্তি স্থান ও ইতিহাস।

১। বহু সহস্র বৎসর পূর্বে, উত্তর এশিয়ার মেরু প্রদেশে এই ধর্ম জন্মগ্রহণ করে। তখন সেটি বহু-ঈশ্বরবাদী ধর্ম ছিল, এবং তাহাতে সূর্য্য, চন্দ্র প্রভৃতি প্রাকৃতিক উপাসনা হইত। মহামান্য তিলকের "আর্যজাতির উত্তর মেরু প্রদেশে বাস" নামক ইংরাজী গ্রন্থ এ বিষয়ে দ্রষ্টব্য।

২। উৎপত্তির বহু সহস্র বৎসর পরে, এবং এখন

হইতে বহু সহস্র বৎসর পূর্বে, এই ধর্ম মধ্য এশিয়ার পারস্য দেশের নিকটবর্তী স্থানে আগমন করে, এবং প্রচলিত থাকে। বোম্বাই প্রদেশে আনিত পার্শি ধর্ম তখন পারস্য দেশে ঐ প্রকার বহু-ঈশ্বরবাদী ধর্ম হিসাবে প্রচলিত ছিল। ঐ দুটি ধর্মের মধ্যে, এবং বর্ত্তমান একেশ্বরবাদী ভারতবর্ষীয় হিন্দুধর্মের মধ্যে বহু সাদৃশ্য ছিল ও আছে।

(১) পার্শীধর্ম ও আমাদের সেই আর্য্য ধর্ম জেন্দ ভাষায় প্রচলিত। জেন্দ ভাষার সহিত বর্ত্তমান সংস্কৃত ভাষার অনেক সাদৃশ্য আছে।

(২) সেই আর্য্য ধর্মে প্রাকৃতিক শক্তির মধ্যে অগ্নিকে প্রাধান্য দেওয়া হইত।

(৩) সেই আর্য্য ধর্মে ভারতীয় হিন্দু ধর্মের ন্যায় সোমরসের উল্লেখ আছে, ইত্যাদি।

৩। তাহার বহু সহস্র বৎসর পরে, এবং এখন হইতে বহু সহস্র বৎসর পূর্বে, সেই বহু ঈশ্বরবাদী আর্য্য ধর্ম উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করে, এবং সিন্ধু দেশে ও সিন্ধু নদীর কাছাকাছি উহা প্রচলিত থাকে।

৪। বৈদিক যুগের প্রথম অংশে, আমাদের হিন্দু জাতির পূর্বপুরুষগণ, এই ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম অংশে বহু-ঈশ্বরবাদ যুক্ত প্রাকৃতিক শক্তির পূজা করিতেন। সেই সময়ের প্রথম দিকে, আমাদের মধ্যে জাতিভেদ সৃষ্টি হয় নাই। সেই "সিন্ধু" অঞ্চলে প্রচলিত আর্য্য ধর্মকে, অভারতীয় ব্যক্তিগণ "সিন্ধুর" অপভ্রংশ "হিন্দু" নাম দিয়াছিলেন। তদবধি, আমাদের ধর্ম, "হিন্দু" ধর্ম এবং আমরা "হিন্দু" জাতি বলিয়া সারা জগতে পরিচিত।

৫। তাহার পরে, অথচ একেশ্বর-বাদ প্রতিষ্ঠা হইবার পূর্বে, বিভিন্ন কার্য্য সুচারু রূপে নিষ্পন্ন করিবার জন্য, হিন্দুগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নামক তিন জাতিতে বিভক্ত হয়েন। পরে, শূদ্র জাতি সৃষ্টি হওয়ায়, তাঁহারা চারি জাতিতে পরিণত হইয়াছিলেন।

৬। ইহার ফলে, কতকগুলি ব্রাহ্মণ, অন্যান্য কর্ত্তব্য কার্য্য করিবার সঙ্গে, নির্জনে তপোবনে ঈশ্বর চিন্তা করিতেন। তাঁহারা, ঈশ্বরে মন সমাহিত করিয়া, ঈশ্বরকে জানিতে পারিয়াছিলেন, এবং তাহারই ফলে, একেশ্বর বাদের মূল তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন। কোন কোন ক্ষত্রিয় পুরুষ এবং কোন কোন স্ত্রীলোক ঐ যুগে একেশ্বরবাদের মূলতত্ত্ব জানিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারা জানিয়াছিলেন যে, এই জগতে একমাত্র সত্যতত্ত্ব হইতেছেন এক ঈশ্বর, এবং সকল প্রকার বস্তু, জীব, চিন্তা অনুভব, ক্রিয়া ও শক্তি-সমস্তই ঈশ্বর হইতে আসিয়াছে, এবং তৎসমস্তই সেই নিরাকার ঈশ্বরের অংশ স্বরূপ।

৭। সেই একেশ্বর তত্ত্ব আজি হইতে বহু সহস্র বৎসর পূর্বে, জগতের মধ্যে সর্বপ্রথমে এই ভারতবর্ষে আমাদের এই হিন্দুধর্মে আবিষ্কৃত ও প্রচারিত হইয়াছিল, এবং পরে তাহা জগতের সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছে।

৮। সেই একেশ্বরবাদ আবিষ্কারের ফলে, ভারতবর্ষের ধর্মজীবনে যুগান্তরকারী পরিবর্ত্তন আসিয়াছিল।

(১) তখন হইতে, হিন্দুধর্মের প্রাকৃতিক শক্তি পূজা আর বিভিন্ন শক্তির বিভিন্ন পূজা রহিল না। প্রত্যেকটি শক্তির পূজা একই ঈশ্বরের পূজা বলিয়া গৃহীত হইল। হিন্দুধর্মের ভিতর সকল প্রকার পূজা ও উপাসনার মধ্যে এই ভাবে সমন্বয় স্থাপিত হইল।

(২) হিন্দুধর্মের পাশাপাশি, অনেক বহু-ঈশ্বরবাদী ধর্ম সে সময় প্রচলিত ছিল। সেগুলির ভিতর ক্রমে ক্রমে একেশ্বরবাদ প্রবেশ করিল। সেই সকল বিভিন্ন শক্তির, মূর্ত্তির, গাছ, পাথর প্রভৃতির পূজা একই ঈশ্বরের পূজা বলিয়া বিবেচিত হইতে লাগিল। ইহার ফলে, ক্রমে ক্রমে অধিকাংশ অ-হিন্দু ধর্মগুলি, হিন্দু ধর্মের সহিত মিশিয়া গেল, এবং সেগুলি হিন্দুধর্মের বিভিন্ন শাখা বলিয়া পরিগণিত হইল।

৯। এই ভাবে, হিন্দুধর্মে সর্বধর্মসমন্বয় বাদ প্রতিষ্ঠিত হইল। এই সর্বধর্মসমন্বয় বাদ, অতি প্রাচীনকালে, পৃথিবীর ধর্মের ইতিহাসে সর্বপ্রথমে, এই ভারতবর্ষে আমাদের এই হিন্দুধর্মে আবিষ্কৃত, গৃহীত ও প্রচারিত হইয়াছিল। আজিও পর্য্যন্ত এই সর্বধর্ম সমন্বয়বাদ অন্যকোন ধর্মে এই ভাবে গৃহীত বা প্রচারিত হয় নাই।

১০। এই সর্বধর্মসমন্বয়বাদ প্রথমে বেদে গৃহীত হয়। দ্বিতীয় বার, ইহা গীতা শাস্ত্রে সন্নিবেশিত হয়। এই দুইবারই, ভারতবর্ষীয় ধর্মগুলির মধ্যে ইহা কার্য্যতঃ সীমাবদ্ধ থাকে। তৃতীয়বার ইহা আংশিকভাবে শিখ-ধর্মপ্রবর্ত্তক গুরুনানক প্রবর্ত্তন করেন। তিনি এই পথে হিন্দুধর্মের সহিত ইসলাম ধর্মের মিলনের জন্য তাঁহার

অসীম শক্তি নিয়োজিত করেন। চতুর্থ ও শেষবার শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজে বিবিধ হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্ম, খৃষ্টধর্ম ও ইসলামধর্ম অনুশীলন করিয়া, ও প্রত্যেক ধর্মের ভিতর সত্য নিহিত আছে জানিয়া, সর্বব্যাপক ভাবে এই সর্বধর্ম-সমন্বয় বাদ গ্রহণ ও প্রচার করেন, এবং তাঁহার জগদ্বিখ্যাত শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের দ্বারা তাহা পৃথিবীর সর্বদেশে জানাইয়া দেন।

১১। ইতিমধ্যে, আর্য্য হিন্দুগণ জানিতে পারিলেন যে, ঈশ্বর পরমদয়ালু, এবং তাঁহার আন্তরিক ভক্তগণ তাঁহাকে নিরাকার জানিয়াও, যে যে মূর্তিতে বা রূপে তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন, তিনি তাঁহাদিগকে সেই সেই মূর্তিতে দেখা দিয়া থাকেন। ইহার ফলে, অনেক আর্য্য হিন্দুগণ, নিজ নিজ আকাঙ্ক্ষা অনুসারে নিজ নিজ কল্পিত বহু সুন্দর সুন্দর মূর্তি পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। বৈদিক যুগের শেষভাগে অথবা তাহার কিছু পরবর্তী কালে, আর্য্য হিন্দুধর্মে এই প্রকার মূর্তি পূজা আরম্ভ হইল। আজিও আমরা সেই দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিয়া, পরম আনন্দের সহিত নানা দেবদেবীর পূজা করিয়া আসিতেছি।

১২। ভারতবর্ষে আগত খৃষ্টান ও মুসলমানগণ, আমাদের এই উৎকৃষ্ট ও মঙ্গলকর, একেশ্বর ভিত্তিক পৌত্তলিক পূজার প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহারা আমাদের হিন্দুধর্মকে পৌত্তলিক ধর্ম মনেকরিতেন। সেইজন্য, তাঁহারা আমাদের মধ্যে অনেক উৎপীড়িত অথবা ভ্রান্ত হিন্দুকে, তাঁহাদের অ-পৌত্তলিক ধর্ম দুটিতে দুটিতে দীক্ষিত করিতে লাগিলেন। সেই প্রকার ভ্রান্ত হিন্দুগণকে ধর্মান্তর গ্রহণ হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য রাজা রামমোহন রায়, বেদ-উপনিষদের ভিত্তিতে নিরাকার "ব্রহ্মধর্ম" প্রবর্তন করিলেন, এবং তাঁহার সৃষ্ট "ব্রাহ্ম সমাজে" জাতিভেদ ঢুকিতে দিলেন না। ইহার ফলে বহু হিন্দু ধর্মান্তর গ্রহণ হইতে নিবৃত্ত হইয়া ছিলেন। অন্যত্র, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী হিন্দুগণকে ধর্মান্তর গ্রহণ হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য তাঁহার জাতিহীন "আর্য্য-সমাজ" প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের উভয়ের নিকট তাঁহাদের এই ফলপ্রসূ মহৎ চেষ্টার জন্য আমরা সকল হিন্দু চিরঋণী।

১৩। হিন্দুধর্মের প্রকৃত সারতত্ত্ব জানিতে পারিলে, এবং হিন্দুধর্মের অনুষ্ঠানগুলির প্রকৃত উদ্দেশ্য জানিতে পারিলে, ইহা পরিষ্কার বুঝা যাইবে যে (১) প্রকৃত হিন্দুধর্ম নীতি ও বিজ্ঞানের দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং (২) প্রকৃত হিন্দুধর্মে কুসংস্কার কুপ্রথা অথবা অন্ধবিশ্বাসের কোন স্থান নাই।

ধর্ম ও বিজ্ঞানের মহামিলন।

১। পূর্বকালে, ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে দুটি বিষয়ে মত পার্থক্য ছিল।

(১) অধিকাংশ ধর্ম ঈশ্বরের অস্তিত্বের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে, বিজ্ঞান ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিত না।

(২) ধর্মে বহু ভুল, কুসংস্কার ও কুপ্রথা ছিল, এবং আজিও উহা অনেক পরিমাণে প্রায় প্রত্যেক ধর্মেই বর্তমান আছে। সেইজন্য বিজ্ঞান ধর্ম হইতে দূরে থাকিত, এবং ধর্মকে একটি অবৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে করিত।

(২) বর্তমান সময়ে, বৈজ্ঞানিকগণ ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ পাইয়াছেন, এবং অনেক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

(৩) ধর্মানুশীলনকারীগণের মধ্যে অনেকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা ধর্মীয় তত্ত্ব ও অনুষ্ঠান এগুলি দেখিতেছেন ও অনুশীলন করিতেছেন, এবং ভুলতত্ত্ব, কুসংস্কার ও কুপ্রথা-গুলি বর্জন করিতেছেন।

হিন্দুধর্মের সারতত্ত্ব হইতেছে (ক) ঈশ্বরতত্ত্ব, এবং (খ) ঈশ্বরলাভের জন্য মনকে একাগ্র করিয়া ঈশ্বরের সমর্পণ করা। এক্ষণে ঈশ্বরতত্ত্ব একটি বৈজ্ঞানিক সত্য, এবং ঈশ্বর-লাভের জন্য পূর্ব আলোচিত কার্য্যগুলির সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক অনুশীলন।

৫। ধর্মানুশীলনকারীগণের মধ্যে একটি বিরাট অংশের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী বিবেচনা করিলে, এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে অনেকের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন লক্ষ্য করিলে, ইহা পরিষ্কারভাবে বুঝিতে পারা যায় যে, ধর্ম ও বিজ্ঞান দ্রুতগতিতে মহামিলনের পথে অগ্রসর হইতেছে। তবে, এখনও সকল বৈজ্ঞানিক ঈশ্বরের অস্তিত্ব পরিষ্কারভাবে স্বীকার করেন নাই, এবং এখনও অনেক ধর্মানুশীলনকারী ভুলতত্ত্ব, কুসংস্কার, কুপ্রথা, ও অন্ধবিশ্বাস সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করিতে পারেন নাই। সেজন্য, এই মহামিলনের এখনও কিছু বিলম্ব আছে। তবে, আশা করা যায় যে, এই বিংশ খৃষ্টাব্দের শেষে, অথবা এক-বিংশ খৃষ্টাব্দের প্রথম অর্দ্ধে, ধর্ম ও বিজ্ঞানের মহা মিলন হইবে। সেই শুভদিনে, ধর্ম নীতি ও বিজ্ঞানের দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে, এবং তাহার ফলে, সারা পৃথিবীর ধর্মানুশীলনকারীগণের অশেষ মঙ্গল সাধিত হইবে।

বিদ্যার মর্ম-কথা ঃ

শ্রীসুধীর গুপ্ত

[রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর পাঠে]'

(১)

চুপে চুপে কবে সিঁধ কেটে শেষে
ওগো সুন্দর চোর,
পশিলে আসিয়া পরম প্রয়াসে
পরাণ-প্রাসাদে মোর।
সেথা প্রতি ঘরে বিদ্যার ধন
চুরি ক'রে ক'রে ধীরে,
গোপনে গোপনে ভীতি-ভরা সুখে
ঘরে ঘরে ঘুরে ফিরে,
আসিলে সহসা অতীব গোপন
আসল রত্ন-গেহে ;
প্রেম-ধনও শেষে ওগো লোভী চোর
চোরাইলে কত স্নেহে।
তাই আমরণ তা'রই শিহরণ
ধারণ করিয়া বুকে,
বহিয়াই যায় জীবনও ধরায়
লীলায়িত সম্মুখে।

(২)

রত্ন-নিবাসে নীরবে ঢুকিয়া
যে চতুর-চূড়ামণি
পরম রতন চুরি ক'রে লয়,
তা'র মত কেবা ধনী !
রমণীর মন—সে যে সেরা ধন,—
সে ধনও সাহস-ভরে
এক লহমায় শিহরণ-সুখে
যে রসিক চুরি করে,
সে যে কত পায় অমূল্য নিধি—
আজীবন—সম্বল
কে আর বুঝিবে ! তাই তা'রই [illegible]
হ'য়ে ওঠে ভূমিতল,
যেথা ব্যাধি-জরা দিতেছে প্রহরা;
তা'র কিবা আসে যায়
সে যে লভিয়াছে রমণীরই মন
চুরি করা বিদ্যায়।

(৩)

তুমি বুঝিয়াছ চুরি বিদ্যার
মর্ম যে অনায়াসে,
সুন্দর চোর নিশি-নিরালায়
আসো তাই মোর পাশে।
আনন্দ-নিধি লভিবার বাধা
যত লোকাচার আছে
পায় না আমল হে চিরপ্রবল,
কখনো তোমার কাছে।
মিথ্যা নীতির অযুত প্রাচীর
সিঁধ কেটে হও পার,
তোমার যে লোভ চির দুর্লভ
মহানিধি লভিবার।
বিদ্যার বুক ভ'রে ওঠে তাই
গোপন সুখেরই ভরে,
সে-ও চায় চুপে তা'র ধন যেন
সুন্দরই চুরি করে।

পতিতা ও পতিতপাবন

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

সত্যের

"গুরুদেবের আদর্শ কিন্তু একটি মাত্র নয়—একাধিক। তাই তিনি নিরুদ্বেগ স্থিতপ্রজ্ঞতার ভূমিকায় নিত্যাসীন হয়েছেন বলে মেনে নিলে তাঁর 'পরে অবিচার করা হবে। কারণ তাঁর শুধু প্রতিভাই নয়, সিদ্ধিও বহুমুখী। একটি বিশিষ্ট সিদ্ধি হল অনলসতা। কর্মকে তিনি বরেণ্য মনেকরে এসেছেন প্রথম থেকেই; বলেন—কর্মকে অপকর্ম বলা ঠাকুরের সৃষ্টিকে অনাসৃষ্টি বলারই সামিল। কথাটা কিছু নতুন নয়। মহাভারতের উদ্যোগপর্ব তাঁর বিশেষ প্রিয়। এতে কৃষ্ণদৌত্যের পাঠ দেওয়ার সময় তিনি প্রায়ই ফলিয়ে ব্যাখ্যা করেন কৃষ্ণের একটি মহাবাক্য :

যা বৈ বিদ্যাঃ সাধয়ন্তীহ কর্ম

তাসাং ফলং বিদ্যতে নেতরাসাম্ *

তাই বলে মনে করিস নি যেন—তিনি ইউটিলিটেরিয়ানিমের—কিনা ফলবাদের—পাণ্ডা, কারণ তিনি প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় মন্দিরে এমনি অনেক পাঠ দেন যার মধ্যে ফলবাদ বা সুবিধাবাদের নামগন্ধ নেই। নানা অধ্যাত্ম তত্ত্ব, পুনর্জন্ম, বিবর্তন, যোগবিভূতি···প্রভৃতি নানা বাদ-এর প্রসঙ্গে তাঁর গভীর ব্যাখ্য শুনতে আসেন, নানা প্রবীণ পণ্ডিত, তপ্ত তার্কিক তথা উদ্ধত কুলীন। তাঁদের নানা আপত্তির উত্তরে তিনি একটি কথা বারবারই বলেন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যে, জিজ্ঞাসু হওয়া ভালো হলেও সংশয়ী প্রতিবাদী হওয়া ভালো নয়—ও পথে জ্ঞানের দেখা মেলে না, কেন না এই মনের যুক্তিতর্ককে ডিঙিয়ে মনের ওপারে পৌঁছতে না পারলে মনের খবর মিলতেই পারে না। কিন্তু এসব ফালতো কথা রেখে গল্পের খেই ধরি ফের। তোকে এটুকু বললাম শুধু একটু আভাষ দিতে—গুরুদেব কী ভাবে আমাদের মনকে উর্বর ও উৎসুক করে তোলেন তাঁর নানা অনন্যতন্ত্র ভাষণে। এ তিনি পারেন তিনি খাঁটি জিজ্ঞাসু হয়েই তাঁর গুরুদেবের কাছে এসেছিলেন বলে—মানে তর্ক করে তর্কাতীতের তল পেতে নয়—গীতার ভাষায়—বিনম্র শ্রদ্ধার বরণে—জ্ঞানকে আবাহন করতে। তাই পণ্ডিতেরা তাঁর কাছে নেন বিদ্যার পাঠ, ভক্তেরা পান ভক্তির রসদ, জ্ঞানার্থীর জ্ঞানের আলো, কর্মীরা নিষ্কাম কর্মের মর্মবাণী। কেবল গীতার প্রসঙ্গে তিনি একটি কথা প্রায়ই বলেন জোর দিয়ে যে, গীতার কৃষ্ণ পূর্ণকান্তি হয়েছেন ভাগবতে, তাই ভাগবতকে গ্রহণ করতে না পারলে গীতাকে গ্রহণ করা কিছুতেই নিটোল হতে পারে না।'

অসিত শুধায় : "কিন্তু একথা কি স্থানীয় গীতাবাদীরা মেনে নিতেন ?"

ভীম বলে "না। আর সেই কথা বলতেই গুরুদেবের এ-উক্তিটির উল্লেখ করেছি। দেবপ্রয়াগে তাঁর ভাষণ শুনতে আসত প্রধানত: ভক্তিমার্গী সাধক-সাধিকা। জ্ঞানমার্গীরাও কখনো কখনো আসতেন বৈকি, তাঁরা অনেক সময়েই উষ্ণ হ'য়ে উঠতেন, যখন গুরুদেব বলতেন অকুতোভয়েই যে, ঠাকুর গীতায় ভক্তির জয়গান করলেও প্রেমকে তার পুরো মানদান করেন নি—যে মান পরে দিয়েছিলেন তাঁর উত্তরসূরী মহাপ্রভু ও বৈষ্ণবসম্প্রদায়—

---

* বিদ্যার আদর কেন ? কর্মের সেথায়
সিদ্ধি দৃষ্টিগম্য বলি'। যে-বিদ্যার ফল
দুরায়ত্ত, অনিশ্চিত—নাই নাই তার
সমাদর বস্তুবিশ্বে।

(কৃষ্ণকথার কাহিনী ২১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বিশেষ করে পদাবলীর বৈষ্ণব কবিরা। গুরুদেব বলেন প্রায়ই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে: 'গীতায় ঠাকুর খেদ করেছেন—অবোধেরা তাঁকে "মানুষীং তনুমাশ্রিত" হওয়ার অপরাধে হেনস্থা করে থাকেন, কিন্তু মানবদেহে তাঁকে জন্ম নিতে হয়েছিল যে-দিব্যকর্মের দীক্ষা দিতে সে দীক্ষাকে বরণ না করলে কৃষ্ণার্থীরা কিছুতেই জন্মচক্র থেকে মুক্তিলাভ ক'রে ভক্তিতে সুপ্রতিষ্ঠ হ'তে পারে না। কিন্তু এখানে—বলেন গুরুদেব—'ঠাকুর উহ্য রেখে গেছেন একটি কথা—যেটি পরে ভাগবতে বলা হ'ল সঘনে—যে, ভক্তির সঙ্গে প্রেমের দীক্ষাও নেওয়া চাই, নৈলে তাঁর প্রেমরাজ, প্রেমসখা, প্রেমদাস প্রেমশিশু ও প্রেমবল্লভ এই পাঁচটি বিভারে খবর মিলবে না—মিলতে পারে না। ফলে, কৃষ্ণের মূল্যায়নে—পরমহংসদেবের ভাষায়—ওজনে কিছু কম প'ড়ে যাবেই যাবে।'

"গুরুদেবের এ-সিদ্ধান্তটিকে আমি বরণীয় মনে করি আরো এই জন্যে যে, গুরুদেব তাঁর আশ্রমে শুধু যে ভক্তির পাঠ দেন তাই নয়, পদে পদেই আমাদের সকলের মন টানেন তাঁর নিজের প্রেমময় রূপে—যার সবচেয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত—কুন্তীকে নিয়ে তাঁর মাথাব্যথা।"

"শান্তনুকে নয়?"

"শান্তনু তো এল অনেক পরে। তাছাড়া তাকে কাল দেওয়ায় তাঁর মহৎ তেজস্বিতার কিছু পরিচয় মিললেও তার জন্যে তাঁকে কোনো ঘোর সামাজিক আলোড়নের মুখোমুখি হ'তে হয় নি তো—যেমন হয়েছিল তাকে আশ্রয় দেওয়ার জন্যে। এর একটা কারণ নিশ্চয়ই শান্তনুর কিন্নরকণ্ঠ। আমি বারবার চাক্ষুষ দেখেছি ভাই, যারা তাকে জারজ ব'লে ঘৃণা করতে চাইত তারাও তার মুখশ্রী দেখে মুগ্ধ হত, আর অভিভূত হ'ত তার অপরূপ কণ্ঠের কীর্তন শুনে। এমন কি শাস্ত্রীজির মতন রস গোঁড়ারাও তার গান শুনে চোখের জল রাখতে পারতেন না—যেমন, যখন সে তুলসীদাসের বিখ্যাত তুমান্ত্রিক রামভজন গাইত—" বলেই ভীম ধরে দেয়:

"শ্রীরামচন্দ্র কৃপালু ভজ মন হরণ ভবভয়দারুণম্।...
ইতি বদতি তুলসীদাস শঙ্কর শেষমুনিমনরঞ্জনম্।
মম হৃদয়কুঞ্জ নিবাসী কুরু কামাদি খলদল গঞ্জনম্।

"এ-গানটি শুনতে শুনতে পাণ্ডাদের মধ্যে অনেকেরও চোখে জল দেখেছি—কণ্ঠলাবণ্যের এমনিই জাদু রে ভাই! গুরুদেবকে বেগ পেতে হয়েছিল কুন্তীর ব্যবস্থা করতেই—বিশেষ করে নীতিবাদীদের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে তার রক্ষণাবেক্ষণ করতে একে ওকে তাকে নিয়োগ ক'রে—নিজের শিষ্যদের কাছে এজন্যে মান খুইয়েই বলব—কী ভাবে, পরে বলছি। কুন্তীকে যখন নানা ধর্মধ্বজ শাপমন্যি দিত তিনি প্রায়ই বলতেন একটি কথা: যে, সাধুদের ঔদার্যের ও প্রেমের সবচেয়ে বড় পরিচয় মেলে—ভ্রষ্টা নারীর অপরাধ ক্ষমা করে তাকে শুদ্ধিদান করার দৃষ্টান্তে। তিনি এ-সম্পর্কে উঠতে বসতে উদ্ধৃত করেন খৃষ্টদেবের, যিনি ব্যভিচারিণীর তরফে দাঁড়িয়ে শাস্তাদের শাসিয়ে বলেছিলেন: 'যে-লোক জীবনে কোনোদিন পাপ করেনি শুধু সেই যেন এগিয়ে আসে ওকে সাজা দিতে।' আর একটি পতিতাকে দেখে খৃষ্টদেব বলেছিলেন গাঢ়কণ্ঠে: 'ও ভগবানের ক্ষমা পাবে কারণ ও জীবনে গভীর ভাবে ভালোবেসেছিল—যে ভালবাসে কম সে ক্ষমা পায়ও কম।'

ভীম কণ্ঠ পরিষ্কার ক'রে নিয়ে ব'লে চলে: "খৃষ্টদেবের এই ক্ষমাসুন্দর করুণার কথা বলতে বলতে কতবারই যে গুরুদেবের চোখে জল চিকিয়ে উঠতে দেখেছি, আহা, মনে করলে আমার পাপ চোখেও জল ভরে আসে।" একটু থেমে ফের কণ্ঠস্বর পরিষ্কার ক'রে গাঢ় কণ্ঠে: "এই কুন্তীর দৃষ্টান্তই নে না। সে যখন প্রথম তাঁর শরণার্থিনী হ'য়ে হরিদ্বারে তাঁর কাছে গান গাইতে গাইতে মূর্ছা যায়, তখন তার কী দুরবস্থা একবার ভাব রে স্কেপটিক, ভাব্! কল্পনা কর্—এক ছোট জাতের মেয়ে, তার উপরে কুলত্যাগিনী ও গর্ভবতী—ভিখারিণীর চেয়ে নিরাশ্রয়—যে কোথাও এমনকি ভজন কীর্তন গাইতে গেলেও সবাই করে দূর-ছেই গুরুদেব এহেন মেয়েকেও শুধু-যেমুখের অন্ন জোগালেন তা নয়, তাকে সঙ্গে ক'রে আনলেন দেবপ্রয়াগে—যাতে ক'রে রঘুনাথজির মন্দিরে গান গেয়ে সে কিছু উপায়

---

* He that is without sin among you, let him cast a stone at her. Her sins, which are many, are forgiven; for she loved much: but to whom little is forgiven, the same loveth little.

(THE BIBLE...NEW TESTAMENT)

করতে পারে আত্মসম্মান বজায় রেখে। কিন্তু হায় রে, দেবপ্রয়াগেও ফের সেই ছি ছি ও ধিক্ রেরে কুশ্রী সোরগোল তুমুল হ'য়ে উঠল—যেই সকলে টের পেল—সে কুলত্যাগিনী ও গর্ভবতী। কেউ অনাথাকে একবার ডেকে জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করল না—কার দোষে কী ভাবে সে ঘর ছেড়ে সর্বহারা হয়েছিল। তার পর ওর পিছনে লাগল লম্পটেরা। তখন গুরুদেব ওর দেখাশোনা করতে পাঠালেন কাকে? না, তাঁর এক যুবক শিষ্যকে জেনেশুনে যে, এতে বিপদ আছে। বিপদ এলেও দেখতে দেখতে—প্রসাদ কুন্তীর মোহে পড়ে হ'য়ে উঠল বেসামাল। তখন একদিকে তাকে সামলাতে আশ্রমে ফিরিয়ে আনা, অন্যদিকে কুন্তীকে নিজের বাগানে মালিনীর পদে নিয়োগ করা—একি সত্যি ভাবা যায় ভাই? শুধু তাই নয়, তিনি বিলক্ষণ জানতেন যে কুন্তীকে আশ্রমের কোনো কাজে বাহাল করলে আশ্রমও বিপন্ন হবেই হবে—আরো ধনুর্ধর পঞ্চপ্রবীরের প্রপাগণ্ডায়। কিন্তু তবু তিনি একটিবারও চাইলেন না এদিক ওদিক—সোজা চললেন তাঁর কর্তব্যের পথে—যার নির্দেশ পেয়েছিলেন অন্তরে তাঁর অন্তর্যামীর কাছে। এ তিনি পেয়েছিলেন কিসের জোরে? শুধু প্রবঞ্চতার দুঃখে তাঁর মন গলছিল ব'লেই তো? এই করুণারই নাম প্রেম—যার অমন আলো, পরম শক্তি নামতে পারে কেবল গুরুদেবের মতই নিষ্কাম ঋষির, দরদী দ্রষ্টার—সবার উপর, কৃষ্ণৈকান্ত দুঃসাহসীর নির্মল আধারে—আর কারুর আধারে নয় নয় নয়।।" ব'লে একটু থেমে: গুরুদেবই প্রায়ই গান চণ্ডীর একটি অভয় বাণী

'ত্বামাশ্রিতানাং ন বিপন্নরাণাং, ত্বামাশ্রিতা হ্যাশ্রয়তাং প্রযান্তি।*"

আঠারো

অসিতের বুকের তারে একটি অশ্রুল সুর রণিয়ে ওঠে: খৃষ্টদেবের এই অভাবনীয় মহত্ত্ব ঔদার্য প্রেম কতবারই যে ওর সংশয়ী মনে ভক্তির প্রবাহ বইয়ে দিয়েছে, নীরস হৃদয়কে সরস করে তুলেছে। সত্যি পতিতার প্রতি এ-গভীর অনুকম্পা কি পতিতপাবন ছাড়া আর কারুর হৃদয়ে জাগতে পারে? ভীমদার খৃষ্টভক্ত গুরুদেবের দীনদয়াল নামও সার্থক হয়েছে—ভাবে অসিত।

ঘরের মধ্যে আর্দ্র নীরবতা বিছিয়ে যায়। শুধু ভেসে আসে অদূরে নীলাম্বরা গঙ্গার মৃদুকল্লোল। একদৃষ্টে চেয়ে থাকে বাঁদিকে ব্রহ্মকুণ্ডের দিকে। মনে ওর গুণগুনিয়ে ওঠে:

যদি অপরাধ না করিত পাপী—কৃপার মহিমা মানিত কি সে?

স্বার্থসলিলে ডোবে নি যে—তুমি তারক কেমন—জানিত কিসে?

মলিন ধুলায় হয় নি যে—প্রেমগঙ্গাস্নানে তোমার, প্রভু, অশুচি যে হয় অমল পলে—এ-উপলব্ধি কি লভিত কভু?

ভীম প্রথম কথা কয়: "কী ভাবছিস?"

অসিত স্বরচিত চারটি চরণ আবৃত্তি করে গাঢ়কণ্ঠে।

ভীমেরও মন ভিজে ওঠে, বলে: "সুন্দর! তবু কেন বলিস তুই যে, তুই স্বভাবে সংশয়ী?"

অসিত করুণ হাসে "কেউ কি জানে সেই তার নিজের স্বরূপ" কিন্তু মরুক গে, একটা প্রশ্ন মনে জাগছে—করেই ফেলি ফের সংশয়কে আমল দিয়ে। প্রশ্নটি এই: কুন্তী কি সে-সাধুটিকে সত্যি ভালোবেসেই ঘর ছেড়েছিল, না চোখের মোহ?"

ভীম বলল: "কেমন ক'রে বলব ভাই? কেবল বলতে পারি গুরুদেবের নজিরে যে, কুন্তী তাকে প্রবল ভাবে ভালোবেসেছিল ব'লেই ভাবতে পারে নি যে সে-সাধুটি ছিল লম্পট, ফন্দিবাজ, ভণ্ড!"

"তবু সাধু উপাধি দেবে তাকে?"

"গুরুদেব বলেন, সে কিছু তান্ত্রিক সাধনা করেছিল কয়েকটি যোগবিভূতি লাভ করতে। যে সাধনায় যা চায় সব সময়ে না পেলেও অনেক সময়েই পায় যদি সাধনায় নিষ্ঠা থাকে। এ-সাধুটি পেয়েছিল—যাকে বলে বশীকরণের বিভূতি। লম্পটদের কাছে এই বিভূতিটিই সবচেয়ে কাম্য। সে এই বিভূতিটিকে করায়ত্ত ক'রে পর পর দুটি কুমারীকে মজিয়ে ধরে কুন্তীকে। কুন্তীর মন আশৈশব হিমালয়ের নামে উজিয়ে উঠত। লম্পট ঝোপ বুঝে কোপ মারে—

---

* তোমার আশ্রিত যারা—বিপদে তাদের নাই ভয় তোমার আশ্রয় লভি' হয় তারা সবার আশ্রয়।

হিমালয়ের কত শত অপূর্ব তীর্থ তার নখদর্পণে ব'লে কুন্তীর কল্পনায় আগুন ধরিয়ে দেয়। সে দেখতেও ছিল সুদর্শন, গাইতেও পারত চমৎকার। ফলে কুন্তী তাকে ভালোবেসে শুধু যে 'হিরো-র আসনে বসায় তাই নয়—তাকে সত্যিই মনে মনে পূজো করত, বলত কুমারী বয়সে শিবপূজা করেছিল ব'লেই এমন স্বামী পেয়েছে।

"স্বামী বলতে করুণ হাসি আসে ভাই," বলে ভীম একটু থেমে, "কারণ লম্পট তাকে ভুলিয়ে ঘর থেকে টেনে হরিদ্বারে এসে মাস খানেকের মধ্যেই—আজ বিয়ে করব কাল বিয়ে করব এই ধরনের ভরসা দিয়ে—পালিয়ে যায় আর একটি কুমারীকে নিয়ে নবলঙ্কার গহনা সমেত।

"কুন্তী চোখে অন্ধকার দেখে। তার আত্মসম্মান-বোধ ছিল প্রবল, তাই এ-অবস্থায় ঘরে ফিরতে চায় নি বাপ মা-র কৃপার্থিনী হ'য়ে। গান করে এখানে ওখানে কিছু রোজগার করত—সেলাইয়ের কাজও জানত, নানা পরিবারের মেয়েদের কাছে কাজ পেত তাতেও কিছু উপায় করত। ফলে কোনমতে চ'লে যেত। থাকত একটি ছোট কুঠিরায়।

"কিন্তু হায় রে, মাস তিনেকের মধ্যেই সে টের পায় যে সে গর্ভবতী। চার পাঁচ মাস বাদে আর গোপন রাখা সম্ভব হ'ল না। ফল হ'ল—যা হবার। সবাই তাকে নষ্টা মেয়ে ব'লে খেদিয়ে দিল। গভীর নিরাশায় আত্মহত্যা করবে ভাবছে এমনি সময়ে সে গুরুদেবের দেখা পায়। গুরুদেব তখন ছিলেন ঋষিকেশে এক শিষ্যের আশ্রমে। তাঁকে গান শোনাতেই তিনি ওর মনের চিন্তা ধরতে পেরে আত্মহত্যা করতে বারণ ক'রে দেবপ্রয়াগে এনে রঘুনাথজির মন্দিরে গান গেয়ে কিছু প্যালা পাবার ব্যবস্থা ক'রে দেন। সে সময়েও নিজেকে বিধবা ব'লে পরিচয় দিত—বলেছি বোধ হয়?"

"হ্যাঁ, কেবল একটা প্রশ্ন: গুরুদেব যখন কুন্তীকে আশ্রমের মালিনী মোতায়েন ক'রে তার গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করেন তখন শান্তনুর বয়স কত?"

"বড় জোর তিন কি চার। আমরা যখন দেবপ্রয়াগে আসি—বছর তিনেক আগে—তখন শান্তনুর গাইয়ে নাম-ক হয়েছে সর্বত্র।"

"তখন ওর বয়স কত?"

"আট কি নয়। তাই কুন্তীকে নিয়ে গণ্ডগোলের প্রথম পর্বের সময়ে আমরা ছিলাম অনুপস্থিত—যা বলেছি শুনেছিলাম প্রথম রঘুবীর ও চন্দনের মুখে তার পরে মার মুখে—কুন্তী মা-কে সবই খুলে বলেছিল তাঁকে দরদী পেয়ে। সে এক লম্বা কথা, সব খুঁটিয়ে বলার সময় নেই, শুধু এইটুকু বললেই চলবে যে, কুন্তীর দুদিন একটু একটু ক'রে কালে এই ধন্য শিশুটির প-রেই—মন্দিরে গান গেয়ে সে যা প্যালা পেত তার অর্ধেকে শাস্ত্রীজি ও পাণ্ডাসংসদ ভাগ বসালেও বাকি অর্ধেকে দুজনের অন্নসংস্থান হ'ত স্বচ্ছন্দেই।" ব'লে বিজয়ী হাসি হেসে: "ওরে অর্বাচীন বুদ্ধিমন্ত! ভাব একবার আমাদের দীনদয়াল ঠাকুরটির লীলার অভাবনীয়তার কথা!—যে ছেলে এসেছিল মা-র ফাঁসিকাঠ হ'য়ে, সে-ই কিনা হ'য়ে দাঁড়ালো তার—গুরুদেবের ভাষায়—'তথা ত্রাতা!' ঠাকুরটি আমাদের ইচ্ছে করলে নয়কে হয় করতে পারেন—আবহমানকাল ক'রে এসেছেন, আজো করছেন, কত সব ক্ষেত্রেই। শুধু আমরা দেখতে চাই না ব'লেই জাদুকে মঞ্জুর করার পরেও জাদুকরকে সরাসরি বাতিল ক'রে দিই—চান্স কোয়েন্সিডেন্স এ-ও-তা হাজারো বৈজ্ঞানিক বুলি কপ্‌চে। মরুক গে, এবার ফিরে আসি পুণ্যতোয়া মা গঙ্গার তীরে।"

উনিশ

ভীম আর একটি পান মুখে পুরতে যেতেই অসিত ওর হাত চেপে ধরে, বলে "করছ কি ভীমদা? সকালবেলা অগস্তি পানের ভোজ?

ভীম একগাল হেসে বলে 'কুছ পরোয়া নেই ভাই! পাঞ্জাবকেশরী মহাবীর রণজীৎ সিং-কে একদা তাঁর এক অমাত্য দেখিয়েছিল ভারতবর্ষের মানচিত্রে কয়েকটি লালমার্কা প্রদেশ—লাল চিহ্ন হ'ল ইংরাজদের লুটে-নেওয়া দেশ। দেখে তিনি বলেছিলেন 'সব লাল হো যায়েগা ভৈয়া!' অথ, ভীম সিং-এর পাঠান্তর—বলি যাকে প্রায়ই করুণ হেসে যোগ করতে এলে সব খতম হো জায়েগা মৈয়া! কিছুই থাকবেনা—স্বেচ্ছাবিলাস, নেশাপত্তর দহরম মহরম—ভোজনং যত্র তত্র স্যাৎ শয়নং হট্টমন্দিরে।' খানিক আগেই তো বলেছি তোকে যে, নবাবী আমলের এই পান টুকুই এখনো পর্যন্ত কোনমতে বেঁচে-ব'র্তে আছে।

কিন্তু আর কদিন? যোগযাত্রা মানেই যে ভোগ-এর গঙ্গাযাত্রা রে দাদা—death-knell! তবে কি জানিস? এম্‌নিই আমাদের মন রে ভাই, যে ভোগ মরন্ত হয়েও থাকে বলে 'মরিয়া না মরে রাম, এ কেমন বৈরী!' মানে, অস্ত যাবার মুখেও নিরস্ত হ'তে চায় না—আরো বাড়িয়ে ওঠে যেন ফাগের মোহন রাগে। ফলে, সুখের লোভে প্রাণ কাকুতি মিনতি ক'রে; যা যেতে বসেছে চিরদিনের জন্যেই, না হয় রইলই ছাই আর দুচার দিন! অর্থাৎ কিনা, যার হিক্কা উঠল ব'লে, তাকে কেন আর সাত তাড়াতাড়ি অন্তর্জলী করা?" ব'লেই গম্ভীর হ'য়ে: "কিন্তু এ হাসির কথা নয় ভাই, কান্নার কথাই বলব। কেন—বলি একটু ফলিয়ে, কারণ কথাটা সত্যিই বলবার ম'ত। 'গুরুদেবের শ্রীমুখে শুনেছি—ইন্দ্রিয়ভোগের যে-পাত্র ঝোলাগুড়ে ভর্তি তাতে মধু ঢালা যায় না—চাই আগে পাত্রটি খালি করা—ঝোলাগুড় ফেলে দিয়ে। এরই নাম প্রত্যাহার বা নেতি নেতি।' কিন্তু এযে কী বিষম কঠিন—তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ কে বল্ তো?"

"প্রসাদ?"

"ন', আমি। তোর মনে আছে নিশ্চয়ই—তিন বৎসর আগেও তোর ভীমদা কী দারুণ ঔদরিক ছিল। আহা, রামার লোভের জন্যে আমার সতীলক্ষ্মী বৌটাকে কী ভোগানটাই না ভুগিয়েছি! সে পই পই ক'রে মানা করত বেশি খেয়ে বেসামাল না হ'তে, বলত গুরুপাক ক্ষীর সর পোলাও কালিয়া একটু কম ক'রে খেতে। বারবার পণও নিতাম সংযমের, তুই জানিস, কিন্তু পারতাম কি? ভাইরে কুকর্ম যার স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে তার ভোগের আসল নাম দুর্ভোগ ওরফে কর্মভোগ। তবু—"ব'লে হেসে—"এই দেখ্ না কেন—রাজভোগ ছেড়ে ধ'রে আছি কিনা এই পাড়াগেঁয়ে পানের টিকি—মনকে বুঝিয়ে যে, টাক যখন পড়বেই তখন বাহারে টিকিটা রৈলই বা আর দুদিন ঝোলুল্যমান হ'য়ে—হা হা হা!" ব'লে বেটুয়া খুলে ফের একটা পান মুখে পুরে: "কিন্তু এর একটা গুরু-গম্ভীর ভাষ্য দিই শোন্—নৈলে পরে আমার 'প্রগল্‌ভ' নাম রটে।

"একদা গুরুদেবের শ্রীমুখেই শুনেছিলাম যে, প্রসাদের মতন হ'ত না যদি সে নিজেকে এই ব'লে না ভোলাত যে মেয়েদের সঙ্গে সহবাসই যখন ছেড়েছি তখন কুন্তীর সঙ্গে দুদিন একটু রসাল হাসিগল্প করলে ক্ষতি কি? গুরুদেব পরে আমাকে বলেছিলেন যে, কুন্তীর কাছে ঘা খেয়ে প্রসাদ তাঁর কাছে এসে কেঁদে অকপটেই বলেছিল যে, সে সত্যিই মনে করত—একটু আধটু ছোঁয়াছুঁয়ির ভোগে যোগের মূলধনের বেশি অপব্যয় হয় না। প্রসাদের মতন আরো কয়েকটি সাধকের পদস্খলনের দৃষ্টান্ত দিয়ে আমাদের তিনি কতবারই বলেছেন শাসিয়ে যে, যোগে যে 'স্থিতধী' কিনা সুপ্রতিষ্ঠ হয় নি তার সামান্য চ্যুতির কুফলও দেখতে দেখতে অতিকায় হ'য়ে ওঠে বাজিকরের বটগাছের মতন। তবে আমার একমাত্র সাফাই অর্থাৎ, গুরুদেবের ব্রহ্মসূত্রের ভীমভাষ্য—" ব'লেই সুর করে:

"পানকে যদি 'সলিড্' রাখো—নেই ক্ষতি তায় তেমন তো:

ডুববে কিন্তু 'লিকুইড' হ'লে অথই জলে, হে সন্ত!"

অসিত উৎফুল্ল হাততালি দিয়ে পিঠপিঠ গায় গুন-গুনিয়ে:

"শুনে আমি 'জয় গুরু জয়' দিচ্ছি আঁখর, হে সন্ত!"

ব'লেই একটু থেমে: "না দাদা, এর পরে আর প্রগল্‌ভতা করব না, কথা দিচ্ছি। তাই গল্পের রথ গড়-গড়িয়ে চালাও তুমি, শ্রীমন্ত!"

কুড়ি

ভীম বেটুয়া থেকে অন্তিম পানটিতে চূণ লাগিয়ে মুখে পুরে শুরু করে:

"তুই জানিস—ভজনকে আমি ঠিক ওস্তাদদের মতন না হোক কিছুটা অবজ্ঞা ধ'রে এসেছি বরাবরই। শুধু ভজনকেই নয়, ভক্তিকেও আমি মনে করতাম খতিয়ে মেয়েদেরই নেশা, ছেলেরা চাইবে কীর্তি, কর্ম, বিদ্যা, হৈ চৈ-এর জয়যাত্রা—এইসব—অর্থাৎ কি না যাতে হাঁক-ডাকের জয়ঢাক বেজে ওঠে, শুধু কান্নাকাটির জলতরঙ্গ নয়। তবু শান্তনুর ভজন কীর্তনের সম্বন্ধে মা'র নিরন্ত উচ্ছ্বাস শুনতে শুনতে সময়ে সময়ে লোভ হ'ত বৈ কি—যাওয়াই যাক না রঘুনাথজির মন্দিরে, একবার শুনে এলে ক্ষতি কি? কিন্তু সত্যি বলচি ভাই—পুনরুক্তি মার্জনীয়—প্রসাদের 'ন যযৌ ন তস্থৌ' টলমলে অবস্থা আমাকে

সত্যিই ভাবিয়ে তুলেছিল। এ কী ব্যাপার! এতদিন সাধনা করার পরে পাকা সাধক হয়েও এক পতিতা মেয়ের টানে ওর এমন দুরবস্থা হল মাত্র একমাসে! তাহ'লে আমার মতন কাঁচা সাধকের 'কা কথা?' গুরুদেবের মুখে আরো শুনেছিলাম যে, যারা গান বেশি ভালোবাসে তাদের আরো বেশি সতর্ক হওয়া চাই, কারণ কানের মোহ চোখের তৃষ্ণার চেয়েও বেশি সহজে পাকে ফেলে। সুতরাং সিদ্ধান্ত: মাদৃশ সাধকের পক্ষে কুন্তীর গান শুনতে চাওয়া হ'য়ে দাঁড়াতে পারে মাছের বঁড়শি গিলতে চাওয়ারই সামিল…ইত্যাদি ইত্যাদি।

তবু ভাই শান্তনুর গান শুনতে এত ইচ্ছে হত সময়ে সময়ে! কুন্দনলালের কথা বলেছি এর আগে—যে শান্তনুকে ভজন শেখাত। সে আমার কাছে এসে দিনের পর দিন শিষ্যের গানের কথা বলতে বলতে উঠত উচ্ছ্বসিত হয়ে। বলত তার গান শুনলে ভাগবতের উপমা মনে পড়ে যায় —অচল পাহাড় নড়ে ওঠে আর সচল শাখা স্থির হয়ে শোনে। প্রসাদ শুনে একদিন বাঁকাহেসে বলেছিল, 'বাবিস! দুধের ছেলে ভক্তি ভজন গাইবে কেমন করে?' কুন্দণলাল উত্তরে বলেছিল হেসে; মহারাজ! ভগবান্ জিনকো ফুল দেনা চাহেঁ তো মরুভুমিমে ভী উস্‌কে সিরপর ফুলোঁকী বরখা হো সকতী হৈ।' মা-ও বলতেন প্রায়ই চোখের জলে; 'গুরুদাস রে! কী রামভজনই আজ গাইল ঐ একরত্তি ছেলে—মন্দিরে বোধহয় একটি মেয়েরও চোক শুকন ছিল না। আমাদের প্রতিবেশিনী চন্দ্রা বলে প্রায়ই; 'তুলসীদাসজির রামভজনের মূর্তিমান্ ভক্তিভাষ্য যদি কেউ থাকে আজ তবে তার নাম শান্তনুজি।' কিন্তু দূর হোক গৌরচন্দ্রিকা, পদ্মাগানের সময় এল।

"শান্তনুর মুখে ভাগীরথীর তীরে সেদিন সকালে 'সজল জলদাঙ্গ' গানটি শুনতে শুনতে আমার মনে কেমন যেন আবেশ জেগে উঠল। সত্যি বলছি ভাই, চোখের সামনে গঙ্গা-মার রূপও যেন বদলে গেল। সেই গঙ্গাই বটে অথচ আর এক গঙ্গা—জলের গঙ্গা নয়, আলোর গঙ্গা! সঙ্গে সঙ্গে এক অপরূপ নীল রঙ-এর বান ডেকে গেল— যেন সুধমার জলতরঙ্গ—রং সুর আর ঢেউ—ত্রয়ীর লগ্ন। না, আরো একটু জুড়ে দেওয়া চাই ভাবরস। বিশেষ করে ভজনে এই ভাবরসের উচ্ছলন না হ'লে তাকে 'ভজন' উপাধি দেওয়া চলে না। ব'লে রাখি, এ-গানটি আমি কুন্দনের মুখেও শুনেছি. সে গাইতও সত্যি ভালো—কিন্তু তার মুখে যখন গানটি শুনতাম তখন কান খুশী হ'ত কেবল সুরলাবণ্যে আর অনুপ্রাসের জাঁকালো শোভা-যাত্রায়। জানিস তো, সেকালের অনেক ভজনেই নানা পদ শুনতে না শুনতে মনে হয় কবিকে যেন অনুপ্রাসের ভূতে পেয়েছে। ছেলেবেলায় দেখেছি—কত আদরে কবির লড়াইয়ে এই অনুপ্রাসের ঘনঘটা, আর সমজদার শ্রোতাদের প্রমত্ত হাততালি। তবে তুই তো কবির লড়াই দেখিস নি—

অসিত সাফাই গায় "আমি তো ভাই গ্রামে কখনো বসবাস করি নি বেশিদিন—আবল্য শহরে মানুষ কবির লড়ায়ের খবর রাখবো কোত্থেকে বলো? তবে অনুপ্রাসের ঘনঘটার খবর কিছু রাখি। আমার এক ভাই নিওদা থাকত শান্তিপুরে, সে প্রায়ই গাইত;

> বুঝি বাজিল বাঁশের বাঁশরী!
> বুঝি বাজাইছে বনে বসি' বনবিহারী!
> বার বার বলিয়াছি—বঙ্কিম বদনে
> বৃথা বাঁশি বাজায়ো না বিজন বিপিনে,
> বৃন্দাবনবাসী বাঁশীর বৈরী।

ভীম ভাছিল্যের সুরে; "দাশুরায়ের কাছে এসব হ'ল সহজ অনুপ্রাসের ছেলেখেলা। তাই তিনি দুরূহ ক্ষ-কে মোক্ষম চেপে ধরে বেঁধেছিলেন—যে-গানটির মদে আমাদের গ্রামের সমজদার শ্রোতারামাতাল হ'য়েউঠতেনমহানন্দে—

> ছিল বারি কক্ষে, ক্রমে এল বক্ষে,
> জীবনে জীবন কেমনে হয় মা রক্ষে,
> আছি তোর অপিক্ষে দেমা মুক্তিভিক্ষে কর্ণক্ষেতে
> কবি' পার।

যেই গাওয়া অমনি শ্রোতাদের আত্মহারা জয়ধ্বনি, হাত-তালি প্যালাবৃষ্টি—সে কী কাণ্ড! আমার এক সময়ে সত্যিই মনে হ'ত—দাশুরায় শুধু যে ক্ষিপ্ত অবস্থায় এ গানটি বেঁধেছিলেন তাই নয়, সেই সঙ্গে তাঁর ক্ষ্যাপামির অজস্র রক্তবীজ বুনে গিয়েছিলেন ছত্রে ছত্রে—তাই শ্রোতারা সবাই অনুপ্রাসের প্রতি আবর্তনে সে ক্ষ্যাপামির দোয়ার দিতেন মহোল্লাসে।

অসিত হাসতে হাসতে বলে; "আমি কিন্তু এ-চার্জে ভাই 'গিল্টি প্লীড' করতে পারব না। কারণ এ-পালাটি যেদিন আমি প্রথম শুনি সেদিন হেসে কুটি কুটি হয়েছিলাম, হলপ ক'রে বলতে পারি। কেবল একটা কথা; তুমি অনুপ্রাসকে নিশানা করে যেভাবে ব্যঙ্গবাণ জুড়লে এতেও আমি পুরাপুরি সায় দিতে পারি না। ধরো, ক্ষ কে পাশ কাটিয়ে ঞ-কে খাটালে রসের মুনফা মেলে যেমন কবিবলরাম দাসের একটি বিখ্যাত কীর্তন (সুরকরে)

নাচত গৌর সুনাগর মনিয়া।

খঞ্জন গঞ্জন পদযুগরঞ্জন রনরনি মঞ্জির মঞ্জুল ধ্বনিয়া।"

কিন্তু গোবিন্দদাসের পদ সম্বন্ধে কী সাফাই গাইবি শুনি? এই কুন্দনের মুখেই শুনে অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছিলাম:

গণ্ডমণ্ডল বলিত কুণ্ডল টুড়ে উড়ে শিখণ্ড,

কেলিতাণ্ডব তালপণ্ডিত বাহুদণ্ডিত দণ্ড—"

অসিত হাত তুলে বলে: "তিষ্ঠ ভীমদা, তিষ্ঠ। কোনো কবির শুধু একটি শ্লোকের বিচারেই সুবিচার হয় না। গোবিন্দদাসের ঐ গানটিরই অন্তিম শ্লোক কী সুন্দর—(সুর ক'রে):

কঞ্জলোচন কলুষমোচন শ্রবণরোচন ভাষ

অমল কোমল চরণ কিশলয় নিলয় গোবিন্দ দাস

আসল ব্যাপারটা কী জানো দাদা? মাত্রাজ্ঞান থাকলে সব কিছুই শ্রুতিমধুর হ'তে পারে। ঐ ন্ত-কেই ধরো না। এটি কর্ণশূল হয় যদি এর মশলা বেশি দিয়ে শ্লোকটি রাঁধো। কিন্তু মাত্রাজ্ঞান থাকলে এ-ও সুশ্রাব্য হতে পারে, যথা জয়দেবের

চন্দনচর্চিত নীলকলেবর পীতবসন বনমালী

কেলিচলন্মণি কুণ্ডলমণ্ডিত গণ্ডযুগস্মিতশালী

এখানে ন্ত-কে আর একটু প্রশ্রয় দিলেই শ্লোকটির ভরাডুবি হ'ত কিন্তু জয়দেবের কান ছিল অসামান্য অনুশীলিত। তাই তিনি জানতেন—কোন্ বর্ণের অনুপ্রাস কানে মধুর লাগে আর কতক্ষণ পর্যন্ত। কিন্তু থাক এ-তর্ক, তুমি বলো। কেবল ব'লে রাখি দাদা, নীলকণ্ঠের এ কীর্তনটি আমার সত্যিই ভালো লাগে। তাই তুমি বেশি বাড়াবাড়ি কেরো না, তাহলে আমি বিতণ্ডায় নামতে বাধ্য হব তোমার কুদণ্ড খণ্ডন করতে।"

ভীম হেসে বলে: "মাভৈঃ দাদা! এ-গানটির নিন্দা করব কেন? শান্তনুর মুখে নীলকণ্ঠের এ-গানটি আবার স্মৃতিলোকে যে আজো প্রায় ল্যাণ্ডমার্কের মতনই বিরাজ করছে। কী ভাবে বলি—অবান্তর বাগ্বিতণ্ডা রেখে।"

বলে ডিবে খুলে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে: "ফুরিয়ে গেছে ভাই, ফুরিয়ে গেছে। কিছুই থাকে না এ-সংসারে - 'চলচ্চিত্তং বলদ্বিত্তং চলজ্জীবন যৌবনম্'—গীতার অকাট্য বিধানে: 'জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুং',—তাই শোন্ ভালোই হ'ল, পানের ডিবের প্রসাদ পেতে আর থামতে হবে না।

একুশ

ভীম সামনে গঙ্গার দিকে মুগ্ধদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলে: "দেবপ্রয়াগের মা গঙ্গাও ঠিক্ এমনিই নীল—কলকণ্ঠী। আর বলেছি সেই নীল আলোর কথা। ঐ শান্তনুকে পরে আমিই শিখিয়েছিলাম এই স্মৃতিচারণের পরমানন্দে:

নীলে নীলে হিয়া রূপান্তরিয়া হয় যে নীলিমাসাথী:

কে গো চিত্তচোর, উদিলে বিভোর নয়নে, পোহালো রাতি।

সত্যি, অসিত, এক একটা ঘটনা ঘটে যেন একটা অবিস্মরণীয় নবযুগের বাণীমূর্তি হ'য়ে। আর সেদিন ঘটেছিল আরো বিচিত্র নাটকীয় যোগাযোগ—যেন আমার জীবনে একটা নতুন দীক্ষা দিতে। কী ভাবে—বলি।

"কল্পনা কর্ তুই তটে ব'সে জপ করছিস একমনে, তোর ডানদিকে খরধারা ভাগীরথী গান গেয়ে বয়ে চলেছেন ডান দিক থেকে বাঁদিকে—সূর্যের আলোয় তাঁর বুকে বেজে উঠছে ঝিকিমিকির অশ্রান্ত আখর, গীতোচ্ছলা নীলধারা সে-আখর শুনে যেন আরো কল্লোলিনী হ'য়ে উঠতে চাইছেন। কুন্তী আমার ডানদিকে দশহাত দূরে হাঁটুজলে তর্পণ করছে অঞ্জলিতে জল নিয়ে। তার ডানদিকে একহাত দূরে শান্তনুও হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়ে গান গেয়ে চলেছে—'সজল জলদাঙ্গ—.' সবাই শুনেছে মুগ্ধ হয়ে। কুন্তী থেকে থেকে তর্পণ করতে করতেই ছেলের দিকে ঘাড় বেঁকিয়ে সগর্বে হেসেই ফের অঞ্জলিভরা জল ফেলে দিয়ে আবার এক আঁজলা জল তুলে নিচ্ছে। আমার বাঁদিকে স্নানার্থী নেই—সেখানে ধারালো পাথর বেশি ব'লে। আমি শুনছি মুগ্ধ হ'য়ে

আর যেতে শান্তনুর এক একটা ঝিড়ে ঘোমাঞ্চ হবে—এমন সময়ে হৈ হৈ রৈ রৈচ্ছ গেল গেল গিয়া গিয়া পকড়ো পকড়ো ইত্যাদি।

"বলতে অনেক সময় লাগছে কিন্তু ব্যাপারটা ঘ'টে গেল চক্ষের নিমেষে। গাইতে গাইতে হঠাৎ টাল সামলাতে না পেরে শান্তনু প'ড়ে যায়। কুন্তী ছেলেকে ধরবার আগেই সে খরস্রোতে ভেসে যায়। বলেছি ওরা ছিল আমার আসন থেকে দশ বারো গজ দূরে স্রোতও ওদিক থেকে আমার দিকেই বইছে, কাজেই শান্তনু চীৎকার ক'রে ভেসে এল ঠিক আমার সামনেই বোধ হয় তিন চার সেকেণ্ডের মধ্যেই। আমি তৎক্ষণাৎ লাফ দিয়ে গিয়ে ওর হাত চেপে ধ'রে টেনে তুললাম তটে। কুন্তী চেঁচিয়ে উঠে হন্তদন্ত হ'য়ে ছুটে এল। শান্তনু অজ্ঞান, কপাল কেটে রক্ত বেরুচ্ছে ফিনকি দিয়ে। কুন্তী দেখবামাত্র 'মাগো' ব'লেই মূর্ছা গেল। আট দশটি স্নানার্থী আসতে আমি বললাম' "চলো, দয়াল মহারাজের আশ্রমে।"

বাইশ

অসিত বলল: "কিন্তু তুমি কুন্তীকে নিয়ে সোজা আশ্রমে চ'লে এলে! একটু আগে বলছিলে না যে তাকে গুরুদেব এমন কি দীক্ষা পর্যন্ত দিতে রাজী হন নি?"

ভীম হেসে বলল: "ওরে ভাই আমাকে চিনবি—যেদিন হারাবি। বুঝবি সেদিন কোন্ যৌগিক প্রেরণা আমাকে চালিয়েছিল '—না ঠাট্টা' নয়,আমার মনের মধ্যে যেন ব'লে উঠল—গুরুদেব কখনই না করবেন না—বিশেষ যখন কুন্তীর সেবা শুশ্রূষা দরকার।

"আশ্রমে কুন্তীকে এনে গুরুদেবকে একথা বলতেই তিনি বললেন—আমি ঠিকই শুনেছি। তৎক্ষণাৎ দুটি খাট আনালেন। একটি আমার খাটের পাশে—শান্তনুকে শোয়ানো হ'ল, অন্যটি মা-র খাটের পাশে—কুন্তীর ভার নিতে বললেন মাকে।

"তারপর রঘুবীর এসে কুন্তীর বাহুমূলে আর শান্তনুর কপালে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিল। এর আগে বলেছি কি না মনে পড়ছে না—রঘুবীর লক্ষ্ণৌ মেডিক্যাল কলেজের হাউস সার্জন ছিল, স্ত্রী হঠাৎ পাগল হয়ে যাওয়ার পরে তাকে বাঁচিতে পাঠিয়ে প্রাকৃটিস ছেড়ে চলে আসে গুরুদেবের টানে। শান্তনুকে দেখে বলল ভয়ের কোনো কারণ নেই, কারণ কপালের একটু মাংস কেটে গেছে মাত্র। বিপদ হ'ল কুন্তীকে নিয়ে। পড়বার সময়ে একটা পাথরের ধারালো কোণা তার বাহুমূলে প্রায় এক ইঞ্চি বিঁধে গিয়েছিল। ফলে রক্তস্রাব থামানো হয়ে উঠল দুর্ঘট। শুধু তাই নয় রক্তপাত কোনোমতে থামানোর পরে দেখতে দেখতে সমস্ত হাতটা বিষিয়ে ফুলে উঠল। অসহ্য বেদনা। জ্বর বিষের তাড়নে উঠল ১০৫ ডিগ্রি।

"রঘুবীর যথাবিধি অ্যান্টিটিটেনাস ইঞ্জেকশন দিয়েছিল, কিন্তু কুন্তীর অবস্থা দেখে ভয় পেয়ে গেল! বলল হরিদ্বার বা দেরাদূন থেকে ভালো ডাক্তার আনানো দরকার। কিন্তু মুস্কিল হল কুন্তীকে নিয়ে। সে বেঁকে বসল—কোনো ডাক্তারেরই ওষুধ খাবে না খাবে না খাবেনা—সে স্বপ্ন দেখেছে: গুরুদেব তাকে চরণামৃত দিচ্ছেন—শুধু চরমমৃতেই সে সেরে উঠবে—আর যদি না ওঠে—ভালোই তো—পুণ্য তীর্থে পাপ দেহ মা গঙ্গার কোল পাবে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

"শুনে রঘুবীর আপত্তি করল। বলল চরণামৃত গুরুদেব কেবল শিষ্যদের দেন, বাইরের কাউকে দেন না। তাছাড়া এ হ'ল সাংঘাতিক blood-p isoning—কোনো আশু প্রতিকার করাই চাই—অর্থাৎ ঘন ঘন ইঞ্জেকশন ছাড়া উপায় নেই।

"কিন্তু গুরুদেব মৃদুহেসে তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন—কুন্তী ঠিকই দেখেছে—ডাক্তার ডাকার কোনো প্রয়োজন নেই। 'তাছাড়া', বললেন তিনি, 'আমি কোনো অনড় অচল বিধান দিই না। কুন্তী শিষ্যা না হ'লেও চরণ মৃতে ওর অটল বিশ্বাস সেব জোরেই ও সেরে উঠবে।

অসিত বলল: "শুধু চরণামৃত?"

ভীম বলল: "প্রথমে আমার মনেও খটকা লেগেছিল। কারণ তুই তো জানিস আমি কতবারই ভক্তদের 'অতিভক্তি' নিয়ে হাসাহাসি করেছি—বলেছি প্রসাদী ফুল বা গুরুর পাদোদক নিয়ে যারা হৈ চৈ কাণ্ড করে, মাতামাতিই তাদের পেশা তথা নেশা। একবার এমনি এক ভক্তকে ঠেশ দিয়ে ছড়া কেটেছিলাম:

রোগ বদ্যি তাড়ায় পাঁচনে, ভূত ওঝা ছাড়ায় ঝাড়ফুঁকে 'সব রোগই পালায় পাদোদকে'—গান গুরু গম্ভীর মুখে।"

"কিন্তু কী আশ্চর্য ভাই—স্বচক্ষে দেখলাম চরণামৃত দিতে না দিতে কুন্তীর ফাঁড়া কেটে গেল! জ্বর অবিশ্যি তক্ষনি ছেড়ে যায় নি, তবে বিকার কেটে গেল—প্রলাপ বকাও বন্ধ হল।"

"একেবারে আরোগ্য?"

"আরোগ্য বলে আরোগ্য—দুদিন বাদেই কুন্তীর মুখে হাসি ফুটল। বলল মা-কে জোর দিয়েই: 'বলি নি, মাসিমা?'

"মা-র মনে গুরুর চরণামৃতের বিশ্বাস ছিল বটে কিন্তু ঠিক কুন্তীর মতন নিটোল বিশ্বাস নয়। তাই আমাকে বলেছিলেন যে, রঘুবীর নামকরা ডাক্তার তার কথা অমান্য করা ঠিক হবে না। কিন্তু কুন্তীর বিশ্বাস দেখে তাঁর মনে একটু অনুতাপ মতন এল। যাকগে—কুন্তীর কথায়ই ফিরে আসি।"

[ক্রমশঃ]

ব্রহ্মসূত্র কাব্যানুবাদ

পুষ্পদেবী, সরস্বতী, শ্রুতিভারতী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

২।২।৩

পয়োঽম্বুবচ্চেত্তত্রাপি

দুধ ও জলের মতন বলেছে প্রকৃতি বদল হয়
তবুও জানিও আপনা হইতে সম্ভব শুধু নয়
শঙ্কর কন বাছুরের তরে দুধ ধারা যথা ঝরে
জীব কল্যাণ তরেতে বৃষ্টি তেমনি ঝরিয়া পড়ে
মূর্খতে ভাবে ইহা অকারণ
স্নেহ ভরে হয় দুধের ক্ষরণ
ঈশ্বর বারি বৃষ্টির জল জন মঙ্গল তরে
আকাশ হইতে হরির করুণা সবাপরে সদা ঝরে।

২।২।৪

ব্যতিরেকানবস্থিতেশ্চ অনপেক্ষত্বাৎ

কন শঙ্কর সাংখ্য মতেতে প্রকৃতি কারণ হয়
ন্যায়েই ইহা ঈশ্বর ছাড়া কখন কিছু না হয়
অচেতন এই প্রকৃতি যখন
সৃষ্টি প্রলয় সে কী অকারণ
সব মূলাধার শ্রীহরি আপনি এতে নাই কোন ভুল
বৃথা তর্কের তুমুল বিচার ঈশ্বরই সব মূল।

অন্যত্রাভাবাচ্চ ন তৃণাদিবৎ

২।২।৫

অন্যত্র দেখা যায় না বলিয়া তৃণাদির মত হয়
গাভীর উদরে যাইয়াই তৃণ দুধ রূপে তবে রয়
তৃণ নিজে দেখো দুধ নাহি হয়
গাভীর উদরে যবে প্রবেশয়
তারি সংযোগে দুধে পরিণত নহিলে কখন নয়
ইহার ভিতরে করুণা হইয়া ঈশ্বর কৃপা বয়।

২।২।৬

অভ্যুপগমেঽপি অর্থাভাবাৎ

স্বীকার করিলেও প্রয়োজনাভাবে সাংখ্যেতে দোষ হয়
শঙ্কর কন ঈশ্বর বিনা তখন কিছু না হয়।
সেই পুরুষের কিবা প্রয়োজন
নির্বিকার ও উদাসী যেজন
মোক্ষ ত তার করতলগত অদূরে মোটেই নয়
মোক্ষ সাধনে বল দেখি কিবা কিবা আর লাভ হয়।

২।২।৭

পুরুষাশ্মবৎ ইতি চেৎ তথাপি

যদি বলা যায় পুরুষ বা পথরে প্রকৃতি [illegible] রে
তুলনা হিসাবে পঙ্গু অন্ধ ইহাদের মনে পড়ে
সাংখ্যের পুরুষ তবু তাহা নয়
পঙ্গু যেমন পথ দর্শায়
সাংখ্যের এই পুরুষে জানিও প্রকৃতি চালিত নয়
প্রকৃতিই যদি সক্রিয় হয় প্রলয় কি করে হয়?

(ক্রমশঃ)

———

কঠোপনিষদের সাধন পথ

শ্রীঅরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

দশম মন্ত্র (১৷২৷১০)

মন্ত্র—জানাম্যহং শেবধিরিত্যনিত্যং
ন হ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবম্ তৎ।
ততো ময়া নাচিকেতশ্চিতোঽগ্নি—
রনিত্যৈর্দ্রব্যৈঃ প্রাপ্তবানস্মি নিত্যম্॥

অর্থ—(যম বলিতেছেন :—) "আমি জানি শেবধি (=নিধি, ধন, এখানে কর্ম্মফল) অনিত্য। অধ্রুব (যজ্ঞাদি) দ্বারা সেই ধ্রুবকে (আত্মাকে) প্রাপ্ত হওয়াও অনিশ্চিতের ফের। এই সব দেখিয়া শুনিয়া, আমি নাচিকেত—অগ্নি চয়ন করিয়াছি। অনিত্য দ্রব্যের (সেবা ও ত্যাগ) দ্বারা নিত্যকে (নিত্যপদ, যাহার চাপরাশ পাইয়া আমি নচিকেতার এবং সেইমত সর্ব্বমানবের আচার্য্য স্থান) প্রাপ্ত হইয়াছি।"

নোট—সাধারণতঃ যজ্ঞ, সাধককে দেবলোক পর্যান্ত লইয়া যায়। তাহাও দেবপ্রসাদ পাইলে পর। দেবলোক অধ্যাত্মলোকের নিম্নে। অধ্যাত্মলোককে ধ্রুব বলা হয়। সেইজন্য সাধকের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে যজ্ঞকে অধ্রুব বলা হইল, মন্ত্রের দ্বিতীয় পংক্তিতে।

ব্যাখ্যা—পূর্ব্ব বল্লী অনুযায়ী এই উপনিষদে কর্ম্ম (বাজশ্রবার সাধন), যজ্ঞ (উদ্দালকের আদর্শ) এবং নাচিকেত যজ্ঞকে মানুষের ধর্ম্মজীবনের উন্নতির সোপান বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। পরিণামে আত্মতত্ত্বের সোপান পাওয়া গিয়াছে। এই মন্ত্রে বলা হইতেছে যে আচার্য্যের (যমরাজের) নিজ অভিজ্ঞতাদ্বারা শিষ্যের (নাচিকেতার বংশ পরম্পরা সূত্রে ও নিজ জীবনে প্রাপ্ত) পূর্ব্বকৃত্য সমস্তটুকু কি করিয়া প্রত্যক্ষভাবে লব্ধ হয় ও আচার্য্য সেই কারণে শিষ্যের (নচিকেতার) পরিচালনায় দক্ষ হ'ন।

যম বলিতেছেন, তিনি দেবতা হইয়াও, অন্যান্য দেববৃন্দের সহিত, মানুষের সকল কর্ম্মে সহায়ক হইয়া, সকল কর্ম্মানুষ্ঠানের যথার্থ মূল্য নিরূপণে সক্ষম হ'ন। কর্ম্ম বলিতে "ভূতভাবোদ্ভবকরঃ বিসর্গঃ কর্ম্ম সংজ্ঞিত" (গীতা, ৮৩) বুঝায়। অর্থাৎ যে মানবীয় প্রচেষ্টারদ্বারা ভৌতিকউপাদান বস্তুর উপযোগিতা বর্দ্ধন অথবা যে ভোগের দ্বারা তাহার হ্রাস নিষ্পন্ন হয়, তাহাকেই কর্ম্ম সংজ্ঞা দেওয়া হয়। ইংরাজীতে অর্থ শাস্ত্রের ভাষায় বলা হয়, "Effort means production or consumption of utilities" কর্ম্মের দ্বারা মানুষ ইহাই সাধন করিতে পারে। তাহাও সক্ষম হয়, যখন দেবতাগণ সহায় হ'ন। দেবতাদের সাহায্য বিনা সে ভোগও সম্ভব হয় না, এমন কি ভোজন পর্য্যন্ত পরিপাক হইয়া তুষ্টি বিধান করে না, তাহা বৈদিক কাল হইতে আর্য্যগণ অবগত ছিলেন এবং সেই কারণে সকল ভোজ্য দেবতাদের নিকট নিবেদন করিয়া তবে আহারের রীতি ছিল। সেইরূপ ভৌতিক উপাদানের সৃষ্টিতেও যে দেবতাদের করণীয় অংশ ছিল তাহা তাঁহারা ভুলিতেন না। ভারতবর্ষ চিরদিন কৃষিকার্য্যের জন্য বিখ্যাত। ভারতবাসী জানেন, ইহা তখনই উৎকর্ষ লাভ করে, যখন দেবতাগণ পদে পদে কৃষকের সাহায্য করেন। তাঁহারাই "unearned increment" (অর্থাৎ কৃষক প্রভৃতির পরিশ্রমের প্রাপ্য পুরস্কার বণ্টন কালে অনুপার্জ্জিতশস্যের ভাগ) দাবী করিতে পারেন ও তাহাই দেবতাগণকে যজ্ঞরূপে অর্পণ করার বিধি এ দেশে চলিয়া আসিতেছে, সনাতন ধর্ম্ম অনুসারে। সে যজ্ঞও দেবতাগণ মানুষের আচার্য্য হ'ন।

এইভাবে, কর্ম্ম ও যজ্ঞ সম্পাদনের সূর্য্যদেব প্রভৃতি দেববৃন্দের সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়া যমরাজ ইহাদের (কর্ম্ম ও যজ্ঞের) যথার্থ মর্য্যাদার সহিত পরিচিত হ'ন যমরাজ জানিতে পারেন, কর্ম্মের ফল বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারে না। ইহা দ্বারা জীবের শুধু অভাব মোচন

হয় এবং ইহা সেইভাবে মানুষকে কেবল জীবিত রাখিতে পারে, এই পর্য্যন্ত। (ঈশ উপ, ১১ মন্ত্র, "অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা" অর্থাৎ জগৎসম্পর্কে সকল সাধন দ্বারা কেবল মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইয়া)। অতএব যম বলিতে চান, কর্মদ্বারা অমৃত (আত্মা) লাভ হয় না। এইরূপ বিচারের ফলে কর্মকে মানবজীবনে অন্তরতর গতি দিবার জন্য যজ্ঞের পদানুসরণ একান্ত বিধেয়। যজ্ঞ সেই কার্য্য যাহাতে মানুষ অনিত্য সামগ্রী দেবপদে সমর্পণ করার সাথে নিজ স্বার্থ ও অহঙ্কার পর্য্যন্ত যথাসম্ভব আহুতি দিয়া কর্ম সমাধান করিতে প্রয়াসী হ'ন। এইরূপে পার্থিব সামগ্রীর (অধ্রুবের) সঙ্গে নিজ অধ্রুব সত্তা যদি ত্যাগ হয়, যজ্ঞকারী সাধক অধ্যাত্মলোকে (ধ্রুবের পানে) উত্তীর্ণ হ'ন। যম এইরূপ যজ্ঞের অনুমোদন করেন। এই প্রকার যজ্ঞ বরণীয় এবং তাহাদের মধ্যে নাচিকেত-যজ্ঞ অন্যতম। যম এই শেষ প্রকার যজ্ঞ নিজ জীবনে চয়ন করিয়া, তাহার বিশেষ মূল্য জানিয়া, তাহাই মানুষের হিতার্থে শিক্ষা দিতে আগ্রহান্বিত হন। ফলতঃ যিনি সকল প্রকার সাধনার পরীক্ষক ও পুরস্কারদাতা, অধ্যাত্ম লোকের একমাত্র বিধাতা, তিনিই যমকে যমপদে অধিষ্ঠিত করিয়া পুরস্কৃত করিলেন। তখন এই নাচিকেত-যজ্ঞ অনুশীলন মার্গে, যম ও নচিকেতার সম্বন্ধ, এই উপনিষদ অনুসারে ঘনিষ্ঠতম হইয়া গেল এবং তাঁহাদের সম্মিলিত প্রেরণা সকল মানবের জীবনেও প্রযুজ্য হইয়া চিরতরে, মন্ত্রের শেষ বাণী অনুসারে "নিত্যম্" হইয়া রহিল।

গুরু যে শিষ্যের অন্তর ও বাহির নিখুঁত ভাবে জানিবার জন্য, নিজ সাধনা দ্বারা, তাহার সমস্ত অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়া নিজ অধ্যবসায় সার্থক জ্ঞান করেন, তাহা যম এইমন্ত্রে সুন্দরভাবে জানাইলেন। শ্রেয় যিনি, তিনি যে প্রেয়কে যথার্থভাবে সেবা করিবেন বলিয়া এতদূর পর্য্যন্ত কর্ত্তব্য স্বীকার করেন তাহা জানিয়া আচার্য্যের প্রতি সকলের শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পায়। পরের মন্ত্রে, যমের প্রশংসা হইতে জানা যাইবে, প্রেয় অর্থাৎ শিষ্য কি করিয়া শ্রেয় যিনি, সেই আচার্য্যের সকল পরীক্ষায় পাশ করিয়া, তাঁহার উপযুক্ত শিষ্য হইয়াছেন এবং এইরূপে উভয়ের মিলনভূমি প্রস্তুত হইয়াছে।

একাদশ মন্ত্র (১।২।১১)

মন্ত্র—কামস্যাপ্তিং জগতঃ প্রতিষ্ঠাং
ক্রতোরনন্ত্যমভয়স্য পারম্।
স্তোমমহদুরুগায়ং প্রতিষ্ঠাং
দৃষ্ট্বা ধৃত্যাধীরো নাচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীঃ॥

অর্থ—(যম বলিতেছেন :—) কামনার আপ্তি (পরিসমাপপ্তি অথবা প্রাপ্তি) জগতের প্রতিষ্ঠা, যজ্ঞের অনন্তফল অভয়ের পার, মহান্ স্তবণীয় বিস্তীর্ণ গতি প্রতিষ্ঠা, এই সকলই ধৈর্য্যসহকারে দেখিয়া নাচিকেতা, ধীর তুমি পরিত্যাগ করিয়াছ।

ব্যাখ্যা—পূর্ব্বমন্ত্রে যম কিভাবে নচিকেতার সহিত মিলিত হইবার জন্য অক্লান্তভাবে দীর্ঘ সাধনায় সচেষ্ট ছিলেন তাহা বর্ণিত হইল। অপরদিকে নচিকেতা কি করিয়া যমের সামীপ্য ঘনিষ্ঠভাবে লাভের জন্য সকল প্রতিষ্ঠা প্রত্যাখ্যান করিয়া, ধীরভাবে, সংযম রক্ষা করিয়া, অগ্রসর হইতেছিলেন তাহা যম নিজমুখেই বিবৃত করিতেছেন। প্রথমে জগৎ প্রতিষ্ঠা সকল সাধককে প্রলুব্ধ করে। নাচিকেতাকেও করিয়াছিল। জগৎ-প্রতিষ্ঠার মূল উৎস নিজ অন্তরের কামনা ও বাসনা। কামনা শরীরের নিম্নস্তরে কাজ করে। বাসনা হইল সেই সকল কামনার পুঁটলি যথা মানুষের মস্তকে বাস দ্বারা আচ্ছাদিত অবস্থায় রক্ষিত হয় ও যাহা সুবিধা ও সুযোগ পাইলেই আত্মপ্রকাশ করে। উভয়েই জগৎ প্রতিষ্ঠার জন্য কাঙাল। হয় তাহাদের উচ্ছেদ সাধন করিতে হইবে অথবা সমস্তগুলির পূরণ করিতে করিতে মরিতে হইবে। উচ্ছেদ সাধন করিতে যাওয়া যদি সহজ হয়, তাহা হইলে তাহা করণীয়। তাহার শ্রেষ্ঠ উপায়, সকল কামনা আচার্য্যের আদেশ মত নিবেদন করা, অর্থাৎ যজ্ঞ দ্বারা সমর্পণ করা। কর্ম্মের শেষ কথা "ক্রতু" যাহা করা উচিত, এবং তাহাকেই বলা হয় যজ্ঞ অর্থাৎ য (অন্তরে প্রবেশ-দ্বার), জ্ঞ (জ্ঞানের হাওয়ায়)। অতএব জগৎ প্রতিষ্ঠা ত্যাগ হয়, যখন যজ্ঞ সাধন করা হয়। তখন বাধাবিঘ্নের আর ভয় থাকে না। সাধক একেবারে অভয়ের পারে উত্তীর্ণ হ'ন। তখন তাহা সাধকের কাছে "স্বর্গ" বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু সে স্ব-এর অর্গল খুলিয়া নিজের প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিলে চলিবে না। তাহা হইলে ত ভজন-

ভুবনে অনন্তলীলা চলিবে ও সে তৃপ্তিও আত্মায় অবস্থিতি বা মোক্ষের অন্তরায় হইবে। তাহাও ত্যাগ হওয়া চাই। নিজের দ্বারা, জগতের হউক্ বা নিজ সত্তাতেই হউক্, কোথাও যাত্রা স্থগিত করিলে চলিবে না। সকল প্রকার প্রতিষ্ঠার প্রতি বিমুখ হইতে হইবে। ইহার জন্য সকল কার্য্যে ধৈর্য্য চাই, নিজ জীবনব্রতে ধীর হওয়া চাই। ধৈর্য্য, নিজ ধীরভাবের বাহিরে প্রকাশ, আত্মরক্ষার জন্য, ইহা বর্ম্মের ন্যায়। নিজের ভিতরে (অন্তরে) ধীর থাকিলে তাহা অস্ত্রবিশেষ, যাহা মানুষকে নিজসত্তায় বীর হইবার উৎসাহ দেয়। বীরের মত আত্মরক্ষা করিতে হয়, বাহিরের ও অন্তরের পরাজয় হইতে নিজকে রক্ষা করিবার জন্য। সেই নিজের মধ্যে, আপন অন্তঃস্থল সংযম-রূপ আধ্যাত্মিক দুর্গ মধ্যে আপন গোপন অস্ত্র শস্ত্র (ধৈর্য্য ও ধীরতা) হইতে শক্তি সঞ্চয় করিয়া প্রস্তুত থাকিতে হয়। তবেই সাধন সময় চলে। নচিকেতা, তুমি তাহা করিয়া মোক্ষের জন্য চিরব্রতী হইয়াছ। তুমি শ্রেয় পথের শেষ আশ্রয়ে গুপ্তভাবে শরণ লইয়াছ চিরতরে। তাই মোক্ষসাধনে তোমার সুনিশ্চিত স্থিতি সম্ভব হইল।

দ্বাদশমন্ত্র (১।২।১২)।

মন্ত্র—তং দুর্দর্শং গূঢ়মনু প্রবিষ্টং
গুহাহিতং গহ্বরেষ্টং পুরাণম্।
অধ্যাত্ম যোগাধিগমেন দেবম্
মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি ॥

অর্থ—সেই দুর্দর্শ (যাহা দেখা যায় না), গূঢ় (যাহা শোনা যায় না), অনুপ্রবিষ্ট (অনু অর্থাৎ জীবাত্মার আড়ালে লুক্কায়িত। অতএব যাহা স্পর্শ করা যায় না) হৃদয় গুহায় অবস্থিত, কামনা বাসনার "ঘেরাও" রূপ কণ্টকভূমি দ্বারা বেষ্টিত হইয়া, যিনি চিরপুরাতন হইয়াও চিরনূতন, সেই সনাতন রহিয়াছেন। অধ্যাত্মযোগ দ্বারা সেই দেবতাই (মহৎ আত্মা) একমাত্র অবলম্বন জানিয়া, সাধক হর্ষ ও শোকের উপর জয়ী হ'ন।

ব্যাখ্যা—উপরে কয়েকটি বাক্যের অর্থ বিশ্লেষণ-পূর্ব্বক মন্ত্রটিকে বোধগম্য করিবার চেষ্টা করা হইল। যাঁহাকে দেখা যায় না, শোনা যায় না, স্পর্শ করা যায় না, অথচ নিজের সব চেয়ে কাছে, হৃদয় মাঝারে রয়েছেন, তাঁহাকে কি করিয়া জানিব? আবার বাসনা কামনার কাঁটা গাছ সেখানে অবধি পৌঁছাইয়া নিজেদের ক্রিয়া কলাপ প্রদর্শন করিতেছে। সে সব কাঁটা গাছ মরেও না। রক্তবীজের মত, একটা মরিলে, একশত জন্মায়। তাই তাহাদের পরতেও পারা যায় না। যখন অব্যক্ত আত্মা (১।২।৭ ব্যাখ্যা দেখুন) তাহাদের আত্মস্থ করিয়া সংহার করেন, তখন সাধকের উদ্ধার সম্ভব হয়। (চণ্ডীতে অব্যক্ত আত্মাকেই চণ্ডিকা দেবী বলা হইয়াছে। ইঁহার একটু পরিচয় এখানে স্মরণ করা ভাল। পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হইবার সময় আমরা অব্যক্ত হইতে ব্যক্তে আসি নি এবং মরণে আবার অব্যক্তের ক্রোড়ে ফিরিয়া যাই। "অব্যক্ত" আমাদের কাছে পাইলেই, আমাদের "সংস্কার" গুলি গুছাইয়া রাখেন এবং পুনর্জন্মে সে গুলি সঙ্গে দে'ন। সেই সুযোগে তিনি সংস্কারের কাঁটাগুলি নিশ্চিহ্ন করেন। মায়ের কাজই হচ্ছে সন্তানের কাঁথাকে কণ্টকাহীন করা)। তাই তাঁহারই মুখ চাহিয়া থাকিতে হয়। যদি তিনি জীবনের জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া মঙ্গল নিকেতন রচনা করিয়া দে'ন এবং সেইখানে যদি সাধক দ্রষ্টা বা প্রহরী হইতেও পা'ন, তাহা হইলে তিনি সকল বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়া শান্তির নিঃশ্বাস লইয়া বাঁচেন। আর যাহা হউক্ হর্ষ বা শোক তাঁহার উপর প্রতিপত্তি স্থাপন করিয়া নিজেদের পুর্ব্বের মত ব্যক্ত করিতে পারে না। তাহা হইলেও আবার বাসনা ও কামনার বীজ সেই ভূমিতে সেই অবকাশে অঙ্কুরিত হইতে পারে ও যন্ত্রনার নাটকের পুণর্কার অভিনয় চলিবে। সাধক মৌন হইয়া যা'ন। বলিবেন কাহাকে? শোনাইবেন কাহাকে? এ অধ্যাত্ম যোগ ত শুধু যোগ নহে। ইহাকে মহাযোগ বলা চলে। ভূঃ, ভুবঃ ও স্ব তিনটি ব্যাহৃতী" (তৈত্তি উপ, ১।৫) পার হইয়া মহঃ ব্যাহৃতিতে সাধক একণে' পৌঁছাইয়াছেন।

এই মন্ত্রে সর্ব্বপ্রথম "অধ্যাত্ম যোগ" শব্দ ব্যবহৃত হইল। অধ্যাত্ম স্থানে যে যোগ নিষ্পন্ন হয় তাহাকে অধ্যাত্ম যোগ বলা হয়। ইহা অব্যক্ত আত্মার নেতৃত্বে জীবাত্মা ও মহৎআত্মার মিলনের সূত্রপাত। "অনু" বলিয়া জীবাত্মার উল্লেখ ১।১।২৯ মন্ত্রে প্রথম পাই। বর্ত্তমান মন্ত্রে "দেবম্" বলিয়া মহৎ আত্মার পরিচয় আরম্ভ হইল। মহৎ আত্মা সম্বন্ধে তৈত্তিরীয় উপনিষদে, শিক্ষা অধ্যায়ে

পঞ্চম অনুবাকে বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে। এই উপনিষদে পরের মন্ত্রে ইহার ঘনিষ্ঠ দর্শন পাওয়া যাইবে। মহৎ আত্মা যে জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যবর্ত্তী প্রকাশ তাহা এই উপনিষদের ২।৩।৭ মন্ত্রে স্পষ্ট হইয়াছে। এবং সাধক যতক্ষণ না পরমাত্মায় মিলিত হইয়া তাঁহার সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক স্বরূপ লইতেছেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত অব্যক্ত আত্মা মায়ের মত সাথী হইয়া থাকেন, তাহাও সেখানে সুস্পষ্ট করা হইয়াছে। অতএব অব্যক্ত আত্মা যে জীবের আদিগুরু ও চরমগুরু তাহা ভুলিবার নয়।

আত্মতত্ত্বের ভিতর ব্যক্ত আত্মা (জ্ঞান আত্ম), অব্যক্ত আত্মা, জীবাত্মা, মহৎ আত্মা ও পরমাত্মার বিবরণ যত পাইতে থাকিবেন, কেহ যেন বিচলিত না হ'ন। সর্ব্বত্রই বিশেষ্য এক, বিশেষণ ভিন্ন। "বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান্"। একটি রামধনুতে যেমন সপ্তবর্ণ সেইরূপ একই আত্মার এই পঞ্চরূপ+অনাত্মরূপ+পুরুষ, যেমন পরের বল্লীতে প্রকাশ পাইবে। এখানে শুধু সতর্ক করিয়া দেওয়া হইল। [ক্রমশঃ]

সেই পুরাতন

অমরনাথ বসু

আজ যা কিছু নতুন বলে বিশ্বাস জন্মায়
সবই নিঃস্ব হয় পৃথিবীর চির শূন্যতায়;
এই বন-উপবন-নদী-নালা সমুদ্র পাহাড়
চেনা-অচেনার সবকিছু সেই পুরাতন হাড়!
গতায়ু জীবনের ফেলে আসা পুরাতন স্মৃতি
দুঃখ সুখ প্রেম প্রীতি বেদনার গীতি
মুহূর্ত্তে কেঁপে ওঠে অশরীরি ছায়ায়
রাত্রিশেষে সকালের নতুন আবহাওয়ায়।

আদিম মানুষ রোদ-বৃষ্টি ধমনীর রক্তে
অথবা শরৎ সকালের স্মৃতি, যা ভাষায় অব্যক্ত
অনিচ্ছা মৃত্যু যন্ত্রণা—আলোর ছলনা
চাওয়া পাওয়া থেকে যায়, কিছুই হ'লোনা!
জীবন মৃত্যুর চূড়ান্ত জয়-পরাজয়
অনির্বাণ ঘটে চলে, রাত্রিদিন সতত
আজ যা কিছু নতুন বলে বিশ্বাস জন্মায়
সবই হারায়, যেন এক ত্রস্ত হরিণের মত!

'জাতীয় বসন্ত উচ্ছেদ পরিকল্পনা'

শ্রীননী ভট্টাচার্য্য

স্বাস্থ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

মানুষের ভয়াবহ শত্রু বসন্ত রোগ। কারণ বসন্ত রুগীকে দেখলে শরীর আতঙ্কে শিউরে ওঠে। আগে এই রোগে অসংখ্য মানুষের প্রাণনাশ ঘটেছে। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে প্রতিষেধক টিকা ব্যবস্থা করার ফলে এই রোগে আক্রমণ ও মৃত্যুর সংখ্যা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু বসন্ত রোগ উচ্ছেদ করতে আমরা এখনও সক্ষম হইনি। নিয়মিত প্রতিরোধক টিকা ব্যবহারের ফলে পাশ্চাত্য দেশগুলি এই রোগের হাত থেকে সম্পূর্ণ রক্ষা পেয়েছে। কিন্তু নিয়মিত টিকা না নেবার ফলে আমাদের দেশে প্রতি বছর এই রোগে এখনও বহু লোকের প্রাণ নাশ ঘটছে। আর এই রোগে আক্রান্ত হয়ে যাঁদের জীবন রক্ষা পাচ্ছে তাঁদের কারও ঘটছে অঙ্গের বিকৃতি··· কারো বা অন্ধত্ব, কেউ হচ্ছেন বধির···কারো বা দেখা দিচ্ছে শ্বাসযন্ত্রের রোগ। সারা গায়ে ও মুখে থেকে যায় স্থায়ি দাগ দেহের ও মুখের সৌন্দর্য্য নষ্ট হয় চিরদিনের জন্য। তাঁরা হারাচ্ছেন ভবিষ্যতের আশা ভরসা, হয়ে পড়ছেন অকর্ম্মণ্য, অক্ষম এবং পরিবার ও সমাজের ভারস্বরূপ।

মহামারীর প্রকোপের বিষয় আলোচনা করলে দেখা যায় যে পৃথিবীতে বসন্তরোগের স্থান ছিল সর্ব্ব প্রথম। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপে অধিকাংশ লোকেই এই রোগে আক্রান্ত হতেন। চীনে এই রোগে এত বেশী লোক আক্রান্ত হতো যে, যতদিন না সন্তানের বসন্ত হচ্ছে, ততদিন তাকে সন্তান সংখ্যার মধ্যে গণনাই করা হতো না। কারণ এই সব বসন্ত রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের ভবিষ্যৎ ছিল অনিশ্চিত। তবে তখনকার মানুষেরও ধারণা ছিল যে, একবার যার বসন্ত হয়েছে তার আর পরবর্ত্তী জীবনে এই রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে না। তখনকার মানুষ আরো উপলব্ধি করেছিলো যে—গো বসন্ত দেখা দিলে আসল বসন্তের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। কিন্তু ডক্টর জেনারই হচ্ছেন প্রথম ব্যক্তি যিনি এই অন্ধ ধারণাকে সত্য বলে প্রচার করলেন ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু সে যুগের বৈজ্ঞানিকেরা এর সম্যক ব্যবহার করলেন না। ঠিক একশ বছর পরে ডাক্তার লুই পাস্তুর ডাক্তার জেনারের বৈজ্ঞানিক সত্য হৃদয়ঙ্গম করে প্রতিষেধক টিকার সার্ব্বজনীন প্রচলন করলেন। পৃথিবীর মানুষ জানলো, বসন্তরোগ উচ্ছেদের পাশুপাত অস্ত্র—বসন্তের টিকা। বসন্তরোগের বিরুদ্ধে প্রতিষেধক টিকা পাশ্চাত্য দেশের জনসাধারণের নিকট অভিনন্দিত হলো। ব্যাপকভাবে নিয়মিত টিকা নিয়েই আজ পাশ্চাত্য দেশ এই মহামারীর হাত থেকে রেহাই পেয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশের জনসাধারণ এই টিকা প্রথমে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি। তাঁদের বেশীর ভাগেরই ধারণা ছিল—বসন্তরোগ ভগবানের অভিশাপ, এর জন্য মানুষের কিছু করবার নেই। ১৮৮০ সালে প্রণয়ন করা হলো—বেঙ্গল ভ্যাক্সিনেশন অ্যাক্ট। এই আইনে, জন্মাবার ৬ মাসের মধ্যে শিশুকে টিকা দেবার ব্যবস্থা হলো। ১৮৯৭ সালে "ইণ্ডিয়ান্ এপিডেমিক ডিজিজ্ অ্যাক্ট" প্রণয়ন করা হলো। কিন্তু তাতেও মহামারীর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া গেল না। স্বাধীনতার পর ভারত সরকার এই মারাত্মক রোগকে চিরদিনের মত নির্মূল করার জন্য "জাতীয় বসন্ত উচ্ছেদ পরিকল্পনা" গ্রহণ করলেন। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হলো—একযোগে সমস্ত প্রদেশগুলিতে বসন্ত রোগের প্রতিষেধক প্রাথমিক ও পুনর্বার টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা। অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত জনগণকে টিকা দিতে পারলে, বসন্তের বীজ টিকা না নেওয়া লোকের অভাবে নিজেই মরে যাবে। এই পরিকল্পনা পশ্চিমবাংলায় চালু হয়েছে—১৯৬২ সালের নভেম্বর মাসে। আমাদের দেশেও টিকা নেবার ফলে পূর্ব্বের চাইতেও বর্ত্তমানে এই রোগের আক্রমণ ও মৃত্যুর হার অনেক কমে গিয়েছে,

কিন্তু পাশ্চাত্য দেশের মত বসন্তরোগ উচ্ছেদ করতে এখনও আমরা সক্ষম হইনি। তাই, প্রতি বছর জনগণকে নিয়মিত টিকা দেওয়ার ব্যাপারে সচেতন করার জন্য "বসন্তরোগ উচ্ছেদ সপ্তাহ" পালন করা হয়ে থাকে। ১২ই নভেম্বর, এ বছরের বসন্ত রোগ উচ্ছেদ সপ্তাহের আরম্ভ, উদ্দেশ্য হলো—জনগণকে বসন্তরোগের সাংঘাতিক পরিণতি সম্বন্ধে সজাগ করা, অরক্ষিতদের অর্থাৎ যাঁরা টিকা নেননি তাঁদের টিকা নেওয়ার জন্য সচেতন করা এবং এই উচ্ছেদ পরিকল্পনাকে সার্থক করার জন্য সরকারের যে কর্ম প্রচেষ্টা চলছে, তাতে জনগণকে সহযোগিতা করার জন্য আহ্বান জানানো।

বসন্ত অত্যন্ত ছোঁয়াচে রোগ তা আপনারা সবাই জানেন। আজও কারো কারো বিশ্বাস মা শীতলার রোষ অথবা নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত এই রোগের কারণ। কিন্তু বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন—অতি ক্ষুদ্র জীবাণু ভেরিওলা ভাইরাস্ এই রোগের কারণ। একমাত্র বসন্ত রুগীই এই রোগের বাহক। জ্বর হওয়ার প্রথমদিন থেকে বসন্তের ঘা শুকিয়ে যাবার পর শুকনো ঘায়ের ছাল বা মামড়ি দেহ থেকে খসে যাওয়া পর্য্যন্ত বসন্তের রুগী নানা-ভাবে ছোঁয়াচ ছড়াতে পারেন। জ্বর কমে যাওয়ার পর সারা দেহে যখন লাল লাল ছোপ দেখা যায় এবং ফুস্কুড়ির মত বেরুতে থাকে অর্থাৎ রোগের তৃতীয় ও চতুর্থ দিনে রুগী সম্ভবত সবচেয়ে বেশী ছোঁয়াচ ছড়ান। রুগীর কফ ও থুথুতে এই রোগের জীবাণু থাকে। শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে হাঁচি, কাশি এবং কথাবলার সময় এই রোগের জীবাণু রুগীর মুখ এবং নাক থেকে সুস্থ মানুষের মুখ ও নাকের ভিতর দিয়ে দেহে প্রবেশ করে। হাঁচি প্রায় ২০ ফুট, কাশি ১৫ ফুট, এবং কথাবলার সময় থুথুর কণা আট ফুট পর্য্যন্ত এই রোগ ছড়াতে পারে। বসন্তের ঘা শুকিয়ে যাবার পর শুকনো ঘায়ের ছাল বা মামড়ি বাতাসে উড়ে গিয়ে সুস্থ লোকের দেহে বসন্তরোগ সংক্রামিত হতে পারে। বসন্তর রুগীর ব্যবহৃত কাপড়-চোপড়ের ছোঁয়াচ লেগেও বসন্তরোগ হতে পারে। বায়ুপ্রবাহে এই রোগের সূক্ষ্ম জীবাণু ভেসে বেড়াতে পারে। তাই নিকট সংস্পর্শ না ঘটলেও এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই প্রথমেই আমাদের সাবধান হতে হবে আদৌ যাতে রোগ না হয় এবং যদি রোগ হয়, তবে রোগ যাতে ছড়িয়ে না পড়ে। রুগীর কফ ও থুথু একটি ঢাকা পাত্রে রেখে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। খসে পড়া বসন্তের মামড়ি যেখানে সেখানে না ফেলে, সেগুলোকে সাবধানে জমিয়ে রেখে পুড়িয়ে ফেলা উচিত। রুগীর কাপড় চোপড় এবং বিছানা পত্র পুড়িয়ে ফেলতে না পারলে অন্ততঃ আধঘণ্টা ধরে এ'গুলোকে ফুটন্ত জলে সিদ্ধ করে নিয়ে, খুব কড়া রোদে খোলা জায়গায় টাঙিয়ে শুকিয়ে নিয়ে ভাল করে ঝেড়ে, তারপর ঘরে তোলা দরকার। এ'তো হ'লো বসন্তরুগীর সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বনের দিক। কিন্তু এই রোগের হাত থেকে আত্মরক্ষার সব চাইতে প্রকৃষ্ট পন্থা হ'ল নিয়মিতভাবে টিকা নেওয়া। যাঁরা এক বা একাধিকবার বসন্তের টিকা নেন নি তাঁদের মধ্যে এই রোগ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার ভয় থাকে। এটা তাই সকলেরই মনে রাখা দরকার, বসন্তের টিকা নিলে এই রোগের বিস্তার বন্ধ করা যায়।

প্রাথমিক টিকা দেওয়া উচিত—শিশুর জন্মের ছ'মাসের মধ্যে। অনেকে জন্মের পর শিশুকে টিকা দিতে ভয় পান, কিন্তু এতে ভয়ের কিছুই নেই। সামান্য একটু জ্বর হতে পারে মাত্র। লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে টিকা ঠিক মত ওঠে এবং টিকার ফোসকাগুলি অটুট থাকে। এই ফোস্কাগুলি যদি কোন কারণে ছিঁড়ে যায় তবে স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মীদের জানাবেন। শিশুর কষ্ট হবে বলে, টিকা না উঠলে, আবার টিকা দিতে দ্বিধাবোধ করবেন না। দ্বিধা বোধ করলে শিশুর পক্ষে খারাপই হতে পারে। প্রত্যেক শিশুকে এর পর নিয়মিত তিন বছর অন্তর টিকা দিতে হবে এবং প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তিও প্রতি তিন বছর অন্তর নিয়মিত টিকা নেবেন। গর্ভবতী মহিলা অবশ্যই টিকা নেবেন। তাতে গর্ভস্থ সন্তানও বসন্ত-রোগের হাত থেকে রক্ষা পাবে—তবে গর্ভ ধারণের তিন মাস পরে টিকা নিলে ভাল হয়। মনে রাখতে হবে কোন ব্যক্তিই বসন্তরোগের আক্রমণের আশঙ্কা থেকে মুক্ত নয়। যে কোন বয়সের যে কোন লোকেরই অরক্ষিত অর্থাৎ টিকা না নেওয়া থাকলে এই রোগ হতে পারে। এই মারাত্মক রোগের হাত থেকে রেহাই পাবার একমাত্র রক্ষা কবচ হ'লো প্রতি তিন বছর অন্তর নিয়মিত ভাবে

টিকা নেওয়া এবং নবজাত শিশুকে জন্মের পরই টিকা দেওয়া।

এই রোগের লক্ষণগুলি হঠাৎ প্রকাশ পায়। প্রথমে জ্বর, শীত শীত বোধ, মাথা ব্যথা এবং সমস্ত গায়ে ব্যথা বিশেষতঃ পিঠে ও কোমড়ে ব্যথা, বমি প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেয়। তৃতীয় দিনে জ্বর কমে যায় এবং সমস্ত গায়ে লাল লাল ছোপ পড়ে। আসল বসন্তের গুটি পাঁচ দিনে দেখা দেয়। বসন্ত রোগ দেখা দিলে রুগীর বাড়ীর, আশে পাশে বাড়ীর এমন কি গ্রামের ও সহরের সেই অঞ্চলের সকলকেই টিকা নিতে হবে। এই রোগে কোন লোক আক্রান্ত হলেই আমাদের দেশে অজ্ঞতার জন্য অনেকে গোপন করে রাখেন। তজ্জন্য রোগটি সহজেই বিস্তার লাভ করে, কেননা সময় মত প্রতিষেধক ব্যবস্থা নেবার সুযোগ পাওয়া যায় না। সেজন্য প্রত্যেকের টিকা নেওয়া যেমন অবশ্য কর্ত্তব্য, সেইরূপ গ্রামে বা সহরে বসন্ত রোগ দেখা দিলে নিকটস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র, স্বাস্থ্য কর্মচারী অথবা পৌর স্বাস্থ্য কর্মচারীকে যত সত্বর সম্ভব সেই সংবাদ পৌঁছে দেওয়াও অবশ্য কর্ত্তব্য। এই খবর দেওয়ার ব্যাপারে গাফিলতী অনেক সময় লক্ষ্য করা গেছে এবং তার ফলে বসন্ত রোগ গ্রাম থেকেগ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। অথচ সময়মত খবর দেওয়া থাকলে এই রোগের ব্যাপক সংক্রমণ বন্ধ করা সম্ভবপর হ'তো। খবর দেওয়ার ব্যাপারে গাফিলতীকে তাই সামাজিক অপরাধ বলে সবাইকে মনে করতে হবে।

বসন্ত রোগ যে অত্যন্ত ছোঁয়াচে তা' আগেই আমি বলেছি সেজন্য রুগীকে পৃথকভাবে রাখা একান্ত প্রয়োজন। সম্পূর্ণভাবে পৃথকীকরণ ব্যবস্থা অনেকের পক্ষে সম্ভব নয়। সেজন্য রুগীকে যত শীঘ্র সম্ভব নিকটস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্র অথবা হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। বসন্তরুগীর সেবা করতে হলে সেই লোককেই সেবা করতে দেওয়া উচিত যে লোকের সম্প্রতি টিকা দেওয়া হয়েছে এবং টিকা ভালভাবে উঠেছে কিংবা যে লোক সম্প্রতি বসন্তরোগ থেকে সেরে উঠেছে। যদি সম্প্রতি টিকা নেওয়া না থাকে তবে অবশ্যই টিকা নিয়ে তবে রুগীর সেবা করবেন। তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে থেকে ১৪ দিনের মধ্যে লক্ষণ প্রকাশ পায়। কাজেই বীজাণু দেহে প্রবেশের পর তিন দিনের মধ্যে টিকা নিলে রোগ সাধারণতঃ হয় না। সাত দিনের মধ্যে টিকা নিলে বসন্ত হতে পারে তবে তার প্রকোপ কম হবে। তাই অনেক সময় টিকা নিলেও বসন্ত হতে দেখা যায়। সে সব ক্ষেত্রে দেহে আগেই বীজাণু প্রবেশ করে। আর একটি কথা মনে রাখতে হবে এই টিকা জল বসন্তের বা চিকেন পক্স এর প্রতিষেধক নয়। জল বসন্তেরও প্রতিষেধক এই টিকা…এই ধারণাটা ভুল। জল বসন্তের বীজাণু অন্য জাতের ভাইরাস্।

বসন্ত রোগে মৃত্যু হলে, সেই মৃত দেহ ভয়ে অনেকে পোড়াতে আসেন না। তাই অনেক সময় আত্মীয়-স্বজনরা মৃতদেহ নদীতে বা জঙ্গলে ফেলে দিয়ে চলে আসেন। এটা কিন্তু অত্যন্ত বিপদজনক। শতকরা ৪০ ভাগ ফর্মালিন সলিউশন্ কাপড়ে বেশ করে ভিজিয়ে, মৃতদেহটি আগাগোড়া মুড়ে, বহন করলে এই রোগের সংক্রমণের ভয় থাকে না। মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেলবেন অথবা অন্ততঃপক্ষে ৬ ফুট গভীর গর্ত করে তাতে ব্লিচিং পাউডার ছড়িয়ে মৃতদেহ সমাধিস্থ করবেন। বসন্তরুগী যে ঘরে থাকেন সেই ঘরে বীজাণু অনেকদিন জীবিত অবস্থায় ছড়িয়ে থাকে এবং রোগ বিস্তার করতে পারে। সেজন্য রুগী সেরে গেলে অথবা মৃত্যুর পর ঘরটি বীজাণুমুক্ত করা প্রয়োজন। নিকটস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র, স্বাস্থ্য কর্মচারী, স্যানিটারী ইন্‌স্পেক্টার অফিসে কিংবা পৌরসভায় খবর দিলে তাঁরা ঘরশোধনের ব্যবস্থা করতে পারেন।

কোন রোগ উচ্ছেদ পরিকল্পনা জনগণের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া সফল হতে পারে না। তাই আজকের দিনে ব্যক্তিগত ও সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় স্বার্থরক্ষার জন্য আমরা সংকল্প গ্রহণ, করবো—নিয়মিত ও সময় মত টিকা নিয়ে, প্রতিটি নবজাত শিশুকেপ্রাথমিক টিকা দিয়ে,আর অরক্ষিতের অর্থাৎ যাঁরা টিকা নেন নি তাঁদের টিকা নেওয়া সম্বন্ধে সচেতন করে এবং বসন্তরুগী সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করে এই মারাত্মক রোগকে চিরদিনের মত দেশ থেকে নির্ম্মূল করবো।

সেকাল ও একালের কথা

॥ স্বপনবুড়ো ॥

[সেকাল]

প্রাচীন নদীমাতৃক বাঙলার এক বর্ধিষ্ণু গ্রাম। নদীর ধারে জনপ্রিয় ও দানবীর জমিদারের তিনমহলা বিরাট প্রাসাদ।

বাড়ীর সামনের দিকে দেবালয়, অতিথিশালা, বিদ্যালয়, টোল, শিবের মন্দির। নয়ন মনোরম পুষ্প উদ্যান, চিকিৎসালয়, জমিদারী দপ্তরখানা প্রভৃতি।

বাড়ী আশ্রিত পরিজনে পূর্ণ।

'আমুন জন' 'বমুন জন' এর অভাব নেই।

জমিদার বাবুর কাছে সকলেরই অবারিত দ্বার। বাইরের বৈঠকখানা ঘরে জমিদার সপার্ষদ গৃহ আলো করে বসে আছেন।

দলে দলে প্রজারা আসছে তাদের দুঃখের কথা নিবেদন করতে, খাজনা মকুবের আর্জি নিয়ে। জমিদার হাসিমুখে সকলেরই বক্তব্য শুনছেন।

কেউ খালি হাতে ফিরে যাচ্ছে না।

এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এলেন, কন্যাদায়ের জন্য অর্থ সাহায্যের আবেদন জানিয়ে।

জমিদার আলবোলায় তামাক টান্‌তে টানতে খাজাঞ্চিকে আদেশ করলেন, এই কন্যাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণকে ৫০০৲ টাকা দিয়ে দাও। ব্রাহ্মণ জমিদারকে আশীর্বাদ করে প্রস্থান করলেন। একজন অভিভাবক এসে আবেদন জানালেন, তার কোনো সঙ্গতি নেই। তার একমাত্র ছেলে যাতে জমিদার বাড়ী থেকে টোলে বিদ্যাভ্যাস করতে পারে—তার জন্যে প্রার্থনা করলেন।

জমিদার ছেলেটিকে দেখতে চাইলেন। তার সঙ্গে দু একটি কথা বল্লেন। তারপর অভিভাবকের আবেদন মঞ্জুর করলেন।

জমিদারের জয়ধ্বনি দিয়ে অভিভাবক প্রস্থান করলেন।

অবগুণ্ঠিতা একটি নারী এসে জমিদারের পা জড়িয়ে ধরল। জমিদার শুধোলেন, কি হয়েছে মা?

নারী বল্লে, আমার স্বামী দুরারোগ্য ব্যাধিতে শয্যাশায়ী, তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। জমিদার হাসি মুখে তার বক্তব্য শুন্‌লেন। তার পর রোগীটিকে তাঁর চিকিৎসালয়ে পাঠিয়ে দিতে বল্লেন। নারী আশ্রয় লাভ করল অন্তঃপুরে।

সারা দিন ধরে জমিদার আবেদন-নিবেদন শুনলেন, তারপর অবেলায় স্নানাহার করে বিশ্রাম গ্রহণ করলেন।

সন্ধ্যার পর প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি শুরু হল।

এক বণিক নৌকাভর্ত্তী পণ্যদ্রব্য নিয়ে জমিদারের গৃহে রাতের জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করলেন।

অতিথিশালায় আশ্রয় মিলল।

গভীর রাত্রে জমিদারের বেশ পরিবর্ত্তন।

কালীপূজা সমাপনান্তে জবা ফুলের মালা গলায় তিনি বাইরে বেরিয়ে এলেন। মালকোঁচা দিয়ে শক্ত করে ধুতি পরা। ললাটে লাল সিঁদুরের ফোঁটা, হাতে শক্ত লাঠি।

জমিদার তখন ডাকাতের সর্দার।

অনুচরদের নিয়ে অতিথিশালায় গেলেন।

হুকুম দিলেন, বণিকটাকে বেঁধে নিয়ে এসো।

সকলের চোখের সামনে তাকে নৃশংস ভাবে হত্যা করা হল।

ডাকাতের সর্দার আদেশ দিলেন, নৌকোর সমস্ত পণ্য সম্ভার গোপন কুঠুরীতে জমা দাও। আর বণিকের মৃত দেহটার গলায় পাথর বেঁধে নদীর জলে ফেলে দাও।

[একাল]

নাম করা সমাজসেবী আর দেশ নেতা।

সকলেই এক ডাকে তাঁকে জানে-চেনে, মান্য করে। সকাল থেকে লোকজনের আসার কামাই নেই।

কেউ এসে আবেদন জানায়, ছাত্রদের পড়ার জন্য বই চাই—, কেউ বলে, দুস্থ পরিবারের জন্য খাদ্য চাই—

সমাজ সেবী চেক কেটে অর্থ সাহায্য করেন।

অঞ্চলের অভিভাবকবৃন্দ এসে জানান, পল্লীতে প্রচুর জঞ্জাল জমেছে— প্রতিকার আবশ্যক।

সমাজসেবী নিজে উদ্যোগী হয়ে সকলকে সঙ্গে নিয়ে ঝাড়ু দিয়ে পথ পরিষ্কারে অগ্রসর হন।

সংবাদ পত্রের ক্যামেরাম্যান ফোনে সংবাদ পেয়ে এসে ফটো তোলেন। সেই চিত্র সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হয়। চারিদিকে সমাজসেবীর প্রসংশা ছড়িয়ে পড়ে।

কেউ আসে হাসপাতালে 'সিট্' সংগ্রহ করতে, কেউ আসে, মোটরের পারমিটের জন্য, কেউ এসে আবেদন জানায় ছেলের চাকরীর জন্যে।

তিনি সকলকেই হাতে রাখেন,—আশ্বাস দেন। বিকেলে ও সন্ধ্যায় তিনি জনকল্যাণ সভায় যোগদান করেন, গ্রন্থাগারের উদ্বোধন করেন, আর জ্ঞানগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন।

গভীর রাত্রে তিনি বেশ পরিবর্তন করেন। `মাজ বিরোধী লোকদের নিয়ে গোপনে আলোচনা সভা অ হু করেন। তাদের হাতে নিবিচারে বোমা, অ্যাসিড্ বাল্ব, সোডার বোতল ইত্যাদি তুলে দিয়ে গোপন পরামর্শ প্রদান করেন। বিরুদ্ধ বাদীদের ধ্বংস করতে হবে।

নিশীথ রাত্রে বিরুদ্ধ দলের বিরুদ্ধে নৈশ-অভিযান পরিচালনা করেন।

নিজের নিরাপত্তার জন্য চারতলার বিরাট হর্ম্যে অবস্থান করেন।

নিরীহ তরুণদল নির্ব্বিচারে প্রাণ হারায়, পুলিশের অত্যাচার সহ্য করে, আর আহত অবস্থায় হাসপাতালে প্রেরিত হয়।

নেতা ও সমাজসেবী চারতলায় হর্ম্যে অবস্থান করে থানায় ফোন যোগে জানিয়ে দেন, তার দলের লোককে যেন গ্রেপ্তার করা না হয়।

সমাজসেবী ও দেশনেতা নিজে সবার অলক্ষ্যে অক্ষত শরীরে অবস্থান করেন।

———

মহাত্মাজী স্মরণে

পুষ্পদেবী

গান্ধী শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে নানাদিক থেকে আমার ওপর অনুরোধ এসেছে আদেশ এসেছে তাঁর বিষয় কিছু বলার জন্য। তাঁর বিষয় বলতে অনুরোধ করা যত সহজ বলা তত সহজ নয়। আমাদের জীবন দুটি প্রভাবে জড়িত ছিল। একজন মহাত্মা গান্ধীজী অপর জন রবীন্দ্রনাথ। অসহযোগের অভিনব অস্ত্রহাতে যে ব্যারিস্টার কটিবাস পরে এগিয়ে এলেন, তাঁর প্রদীপ্ত প্রভাব তরুণ সূর্য্যের মত আমাদের পথ দেখিয়ে চললো। কণ্ঠে সঙ্গীত দিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী—জন গণ মন অধিনায়ক জয় হে এসব গান আমরা যেমন প্রাণ দিয়ে মর্ম নিংড়ে গেয়েছি জানিনা আজকালকার আধুনিক গায়িকারা সে আনন্দ জীবনে কোনদিন পাবেন কিনা।

বালিকা বয়সে সরোজনলিনী দেবীর কাছে গান শিখেছিলুম "অয়ি ভুবন মনোমোহিনী" তখন আমার পিতৃদেব শ্রীনিকেতন সচীব সুকুমার চট্টোপাধ্যায় বাঁকুড়ার সদর হাকিম ছিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন স্বর্গত গুরু সদয় দত্ত মহাশয়। গান্ধীজীর অমোঘ মন্ত্র মরব কিন্তু মারব না এই কথা নিজের জীবন দিয়ে তিনি প্রতিপন্ন করে গেছেন। পার্লবাক বলেছিলেন তাঁর দশ বছরের ছেলেটি যে গান্ধীজীকে জীবনে চোখেও দেখেনি গান্ধীজীর মৃত্যুর খবর শুনে সে বলে উঠেছিল "কেউ কোনদিন বন্দুক তৈরী করতে না পারলেই ভালো হত।"

১৯৩১ সালে গান্ধীজীকে দেখেছি পিতৃদেবের রোগ-শয্যার পার্শ্বে কস্তুরী বাঈকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীনিকেতনে। দেখেছি ১৯৪৭ সালে বেলেঘাটায়। এই দুটি দিনের কথা আমার জীবনে চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে। সম্প্রতি বেতার ভাষণে সেই দুটি দিনের কথা আমি বলে মহাত্মাজীর স্মৃতি চারণ করেছি। কাজেই আবার সেকথা আজ বলবো না। আমি বলবো গান্ধীজীর প্রতি আমাদের গ্রামের নিরক্ষর মানুষদের যে কী মনোভাব ছিল সেই কথাই। এই ঘটনাটি সত্য ঘটনা। গান্ধীজী রামপুর হাট পরিক্রমা করছিলেন। একটি ছোট্টছেলে গান্ধীজী যে পথে গেছেন সেই পথের ধূলি তার শতছিন্ন কাপড়ের খুঁটে বেঁধে নিয়েছিল। কারণ তারা এত গরীব যে তার মা বোন কাপড়ের অভাবে ঘর থেকে বেরোতে পারেনি। তাই সে ঐ পবিত্র পদধূলি কুড়িয়ে নিয়েছে মা বোনের জন্য। গান্ধীজীকে আমাদের দেশের দীন দরিদ্ররা পর্য্যন্ত যে কী দৃষ্টিতে দেখেছে এই নিচের কবিতায় তা বোঝা যায়।

"পথের দুধারে কাতারে কাতারে লোক
উদ্বেল মন দর্শ ব্যাকুল উৎসুক কত চোখ
শত শত নয় হাজার হাজার লাখো লাখো নর নারী
ছুটিয়া এসেছে কিজানি কী মোহে ফেলে রেখে ঘরবাড়ী
বহুদূর থেকে বহু ক্রোশ পাড়ি দিয়ে
আমার দেশের দুঃখী মানুষ কী আবেশ চোখে নিয়ে
প্রহরের পর প্রহর ধরিয়া কিসের প্রহর গোণে
পথের ধুলায় কান পেতে রেখে কিজানি কি ওরা শোনে।

স্বর্গের বার্তা কি?
নয়ন তাইত শ্রবণ হয়েছে শ্রবণ হয়েছে আঁখি।
কিসের প্রতীক্ষাতে?
লাখো লাখো লোক বসে আছে আজ অপলক আঁখি পাতে।

প্রহর গুনিছে প্রতীক্ষমাণ অগুনতি জনগণ
কখন আসবে সেই মহেন্দ্র ক্ষণ?
এই পথ দিয়ে কখন যাবেন তিনি?
আনন্দময় ক্ষমাসুন্দর প্রেমের দেবতা যিনি।
চক্ষে যাঁহার করুণা গঙ্গা বয়!
সেই অমৃতময়?
স্তব্ধ মানুষ ব্যাকুল মানুষ চলিছে প্রহর গণি
আকাশ বাতাস কাঁপায়ে সহসা উঠিল জয়ধ্বনি

তারপর ক্ষণ পরে
কটিবাস পরা দেবতা এলেন ধীর পায়ে জোড় করে
করুণাস্মিত মুখে
লাখো মানুষের পলক বিহীন দৃষ্টির সম্মুখে
তার পর তিনি অমৃত ঝরানো দু একটি কথাবলে
বিদায় নিলেন জনতার আঁখিজলে।
শেষ হল কলরব
সারা দিবসের প্রাণের মহোৎসব
মহাত্মাজী দর্শন শেষ করে
ফিরলো মানুষ আবার যে যার ঘরে।
তোমাদেরই মত একটি ছোট্ট ছেলে
সেও এসেছিল দেবদর্শনে খেলাধুলা সবফেলে।
ফেরার সময় ছিন্নধুতির জীর্ণ কোঁচর খুলি
ভরে নিলো সেই ছোট্ট ছেলেটি পথের দুমুঠো ধুলি!
সবে তারে বলে কী করো কী করো খোকা
কাপড়ের খুঁটে ধুলো বেঁধে নাও তুমিত আচ্ছা বোকা!
ছেলেটি তখন বলে সকরুণ স্বরে
একটি কাপড়ও নেই আমাদের ঘরে
মা-বোন আমার তাঁরে যে দেখতে আসতে পারেনি তাই
তাদেরি জন্য তাঁর পবিত্র পদধুলি লয়ে যাই।
এ কাহিনী শুনে সবার কণ্ঠে করুণায় বাণি বয়
সবার কণ্ঠে ধ্বনিত হইল মহাত্মাজী কি জয়।

এই হলেন আমাদের মহাত্মাজী। তাঁর জন্য আজও অযুত বুকে ভক্তির সিংহাসন পাতা। তাঁর অজের মানা-বল তাঁর আত্মসম্মানবোধ ঠুনকো পলকাজিনিষ নয়। তা আমাদের ঋষির বাণী আত্মবিদ কথাটি স্মরণ করিয়ে দেয়। আমি বলে কেউ নেই। আমিত আর আমার এই দেহটা নয়। আমার মধ্যে যে দেবতা আছেন তাঁর অসম্মান করতে দিতে আমি পারিনা। আমার যে মা তিনি শুধু আমার জন্মদাত্রিনী জননীই নন। আমার ভারত মাতারও সন্তান আমি। তাঁর গৌরব আমায় রক্ষা করতেই হবে। এই ভাবে তিনি ঋষিদের ব্রহ্মবিদ কথাটি নিজের জীবনে মূর্ত্ত করে গেছেন।

এইবার আবার আমি আমাদেরই বাড়ীর একটি শিশুর কথা বলে এলেখা শেষ কর্ব্ব। সে আজ পঞ্চাশ বছর আগের কথা। আমার পিতৃব্য তখন রাঁচীতে এ্যাকাউন্টেন্ট জেনারল। কিন্তু নিজে চরকায় সুতো কাটেন বাড়ীশুদ্ধ লোকের বেনারসী সিল্ক মাঠে জড়ো করে যেদিন কাকী নিজে হাতে তা ধু ধু করে জ্বালিয়ে দিলেন সেকালের কথা হলেও তা আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে। কাকা জীবনে বিলাতী জিনিষ পরেন নি। খদ্দরের আচকান ও পায়জামা পরে চাকরী করতেন, একান্তই আমার পিতামহ রায় বাহাদুর রামসদন ভট্টাচার্য্যের ইচ্ছায়। মহাত্মাজীকে নিয়ে তখন সরকার মহলে হুলুস্থুল। আমাদের বাড়ীতেও তার প্রভাব যথেষ্ট এসেছে। বাবা ও কাকা দুজনেই চাকরীতে ইস্তফা দেবার মতলব কর্চ্ছেন। বাবা ছুটী নিয়ে রাঁচীতে কাকার কাছে এলেন। সঙ্গে আমিও ছিলুম। যতদূর মনেহয় তখন আমার বয়েস ১০ কি ১১। কাকার ছোট্ট ছেলেটি ট্রাই সাইকেলে করে সামনের লনে বেড়াচ্ছিল। তার তখন শিশু বয়েস। জমাদার মালী এদের ছেলের দেখাদেখি সে ফটক দিয়ে বেরিয়ে সাহেবদের গাড়ী দেখে "সেলাম সাব" করেছিল। সাহেব আধোহাসিটি স্পষ্ট হেসে হাত তুলে সেলাম গ্রহণ করলো। শত হোক শিশু সে। মজা পেয়ে তিন চারবার এইরকম করে সেলাম করে বাড়ী ফিরলো। কিন্তু তার যাকিছু গল্প বাবা মার সঙ্গে কিন্তু বাবা মা সবাই যেন আজ বিভ্রান্ত। তার দিকে যেন তাঁদের স্বাভাবিক মনোনিবেশ আজ নেই। শেষে সে আর পারলোনা শিশুমন অভিমানে ভারাক্রান্ত। বাবা খেতে বসেছিলেন কাকীমা সামনে বসে। সেখানে গিয়ে বললো জানো মা আজ আমি কত সাহেবকে সেলাম করেছি। হঠাৎ অগ্ন্যুৎপাৎ হল। কাকা খাবার ছেড়ে উঠে পড়লেন। চিরদিনের শান্ত মানুষ কাকা। তবু আমি চেয়ে দেখলুম তাঁর উজ্জ্বল গৌরবর্ণ মুখ টকটকে লাল হয়ে উঠেছে। শান্তভাবে শিশুপুত্রের হাত ধরে তিনি তাকে শোবার ঘরে নিয়ে গেলেন। মহাত্মাজীর বড় ছবি সেখানে টাঙ্গানো। তাকে বললেন প্রণাম করো বলো আর সায়েবদের সেলাম কর্ব্বনা। শিশু মন্ত্রমুগ্ধের মত পিতার কণ্ঠস্বরের অনুসরণ করে মন্ত্রপাঠ করলো। আমরাও মনে মনে সে শপথ সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করলুম। সে জানতো না ঐদিন অসহযোগ আন্দোলনে মহাত্মাজীকে প্রথম কারারুদ্ধ করা হয়।

আজ আমাদের পারিবারিক ও গ্রামের দুটি শিশুর সত্য ঘটনা দিয়ে এ প্রবন্ধ শেষ করলুম।

———

অসংসারী [উপন্যাস] শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

বেলা সাড়ে তিনটে নাগাদ সমীরের সুযোগ জুটে গেল। ডেপুটী মিনিষ্টার তাকে খাস কামরায় ডেকে বল্লেন, সমীর বাবু, আপনার নরেন দাসকে মনে পড়ে? আপনারা বোধহয় একসঙ্গে—

সমীর বল্লে, হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব মনে পড়ে। ঐ যে, এখন কমিউনিষ্ট হয়েছে, সেই নরেন দাস ত? আমরা একসঙ্গে বহুদিন কাজ করেছি, তারপর ওর সঙ্গে আমরা তিনবছর একই জেলে কাটিয়েছি, ওকে আর মনে পড়বে না! খুব ব্রিলিয়েণ্ট ছিল।

ডেপুটী মিনিষ্টার একটু থেমে বললেন, একটা কাজ করতে হবে। ওকে আবার কংগ্রেসে কনভার্ট করতে পারবেন?

সে কি? ওর মতো লোককে কি আমি কনভার্ট করতে পারবো?

দেখুন এ-সব কনফিডেন্সিয়াল ব্যাপার খুব সিক্রেটলি করতে হবে। আমরা খবর পেয়েছি, ঐ নরেন দাস এই ঠিকানায় এসে তলে তলে কাজ করছে। ওর সঙ্গে আপনার যেমন হৃদ্যতা ছিল এমন আর আমাদের এখানকার কারুর সঙ্গে নেই, কাজেই এ কাজ করার ভার আপনারই ওপোর। আজ আপনি এখান থেকে এখনই বেরিয়ে পড়ুন, তারপর সুবিধে মত আজ বিকেলেই ঠিক যেন প্রাইভেট কেপাসিটিতে দেখা করছেন, এই ভাবে ওর বাসায় গিয়ে আলাপ করুন। বুঝে দেখুন, নরেন বাবুর কি উদ্দেশ্য এবং কি ভাবে ওঁকে আমরা আবার আমাদের মধ্যে পেতে পারি। বুঝলেন, কালই কিন্তু আমার রিপোর্ট চাই।

চিন্তিতমুখে সমীর ডেপুটী মিনিষ্টারের ঘর থেকে বেরিয়ে এলো, এবং নিজের অফিসে এসে দেখে যে, যে-সব কাগজ সে টাইপ করার জন্য পাঠিয়েছিল, সেগুলোর এখনও খানিকটে দেরী আছে। সমীর ভাবলে ইতিমধ্যে একবার ঘুরে আসি, নরেনবাবুর বাসার খোঁজ করা যাক, আর পঁয়ত্রিশটে টাকাও বাড়ী থেকে আনা যাক্।

বাড়ী ফিরেই সমীর অবাক হয়ে গেল। খোলা-জানলার পাশ দিয়ে দেখে, পিসিমার ঘরে এক মোটা গিন্নী এবং গৌরী দুজনে বসে কথা কইছে। বাইরে দরজার ঘা দেওয়ার পূর্ব্বেই সে গৌরীর গলার আওয়াজ পেলে। গৌরী সজোরে বলছে, পিসিমা, আপনি হুকুম করুন, ঐ কানী মাগিকে আমি আজই ঝেঁটিয়ে বাড়ী থেকে বিদেয় করে দিয়ে যাই।

মেদিনীপুর কর্ত্তার গিন্নীটি বললেন, রাম, রাম, পাড়ার মধ্যে কেলেঙ্কারী। বাঙ্গালী সমাজের নাম ডুবছে। একটা সামান্য ঝি নিয়ে কি এ-সব সহ্য করা যায় নানা রকম অনাচার বেশী দিন চলতে দেওয়া উচিত।

এইসব নোংরা কথাবার্ত্তা আড়ি পেতে শুনতে সমীরের ভালো লাগলো না। সে দরজায় আঘাত করলে, বোধ হয় যেন আজকের আঘাত অন্যদিনের তুলনায় একটু কর্কশ হয়ে বেজে উঠলো।

দু'তিনবার ঘা দেওয়ার পর একটি দশ এগার বছরের মেয়ে এসে দরজা খুলে দিলে। মেয়েটার মুখ চেনা, পাশের বাড়ীতেই থাকে মেদিনীপুর-নন্দিনী।

দরজা খোলা পেয়ে সমীর ঘরে ঢুকেই মেয়েটাকে জিজ্ঞাসা করলে, রেণু কোথায় রে।

রান্নাঘরে।

ওধার থেকে মেদিনীপুর গিন্নী ডাকলেন, আলো, কে এসেছে রে?

সে দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে চুপি চুপি বললে, সমীর বাবু।

ও-ঘরে হঠাৎ সব চুপচাপ হয়ে গেল। এ সময়ে সমীর কখনও বাড়ীতে থাকে না। দুই আগন্তুকা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে নিলে। পিসিমা বললেন, তবেই বোঝো, তোমরা যে আসবে সে খবর ঐ কানী আমার বাছার কানে দুপুরেই দিয়েছে, নইলে—

গৌরী বললে, আমি কেয়ার করি না। একটা ভালো কাজ করবো, তাতে আবার ভয়টা কিসের? সমীরবাবুর সামনেই আমি ওর ঘাড় ধরে বের করে দিতে পারি।

টাকাকড়ি গোছ করে গিয়ে সমীর মাঝখানের দরজাটা খুলে কোন ভণিতা না করেই গৌরীর দিকে চেয়ে স্পষ্ট কণ্ঠে বললে, আমার বাড়ীতে কে থাকবে না থাকবে, সে আমি বুঝবো, আপনারা পাড়ার লোক এ বাড়ীতে এসব নিয়ে অশান্তি করতে এসেছেন কেন?

সকলেই চুপ। শেষে পিসিমা বললেন, এরকম করে কি আমার সতীলক্ষ্মী মাকে অপমান করতে আছে? তুমি শিক্ষিত ছেলে, সামান্য একটা ঝি-এর জন্য এদের অপমান করা—

কে যে কি তা তুমি কিছু জানোনা পিসিমা। উনি আমার বন্ধুর স্ত্রী, তোমাদের সকলের চেয়ে আমি ওঁকে যত বেশী জানি, তোমরা তার কিছুই জানো না। গৌরীর দিকে মুখ করে সমীর বল্লে, আপনি এ-বাড়ীতে কেন এসেছেন? চলে যান এখুনি।

এবার গৌরী মুখ তুলে চাইল, বললে, এতদূর? রাগে ফুলতে ফুলতে বললে, প্রথম যখন কোথাও জায়গা জোটে নি, তখন আমার কাছেই এসে দাঁড়িয়েছিলেন। দুবেলা খাইয়েছিলুম, তাই চাকরী বজায় করতে পেরেছিলেন। সে সব কথা কি আজ একটুও মনে পড়ছেনা? দুঃখে রাগে গৌরী আর কিছুই বলতে পারলে না।

পড়ছে। নগদ একশ টাকা করে দিয়ে তবে খেয়েছি, অমনি নয়। যাক সে সব কোন কথা নয়। ভদ্রভাবে লোকের বাড়ীতে এসে সুখ দুঃখের কথা কন, আপত্তি নেই, পরের বাড়ীতে ঝাঁটাবাজী করতে আপনার কোন অধিকার আপনার নেই। যান, এখুনি বেরিয়ে যান।

রান্নাঘরের দরজা খুলে রেণু বেরিয়ে এল। চোখের জলের ধারা তার গালের ওপোর তখনও শুকিয়ে আছে। এসেই বললে, দাদা আপনি কিছু বলবেন না, আপনি—

পিসিমা তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠে বললেন, থাম কানি, আর ভালোমানুষী দেখাতে হবে না! নিজে বলে কয়ে সমস্ত সাজিয়ে আবার ভালোই জানাতে আসা হয়েছে, বলেই তিনি দুর্বলতাবশতঃ খক্ খক্ করে কাস্‌তে লাগলেন।

সমীর বল্লে, কেউ কিছু আমাকে বলে নি, আমি আমার নিজের দরকারে এ সময়ে এসেছি। এখন বুঝছি, রোজ তোমাদের এই সব কাণ্ড হয়। দুনিয়ায় যার কেউ নেই, এমন একটা নিরীহ মেয়ের ওপোর তোমরা সবাই মিলে এই রকম করে দিনের পর দিন অত্যাচার কর। হঠাৎ সমীর তার গুজোন হারিয়ে বললে, দেখ পিসিমা, তোমার ইচ্ছে হয় যতদিন খুসি এ বাড়ীতে থাক, কিন্তু রেণু, ওদের কোন রকম অন্যায় ব্যবহার করতে পারবে না। আর তোমার ঐ সতীলক্ষ্মী মা-টিকে এ বাড়ীতে খবরদার ঢুকতে দিতে পাবে না। বাড়ীটা আমার, সেটা ভুলে যেও না। রাগে ফুলতে ফুলতে গৌরীর দিকে কঠোর দৃষ্টিপাত করে সমীর যেন আপন মনেই বললে, শয়তানী কোথাকার!

এ পাপের শাস্তি ভগবান না দেন, আমি দেব, দাঁতের ওপোর দাঁত চেপে গৌরী উঠে দাঁড়িয়ে বললে, পিসিমা। এ জীবনে এ বাড়ীতে এই আমার শেষ, বলেই ভিতরের দরজা দিয়ে উঠানে নেমে পাশের দরজা খুলে বেরিয়ে চলে গেল। পেছন পেছন মেদিনীপুর গিন্নিও তাকে অনুসরণ করলে, তাঁর মেয়ে আলোও মায়ের সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল। পিসিমা হঠাৎ কেঁদে ফেললেন।

সমীর কঠোরকণ্ঠে বললে, তোমাকে ত কিছু বলি নি পিসিমা, তুমি কাঁদছো কেন? একটু থেমে পিসিমার কোন উত্তর না পেয়ে সমীর বললে, তুমি এ সব পাড়ার লোককে চেন না, যাকে সতীলক্ষ্মী বলছো, সে রেণুর পায়েরও যোগ্য না, তা মনে রেখ।

পিসিমা কাঁদতে কাঁদতে বললেন, হ্যাঁ বাবা হ্যাঁ, এবার

বুঝছি। দুনিয়ায় ঐ কানী ছাড়া আর কোন মানুষই মানুষ নয়। আমার ভুল হয়েছে বাবা, তোমার এখানে এসে, তুমি আমাকে আজই সেই বৃন্দাবনের আখড়ায় আবার আমায় ফেলে দিয়ে এস। তোমার টাকা পয়সাও চাই না, আর তোমা'কে আমার কোন খোঁজও নিতে হবে না।

সমীর বললে, আমার কাজ আছে, এই সব বাজে অশান্তি করার সময় এখন নেই, এই বলে একরাশ বিরক্তি নিয়ে সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে সাইকেলে চড়ে চলে গেল।

কমিউনিষ্ট নরেন দাসের হোটেলে গিয়ে সেইদিন সন্ধ্যের পর সমীর দেখা করলে। সমীরের দেখা পেয়েই নরেন ঠিক পূর্ব্বের মতন অন্তরঙ্গতা নিয়ে তাকে একেবারে জড়িয়ে ধরলে, বললে, সমীর, আজ কতদিন পরে আবার তোর দেখা পেলুম বল ত?

হিসেব করে দেখা গেল, প্রায় ছ'বছর পরে ওদের দুজনের সাক্ষাৎ হচ্চে। শারীরিক কুশল প্রশ্নের পরে নরেন তার ঘরে উপস্থিত কয়েকজনের সঙ্গে খুব সংক্ষেপে কথা শেষ করে ইঙ্গিতে সমীরকে বসতে বলে তাদের সঙ্গে ঘরের বাইরে পর্য্যন্ত গিয়ে তাদের এগিয়ে দিলে। তারপর ঘরে এসে ঢুকে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে সমীরের পাশে চেয়ার টেনে বসে বললে, সমীর, মেঘ না চাইতে জল ঠিক একেই বলে। তুমি যে দিল্লীতে ভালো চাকরী করছো, তা আমি জানি, এবং দিল্লীতে আসার পর থেকে আমার কেবলই মনে হচ্ছিল তোমার সঙ্গে দেখা করতে হবে। তা ভগবান সে সুযোগ নিজে থেকেই জুটিয়ে দিলেন। তারপর, তুমি কি করে খবর পেলে যে আমি এখানে এসে উঠেছি।

সমীর জানে এরকম প্রশ্ন সে করবেই। হাসতে হাসতে বললে, নরেন, তুমি কি ভুলে গেছ, যে চেনা-অচেনা নানা-বিধ লোকের সঙ্গে যোগাযোগ করাই ছিল আমার প্রধান কাজ। আমাদের পার্টিতে আমি কত ছেলে রিক্রুট করে-ছিলুম, তা কি তোমার মনে নেই?

নিশ্চয়, মনে আছে বলেই ত তোমার সঙ্গে দেখা করায় জন্ত আমি ছট্‌ফট্‌ করেছি। তা ভাই, তুমি ত এখনও বিয়ে-থাওয়া কর নি। তবে তুমি তোমার প্রতিভাকে এই ভাবে কনফিডেন্সিয়াল ফাইলের মধ্যেই শেষ করে ফেলবে কেন? এসো, কাজ কর।

সেইজন্তই ত তোমার কাছে আসা। একটা পরামর্শই ত চাই। আচ্ছা, তুমি বা তোমার পার্টি এখন কি করতে চাও বল দেখি।

নরেন ধীরে সুস্থে টেবিলের ওপোর থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা তুলে নিয়ে একটা সমীরকে দিয়ে একটা নিজে নিয়ে দুটোকে ধরাতে ধরাতে বললে, একটু চা-টা হবে?

সমীর বললে, না ভাই, ও সব হয়ে গেছে, আর তা ছাড়া আমি এখন আর খুব বেশি চা খাই না।

তাই নাকি, বিস্মিতভাবে নরেন উত্তর দিলে, সেটা কার সৌভাগ্য বলবো, চায়ের না তোমার?

কার সৌভাগ্য তা জানি না, তবে চা বাগানের মালিকের যে দুর্ভাগ্য তা বলতে পারি, হাসতে হাসতে সমীর উত্তর করলে। একটু থেমে বললে, দেখ, তোমার এখানে এসেছি, কিন্তু একটু ভয় ভয় করছে। আমার হাড়ও বুড়া হয়ে গেছি, চাকরীটাও করছি একরকম, শেষকালে কোথায় কে দেখে রিপোর্ট করে যদি—

এত ভয়? ব্যঙ্গ করে নরেন দাস প্রশ্ন করলে। তবে কি আর সেই সমীর মুখুজ্জ নেই, যাকে আমি চিনতুম।

খানিকটা আছে বই কি, নইলে আসবো কেন? কিন্তু বেশীক্ষণ থাকবো না ভাই, কে কোথায় দেখতে পাবে, তাই বলছি চট্‌পট্‌ জেনে নিই, তোমাদের কর্ম্মপন্থা কি? কি জন্তেই বা তুমি আমার খোঁজ করছিলে?

আমাদের কর্ম্মপন্থা সম্বন্ধে তুমি কতটুকু জানো বল দেখি? তোমাদের ফাইলেও ত অনেক কিছু আছে, সেখানেই বা কি বলে? নরেন দাস হাসতে লাগলো।

ফাইলে এমন কিছুই বলে না, তবে লোকে অনেক কথাই বলে থাকে।

অন্ততঃ ফাইল থেকে আমার ঠিকানাটা পেয়েছ, কেমন সত্যি কি না বল, নরেন খুব দৃঢ়তার সঙ্গে কথাগুলো বললে।

তা পেয়েছি, সমীর স্বীকার করতে বাধ্য হোল।

তাহলে তোমার অফিসারই তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন, কেমন?

সমীর দৃঢ়ভাবে উত্তর দিলে, না। ফাইলে তোমার

ঠিকানা দেখে মনে মনে মুখস্থ করে ফেললুম। ভাবলুম, আজই দেখা করতে হবে। আর বাপু, আজই না হয় তোমার আমার পথ আলাদা হয়ে গেছে। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে, বোধ হয় একযুগেরও বেশী যে তুমি আমি একসঙ্গে একপথ দিয়েই চলেছিলুম, সে কথা ত মনে আছে। একটা পিঁয়াজ কুচিয়ে দুদিনধরে দুজনে মিলে খেয়েছি, মনে পড়ে?

খুব পড়ে। কিন্তু তাতে কি দেশের একটা লোকেরও চোখের জল ঘোচাতে পারলুম, বরং দুঃখ দুর্দ্দশা ক্রমশঃ বহুগুণ বেড়েই চলেছে। দেখ সমীর, তোমার আমার পথই ঠিক পথ ছিল। দরজা ভেঙ্গে জোর করে ঢুকতে পারলে তবে উপযুক্ত লোক ঢোকে এবং গোটা বাড়ীর ওপোর জয়ের মালিকানাই সে পায়। খোসামত করে মালিকের কাছ থেকে চাবি চেয়ে এনে ঢুকলে বাজে লোকই ঢোকে এবং সে ভাড়াটে ছাড়া অন্য কোন অধিকারই পায় না। যাই বল ভাই, আমাদের বর্ত্তমান সরকার হচ্চে এ্যাংলো-এ্যামেরিকার টেনাণ্ট, এ সরকার রাজ্যের মালিক নয়।

সমীর একটু ব্যঙ্গ করে বললে, তাহলে তোমরা কি রাশিয়ার টেনাণ্ট হতে চাও?

মৃদু হেসে নরেন বললে, এ কথা অনেকেই বলে, কিন্তু বড় দুঃখু হোল সমীর, একদা-বিপ্লবী তুমি, তুমিও এইভাবে তর্ক করছো। আচ্ছা, সত্যিকথা বলত রাশিয়া কি ফ্রান্সের অধীনে আছে!

না,—এ কথা উঠছে কেন? ফ্রান্সের সঙ্গে রাশিয়ার এখন সম্বন্ধ কি?

ভেবে দেখ। দেশের মধ্যে অন্তর্বিপ্লব ঘটিয়ে মুষ্টিমেয় ধনী ও ক্ষমতাশালী দেশবাসীর হাত থেকে শাসন ভার ছিনিয়ে এনে দেশের জনসাধারণ নিজেদের কর্তৃত্ব নিজেরা নিয়েছিল প্রথম ফরাসী দেশে। তার পূর্ব্বে যে সব বিপ্লব বিভিন্ন দেশের ইতিহাসে পাওয়া যায়, তা হয় একদল ক্ষমতাশালী দেশবাসীর হাত থেকে অন্যদল ক্ষমতাশালী দেশবাসীর দ্বারা ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টার, আর না হয়ত বিদেশীর শাসন থেকে মুক্তি পাওয়ার প্রয়াস, যেমন কিনা আমেরিকার বিপ্লব। কিন্তু ফ্রান্সেই প্রথম দেখা যায় যে, রাজা, রাজপুরুষ, জমীদার এবং গির্জ্জার হাত থেকে সমস্ত শক্তি জনসাধারণ কেড়ে নিলে। এর প্রায় সওয়া-শো বৎসর পরে ঠিক ঐ জিনিষই হোল রাশিয়ায়, তা বলে কি বলতে হবে যে, রুশিয়া ফরাসীর তাঁবেদার?

সমীর চুপ করে রইল। নরেন বললে, তা যদি না হয়, তাহলে ফ্রান্স এবং রুশিয়ার পথ অবলম্বন করে চিয়াং কাইশেকের চীন যে জনসাধারণের চীন হয়ে গেল, সেই নয়া চীনকে নিশ্চয়ই রুশিয়ার তাঁবেদার বলতে পারো না এবং ভারতের জনসাধারণ যদি সেই পথ অবলম্বন করে, তাহলে নিশ্চয়ই ভারতকে বলতে পারো না, রুশিয়ার-চীনের তাঁবেদার। এটা হচ্ছে দেশ নিয়ে ল্যাবরেটরীর খেলা। কলকাতার সায়েন্স কলেজ কোন একটা এক্‌-পেরিমেণ্ট করে সফল হলে দিল্লীর বিজ্ঞান ছাত্রেরাও নিজেদের ল্যাবরেটরীতে সেই এক্‌সপেরিমেণ্ট করতে পারে। তাতে বড়জোর বলতে পারো, দিল্লী জ্ঞানরাজ্যে কলকাতার শিষ্যত্ব নিলে, কিন্তু একথা বলা যায় না যে, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় সায়েন্স কলেজের তাঁবেদার। কি বল, তাই নয় কি?

তা ঠিক, সমীর চিন্তিতমুখে উত্তর দিলে।

তবে? নরেন বলতে লাগলো, দুজন মনীষি, রুশো এবং কার্ল মার্কস্, এরা দুজনে যে শিক্ষা প্রচার করলেন, সেই শিক্ষা অনুসরণ করে শোষিত মানুষ প্রথম দেখতে পেলে তারা কোথায় আছে এবং তাদের অধিকার কি এই ভাবে আসল রোগ যেমনই ধরা পড়লো, তেমনই তার উপযুক্ত চিকিৎসা চলতে লাগলো, এবং রোগীও সেরে উঠলো অচিরাৎ।

কিন্তু তোমাদের চিকিৎসার পদ্ধতি যে বড় অমানুষিক সমীর বললে, একদল দেশবাসীকে খুন না করলে যে বাকী দেশবাসীর মঙ্গল নেই, একথা তোমরা সিদ্ধান্ত করছো কি করে? গণতন্ত্রের যুগে, যেখানে প্রত্যেককে ভোটাধিকার দেওয়া হয়েছে, সেখানে চোরাগোপ্তা ছুরী চালাবার যে প্রয়োজন আছে, সে কথা তোমরা নিজেরা কি সত্যিই বিশ্বাস করো? ফ্রান্স এবং রুশিয়াতে এই রকম ভোটাধিকার দিল না, তাই তারা খুনোখুনির পথ নিয়েছিল। ইংরেজ রাজত্বেও ভোটাধিকার ছিল না, তাই আমরা রিভলবার পলিটিক্স করেছি। কিন্তু বর্ত্তমানে এর প্রয়োজনীয়তা কোথায়? দেশ এখন আমাদের, একে

আগাগোড়া না ভেঙে, এর মধ্যে খুসিমত পরিবর্ত্তন করে নেওয়াই ভালো। তাতে ঝঞ্ঝাটও কম, হাঙ্গামাও কম, এবং বিপদ একেবারেই নেই।

নরেন দাস সিগারেটের গোড়াটাকে টিপে নিবিয়ে দিয়ে ছাইদানে ভালো করে ঢুকিয়ে বললে, আমাদের সেই সুশীলকে মনে আছে? লড়াইয়ের সময় সরকারী কনট্রাক্ট নিয়ে যে লাখ লাখ টাকা উপায় করেছিল?

সমীর বললে, হ্যাঁ, খুব মনে আছে।

কলকাতার ঠনঠনে কালীতলায় সে একখানা পুরাতন বাড়ী কিনেছিল, লড়াইয়ের বাজারে চারগুণ দাম দিয়ে।

বেশ, সমীর জবাব দিলে।

সে সেই বাড়ী পয়সা দিয়ে কিনে একেবারে ভিত পর্য্যন্ত খুঁড়ে ফেলে দিয়ে নতুন করে গাঁথনি সুরু করলো। আমি বললুম, সুশীল, বাড়ীটে ত তোমার, তুমি কেন ইচ্ছেমত অদলবদল করে নিলে না। বসতবাড়ী ছিল, বসতবাড়ীই হবে, তাহলে কেন আর মিছামিছি এত খরচ এত ঝঞ্ঝাট করছো। সে কি উত্তর দিয়েছিল জানো?

থাক্, আর বলতে হবে না, এবার বুঝেছি, তুমি কি বল্‌তে চাও।

আর একটু শোন। পুরানো আমগাছের গোড়ায় যতই সার দাও, তার ফল কিছুতেই মনোমত হবে না। গাছটাকে কেটে ফেলে দিয়ে তার শেকড় পর্য্যন্ত মাটী থেকে তুলে বাদ দিয়ে অন্য বাগানের ভালো আমগাছ থেকে কলম কেটে এনে নতুন করে বসাও, দেখ্‌বে, কিছুদিন পরে অতি উৎকৃষ্ট ফল দেবে। এতে করে মাঝের দুচার বছর একেবারে ভাল ফল পাবে না বটে, এবং পুরানো গাছের কাটা ডালগুলো দেখে দুঃখ বা মায়া যে হবে, তাও ঠিক, কিন্তু দু'বছর পরে যে উৎকৃষ্ট ফল পাবে, তাতে সমস্ত দুঃখ ধুয়ে মুছে নির্ম্মল হয়ে যাবে। একথা সত্য, যে, ক্যাপিটালিজমের গাছে অনেক ফল ফলেছে; সারা পৃথিবী সেই ফল খেয়ে সভ্যতার পথে এতদূর এগিয়ে এসেছে এতে কোন সন্দেহই নেই, কিন্তু এই গাছ এখন এত বুড়ো হয়ে গেছে যে, এর ফল আর ভালো হচ্ছে না। এর রন্ধ্রে রন্ধ্রে হাজার হাজার সুবিধাবাদী পোকামাকড় বাসা বেঁধেছে, এর কোটরে কোটরে বিষাক্ত সাপ এসে ছানাপোনা নিয়ে তাদের বিষাক্ত নিঃশ্বাসে সারা বাগানের আবহাওয়াকে বিষিয়ে তুলেছে। বাগানের সমস্ত পশুপক্ষী ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ছে। এর একটা সাপ তাড়াতে গেলে আর একটা সাপ ছোবল মারতে আসে, একজাতীয় পোকাকে নিঃশেষ করতে গেলে অন্যজাতীয় পোকারা তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে, কাজেই এই গোটা গাছটাতে আগুন লাগিয়ে একেবারে সাবাড় করে অন্য বাগানের ভালো গাছ থেকে কলম কেটে এনে নিজের বাগানকে নতুন করে সাজাতে হবে। সে কলম অবশ্য তুমি রুশিয়া থেকেও আন্‌তে পারো, চীন থেকেও আন্‌তে পারো, যেমন তোমার খুসি, তুমি তেমনটিই করতে পারো, কিন্তু আগে দরকার, ঐ পুরানো, বুড়ো গাছের মায়া কাটানো।

ঝেড়ে ঝুড়ে সোজা হয়ে বসে সমীর বললে, যাক নরেন, এ ত সবই হোল উপমা, এখন সত্যি কথা বল দেখি, তোমাদের সত্যিকার আক্রোশটা কার ওপোর? বর্ত্তমান সরকারের লোকগুলোর ওপোর, না আমাদের সংবিধানের ওপোর, না ধনীদের ওপোর, না ধর্ম্মের ওপোর, ঠিক কার ওপোর তোমরা আঘাত দিতে চাও বল দেখি?

হাসতে হাসতে আর একটা সিগারেট বার করে নরেন প্যাকেটটা সমীরের দিকে এগিয়ে দিয়ে সেটা ধরিয়ে দেশলাইটা প্যাকেটের ওপোর বসিয়ে বললে, আবার ত সেই উপমাতেই ফিরে যেতে হচ্ছে সমীর। তুমি বুঝে দেখ, বর্ত্তমান সংবিধান হচ্ছে এই পুরাতন আমগাছের শেকড়ের পোকা, এই সংবিধান মাটীর প্রাকৃতিক রসবস্তুকে গাছের শিরা উপশিরায় ঠিকমত যেতে দিচ্ছে না। বর্ত্তমান সরকারের লোকগুলো হচ্ছে এর কোটরের বিষাক্ত সাপ, এরা গাছটাকে এমনভাবে নিজস্ব করে রেখেছে যে, এর ধারে কাছে অন্য কোন ফলপ্রয়াসীকেই ঘেঁষতেই দিচ্ছে না। দেশের ধনী সমাজ হচ্ছে এর ডালপালার কীট, তারা নিজেদের উদরপূরণের জন্য এই গাছটাকে শুষে এর গুঁড়ি পর্য্যন্ত শেষ করে ফেলেছে, আর আমাদের ধর্ম্মের অসংখ্য বাধন এর ফলের বোঁটাগুলোকে এমনই চেপে ধরেছে যে, ফল পাকার আগেই সেই ফল শুকিয়ে ঝরে পড়ছে। তাই গোটা গাছটাকেই আমরা আমূল বদলাতে চাই। এই ক্যাপিট্যালিজমের সুন্দর প্রাসাদ পুরানো হয়ে ফেটে চৌচির হয়ে গেছে, একে জোড়াতালি দিয়ে যতই রাখো না কেন, এই প্রাসাদের অধিবাসীদের স্বাস্থ্য

স্বাচ্ছন্দ্য কিছুতেই রক্ষা করতে পারবে না, যেদিন বাইরের ঝড় আসবে, সেইদিনেই ঘর চাপা পড়ে প্রাণহানি হওয়ার সম্ভাবনাই সমধিক, যেমন চিয়াং কাইসেক প্রাসাদের হয়েছিল, কাজেই বুদ্ধিমান গৃহস্বামীর মতো আমাদের সেই হিসেবী সুশীলের মত এই পুরানো কাঠামোটা স্বেচ্ছায় ভেঙ্গে ফেলে দিয়ে নতুন মডেলে নতুন বাড়ী তৈরী করাই যুক্তিযুক্ত।

সমীর একটু অসহিষ্ণু হয়ে বল্লে, দেখ নরেন, কথায় আমি তোমার সঙ্গে কোন দিনই পারি নি; আজও পারবো না. কিন্তু বুঝে দেখ, এই সমস্ত প্রতিকারগুলো করবে কে? মানুষই ত করবে। মানুষ ছাড়া কোন পথই নেই। আজ আমাদের দেশের যা কিছু দুর্দ্দশা তার মূল কারণ কি? এর উত্তরে তোমাকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়, যারা কি না রাজকার্য্যে ঢুকেছে বা যারা অন্য নানাবিধ পথ দিয়ে সমাজ সেবা করছে, তারা সবাই চরিত্রশূন্য হয়ে পড়েছে। চুরী, ধাপ্পাবাজী, মিথ্যা প্রচার, বৃথা আশা এই সব দিয়ে দিয়ে এরা নিজেদের ব্যক্তিগত কাজ বাগিয়ে নিচ্ছে। আজ ক্যাপিটালিজমই থাকুক আর কমিউনিজমই আসুক, এই সব দেশের লোক দিয়েই ত দেশকে চালাতে হবে, স্বর্গের দেবতারা কিছু নেমে এসে এই সব কাজগুলো করে দিয়ে যাবে না। তা যদি হয়, তা হলে প্রথম দরকার মানুষের। তুমি তোমার মত লোক যদি আজ এই ভাবে বল দিয়ে তৈরী জিনিষ না ভেঙ্গে কর্নিক নিয়ে ভাঙ্গা জিনিষ তৈরী করার কাজে লেগে যায়—

হো হো করে হেসে উঠে নরেন বল্লে, সমীর কিছু মনে কোরো না ভাই তোমাদের মিনিষ্টার সাহেব কি তোমার মারফৎ আমার কাছে কোনো মোটা মাইনের সরকারী চাকুরী বা কোন লাভজনক কনট্রাক্টের অফার পাঠিয়েছেন। সত্য কথা বল ভাই আমি কিছু মনে করবো না।

পাগল নাকি? জোর করে হেসে সমীর উত্তর দিলে। একটু থেমে সমীর বললে তবে হ্যাঁ, ব্যক্তিগতভাবে আমি নিজে মনে করি যে তুমি যদি কোন দায়িত্বপূর্ণ পদে এসে বস তাহলে তোমার দ্বারা দেশের যে উপকার হবে, তা বোধহয় দেশের এই বর্ত্তমান বিপ্লবের পন্থা দিয়ে এখন আর ঠিক হবে না।

ভুল বন্ধু ভুল। তা হয় না। তুমি কি বলতে চাও বর্ত্তমানের ওপোরওয়ালা যারা হয়েছেন তাঁদের ত্যাগ, তাঁদের সততা, তাঁদের কর্ম্মনিষ্ঠা আমাদের চেয়ে খুব কম ছিল? মোটেই নয়। বরং এদের মধ্যে এখনও পর্য্যন্ত এখন অনেক লোক রয়েছেন, যারা সত্যিই প্রাতঃস্মরণীয়। কিন্তু তাতে কি? উই খাওয়া আলমারীর মধ্যে যতই নতুন নতুন বই ঢোকাও না কেন, একদিন দু'দিন এক হপ্তা, দু হপ্তার মধ্যে যে কোন কড়কড়ে নতুন বই একেবারে ঝাঁঝরা হয়ে যাবে। তুমি এই যে, বলছো, চরিত্রের অভাব এ অভাব এনে দিচ্ছে বর্ত্তমানের কাঠামো। তুমি বুঝতে পারছো না, এই পুরাতন হাঁড়ির মধ্যেই যে দম্বলের গন্ধ রয়েছে। এর মধ্যে যত টাটকা দুধই রাখো না কেন, পনর মিনিটের মধ্যেই সেই দুধ কেটে যাবে। এই হাঁড়িটাকে ফেলে দিতে হবে, এবং আমরা সেই হাঁড়ি ফেলার কাজেই আত্মনিয়োগ করেছি।

পারবে কি?

চেষ্টা করবো।

সমীর একটু ভেবে নিয়ে বললে, নরেন, এই অনিশ্চিত চেষ্টা না করে আমার মনে হয়, যেটা নিশ্চিত, সেইটে করাই ভালো, অর্থাৎ যেখানে যেটুকু সাহায্য করা সম্ভব সেইটেই করা বোধহয় মঙ্গলের হবে।

এ কথা যে তোমার মনে হয়, সেটা আমি খুবই বুঝি, এ বিষয়ে মুখফুট বলা বাহুল্যমাত্র। তুমি যে দেশের জন্য সর্ব্বস্ব নিবেদন করে দিয়েছিলে তা আমি জানি, এবং তোমার সেই নিবেদিত প্রাণ ও কর্ম্মশক্তিকে যে তুমি এখন স্বার্থসেবার জন্য দেশের কার্য্য থেকে ফিরিয়ে নাও নি, তাও আমি জানি। তোমার বিশ্বাস, স্বাধীন দেশের যেখানে যেটুকু সম্ভব, তুমি সেবা করবে। সেই ভেবেই তুমি সরকারী চাকুরী নিয়ে তোমার কর্ত্তব্য তুমি প্রাণপণে পালন করছো। কিন্তু দেখ ভাই, ওটা বৃথা মায়া মাত্র। নিকট-আত্মীয়া শুশ্রূষাকারিণীর অলীক মমত্ববোধ। যে ফোড়া তলে তলে পেকে শোষে পরিণত হয়েছে, সে ফোড়ার ওপোর মমতাময়ীর হাত বুলানোয় হয়ত সাময়িক কিছু উপশমের বোধ আসতে পারে. কিন্তু স্থির জেনে রেখো ডাক্তারের তীক্ষ্ণ ছুরী দিয়ে ঐ শোষকে এফোঁড় ওফোঁড় চিরে ওর

সমস্ত ক্লেদ বার করে না দিলে ঐ ফোড়াও সারবে না, রোগীও কর্মক্ষম হতে পারবে না। তুমি অল্পদৃষ্টি স্ত্রীর মত স্বামীর শোথে হাত বুলিয়ে তাকে নিরাময় করতে চেষ্টা করছো, কিন্তু পারছো না। আমি বহুদর্শী বন্ধুর ন্যায় তোমার সেই দেশরূপ স্বামীর শোথের ওপোর যে ডাক্তার সাফল্যের সহিত ছুরী চালাতে পারবে সেই ডাক্তারকে খুঁজে আনতে বেরিয়েছি। যদি উপযুক্ত ডাক্তার পাই, তাহলে রোগীকে নিশ্চয়ই সারিয়ে তুলতে পারবো, তবে এটা ঠিক যে রোগী অস্ত্র চিকিৎসককে দেখলে প্রথমে খুবই ভয় পায়, বাড়ীর লোকও অস্ত্রোপচারকে বরাবরই এড়িয়ে চলতে প্রাণপণে চেষ্টা করে, কিন্তু তবুও ছুরী চালাতে হয় এবং সার্জ্জেনরা মোটা টাকাও উপার্জ্জন করে। বুঝেছ?

বুঝলুম, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সমীর উত্তর দিলে। একটু থেমে বললে, আচ্ছা নরেন, তুমিত জানো, ভারতবর্ষ ধর্মপ্রাণ দেশ। এদেশের হিন্দু এবং ভঙ্গ হওয়ার পরেও যে সমস্ত মুসলমান এদেশে আছে, তারা সকলেই আপন-আপন ধর্মকে বিশ্বাস করে, ভালোবাসে। আচ্ছা, তোমার কি মনে হয়, এদেশের মাটীতে ধর্মদ্বেষী কমিউনিজম তার শেকড় বসাতে পারবে?

ধর্ম মানে কি সমীর? সহজভাবে নরেন দাস প্রশ্ন করলে।

অপ্রতিভের ন্যায় প্রশ্নটাকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য সমীর বললে, ধর্ম মানে যে কি, তা তুমিও জানো, আমিও জানি, অতএব এ নিয়ে বৃথা বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন কি?

প্রয়োজন আছে। আচ্ছা, আমাদের পবিত্র শাস্ত্রে ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কারুরই অধিকার ছিল না, এটা কি ধর্মের নির্দেশ?

হ্যাঁ, একসময় লোক তাই মনে করতো।

বুঝে দেখ সমীর, ইংরেজ যখন প্রথম সংস্কৃত শিখতে চেয়েছিল, তখন তারা বাঙ্গালী পণ্ডিতদের কাছেই সেটা শিখতে চেষ্টা করে। কিন্তু কোন বাঙ্গালী পণ্ডিত ম্লেচ্ছকে দেবভাষা শেখাতে চায় নি। তখন ইংরেজ বাধ্য হয়ে কাশীতে যায়। কাশীর কয়েকজন ব্রাহ্মণ টাকার লোভে ইংরেজকে সংস্কৃত শেখায়। তাতে অবশ্য তাদের সমাজে তারা পতিত হয়ে যায় বটে, কিন্তু হিন্দীভাষী পণ্ডিতদের কাছে ইংরেজ সংস্কৃত শিখেছিল বলে সংস্কৃত ভাষাকে তারা নাগরী অক্ষর দিয়েই শেখে, সেইজন্য কালক্রমে নাগরী অক্ষরই হয়ে গেল সংস্কৃতের অক্ষর তা না হলে সারা পৃথিবী জুড়ে সংস্কৃতের বাহন হোত বাংলা অক্ষর। সে যাক্, দেবভাষাকে তারা কতখানি বেড়া দিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে সেটা বুঝ তো, সেটা তারা ধর্মকে রক্ষার জন্যই করেছিল। সে জন্য সে যুগের সেই দরিদ্র বাঙ্গালী ব্রাহ্মণেরা সাহেবদের প্রতিশ্রুত প্রভূত দক্ষিণাও অগ্রাহ্য করেছিল। কিন্তু হিন্দুদের সেই ধর্মের যে আদিগ্রন্থ বেদ, সেই বেদকে ঠিকমত ভাগ করে লিপিবদ্ধ করেছে কে? পঞ্চম বেদ নামক বিরাট মহাভারত গ্রন্থকেই বা রচনা করেছে কে? তিনি বেদব্যাস। বেদব্যাসের জন্ম হোল কিরূপে তা ত জানো। জেলের মেয়ে মৎস্যগন্ধা খেয়া নৌকা নিয়ে পার করতে গেল বুড়ো পরাশর মুনিকে। নৌকোয় আর কোন যাত্রী নেই, মুনি মৎস্যগন্ধাকে সাময়িকভাবে পেতে চাইলেন। আইবুড়ো মেয়ে, কিছুতেই রাজী হয় না। মুনি তাঁর তপঃপ্রভাবে সৃষ্টি করলেন গাঢ় কুজ্ঝটিকা, তাইতেই জেলের মেয়ে গর্ভবতী হোল। সন্তান জন্মাতে সে ঐ বেজন্মা ছেলেটিকে এক দ্বীপে ফেলে দিয়ে পালালো। তাইতেই ব্যাসের নাম হোল, দ্বৈপায়ন। আচ্ছা বলতে পারো, কোনো অজ্ঞাত-পিতৃক পড়ুয়াকে কোন ব্রাহ্মণ এর পরেও বেদ পড়াতে রাজী হোত না কেন? তারপর দেখ, মহাভারতের ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির, মহাবীর ভীম, কৃষ্ণসখা অর্জ্জুন এঁরা সকলেই ক্ষেত্রজপুত্র। বর্ত্তমান হিন্দুধর্মে ক্ষেত্রজ পুত্রের কোন স্থান আছে কি? তাহলে ধর্মের নাম করে আমরা যে বাইরের নিয়ম-কানুন তৈরী করেছি, তার ভিত্তি কোথায়? চরিত্রহীনা নারীকে তোমার সমাজে তুমি স্থান দাও না, ওটাকে তুমি ধর্ম বলেই মনে কর। তবে তোমার দেশের নিষ্ঠাবান্ ধার্মিকেরা সকালে ঘুমথেকে উঠে অহল্যাদ্রৌপদী কুন্তী তারা,পঞ্চকন্যার নাম আবৃত্তি করেস্মরণ করেন কেন? আমরা রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ একসঙ্গে উপাসনা করি কেন? রাধাত আয়ান ঘোষের বিবাহিতা স্ত্রী। তাই যদি হয়, তাহলে ধর্মের প্রকৃত মাপকাঠি কোথায়? এই যে পবিত্র ভারতবর্ষ বলে আমরা গৌরব করি, এর নাম এল কোথা থেকে? দুষ্মন্তের ছেলে রাজা ভরত

থেকে ভারতবর্ষের নাম। সে ভরতের জন্ম হোল কিরূপে? জানো ত, ঋষি বিশ্বামিত্র তপস্যা করছেন, তার কাছে এল দেববেশ্যা মেনকা। ঋষির তপস্যা ঘুচে গেল, মেনকার গর্ভে জন্ম নিলে শকুন্তলা। আর পাঁচটা বেশ্যার মত মেনকাও ঐ সদ্যোজাত মেয়েটিকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে গেল জঙ্গলে। কোন্ জাতের মেয়ে, ভালো কি মন্দ সে সব বিচার না করেই ঋষি কণ্ব তাকে দয়া করে নিজের আশ্রমে এনে বড় করলেন। সেই মেয়ে যখন বড় হল, তখন সেই আশ্রমে এলেন, মহারাজ দুষ্মন্ত। শিকারের মনোবৃত্তি নিয়ে তিনি বেরিয়েছিলেন, শিকার করলেন ঐ মেয়েটিকে। গন্ধর্ব বিয়েটা বিয়ের ছলনা মাত্র, কারণ দুষ্মন্ত যদি সত্যিকার বিয়ে করবেন বলে মনে করতেন, তাহলে দেশে ফিরে শকুন্তলাকে ভুলে থাকতেন না। ফ্রয়েডের থিওরি অব্ এব্রাম্স্ জানো ত? যেটা অবাঞ্ছিত, সেটাকেই মানুষ ভুলে যায়, ঋষির অভিশাপটা দুষ্মন্তের দুশ্চরিত্রতার একটা অক্ষম কৈফিয়ৎ, ওটা একটা শাস্ত্রীয় আবরণ মাত্র। তাই যখন গর্ভবতী শকুন্তলা রাজসভায় গেল, তখন দুষ্মন্ত তাকে সোজা হাঁকিয়ে দিলেন। কিন্তু রাজা ছিলেন ঘোরতর বিষয়ী। মানুষের হৃদয়ের চাইতেও সোনাকে তিনি অনেক বেশী ভালবাসতেন, তাই সোনার আংটিটা হাতে পড়তেই তাঁর সমস্ত কথা মনে পড়ে গেল। হয়ত আংটিটা শকুন্তলাকে ঝোঁকের মাথায় দিয়ে দেশে ফিরে রাজা আংটির জন্য মনে মনে দুঃখই করেছিলেন। তার ছিল লাভ্ অফ্ গোল্ড, হয়ত এরকম শকুন্তলার মত অনেক মেয়েকেই তিনি আরও অন্যান্য বনে জঙ্গলে ভোগ করেছিলেন, তাদের সঙ্গে শকুন্তলাকেও তিনি বেমালুম ভুলেই গিয়েছিলেন। তাহলেই বোঝো, এমন ধারা মায়ের যে ছেলে, অর্থাৎ যার দিদিমা বেশ্যা, এবং মায়ের বিয়ের আগেই গর্ভ, সেই ছেলে ভরতের নাম অনুসারে পবিত্র আর্যভূমি ভারতবর্ষের নামকরণ। এদেশে ধর্মের দোহাই দিয়ে জন্মগত চরিত্রের বড়াই কর কি করে বাপু?

নরেন দাস একটু থামলো। তারপর বললে, আরও আছে। ঐতিহাসিক যুগে নেমে এস। এই ভারতবর্ষের প্রথম একচ্ছত্র সম্রাট কে বল দেখি? সে হচ্ছে, মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত, এবং তার বিখ্যাত বংশের নাম মৌর্য্যবংশ। এই চন্দ্রগুপ্ত রাজবাড়ীর অনার্য্য ঝি মুরার গর্ভে চরিত্রহীন রাজার ঔরসজাত পুত্র। রানীর গর্ভজাত পুত্রকে বধ করে এই ঝি-এর ছেলেই সিংহাসনে বসে। একে সাহায্য করে চণক বংশীয় কুটিল ব্রাহ্মণ চাণক্য। রাজবাড়ীর অনার্য্য ঝি-এর নাম অনুসারে বংশের নামকরণ হোল, মৌর্য্যবংশ। আর্য্য অনার্য্যের সংমিশ্রণের ফলে যে সঙ্কর ছেলেটি জন্মাল, তার শক্তি ও বুদ্ধিমত্তা সাধারণ আর্য্য সন্তানের চাইতেও অনেক বেশী। তা ত হবেই ক্রশ করার ফলে সন্তান যে মেধাবী এবং শক্তিশালী হয়, অবৈধ প্রণয়ের সন্তান যে বাপ মায়ের অত্যধিক আকর্ষণের ফলে সব দিক দিয়ে অধিক উপযোগী ও বলশালী হয়, তা বর্ত্তমানের বিজ্ঞানও স্বীকার করে নিয়েছে। এইভাবে সেকালের কেউই এই রকম ধরণের চরিত্রহীনতাকে অন্যায় বা অধর্ম বলে মনে করেন নি। পঞ্চপাণ্ডব দেশ বিদেশে বনে জঙ্গলে ঘোরবার সময় যে কত জায়গায় কত অনার্য্য মেয়েকে বিয়ে করে এসেছে, তার ইতিহাস নিয়েইত আধখানা মহাভারত। ওদের পাল্লায় কাবুলী, সিন্ধী, মহিশোরী থেকে নাগা, মণিপুরী কেউই বাদ যায় নি। তাহলে মানুষের এই দিকটাকে ধর্মের জিনিষ বলে সেকালে কেউই মনে করে নি। তারপর আহারের ব্যাপার। ষাঁড় এবং বাছুর যে সুখাদ্য সেটা বৈদিক যুগ থেকে সমস্ত ঋষিই মেনে নিয়েছিলেন। ঐ যুগে মাননীয় অতিথির নাম ছিল গোঘ্ন, অর্থাৎ যিনি গৃহে পদার্পণ করলে যার পরিতোষের জন্য গোহত্যা করতে হোত। ব্রাহ্মণের পক্ষে নরমাংস ভোজন করাও সেকালে অন্যায় বা অসম্ভব ছিল না, না হলে কুন্তীর কানীন পুত্র কর্ণের কাছে ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ এসে তারই ছেলে বৃষকেতুর মাংস দিয়ে একাদশীর পারণ করতে চাইলে কর্ণ তাতে স্বীকার না হয়ে বরং তাকে পাগলা গারদেই পাঠিয়ে দিত। পশুপক্ষী কোন কিছুই ভীমের অখাদ্য ছিল না। এমন কি স্বয়ং বুদ্ধদেব বৃদ্ধ-বয়সে শূকর মাংস পর্য্যন্ত খেতে দ্বিধাবোধ করেন নি। অবশ্য শিষ্যের মনস্তুষ্টির জন্য এটা তিনি করেছিলেন, কিন্তু তা বলে বুদ্ধদেবকে বুদ্ধত্ব থেকে পতিত হতে হয় নি। এমন কি রাজা অশোক ধর্মাশোক হওয়ার পরেও প্রত্যহ দুটি ময়ূর এবং একটি মৃগের মাংস য় আহার করতেন, তা দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজার শিলালিপিতে আজও স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রবল প্রাদু-

র্ভাবের সময়ও ভারতের কোন অংশে ব্রাহ্মণরা মাছ খেতেন, কোন অংশে মাংস খেতেন, কোন অংশে নিরামিষ আহার চল্‌তো। তাহলে আহারের মধ্যেও ধর্ম্ম নেই। তারপর চলে এস পূজা পদ্ধতিতে। কেউ একেবারে অহিংস, কেউ বা নরবলি দিয়ে পূজা করেছে। কেউ নিজের দেহের ওপোর নিদারুণ অত্যাচার করে শেষ পর্য্যন্ত আত্মহত্যা করে দেবোপাসনা করেছেন। কেউ বা পরমানন্দে দেবদাসী ভোগ করে দেবার্চ্চন করেছেন। অতএব এই ধর্ম্মের মাপকাঠি কোথায়? কেউ সারা দেহে ছিটেফোঁটা কেটে সর্বক্ষণ মালা নিয়ে জপ করে, কেউ বলে, 'যো মালা জপে উ শালা'। তাহলে এর মধ্যেও ধর্ম্ম বলে কিছুই নেই।

অসহিষ্ণু হয়ে সমীর বলে উঠলো, এই কথার ভেতর দিয়ে কি বল্‌তে চাও নরেন, সেই সোজা কথাটা বলে-ফেল দেখি।

হাসতে হাসতে নরেন বললে, বল্‌তে চাই এইটুকু যে, ধর্ম্ম মানুষের সম্পূর্ণ অন্তরের জিনিষ এটা আত্মার গোপন অনুশীলন। এর বহিঃপ্রকাশটা সম্পূর্ণ অবান্তর। পৃথিবীতে মানুষ যা কিছু কাজ করে, সে সমস্তই দেহের কাজ। আত্মা সংগোপনে হৃদয়ের অভ্যন্তরে যে কাজ করে যায়, সেটা ধর্ম্মের কাজ। আত্মাকে কোন আইন বা কোন রাষ্ট্রশক্তি বাঁধতে পারে না, দেহকে পারে। কম্যুনিজম্ বলে, মানুষের আত্মা অন্তরে অন্তরে ধর্ম্মাচরণ করুক, বাইরের অপ্রয়োজনীয় বহিঃপ্রকাশে কোন প্রয়োজন নেই, তাতে অযথা দলাদলি, রেষারেষির সৃষ্টি হয়। একেই ত মানুষের বহুবিধ সমস্যা রয়েছে, তার ওপোর আবার আর একটা সমস্যা যথা মন্দির-মসজিদ-গির্জ্জার সমস্যা বাড়িয়ে কি লাভ? মনে মনে ধর্ম্মাচরণ করে, আপত্তি নেই, বড় বড় মনীষির রচিত দর্শন শাস্ত্র পাঠ ও আলোচনা কর, কমিউনিজম্ সে জন্য টাইপেণ্ড দেবে, ধর্ম্মগ্রন্থ পড়ে সেথান থেকে আদর্শ লাভ কর, সারা দেশ তোমায় মাথায় করে রাখবে, কিন্তু দোহাই বাবা, ধর্ম্মের কচ্‌কচি নিয়ে অযথা খুনোখুনি কোরো না।

সমীর বলে, ধর্ম্ম নিয়ে খুনোখুনি, সে অবশ্য এক হিন্দু মুসলমানেই হয়েছে বটে, কিন্তু—

কিন্তু কেন, নরেন উত্তর দিলে। পৃথিবীতে যত হিংসা যত রক্তপাত হয়েছে, তার মধ্যে অর্দ্ধেকের ওপোর বোধ হয় ধর্ম্ম নিয়েই হয়েছে। আমাদের দেশে হিন্দু বৌদ্ধের যুদ্ধ, শাক্ত বৈষ্ণবের মারামারি, গ্রীস রোমের ধর্ম্মযুদ্ধ, আরব পারস্যের ধর্ম্মযুদ্ধ, য়ুরোপের হোলি ক্রুশেড, সেমিটিক কর্ত্তৃক দক্ষিণ য়ুরোপ অবরোধ, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই ভাবে মানুষের যে কত নির্য্যাতন হয়েছিল তার মোট যোগফলটা কত হয় হিসেব করে দেখ ত? আমার বিশ্বাস এ পর্য্যন্ত ইতিহাসের সমস্ত রক্তপাত একত্র করলে শতকরা পঞ্চাশ ভাগের বেশী রক্তপাতের কারণ হোল, এই ধর্ম্মের বহিরাচরণ। কমিউনিজম, সেইজন্যই এই বিপজ্জনক বহিরাচরণকে একেবারে লুপ্ত করিয়ে দিতে চায়। হঠাৎ যেন দ্রষ্টার ভঙ্গি নিয়ে নরেন বললে, সহজ হও, স্বাভাবিক হও, সরল মনে প্রাণ খুলে চিন্তা কর, দুনিয়ার সব মানুষই মানুষ। ভালোয় মন্দে মেশানো মানুষ সকলেই পৃথিবী-মায়ের সমান সন্তান। পৃথিবীর ঐশ্বর্য্যে সকলের সমান অধিকার। সে অধিকার থেকে একজন অপরকে বঞ্চনা করার চেষ্টা করলে তাকে বঞ্চক বলা হবে, এবং বঞ্চনার উপযুক্ত শাস্তি পেতে সে বাধ্য। কমিউনিজমের যে স্রোত এসিয়া-খণ্ডে দেখা দিয়েছে, এই সত্য ধীরে ধীরে সমস্ত পৃথিবীকে ছেয়ে ফেল্‌বে, একে কেউ রুখতে পারবে না। তবে যেখানে বঞ্চনা বেশী, যেখানে অত্যাচার বেশী, সেইখানেই চিকিৎসা সুরু হবে সকলের আগে, যেখানে কম, সেখানে চিকিৎসক আসবেন পরে। ক্যাপিটালিজমের যুগ ফুরিয়ে যাচ্ছে, কমিউনিজমের যুগ আসছে। অবশ্য পৃথিবীর ইতিহাসে কোন জিনিষই স্থায়ী নয়, হয়ত কিছুকাল পরে আবার নতুন কোন মতবাদ আসবে, কিন্তু এখন যে আসছে, সে এখনকার অবস্থায় শুভকর, যা অনিবার্য্য সেই আজ অতিথির বেশে দরজায় এসে ডাকছে, আমিও তোমায় ডাকছি সমীর, তুমি আমাদের সঙ্গে এগিয়ে এসো, সেই নবাগন্তুককে অভিনন্দন জানিয়ে অভ্যর্থনা কর। কেমন? আসবে না? আবেগভরে নরেন সমীরের হাত-খানা চেপে ধরলে।

সমীরের বাক্‌রোধ হয়েছে। একটু সাম্‌লে নিয়ে বল্লে, দেখ নরেন—

আজ আর আমার সময় নেই ভাই, মাফ্ কর।

আজ এখুনি একটা কাজে আমায় লেগে পড়তে হবে, তুমি বরং নিজে অবসরমত ভেবে চিন্তে আগামী শুক্রবার এমন সময় অমুক ঠিকানায় আমার সঙ্গে দেখা কোরো, কেমন? অসুবিধা হবে?

চিন্তিতমুখে সমীর বললে, অসুবিধা আর এমন কি আছে।

তবে সেই কথাই রইলো আজ এই পর্যান্তই থাক। বলেই নরেন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো, এবং সমীরের হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এসে সিঁড়ি অবধি পৌঁছে দিয়ে গেল।

[ক্রমশঃ]
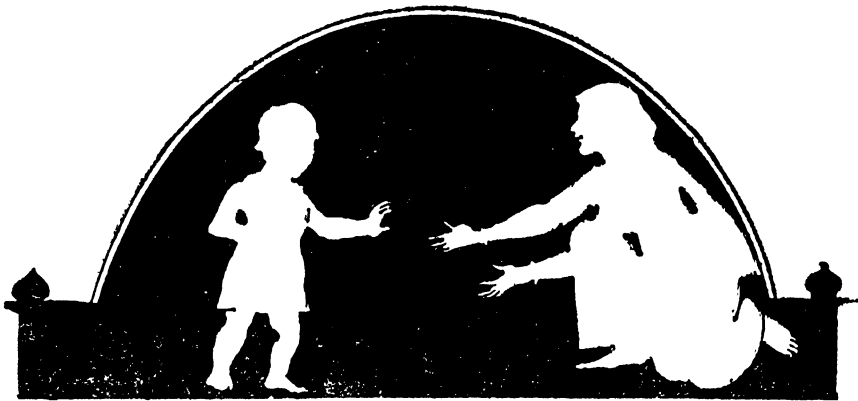
আচার্য শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী শনিবার সকাল ৬টায় সময় পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সমালোচক সুপণ্ডিত অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ৭৮ বৎসর বয়সে তাঁহার কলিকাতা কালিঘাট ৩১নং সাদার্ণ এভেন্যুস্থ বাসভবনে কয়েক মাস রোগে শয্যাগত থাকার পর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের পর তাঁহার মত অপর কেহ এত বেশী লেখনী চালনা বা ভাষণদান করেন নাই। বীরভূম জেলার সুদূর পল্লীগ্রামে এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি নানারূপ অসুবিধা ও কষ্টের মধ্যে স্কুলের শিক্ষা শেষ করেন। প্রত্যহ পাঁচ মাইল পদব্রজে যাইয়া তাঁহাকে স্কুলে পড়াশুনা করিতে হইত। বাঁকুড়ায় যাইয়া সেখান হইতে প্রথম বিভাগে এনট্রান্স পাশ করিলেন বটে, কিন্তু বৃত্তিলাভ করা সম্ভব হয় নাই। পরে বীরভূম জেলার হেতমপুর রাজ কলেজে আই-এ পড়িতে যান। হেতমপুরে তাঁহাকে মাটির ঘরে বাস করিতে হইত। সেখান হইতে ভালো বৃত্তি লাভ করিয়া তিনি স্কটিশচার্চ হইতে সম্মানের সহিত বি, এ, এবং প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে ইংরাজীতে প্রথম বিভাগে প্রথম হইয়া এম. এ, পাশ করেন। উপযুক্ত সংস্থানের না থাকায় প্রথমে কয়েক বৎসর তাঁহাকে রিপন কলেজে ইংরাজীর অধ্যাপনা করিতে হয়। পরে প্রেসিডেন্সী কলেজে ইংরাজীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

ইংরাজী সাহিত্যের এম, এ, হইলেও সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল এবং প্রথম জীবনেই বাংলা ভাষায় লেখা অভ্যাস করিয়াছিলেন। যৌবনেই তিনি "বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা" পুস্তক লিখিয়া বাঙালী পাঠক সমাজের প্রশংসা অর্জন করেন। ঐ সময়েই তিনি ইংরাজী সাহিত্য সম্বন্ধে কয়েকখানি ইংরাজী পুস্তক রচনা করেন ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি, এইচ, ডি, উপাধি প্রাপ্ত হন। অধ্যাপকের কাজ আরম্ভ করার পর হইতেই তাঁহার অধ্যাপনা নৈপুণ্য সকলের সুখ্যাতি লাভ করে এবং তিনি বাংলা দেশে বিদ্বৎসমাজের একজন খ্যাতিমান মানুষ বলিয়া পরিচিত হন। সেই সময়ে নানা কারণে তাঁহাকে রাজশাহী কলেজে বদলী করা হয় এবং সেখানে কিছুকাল ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ও পরে প্রিন্সিপ্যালের কাজ করেন। সারাজীবন তাঁহার অসামান্য অধ্যয়ন স্পৃহা ছিল এবং রাজশাহীর মত পাণ্ডিত্য-পূর্ণ শহরে যাইয়া 'বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সমিতি' প্রভৃতি নানা গ্রন্থাগারের পুস্তক সম্ভারের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর তিনি আবার কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে ফিরিয়া আসেন এবং অল্পকাল পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক অর্থাৎ বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের পদ লাভ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দান করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সময়ে ও তাঁহার চেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ নূতন রূপ ধারণ করিয়াছিল। প্রথম বয়স হইতেই তিনি নানাবিধ সভাসমিতিতে যোগদান করিতেন। তাঁহার বাগ্মিতা ও বিশ্লেষণ শক্তি সর্বদা তাঁহার ভাষণ জনপ্রিয় করিয়া তুলিত। ছোট-বড়, পণ্ডিত-মূর্খ, পরিচিত-অপরিচিত-যে-কেহ তাঁহার কাছে গমন করিত তিনি তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিতেন এবং সকলের অনুরোধ রক্ষা করিয়া সর্বত্র সভাসমিতিতে যোগদান করায় তাঁহার জনপ্রিয়তা খুবই বাড়িয়া গিয়াছিল। বাংলাদেশে বহু সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং স্বাধীনতা লাভের পূর্বেও যেমন পরেও তেমনি তিনি সকল স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যে যোগদান করিয়া সকল কর্মীকে উৎসাহ দান করিতেন।

সদা-সর্বদা তিনি নিজেকে লেখা ও পড়ার কাজে নিযুক্ত রাখিতেন। সেজন্য বাংলাদেশের বহু সাময়িক পত্রে সর্বদা তাঁহার রচনা প্রকাশিত হইত। তাঁহার প্রধান আলোচ্য বিষয় সাহিত্য সমালোচনা হইলেও তিনি ইতিহাস, বিজ্ঞান, সমাজ ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়েও বহু সুচিন্তিত প্রবন্ধ রচনা করিয়া গিয়াছেন। এ-যুগে আচার্য শ্রীকুমারের ন্যায় লেখাপড়ার কার্যে সারাদিনের অধিকাংশ সময় ব্যয় করিতে খুব কম লোককেই দেখা গিয়াছে। তাঁহার গৃহে সর্বদা দর্শনার্থীর ভিড় থাকিত। কিন্তু তিনি কাহাকেও নিরাশ করিতেন না। পরিণত বয়সে তিনি প্রত্যহ রাত্রি তিনটায় শয্যা ত্যাগ করিয়া ছয়টা পর্যন্ত লিখিয়া যাইতেন এবং তাঁহার রচিত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সুবৃহৎ আলোচনা গ্রন্থ এই ভাবেই লিখিত হইয়াছিল। ১৯৫২ সাল হইতে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত পাঁচ বৎসর তিনি পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সদস্য ছিলেন এবং পরে আরো তিন বৎসর বিধান পরিষদে কাজ করিয়াছিলেন। সে কার্যেও তাঁহাকে অনেক সময় ও শক্তি ব্যয় করিতে হইত। তাঁহার মত পরিশ্রমী, পরহিতব্রতী মানুষ অধিক দেখা যায় না। বাল্যকালে দরিদ্র ছিলেন বলিয়া জীবনে কখনও বিলাসিতা করেন নাই পোশাক ব্যবহার প্রভৃতি সকল সময়ে সহজ ও সরল রাখিতেন। তিনি যে কলিকাতার কত স্কুল-কলেজ, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন তাহার হিসাব বলা কঠিন। এই সমস্ত কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াও তাঁহার লেখাপড়া করার সময়ের কোনদিন অভাব হয় নাই। অন্যলোক যে-সময়ে তাঁহার পাশে বসিয়া গল্পগুজব করিত তিনি সে-সময়ে হট্টগোলের মধ্যে থাকিয়াও নিজের কাজ অর্থাৎ লেখাপড়া করিয়া যাইতেন। চিরদিনই তিনি রুগ্ণ স্বাস্থ্য ছিলেন এবং জীবনের শেষ কয় বৎসর পত্নীবিয়োগের ফলে তাঁহার শরীর আরো ক্ষীণ হইয়া গিয়াছিল।' তিনি প্রসিদ্ধ ধর্মনেতা শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঁকারনাথ মহাশয়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং অন্যান্য সকল কাজের মধ্যেও তাঁহার পূজার্চ্চনার সময়ের কোনদিন অভাব হয় নাই। আচার্য শ্রীকুমারের পরলোক গমনে বাংলাদেশ শুধু একজন বিশিষ্ট সমাজসেবী, দেশহিতৈষী ও পণ্ডিত ব্যক্তিকে হারায় নাই, একজন নিষ্ঠাবান ভারতীয়কেও হারাইয়াছে। তিনি কয়েক বৎসর বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি, রবিবাসর নামক সাহিত্যসেবীদের মিলন সভার সর্বাধ্যক্ষ প্রভৃতি বহু প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত ভাবে যোগদান করিয়া দেশবাসীর মধ্যে সদ্ভাব জাগাইবার চেষ্টা করিতেন।

তাঁহাকে প্রথম জীবন পল্লীগ্রামে কাটাইতে হইয়াছিল বলিয়া তিনি নিজ গ্রাম ও পল্লীর উন্নয়নের জন্য বিবিধ ব্যবস্থায় অবহিত ছিলেন। শুধু তাহাই নহে, বংশধরেরা যাহাতে নিজ পল্লীর ও বিশেষ করিয়া বীরভূম জেলার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করে সে-জন্য তিনি জেলার বহুস্থানে কয়েকটি বাসগৃহ নির্মাণ করিয়াছিলেন। যে-সকল পল্লীগ্রামে যাতায়াতের অসুবিধা সে-সকল স্থান হইতে আহ্বান আসিলেই তিনি সাগ্রহে তথায় গমন করিতেন এবং গ্রামবাসীদের শিক্ষা-স্বাস্থ্য পথ-ঘাট প্রভৃতির অসুবিধা দূর করিবার জন্য তাঁহার ছাত্রবৃন্দ ও বন্ধুদিগকে পত্র দিয়া প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতেন।

তাঁহার মতন সর্ব্বগুণান্বিত পণ্ডিত একালে দুর্লভ বলা চলে। তাঁহার তিরোধানে যে শূন্যস্থান সৃষ্টি হইল তাহা বোধহয় আর পূর্ণ হইবে না।

হাসপাতাল

বিশ্বামিত্র

পিছনে আমার মৃত্যুর ছায়া নিবিড় নিকষ কালো
সুমুখে দুলিছে ক্ষীণ চঞ্চল জীবন দীপের আলো।
তা'রি মাঝখানে দাঁড়া'য়ে নিথর
গণিয়া চ'লেছি কালের প্রহর
সুপ্ত নিশীথে মুখর দিবসে নিরালা সন্ধ্যাকাল।
চিনেছ আমারে? আমি তোমাদের সেবক হাসপাতাল।

কোন্ দেশে আর কোন্ যুগে আমি প্রথম মেলিনু আঁখি
শৈশব মোর কেমনে কেটেছে কার অঞ্চলে থাকি
ব্যাধিজর্জ্জর মানব সেবার
সুকঠিন ব্রত শিরে বহিবার
কে দিল শকতি—কোন্ ভূস্বামী শ্রেষ্ঠী বা নরপাল
মনের গহনে আজি তা' খুঁজিয়া পাইনা হাসপাতাল।

শুধু মাঝে মাঝে অন্ধতামস অতীতের বুক চিরে
চকিত তড়িৎ আলোক রেখায় ভাসে যুগান্ত তীরে—
অশোকের আঁখি করুণাঘন
নৃপতি হর্ষের ক্লিষ্ট আনন,
স্মৃতির পথেতে শতদল সম ফোটে সে বিগতকাল
বিস্মরণের ছায়াবনে আমি তন্দ্রামৌন হাসপাতাল।

শিবের মত ব্যাধি বিষ আমি করিয়া চ'লেছি পান
তাই দিকে দিকে বন্দনা মোর দেশে দেশে জয়গান।
অতিথিরা মোর কেহ ফিরে ঘরে
কেহ বা বিদায় লয় চিরতরে
অবিরাম এই আসা যাওয়া খেলা চলিতেছে চিরকাল—
আমি ব'সে আছি অনুভূতিহীন নীরব হাসপাতাল।

প্রাণচঞ্চল কোলাহলময় কান্নাহাসির সংসারে
কেহ নাই মোর, পড়িয়া র'য়েছি আঙিনার একধারে।
বেদনার সাথী আমি সবাকার
কেহ তো বোঝে না বেদনা আমার
এ দুঃখ বেদনা কবে হবে শেষ—বলে দাও মহাকাল,
এ দুঃসহ ব্যথা আর ব'হিতে পারি না আমি অভাগা
হাসপাতাল

ভুবনে আমার জন-অরণ্য আমি চিরদিন একা
হৃদয় দেউলে দেবতারে খুঁজি পাইনা তাহার দেখা।
তারকা খচিত নিশীথ-গগনে
চেয়ে থাকি আর ভাবি মনে মনে
ছায়াতরুহীন এ উষর পথে চলিব আর কতকাল—
জীবন মৃত্যুর সিংহদুয়ারে আমি প্রহরী হাসপাতাল।

চরম খামখেয়ালী ও উন্মাদ-প্রায় রোম-সম্রাট ক্যালিগুলার অকথ্য অত্যাচারের কাহিনীর মধ্যেও আলবেয়ার কামু খুঁজে পেয়েছেন অভাবনীয় সঙ্গতি অবতারণা করেছেন পরম যুক্তির। শক্তিশালী ও স্বেচ্ছাচারী সম্রাটদের মধ্যে একমাত্র ক্যালিগুলাই উপলব্ধি করতে চেয়েছিলেন এক সুমহান আদর্শের কথা—অসম্ভবকে পেতে হবে, চাঁদকে হাতের মুঠোয় আনতে হবে। সেই অদ্ভুত পরীক্ষার নির্মম প্রতিফলনই এই নাটকের বিষয়বস্তু—মানুষের জীবনের কোন মূল্য নেই।

নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত আলবেয়ার কামুর 'ক্যালিগুলা' অবলম্বনে—

চাঁদটা নিয়ে এসো

সীতানাথ চৌধুরী

চরিত্র

ক্যালিগুলা — সম্রাট। বয়স ২৫ থেকে ২৯।
সীজোনিয়া — ক্যালিগুলার রক্ষিতা। বয়স ৩০
হেলিকন — „ বিশেষ বন্ধু। বয়স ৩০
স্কিপিও — „ „ „ বয়স ১৭।
চেরিয়া — বয়স ৩০।
বৃদ্ধ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি — „ ৭১।
মীরিয়া — „ ৬০।
মিউসিয়াস — „ ৩৩।
কোষাধ্যক্ষ — „ ৫০।

প্রথম সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি —
দ্বিতীয় „ „ —
তৃতীয় „ „ —
} বয়স ৪০ থেকে ৬০।

প্রাসাদরক্ষী, ভৃত্য ও আরো অনেকে।

[নাটকের প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ অঙ্কের দৃশ্য প্রসাদের সভাকক্ষ। সেখানে একটি মানুষ প্রমাণ আয়না, একটা পেটা ঘড়ি ও একটা বড় কৌচ।
দ্বিতীয় অঙ্কের দৃশ্য চেরিয়ার খাবার ঘর।]

চাঁদটা নিয়ে এসো

প্রথম অঙ্ক

[রাজপ্রাসাদের সভা-কক্ষ। সেখানে একটি মানুষ প্রমাণ আয়না, একটা পেটাঘড়ি ও একটা বড় কৌচ।

যবনিকা ওঠার পর দেখা গেল বৃদ্ধ ব্যক্তিটি চিন্তাকুল অবস্থায় রয়েছেন। কিছু পরে দূর থেকে পদশব্দ শোনা গেল, শব্দটা কাছে আসছে। বৃদ্ধ উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকাতেই প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রবেশ করলো।]

বৃদ্ধ। কী খবর?

১ম ব্যক্তি। এখনো কোন খবর নেই।

বৃদ্ধ। বলো কী! কাল রাত্তিরেও কোন খবর নেই, আজ সকালেও নয়!

২য় ব্যক্তি। তিন দিন হয়ে গেল,—সত্যিই অদ্ভুত।

বৃদ্ধ। আশ্চর্য্য, দূতের দল শুধু যাচ্ছে আর ফিরে আসছে, আর জিজ্ঞেস করলেই কেবল ঘাড় নেড়ে বলছে —উঁহু।

২য় ব্যক্তি। তা ছাড়া করবেই বা কী—সমস্ত মাঠ-ঘাট তো চষে ফেললো। আর কত করবে ওরা?

১ম ব্যক্তি। আমার তো মনে হয়, আমাদের অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করার নেই। যেমন হঠাৎ উধাও হয়েছেন, তেমনি হঠাৎই আবার ফিরে আসবেন।

বৃদ্ধ। প্রাসাদ ছেড়ে চলে যাবার সময়, ওঁর চাউনিটা কেমন যেন অদ্ভুত লেগেছিল!

১ম ব্যক্তি। আমারও। আমি তো জিজ্ঞেস করেই বসলাম—আপনার কিছু হয়েছে?

২য় ব্যক্তি। কী বললেন? জবাব দিলেন কিছু?

১ম ব্যক্তি। ঐ এক কথায় যতটা হয়,—কিছু না।

(একটু নীরবতা। কিছু একটা চিবোতে চিবোতে হেলিকনের প্রবেশ)

২য় ব্যক্তি। যতো সব ঝুটমুট ঝামেলা।

১ম ব্যক্তি। ঝামেলা বলে ঝামেলা, ছেলেছোকরাদের কাণ্ডই আলাদা।

বৃদ্ধ। যা বলেছ, সব ব্যাপারেই বাড়াবাড়ি। আরে-বাবা, এটা তো ঠিক, যে, সময় কালে সবই ঠিক হয়ে যেত!

২য় ব্যক্তি। তার মানে?

বৃদ্ধ। আহা হা, একটা মেয়ে ম'লো তো হয়েছে টা কী? —এক ডজন ফ্যাস্ত তো আছে!

হেলিকন। ও, তোমরা মনে করো, এর পেছনে কোন মেয়ে-ঘটিত ব্যাপার আছে!

১ম ব্যক্তি। তা ছাড়া আর কী হতে পারে? তবে শোক দুঃখ বেশীদিন টেঁকে না তাই রক্ষে। বিয়োগ-ব্যথাকে কেউ সারা বছর ধরে জীইয়ে রাখতে পারো?

২য় ব্যক্তি। আমি তো পারি না।

১ম ব্যক্তি। তুমি কেন,—কেউই পারে না।

বৃদ্ধ। জীবনটা তা হলে অতিষ্ঠ হয়ে উঠতো।

১ম ব্যক্তি। ঠিক তাই। আমার ব্যাপারটাই দেখো না,—গত বছর স্ত্রী মারা গেলেন,—আমি কাঁদলাম, খুবই কাঁদলাম,—কিন্তু তারপর? তারপর সব ভুলে গেলাম! এখনো অবশ্য ভেতরটা মাঝে মাঝে এক আধবার মোচড় দিয়ে ওঠে,—তবে ঐ পর্য্যন্ত, এমন কিছু নয়।

বৃদ্ধ। তাইতো কথায় বলে,—কাল এবং প্রকৃতিই হলো সবচেয়ে বড় ওষুধ।

চেরিয়া প্রবেশ করে

১ম ব্যক্তি। কোন খবর আছে?

চেরিয়া। এখনো পর্য্যন্ত কিছুই না।

হেলিকন। দেখো, শুধু শুধু তোমরা ব্যাপারটাকে ঘুলিয়ে তুলছো। এতে অবাক হবারও কিছু নেই, ভয় পাবারও কিছু নেই। দুশ্চিন্তা করলেই ঘটনাগুলো বদলে যায় না। এখন খাবার সময়,—ক্ষিদে পেয়েছে।

বৃদ্ধ। তা যা বলেছো। অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়ার কোন মানেই হয় না।

চেরিয়া। তোমরা নির্ব্বিকার হতে পারো, আমার কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই ভাল ঠেকছে না। সব বেশ

ভালই চলছিল—আর, সম্রাট হিসেবে তাঁর গুণও ছিল অনেক,—সর্ব্বগুণসম্পন্নও বলা চলে।

২য় ব্যক্তি। আমিও তো তাই বলি,—এই রকম সম্রাটই আমরা চেয়েছিলাম,—ন্যায়পরায়ণ অথচ অভিজ্ঞতা নেই,—বয়সে কাঁচা।

১ম ব্যক্তি। আচ্ছা তোমাদের হোলোটা কী? শুধু শুধু মাথা চাপড়ে কী লাভ? উনি যে বদলে যাবেন,—এটাই বা ধরে নিচ্ছ কেন? বেশ তো, ধরো উনি ড্রুসিলাকে ভালবাসতেন,—খুবই স্বাভাবিক,—সে ওঁর বোন ছিল। হতে পারে, ওর প্রতি তাঁর ভালবাসাটা ভ্রাতৃ প্রেমের চেয়ে খানিকটা, মানে ইয়ে, মানে একটু বেশী ছিল। মানি, শুনতে একটু খারাপ লাগছে। কিন্তু এটাও বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে না, যে, ঐ মেয়েটা মরেছে বলে তোমরা ভাবছো সমস্ত রোমে একটা হুলুস্থুল হাঙ্গামার সৃষ্টি হবে?

চেরিয়া। মানলাম, সবই মানলাম। কিন্তু তবু বলবো—ব্যাপারটা আমার মোটেই ভাল ঠেকছে না। কারণ এই ধরণের অদ্ভুত খেয়ালটাই হচ্ছে ভয়ের ব্যাপার, ঝড়ের পূর্ব্বলক্ষণ।

বৃদ্ধ। সে কথা ঠিক, আগুন না থাকলে ধোঁয়া বেরোয় না কখনো।

১ম ব্যক্তি। যাই হোক, একটা নোংরা, মানে অশোভন প্রণয়-সংক্রান্ত শোকের ব্যাপার নিয়ে তাঁর এই ঢাক পিটিয়ে সবাইকে জানানোটা রাজ্যের পক্ষে মোটেই মঙ্গলজনক নয়, দেশের মুখ চেয়ে এগুলো বন্ধ করা উচিত। এ ধরণের ঘটনা যে ঘটে না তা নয়, তবে এ সম্বন্ধে যত কম কথা হয় ততই ভাল।

হেলিকন। কি করে নিশ্চিত জানলে যে ড্রুসিলাই এইসব ঝঞ্ঝাটের একমাত্র কারণ?

২য় ব্যক্তি। তা ছাড়া আর কে হতে পারে?

হেলিকন। কেউ না। যেখানে একশোটা কারণ থাকতে পারে, সেখানে সবচেয়ে স্পষ্ট একটা ব্যাপার নিয়ে এত মাথা ঘামানোর কোন মানেই হয় না।

(স্কিপিওর প্রবেশ। চেরিয়া তার দিকে দ্রুত অগ্রসর হয়ে)

চেরিয়া। কোন নতুন খবর...?

স্কিপিও। এখনো না। তবে কাল রাত্তিতে কয়েকজন কৃষক তাঁকে দেখতে পেয়েছিল, শহর থেকে একটু দূরে, বললে ঝড়ের মধ্যে ছুটে চলেছেন।

(চেরিয়া অন্যান্যদের কাছে ফিরে এল, স্কিপিও তার পিছু পিছু এল)

চেরিয়া। তার মানে পুরো তিনদিন হয়ে গেল, তাই না স্কিপিও?

স্কিপিও। (ঘাড় নাড়লো) সেদিনও আমি তাঁর সঙ্গেই ছিলাম, যেমন রোজ থাকি। দেখলাম উনি ড্রুসিলার মৃত দেহটার কাছে গেলেন, দুটো আঙুল দিয়ে টোকা মারলেন, মনে হলো, কি এক গভীর চিন্তায় কিছুক্ষণ যেন নিজেকে হারিয়ে ফেললেন,—তারপর হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে, কোনরকম উত্তেজনা নেই, আস্তে আস্তে হাঁটতে হাঁটতে বেরিয়ে গেলেন। (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) আর সেই থেকে আমরা খুঁজছি, বৃথাই খুঁজে মরছি।

চেরিয়া। ছেলেটা বড্ড বেশী সাহিত্যের অনুরাগী ছিল।

২য় ব্যক্তি। আমার মনে হয়, ওঁর মত বয়সে হয়ত...

চেরিয়া। ওঁর মত বয়সে হতে পারে, কিন্তু ওঁর মত পদমর্য্যাদায় নয়। সম্রাট অথচ শিল্পী—এটা হচ্ছে নিয়মের ব্যতিক্রম। জানি, অনেক ভাল ভাল সাম্রাজ্যেও কখনো কখনো দু'একজন অযোগ্য ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু তারা একটা কথা কখনো ভুলতো না যে তারা দেশের সেবক।

১ম ব্যক্তি। দেশের কাজটাও তাই ভালভাবেই হয়ে যেত।

বৃদ্ধ। প্রত্যেকেরই এক একটা নির্দ্দিষ্ট কাজ থাকে,—তাই তো নিয়ম।

স্কিপিও। চেরিয়া, এখন আমাদের কি কর্ত্তব্য?

চেরিয়া। কিছু না।

২য় ব্যক্তি। আমাদের শুধু অপেক্ষা করতে হবে। একান্তই যদি ফিরে না আসেন, তা হলে একজন উত্তরাধিকারী খুঁজে বার করতে হবে। আমার তো মনে হয় আমাদের মধ্যে প্রার্থীর অভাব নেই।

১ম ব্যক্তি। প্রার্থীর অভাব নেই, কিন্তু যোগ্য ব্যক্তির অভাব নিশ্চয়ই আছে।

চেরিয়া। ধরো, তিনি যদি একটা বীভৎস মানসিক অবস্থায় ফিরে আসেন ?

১ম ব্যক্তি। না না, তা কেন হবে ? হাজার হোক ছেলেমানুষ তো,—সে আমরা যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দোবো।

চেরিয়া। সে যুক্তি যদি না মানেন ?

১ম ব্যক্তি। (সহাস্যে) যদি না মানেন ? তা হলে অন্য পথ আছে,—ভুলে যেও না,আমি এককালে বিদ্রোহের উপক্রমণিকা লিখেছিলাম। কি করতে হবে তাতেই লেখা আছে।

চেরিয়া। ঠিক আছে, পড়ে দেখবো। ঘটনাচক্রে পরিস্থিতি যদি সেই দিকেই গড়ায়, তখন দেখা যাবে। নাঃ, আমাকে এখন কিছু পড়াশোনা করতে হবে।

স্কিপিও। আমি চলি। [প্রস্থান

চেরিয়া। (স্কিপিওর প্রস্থান লক্ষ্য করে) বাবুর রাগ হলো !

বৃদ্ধ। আহা, স্কিপিও বয়সে তো কাঁচা, কচি বয়সে সবাই এক গোয়ালের গরু যে !

হেলিকন। স্কিপিওকে নিয়ে কারো মাথা ব্যথা নেই।

প্রাসাদরক্ষীর প্রবেশ

রক্ষী। সম্রাট ক্যালিগুলাকে প্রাসাদ-উদ্যানে দেখা গেছে।

সকলে। তাই নাকি ? [চাপা কলরব করতে করতে সকলের প্রস্থান। সভাকক্ষ কিছুক্ষণ শূন্য থাকবে। চাপা কলরব ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাবার পর ধীর পদক্ষেপে ক্যালিগুলার প্রবেশ। পায়ে কাদা, পোষাক নোংরা, মাথার চুল ভিজে ভিজে, চাহনি বিভ্রান্ত। কি যেন করতে চান সেই চিন্তায় হাতটা কয়েকবার মুখে আঘাত করলো। আয়নাটার কাছে গিয়ে নিজের চেহারা দেখে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন, বিড়বিড় করে কী যেন বললেন, তারপর ষ্টেজের ডানদিকে একজায়গায় বসে পড়লেন। হাত দুটো কোলের ওপর শ্লথ হয়ে পড়লো।

হেলিকন প্রবেশ করে দূরেই দাঁড়িয়ে গেল। ক্যালিগুলা আস্তে আস্তে মুখ ফিরিয়ে তাকে দেখলেন। একটু নীরবতা।]

হেলিকন : কেমন আছ, কেয়াস ?

ক্যালিগুলা। (স্বাভাবিক কণ্ঠে) ভাল। তুমি কেমন আছো হেলিকন ?

হেলিকন। বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে তোমায়।

ক্যালিগুলা। অনেক ঘুরতে হয়েছে।

হেলিকন। হ্যাঁ, ক'দিন তো ছিলে না !

[আবার চুপচাপ]

ক্যালিগুলা। খুঁজে পাচ্ছিলাম না যে।

হেলিকন। কী খুঁজে পাচ্ছিলে না ?

ক্যালিগুলা। যা চেয়েছিলাম, যা চাইছি।

হেলিকন : মানে ?

ক্যালিগুলা। (স্বাভাবিক কণ্ঠে) আকাশের চাঁদ।

হেলিকন। কী,—কী বললে ?

ক্যালিগুলা। হ্যাঁ, আমি আকাশের চাঁদই চেয়েছিলাম।

হেলিকন। অ। [আবার একটু চুপচাপ। হেলিকন এবার কাছে এগিয়ে] কেন চেয়েছিলে ?

ক্যালিগুলা। কারণ, আমার যে কটা জিনিষ নেই, তার মধ্যে ওটাও তো একটা।

হেলিকন। ও। তা, এখন সব ঠিক হয়ে গেছে তো ?

ক্যালিগুলা। না, কি করে হবে,—পেলাম না যে ! তাইতো, তাইতো আমি এত ক্লান্ত। (একটু চুপ করে থেকে) হেলিকন !

হেলিকন : বলো কেয়াস ?

ক্যালিগুলা। তুমি নিশ্চয় ভাবছো, আমার মাথা খারাপ হয়েছে, না ?

হেলিকন। তুমি তো জানো, আমি কিছুই ভাবি না।

ক্যালিগুলা। তা বটে ! কিন্তু দেখো, আমি ঠিক পাগল হই নি, আমার—মানে, আমি চেতনা হারাই নি একবারও। আমার যা হয়েছে, তা খুবই সহজ, খুবই সামান্য—মানে, হঠাৎ আমার মনে হলো, আমি যেন অসম্ভবকে পেতে চাই—এই আর কি। মানে, আমার আশেপাশে কিছুই যেন সন্তোষজনক নয়, আমি যেন কিছুতেই সন্তুষ্ট নই।

হেলিকন। ও রকম অনেকেরই মনে হয়।

ক্যালিগুলা। হতে পারে। কিন্তু আগে আমি কখনো এটা উপলব্ধি করিনি, এখন বেশ বুঝতে পারছি। সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের এই পৃথিবীতে যা কিছু বিধি ব্যবস্থা, সব যেন অসহ্য। তাই তো, তাই তো,

আমি চাই আকাশের চাঁদ, কিম্বা সুখ, কিম্বা অবিচ্ছিন্ন চিরন্তন জীবন,—মানে, এমন একটা কিছু—তোমার হয়ত শুনে পাগলামী মনে হচ্ছে,—যার সঙ্গে পৃথিবীর কোন সম্বন্ধ নেই।

হেলিকন। কল্পনার দিক থেকে সবই ঠিক, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে এর পেছনে শেষ পর্য্যন্ত ছোটা যায় না।

ক্যালিগুলা। (হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে অথচ সংযত ভাবে) ভুল, ঐখানেই তোমাদের মস্ত ভুল। মানুষ মাঝ-পথেই হাল ছেড়ে দেয়,—নিজের কল্পনা, নিজের বিশ্বাসকে হারিয়ে ফেলে, উদগ্র বাসনার পেছনে দৌড়তে ভয় পায়,—তাই কোন কিছুই সে অর্জ্জন করতে পারে না। কী দরকার জানো? এগিয়ে যেতে হবে—আমি বলতে চাই যে, যুক্তির ওপর নির্ভর করে এগিয়ে যেতে হবে,—যা হবার হোক, গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত আমাকে শুধু ন্যায় সঙ্গতভাবে এগিয়ে যেতে হবে। (এগিয়ে গিয়ে হেলিকনের মুখটা নিরীক্ষণ করে নিয়ে) আমি জানি তুমি কি ভাবছো। ভাবছো, একটা মেয়ের মৃত্যুর ব্যাপার নিয়ে কী ঝামেলা,—তাই না? কিন্তু তা নয়। এটা ঠিক, যে, কদিন আগে একটা মেয়ে মারা গেছে এবং তাকে আমি ভালবাসতাম। কিন্তু ভালবাসায় কী এলো গেল? ওটা তো একটা গৌণ ব্যাপার! বিশ্বাস করো, ওর মৃত্যুটা খুব একটা বড় কথা নয়। আমার চাঁদ চাওয়ার মধ্যে যে সত্য আছে, ওটা তার একটা সঙ্কেত মাত্র। ছেলেমানুষীর মত শোনাচ্ছে বটে, কিন্তু তা সরল, সুস্পষ্ট, অসম্ভব সত্য,—যা উপলব্ধি করাও শক্ত, সহ্য করাও শক্ত।

হেলিকন। কী এমন সেই সত্য, যা তুমি আবিষ্কার করলে?

ক্যালিগুলা। (মুখটা ঘুরিয়ে, ভাবলেশহীন কণ্ঠে) মানুষকে মরতে হয় এবং সে কখনো সুখী নয়।

হেলিকন। দেখো ক্যালিগুলা, এ সত্যের সঙ্গে মানুষ সহজেই আপোষ করতে পারে। ওদের দিকে তাকিয়ে দেখো, কেমন নির্ব্বিবাদে ওরা খাওয়া দাওয়া উপভোগ করছে।

ক্যালিগুলা। (হঠাৎ ক্ষিপ্ত কণ্ঠে) সেই কথাই তো বলছি,—এতে কি এই কথাটাই প্রমাণিত হচ্ছে না, যে, আমার চারপাশে শুধু মিথ্যা, শুধু আত্মপ্রবঞ্চনা? কিন্তু এসব আর আমি সহ্য করবো না। আমি চাই সত্যের আলোকেই মানুষকে থাকতে হবে এবং ওদের বাধ্য করাবার পক্ষে আমার যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। আমি জানি ওরা কী চায় এবং ওরা কী পায় নি। ওদের বুদ্ধিশুদ্ধি নেই, ওদের শিক্ষা দিতে হবে।

হেলিকন। দেখো কেয়াস, কিছু যদি মনে না করো, ওসব পরে হলেও চলবে। আগে তুমি একটু বিশ্রাম করে নাও।

ক্যালিগুলা। (বসে পড়ে ও অসহায়কণ্ঠে) কিন্তু তা যে আর সম্ভব নয় হেলিকন। বিশ্রাম যে আমার ফুরিয়ে গেছে!

হেলিকন। কেন?

ক্যালিগুলা। আমি যদি এখন ঘুমোতে যাই, কে আমাকে চাঁদ এনে দেবে বলো!

হেলিকন। (একটু নীরব থেকে) তা বটে।

ক্যালিগুলা। (উঠে দাঁড়িয়ে) শোন হেলিকন,—কারা যেন আসছে।—পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। তুমি কিছু বলো না, ভুলে যাও যে তুমি আমায় দেখেছ।

হেলিকন। ঠিক আছে।

ক্যালিগুলা। (যেতে যেতে আবার পেছু ফিরে) তুমি আমার সহায় থেকো হেলিকন।

হেলিকন। না থাকার কোন কারণ নেই কেয়াস। কিন্তু কতটুকুই বা আমার জ্ঞান, আর কতটুকুই বা আমার ক্ষমতা—কী উপায়ে সাহায্য করতে হবে?

ক্যালিগুলা। অসম্ভবকে সম্ভব করার উপায়ে।

হেলিকন। যথাসাধ্য নিশ্চয়ই করবো।

(ক্যালিগুলার প্রস্থান এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই স্কিপিও ও সীজোনিয়ার দ্রুতবেগে প্রবেশ)

স্কিপিও। কৈ, কেউ নেই তো! ওঁকে দেখো নি?

হেলিকন। না তো।

সীজোনিয়া। বল না হেলিকন, ও যাবার আগে তোমাকে কিছু বলে নি?

হেলিকন। তার মনের কথা আমি কি করে জানবো?—আমি তো একজন সাধারণ প্রজা, একজন সাধারণ দর্শকমাত্র!

সীজোনিয়া। অমন করে বলছো কেন হেলিকন!

হেলিকন। দেখো সীজোনিয়া, আমরা সবাই বেশ ভাল করেই জানি, যে কেয়াস একজন তীব্র আদর্শবাদী। একবার গোঁ ধরলে, কতদূর যে ও ঝুঁকবে কেউ বলতে পারে না। যাক, আমার খিদে পেয়েছে, আমি চলি।

(প্রস্থান)

সীজোনিয়া। (হতাশায় ভেঙে বসে পড়ে) একজন প্রাসাদরক্ষী ওকে যেতে যেতে দেখেছে বললে। আশ্চর্য, রোমের সবাই ওকে সর্বত্র দেখছে, কিন্তু ক্যালিগুলা নিজের কল্পনা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না।

স্কিপিও। কী কল্পনা?

সীজোনিয়া। আমি কি করে বলবো স্কিপিও।

স্কিপিও। তুমি কি ড্রুসিলার কথা ভাবছো?

সীজোনিয়া। হয়ত তাই। তবে এটা ঠিক ক্যালিগুলা ওকে ভালবাসতো। কাল যাকে ও বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে রেখেছিল, আজ যদি সে পৃথিবী ছেড়ে চলে যায়, কি রকম মর্মান্তিক লাগে বলো তো?

স্কিপিও। (ভয়ে ভয়ে) আর তুমি?

সীজোনিয়া। আমার কথা বাদ দাও। আমি তো একটা বুড়ি, পুরোনো বিগত যক্ষিতা মাত্র—এই তো আমার পরিচয়।

স্কিপিও। না সীজোনিয়া, ক্যালিগুলাকে বাঁচাতেই হবে।

সীজোনিয়া। তুমিও ওকে এত ভালবাসো?

স্কিপিও। বাসি বৈকি। ও কি আমায় কম ভালবাসে? কত উৎসাহ দিয়েছে কত সময়ে—জীবনে ভুলবো না ওর কয়েকটা কথা। বলেছিল—জীবনটা সহজ নয়, কিন্তু তাতে একটা সান্ত্বনা আছে—ধর্মে, শিল্পে, ভালবাসায় তুমি অন্যকে উদ্বুদ্ধ করতে পারো। আমায় প্রায়ই বলতো—মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় ভুল কী জানো?—যখন সে অন্যের কষ্টের কারণ হয়। ক্যালিগুলা চিরকালই ন্যায়পরায়ণ হতে চেয়েছে।

সীজোনিয়া। (উঠে দাঁড়িয়ে) ওযে বড্ড ছেলেমানুষ! (সীজোনিয়া আয়নার সামনে গিয়ে নিজের চুল, পোষাক কিঞ্চিৎ ঠিক করে নেয়) আমার একমাত্র দেবতা কে জানো?—আমার এই দেহটা। এবার এই দেবতার কাছেই অহরহ প্রার্থনা জানাবো,—ক্যালিগুলাকে আমার কাছে যেন ফিরিয়ে আনতে পারে।

(ক্যালিগুলার প্রবেশ। সীজোনিয়া ও স্কিপিওকে দেখে প্রথমে ইতস্তত করে এক পা পেছিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে অন্যদিক দিয়ে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে কোষাধ্যক্ষ প্রবেশ করে এবং ক্যালিগুলাকে দেখে থমকে দাঁড়ায়। সীজোনিয়া মুখ ঘুরিয়ে দেখে স্কিপিওকে নিয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসতে চায়, ক্যালিগুলা ইসরায় তাদের নিরস্ত করে)

কোষাধ্যক্ষ। (কম্পিত কণ্ঠে) আমরা—মানে, আমরা চতুর্দিকে আপনাকে খুঁজেছি, সীজার।

ক্যালিগুলা। (কঠোর কণ্ঠে) তাইতো দেখছি।

কোষাধ্যক্ষ। আমরা—মানে, আমি···

ক্যালিগুলা। (কর্কশ ভাবে) কী বলতে চাও?

কোষাধ্যক্ষ। সীজার, আমরা বড্ড উদ্বিগ্ন হচ্ছিলাম।

ক্যালিগুলা। (ওর দিকে এগোতে এগোতে) কে বলেছিল তোমাদের উদ্বিগ্ন হতে?

কোষাধ্যক্ষ। মানে—ইয়ে, (হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে) আপনি তো জানেন, রাজকোষের ব্যাপারে কতকগুলো জরুরী বিষয় এখনই ঠিক করার ছিল।

ক্যালিগুলা। (উচ্চহাস্যে ফেটে পড়ে) ও হাঁ, তাই তো! রাজকোষ,—রাজভাণ্ডার! হাঁা ঠিকই তো, রাজকোষই তো মুখ্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়!

কোষাধ্যক্ষ। আজ্ঞে হাঁা, অবশ্যই।

ক্যালিগুলা। (হাসতে হাসতে সীজোনিয়ার কাছে গিয়ে) কি বল, প্রিয়সখি, তাই না? সবচেয়ে প্রয়োজনীয় তো এখন রাজকোষ!

সীজোনিয়া। না ক্যালিগুলা, ওটা গৌণ—ওটা পরে হলেও চলবে।

ক্যালিগুলা। এতে যে তোমার অজ্ঞতাই প্রকাশ পাচ্ছে—তুমি কিছু জানোনা। রাজভাণ্ডারই আমাদের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ। সব কিছুতেই আমাদের প্রয়োজন,—আমাদের রাজকোষ, রাজস্ব আদায়ের নিয়ম, দেশের নৈতিক চরিত্র, বহির্বিষয়ক নীতি, দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, ভূমি বণ্টন ও কৃষিকার্য—সবই প্রয়োজনীয়, সব

কিছুতেই সমান গুরুত্ব দিতে হবে,—রোমের ঐশ্বর্য্য, জাঁকজমক, তোমার বাতের ব্যথা—সব। ঠিক ঠিক, সব দিকেই আমার মন দিতে হবে এবং সুরু করতে হবে, —শোন কোষাধ্যক্ষ···

কোষাধ্যক্ষ। আমরা শুনছি, বলুন হুজুর।

[কোষাধ্যক্ষ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ এগিয়ে এল]

ক্যালিগুলা। তোমরা সবাই আমার অনুগত, বিশ্বস্ত এবং রাজভক্ত প্রজা, তাই না?

কোষাধ্যক্ষ। (নিদ্রিত অবস্থায়) এ আপনি কি বলছেন সীজার।

ক্যালিগুলা। শোন, তোমাদের কাছে আমার একটা প্রস্তাব আছে। আমাদের অর্থনৈতিক কাঠামোকে ভেঙে চুরে একটা আমূল পরিবর্তন করতে চাই। একটা প্রচণ্ড আঘাতে এবং হঠাৎ—তোমাকে পরে বুঝিয়ে বলছি কোষাধ্যক্ষ, আগে এই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের বাইরে যেতে দাও।

[সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা চলে গেল। ক্যালিগুলা সীজো-নিয়াকে পাশে নিয়ে বসলেন এবং তার কোমর জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলেন] এবার ভাল করে বোঝবার চেষ্টা করো কোষাধ্যক্ষ। আমার প্রথম পদক্ষেপ হলো,—প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, রাজ্যের প্রতিটি নাগরিক যাদের সম্পত্তি আছে—তা সে ছোটই হোক আর বড়ই হোক—আজ থেকে নিজের নিজের সন্তান সন্ততিদের বঞ্চিত করে সমস্ত সরকারের নামে লিখে দিতে বাধ্য হবে।

কোষাধ্যক্ষ। কিন্তু সীজার...

ক্যালিগুলা। তোমাকে কথা বলার অধিকার এখনো আমি দিইনি। শোন, যেমন যেমন দরকার পড়বে, এদের সবাইকে মরতে হবে, তবে কে আগে কে পরে, সেটা ঠিক করে একটা তালিকা তৈরী করা হবে। অবশ্য আমার খুসীমত সে তালিকায় কিছু অদলবদল হতে পারে। মোট কথা, ওদের সমস্ত অর্থসম্পত্তি আমাদের করায়ত্ত হবে।

সীজোনিয়া। (নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে) কিন্তু, এ তোমার হোলো কী?

ক্যালিগুলা। (অবিচলিতভাবে) বুঝতেই পারছো, আগে পরে মারা যাওয়ার ব্যাপারে বিশেষ কোন মূল্য নেই, অর্থাৎ, এই সব প্রাণদণ্ডের মূল্য সবক্ষেত্রেই সমান—তার মানে, বুঝতে পারছো, কারুই কোন মূল্য নেই। সত্যি কথা বলতে কি, এরা সবাই সমান—একে অন্যের মতই দোষী। (কোষাধ্যক্ষের দিকে সুদৃঢ়ভাবে তাকিয়ে) এক মুহূর্তও সময় নষ্ট না করে, এই রাজাজ্ঞা তুমি ঘোষণা করবে এবং দেখবে যেন ঠিকমত পালিত হয়। রোমের বাসিন্দারা আজ সন্ধ্যের মধ্যেই দানপত্রে সই করবে এবং রাজ্যের অন্যান্য অংশে এ কাজ যেন এক মাসের মধ্যেই শেষ হয়। সব দিকে দূত পাঠিয়ে দাও, যাও।

কোষাধ্যক্ষ। সীজার, আমার মনে হয়, আপনি যদি একবার ভেবে দেখেন·· ···

ক্যালিগুলা। আমি ভেবে দেখবো? শোন গর্দ্দভ! রাজকোষ যেখানে একমাত্র প্রয়োজনীয় ব্যাপার, মানুষের জীবনের সেখানে কোন মূল্য নেই, এটা নিশ্চয়ই বোঝো। আমার এই রাজাজ্ঞা যে ন্যায়সঙ্গত, এটা মানতে তোমরা বাধ্য। যারা অর্থকেই সবকিছু মনে করো, তারা মানুষের মূল্য দেবে কিসে? আমি ঠিক করেছি, এবার থেকে আমি যুক্তির ওপর নির্ভর করে চলবো, এবং আমার ইচ্ছাকে প্রতিফলিত করার মত রাজশক্তি আমার আছে। এবার দেখবে যুক্তির পথ কি ভয়াবহ। পরস্পর বিরোধী কথা, সব কিছু অসঙ্গতি আমি মুছে দেবো। প্রয়োজন হলে, তোমাকে দিয়েই সুরু করবো।

কোষাধ্যক্ষ। সীজার, বিশ্বাস করুন—আমার সদিচ্ছার উপর আপনি আস্থা রাখতে পারেন।

ক্যালিগুলা। আমার সদিচ্ছার ওপরও আপনি আস্থা রাখতে পারেন। আমি তো তোমার কথামতই চলছি, আমার কার্য্যসূচীতে রাজকোষকেই প্রাধান্য দিয়েছি—তোমার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। (ঘুরে গিয়ে) আমার পরিকল্পনায় সরলতায় প্রতিভার ছোঁয়াচ আছে, কি বলো? (হঠাৎ গম্ভীর হয়ে) আর তিন সেকেণ্ডের মধ্যে তুমি ঘর থেকে বেরিয়ে যাবে। এক······

কোষাধ্যক্ষের প্রস্থান

সীজোনিয়া। এ আমি বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না যে তুমি কথা বলছো! ঠাট্টা করেছিলে, না?

ক্যালিগুলা। না, ঠিক ঠাট্টা করছিলাম না

সীজোনিয়া। বলতে পারো এটা রাজনীতির একটা শিক্ষা।

স্কিপিও। কিন্তু কেয়াস, এ যে—মানে, এ যে অসম্ভব।

ক্যালিগুলা। ঠিক,—ঐটেই তো আসল কথা।

স্কিপিও। তার মানে?

ক্যালিগুলা। ঐ তো বললাম, ঐটেই আমার আসল বক্তব্য। আমি অসম্ভবকেই কাজে লাগাতে চাই। মানে, এক কথায়, অসম্ভবকে সম্ভব করতে চাই।

স্কিপিও। কিন্তু সে যে বড় মারাত্মক খেলা, একেবারে উন্মাদের খেয়াল।

ক্যালিগুলা। না স্কিপিও, এটাই হলো সম্রাটের উপযুক্ত কাজ। (ক্লান্তভাবে বসে পড়ে) ওঃ, এতদিনে আমি একাধিপত্যের একটা মানে খুঁজে পেলাম। অসম্ভবের পথে পা দিয়েছি,—যতদিন বেঁচে থাকবো, কোন বাধা মানবো না।

সীজোনিয়া। (দুঃখিত) এই পথে তুমি সুখী হবে মনে করো!

ক্যালিগুলা। হয়ত হবো না, কিন্তু আমার জীবনে এইটাই এখন একমাত্র পথ।

চেরিয়া প্রবেশ করে

চেরিয়া। এইমাত্র শুনলাম, আপনি ফিরেছেন। শরীর নিশ্চয়ই ঠিক আছে!

ক্যালিগুলা। বাধিত হলাম। (একটু থেমে হঠাৎ) তুমি যেতে পারো চেরিয়া, তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই না।

চেরিয়া। কি বলছেন কেয়াস, কিছু বুঝছি না তো?

ক্যালিগুলা। না-বোঝার কিছু নেই এতে। সাহিত্যিকদের আমি পছন্দ করি না। রাজ্যের মিথ্যে কথা আমি আর সহ্য করবো না।

চেরিয়া। মিথ্যে যদি বা বলি, তা সে না জেনেই বলি, —আমি নির্দোষ।

ক্যালিগুলা। মিথ্যে কখনো নির্দোষ হয় না। তা ছাড়া, তোমাদের মিথ্যে দেশের লোকের ওপর, সবকিছুর ওপর অনেক বেশী গুরুত্ব আনে—সেইজন্যেই তোমাদের ক্ষমা নেই।

চেরিয়া। তা হলেও, আমরা তো একই সাহিত্য-জগতে......

ক্যালিগুলা। আমি কোন কথা শুনতে চাই না, বিচার হয়ে গেছে। চরম স্বাধীনতার স্বাদ যে একবার পেয়েছে, তার কাছে কোন কিছুরই আজ আর মূল্য নেই। সেইজন্যেই তোমাকে এবং তোমাদের সকলকে আমি ঘৃণা করি, কারণ তোমরা স্বাধীন নও। স্বাধীন আমি, স্বাধীনতার পথপ্রদর্শক হিসেবে আমাকে পেয়ে তোমাদের খুশী হওয়া উচিত। তুমি যেতে পারো চেরিয়া,—তুমি যাও স্কিপিও, বন্ধুত্বেরই বা কী দাম আছে? তোমরা দুজনেই যাও,—সবাইকে জানিয়ে দাও—স্বাধীনতার পুণ্য-ক্ষণে মহাপরীক্ষা শুরু হয়ে গেছে।

[উভয়ের প্রস্থান। ক্যালিগুলা ঘুরে গিয়ে দু'হাতে চোখ ঢাকলেন]

সীজোনিয়া। একি তুমি কাঁদছো?

ক্যালিগুলা। হ্যাঁ সীজোনিয়া। আমি আর পারছি না।

সীজোনিয়া। আচ্ছা, কী হলো তোমার? এত বদলে যাচ্ছ কেন? ড্রুসিলাকে না হয় ভালবাসতে, কিন্তু ভাল তো তুমি অনেককেই বাসতে—আমাকেও। কিন্তু কখনো তো তোমাকে তিন দিন তিন রাত্তির ধরে পথে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে হয়নি? ফিরে এলে, তাও একটা কঠিন, ক্রুর মূর্তি নিয়ে!

ক্যালিগুলা। (সীজোনিয়ার দিকে ঘুরে) কী যা তা বকছো? ড্রুসিলাকে এর মধ্যে টেনে আনছো কেন? তুমি কি মনে করো, একমাত্র ভালবাসার ব্যাপারেই মানুষের চোখে জল আসে?

সীজোনিয়া। আমার ভুল হয়েছে, কেয়াস, আমায় মাফ করো। আমি শুধু তোমায় বোঝবার চেষ্টা করছিলাম।

ক্যালিগুলা। মানুষ কাঁদে কেন, জানো? মানুষ কাঁদে, যখন তার সমস্ত পৃথিবীটা মিথ্যে হয়ে যায়। (সীজোনিয়া তার দিকে এগিয়ে আসতে সে চেঁচিয়ে ওঠে) না—(সীজোনিয়া পেছিয়ে যায়, ক্যালিগুলা কাতর-ভাবে) কিন্তু তুমি আমার পাশে পাশে থেকো।

সীজোনিয়া। তুমি যা চাইবে, আমি তাই করবো।

(বসে পড়ল) আমার বয়সে এমনিতেই জীবন দুর্বিসহ মনে হয়, তুমি জোর করে আর জ্বালা বাড়িও না লক্ষ্মীটি।

ক্যালিগুলা। না না, তুমি বুঝবে না আমার কি হয়েছে। হয়ত একটা পথ খুঁজে পাবো কোনদিন। কি জানো, এক এক সময় ভাবি কী একটা অস্বাভাবিক আলোড়ন বয়ে যাচ্ছে আমার ভেতর, স্বপ্নেও ভাবিনি এমন এক অমোঘ শক্তি যেন আমায় ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে আলোর সন্ধানে,—আমি সম্পূর্ণ অসহায় বোধ করি তখন। (সীজোনিয়ার কাছে এসে) জানো সীজোনিয়া, মানুষের মনস্তাপ হয়, দুঃসহ যন্ত্রণা হয়—এ সব বহুবার শুনেছি, কিন্তু কখনো বুঝিনি ঐসব কথাগুলোর সত্যিকারের মানে কী। ভাবতাম বুঝি একটা মানসিক অসুস্থতা। কিন্তু তা নয়, এ যেন সর্ব্ব শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা।—বুকে পিঠে, হাতে, পায়ে—গায়ের চামড়াগুলো পর্যন্ত যেন জ্বালা করছে, মাথা ঘুরছে—এক এক সময় মনে হয় বুঝি বমি হয়ে যাবে। সবচেয়ে কী খারাপ লাগে জানো?—মুখের ভেতরটা যখন বিশ্রী বিস্বাদ হয়ে যায়,—শুধু রক্তের স্বাদ নয়, মৃত্যুর স্বাদ নয়, জ্বরের স্বাদ নয়—তিনটে মিলিয়ে একটা বীভৎস ব্যাপার। শুধু জিভটাই নড়ছে, আর আশেপাশে সবকিছু হয়ে যাচ্ছে কালো, মানুষগুলোকে মনে হচ্ছে যেন জঘন্য ভীষণ! উঃ, আমার এই নবজীবনের পথ কী কঠিন, কী ভীষণ নির্দয়!

সীজোনিয়া। শোন লক্ষ্মীটি, তোমার এখন সবচেয়ে বেশী দরকার কী জানো?—ঘুম, একটানা বেশ খানিকটা লম্বা ঘুম। একটু মনটাকে হাল্কা করো, চিন্তাভাবনা ঝেড়ে ফেলে দাও, ঘুমোও—আমি তোমার পাশে বসে বসে সেবা করবো। তারপর দেখবে, ঘুম থেকে উঠে তোমার কত ভাল লাগছে, দেখবে সমস্ত পৃথিবী তার পুরোনো স্বাদ গন্ধ আবার ফিরে পেয়েছে। তারপর, তুমি তোমার ক্ষমতা প্রয়োগ করো ভাল কাজে, যা তুমি ভালবাসো, তা আর বেশী করে ভালবাসো। যা সম্ভব, যা স্বাভাবিক তাকেও তো মানতে হবে, স্বাভাবিক জীবন যাত্রারও তো একটা মানে আছে!

ক্যালিগুলা: কিন্তু তা হলে তো আমাকে ঘুমাতে হবে, নিজেকে হারাতে হবে,—না না, সে অসম্ভব।

সীজোনিয়া: অতিরিক্ত ক্লান্ত হলে ও রকম মনে হয়। এক সময়ে আবার তুমি দৃঢ় হস্তে উঠে দাঁড়াবে।

ক্যালিগুলা। কিন্তু তুমি বুঝতে পারছো না, সেই দৃঢ়হস্ত নিয়ে আমি করবোটা কী? সূর্য্যকে যদি পুব দিকেতেই কোনদিন অস্ত যাওয়াতে না পারলাম, মানুষের দুঃখকষ্ট যদি কোনদিন কমিয়ে দিতে না পারলাম, মৃত্যু যদি বন্ধ করতে না পারলাম, তবে আমার এই অসীম ক্ষমতার মানে কী? চিরকাল যা ঘটছে বা চিরাচরিত যা কিছু প্রথা, বিধি, নিয়ম—তার ওপর হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা যদি আমার না থাকে, তবে ঘুমোলেই বা কি আর জেগে থাকলেই বা কি—সবই সমান। না না সীজোনিয়া, যে আমার কাছে অসহ্য।

সীজোনিয়া। অ হ্যাঁ, সেইটাই তো পাগলামী, সম্পূর্ণ পাগলামী। তার মানেই তো পৃথিবীতে ভগবান হতে চাওয়া।

ক্যালিগুলা। ও, তা হলে তুমিও ভাবছো আমি পাগল? কে সেই দেবতা, যার সমকক্ষ আমি হতে চাই বললে? শুনে রাখো, তার চেয়েও বড়, দেবতাদের চেয়েও অনেক ওপরে আমার লক্ষ্য, কায়মনোবাক্যে সেই লক্ষ্যের পথেই আমার সর্ব্বশক্তি নিয়োজিত। আমি এমন এক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করছি, যেখানে এই অসম্ভবই হবে একমাত্র সম্রাট।

সীজোনিয়া। তা হলেও আকাশ আকাশই থাকবে, কচি মুখ একদিন বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বুড়ো হয়ে যাবে, হৃদয়ের উত্তাপ একদিন কমে যাবে,—তুমি বাধা দিতে পারবে না।

ক্যালিগুলা: (উত্তেজিত হয়ে) আমি চাই, আমি চাই সেই আকাশটাকেই সমুদ্রের তলায় ডুবিয়ে দিতে, আমি চাই সৌন্দর্য্যের মধ্যে কদর্যতা ঢেলে দিতে, ব্যথার ভেতর থেকে টেনে হিঁচড়ে হাসি বার করতে।

সীজোনিয়া: (কাতরভাবে) তা হলেও ভাল-মন্দ, উচ্চ-নীচ, ন্যায় অন্যায় যেমন আছে তেমনি থাকবে, কোনদিন তুমি বদলাতে পারবে না।

ক্যালিগুলা: এবং ঐটেই আমি ঠিক করেছি—ওদের বদলে দেবো। এ যুগের মানুষকে আমি এক বিরাট রাজকীয় উপহার দিয়ে যাবো,—সমতা—সমতা—সমতা। সব যখন পিষে মিশে সমান হয়ে যাবে, যখন এই অসম্ভব

পৃথিবীতে সম্ভব হবে, চাঁদ যখন হাতে এসে যাবে—তখন আমার হয়ত হবে রূপান্তর, পৃথিবীর নতুন রূপ, তখন মানুষ আর মরবে না এবং শেষ পর্য্যন্ত তারা সুখী হবে।

সীজোনিয়া: আর ভালবাসা? নিশ্চয়ই ভালবাসার কথা তখন আর মনেতে থাকবে না।

ক্যালিগুলা: ভালবাসা! (ক্রোধে সীজোনিয়ার কাঁধ দুটো ধরে ঝাঁকানি দিয়ে) সীজোনিয়া, ভালবাসা সম্বন্ধে আমার সব কিছু জানা হয়ে গেছে,—ওটা কিছু না, কিছু না। শোন নি ঐ লোকটা তখন কী বলে গেল? রাজকোষ, একমাত্র রাজকোষই হচ্ছে সব, সব কিছুর একমাত্র উৎস। হ্যাঁ, এইবার আমি বাঁচবো, সত্যিকারের বাঁচার মত বাঁচবো। জানো, বাঁচার সঙ্গে ভালবাসার কোন সম্পর্ক নেই,—ও দুটো সম্পূর্ণ বিপরীত! আমি জানি, আমি কী বলছি। তোমায় একটা অদ্ভুত জিনিষ দেখাবো,—এক বিরাট মেলা, আমার বিচিত্র লীলা—দেবতারা সব লোলুপদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবে—সমস্ত পৃথিবীর বিচার হবে। কিন্তু তারজন্যে লোকের ভিড় চাই, হাজার হাজার লোক,—দর্শক, বলি, অপরাধী। (ছুটে গিয়ে পেটাঘড়িতে আঘাত করতে থাকেন জোরে জোরে) অভিযুক্তরা এগিয়ে আসুক, অপরাধীরা এগিয়ে আসুক, ওরা সবাই অপরাধী। (আবার আঘাত করেন) অকর্মণ্যদের নিয়ে এসো,—আমার প্রজারা কোথায়? বিচারক, সাক্ষী, অপরাধী—বিনা শুনানীতেই সবাই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত। হ্যাঁ সীজোনিয়া, জীবনে ওরা যা দেখেনি, আজ তাই দেখবে—রোম সাম্রাজ্যের একমাত্র পুরুষকে, একমাত্র স্বাধীন সম্রাটকে। (পেটাঘড়ির আওয়াজে নেপথ্যে কলরব সুরু হয়েছে, সৈন্যদের অস্ত্রের ঝন্‌ঝন্ শব্দ, কেউ ধীরে কেউ দ্রুত চলাফেরা করছে, পদশব্দ ক্রমশ কাছে এগিয়ে আসছে, কয়েকজন সৈন্য হঠাৎ ঢুকে পড়ে আবার বেরিয়ে গেল) সীজোনিয়া, তুমি আমার কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে যাবে, শেষ পর্য্যন্ত আমার পাশে থাকবে। প্রতিজ্ঞা করো, তুমি সব সময়ে আমার পাশে থাকবে সীজোনিয়া।

সীজোনিয়া: (উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থায়) আমার প্রতিজ্ঞা করার দরকার নেই। তুমি তো জানো, তোমায় আমি ভালবাসি।

ক্যালিগুলা। আমি যা বলবো, তুমি তাই করবে।

সীজোনিয়া। করবো, করবো ক্যালিগুলা। কিন্তু দয়া করে ও সব বন্ধ করো।

ক্যালিগুলা। (আবার ঘা মেরে) তুমি নিষ্ঠুর হবে।

সীজোনিয়া। (ফুঁপিয়ে) হবো।

ক্যালিগুলা। (আবার ঘা মেরে) নির্মম, নির্দ্দয় হবে।

সীজোনিয়া। হবো, হবো।

ক্যালিগুলা। তুমিও শাস্তি ভোগ করবে?

সীজোনিয়া: করবো করবো, করবো—উঃ, আর আমি পারছি না।—আমি, আমি এবার পাগল হয়ে যাবো, তুমি থামো।

[সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা প্রবেশ করে, প্রাসাদ রক্ষীরা প্রবেশ করে—সবাই বিচলিত, বিক্ষুব্ধ। ক্যালিগুলা আর একবার ঘা মেরে, হাতুরিটা হঠাৎ ঘুরিয়ে উচ্চৈঃস্বরে ক্ষিপ্তকণ্ঠে হাঁক দিলেন]

ক্যালিগুলা। এগিয়ে এসো, সবাইকে বলছি, কাছে এসো, আরো কাছে (অধৈর্য্য হয়ে যেন কাঁপছেন) তোমাদের সম্রাট তোমাদের কাছে আসতে আদেশ করছেন, শুনতে পাচ্ছো না? (ভয় বিহ্বল চিত্তে সবাই এগিয়ে আসতে থাকে) তাড়াতাড়ি এসো। তুমিও এসো সীজোনিয়া, আমার পাশে এসে দাঁড়াও। (সীজোনিয়ার হাত ধরে আয়নার কাছে নিয়ে গিয়ে, হঠাৎ পাগোলের মত আয়নার কাঁচটা মুছে দিয়ে উন্মত্তের মত হেসে) সব চলে গেছে, দেখতে পাচ্ছ না সুন্দরী? সব স্মৃতি মুছে গেছে, মুখোসটা খসে গেছে, দেখতে পাচ্ছ না! কিছু নেই, কিচ্ছু নেই। কেউ না? না, না, তা সত্যি নয়। এইতো, দেখো সীজোনিয়া, এসো—তোমরাও এসো, দেখো—কী দেখছো?

[ক্যালিগুলা নিজেকে হাসিমুখে উদ্ভাসিত করে আয়নার সামনে দাঁড় করালেন]

সীজোনিয়া। (ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে আয়নার ভেতর দেখে) ক্যালিগুলা!

ক্যালিগুলা। (আয়নায় আঙুল ঠেকিয়ে কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে গর্ব্বিত কণ্ঠে বলে উঠলেন হ্যাঁ……ক্যালিগুলা ‖ (ক্রমশঃ)

হাতের কথা

সুরাচার্য

এবার একটি brilliant লোকের হাতের বিচার করছি। এনার sehool carcer ছিল really brilliatl অষ্টম শ্রেণীতে এনার নম্বর ছিল ১১০০য়ের মধ্যে ১০০৯। নবম দশম শ্রেণীতেও খুব ভাল নম্বর পেতেন। সংস্কৃততে ৯৮।৯৯, অঙ্কে পুরোপুরি ১০০, বাংলায় ৮৭।৮৮, ইংরাজিতে বাংলারই মত ৯০য়ের কিছুটা নীচে, ইতিহাসে তদ্রুপ, ভুগোলে ৯৫।৯৬, বিজ্ঞান স্বাস্থ্য সকল বিষয়েই ৯০য়ের উর্দ্ধে, এবং সবেতেই প্রায় প্রথম। যখন drawing করতেন তাতেও নম্বর আসতো আশীর কোঠায়। কাজেই লেখা-পড়ায় কোন ছাত্রই তার সমকক্ষ ছিল না। ইনি শুধু লেখাপড়ায় ভাল ছিলেন না। উৎকর্ষের পরিচয় দিতেন তিনি নানান্ দিকে। ভাল গান করতে পারতেন, অভিনয় করতে পারতেন। ২৫।৩০ বার বালক শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন যখন তার বয়স ছিল মাত্র ১৩।১৪ বৎসর। পরে তাসের খেলা এবং অন্যান্য ম্যাজিক দেখাতে পারতেন। এ ছাড়া নানারূপ খেলাধুলায় যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। সন্তরণ জানতেন, সাইকেল সহযোগে দূরপাল্লায় পাড়ি দিয়ে সেখানে ফুটবল খেলে বাড়ী ফিরতেন। ক্রীকেটে একটি নামকরা কলেজের Captain ছিলেন। বল দিতে পারতেন খুব ভাল, Spin bowler ছিলেন। Fieldingয়েও হাত থেকে বল গলার যো ছিল না।

ফুটবল ক্রীকেট ছাড়া ঘুড়ি ওড়ানো, তাস খেলা, ভলী বল, বাস্কেট বল, ব্যাডমিণ্টন অনেক কিছুই মোটামুটি ভাল খেলতেন।

হাতের লেখা মুক্তাক্ষর, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঝরঝরে সবই সমান ওজনের এবং দৃঢ়ত্বের। পোষাক পরিচ্ছদে ছিমছাম। ধুতি পাঞ্জাবী যেমন পরিষ্কার তেমনি ইস্ত্রীযুক্ত, এক কাপড় তিনদিন পরলেও মনে হবে সদ্য ভাঙ্গা। জুতা চক্চক্ করছে, ধুলোর 'ধ'য়ের দেখা নাই। এত সযতনে চুলটি আঁচড়ান যে একটি চুল হাওয়ায় উড়বেনা। বয়স পঞ্চাশের উর্দ্ধে, এখনও চুল ঘন এবং কাল। রং শ্যামবর্ণ, ত্বক্ মসৃণ চক্চকে। এক কথায় শুধু বিদ্যা বুদ্ধি ও কর্মে দীপ্ত নয়, দেহে মনেও যথেষ্ট দীপ্তি দেখা যায়। সব কিছু পুজা উৎসবে তিনি একজন ছিলেন ভাল Organiser। কাজেই বুঝতে পারছেন তাঁর প্রতিভা ছিল সর্ব্বতোমুখী। Matriculation-এ তিনি দুইটি বিষয়ে scholerhip পান। intermediate থেকে তাঁর বিদ্যার উৎকর্ষ দেখা যায় না। তিনি "বিলকুল পড়াশোনা না করার জন্য কেবল প্রথম ডিভিসনে পাস করেন। তিনি ছিলেন শ্রুতিধর। ক্লাসে যা শুনতেন সেইটাই মগজে থেকে যেত, কাজেই না পড়ে প্রথম শ্রেণীতে তিনি উত্তীর্ণ হয়ে ছিলেন। পরে পড়তে লাগলেন বি-এ, ইংরাজিতে honours নিয়ে। যদি লেখাপড়া নিয়ে সতাই থাকতেন আজকে তাঁকে একজন brilliant profesor বলে দেশ

পেত কিংবা অন্য কোন কর্মক্ষেত্রে বহু উচ্চপদ ও সম্মান পেতে পারতেন। তিনি জীবনকে মোটামুটি সহজভাবে নিয়েছিলেন, এবং যা কিছু করতেন সহজভাবেই, তখনও উৎকর্ষই ছিল লক্ষ্যযোগ্য। মনে হয় তাঁর fiery imagination ছিল না। সেই কারণেই হয়ত জীবনে বিরাট ধাক্কা দেবার আগ্রহ বা ইচ্ছা আসেনি আবার মজার বিষয় যখন কাজ ঘাড়ে এসে পড়তো তিনি ব্যক্তিগত চেষ্টা উৎসাহ ও বুদ্ধির দ্বারা সেটা সুসম্পন্ন করতেন। সাধারণ ভাবে অল্প খেটে কাজ হাসিল করতে পারতেন বলে অধিক চেষ্টা তাঁর আসতো না। প্রতিযোগী সহপাঠী না থাকায় তিনি সহজেই প্রথম স্থান অধিকার করতেন। পরে কলেজে যখন প্রতিযোগী সহপাঠী পেলেন তখন অল্প আয়াসের বদভ্যাস দাঁড়িয়ে

ডান
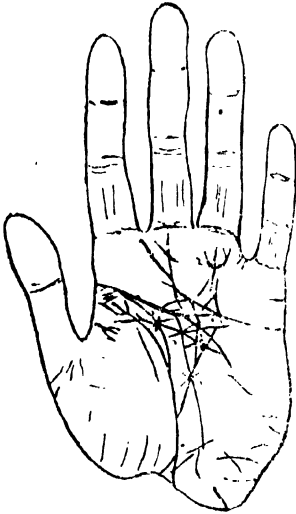
গেছে। তখন নিজেকে ঢেলে সাজা শক্ত। ভাল তাদের বিরুদ্ধে "কড়া defence" করতে হবে তখনকার এই ছিল এক বুলি। ইনি যখন বি-এ পরীক্ষা দেন তার আগের দিন মাত্র সংস্কৃত বইটা একবার দেখে নেন, কেমন দিলে? উত্তর এলো কড়া difence করেছি।" অর্থাৎ তাকে fail করায় কে? এই হচ্ছে মজার লোক যার মজার দুটি হাতের ছাপ আপনাদের চোখের সামনে ধরেছি।

দুই হাতেই দেখুন, রবির স্থান শনির উপরে এবং রবির আঙ্গুল দুটি অর্থাৎ অনামিকাদ্বয় দীর্ঘাকার, সরল এবং অন্যান্য আঙ্গুলগুলি অপেক্ষা অধিক আকর্ষণীয়।

সূর্যের যেমন সরু রশ্মি ঘরে ঢুকলে অন্ধকার ঘরের অনেকখানি আলোকিত হয়, সেইরকম রবি স্থান ও রবির আঙ্গুল বা রবি রেখা হাতে বলবান থাকলে আনন্দ, প্রতিভা ও দীপ্তি দেখা যায়।

এঁর করতল নরম ও মসৃণ এবং পর্ব্বতগুলি বেশ উচ্চ বিশেষ করে বৃহস্পতি রবি ও শুক্রের। এইগুলি হইতে জ্ঞান বুদ্ধির সূক্ষ্মতা ও দীপ্তি বিচার্য্য। বুদ্ধির কারক বুধ। তার স্থান ও আঙ্গুল দক্ষিণ হস্তে প্রশংসনীয়।

রেখা বিচারেও দেখা যাচ্ছে রেখাগুলি সূক্ষ্ম কাজেই সূক্ষ্ম বিচার বুদ্ধি বিদ্যমান। মস্তিষ্করেখা উভয় হস্তেই দুইটি করে। একা রামে রক্ষে নাই, আবার সুগ্রীব দোসর। আপনি হাজার হাজার হাত দেখে যান, দেখবেন অধিকাংশ হাতেই একটি করে মস্তিষ্ক রেখা। কিছু কিছু লোকের কেবল একটি হাতে অর্থাৎ দক্ষিণে বা বামে দুটি মস্তিষ্ক রেখা চখে পড়বে। কিন্তু দুই হাতেই এক জোড়া করে মস্তিষ্ক রেখা অতি বিরল। কাজেই এই সব লোক যে অসাধারণ হবে এ-ত সহজেই অনুমেয়। দুইটি মস্তিষ্ক রেখায় শাখা প্রশাখা থাকায় প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী। রেখা দুইটির উৎপত্তি স্থল আলাদা আলাদা। শেষে হয়েছে কিন্তু এক রেখায়। কাজেই দুইটি মস্তিষ্ক রেখা দিয়ে আলাদা আলাদা চিন্তা করার ধারা ও স্বাভাবিকতা রয়েছে এবং এক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হচ্ছে এই জন্যে যে রেখা দুইটি একটি রেখায় শেষ হয়েছে। Bias বা prejudice আমাদের অনেকেরই থাকে। এবং উভয় দিক দিয়ে বিচার না করলেই বিচারের গলদ থেকে যায়। এঁর মস্তিষ্ক রেখার দুইটি আলাদা উৎপত্তি স্থল হওয়ায় ইনি bias, prejudia-য়ের বাহিরেও বিচার দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পারতেন। কলেজে কয়েকবার খুব কুট প্রশ্নের উত্তর তিনি এমন দিয়েছিলেন যে অধ্যাপককে বলতে হয়েছিল—"very well guarded answer"

উপরের মস্তিষ্ক রেখাটি উচ্চ বৃহস্পতিগৃহের প্রায় বহিঃসীমা হইতে উত্থিত কাজেই অতি বাল্য হইতেই মস্তিষ্কের তেজ শক্তি ও আত্মনির্ভরতা স্বাধীন চিন্তা শক্তি পরিস্ফুট হতে দেখা যায়। ইনি একবার double

promotion পেয়েছিলেন। এবং এত বেশী নম্বর পেতেন যে আরো কয়েক বার দিলে কিছু অন্যায় হোত না।

নীচের মস্তিষ্ক রেখাটি অপেক্ষাকৃত দুর্বল। ফলে এঁর মধ্যে লাজুকতা যথেষ্ট ছিল। নিজের বিলক্ষণ যোগ্যতা থাকলেও হাম-বড়ামি করতে কখন দেখা যেত না। বরং নিজেকে অধিক সময় এক পাশে ফেলে রাখতেন। সমসাময়িকদের বুদ্ধি ন্যূন সত্ত্বেও তাঁদের দাবাবার জন্য কোনই ব্যস্ততা ছিল না। তাদের নানান্ আস্ফালন কালে তিনি কম জানতেন এই ভাব নিয়ে চুপ করে বসে থাকতেন। তিনি কোনদিনই মাতব্বরী করার জন্য পা বাড়ালেন না তাঁকে সব সময়ই ঠেলে এগিয়ে দিয়ে মাতব্বরী করান হোত। এই যে লাজুকতা এবং আত্ম-অনাস্থা এটা এই নীচের মস্তিষ্ক রেখাই কারণ। এই রেখাটির জন্য তাঁর বহিঃপ্রকাশ সীমিত হয়ে যায়। "লোকে কি বলবে? আমি পারব ত?" এই সব ভীতি ও চিন্তা এসে নিজস্ব স্বকীয় উৎসাহ ও তেজের হানি করে দেয়। তবুও লোকে বলবে—"while humility is good and desirable one should not hide one's light in a brushel" যাই হোক—তিনি একটি বিশিষ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং administator হয়ে কাজ করেন। এটা পাবার জন্যও তাঁর কোনদিনই কোন তাগিদ ছিল না, এলো আপনিই ঘটনার পারম্পর্য্যে। ইনি অত্যন্ত মেধাবী। Nesfield সাহেবকে গুলে খেয়ে ফেলেছেন, এমনই ইংরাজি ব্যাকরণে দখল। বাজারে ইংরাজি ভাল লেখেন বলে যাদের কিছু পরিচয় আছে এমন কেহ কেহ লোক এঁর কাছ থেকে ইংরাজি ব্যাকরণের clarification চেয়ে নেন। শুধু ইংরাজি ভাষায় কেন বাংলা ও সংস্কৃততে তাঁর ব্যাকরণের ব্যুৎপত্তি অসাধারণ। যদি তিনি চর্চা রেখে যেতেন আজ এক মহা বৈয়াকরণিকও হতে পারতেন।

দুটো হাতই মোটামুটি square আঙ্গুলগুলি square eomic এবং smooth অর্থাৎ কোন knots (গ্রন্থি) দৃশ্যমান নয়। ফলে বিচার বিবেচনা স্বতঃস্ফূর্ত, সহজ, সুন্দর। বিশেষ চিহ্নের মধ্যে বাম হস্তে মৎস্য রেখা ত্রিভুজ চতুর্ভুজ লক্ষ্য করুন দুই মস্তিষ্ক রেখা ও হৃদয় রেখার মধ্যস্থলে। জীবনী রেখার উর্দ্ধভাগে ত্রিভুজ জীবনী রেখার নীচে শুক্রক্ষেত্রে ত্রিভুজ।

দক্ষিণ হস্তে রবি রেখা জীবনী রেখা থেকে উত্থিত। পরে হৃদয় রেখার নিকট বিলীন। পুনর্বার হৃদয় রেখার উপর হইতে কয়েকটি উত্থিত। উপরে ত্রিশূলাকারে সমাপ্তি নীচেরটীতে ত্রিভুজ চিত্র যুক্ত। মস্তিষ্করেখা দুইটীতে অনেকগুলি ত্রিভুজ।

brilliancy'র কারণ তারকা চিহ্ন দক্ষিণ হস্তের নীচের মস্তিষ্ক রেখাটিতে দেখুন তিনটি রয়েছে। বাম হাতের মস্তিষ্ক রেখায় মৎস্য চিহ্ন।

বাম
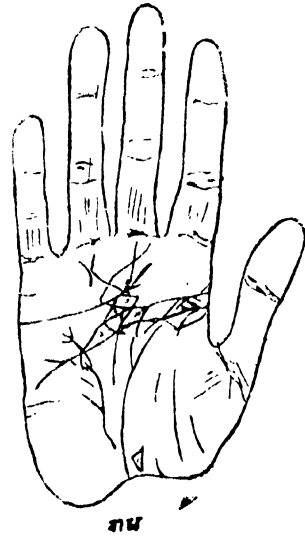
এত brilliancy সত্ত্বেও তিনি খবরের কাগজের head line hit করেন নি তার কারণ আমার মনে হয় তিনি বাংলো বহুদিকে ছড়িয়ে পড়েছিলেন পরে সামাজিকতা এবং সামাজিক বোধকে বড় করে ফেলে আত্ম সাধনায় ডুবে যেতে পারেন নি। বন্ধুবান্ধবের দুর্নিবার আকর্ষণও তাঁর এক প্রকার দুর্বলতা ছিল। Inpeioiry complex তাঁকে ভিতর থেকে কতকটা আটকেও রেখেছিল। কেবল শোভনীয় কি এই বিচার করতে করতে অনেক সুযোগ উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং কতকটা বিলাস আরাম ও নির্ঝঞ্ঝাট শান্তি প্রিয়তা প্রয়োজনীয় উৎসাহ দেয় নি। দোষ তাঁর কি কার বলা শক্ত তবে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে হাতের বিচার বলে—

Evrey hand tells its own story. It also tells how this story, can be al erec to the ownde adsantage.

অনেকে এ কথা কয়টি মানবেন না। তাঁরা বলবেন মানুষ ও মানুষের জীবন রহস্যময়। উদ্ঘাটন করা সহজ নয়। আর করবে কে?

তার উত্তরে বলতে হয়—

No doubt man is an enigma, But each enigma has a cave, a chast, a design, an exit of its own.

That crux or quintersence is embedded in the lines of his palm, A lay man may not decipher, but an adept can,

এর জবাব আপনার যা আছে তাই নিয়ে ভাবুন এবার। হয়ত সঠিক উত্তর একদিন পাবেনই, আমার কথা নাই বা স্বীকার করলেন।

প্রশ্ন উত্তর ও বিচার

১। এন্ সি চ্যাটার্জি, কসৌলী

আপনি অনেকগুলি কুপন একসঙ্গে পাঠিয়েছেন। পুরান কুপনগুলির উত্তর দেওয়া সম্ভবপর নয়। তবুও আপনার প্রশ্নের জবাব জানাচ্ছি।

১। আপনার মেয়ের জন্ম সময় তারিখ জানালে ভাল হোত। তার জন্মচক্র থেকে তার বিবাহ সময় বলার সুবিধা বেশী, আপনার চক্রে তার ছায়া পড়ে মাত্র। যাই হোক আপনার বৃহস্পতির দশায় বুধান্তর যাচ্ছে। মেয়ের বিবাহ যোগ পড়েছে। কথাবার্তা চলবে। তবে বিঘ্ন বাধাও এসে পড়বে। মনে হয় দেরী হলেও দুই বৎসরের মধ্যেই হয়ে যাবে।

(খ) আপনার ছেলের চাকরী মার্চ কি মে মাসে হয়ে যেতে পারে। পরে ভাল সময় সেপ্টেম্বর অক্টোবর।

(গ) আপনার চাকরীতে উন্নতি হবে। কিছুকাল অপেক্ষা করুন। আশাহীন হবেন না।

(ঘ) আপনার কলিকাতায় বদলী হওয়া সম্ভব।

(ঙ) M. D. করার চেষ্টা করুন। চাই ধৈর্য্য ও একাগ্রতা।

২। শ্রীরঞ্জিৎ চ্যাটার্জি, কলিকাতা ৪। ব্যক্তিগত ভাবে আলাদা জবাব দেওয়ার প্রস্তাব এখন নাই। কাজেই ভারতবর্ষ মারফৎ জানাচ্ছি। তা ছাড়া প্রতি কুপনে দুইটি প্রশ্ন করার কথা। আপনি তিনটি প্রশ্ন করেছেন।

ক আপনার প্রতিষ্ঠা হবে মোটামুটি।

খ বরং অনেক বেগ পেতে হবে আপনাকে।

ঘ অধিক পড়াশোনা করার সুযোগ কম দেখি।

গ পারিবারিক জীবন তেমন শান্তিপ্রদ দেখিনা।

আপনি আমার কাছাকাছি থাকেন। কাজেই সাক্ষাতেও আলাপ করতে পারেন কোন বিশেষ কিছু জানার থাকলে।

৩। শ্রীসমিৎ ঘোষ। আসানসোল।

১। বৃহস্পতি বৃশ্চিক রাশিতে এসে থাকাকালীন আপনার বিবাহ যোগ বেশী। আপনার শুক্র পাপাক্রান্ত তাই বিবাহে দেরী হচ্ছে।

খ। চন্দ্র তুঙ্গী হওয়ায় কি ধরণের ফল আপনি চান্? চন্দ্র ভাগ্যাধিপতি হয়ে সপ্তমে উচ্চস্থ। এতে ভাগ্য বিষয়ক শুভ ফল হবে। বিবাহের পরও উন্নতি বোঝায়। ব্যবসা বাণিজ্যে বা কোন professional কাজে ভাগ্য গঠন হতে পারে।

আলাদা জবাব দেওয়ার প্রস্তাব এখন নাই। কাজেই ভারতবর্ষ মারফৎ জানাচ্ছি।

৪। শ্রীঅজয় মিত্র, পণ্ডিচারী।

ভৃগু পদ্ধতির বিচারের নকল যা পাঠিয়েছেন তা দেখলাম। কে কী বলেছেন বা লিখেছেন সে নিয়ে আমার কিছু বলার নাই। কারণ প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগতমতামত বা বিচারআছে, ভৃগুর বিচার আসলে প্রক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে। অনেকেই জোড়াতালি দিয়ে ভৃগুর নামে কাটাচ্ছেন। যাঁরা ভৃগুর বিচার আনিয়েছেন অমন অনেকের কাছেই নানান্ ধরণের কথাবার্ত্তা শুনি কাজেই আসল ভৃগু কোথায় কার কাছে সেইটাই আগে জানা দরকার। আপনি যা পেয়েছেন তাতেই হাতে পাঁজী মঙ্গলবার করে নিন। অর্থাৎ ব্যক্তিগত জীবনের ফল মিলিয়ে দেখে নিন আপনার জীবনে কত খাটে। যাইহোক আপনার এই বিচারের কাগজগুলি আলাদা ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছি।

আপনি সাধনার রাস্তায় এগিয়ে যান। এতে আপনার অধিকার আছে, ফলও পাবেন।

যাতে জড়িয়ে পড়েছেন মনে করছেন, তা সত্বেও সাধনার উচ্চস্তর ভেদ করা যায়। চাই একাগ্রতা। যা কিছুই করছেন তাঁর কাজ করছেন এই ভাবটী যদি সম্যক্ আনতে পারেন তাতেই বা আপনার দিব্য জীবনের দ্বার রোধ করে কে? কেউ কাউকে আটকায় না। মানুষ নিজেই নিজেকে আটকায়। দ্বন্দ্ব দোলা সন্দেহ সাথে রাখলে হবেনা, অযথা দেরী হয়ে যাবে। গভীর বিশ্বাস ও অটল একাগ্রতা নিয়ে অগ্রসর হোন। আপনার সঙ্গে আপনার বাধাগুলি সচল ভাবে চলতে থাকবে।

৫। শ্রীকনক চক্রবর্ত্তী, আগরতলা, ত্রিপুরা।

প্রশ্নোত্তর এখন ভারতবর্ষের মাধ্যমে দেওয়া হচ্ছে। কাজেই এখানেই দেখে নিন।

ক—আপনার চাকরী পাবার এবং করার যোগাযোগ প্রবল। 'সহসা' বলতে কি বলতে চাইছেন ঠিক বুঝলাম না। আপনার কর্ম্মস্থানে অনেকগুলি গ্রহ। কাজেই আপনার কাজ ঠেকায় কে?

খ—ভাল করে খাটুন, ১৯৭০ সালের পরীক্ষায় পাশের সম্ভাবনা আছে।

৬। শ্রীঅজিতকুমার নন্দী, বর্দ্ধমান।

আপনার হাতের রেখাগুলি সুন্দর। চাকরীতে নিশ্চয়ই উন্নতি হবে। ব্যস্ত হবেন না। পরিশ্রম করে যান। কিছু সময় লাগবে। ধৈর্য্য কিছু কম দেখছি, এবং আপনার মধ্যে irritations-ও অনেক। বৃথা ঝগড়া ঝাঁটি হয়ে যায়। বাধা পেলে অস্থির হয়ে যান। এসবগুলি দূর করে একাগ্রতা নিয়ে এগিয়ে যান। উন্নতি কাজের উপর, luck'এর উপর ধরে বসে থাকবেন না। যদিও অনেকে হঠাৎ ভাল সুযোগ সুবিধে পেয়ে গিয়ে থাকেন।

৭। শ্রীত্রিদিব বসু, বাটানগর।

আপনি জ্যোতিষ শিখতে চান ভাল কথা। কিন্তু জ্যোতিষ উপার্জ্জনের রাস্তা বলে ধরে নেবেন না। কারণ জ্যোতিষ সাধনার জিনিষ। আজকালকার দিনে উপার্জ্জন না করে সাধনা করার সুযোগ কজন পায়? আপনার আছে কিনা জানিনা। কাজেই সাধারণ হিসাবে অর্থকরী শিক্ষার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হোন। আপনি এক রবিবারে আমার সঙ্গে দেখা করুন। তাহলে আপনার অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ের আলোচনা করা যাবে।

দ্রষ্টব্য—

অনেকে পুরাণ কুপন দিচ্ছেন এবং দুইটির বেশী প্রশ্ন করেছেন। যে মাসের কুপন দেবেন তার পরের মাসের পত্রিকায় উত্তর দেওয়ার কথা, অবশ্য বেশী প্রশ্ন এসেগেলে তার পরের সংখ্যাগুলিতে উত্তর দেওয়া হবে। পাঠকের তরফ থেকে পুরাণ কুপন যেন না আসে এইটাই অনুরোধ। প্রশ্ন সংখ্যা দুইটির মধ্যে সীমিত রাখবেন। বেশী প্রশ্ন করলে প্রয়োজনীয় প্রশ্নের উত্তর বাদ পড়ে যেতে পারে।

———

আপনার ভবিষ্যৎ জানতে চান কি

আপনার যদি কোন গুরুতর প্রশ্ন থাকে, তার উত্তর দেবেন সুরাচার্য্য আপনার জন্মসময়, তারিখ এবং জন্মস্থান জানালে। যাঁদের জন্মচক্র, গ্রহের স্ফুট, বিংশোত্তরীর দশা যা চলছে তা জানা আছে তাঁরা এগুলি লিখে পাঠালে, শীঘ্র উত্তর দেবার সুবিধা হবে। Lahiri' Ephemenis বা বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুযায়ী গণনা করা থাকলেই পাঠাবেন। কারণ সুরাচার্য্য এই দুই গণনার উপরই নির্ভর করেন। দুইটীর বেশী প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব হবে না। এই উত্তর "ভারতবর্ষ"-এর পরের সংখ্যায় পাবেন। অবশ্য খুব বেশী অনুরোধ এসে গেলে পত্রের প্রাপ্তি ক্রম অনুযায়ী আস্তে আস্তে পরের সংখ্যাগুলিতে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা হবে। প্রশ্নের সঙ্গে এই পাতার শেষে যে 'কুপন' আছে সেটী ছিঁড়ে পাঠাতে হবে। প্রতি কুপন'-এ দু'টি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হবে।

পত্র লেখার সময় ও তারিখ পত্রে থাকলে অনেক সময় যথার্থ উত্তর দেওয়ার সহায়তা হয়। হাতের ছাপও পাঠাতে পারেন প্রশ্নের রহস্যোদ্ঘাটনের সহায়তা হিসাবে। দুই হাতের ছাপ প্রয়োজন। ছাপ নেবার অনেক পদ্ধতি আছে। সাধারণ কালিতে ছাপ ভাল হয়না; Stamp pad ink-এ চলতে পারে, যদি Stamp pad-এর সাহায্য নেন। Press ink, Cyclostyle ink অর্থাৎ ছাপার কালি সবচেয়ে ভাল। কিন্তু এই কালি হাতে লাগাতে হলে কাঠের বা রবারের রোলার প্রয়োজন। অনেকের এটা যোগাড় করা সম্ভব নাও হতে পারে। ভূষো কালি হাতে লাগিয়ে চেষ্টা করে দেখতে পারেন। পরিত্যক্ত Lip stick বাড়ীতে থাকলে তা দিয়েও হাতের সুন্দর ছাপ নেওয়া যায়। নূতন ব্যবহার করলে বৃথা খরচ বৃদ্ধি হবে এই যা। মনে রাখবেন, কেবল কৌতুক বশত: প্রশ্ন করবেন না। তাতে আপনার ও সুরাচার্য্যের দুজনেরই সময় নষ্ট হবে। প্রশ্ন প্রয়োজনীয় যা গুরুতর বা জানার আগ্রহ যথেষ্ট থাকলে তবে প্রশ্নের উত্তর ভাল পাওয়া যায়। মনে মনে কল্পনা করে প্রশ্ন বার করবেন না। যে প্রশ্নের উত্তর পাবার জন্য মন ব্যাকুল সেই প্রশ্নই প্রশ্ন।

অনেকেই প্রশ্ন ঠিকমত করতে পারেন না। তাঁরা জানতে চান এক, কিন্তু জিজ্ঞাসা করেন আর এক! কাজেই উত্তর সন্তোষজনক পাওয়া যায় না। এজন্য প্রশ্নটা একটু ভাববেন এবং আসল জ্ঞাতব্য কি সেই কথাটাই খুব সরল, সহজ, স্পষ্ট এবং যথাসম্ভব ছোট্ট করে জানাবেন।

ধরুন আপনার বাজারে কিছু দেনা আছে। আপনি ভাবছেন একটা লটারী পেলে দেনাটা শোধ করে ফেলতে পারেন। কাজেই প্রশ্ন করলেন "লটারী পাব কিনা?" লটারী পাওয়া আসলে কিন্তু প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হচ্ছে ঋণ শোধ, কারণ আপনি ঋণ পীড়ায় পীড়িত। কাজেই আপনার প্রশ্ন হওয়া উচিত "দেনা শুধতে পারবো কি?" "দেনা শোধ করতে কত সময় লাগবে?" "দেনা সময়ে পরিশোধ না করলে কি ক্ষতি হয়ে যাবে"—এইসব। কিন্তু লটারী পাবার জন্যে মন সত্যই আকুল থাকলে তখন জিজ্ঞেস করতে পারেন লটারী পাবেন কিনা। সেই টাকা তখন কী কাজে লাগাবেন সেটা প্রশ্ন নয়।

প্রশ্নের উত্তর সন্তোষজনকভাবে মিলে গেলে সুরাচার্যকে "ভারতবর্ষ"-এর ঠিকানায় জানাবেন।

॥ কুপন ॥

পৌষ মাঘ ফাল্গুন—১৩৭৫ গ্রহ-জগৎ

তীর্থ স্মৃতি

শ্রীমতী ঊর্মিলা দেবী

তীর্থে চলিয়াছি মোরা সুদূরের পথে
হেরি কত নর নারী চলিয়াছে গৃহ ছাড়ি
কারো মন ভাবাক্রান্ত কেহ আনন্দেতে।
স্বামী পুত্র হারা কেহ চোখে জল ভরে
সন্তানে হারায়ে কেহ ছাড়িয়াছে নিজ গেহ
চলিয়াছে দেশান্তরে শান্তি লাভ তরে।
বারাণসী ধাম হতে তীর্থ হল সুরু
সেথা হতে সাঁচী স্তূপ শিলাময় অপরূপ
ভক্ত সাথে বেড়ালেন মোর তীর্থ গুরু।
বিকালে ভূপাল হয়ে উজ্জয়িনী পুর
মহাকাল মন্দিরেতে পূজা সারি আনন্দেতে
চলি সবে রাজপুরী মন ভর পুর।
শূন্য সেই রাজপুরী নাই কেহ সেথা
কবি কালিদাস কই ? আনমনে চেয়ে রই
বহে যায় সিপ্রা নদী অতি খরস্রোতা।
সেথা হতে ইন্দোরের শিস্ মহলেতে
আর্সি দিয়ে কাজ করা জমকালো আলো করা
কাচদিয়ে মোড়া সব থাম দেয়ালেতে।
অহল্যাবাঈএর বাড়ী শুচি মূর্তি তাঁর
বসেছেন যোগাসনে দেখি শ্রদ্ধা ভরে মনে
ফিরে আসি ক্লান্ত দেহে গাড়ীতে আবার।
রেলগাড়ী ছুটে চলে ছাড়ি গিরি বন
আভা শোভা দুই বোন গান করে ঢালি মন
ভরে দেয় সুরে সুরে আমাদের মন।
ক্রমে সবাকার সাথে হল পরিচয়
আনন্দময়ী সেদিদি আমাদের কমলাদি
যশোদা জননী যেন দেখে মনে হয়।

একসাথে ঘুরি ফিরি একসাথে খাই
মনেহয় কেবা কার সকলেই আপনার
এই গাড়ী ঘর বাড়ী হেথায় সবাই।
বরোদায় গিয়ে শুনি মহা ধুমধাম
গ্রন্থোনাথে গিয়ে আজ খাওয়াবেন মহারাজ
সেখানেতে আছে তাঁর মহাগুরু ধাম।
তারপর সোমনাথে সাগরের তীর
প্রভাস পত্তন মাঝে . শ্রীকৃষ্ণ শুইয়া আছে
পায়ে তাঁর বিঁধিয়াছে বিষমাখা তীর।
দ্বারকা রাজার দেশ দেখিবারে যাই
ধন্য সেই মহারাজ সোনা রূপা কত সাজ
পূজা দিয়ে উপহার পদচিহ্ন পাই।
শঙ্করাচার্য্যের মঠে প্রণাম জানাই
মহারাজে সেথা পাই যার মনে খেদ নাই
গুরু সনে গোবিন্দর দরশন পাই।
দিলওয়ারার মন্দির অপূর্ব্ব সেকাজ
কোন সে নিপুণ হাত করেছে এ রেখাপাত
এত সূক্ষ্ম কারু কাজ গড়িয়াছে আজ।
যোধপুরে রাজবাড়ী কত অগণন
কত ইতিহাস ভরা কত হাসি কান্না ভরা
কত স্মৃতি স্তম্ভ আর প্রাসাদ কানন।
কত হ্রদ কত বন কত গিরি পথ
পার হয়ে চলে যাই মনে মনে ভাবি তাই
জানিনা কোথায় গিয়ে শেষ হবে পথ।
শ্রীনাথে জানকী নাথে অভেদ দুজন
দ্বারকানাথের সনে একযেন হয় মনে
ভিন্নরূপে বিরাজেন একই নারায়ণ।

দুর্গের মন্দির দেখি পাহাড়ের পর
অপূর্ব্ব সে দৃশ্য তার কত পাহাড়ের সার
তার মাঝে পঞ্চানন একলিঙ্গেশ্বর।
চিতোরে মীরার গৃহ গিরিধারী লাল
অন্ধ সে গাহিছে গান ভরে যায় মন প্রাণ
আনন্দ প্রবাহ সেথা বহে চিরকাল।
আজমীরে পুষ্করেতে সাবিত্রী পাহাড়
ব্রাহ্মার সে মন্দির পুষ্করের নদী তীর
সেই সব স্মৃতি মনে জাগে বারবার।
জয়পুরে শ্রীগোবিন্দ ঝলক দরশন
গোপা—ল জয় জয় একসুরে সবে গায়
শুনি সেই জয় গান ভরে যায় মন।
আগ্রায় দেখি তাজ ভাবি মনে মনে
কোথা শাজাহান রাজ কোথা তব মমতাজ
স্মৃতি শুধু পড়ে আছে মর্ম্মরের সনে।

মথুরায় রাজা হন গোপাল যখন
কাঁদে গোপ গোপী গণ কাঁদে তাঁর বৃন্দাবন
মনে পড়ে কত কথা দেখি বৃন্দাবনে।
বস্ত্র হরণের ঘাটে তমালের সাথে
শ্রীকৃষ্ণ বাজান বাঁশী সেই আশে ভাসি
ব্রজবালা ঘাটে বসি রয় হাসি মুখে।
দিল্লীতে মহাত্মার সমাধির কাছে
প্রণাম করিনু সবে চিরদিন মনে রবে
ফুল দিয়ে সাজায়েছে কী পবিত্র সাজে।
স্বাধীনতা দিবসেতে দেখি রাজধানী
সৈন্য চলে কত শত হাতী ঘোড়া কত মত
আলোমালা পরে যেন সাজে রাজ রাণী।
রোজ কত কি সে দেখি মনের পাতায় লিখি
চিরদিন তরে মনে ছবি আঁকা রয়
ঘরে ফিরি ক্ষণে ক্ষণে সেই ছবি ভাসে মনে
তার সাথে সকলেরই স্মৃতি মিশে রয়॥

যুক্তিবাদী দার্শনিক বার্ট্র্যাণ্ড রাসেলের দৃষ্টিতে দাম্পত্য মিলনের রীতি ও নীতি।

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক বার্ট্র্যাণ্ড রাসেল মানব দরদীও বটেন। পৃথিবীর যেখানে যখন কোন ব্যক্তির বা জাতির প্রতি অবিচার হয়েছে সেখানেই তাঁর বজ্র কণ্ঠে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। গণিত কিংবা দর্শনে তাঁর দানের তুলনা নেই। তাঁর রচিত হিষ্ট্রি অব ওয়েষ্টার্ণ ফিলোজফি তাঁকে পৃথিবীতে সব চেয়ে বেশী সম্মান দিয়েছে; আর দিয়েছে অর্থ আবার অপর দিকে তাঁর "ম্যারেজ এণ্ড মর্যালস্' গ্রন্থ বিতর্কের ঝড় তুলেছে সারা জগতে। তাঁকে তার জন্যে স্থানে স্থানে অপদস্থও হতে হয়েছে।

এ-গ্রন্থের সূচনায় রাসেল লিখেছেন:—

কোনও প্রাচীন বা আধুনিক সমাজের লক্ষণাবলী বিচার করতে গেলে দুটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পরস্পর ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পর্কযুক্ত বিষয়ের কথা প্রথমে ভাবতে হবে: একটি হচ্ছে অর্থ নৈতিক অপরটি পারিবারিক ব্যবস্থা। বর্তমান কালে দুটি প্রভাবশালী মতবাদ রয়েছে। একটির ভিত্তি অর্থ নৈতিক অবস্থা, অপরটির ভিত্তি পরিবার বা জনন ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথমটির প্রবক্তা মার্কস্ দ্বিতীয়টির ফ্রয়েড। আমি এ দুয়ের কোনটিরই অনুবর্তী নই। কারণ আমার কাছে অর্থ নীতি ও জনন ব্যবস্থার পারস্পরিক সম্পর্কে নিমিত্ত হিসাবে একের চেয়ে অপরের প্রাধান্য প্রতীয়মান নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলছি: শিল্পবিপ্লব অবশ্যই যৌন-নীতির উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে; অথবা বিপরীতভাবে ভাবলে বলা যায় পবিত্রতাবাদীদের যৌন বিষয়ক শুদ্ধাচার অংশত: শিল্প বিপ্লবের নিমিত্ত দায়ী। আমি নিজে অর্থনীতি বা জনননীতির কোনটির উপর গুরুত্ব দিতে প্রস্তুত নই। বস্তুত: পক্ষে এই দুই বিষয়কে নিখুঁত ভাবে বিচ্ছিন্ন করাও সম্ভব নয়। অর্থনীতির প্রধান লক্ষ্য খাদ্য সংগ্রহ। কিন্তু মানব সমাজে খাদ্যসংগ্রহ কেবল সংগ্রহকারীর ব্যক্তি গত কল্যাণের উদ্দেশ্যেই করা হয় না। পরিবারেরই উদ্দেশ্যেই তা হয়ে থাকে পারিবারিক অবস্থা যেমন বদলায়, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও পরিবর্তিত হয়।

প্লেটোর 'রিপাব্লিক' অনুসারে রাষ্ট্র যদি বাপমায়ের কাছ থেকে সন্তানদের নিয়ে গিয়ে তাদের লালন পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করে, তবে কেবল ইনসিওরেন্স নয় প্রায় প্রত্যেক রকমের ব্যক্তিগত সঞ্চয় যে প্রায় বন্ধ হয়ে যাবে তা অবশ্যই প্রতীয়মান। অর্থাৎ রাষ্ট্র যদি পিতার কাজ নিজের হাতে নিয়ে নেয়—দেশের সকল পুঁজিও রাষ্ট্রের হাতে চলে যাবে। পাকা কম্যুনিষ্টগণের মত এই যে রাষ্ট্র পুঁজি হাতে নিলে পরে এতাবৎকালের পরিবার বাঁচতে পারবে না। একে যদিও বেশী বাড়াবাড়ি বলে মনে করা হয়,—ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও পরিবারের মধ্যে যে নিবিড় পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে তা অস্বীকার করা যায় না। যদিও একটিকে অপরটির নিমিত্তও বলা যেতে পারে না।

সমাজের যৌন-নীতিজ্ঞান বিভিন্ন স্তরে রচিত। প্রথম হল: দেশের আইন সম্মত সমাজ ব্যবস্থা। যেমন কোন কোন দেশে এক বিবাহ আবার কোন কোন দেশে বহু বিবাহ। তার পরের স্তর হলো জনমত। আইন ইহাতে নাক গলায় না; কিন্তু জনমত বড় সোচ্চার। সকলের শেষে হলো ব্যক্তিগত অভিরুচিত স্তর—তত্ত্বের দিকে না হলেও বাস্তবিকতার দিক থেকে তো বটেই। সোভিয়েট রাশিয়া ছাড়া পৃথিবীতে এমন কোন দেশ নেই পৃথিবীর ইতিহাসে এমন সময় আসে নি যখন যৌন-নীতি এবং যৌন সমাজ ব্যবস্থা বিচার বুদ্ধির দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে। আমি এ বলছি না যে সোভিয়েট রাশিয়ায় সমাজ ব্যবস্থা এবিষয়ে সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে। আমি শুধু এই বলছি যে সেখানকার ব্যবস্থা—সর্বকালে সর্বদেশের ব্যবস্থার মত কিছুটা বা সংস্কার আর কিছুটা দেশাচার মিশিয়ে তৈরী হয় নি। কোন্ ধরনের

যৌন-নীতি সকলের পক্ষে সুখদায়ক ও মঙ্গল জনক হবে তা নির্ধারণ করার সমস্যা বড়ই জটিল। পারিপার্শ্বিক অবস্থা যত বিভিন্ন হবে তার সমাধানও হবে তত বিভিন্ন রকমের।

শিল্পে অগ্রসর সমাজের ব্যবস্থা আদিম কৃষি ভিত্তিক সমাজের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন হবে। সে-সমাজে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞান এত উন্নত যে মৃত্যু সংখ্যা হ্রাস পেয়ে গেছে, সেখানকার ব্যবস্থা, প্লেগ ও মহামারীতে যে সমাজে বয়ঃপ্রাপ্তির আগেই মৃত্যু ঘটছে তার চেয়ে ভিন্ন হতে বাধ্য। আমাদের আরও জ্ঞান বৃদ্ধি হলে হয়ত বলতে পারব যে সব চেয়ে ভাল যৌন নীতি ভিন্নভিন্ন আবহাওয়ায় এবং ভিন্ন ধরণের খাদ্য গ্রহণ কারীদের মধ্যে বিভিন্ন রকমের হবে।

যৌন নীতির প্রভাবও ব্যক্তি,দম্পতি, পরিবার, জাতি, ও আন্তর্জাতিক জীবনের উপর বিভিন্ন রকমের। এও সম্ভব হতে পারে যে প্রভাবটা এদের কতকগুলির উপর ভাল হবে অপর কতগুলির উপর মন্দ হবে। কোন বিশেষ ধরণের রীতি সম্বন্ধে কিছু মতামত স্থির করার আগে সব কিছুই বিচার করে দেখতে হবে। একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে আরম্ভ করা যাক—মনোবিশ্লেষণ যে সব প্রভাবের কথা বিচার করে সে-সকলই আসবে। এখানে যে আমাদের শুধু বয়ঃপ্রাপ্তদের নীতি প্রভাবিত চালচলন বিচার করলেই চলবে তা নয়। বাল্যকালে যে শিক্ষায় নীতি মেনে চলার স্পৃহা জন্মে তা'কেও ধরতে হবে। আর এই ব্যাপারে সবাই জানে—বাল্যকালে ধর্মীয় নিষেধের প্রভাব কৌতূহলপ্রদ এবং পরোক্ষ। এই বিষয়ের এই ভাগটিতে আমরা ব্যক্তিগত কল্যাণের স্তরে রয়েছি। আমাদের সমস্যার পরের ধাপ হচ্ছে—নর নারীর পরস্পর সম্পর্কের বিচার। ইহা পরিষ্কার স্পষ্ট যে কয়েক ধরণের যৌন সম্পর্ক অন্য ধরণের সম্পর্কের চেয়ে অধিকতর মূল্যবান্। বেশীর ভাগ লোকই স্বীকার করবেন যে অন্তরের যোগযুক্ত যৌন সম্পর্ক শুধু দেহগত সম্পর্কের চেয়ে অনেক ভাল। ভালোবাসার মানুষেরা পরস্পরের জীবনে যত বেশী সম্পৃক্ত হবে ততই ভালোবাসার মূল্য বেড়ে যাবে, কবিপরম্পরা এই মতবাদ সভ্য নর-নারীর চিত্ত অধিকার করে আছে। কবিরাও জনগণকে শিক্ষা দিয়েছেন প্রেমের তীব্রতা বুঝে তার মূল্যায়ন করতে। এ অবশ্য বিতর্কমূলক বিষয়। প্রায় সকল আধুনিক আধুনিকাই স্বীকার করবেন যে প্রেমের সম্পর্ক সমভাবযুক্ত হওয়া উচিত। অন্য কারণে না হোক বিশেষ করে এই কারণেই বহুবিবাহকে আদর্শ ব্যবস্থা হিসাবে গণ্য করা যায় না। এই বিষয়ের এইভাগে বিবাহ ও বিবাহ-বহির্গত যৌন সম্পর্কের বিচার হওয়া প্রয়োজন। কারণ বিবাহের যে রীতিই চালু থাকুক না কেন—বিবাহ বহির্গত যৌন সম্পর্কও অনুরূপ ভাবেই ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।

এরপর আমরা পরিবারের প্রশ্নটি আলোচনা করব। নানাকালে ও নানা দেশে বিভিন্ন রকমের পরিবার গোষ্ঠী বর্তমান ছিল। কিন্তু পিতৃতান্ত্রিক পরিচারের গুরুত্বই ছিল বেশী। প্রাক্ যীশু যুগ থেকে পাশ্চাত্য দেশগুলিতে যে ধরণের যৌননীতি বর্তমান ছিল তাতে নারীর পবিত্রতার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হত। কারণ পিতৃত্ব সম্বন্ধে নিশ্চয়তা না থাকলে পিতৃতন্ত্র শাসিত পারিবারিক ব্যবস্থা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে মুনিত্ব থেকে উদ্ভূত পুরুষের পবিত্রার উপর খৃষ্টান ধর্মের গুরুত্ব আরোপ। বর্তমান কালে মুক্তিপ্রাপ্ত নারী জাতির ঈর্ষ্যায় তার উপর আরও বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। আপাতঃ-দৃষ্টিতে বিচার করলে মনে হবে দ্বিতীয় বিষয়ের গুরুত্ব অস্থায়ী মাত্র—কারণ নারী পবিত্রতার দায় যা সে নিজে এতদিন বহন করে এসেছে তা পুরুষের উপর চাপিয়ে না দিয়ে উভয়ের স্বৈরাচারেরই পক্ষপাতী হবে।

একবিবাহ ব্যবস্থা যে সমাজে রয়েছে, সেখানেও রয়েছে অনেক বৈচিত্র্য। যেমন বিবাহ অথবা তাদের পাত্রপাত্রী বাবা মায়ের দ্বারা স্থিরীকৃত হতে পারে।—কোন-কোন দেশে ক'নেকে কেনা হয়ে থাকে। অপরাপর দেশে যেমন ফরাসীতে বরকে কেনা হয়ে থাকে। তারপর রয়েছে বিচিত্র রকমের বিবাহ বিচ্ছেদের পদ্ধতি। ক্যাথলিক সম্প্রদায়ে বিবাহবিচ্ছেদ নিষিদ্ধ। আবার প্রাচীন চীন সমাজে স্ত্রী বেশী কথা বললেই বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যেত। জীব-জানোয়ার ও মানুষের সমাজ যাদের বংশরক্ষার্থে সন্তান পালনার্থে পুরুষের সাহায্য প্রয়োজন হয় তাদের মধ্যে দাম্পত্য স্থিরতা বা প্রায়স্থিরতা স্বভাবতই গড়ে উঠে।

পাখীদেরও অনেক সময় ডিমে তা দিতে খরচ হয়ে যায়—দিনের অনেক সময় কেটে যায় খাদ্য সংগ্রহে। দুটো কাজ একই পাখীর পক্ষে করা অনেক সময় অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই পুরুষ পাখীর সাহায্য একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়ায়। তার ফলে অনেক পাখী পবিত্রতার আদর্শ স্বরূপ। মানব জাতির মধ্যে পিতার আনুকূল্য সন্তানের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক বিশেষ করে উচ্ছৃঙ্খল সমাজে চাঞ্চল্যের যুগে। কিন্তু আধুনিক সভ্যতার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পিতার দায়িত্ব রাষ্ট্রের হাতে চলে যাচ্ছে। কালে সমাজে, বিশেষ ভাবে মজুর সমাজে পিতৃত্বের দেহগত উপযোগিতা একেবারে হারিয়ে যাবে একথা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। এযদি ঘটে তাহলে দেশাচার গত নৈতিকতা সম্পূর্ণরূপে ধ্বসে পড়বে। কারণ তখন আর এমন কোন হেতু থাকবে না যার জন্যে নারী তার সন্তানের পিতা সম্পর্কে নিশ্চিত পরিচয় দেবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবে। প্লেটো আমাদের আরও এক ধাপ এগিয়ে যেতে হয়ত বলে থাকবেন, শুধু পিতৃত্ব নয়, মাতৃত্বের দায়িত্বও রাষ্ট্রের হাতে দিয়ে। আমি নিজে রাষ্ট্রের স্তাবক নই, অনাথ আশ্রয়ের আনন্দেও আমি পুলকিত হই না; তাই এই ব্যবস্থার আমি উৎসাহী সমর্থক নই কিন্তু এও অসম্ভব নয় যে অর্থনৈতিক প্রভাবে এ ব্যবস্থার কিছুটা সমাজে গৃহীত হবে।

আইন যৌন সমস্যা নিয়ে দুটি ভিন্নভাবে জড়িত। একদিকে তাকে সমাজে প্রচলিত যৌননীতিকে বলবৎ করতে হচ্ছে, অপরদিকে জননের ক্ষেত্রে ব্যক্তির সাধারণ অধিকার তাকে রক্ষা করতে হবে। শেষোক্ত বিষয়টির দুটি প্রধান বিভাগ রয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে নারী ও অপ্রাপ্ত-বয়স্কদের দুর্বৃত্তের অত্যাচার থেকে রক্ষণ, অপরটি হচ্ছে যৌন ব্যাধির দমন। সচরাচর এ দুয়ের কোনটিই তাদের গুণবিচারে পরিবেবিত হচ্ছে না। এই কারণে উভয়ই যথাযোগ্য কার্যকারী যত্ন থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। প্রথমটি সম্পর্কে উন্নত অভিযান শ্বেতাঙ্গিনী নিয়ে পাপব্যবসায় রোধের আইন পাশ হয়েছে যা সহজেই পেশাদার পাপ-ব্যবসায়ীরা লঙ্ঘন করে যাচ্ছে—আর নিরীহ লোকেদের বঞ্চনা করার সুযোগ পাচ্ছে। দ্বিতীয়টি সম্বন্ধে দেখা যাচ্ছে —যৌনব্যাধিকে পাপের ফল রূপে গণ্য করাতে, চিকিৎসা বিজ্ঞান অনুসারে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত তাতে বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে, তারপর যৌনব্যাধি লজ্জাজনক এই সাধারণ মনোবৃত্তি বশতঃ তাকে গোপন রাখার চেষ্টা চলছে তাই চিকিৎসা ত্বরান্বিত হচ্ছে না—বা সুষ্ঠুরূপে হচ্ছে না।

এরপর আমরা জনসংখ্যার কথা আলোচনা করব। এতো একাই একটা বিরাট বিচারের বিষয় যাকে বিভিন্ন দৃষ্টি কোণ থেকে দেখতে হবে। বিচার করতে হবে মাতার স্বাস্থ্যের প্রশ্ন—সন্তানের স্বাস্থ্যের প্রশ্ন—সন্তানদের উপর বড় বা ছোট পরিবারের চিত্ত সম্পর্কিত প্রভাবের প্রশ্ন। এ-সকলকে এক কথায় স্বাস্থ্য বিষয়ক সমস্যা বলা যেতে পারে। এর পর আসছে ব্যক্তিগত বা সমাজগত অর্থ-নৈতিক অবস্থার কথা;—প্রত্যেক পরিবারের কর্তা পিছু আয়ের প্রশ্ন, আর পরিবারের অবতন ও ও্যহারের সঙ্গে সমাজের আয়ের সম্পর্ক। জন্মসংখ্যার সমাসার সঙ্গে আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও বিশ্বে শান্তির প্রশ্নও ঘনিষ্টভাবে জড়িত। সকলের শেষে আসছে বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন ধরণের জন্মহার মৃত্যুহার বশতঃ জন্মদানে উৎকর্ষ বা অপকর্ষ সাধনের সমস্যা। কোনও প্রকারের যৌন নীতি উপরি লিখিত বিষয়ে বিবেচিত না হয়ে উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট বলে নিশ্চিতরূপ গণ্য হতে পারে না। সংশোধনবাদীই হোন আর প্রতিক্রিয়াশীলই হোন, এ-সমস্যার একটি বা দুটি মাত্র দিক তাঁরা বিবেচনা করতে অভ্যস্ত। ব্যক্তিগত ও রাজ-নৈতিক মতবাদের একত্র মিলন বড় একটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। একটি অপরটির চেয়ে অধিক গুরুত্ব পূর্ণ, একথা বলাও সম্ভব নয়। যে ব্যবস্থা ব্যক্তিগত ভাবে উৎকৃষ্ট বলে বিবেচিত হবে, তা রাজনৈতিক ভাবেও তেমনি হবে বা তার বিপরীত হবে তা পৌর্বাপর্য্য বিবেচনা না করে নিশ্চিত হওয়া যায় না।

আমার নিজের বিশ্বাস—প্রায় সর্বকালে ও সর্বদেশে অস্পষ্ট মনস্তাত্বিক প্রভাবের দরুণ মানুষ এমন সব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে যা অপ্রয়োজনীয় নিষ্ঠুরতায় পর্যবসিত হচ্ছে। আজকের দিনের সবচেয়ে বেশী সভ্য সমাজের সম্পর্কেও একথা খাটে। এও আমি বিশ্বাস করি যে চিকিৎসা বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে উন্নতি ব্যক্তিগত ও সমাজগত দিকে থেকে যৌন নীতির পরিবর্তন আকাঙ্ক্ষণীয় করে তুলেছে,—আর শিল্প বিষয়ে রাষ্ট্রের ক্রমবর্দ্ধমান কার্য-

বিস্তার, আগে যা বলেছি, সমগ্র ইতিহাসে পিতা যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় ভাস্বর ছিলেন, তাকে ম্লান করে দিয়েছে। বর্তমান কালের যৌন নীতির সমালোচনায় আমাদের দুটি কর্তব্য রয়েছে। একধারে আমাদের ছিন্ন করতে হবে অবচেতন মনে স্থিত কুসংস্কারের বেড়াজাল, আর অপর দিকে সে-সকল নূতন বিষয়ের বিচার করতে হবে যাতে অতীতের সকল প্রজ্ঞা বর্তমান কালের বিজ্ঞতায় রূপায়িত না হয়ে মূঢ়তায় পর্যবসিত হয়েছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সমাজে বিভিন্ন সময়ে কোথায়ও মাতার প্রাধান্য কোথায় বা পিতার প্রাধান্য দেখা গিয়েছে। মাতৃ-প্রাধান্যই মাতৃতান্ত্রিক সমাজের সৃষ্টি করেছে। সে-সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে রাসেল লিখেছেন—

"বিবাহের রীতি-নীতি তিনটি যৌন বিষয়ের সংমিশ্রণে রূপ লাভ করেছে। তারা হচ্ছে সাধারণ ভাবে সহজাত প্রবৃত্তি, আর্থিক অবস্থা ও ধর্ম। দোকান যে রবিবারে বন্ধ থাকে তার কারণটা হচ্ছে ধর্মজাত কিন্তু আজ এটা একটা অর্থনৈতিক বাস্তবে রূপায়িত। যৌন সমস্যার সঙ্গেও ঠিক তেমনি অনেক আইন ও প্রচলিত রীতির সম্পর্ক রয়েছে। যে প্রয়োজনীয় সামাজিক রীতির জন্ম হয়েছে ধর্ম বিশ্বাস থেকে—সে ধর্মমতের অধোগতি হলেও সে রীতি বেঁচে থাকবে তার প্রয়োজনীয়তার জোরে। কোন্‌টা ধর্ম থেকে জাত। কোন্‌টা সহজাত প্রবৃত্তি থেকে জাত এর পার্থক্য বুঝতে পারা কঠিন। মানুষের কাজের উপর যে সকল ধর্মের প্রভাব বেশী তাদের মূলে রয়েছে সহজাত প্রবৃত্তির প্রবলতা।"

কিন্তু সভ্য সমাজে মাতৃতন্ত্র প্রাধান্য লাভ করতে পারে নি। পিতৃতন্ত্ররই শেষপর্যন্ত জয় হয়েছে। বার্ট্রাণ্ড রাসেল বলেছেন—যেই মাত্র কোন পিতা জানতে পারেন যে কোন শিশু তাঁর অর্থাৎ তাঁর ঔরসজাত, তার প্রতি দুটি কারণে তাঁর মন অনুরক্ত হয়,—ক্ষমতার প্রতি আসক্তি আর মৃত্যুকে অতিক্রম করার কামনা। কোনও মানুষের বংশধরদের সাফল্য বস্তুত তাঁরই সাফল্য।—বংশধরদের জীবনে তাঁরি জীবনের অবিচ্ছিন্ন বিস্তৃতি ক্ষমতার লালসাই পিতৃতন্ত্রের বিকাশে সাহায্য করেছে।

লিঙ্গপূজা, ব্রহ্মচর্য পালন ও পাপ সম্বন্ধে রাসেল অতি গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। যৌন বিষয়ে ধর্ম নেতাদের বিশেষ ঔৎসুক্যই লিঙ্গ পূজার জনক। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ধর্মের লোকেরা নিজেদের লিঙ্গ পূজারী বলে চিহ্নিত করতে চাইছে না।

আদিম মানুষ অপেক্ষাকৃত সভ্য মানুষের মত যৌন চর্চায় মত্ত ছিল না। তারা যৌন ক্লান্তিতে কখনও ভেঙ্গে পড়ত না। কিন্তু সভ্য মানুষের ক্ষুধার অন্ত নেই। তাই যৌন ক্লান্তিতেও তাকে ভুগতে হয়,—তার ফলে তার মধ্যে যৌন জীবনে বিতৃষ্ণা দেখা দেয়—সে তখন ব্রহ্মচর্যের বাণী প্রচার করে। কিসে পাপ কিসে পুণ্য সে প্রচারে সে মত্ত হয়। অপর দিকে যে সমাজে বহু ব্রহ্মচর্য পরায়ণ নর নারী কঠিন জীবনের ব্রত পালন করে—হঠাৎ কিন্তু যৌন পাপে লিপ্ত হতে দেখা যায়। পাদ্রী সাহেবদের, সন্ন্যাসিনীদের কুকাজের কাহিনীতে পশ্চিমের সাহিত্য পূর্ণ। এই দুই ধারার সংঘাতে ঘাতে প্রতিঘাতে খৃষ্টীয় যৌন নীতি রচিত হয়েছে ক্রমে ক্রমে। যৌন কার্যকে খৃষ্টান সন্তগণ পাপ-কার্য বলেই স্বীকার করেছেন। কিন্তু তবু কোন কোন সন্ত যেমন সন্ত পল উদার মনের পরিচয় দিয়েছেন, বলেছেন, দগ্ধ হবার চেয়ে বিয়ে করা ভাল। ক্যাথলিক সাধুগণ বিবাহ বিচ্ছেদকে বরদাস্ত করতে পারেন নি।

প্রেম সম্বন্ধে রাসেল বলেছেন—নর-নারীর জীবনে প্রেমের মূল্য অপরিসীম। সে প্রেম সম্বন্ধে অনবহিত থাকার মত বড় দুর্ভাগ্য আর নেই।

কিন্তু প্রেমের জীবনেও নীতির প্রশ্ন আছে। আর যৌননীতি গর্ভনিরোধক ঔষধ এবং নারী মুক্তির উদ্দামতায় ঘোরতর পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। আগেকার যুগের নারী মুক্তির আন্দোলন কারীরা চাইত—পুরুষকেও নারীর মত চেষ্টিটির নিয়ম মানতে হবে। কিন্তু এ যুগের আন্দোলন-কারীরা চাইছে—নারীকেও পুরুষের মত স্বৈরাচারের সুযোগ দিতে হবে।

যৌনজ্ঞানকে প্রাচীন কালের মানুষ গুপ্ত রাখতে চেয়েছে। সদাচারের প্রতারকগণ যৌন বিজ্ঞান প্রস্তাবে কখনও উৎসাহ দেন নি। ফলে যুগে যুগে মানুষের মনে যৌন বিষয়ে কেবল কৌতুকই রয়ে গেছে। আত্ম দমন বেড়ে গেছে। আর সুস্থ যৌন জীবন যাপনে ব্যর্থতা অনিবার্য হয়ে পড়েছে। তবু সকল বিঘ্ন সত্বেও এ অবস্থ

অনস্বীকার্য যে জীবনে প্রেমের মত মূল্যবান আর কিছু নেই। তেমনি বিবাহের মর্যাদাও মহত্ত্বপূর্ণ। কিন্তু নারী-মুক্তির বিভিন্ন পর্যায় প্রচলিত বিবাহ নীতিকে আঘাত হানছে।

পতিতাবৃত্তি. পরীক্ষামূলক বিবাহ সম্বন্ধেও রাসেলের মতামত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান যুগে পরিবার যে-সকল দুর্যোগের সামনে এসে পড়ছে তা থেকে সভ্য সমাজের মুক্ত হওয়া কঠিন। বর্তমান যুগের পরিবার ও রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক পরিবর্তিত হচ্ছে। এমন ব্যাপার ঘটছে—নারী মাতৃত্বের প্রতি ততটা অনুরক্তি দেখাচ্ছে না।

বিবাহ বিচ্ছেদ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে রাসেল আবার যৌন জীবনের উপযোগিতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। বিবাহ-জীবনে অভ্যস্ত নর-নারীকে যদি সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্মচারী হতে হয় তবে তা দুঃখজনক হয়ে উঠে—নারী বা পুরুষকে অকাল বার্ধক্য আক্রমণ করে। রাসেল দাম্পত্য-জীবনে অবিশ্বস্ততাকে বিবাহবিচ্ছেদের কারণ হিসাবে প্রাধান্য দিতে চান না। ইহাতে পৃথিবীর সব দেশের সব ধর্মের নীতিবাগীশরা আঘাত পেয়েছেন।

পৃথিবীর জন-ক্ষয় পুরণের পদ্ধতি হিসাবে বিবাহকে রাসেল স্বীকৃতি দিয়েছেন। কিন্তু পৃথিবীর যে দেশে নারী পুরুষের সংখ্যা সমান নয়, সে দেশে এক-বিবাহের প্রথা অসুবিধা সৃষ্টি করে। কোন কোন দেশে নারীর সংখ্যা অধিক হওয়াতে বহু নারীকে আজীবন অবিবাহিত থাকতে হয়েছে—তারা মাতৃত্বের আস্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। যদি সামাজিক প্রথায় অবিবাহিত নারীর মাতৃত্বকে স্বীকৃতি দেওয়া হত,, তবে অনেক নারী মাতৃত্বের স্বাদ লাভ করতে পারত। এক্ষেত্রে প্রাচীনতা-প্রবণ পণ্ডিতদের প্রশ্ন হচ্ছে—রাসেল তা হলে পুরুষের বহু-বিবাহকে মেনে নিলেন না কেন?

বংশের উন্নতি সাধন সম্ভব—ইউজেনিকস্ শাস্ত্র মেনে চললে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে কি কি অসুবিধা দেখা দিতে পারে রাসেল বিশেষভাবে তার আলোচনা করেছেন। আর সকলের শেষে, প্রগতির অদম্য গতিতে যদি পরিবার বন্ধন ভেঙ্গে যায়, তাহলে সেটা যে মোটেই সুখের হবে না, তাও রাসেল স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। প্রেমের মধুর রসে কি-রকমভাবে নর-নারীর দাম্পত্য জীবন পরম রমণীয় হতে পারে মনীষী রাসেল তারও সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্গাতা। বর্তমান যুগের দম্পতিরা রাসেলের প্রেমধর্মের মাধুর্য কতটা বুঝতে পারবেন, তা অবশ্যই বিচার করবার সময় এখনও আসেনি।

বন্দরের বন্ধন

অরুণকুমার দত্ত

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

আট

পোর্টাবেলায় এডিনবরা সিটির বন্দর। শহরের পূর্ব্বপ্রান্তে।

আর্ডেন হোটেল থেকে ইষ্টার্ণ জেনারেল হসপিটালের যাবার পথে একটা বিরাট মাঠ পড়ে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ফুটবল খেলছে, স্কিপিং করছে, পেরাম্বুলেটারে করে মা-রা তাদের দুগ্ধপোষ্য শিশুদের নিয়ে ঘুরছেন। ছেলেদের কেউ কেউ উইকেট সাজিয়ে ক্রিকেটের নেট-প্র্যাকটিশ করছে। কুকুর কোলে নিয়ে আধাবয়সী মেমসাহেবেরা মাঠের কোণায়, বাসরাস্তা থেকে বেশ দূরের একটা টিবির ওপরে বসে আদর করছে, চুমো খাচ্ছে আর কেউ কেউ লাল বল ছুঁড়ে কুকুরদের সঙ্গে খেলছে।

বিরাট মাঠটা পেরিয়ে গেলে সমুদ্রের তীর নজরে পড়ে।

সমুদ্র কিন্তু এখানে উচ্ছল নয়। শান্ত, সমাহিত। সমুদ্রের পরে অনেকটা বেলাভূমি। আর সমুদ্রের সেই চরে একগাদা সীগাল পাখী ডাকছে, উড়ছে, একে অপরকে ঠোকরাচ্ছে।

সীগালগুলোকে দেখলে চিলের কথা মনে পড়ে। এদের আকৃতি চিলের মত। পেটটা সাদা। ডানাগুলো পাটকিলে। এদের ডাকও চিলের মত। তবে ক্ষণস্থায়ী। চিলের মত অত করুণ আর দীর্ঘস্থায়ী নয়।

রাস্তাটার একদিকে সমুদ্র আর একদিকে বাড়ী। রাস্তাটার নাম সি সাইড রোড। ইষ্টার্ণ জেনারেল হাসপাতাল সে রাস্তায় পড়ে। হাসপাতালটার সামনে সমুদ্রের তটভূমিটা অনেক চওড়া হয়ে গেছে। আর সীগালগুলোর সংখ্যা এ-জায়গাতেই সবচেয়ে বেশী।

সীগাল সমুদ্রের পাখী। জাহাজে করে আসবার সময় শঙ্কর সীগাল দেখেছে লোহিত সাগরের কিনারায়। জাহাজ তাড়া করে তারা ফিরত খাবারের লোভে। সমুদ্রের কাছাকাছি এরা থাকে। গভীর সমুদ্রে কখনও এদের দেখা যাবে না। লোহিত সাগরের সীগালগুলোর গলার রং কিন্তু কৃষ্ণাভ এদের মত ব্রাউন নয়।

ইষ্টার্ণ জেনারেল হসপিটাল ছাড়িয়ে সী সাইড রোডটা এঁকে বেঁকে চলে গেছে সমুদ্রের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে।

তারপর সুরু হল পোর্টাবেলা।

ইনজিনীয়ারদের যাদুদণ্ডের স্পর্শে সমুদ্রের ধারের বন্দরে রকমারি বাড়ী, হোটেল, নতুন জনপদের সৃষ্টি করেছে।

পোর্টাবেলার সী বিচ। প্রমোনাড। অদ্ভুত সুন্দর ভাবে সাজান।

একদিকে শান্ত সমুদ্রের জল ছলাৎ ছলাৎ করে তটভূমিতে আছড়ে পড়ছে। জলের দশ বারো ফুট উচুতে জমি সিমেন্টে বাঁধান। লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা। প্রায় একমাইল চলে গেছে।

পোর্টবেলায় এডিনবরায় বন্দর। পোর্টাবেলা এডিনবরার স্বপ্ন। এডিনবরার গর্ব্ব। পোর্টাবেলার প্রমোনাড না দেখলে শঙ্করের জীবনের একদিক বোধহয় বাকিই থেকে যেত।

গরমের সময় এখানে মেলা বসে। দূর দূরান্ত থেকে ট্যুরিস্টদের আকর্ষণ করে নিয়ে আসে। আকর্ষণ করে এডিনবরার'। গ্লাসগোর অধিবাসীদেরও।

সমুদ্রের তীর ঘেঁসে বাড়ীর সারি। যেন একগাদা তাসের ঘর।

গরমের দিনে দুপুরে সমুদ্রে স্নান করতে আসে একগাদা নরনারী। বেশীর ভাগই যুবক যুবতী। বিকিনি পরে যুবতীরা সমুদ্রের বালির ওপরে অর্ধ নগ্ন হয়ে শুয়ে এলিয়ে রৌদ্রস্নান করে। গায়ের আপেল-লাল চামড়াটাকে তারা সান-ট্যান করে ব্রাউন করে নিতে চায়। ব্রাউন হবার জন্যে তাদের বড় সাধ। ক্যাটকেটে সাদাদের বড় এনিমিক মনে হয়। কিন্তু স্কটল্যাণ্ডের শান্ত রৌদ্রের নিষ্প্রভরশ্মিতে গায়ের চামড়া কতটা ডার্ক হয় কে জানে।

পোর্টাবেলার প্রমোনাডের কাছাকাছি এক জায়গায় সমুদ্রের কোল ঘেঁসে মিস ডেনহোমের বাড়ী।

মিস ডেনহোম উত্তর-সত্তর এক বৃদ্ধা। লোলচর্মা কিন্তু মুখে তার সবসময় হাসি লেগেই আছে।

মিস ডেনহোম খাঁটি স্কটিশ। তার জীবনে নাকি কোন পুরুষ কোনদিনই আসেনি। ডেনহোমের বাসায় এসে শঙ্করের স্কটিশ ল্যাণ্ডলেডিদের কৃপণতা সম্বন্ধে যে বদধারণা ছিল তা একেবারে ভেঙ্গে গেল।

মিস ডেনহোম অর্থের জন্যে পেয়িংগেষ্ট রাখেন না। রাখেন তার নির্জনতা, নিঃসঙ্গতা কাটাবার জন্যে।

শঙ্কর একটা আলাদা ঘর, কিচেন, টয়লেট পেল। খালি সকালের ব্রেকফাষ্ট মিস ডেনহোম করে দেবেন। আরসব শঙ্কর নিজে করবে। সপ্তাহে মাত্র দেড় পাউণ্ড করে দিতে হবে। এর চেয়ে সস্তা, ভাল ব্যবস্থা আর কি হতে পারে! পুরো স্বাধীনতা।

ইষ্টার্ণ জেনারেল হসপিটালে ওয়ার্ড রাউণ্ড দেবার জন্যে শঙ্কর যখন পরের দিন এসে পৌছাল তখন রৌদ্র-স্নাত সমুদ্রটাকে বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল। সীগাল পাখিগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে চীৎকার করছিল।

শঙ্করের হঠাৎ বাড়ীর জন্যে, দেশের জন্যে মন কেমন করতে লাগল। ইষ্টার্ণজেনারেল হসপিটালের প্রবেশ পথে 'সী ভিউ কাফে' বলে একটা রেস্তোরাঁতে বসে সে ভাবতে লাগল এক কাপ কফি হাতে নিয়ে। আর দূরের সমুদ্রের ওপর রৌদ্রের ঝিকিমিকি লক্ষ্য করতে লাগল।

—আজকে বড় ঠাণ্ডা তাই না? দোকানী ভদ্র-মহিলা শঙ্করের গা ঘেঁষে চেয়ার টেনে বসে বললেন আলাপ জমাবার জন্যে। এটা তার ব্যবসায়িক ষ্টাইল।

হাঁ, কিন্তু চমৎকার রোদ উঠেছে। সামনের সমুদ্রের জলে চকচক করছে সকালের সুন্দর রোদ। সীগালের ডানাগুলোয় ঝলমল করছে সকালের মিষ্টি রোদ। আপনার দোকানটা বড় সুন্দর পজিসনে।

দোকানের প্রশংসায় দোকানী ভদ্রমহিলা মিসেস ব্রাউন গলে গেলেন। তারপর বললেন—আপনি ডাক্তার বুঝতে পারছি। ইষ্টার্ণ জেনারেল হসপিটালে আসার পথে আপনার দেশের অনেকে আমার দোকান থেকে স্ন্যাক নিয়ে খায়। সমুদ্রটা এখান থেকে বেশ ভালই নজরে আসে।

—সমুদ্র দেখলে কিন্তু আমার বাড়ীর কথা মনে পড়ে যায়।

কথা আর বেশী এগোল না। কাফে থেকে বেরিয়ে শঙ্কর হসপিটালের দিকে এগোল। মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে হসপিটালের গেট।

গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকে শঙ্কর দেখল বিরাট বাগান। পাশের ঘাসের ওপর মরশুমী ফুল লাগান হয়েছে। কিন্তু হাওয়াটা কি ঠাণ্ডা। ওভারকোট ভেদ করে মোজার ভেতর দিয়ে ধারাল ছুঁচের মত শরীরে ফুটছে। তার মাথার টুপিটা উড়ে যাচ্ছিল। শঙ্কর হাত দিয়ে চেপে ধরল।

বিপরীত দিক থেকে গাঢ় নীল পোষাক, মাথায় তিনকোণা সাদাটুপি, কোমরে সাদা বেল্ট-সটকান এক সিষ্টার আসছিলেন। শঙ্কর ভাবল একে ডেকে জিজ্ঞেস করে ডাঃ বার্ণেসের ওয়ার্ড কোথায়। সে তাই করলও। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! ভদ্রমহিলা চটে গিয়ে শঙ্করের মাথার দিকে কটমট করে তাকাতে লাগলেন। তারপর দ্রুত পা চালিয়ে, কথার জবাব না দিয়ে চলে গেলেন।

কোথায় কি গণ্ডগোল হয়েছে বুঝতে না পেরে শঙ্কর ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল।

যাইহোক সে হসপিটালে বিল্ডিংয়ের ভেতর ঢুকল। তারপর দরজার পাশে গাইড বোর্ড দেখে ডাঃ বার্ণেসের সঙ্গে দেখা করল।

ছফিটের ওপর লম্বা, টাক মাথা, ডঃ বার্ণেস শঙ্করকে আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করে বললেন সাদা ডকটরস কোট

পরে এস আমার সঙ্গে ওয়ার্ড রাউণ্ডে।—ইউ হ্যাভ টু টিচ্ ইয়োরসেলফ। ট্রাই টু লুক এরাউণ্ড টু দোস্ লিভিং মিউজিয়াম। দে উইল গিভ ইউ ক্লু। ইউ ক্যান সি ইফ্ ইউ নো দি সাবজেক্ট।

হসপিটালের ডাইনিং রুমে লাঞ্চ খেতে বসে আবার দেখা হল ডাঃ সানাই পোদ্দারের সঙ্গে। সেও ইষ্টার্ণ জেনারেল হসপিটালে মাঝে মাঝে ক্লিনিক করতে আসে।

শঙ্কর ডঃ বার্ণসের ওয়ার্ডে কাজ করছে শুনে সানাইবাবু বললেন আরে ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন। ডাঃ বার্ণস এমন বদরাগী আর কটুভাষী যে দুদিনে আপনার জীবন বিষময় হয়ে যাবে।

শঙ্কর চুপ করে রইল। সে বুঝেছিল এডিনবরায় এরকম দুচারজন ছেলে আছে যারা খালি সকলকে নিরুৎসাহ করে দেয়। এদের সঙ্গ ত্যাগ করতে হবে। তাই সে আর বেশী কথা বাড়াল না।

বিকেলে ফিরে এসে শঙ্কর পোর্টাবেলার প্রমোনাডের দিকে ছুটল। কিসের যেন টানে। পোর্টাবেলা তাকে হাতছানি দিচ্ছে সমুদ্রের তরঙ্গে, বালির ঝিকিমিকিতে অশান্ত হাওয়ার দাপাদাপিতে। কিসের আকর্ষণে কে জানে?

মিস ডেনহোম তাকে মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করতেন ডঃ মিট্রা, তুমি রোজ রোজ সমুদ্রের ধারে যাও কেন? কোন গার্লফ্রেণ্ড পেয়েছ নাকি সেখানে?

হেসে শঙ্কর জবাব দিত না,—মিস ডেনহোম। পোর্টাবেলার সমুদ্রের জলে আমি আমার দেশের হাওয়া খেতে যাই।

সে কি?

হ্যাঁ, মিস ডেনহোম। এই নর্থসীর জল মিশেছে আটলান্টিকের সঙ্গে। আটলান্টিক, মেডিটারেনিয়ান সীর সঙ্গে। মেডিটারেনিয়ান রেডসীর সঙ্গে। রেডসী, আরাবিয়ান সীর সঙ্গে। সেই আরব সমুদ্রের জল আমার দেশের মাটিতে ধাক্কা দিচ্ছে। তাই পোর্টাবেলার সমুদ্রের জলের ধারে বসে আমি জলের সঙ্গে একটা নিবিড় আত্মিক সংযোগ খুঁজে পাই।

—মিট্রা, তুমি এখনও হোমসিক রয়েছ। আমাদের 'স্কচ হ্যাগিস'ত খেলেই না। স্কটিশ কিস্ট ড্যান্স ত দেখলেই না। খালি সবসময় দেশের কথা ভাবছ। এরকম মনমরা হয়ে থাকলে চলবে কি করে? এখন তোমাদের কাঁচা বয়স। যাও স্ফুর্তি কর গিয়ে।

এইরকম একদিন পোর্টাবেলার প্রমোনাডে বসে আছে শঙ্কর। লম্বা প্রমোনাডের একেবারে কোণার বেঞ্চিতে।

শীত এসে গেছে বলে লোকজনের ভীড়ও কমে গেছে আজকাল। সন্ধ্যার অন্ধকার তখন নেমে এসেছে। তীরের বাড়ীগুলো, হোটেল, কাফে, রেস্তোরাঁগুলো আলোর মালায় দীপান্বিতা। হাওয়ার বেগটায় তত জোর নেই। সমুদ্রের ধারটা সহরের তুলনায় উষ্ণতর। সেজন্য শঙ্করের বসে থাকতে কষ্ট হলেও অসহ্য মনে হচ্ছিল না।

কুড আই বরো ইয়োর বক্স অফ ম্যাচেস্, প্লিজ্—

মুখ ফিরিয়ে দেখে শঙ্কর, এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক তাকে জিজ্ঞেস করছেন। তার ঠোঁটে একটা মোটা চুরুট।

শঙ্কর তাকে সিগারেট লাইটার জ্বালিয়ে এগিয়ে দেয়। চুরুটটা ধরিয়ে তিনি বলেন,—বসতে পারি?

হ্যাঁ বসুন না।

ভদ্রলোকের গায়ের রং পেতলের ঘড়ার মত উজ্জ্বল। মনেহয় আরবের কি আফগানিস্তানের লোক। চেহারায় ব্যক্তিত্বের ছাপ। চোখে পুরু লেন্সের চশমা। চুলে দুচারটে শুভ্রতার ঝিলিক। কিন্তু বেশবাস কিরকম বিস্রস্ত। আপনি ইণ্ডিয়ান না পাকিস্তানী—মাপ করবেন ব্যক্তিগত প্রশ্নে। ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করেন।

—না তাতে কি হয়েছে?

আমি ইণ্ডিয়ান। কলকাতার লোক। ডাক্তারি পাশ করে এখানে এম, আর, সি, পি পড়তে এসেছি। আমার নাম শঙ্কর মিত্র।

আমি পাঞ্জাবের লোক। নাম উধম সিং বলে তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন। করমর্দনের পালা শেষ হলে তিনি বললেন—এম, আর, সি, পি, এই চারটে অক্ষরের জন্যে আমিও জীবনের অনেকটা সময় ব্যয় করেছি একদিন, তা জানেন?

ও আপনিও ডাক্তার?

হ্যাঁ আমি এডিনবড়া কাউন্টি কাউনসিলের অ্যাসিস্টেণ্ট পাবলিক হেল্থ অফিসার। কিন্তু সে কথা

থাক। আপনাকে এর আগে কখনও এখানে দেখিনি। আমি অথচ প্রায়ই আসি এখানে। এই বেঞ্চটাতে বসে বসে সমুদ্রের ঢেউ গুনি।

কেন? শঙ্করের মুখ দিয়ে ফস করে বেরিয়ে গেল। বলেই বুঝতে পারে বড অন্যায় হয়েছে এরকম বেয়াদব প্রশ্ন করে।

পরক্ষণেই বলে মাপ করবেন, এত ব্যক্তিগত প্রশ্নকরা আমার উচিত হয়নি।

ভদ্রলোক কিন্তু কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। তারপর আপন মনে বিড় বিড় করে বলতে আরম্ভ করলেন কেন? তাইত। আচ্ছা ওই যে বড় ঢেউটা আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে ওকে লক্ষ্য করুন। দেখুন ঢেউটা আমাদের নীচের বালির ওপর আছড়ে ভেঙ্গে গেল। এরকম আরও অনেক ঢেউ···হাজার হাজার, লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি ঢেউ আসবে তীরের ওপর আছড়ে পড়বে। চুরমার হয়ে যাবে। কিন্তু ওই যে একটা বিশেষ ঢেউ আমাদের পায়ের তলায় তার বিশেষ ভঙ্গীতে ভেঙ্গে পড়ল তার কথা কি আপনি কখনও মনে রাখবেন?

—আপনি ভাববেন, দেখবেন সামগ্রিকভাবে সমুদ্রের সত্তাকে; সৌন্দর্য্যকে, কিন্তু ওই বিশেষ ঢেউটার কথা ভুলে যাবেন।

আমাদের জীবনে ঘটনার ঢেউগুলোও ওইরকম মস্তিষ্কের বেলাভূমিতে আছাড় পড়ছে। কিন্তু কটায় কথা আর আমরা মনে রাখি। ঢেউয়ের পর ঢেউ ভেঙ্গে ভুলিয়ে দেয় আমাদের টুকরো টুকরো বিচ্ছিন্ন ঘটনার স্মৃতিগুলোকে —কিন্তু মনে করুন একটা বিরাট, ব্যাপক, বিশাল ঢেউ যদি ওই সী বিচ পেরিয়ে এই লোহার রেলিং ছাড়িয়ে আপনাকে ডুবিয়ে দেয়, আছাড় মারে, তাহলে—তাহলে— আপনি কি ভুলতে পারবেন; তার কথা? নিশ্চয়ই আপনার চিরদিন মনে থাকবে। পোর্টাবেলার প্রমোনাডে আপনাকে একদিন নর্থসীয়ের একটা ঢেউ আছাড় মেরেছিল। লোকের কাছে গিয়ে বলবেন তার কথা। সেই ঘটনার কথা। কেঁপে ভেঙ্গে গেল উধম সিংয়ের সংলাপগুলো।

থামলেন না তিনি। শঙ্করের মত নির্ব্বাক শ্রোতা পেয়ে ডাঃ উধম সিং উজাড় করে দিলেন তার অবচেতন মনের ব্যথাভরা ঘটনাগুলোর কথা যা তার স্মৃতিতে চিরকাল লেগে রয়েছে। এবং থাকবে।

—আমি উধম সিং। জাতিতে শিখ, জলন্ধরের আমার বাড়ী। অমৃতসর থেকে ডাক্তারি পাশ করে আমি কয়েক বছর দেশে প্র্যাকটিস করি। তারপরে যুদ্ধোত্তর পর্ব্বে যখন ইংল্যাণ্ডে 'ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস' চালু হয়েছে তখন বিলেতে আসি।

এডিনবরায় ডি, পি, এচ্ কোর্সে ভর্ত্তি হই আমি। পোর্টাবেলায় এক সামারে এই সী বিচের ধারে একদিন পাইচারি করছি। এই প্রমোনাডসেদিনওএই রকমই ছিল। সামারের দুপুর। অত্যন্ত মনোরম আবহাওয়া। সে বছর আবার লংসামার চলছে। দলে দলে নরনারীরা পোর্টাবেলার সমুদ্রের তীরে ভীড় করেছে।

সামারের মেলা বসেছে। চারিদিকে রকমারি দোকানে চটকদার পণ্যসামগ্রী। কোথাও তাসের খেলা। লাফি ট্রিপ ট্রাই ইয়োর লাক্, ইত্যাদি। কোথাও বা আবার সী-স, মেরী গো রাউণ্ড চলছে।

আমি সে সব ছেড়ে যেখানে বিংগো খেলা চলছে সেখানে গেলাম।

চারিদিকে গোল হয়ে বসে আছে খেলোয়াড়রা। মাঝখানে ঘোষক নম্বর ডেকে ডেকে যাচ্ছে।

আমিও খেলছি। কিন্তু খালি হারছি।

এমন সময় পেছনে এসে দাঁড়ালেন মিস আইলিন পেজ। মধুর স্বরে বললেন, মনে হচ্ছে আপনি নতুন খেলতে এসেছেন। খেলার কায়দাকানুনগুলো জানেন না। সেজন্যে হেরে যাচ্ছেন। আমি কি আপনাকে সাহায্য করতে পারি?

সেই থেকে পরিচয়, সেই পরিচয় প্রেমে পরিণত হল।

আইলিনের বাড়ী আবর্ডিনে। তার বাবা সেখানে জেলেরা যে ট্রলার নিয়ে সমুদ্রে মাছ ধরতে যেত সেই ট্রলার সারানোর ইন্‌জিনীয়ার ছিলেন।

আইলিনের সঙ্গে প্রায়ই এসে এসে এই সমুদ্রের ধারে এই বেঞ্চিতে বসতাম। সে এডিনবরায় 'ফিসারি' সম্বন্ধে পড়তে এসেছিল।

ডি, পি, এচ পড়তে আমাদের এডিনবরার 'আবার

হাইজিন ইনষ্টিটিউটে থেকে ৮০। এডিনবার রয়াল ইনফরমারির পেছনকার মাঠটা পেরিয়ে।

বিকেলে ক্লাশ করে যখন ফিরতাম তখন আইলিন তার মিনিকার নিয়ে মিডোর ধারের পার্কে অপেক্ষা করত আমার জন্যে। সেখান থেকে পোর্টাবেলার সী বিচ দশমাইল দূর। কিন্তু আমরা আসতাম পার্টাবেলাতে, আমাদের প্রথম মিলন স্থানে।

আইলিনের কথায় আমি গোঁফ, দাড়ি, পাগড়ী সব ত্যাগ করলাম।

ডি, পি, এচ্‌ পাশ করার পর আইলিনকে আমি রেজেষ্ট্রী করে বিয়ে করলাম।

দেশে ফিরে এলাম। ভারত তখন শিশু রাষ্ট্র। স্বাধীনতার তোরণদ্বার পেরিয়ে বাইরের রাস্তায় হামাগুড়ি দিচ্ছে।

কোন ভাল চাকরী পেলাম না; যা দিয়ে আমরা ভদ্রভাবে গ্রাসাচ্ছাদন করতে পারি। বড় মুস্কিলে পড়লাম। সবাই বলতে লাগল এম, আর, সি, পি করে এস; না হলে ভাল স্কোপ পাবেনা এখানকার বাজারে।

আরও মুস্কিল হল দাড়ি, গোঁফ কামিয়ে ফেলার জন্যে আমার ওপর আমার সম্প্রদায়ের, সমাজে লোকেরা চটে গেলেন। তারা আমাকে সমাজের অপাংক্তেয় করে দিলেন।

বাধ্য হয়ে আমরা ফের এডিনবরায় ফিরে এলাম। আমি এম, আর, সি, পির চেষ্টা করে যেতে লাগলাম।

দেশ থেকে আসবার সময়ে একগাদা নাইলন শাড়ী কিনে এনেছিলাম। আইলিনের শ্বেত অঙ্গে নীল নাইলন বড় সুন্দর মানাত।

আইলিন দেশ থেকে শিক কাবাব, কোর্মাকারি ইত্যাদি দেশীয় খাবার তৈরী করতে শিখে এসেছিল। সে সবের ফর্মুলাগুলো তার সঙ্গেই ছিল।

আমি তখন্‌ এম, আর, সি, পি, পরীক্ষা দিচ্ছি। এডাম হাউসে বসে। হলে এসে পুলিশের লোক খবর দিল আপনার স্ত্রী সাংঘাতিক ভাবে দগ্ধ হয়ে রয়াল ইনফরমারিতে ভর্ত্তি হয়েছেন।

এডামস হাউসের সামনেই রয়াল ইনফরমারি। তাড়াতাড়ি ছুটলাম সেখানে। সব শুনলাম। নীল নাইলন শাড়ীটা পরে গ্যাস্‌ উনুনটার সামনে দাঁড়িয়ে আইলিন শিক কাবাব তৈরী করছিল। খেয়াল ছিলনা কখন উড়ে-পড়া শাড়ীর প্রান্ত দেশ ওভেন স্পর্শ করেছেন।

নাইলন শাড়ী শরীরের সৌন্দর্য্য বাড়াতে পারে কতটা জানিনা. কিন্তু আগুনের লেলিহান শিখা দ্রুততালে এগিয়ে দিতে পারে অনেক বেশী। তাই হল। ফশ করে সমস্ত শাড়ীটা জ্বলে গেল। আর্ত্ত চীৎকারে প্রতিবেশীরা যে যখন তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলেন তখন বড্ড দেরী হয়ে গেছে।

জ্ঞান ফিরে আসতে আইলিন বলেছিল মরার পরে তুমি আমাকে পোর্টাবেলার ধারে কবর দিও। সেখানেই তোমার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ।

তাই করেছিলাম। কাছের ওই সিমেট্রিতে আইলিন শুয়ে আছে। পোর্টাবেলার সমুদ্রের ফিসফিসে হাওয়ায় তার কথা স্পষ্ট শুনতে পাই···এইত, আমি তোমার পাশে বসে রয়েছি। বেশ ভাল। এই ভাল। এই ভাল।

ইয়ং ডকটর, জানিনা আপনি আমার কথা-গুলো কি ভাবে নেবেন কিন্তু আমার কাছে ব্যাপারটা সত্যি। আইলিনের স্মৃতি বুকে নিয়ে আমি এডিনবরায় বসে আছি। আর দেশে কোনদিনই ফিরে যাবনা। তাই বলছিলাম যে ঢেউটা জীবনের সব কিছু ওলট পালট করে দেয় তাকে ভোলা যায় না। এম, আর, সি, পি, পরীক্ষা আর আমি দিইনি।

নর্থসীর জল ছলাৎ ছলাৎ করে পায়ের নীচের বালির চরে আছড়ে পড়ছে। রাত হয়ে গেছে। দূরের কোন এক হোটেল থেকে ভেসে আসছে, করুণ এক ভায়োলিনের সুর। শঙ্কর বার বার অন্যমনস্ক হয়ে যায়।

অনেক দূরের দেশের কথা, কলকাতার গঙ্গার কথা মনে পড়ে যায়। কলকাতায় পড়ার সময় বাগবাজারে গঙ্গার ঘাটে সে তার কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে এভাবেই বসে থাকত। মনটা ফের তার হু হু করে ওঠে। পাশ করে কবে দেশে ফিরবে কে জানে?

হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া শোঁ শোঁ করে তার গায়ের ওপর দিয়ে বয়ে যায়। শঙ্করের মনে হয় কে যেন ফিসফিস করে কানের কাছে বলছে এই ভাল··এই ভাল।···

মুখ তুলে দেখে কখন ডাঃ উধম সিং চলে গেছেন সে খেয়ালই করেনি। তার পায়ের তলায় পড়ে আছে সিংয়ের পরিত্যক্ত চুরুট। [ক্রমশঃ

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

উদ্‌ভ্রান্ত পথিকের চোখে নিউইয়র্ক ঃ

এই সেই নিউইয়র্ক যার পাদপথের ও যানপথের তলায় অসীম শক্তি ও সেবার সম্ভার লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে প্রতিনিয়ত গোপনে আপন কাজ করে যায়। এরাই গোপনে থেকে বিনয়াবনত সেবার প্রতীক হ'য়ে নীরবে কাজ করে। এইখানেই তো দেড়কোটী মাইল টেলিফোন কেবল, ৭০০০ মাইল গ্যাসের নল, ৫০০০ মাইল ময়লা জল নিষ্কাশনী নল, ২২০০ মাইল T. V. কেবল, প্রায় আটশো মাইল সাবওয়ে, ১৯,০০০ মাইল বৈদ্যুতিক কেবল, সাড়ে পাঁচ হাজার মাইল পানীয় জলের নল, ৯০ মাইল উষ্ণ জলীয় বাষ্পের নল বাড়ী ঘরদোর গরম করতে ব্যবহৃত হয়। যে টেলিফোনের কেবল এই নিউইয়র্কের মাটীতে পোঁতা আছে তা পৃথিবীকে লাটাইয়ের সুতোর মত সাতশো পাক বেড় দেওয়া সম্ভব। এর আটশো মাইল সুড়ঙ্গপথে প্রায় ন' হাজার ট্রেন অবিরাম সারা দিনে রাতে যাতায়াত করে।

এই সহর নিউইয়র্কই ছিল একসময় নিউইয়র্ক রাজ্যের রাজধানী, যতদিন না ১৭৯৬ সালে এলবানীতে তা উঠে যায়। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে পাঁচ বছর ছিল এটী যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী যতদিন না তা ওয়াশিংটনে উঠে যায়। ঐ সময় ফিলাডেলফিয়া ছিল সবচেয়ে বড় সহর। স্বাধীনতোত্তর যুগের গোড়ার দিকে কংগ্রেসকে কেউ কেউ বললো ; Congress poorly attended, lacking money, without the means of raising the money—degenerated into debating society. এইখানেই প্রথম কবর থেকে মৃতদেহ খুঁড়ে বার ক'রে মেডিকেল স্কুলে অস্থিবিদ্যা (এনাটমী) শিক্ষা দেওয়ার জন্য ডাক্তার ও ডাক্তারী শিক্ষার্থী ছাত্রদের নিউইয়র্কবাসী মারতে ধাওয়া করে। সেই ক্রুদ্ধ জনতার হাত হতে বাঁচতে ডাক্তার ও ছাত্রদের দলকে জেলে এসে আশ্রয় নিতে হয়। 'Sir John' Temple-কে (উচ্চ বর্ণের সামন্তার জন্য) Surgeon ভেবে জনতার হাতে নিগৃহীত হতে হয়েছিল।

এখানে জর্জ ওয়াশিংটন, যিনি সাধারণতঃ বিদেশী সিল্কের জামা পরতেন, তিনি ৩০শে এপ্রিল ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্ট পদে অভিষিক্ত হবার জন্য দেশী হার্টফোর্ড মিলের তৈরি বাদামী রংয়ের সুট পরে আসেন Federal Hall-এ। ১৭৯০ সালে ৩০শে এপ্রিল ইনি নিউইয়র্ক ছেড়ে নতুন মধ্যবর্তীকালীন রাজধানীতে চলে যান। ১৭৯২ সালে ১৭ই মে ৬৮ নং ওয়ালষ্ট্রীটে Stock Exchage এর সূচনা হয়। এ্যান্টিওয়ার্পে Stock Exchange স্থাপিত হয়েছিল ১০৬০ খ্রীষ্টাব্দে, প্যারিসে ১৭২৬ খ্রীষ্টাব্দে ও লণ্ডনে ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে। এইখানেই দুই রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটন ও আরণ বুরর (BURR) সঙ্গে ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে ১১ই জুলাই যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয় তার ফলে বুরের গুলির আঘাতে হ্যামিলটনের মৃত্যু ঘটে। এর পর ভীম দুর্যোধনের দ্বন্দ্বযুদ্ধ নিবারণ আইন করে পুনরভ্যুত্থানের অবসান ঘটানো হয়। এই সহরের ইতিহাস লেখেন প্রথম Dr. Samuel Latham Mitchel, এতে উকীল Washington Irving ক্ষুণ্ণ হয়ে লিখলেন A History of Newyork from the begining of the world to the end

of the dutch dynasty। এটা পরে নিকার বোকারের History of Newyork বলে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

নিউইয়র্ক শুধু যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম মহানগরী নয়, এটা আবার গুণ্ডা, বদমায়েসেরও বড় জায়গা। এইখানে রোশান্না পিয়াসের (Rosanna peers) খিড়কী বাড়ীতে একটা গুণ্ডার দল এডওয়ার্ড কোলম্যানের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে। এই দলটির নাম Forty thieves (আলিবাবা ও Forty Thieves এর নাম থেকে।) এই রোশান্নাই তার সামনের চালাঘরে ফুলকোপি, বেগুন ও নানারকম সব শাক সবজি বিক্রির বন্দোবস্ত রেখেছিল, আর পিছন থেকে চোলাই মদ সস্তা দামে বিক্রি করতো। সব বড় সহরেই এমনি রীতি। কলকাতার পানের দোকানে কোকেন। এই শ্রীমতী রোশান্নার আস্তানায় দ্বিতীয় দল কেড়িওনিয়ান্স্ (Kerryonians) নামে স্থাপিত হয়। গুণ্ডার দলের লোকেরা বস্তি অঞ্চলে ছিনতাই, চুরি, ডাকাতি ও খুন ইত্যাদি দুষ্কার্য করতো। এই দুর্বৃত্তের দল কিছুদিন মহানগরীকে আতঙ্কিত অবস্থায় রেখেছিল কখনও কখনও রাস্তাঘাটে বন্দুক,গুলি ও খুন খারাপি চালাতো। প্রথম দলটিতে আইরিশ ম্যানে ভর্তি ছিল। অজ্ঞতা, দারিদ্র্য, বেকার ও রাজনৈতিক অসাধুতা, মাতলামি ইত্যাদির দরুণ নানা দুর্বৃত্তদলের সৃষ্টি হয়। এদের কুখ্যাত নামগুলি হল—Patsy Conroys, O' Connell Guards, Bowery B'hoys, Chischesters Roach Guards, Plug Uglies, Shirt Tails, Dead Rabbits, Atlantic Guards, Daybreak Boys, Buckoos, Hookers, Swamp Angels, and Slaughter Housers প্রভৃতি।

এই অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত আদিম আয়ার্ল্যাণ্ড-বাসীরা নিউইয়র্কে তাদের বেকারত্বের জন্য যে সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করতো তা প্রচুর পরিমাণে বেড়ে যায় ক্রীতদাস প্রথা বিলোপের ফলে। ক্রীতদাসেরা মুক্ত হল বটে, কিন্তু তাদের কোন কাজে নিযুক্ত থাকার কিছু ব্যবস্থা হল না। সদ্যোমুক্ত ক্রীতদাসেরা কিছু ক্ষেতখামারে রোজ-মজুরী বা সামান্য ফলমূল বিক্রি করে কোন গতিকে দিন গুজরাণ করতে লাগলো। ক্রীতদাসের সমর্থনে খবরের কাগজ বেরুল Ganison এর সম্পাদনায় Liberator ও Arthur Tappan-এর সম্পাদনায় Journal of Commence। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দ ৪ঠা ডিসেম্বর American Antislavery Society স্থাপিত হয় ফিলাডেলফিয়ায়। এর সভাপতি হন Arthur Tappan। Tappan ঐ সমিতির মুখপাত্র হিসেবে Emancipator নামে এক কাগজ প্রকাশ করেন এবং কংগ্রেসের সদস্যদের একখণ্ড করে পত্রিকা বিনামূল্যে পাঠাতেন। কেউ মাজিনে কটু মন্তব্য করে সেই পত্রিকা তাঁকে ফেরত পাঠাতেন। একবার দক্ষিণাঞ্চলের একজন সদস্য এত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন যে সম্পাদক সম্বন্ধে এক নিম্নোক্ত অশালীন উক্তি করেন—

"You damned infetnal psalm-singing, negro-stealing son of a bitch, if you ever show your damned face in the districct of Columbia, I will make my negroes cowhide you to death"

তখন Tappan-কে হত্যা করার জন্য New Orleans এর Vigilant Committee বিশ হাজার ডলার পুরস্কার ঘোষণা করেন। সেকালেও দুষ্কার্যের জল্পনা কল্পনা হয় নিউ অরলিন্সে। এমনকি আজও তার ব্যতিক্রম নেই যেমন কেনেডী হত্যার ব্যাপারে।

প্রথম টেলিফোন ও বিজলী বাতি :

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ১১ই মে 'গ্রাহাম্ বেল্' প্রথম টেলিফোনে দু' মাইল দূরে তাঁর সহকারীর সঙ্গে কথা বলেন। আগষ্ট মাসে 'Telephone of Neuyork' স্থাপিত হয়। কিন্তু এক বছর তার আয়ু পূর্ণ হবার আগেই এটা উঠে যায়। পরের বছর আগষ্ট মাসে বেল টেলিফোন (Bell Telephone co) কোম্পানী নিউইয়র্কে স্থাপিত হয়। এদের Exchange প্রথম ৪২ নং Nassal Street এ স্থাপিত হয়। সেখানে মোট গ্রাহক সংখ্যা ছিল ২৫২টি মাত্র। এই খানেই প্রথম এডিসন সাহেব তাঁর নতুন বিজলিবাতিতে Menton Park আলোকিত করেন। সেদিনটা ছিল ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর। এডিসনেরও আগে Charles Francis Brush নামে এক বৈজ্ঞানিক আর্ক ল্যাম্পের সাহায্যে আলো প্রজ্জলনে সমর্থ হন। নিউইয়র্কের

Alderman শুধু পায়ে চলার পথ আলোকিত করার জন্য পৌর প্রতিষ্ঠানের অর্থব্যয় করতে নারাজ। তাই দোকান ও বাড়ি আলোকিত করার জন্য এডিসন সাহেব দশলক্ষ ডলার মূলধনে Edison Electric Illuminating Co. নামে এক সংস্থা স্থাপন করেন।

ব্রুকলীন সেতু:

এইখানে ১৮৮৩ খৃ: ২৪শে মে 'ম্যানহাটান' দ্বীপ থেকে Long Island East নদীর ব্যবধানকে সংযুক্ত ক'রে 'Brooklyn সেতু' তৈরি হয়। এটাই প্রথম এই অঞ্চলের সেতু। এই সেতু নির্মাণ করেন John A. Roebling. এই সেতু সম্বন্ধে এক নিউইয়র্ক-বাসী মন্তব্য করেন যে এই সেতুতে নিউইয়র্ক মহানগরীর যত কিছু অর্থ Long Island এর উপর অঞ্চলকে উন্নত করার জন্য ব্যয় হয়েছে। এটা নদীপৃষ্ঠ থেকে ১৩০ হইতে ১৩৫ ফুট উঁচুতে যাকে বড় বড় জাহাজ এর তলা দিয়ে অনায়াসে যাতায়াত করতে পারে। Alfred E. Smith বলেন—"The bridge and I grew up together." পরবর্তীকালে তিনি বলেন আমি বহুসময় এই সেতু নির্মাণের কাজ দেখে কাটিয়েছি। দলে দলে লোক এগিয়ে চলেছে। এপার থেকে ওপার তার চালিয়ে দিয়েছে। তার থেকে ঝুলিয়েছে পথ চলার পাটাতন। গড়ে তুলেছে গাড়ী চলার পথ। ৬০০ লোক একসঙ্গে কাজ করত এখানে। কম করে এই কাজে ২০ জন লোকের মৃত্যু হয়েছিল। John A. Roebling এক দুর্ঘটনায় মারা যেতে তাঁর পুত্র Washington Roebling পিতার আরব্ধ কাজ শেষ করেন। Brooklyn Bridge-কে কেউ বলেন—"The brooklyn bridge on sunday is known as lovers lane" এই brooklyn bridge-এর উপর Crane (Hant) তাঁর অনবদ্য কবিতা "To brooklyn bridge" লিখেছিলেন।

বহুতল বাড়ী :—

গত ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত Newyorkএর বাড়ী পাঁচ তলার বেশী ছিল না। এর পর পাঁচ তলার উপর আট তলা দশ তলা বাড়ী তৈরী করা সুরু হয়। ১৮৮২ খৃ: C. W. Field বারোতলা বাড়ী ১নং ব্রডওয়েতে 'ওয়াশিংটন বিল্ডিং' নামে তৈরী করেন। তবে এটি ইস্পাতের কাঠামো দিয়ে তৈরী নয় কেবল ইট, পাথর, কাঠ দিয়ে তৈরী। Gilbertএর নির্দেশনায় যখন এক বারো তলা বাড়ী ইস্পাতের কাঠামো দিয়ে তৈরী হয় সেই সময় নিউইয়র্কে ভীষণ এক ঝড় আসে। এই ঝড়ে নির্মীয়মান বাড়ীটির কোনও ক্ষয়-ক্ষতি হয়নি। ১৮৯৩ সালের ১৪ই মার্চ, ৫৩০ ঘরওয়ালা Waldorf Astoria Hotel খোলা হয়। সেই সময় হোটেলে মাত্র ৪০ জন অতিথির জন্য ৯১০ জন হোটেলের কর্মীরা কর্মব্যস্ত ছিল। ১৮৯৭ সালে ১৭ তলা Astoria Hotel পরে Waldorf Hotel নাম নিয়ে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত চলেছিল। সেটিকে ভূমিসাৎ করে পৃথিবীর দীর্ঘতম অট্টালিকা Empire State Bailding' এর জন্য স্থান করা হয়।

পৌরসংস্থার পরিচালনার ইতিকথা:

Fiorello La Guardia সাহেব Newyork এর মেয়র হবার আগে Jimmy Walker Newyork এর মেয়র ছিলেন। তিনি নাকি মোটা উৎকোচ নিয়ে পৌরসংস্থায় লোক নিযুক্ত করতেন। ১৮৩৮ সালের ৮ই জুন সীবেরী (Seabury) সাহেব নিউ ইয়র্ক রাজ্যের গভর্ণর Franklin D. Roosevelt এর কাছে মেয়রের বিরুদ্ধে ১৫ দফা নালিশ দায়ের করেন এবং রাজ্যপালের কাছে দাবী জানান মেয়রকে বরখাস্ত করতে। কিন্তু আইনত: এ বড় দুরূহ কাজ। হার্ভার্ড (Harvard) বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের অধ্যাপক Felix Frankfuller সাহেব রাজধানী আলাবানীতে রাজ্যপালের সঙ্গে আইনের কূট সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে বলেন যে তিনি কনভেন্টর সঙ্গে এই আইনের তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছিলেন এবং তাতে জিমি ওয়াকারকে চলে যেতে হয়। আইনের এই খিয়োরিটি হচ্ছে যে যখন একদল পাবলিক অফিসার তাঁর কার্য্যকালেই অনেক টাকা রোজগার করেন এবং এই রোজগার শুধুমাত্র তাঁর মাহিনার থেকেই হয় না, আর টাকা পাওয়া সম্বন্ধে তিনি যদি সন্তোষজনক কৈফিয়ত না দিতে পারেন, তাহলে দুর্নীতির সন্দেহ থেকে যায়।

Mayor walker তাঁর ভাই এর মৃত্যুতে Newyork এ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিতে আসেন। সেখানে Tammany দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা ও পরামর্শ করেন। তাঁদের নেতা Al-Smith বলেন "জীম, দলের

সুখ্যাতির জন্য তুমি পদত্যাগ কর"। ১৯৩২ সালের ১লা সেপ্টেম্বর Walker এক বিজ্ঞপ্তি দেন, 'আমি এখনই পদত্যাগ করছি।' এরপর তিনি রুজভেল্ট (Roosevelt) এর উপর ক্রুদ্ধ হয়ে এক বিবৃতি দেওয়ার পর ২রা সেপ্টেম্বর জাহাজে চড়ে ইউরোপ পাড়ি দেন। ওয়াকারের অসম্পূর্ণ কার্যকালে ১৯৩২ সালে বিশেষ এক নির্বাচনে ও-ব্রায়ন মেয়রের পদে অভিষিক্ত হন। ১৯৩৩ সালের নির্বাচনে তিনজন প্রার্থীর মধ্যে রিপাবলিকান (Repulican) দলের মনোনীত সদস্য লা গার্ডিয়া (La-Guardia) ডেমোক্র্যাট দলের প্রার্থী দুজনের মধ্যে ভোট ভাগ হয়ে যাওয়ায় লা গার্ডিয়া (La guardia) মনোনীত হন। স্বাধীন ডেমোক্র্যাট সদস্য ম্যাক কী (Mekce Kee) ও টামানীদল মনোনীত ডেমোক্র্যাটসদস্য ও'ব্রায়ন(O'Brien) এর মিলিত ভোট লা গার্ডিয়া (La guadia) এর ভোটের চেয়ে বেশী ছিল।

১৯৩৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর এক সুপ্রিম কোর্টের জজ La-guardia কে মেয়রের শপথ নেওয়ান। এর ফলে ১৬ বছরের দীর্ঘ 'টামানী' অধ্যুষিত পৌরশাসনের অবসান ঘটে। মেয়রপদে অভিষিক্ত হওয়ার এক মিনিট পরেই টেলিফোন তুলে হুকুম দেন নগরীর কুখ্যাত গুণ্ডা Charles 'Lucky' Luciand কে বন্দী করার। এই সময় পৌর-কোষ প্রায় কপর্দক শূন্য। তিনি কিন্তু অর্থ কৃচ্ছ্রতা না করে জনগণের হিতের জন্য অর্থ ব্যয় শুরু করেন। Franklin Roosevett এর সঙ্গে তাঁর মিত্রতা থাকায় Roosevelt-এর Newdeal-এর বহু অর্থ New-york-এর উন্নয়নে ব্যয়িত হয়।

নগরীর পার্কগুলির অবস্থা অতি ম্লান হয়ে পড়েছিল। তিনি সেগুলিকে পুনরায় উজ্জীবিত করেন। পার্ক কমিশনার Robert Mores নবোদ্যমে পার্কগুলির প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। উদ্যানগুলি ইঁদুরে ভর্তি ছিল। ইঁদুর অধ্যুষিত পার্কের প্রায় দু'লক্ষ ইঁদুর মেরে ফেলেন। অর্থ উপার্জনের জন্য তিনি শতকরা ২ ভাগ Sales tax, শতকরা ৩ ভাগ utility tax ও 0.1% মোট বাণিজ্য কর ধার্য্য করেন। রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার নগরীর Relief এর জন্য ব্যয়ের শতকরা ৭৫ ভাগ বহন করেন। ১৯৩৩ সাল থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার নিউইয়র্কের জন্য ১০০ কোটী ডলার ব্যয় করেছিলেন। অর্থনৈতিক দুর্যোগে যখন সারা আমেরিকা বিধ্বস্ত সেই সময়েই বহুতল গৃহনির্মাণ শুরু হয়। ১৯৩১ সালের ১লা মে ১০২ তলা Empire State Building এর উদ্বোধন হয়। ১লা অক্টোবর ১৯৩১ সালে নতুন Waldorf Astoria হোটেলের দ্বার উদ্ঘাটন করা হয়। La-Guardia নিউইয়র্ক থেকে দুর্বৃত্তদের বিদূরিত করবার শপথ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁকে সাহায্য করতে এলেন Thomas E. Dewey। দুর্বৃত্তরাও তাঁদের দলীয় বিরোধ ও বিভেদ বিসর্জ্জন দিয়ে এক সর্ব-মার্কিন সংস্থা গঠন করেন। পূর্বাঞ্চলের কেন্দ্র স্থাপিত হল নিউইয়র্কে। এর নাম হল Big Six. এখানের জুয়াখেলার অধিকর্তা হলেন Francesco Castiglia বা Frank Castello, বেশ্যাবৃত্তি ও মাদকতার অধিকর্তা হলেন Lucly Luciano, রেস্তোরাঁ পরিচালনায় Dutch Schulty, J seph Doto দোষীদের জামিনে ছাড়ানো ব্যাপারে, ব্রুকলীন সৈকতের গুণ্ডামির পরিচালনায় Louis "Lepke" Buchalter ও Jacob "Gurrah" Shapir শিল্প ও শ্রমিক নির্যাতনের, Benjamin "Bngty" Siegel ও Mayer Lansky আগ্নেয়াস্ত্রের পরিচালনায় নিযুক্ত হলেন। যখন Dewey এই রেস্তোরাঁর অনাচারের উচ্ছেদ সাধনে দৃঢ় সংকল্প; সেই সময় Deweyকে চিরতরে সরিয়ে দেওয়ার জন্য Dutch Schutq কৃতসংকল্প। কিন্তু দুর্বৃত্তরা এক গোপন সভায় স্থির করে যে যদি Dewey কে সরিয়ে দেওয়া হয় তারপর থেকে কাজের ভার নেবে Federal Agency। তারা আমাদের সারাদেশ থেকে উৎখাত করে ছাড়বে। অতএব Dewey বেঁচে থাকুন। এতে ক্রুদ্ধ Dutchmen স্বয়ং Deweyকে হত্যা করার জন্য অগ্রসর। সকলের সংহতি ও স্বার্থের জন্য দলের লোকই Dutch Schultqকেই হত্যা করে। Dewey কিন্তু Lucky Lucianoর শাস্তি বিধান করতে সমর্থ হন। La-Guardia-এর সময় নিউইয়র্কে বৃহত্তম প্রদর্শনী, উদ্বোধন করা হয় যেখানে সর্বসমেত সাড়ে চার কোটী দর্শক এসেছিলেন। নিউইয়র্কের সবচেয়ে ভাল মেয়র হলেন La-Guardia এবং দীর্ঘদিন জনগণের সেবায় নিযুক্ত ও পৌরশাসনেরবহু সংস্কার

সাধন করেন। তিনি পৌরকর্মীদের বেতন ও ভাতার হার বৃদ্ধি, বস্তিসমস্যার সুষ্ঠু সমাধান প্রচেষ্টা, গৃহসমস্যার উন্নয়ন, স্কুল নির্মাণ, সুড়ঙ্গ পথের সংগঠন, সাংস্কৃতিক উন্নয়ন, বিমান ক্ষেত্রের মুখ্য কেন্দ্র ও নিউইয়র্ককে শুল্কমুক্ত বন্দর বলে ঘোষণা করেন। পৌরসংস্থাকে Tammany পরিচালিত সংস্থা থেকে মুক্ত করেন এই মেয়র La-Guardia। তিনি হিটলারকে 'Perverted Maniac' আখ্যা দেন। এতে হারম্যান্ গোয়েরিং নাজি বিমান প্রস্তুতের কারখানাকে আদেশ দেন এমন দূরপাল্লার বিমান তৈরি করতে, যাতে ৫টন বোমা নিয়ে নিউইয়র্কে ফেলে 'Stop somehow the mouth of the arrogant people over there'. ১৯৩১ সালের ৯ই ডিসেম্বর এক মিথ্যা বিমান আক্রমণের সংকেত দেওয়ায় নিউইয়র্কের জনগণের কি আতঙ্কিত অবস্থা। এই La-Guardiaএর স্মরণে নিউইয়র্কের একটী বিমানক্ষেত্রের নাম La-Guardia বিমানক্ষেত্র' দেওয়া হয়েছে।

নিউইয়র্ক সম্বন্ধে নানা গুণীজ্ঞানীর মতামত :

কেউ কেউ নিউইয়র্কে বিশ্বের কেন্দ্র বলে অভিহিত করেন: কেন না এটী United Nations এর হেড কোয়ার্টার। এটী সব বিখ্যাত ও সবচেয়ে অর্থবান মহানগরী। এটী বিশ্বের সর্ববৃহৎ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় শিক্ষাকেন্দ্র, পর্যটকদের সবচেয়ে বৃহৎ আকর্ষণীয় স্থান, এটী দুনিয়ার সবচেয়ে বড় কর্মচঞ্চল শিল্পনগরী। মেয়র Wagner নিউইয়র্কবাসীর উদ্দেশ্যে বলেছিলেন—

"make more, sell more, buy more, eat more and enjoy more than the citizens of any other city of the world."

এই নিউইয়র্ক সম্বন্ধে কত বিখ্যাত মনীষিদের কত রকমই না বিচিত্র উক্তি। কেউ প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত, কেউ বা নিন্দায় পঞ্চমুখ। মেয়র Wagner বলেন—The city is the centre of the universe. রবার্ট জোসেফ্ বলেন—Newyork notorioasly lacks citizen leadership and is hard to aronse.

Sir Patrick Geddes—বিখ্যাত সমাজ বৈজ্ঞানিক ও নগর পরিকল্পনাকারী ১৯১৩ সালে নগরীর অভ্যুদয় ও বিবর্তনের ইতিহাসকে পাঁচটী ভাগে ভাগ করেন। তিনি বলেন নগরীর প্রথম পর্যায়ে বলা হয় Polis—

দ্বিতীয় পর্যায়ে Metropolis—বৃহৎ ও শক্তিমান মহানগরী ;

তৃতীয় পর্যায়ে Megalopolis—অসুস্থ, বিরাট আয়তনের দানবনগরী যেখানে মহানগরীর উন্মত্ততার বিকার ভাব বিদ্যমান ;

চতুর্থ পর্যায়ে Pathopolis—রোগগ্রস্ত সংকুচনশীল মরণোন্মুখ মহানগরী।

Patrclk Geddes এর বিশ্লেষণে নিউইয়র্ক এখন Megalopolis এর পর্যায়ে। যদি না সময়ে এর গতিরোধ করা হয় তো এটী ধীরে ধীরে ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাবে। যদিও Arnold Joseph Toynbee, বিখ্যাত বৃটিশ ঐতিহাসিক, Patrick Geddesএর সঙ্গে একমত নন।

নিউইয়র্কের ইতিহাস সংঘাত ও সংগ্রামের ইতিহাস, অমৃতের পুত্রদের মহত্ত্ব, সৃষ্টির ইতিহাস, সেই সঙ্গে ঠগী ও বদমাইসদেরও ঘৃণ্য ইতিহাস।

এই নিউইয়র্কে রয়েছে কাশীর কাঠের কৌটের মধ্যে কৌটোর মত মহানগরীর মধ্যে নগরী যার নাম The Rockefeller Center. এখানে লক্ষ লক্ষ টন সিমেন্ট ইস্পাত, পাথর, কাচ ও কাঠের সমন্বয়ে অভ্রভেদী হয়ে উঠেছে অজস্র বহুতল অট্টালিকা। একসময় সামান্য বাড়ী ছিল যেখানে তা' উচ্ছেদ করে গড়ে উঠলো—The fabulous city within city। এখানে একাধারে পাওয়া যাবে বহু দর্শনীয় বস্তুর সাক্ষাৎ, কেনাকাটার অপূর্ব সুযোগ, নানা আনন্দানুষ্ঠান, জ্ঞানের প্রদর্শনী। বিভিন্ন স্বাদের মুখরোচক আহারাদির ব্যবস্থা একধারে চোখের, মনের, চিন্তার ও মুখের খোরাক। এইখানেই National Broadcasting-Corporation এর ষ্টুডিও, Eastern Airlines-এর বাড়ী, চেস্ ম্যানহাটান ব্যাঙ্কের মুদ্রার (ধাতব ও কাগজের) প্রদর্শনী, রেডিওসিটি, মিউজিক হল্ প্রভৃতি। এখানে পৃথিবীর বৃহত্তম অতিবিখ্যাত প্রেক্ষাগৃহ যেখানে ৬২০০ লোকের বসার জায়গা রয়েছে ও যেখানে বহু সুন্দরী স্তনোচ্ছলা নর্তকীরা রূপের ডালি নিয়ে আনন্দ দিতে অপেক্ষমাণা। এক সুন্দরী যুবতীর

অভূতপূর্ব সমাবেশ শুধু অর্থের বিনিময়েই সম্ভব হয়েছে। তুলনায় কে যে কার চেয়ে সুন্দরী এ মান নির্ণয় করা অসম্ভব। মনে হয় সবই যেন এক বয়সী। তার উপর প্রসাধন ও বেশভূষায় সুসামঞ্জস্যপূর্ণ প্রাচুর্য রয়েছে

স্বাধীন মার্কিন দেশে সবাই স্বাধীন। কেউ কারুর তোয়াক্কা রাখে না। সবারই as *g*ood as anybody। এক রং হ'লে এরা জাত মানে না সত্যি কিন্তু ধনীরা এক-জাত। এই ধনের মানদণ্ড কেমন করে নির্নীত হবে? শুধু বিরাট বাড়ী ও গাড়ীর সংখ্যাধিক্যে নয়। সেটা হ'ল কার কটা কোম্পানীর কতগুলো CREDIT Card আছে। এ কার্ডগুলি প্ল্যাষ্টিকের তৈরি উঁচু উঁচু হরফে লেখা। কিছু কেনা-কাটা করলে বা হোটেল রেস্তোরাঁয় খেলে এই CREDIT Card দিলে সেটী কারবণ পেপার দেওয়া কয়েক খণ্ড বিলের তলায় রেখে রবারের বেলুন ঘুরিয়ে দিলে হুবহু ছাপ এসে যাবে। তখন CREDIT Card টী ফেরত দিয়ে সেই কারবণ কপি দেওয়া বিলে CREDIT Card মালিকের সই করিয়ে নেওয়া হয়। এই ক্রেডিট কার্ড দিয়ে এরোপ্লেনের, জাহাজের টিকিট খরিদ করা যায়, জামা কাপড় কেনার বিল দেওয়া যায়। যার যত সংখ্যায় ক্রেডিট কার্ড সেই তত খ্যাতিমান ও মান্যবর ব্যক্তি। অর্থের দ্বারাই এখানে সামাজিক পরিমাপ নির্নীত হয়। এই ক্রেডিড কার্ড দেওয়া ব্যাপারে এরা নিশ্চয়ই কিছু অনুসন্ধান করে নেয়, তা আমার জানা নেই। তবে American Express Co, Diner's Club, Lion club ক্রেডিট কার্ড দেয়। Shell oil, Standard oil, Gulf oil. এদিকে পেট্রোল কোম্পানীরা পয়সা না বের করে তেল কেনার জন্য credid কার্ড দেয়। ক্রেডিট কার্ডধারীর ব্যাঙ্ক একাউন্ট থেকে মাসে মাসে আদায় হয়ে যায়। (নতুন মহাদেশ পর্ব সমাপ্ত)

গতকালের কথামত Ross ঠিক সাড়ে আটটার সময় দুই ছেলেকে নিয়ে হাজির। আমি বলেছিলাম, 'কাল তোমার দুই মেয়েকে নিয়ে এসো।' ওরা নাকি রাগ করেছে ভাইয়েদের উপর। ওরা Empire State Building এর চূড়োয় চড়েছে, তারা পারেনি। আমরা সবাই মিলে চললাম Kenedy Air Port এর দিকে। বিমান বন্দরে যখন পৌঁছলাম, তখন সকাল ৯টা। প্লেন ছাড়বে দশটায়। অতএব মালপত্র চেক্ টেক্ ক'রে নিলাম। নিউইয়র্কের কেনেডী বিমান ঘাঁটিতে লাইন ধ'রে পর পর বিমান একের পর একটী উড়ে যাবার পর AIR FRANCEএর বিমানে যুক্তরাষ্ট্রের মাটী ছাড়লাম। যে হেতু সিনেমার যন্ত্রটী খারাপ হয়ে গেছে তাই অতলান্তিক মহাসাগর পার হবার সময় এবার বিমানে ছবি দেখানো হবে না। হনলুলু থেকে লস এনজেলিস আসার সময় দীর্ঘ সিনেমা দেখানো হ'য়েছিল। আমি মনে মনে খুশীই হলাম, ভাবলাম ভালই হ'ল। কিছু ঘণ্টা কয়েক লেখা যাবে। প্রথমেই দিয়ে গেল রবিবারের The Newyork Times। মূল্য 30 Cent। পত্রিকাটি নানা বিভাগে বিভক্ত।

নিউইয়র্কের সংবাদ পত্র :

Section—1 : ৭৬ পাতা : মুখ্যত: Architiceure Art, Bridge Camera, Chess, Coins, Dance, Drama, gardens, Home Music, Movies, Radio—TV, Records প্রভৃতি।

Section—2 : ২৪ পাতা : Stamps সংক্রান্ত বিষয়ে প্রবন্ধ ও অজস্র বিজ্ঞাপন।

Section—3 : ৪৪ পাতা : Business & Financial,

Section—4 : ১০ পাতা : News Background : Education—Service, Editorials, Letters to Editors প্রভৃতি।

Section—5 : ২৬ পাতা : Sports, Dogs, Boats, Automobiles, Merchandise, Offerings, wanted to purchase, Shopping Guide ইত্যাদি

Section - 6 : ৭২ : এটী রঙিন ছবিতে ভর্তি ও খবরের কাগজ এক ভাঁজ করলে যেমন হয় তেমনি এর মাপ। এটী Magazine 3 এটী Stepple করা

Section—7 : ৪০ পাতা : এটী Book Review-এ ভর্তি—এটীও Stepple করা

Section - 8 & 9 : Advertisements : এটীকে অনেকে না নিয়ে খবরের কাগজ কিনে পাশে ফেলে দিয়ে আসে। এর পাতার সংখ্যা—৪০

Section - 10 : ৪০ পাতা। Reports ও Travel।

সব মিলে ৩৩২ পাতা। ওজন দরে বিক্রী করলে আগেকার দিনে কাগজের দামের চেয়ে বিক্রীর দাম ভারতবর্ষে কিছু বেশী পাওয়া হয়তো যেতো। যাঁরা রবিবারের সংবাদপত্র পথে যাবার সময় কেনেন তাঁরা বিজ্ঞাপনের ভারী অংশটী ওখানেই ফেলে রেখে যান। সঙ্গে অযথা ভার বহন করেন না। কলেবরের কথা বাদ দিলে এর মুদ্রণ বৈশিষ্ট্য ও প্রচুর। নানা রংয়ের কালিতে বিশেষ বিশেষ অংশকে দৃষ্টি আকর্ষণীয় করার জন্য কতনা প্রবল প্রচেষ্টা। হরফের কায়দাও যেমন, চিত্র সম্বলন ও তেমতি। [ক্রমশঃ

যোগভ্রষ্ট

শ্রীসমীরণ রুদ্র

চারিদিকে ধান ক্ষেত, গ্রামের সীমানায় বাঁশবন আর আমবাগান, মাঠের বুকচিরে ছোট্ট রেল লাইনটা ধুকতে ধুকতে এসে এই চাষী গাঁ খানিকে ছুঁই ছুঁই করেও নাগাল না পেয়ে আবার বের হয়ে গেছে জংশন ষ্টেশনের দিকে। গ্রামটিও ছোট্ট। নাম শ্যামচক। একটা হাই-স্কুলও আছে। সতীশ চাষীর ছেলে নবীন এবার সেই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করেছে। চাষীর ঘরের ছেলে হলেও ছেলেটির সুন্দর সুশ্রী চেহারা, দেহে নতুন যৌবনের জোয়ার, মনে দুর্বার আকাঙ্ক্ষা, চোখে রঙীন স্বপ্ন। একদিন সতীশ মণ্ডল জিজ্ঞাসা করল তার ছেলেকে "তুই কি আর পড়বি ?"

নবীন বলল "হ্যাঁ, আমি আই, এস, সি, পাস করে ডাক্তারী পড়ব। লাঙ্গল কাঁধে করে মাঠে মাঠে ঘুরতে পারবো না।"

বাপ বললে "তাই হোক, গ্রামে পাস-করা ডাক্তার কেউ নেই। সবাই হাতুড়ে। তুই পাস করে এলে গ্রামের লোকেদের অনেক উপকার হবে।" বাপের অনেক আশা। সেইমত ছেলে একদিন কোলকাতা চলে গেল কলেজে পড়তে। দিন যায় মাস যায়। তারপর অনেকগুলি বছর কেটে গেছে। নবীন আই, এস, সি, পাস করে কোলকাতায় মেডিক্যাল কলেজে পড়ছে। সামনের বছর সে ফাইন্যাল এম,বি, বি, এস পরীক্ষা দেবে। এখন ভুলে গেছে সে গ্রামে থাকতে দুপুরে স্কুলপালিয়ে এক একদিন শস্য শূন্য মাঠ পেরিয়ে কাশ কুশ শরে ঢাকা নাবাল তৃণভূমির শেষে নদীর ধারে ঘন হিজল জাম জামরুলের ছায়ার নীচে সস্তায় তরমুজ খেতে সে বন্ধুদের নিয়ে পাড়ি দিত। এখন শহুরে হয়েছে সে। শহরের যাবতীয় কায়দা কানুন রপ্ত করেছে। গ্রামের লোককে গেঁয়ো ভূত বলে ঘেন্না করতেও শিখেছে। গ্রামীন বাংলার সমাজ জীবনকে, যেখান থেকে সে এতোদিন মানুষ হয়েছে, তাকে এখন সম্পূর্ণ ঘৃণা করতে শিখেছে।

এখন ভুলে গেছে সে নদীর ওপারে ওদের পাশের কাসিমা গ্রামের সেই কালো মেয়েটিকে। নাম যার শ্যামা। একদিন নদীর ধারে সে মুগ্ধ হয়েছিল সেই কালো মেয়ের কালো হরিণ চোখ দেখে। স্বচ্ছল চাষী গৃহস্থের মেয়ে সেই শ্যামা। তার বড় বড় চোখে ছিল স্নিগ্ধ শান্ত কোমলতার মগ্ন আভাস। সেই চোখ দেখে নবীনের ভাল লাগতো। সে মুগ্ধ হয়েছিল। তার মনে হতো অতল কালো দীঘির জলে সন্ধ্যার নিবিড় স্তব্ধতা জমে আছে বুঝি। তাই নবীনের বাবা ও মা দুজনেই সেই বিত্তবান পরিবারের মেয়ে শ্যামাকে দেখে পছন্দ করেছিল। শ্যামার সঙ্গে নবীনের বিয়ের সব ঠিকঠাক করে একদিন সত্যই সতীশ চিঠি দিল পুত্র নবীনকে বাড়ি আসতে। কিন্তু সরল সাদাসিদে চাষী বাপ নিজের শহুরে ছেলের মন জরিপ করতে বোধ হয় ভুলই করেছিল। কোলকাতায় গিয়ে ছেলের জীবনে যে রাহুর ছায়া পড়েছে তা সরল বাপ জানতো না। তারপর ভাবী ডাক্তার ছেলে বাপের কথামত গ্রামে এল। কচি ছেলেটি হয়ে বিয়ের পিঁড়িতে গিয়েও বসল। শাঁখ বাজল, উলুধ্বনিতে মুখরিত হল গ্রাম্য বিবাহ বাসর। তখন ফাল্গুন মাস। গাছের পাতা ঝরছে। শিমুলে পলাশে ফুল দেখা দিয়েছে। ফুলশয্যায় রাত্রে চন্দন চর্চিত চন্দ্রভূষিত একখানি মুখের সলজ্জ আনত চাহনিও নবীন দেখল। সেই কালো মেয়ের গালে টোল ফেলা মিষ্টি হাসিও সে দেখল। কিন্তু নবীনের সেই গ্রাম-বাংলার সরল মন আর নেই। তার ভালবাসার ফুল শুকিয়ে তখন আমসী হয়ে

গেছে। অতীতকে সে নিঃশেষে মুছে ফেলে দিয়েছে। ফুলশয্যার পরের দিনই নবীন পরীক্ষার পড়া আছে ইত্যাদি মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে কোলকাতায় পালিয়ে এল।' সেই যে এল আর সে গ্রামে ফিরে যায় নি। সেই শ্যামা মেয়েকে সে আর তার জীবনে গ্রহণ করেনি। তার অপরাধ হল সে কালো, সে অশিক্ষিতা, সে পাড়া গেঁয়ে। সে শহরের মেয়েদের মতো আপ-টু-ডেটনয় আধুনিকা নয়। সোনালি বাকির নদীর চর পার হয়ে শ্যামচকের সেই তরমুজ ক্ষেতেরভিতর দাঁড়িয়ে ঘুঘু পাখির ডাক শুনতে শুনতে কালিসা গ্রামের সেই শ্যামা মেয়ে রোজই স্বপ্ন দেখতো স্বামী তার ফিরে আসবে, তাকে ঘরে নিয়ে যাবে, স্বামীর আদর যত্ন ভালবাসায় তার হৃদয়, মন পরিপূর্ণভাবে ভরে যাবে, ফুলে ফলে বন মাঠ আবার ভরে যাবে।' কিন্তু হায়, সে স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে গেল! শ্যামা জানতো না নবীন ডাক্তারি পাশ করে কোলকাতায় চেম্বার খুলে বসেছে। সুন্দর চেহারা তার, মিষ্টি কথাবার্তার দ্বারা বেশ পসার সে জমিয়ে নিয়েছে। খ্যাতির দেওয়াল তার চারদিকে এখন আকাশচুম্বী হয়ে উঠেছে। সেখানে বি এ পাশ করা এক আধুনিকা মেয়েকে সে বিয়েও করেছে। তার পেট কাটা জামা, উন্মুক্ত বগল, ঠোঁটের ও গালের অতি উগ্র প্রসাধন, অতি আধুনিক পোষাক পরিচ্ছদ, বক্ষের উদ্ধত ভঙ্গী, সেখানে সেসবার শ্যামার মতো গেঁয়ো মেয়ের ক্ষমতা নেই। সেখানে শ্যামার কোনদিনই স্থান হবে না। নবীন আর ফিরে আসবে না। ঘুঘুর করুণ সুরে শ্যামার দীর্ঘশ্বাস পড়ে। দিনান্তের শেষ ট্রেনখানি স্টেশন ছেড়ে চলে যায়। নাঃ; আজো তার স্বামী আসেনি। আঁধার আকাশ তারায় ভরে যায়, অনেক তারা, বাতাসে ভেসে আসে মিষ্টি সুবাস। মেহেদীফুল অনেক ফুটেছে। যৌবনের বান ডেকেছে শ্যামারও সারা দেহ মনে। কিন্তু এই ভরা যৌবনের দিনে নবীন কোথায়? শহরের লক্ষ লক্ষ মানুষের মিছিলের ভিড়ে তার স্বামীর ঠিকানা যে চিরদিনের তরে হারিয়ে গেছে। শ্যামা সেই শহরকে চেনে না। কখনো সে কোলকাতায় যায় নি।

অশিক্ষিতা শ্যামা গ্রামের পণ্ডিত হরতীর্থের কাছে শুনেছে জীবনের সকল ধারায় নীতিবোধকে সর্বোচ্চ স্থান দেওয়াই হল আসল শিক্ষা। সরলা গ্রাম্যবধূ শ্যামা জানে তার স্বামী শিক্ষিত ব্যক্তি, সে ডাক্তার। ডাক্তারের কাজ মানবের সেবা, সমাজ সেবা, আর তাই হল ধর্ম। শিক্ষিত স্বামীর এমন নৈতিক বিপর্যয়ের কথা, তার উচ্ছৃঙ্খল-জীবন যাপনের কথা শ্যামা জানে না। শ্যামা জানে না তার সেই শিক্ষিত স্বামী আবার অন্য মেয়ে বিয়ে করেছে, সেখানে তাদের দুটি ছেলে মেয়েও হয়েছে। তার স্বামী কোলকাতায় বাড়ি ও গাড়ি কিনেছে। জানেনা বলে তাই সরলা গ্রাম্য বধূ আজও তার হৃদয়ের সরল বিশ্বাস ও স্বামীর প্রতি পবিত্র প্রেম নিয়ে নীতি-হীন নবীনের জন্য দিনের পর দিন অপেক্ষা করে আছে। গ্রীষ্মের রোদজ্বালা ষ্টেশনের পথে অনেক চেনা মানুষের আনাগোনা। তাদের মুখে কিছু কিছু শোনে বৈকি শ্যামা। গ্রীষ্মের ধূধূ মাঠে আগুনের ব্যাপকতা রোদ ঝাঁকাস বাতাসেও অনেক টুকরো টুকরো কথা ভেসে আসে তার কানে। কিন্তু শ্যামা সে সব বিশ্বাস করে না। শ্যামা শুনেছে নবীন ডাক্তার একদিন নাকি এক পুরুষ রুগী দেখতে গেছল। তারপর সেই রুগীর সে নিয়মিত চিকিৎসা করতো। লোকটির বয়স অল্প ছেলে-পুলে হয়নি। সেই লোকটি একটি স্বতন্ত্র ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে থাকতো। তার স্ত্রীর বয়স অল্প। দেহ সৌষ্ঠব সুন্দর, সেই লোকটি মারা যেতে নবীন ডাক্তার তার সুন্দরী বিধবা স্ত্রীর সঙ্গে অবৈধ প্রেম করে। গোপনে এসে প্রতিদিন তার সঙ্গে মেলামেশা করতো। পাড়ার লোকেরা একদিন ধরে ফেলে, তখন ডাক্তার গাঢাকা দেয়। কিন্তু তখন মেয়েটি অন্তঃসত্বা, রিক্তা, সহায়-সম্বলহীনা। পাড়ার ছেলেরা তখন ঐ নারীদেহ লোভী ডাক্তারকে চেপে ধরে। এই মেয়েটির নাম নাকি মমতা। নবীন ডাক্তার তখন বাধ্য হয়ে কালিঘাটে গিয়ে মালা বদল করে মমতাকে বিয়ে করে। আর এর আগে বি এ পাশ যে মেয়েটিকে নবীন রেজিস্ট্রী করে বিয়ে করেছে, যাকে নিয়ে সে সংসার পেতেছে, যার গর্ভে তার দুটি ছেলে মেয়ে হয়েছে, সেই মেয়েটির নাম নাকি মানসী। এইসব টুকরো টুকরো কথা শ্যামার কানে আসে। শ্যামা তার দুটি ভীরু ডাগর চোখ নীল আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবে একজন চেতন সম্পন্ন পুরুষ জীবনে কতোবার বিয়ে করবে? একজন শিক্ষিত মানুষ যদি এমনি লম্পট হয়

তাহলে সমস্ত সংসার ব্যভিচারে যে ভরে উঠবে! ক্রমশঃ মানুষ তাহলে পশুত্বের সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাবে পশু সমাজের সমান স্তরে। শ্যামাকে সে শাস্ত্র সম্মত ভাবে বিয়ে করেছে। একথা অস্বীকার করতে সে পারে না। যদি কালো বলে অতো ঘেন্নাই করতো তাহলে সে তাকে বিয়ে করলো কেন? এতে শ্যামার কি দোষ? শ্যামা তো যেচে বিয়ে করতে চায় নি। মানসীকে সে বিয়ে বিয়ে করেছে গোপনে। মানসী শিক্ষিতা বলে কি? শ্যামার কথা সেখানে সে নিশ্চয় চেপে গেছে। অথচ হিন্দু আইনে আছে এক স্ত্রী বর্তমান থাকতে সে আর বিয়ে করতে পারে না। তাহলে নবীন আইনের চোখে দোষী। আবার মানসীকে গোপন করে সে বিধবা মমতাকে বিয়ে করেছে। মমতা সুন্দরী বলে রূপের মোহে সে এই বিয়ে করেছে নাকি বিধবা মেয়েকে সর্বনাশ করে পথে বসিয়েছিল আর পাড়ার লোকেদের চাপে পড়ে ভয়ে ভাবনায় সে মমতাকে বিয়ে করেছে। মমতাকে বিয়ে না করে তার বোধ হয় কোন উপায় ছিল না। মমতার কাছেও মানসীকে বিয়ে করার কথা সে নিশ্চয় চেপে গেছে। এতো নিষ্কাম পবিত্র প্রেম নয়। এ তাহলে নবীনের কামার্ততা আর ভোগলোলুপতা। ডাক্তার স্বধর্ম পালন না করে যোগভ্রষ্ট হয়েছে। এখানে জীবনের পূর্ণতা কোথায়? অথচ অশিক্ষিতা শ্যামার আত্মিক শক্তি আছে কতো বৈরাগ্য আছে। শ্যামা তার নিজের জীবন ঈশ্বরের পায়ে উৎসর্গ করেছে। তার জীবনের রিক্ততা আর শূন্যতা এই ভাবেই সে ভুলেছে। প্রকৃতির আনন্দ লোকে, চৈতন্যের আনন্দ বোধে সে ফিরে গেছে। গাছপালা নদী মাঠ নির্জনতার ভিতর জলের পাশে, ছায়ায়, সোঁদা গন্ধ ভরা নরম মাটিতে যেখানে ব্যাঙের ছাতা গজায়, ফাঁড়ি ঘাসের পাতায় শুয়ে থাকে ক্লান্ত শামুক, প্রজাপতি ওড়ে লাল নীল পোকা গুটি গুটি হেঁটে যেন তীর্থযাত্রীর মত দুজ্ঞের্য় কোন মন্দিরের দিকে যায়, যেখানে খরগোস বেজী খটাস শেয়াল আর পাখিরা, আর রঙীন সুন্দর সাপগুলো চলাফেরা করে সেখানে প্রকৃতির খুব কাছে নবীনের পরিত্যক্তা স্ত্রী শ্যামা থাকে। এই প্রকৃতির মধ্যেই সে থাকতে ভালবাসে। যখন সভ্য সমাজে শহরে মানুষের চেতনা ও চৈতন্যের দিগন্ত চারিদিক থেকে শঙ্কাতুরতার ছায়ায় সমাবৃত হয়ে অন্ধকারে সঙ্কুচিত হয়ে আসছে তখন সরলা গ্রাম্য মেয়ে শ্যামা প্রকৃতির আনন্দলোকে এবং মানব চৈতন্যের আনন্দ বোধে বৃক্ষ প্রান্তের বৃন্তে বৃন্তে পুষ্প সম্ভারের মত নিজেকে বিকশিত করেছে। ডাক্তার হয়ে মানুষের প্রকৃত সেবার মধ্যে না থেকে নবীন এক প্রমত্ততার মহাবন্যায় চিরতরে ভেসে গেছে। বিত্ত বৈভব খোঁজার বিকৃতির মধ্যে, বিলাস উল্লাসের মধ্যে সে চিরদিনের তরে ভেসে গেছে। অথচ জন্ম মুখর বাস্তব জগতে সূতিকা গৃহ ও শ্মশানের মধ্যে ভারতের মানুষ অমৃত সন্ধানী। এই মানুষই অপ্রমত্ত আনন্দ চায়। মানুষই বলে "অসৎ থেকে আমাকে সতে নিয়ে চলো, মৃত্যু থেকে আমাকে অমৃতের পথ দেখাও।"

নভোচরত্রয়ী

তপতী চট্টোপাধ্যায়

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা দেখেছে আকাশে অযুত নক্ষত্র
ঘুরেছে তারা প্রচণ্ড গতিবেগে।
অমিত তাদের তেজ অসীম তাদের আলো।
চলছে তারা
চলছে তাদেরে সঙ্গে তাদের আত্মোদ্ভূত অংশ।
তাদের কেউ হয়ে গেছে ঠাণ্ডা তেজহীন।
হারিয়েছে সৃষ্টির জনকের ধর্ম
আবার কেউ টগবগিয়ে ফুটছে
আশা তেজ অমৃতের উদ্বেজনায়।
আমিও দেখেছি আরও তিন নক্ষত্র
চলেছে গ্রহ হতে চন্দ্র প্রান্তরে এগিয়ে
চলেছে বৈপরীত্যের অজানা আকর্ষণে।
আরামের চির অভ্যস্ত টান শক্ত হাতে ছাড়িয়ে
বিপদের নিরাশ্রয় আহ্বানে।
উল্কাবেগে।
সূর্য্য হতে ছিটকে এসেছিল সে।
তারই মত তপ্তপ্রাণকণা পৃথিবীর বুকে।
এসে দেখেছিল মানব জীবনে ভীরুতা ক্লীবতা,
ঘন কুয়াসার মত ঢেকে ফেলেছে মানুষকে।
সূর্য্য থেকে করছে আড়াল।
ভুলিয়েদিচ্ছে তার জন্মপ্রতিশ্রুতি।

আরামের মন্ত্রপুত পানীয় যেমন
দিত ভুলিয়ে সেকালের রাজপুত্রদের
কোথা হতে এসেছে সে
কিসে ছিল জন্মের প্রত্যাশা।
মৃত্যুভয় মৃত্যু নাম ধরে
পৃথিবীর জনে জনে ভয় দেখিয়ে বেড়াচ্ছে
তাদের জীবনকে করে তুলছে অসাড়
তাই তারা জীবন্মৃত।
তোমরা তিনজন
দুহাতে সরিয়ে দিলে সেই কুয়াসা পুঞ্জ
ছুঁড়ে ফেলেদিলে সেই কালার দানবটাকে
যে জুজুর ভয় দেখিয়ে মানুষকে করেছিল শিশু
সূর্য্যের আয়নায় দেখলে নিজেকে।
চিনতে পারলে।
মনে পড়ে গেল জন্মক্ষণের অগ্নিমন্ত্র
জ্বলে উঠলে দৃপ্ততেজের উর্বিশিখায়।
বিশ্ব মানব মনে চিন্ চিন্ করে
ফিরে আসতে লাগলো তপ্ত রক্তের সাড়
জ্ঞান ফিরে আসার সম্ভাবনার
তার ক্লীবদেহে স্পন্দিত হল প্রাণের সাড়া।

শ্রী'শ'—

॥ পুরস্কার ॥

বেঙ্গল ফিল্ম জার্ণালিষ্টস্ এসোসিয়েশন (বি, এফ, জে, এ)-এর সদস্যবৃন্দের ভোটে ১৯৬৯ সালের যে সব চিত্র ও তৎসংক্রান্ত ব্যক্তিদের পুরস্কার বিজয়ী বলে ঘোষণা করা হয়েছিল, তাঁদের আগামী ২৪শে বৈশাখ ১৩৭৭ সন্ধ্যায় "রবীন্দ্রসদন" প্রেক্ষাগৃহে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে পুরস্কৃত করা হবে।

১৯৬৯ সালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্র রূপে নির্ব্বাচিত হয়েছে শ্রীমৃণাল সেন পরিচালিত "ভুবন সোম' নামক হিন্দী ভাষী চিত্রটি। শ্রীসত্যজিৎ রায় পরিচালিত "গুপী গাইন, বাঘা বাইন" চিত্রটি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে।

নীচে এবারকার পুরস্কার বিজয়ীদের সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া হল :—

বছরের শ্রেষ্ঠ দশটি ভারতীয় ছবি (গুণানুক্রমে)— ভুবন সোম, গুপী গাইন বাঘা বাইন, আশীর্বাদ. সরস্বতীচন্দ্র, অনোখী রাত, আরোগ্যনিকেতন, নতুন পাতা, রাহগীর, নান্‌হা ফরিশ্‌টা ও পরিণীতা। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা (বাংলা)—তপেন চট্টোপাধ্যায় (গুপী গাইন…) : হিন্দী : অশোককুমার (আশীর্বাদ)। শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী (বাংলা)—অপর্ণা সেন (অপরিচিত,) হিন্দী : সুহাসিনী মুলে (ভুবন সোম)। শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেতা (বাংলা)—নির্মলকুমার (কমললতা); হিন্দী : অজয় সাহানি (অনোখী রাত)। শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেত্রী (বাংলা)—রমি চৌধুরী (মন নিয়ে); হিন্দী : শশিকলা (রাহগীর)।

অন্যান্য বিভাগে শ্রেষ্ঠত্বের গৌরবে সম্মানিত : চিত্রনাট্য ও পরিচালনা (বাংলা)—সত্যজিৎ রায় (গুপী গাইন); হিন্দী : মৃণাল সেন (ভুবন সোম)। সংলাপ (বাংলা)—সত্যজিৎ রায় (গুপী গাইন); হিন্দি : আনন্দ কুমার (অনোখী রাত)। সংগীত (বাংলা)—সত্যজিৎ রায় (গুপী গাইন); হিন্দী : কল্যাণজী আনন্দজী (সরস্বতী-চন্দ্র); চিত্রগ্রহণ (বাংলা)—সৌম্যেন্দু রায় (গুপীগাইন)

হিন্দী : কে, কে, মহাজন (ভুবন সোম)। ক্যামেরা ফোটোগ্রাফি : হিন্দী—কানাই দে (রাহগীর)। শিল্প নির্দেশনা (বাংলা)—বংশী চন্দ্রগুপ্ত (গুপী গাইন) ; হিন্দী : রবি চট্টোপাধ্যায় (রাহগীর)। সম্পাদনা (বাংলা)—দুলাল দত্ত (গুপী গাইন) ; হিন্দী : গঙ্গাধর নস্কর (ভুবন সোম) ; গীত রচনা (বাংলা)—সত্যজিৎ রায় (গুপী গাইন) ; হিন্দী ইন্দিবর (সরস্বতী চন্দ্র) ; নেপথ্যসংগীত (বাংলা)—মান্না দে (চিরদিনের), প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় (পরিণীতা) ; হিন্দী : মুকেশ ও লতা মঙ্গেশকর (সরস্বতী চন্দ্র)। শব্দগ্রহণ বিভাগে 'গুপী গাইন' ও 'নানক দুখিয়া' চিত্রের কলাকুশলীরা শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কার পাবেন। এ ছাড়া একটি বিশেষ পুরস্কার পাবেন বেবি রাণী নানক দুখিয়া চিত্রে সুন্দর অভিনয়ের জন্য।

বছরের শ্রেষ্ঠ তিনটি বিদেশী চিত্র (গুণানুক্রমে): এ স্পেস ওডিসি, রোজমেরিজ বেবি এবং বনি অ্যান্ড ক্লাইড। এই বিভাগে শ্রেষ্ঠ পরিচালক, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী যথাক্রমে : স্ট্যানলি কুব্রিক (এ স্পেস ওডিসি), সিডনে পয়টিয়ের (টু স্যর, উইথ লাভ), অড্রে হেপবার্ন (ওয়েট আনটিল ডাক)।

খবরাখবর বলছি :

প্রায় দু'মাস অবকাশের পর ২২শে এপ্রিল থেকে "শ্রীলোকনাথ চিত্র মন্দির" তাঁদের নতুন চিত্র "রাজকুমারী"-র চিত্র-গ্রহণ টেকনিসিয়ানস্ ষ্টুডিওতে আবার আরম্ভ করেছেন। উত্তমকুমার ও তনুজা তারকাখচিত এই চিত্রটি ব্যয়বহুল ভাবেই নির্ম্মিত হচ্ছে এবং মনে হয় আঞ্চলিক চিত্র-নির্ম্মাণের ক্ষেত্রে এই "রাজকুমারী" চিত্রটি একটি বিশিষ্ট চিত্র রূপেই পরিগণিত হবে।

সলিল সেন এই চিত্রটির পরিচালক ও চিত্র-নাট্য লেখক এবং রাহুল দেব বর্ম্মণ এই প্রথম বাংলা চিত্রে সুরারোপ করলেন। আর এই চিত্রটির প্লে ব্যাক্ গায়ক-গায়িকার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য নাম হচ্ছে : লতা মঙ্গেশকর, আশা ভোঁসলে ও কিশোরকুমার।

চিত্রটির অন্যান্য ভূমিকাগুলিতে আছেন : ছায়া দেবী পাহাড়ী সান্যাল, অসীতবরণ, দীপ্তি রায়, তরুণকুমার, জহর রায়, ভানু ব্যানার্জি প্রভৃতি।

• • • •

শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স প্রাঃ লিঃ হচ্ছেন "রাজকুমারী"-র একমাত্র পরিবেশক।

* * *

"ফিল্ম-ও-পাব" (Film-O-Pub) নামক একটি নতুন সংস্থা গঠিত হয়েছে। তাঁদের উদ্দেশ্য হচ্ছে নতুন ধরনের পরীক্ষামূলক সর্ট ফিচার্স (Shart Feature) চিত্র নির্ম্মাণ করা। এঁরা প্রথম যে চিত্রটি নির্ম্মাণ করেছেন সেটি হচ্ছে "Latent" নামক একটি দু' রিলের চিত্র। চিত্রটি পরিচালনা করেছেন বিপ্লব রায়চৌধুরী। এই সংস্থার পরবর্ত্তী দু' রীলের চিত্রটি হবে স্বর্গত সুকান্ত ভট্টাচার্যের "একটি মোরগের কাহিনী" অবলম্বনে।

* * *

Candidan Films একটি প্রামাণ্য চিত্র নির্ম্মাণ করেছেন। চিত্রটির নাম "Nature's Gitt to Mankind" একটি লাক্ষার বিষয় বস্তু নিয়েই নির্ম্মিত হয়েছে।

* * *

একটি শিল্পীর কথা

অন্তরের আকুতি যে প্রকাশ করতে পারে না, তার মনের ভাব ভাষায় মুখরিত হয়ে ওঠে না—কারণ সে জন্মবধির। তার শ্রবণশক্তির অভাবে তার বাকশক্তিও পূর্ণতা লাভ করেনি, কিন্তু সে জন্মেছে সহজাত শিল্পী মন নিয়ে; তাই তার মনের ভাবকে সে প্রকাশ করে কাগজের, ক্যান্‌ভাসের বুকে রংয়ের ছোঁয়ায়। আর এই বালক বয়সেই সে পেয়েছে শিল্পীর মর্যাদা—তার আঁকা কুড়িটি চিত্রের এক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে "আকাদেমী অব ফাইন্‌ আর্ট্‌স্‌" ভবনে। ১৬ বৎসর বয়স্ক এই মূকবধির বালক-শিল্পীর নাম শ্রীমান্‌ সুনির্মল বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীমান্‌ সুনির্মল ১৯৫৯ সালে ডেফ্‌ এণ্ড ডাম স্কুলে ভর্তি হয় এবং চিত্রাঙ্কনে তাঁর সহজাত পারদর্শিতার পরিচয় দিতে আরম্ভ করে। ১৯৬৪ সাল থেকেই তার অঙ্কন প্রতিভার বিকাশ ঘটতে থাকে এবং বার্লিনের ইণ্টারন্যাশনাল আর্ট একজিবিসন, কোরিয়ার আফ্রো-এসিয়ান হ্যাণ্ডিক্যাপ্ট চিল্‌ড্রেন্স আর্ট একজিবিসন, লণ্ডনের কমনওয়েলথ সোসাইটি ফর দি ডেফ্‌, কলিকাতার চিলড্রেন্‌স্‌ ইণ্টারন্যাশনাল আর্ট একজিবিসন প্রভৃতি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে তার ছবি পাঠানো হয়। তাছাড়া ওয়েষ্টবেঙ্গল ষ্টেট ইয়ুথ ফেস্‌টিভ্যাল্‌, ক্যালকাটা ইউনিভারসিটি ইনস্‌টিটিউট আর্ট একজিবিসন, মডার্ণ ফোটোগ্রাফিক্‌ এণ্ড আর্ট সোসাইটি অব দি অল ইণ্ডিয়া ডেফ্‌ চিল্‌ড্রেনস্‌ আর্ট একজিবিসন, ইণ্টার স্কুল আর্ট কম্‌পিটিসন, ওয়াই, এম, সি, এ, আর্ট এণ্ড হ্যাণ্ডি-ক্রাফট্‌স্‌ একজিবিসন প্রভৃতি বিভিন্ন চিত্র-প্রদর্শনীতে সুনির্মলের অঙ্কিত চিত্র পুরস্কার লাভ করে। প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীও, সি, গাঙ্গুলী প্রভৃতি অনেকেই শ্রীমান্‌ সুনির্মলের চিত্র-অঙ্কন পদ্ধতির বিশেষ প্রশংসা করেছেন।

আকাদেমী অব ফাইন আর্টস ভবনে সুনির্মলের যে চিত্রগুলির প্রদর্শনী হল তা শিল্পরসিক অনেক দর্শকেরই প্রশংসা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে। চিত্রগুলির মধ্যে সিংমিষ্ট এণ্ড অব দি ডে, ল্যাণ্ডস্কেপ্‌ নং ২, প্‌ মাইন উইণ্ডো, আফটার দি রেন্‌, মেরী গো রাউণ্ড, দি ডেক্‌ প্রভৃতি চিত্র বিশেষ প্রশংসার দাবি করে।

আমরা এই প্রতিভাবান্‌ মূকবধির শিল্পীর উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি এবং আশা করি উত্তরকালে এই শিল্পীর যশ দেশে বিদেশে বিস্তার লাভ করবে।

পুণার 'ফিল্ম ইনষ্টিটিউট অফ ইণ্ডিয়া' প্রসঙ্গে

:: বাদলকুমার বোধক ::

২৩শে জানুয়ারী আমাদের কাছে স্মরণীয় দিন। এই স্মরণীয় দিনে পুণার ফিল্ম ইনষ্টিটিউট অফ ইণ্ডিয়া ষ্টুডেণ্ট ফিল্ম শো'র (১৯৬৯) আয়োজন করেছিলেন দক্ষিণ কলকাতার প্রিয়া সিনেমায়। আমরা চিত্রসাংবাদিকরা ছাত্রদের তোলা ছবি দেখলাম সকালে। আর আমাদের নিজস্ব সংস্থা বেঙ্গল ফিল্মজার্ণালিষ্টস এ্যাসোসিয়েশন সন্ধ্যায় আনন্দবাজার পত্রিকার কার্যালয়ে আমাদের সভাপতি অশোককুমার সরকারের নেতৃত্বে ইনষ্টিটিউটের অধ্যক্ষ জগৎ মুরারীর সংগে আলোচনা সভায় বসেছিলাম। সকালের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলা চিত্রজগতের স্বনামধন্য পুরুষ বি, এন, সরকার। উদ্বোধনানুষ্ঠানে সত্যজিৎ রায়, সুশীল মজুমদার, অমর মল্লিক, অমরেন্দ্র দাস, শমিত ভঞ্জ, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি সুধী-বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ছবি সম্পর্কে কিছু বলার আগে জগৎ মুরারীর সংগে যে আলোচনা হয়েছিল সে সম্পর্কে কিছু বলি। পরে ছবির প্রসঙ্গে আসবো।

জগৎ মুরারী বললেন, আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা যে

ধারায় এখানে শিক্ষা পাচ্ছে তা উন্নত ধরনের। আমরা চেষ্টা করছি যদি কিছুও তাদের কাজে লাগে তাহলে নিজেদের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো।

সদা হাস্যোজ্জ্বল শ্রীমুরারী বললেন, আমাদের শিক্ষা যে মোটামুটি সার্থক হচ্ছে তার প্রমাণ আমরা বিচ্ছিন্ন সূত্র থেকে পাচ্ছি। যেমন ধরুন, ইতিপূর্ব এখানকার উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীরা স্বনামধন্য পরিচালকদের অধীনে বিভিন্ন বিভাগে কাজ করছেন। মৃণাল সেনের আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রাপ্ত ছবি "ভুবন সোম"-এ আমার ছাত্র-ছাত্রীরা শুধু অভিনয়ই করেননি টেকনিক্যাল কাজও দক্ষতার সংগে করেছেন।

চতুর্থ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসবে "ভুবন সোম"-এর পুরস্কার প্রাপ্তির ব্যাপারে রাজকাপুরের মন্তব্য সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য জানতে চাইলে তিনি বলেন, রাজকাপুর বহু হিট ছবি তৈরী করেছেন একথা সত্যি। তবে শিল্প গুণ সমন্বিত ছবি একটিও করেছেন কি ?"

এই আলোচনা সভা ছিল একান্তই ঘরোয়া এবং খুবই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান। শ্রীমুরারী অনুরোধ করলেন, আপনারা যদি আমাদের প্রতিষ্ঠানে বেড়াতে যান তাহলে আমি বাধিত হবো।

প্রিয়া সিনেমায় পরিচয় হোলো সদ্য পাশ করা অভিনেতা ছাত্র ভাস্কর চৌধুরীর সংগে। ভাস্করের অভিনয় দেখলাম 'প্রিয়া' দি এপিট্যাপথ, গোল্ড স্পট প্রভৃতি ছবিতে। তাঁর অভিনয় আমাদের ভালো লেগেছে। ভাস্কর জানালো কথা প্রসঙ্গে যে, সত্যজিৎ রায়ের আগামী ছবি 'প্রতিদ্বন্দ্বী', তপন সিন্হার হিন্দী ছবি 'আপনজন' এবং অরুন্ধতী দেবীর 'মৃগয়া' তে অভিনয় করার জন্য সে সুযোগ পেয়েছে। আমরা তাকে পূর্বাহ্ণেই অভিনন্দন জানিয়ে রাখলাম। বাংলা ছবিতে এই নবাগত শিল্পীটি প্রতিষ্ঠিত হোক এই আশা সর্বান্তঃকরণে রাখি। ভাস্কর তাঁদের বাড়ীতে যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছে। ভবিষ্যতে তাদের যাদবপুরের বাড়ীতে যাবার ইচ্ছা রইলো।

এবার আসি ছবির কথায়।

ছোট বড় মিলিয়ে অনেকগুলি ছবি দেখার সুযোগ সেদিন আমাদের হয়েছে। তার মধ্যে 'পিয়া কা ঘর', ডিসএ্যাপারন্টেড, দি এপিট্যাপথ, প্রিয়া এবং আওয়ার ইয়ুথ ভালো লেগেছে। মনে দাগ কাটে কাহিনী, পরিচালনা, অভিনয়, চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনার কাজ।

গুরুদেবের কবিতা অবিলম্বনে গড়ে উঠেছে ডিস্এ্যাপয়েন্টেডের-এর কাহিনী। নায়কের চিঠি পেয়ে নায়িকা তার সংগে দেখা করতে যাচ্ছে। ট্রেনে উঠেই তাঁর নজর পড়েছে এক নবদম্পতির প্রতি। ট্রেন চলতে শুরু করেছে। নায়িকার মনে টুকরো টুকরো ঘটনা ভেসে উঠছে। আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। নির্দিষ্ট স্থানে যথা সময়ে হাজির হোলো নায়িকা। কিন্তু নায়কের সন্ধান নেই। ষ্টেশনে ওভারব্রীজের ওপর বার বার পায়চারী করতে লাগলো নায়িকা। নায়ক আর এলো না। নিরুপায় হয়ে বহু আদরে ও যত্নে খোঁপায় গোঁজা ফুলটি ফেলে দিয়ে একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে নায়িকা চলে গেল।

গুরুদেবের কবিতার ভাবানুসরণে এর চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনা করেছেন কাওয়ালজিৎসিং। সংলাপহীন এই কাহিনীর নায়িকার চরিত্রে শোভনা সা'র অপূর্ব অভিনয় মনে দাগ কাটে। তাঁর নীরব অভিব্যক্তি যে কোনো প্রতিষ্ঠিত অভিনেত্রীর অভিনয়কে হার মানিয়ে দেবে।

দি এপিট্যাপথের কাহিনীতে পেয়েছি একটি অপরিচিত লোক মরে রাস্তায় পড়ে আছে। অনেক পথচারী তাঁর নিজের মাথার টুপি খুলে অন্যান্য পথচারীদের কাছে সেই হতভাগ্যটির সৎকারের কথা বলে পয়সা সংগ্রহ করছেন। অনেকে অনেক রকম প্রশ্ন করছেন। এমন সময় একজন ভদ্রলোক এসে ভীড় ঠেলে ভেতরে ঢুকে বেশ জোরালো বক্তৃতা দিলেন। তারপর একটি দশটাকার নোট সেই সংগ্রাহককে দিয়ে অনুরোধ করলেন উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে : আপনারা দয়া করে আমার কথা মনে রাখবেন। কারণ, আমি আগামী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি।

ঐ ভদ্রলোক চলে যেতে পুলিশ এলো। কিছু সাক্ষীর সই নিলো। ইতিমধ্যে যিনি পয়সা সংগ্রহ করছিলেন তিনি পুলিশ দেখেই স্থান ত্যাগ করেছেন। পুলিশ ভ্যানে করে মৃতদেহ তুলে নিয়ে চলে গেল।

গুরুচরণ সিং পরিচালিত এই ছবিটির কাহিনী সত্যিই মর্মস্পর্শী। তাছাড়া চিত্রগ্রহণ ও শব্দগ্রহণ ছবিটির মর্যাদা বাড়িয়েছে।

'প্রিয়া' কাহিনীর নায়িকা একজন প্রফেসারের স্ত্রী। একদিন ঐ প্রফেসারের একজন ছাত্র তাঁর সংগে দেখা করতে আসে। প্রিয়ার সংগে তাঁর পরিচয় হয়।

প্রিয়া তাঁকে নিয়ে কল্পনার জাল বুনতে থাকেন। আবার তাঁর নিজের ছাত্রী জীবনের কথাও মনে পড়ে। সহপাঠীদের সংগে একদিন যে তিনি প্রেম-সাগরে হাবুডুবু খেতেন সে কথাও তাঁর মানসলোকে উদিত হয়।

জন আব্রাহাম রচিত ও পরিচালিত এই কাহিনীটিতে মাঝে মাঝে ফ্লাশ ব্যাকের সুষ্ঠু ব্যবহার সত্যিই হৃদয়গ্রাহী তাছাড়া অভিনয়ে প্রিয়ার ভূমিকায় রীতা সালুজা যে মনন-শীল অভিনয় করেছেন তা দ্রষ্টব্য। ভাস্কর চৌধুরী এবং সুরেশ কুমারও সুঅভিনয় করেছেন।

এস, এন, ধীর পরিচালিত ও চিত্রনাট্যায়িত গোগু স্পটে পেয়েছি আমরা আধুনিক তরুণ-তরুণীর যৌবনোজ্জ্বল প্রেমের কথা। পরিচালক সেই প্রেমকেই চূড়ান্তভাবে তুলে ধরেছেন। আমরা যৌবনের যেদিকটির প্রকাশ এতে দেখেছি তা passion-এ পরিণত হয়েছে। অতএব, বলতে দ্বিধা আমরা করি না যে, এই ছবিতে Sexএর সুড়সুড়ি একটু বেশী মাত্রায় প্রতিফলিত হয়েছে। মুখ্য ভূমিকাদ্বয়ে ভাস্কর চৌধুরী ও রীতা সালুজার অভিনয় সংবেদনশীল মনে দাগ কাটে।

ডিভ্যাসী পরিচালিত ও চিত্রনাট্যায়িত "আওয়ার ইয়ুথ" ছবিটির বিভিন্ন ছাত্র-ছাত্রীর ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছে। তাঁদের প্রশ্ন করা হয়েছে "তাঁরা শিক্ষা গ্রহণ করছেন কেন?"

প্রত্যেকে প্রত্যেকের মন্তব্য অতি সংক্ষেপে প্রকাশ করেছেন। অনেকে ছাত্রীকে বলতে শুনেছি—'বিয়ের জন্য লেখাপড়া শিখছি।' এই ছবিটির মাধ্যমে আমরা আমাদের ছাত্রদের মানসিকাবস্থার কথা মোটামুটি জানতে পেরেছি।

সব চেয়ে মনে দাগ কেটেছে ছয় রীলের ছবি—'পিয়া কা ঘর'।

বিশেষত্ব হোল—

এটির পরিচালনা করেছেন ৫ জন, সম্পাদনা করেছেন ১১ জন, চিত্রগ্রহণ করেছেন ১০ জন ও শব্দগ্রহণ করেছেন ১০ জন। সমবেতভাবে তোলা এই ছবিটি সত্যিই হৃদয়-গ্রাহী।

বোম্বাইয়ের যে গৃহ সমস্যা মধ্যবিত্ত সমাজকে ভাবিয়ে তুলেছে তার রূপটি আলোচ্য ছবি 'পিয়া কা ঘর' এ তুলে ধরা হয়েছে। এ সমস্যা শুধু বোম্বাইয়ের নয়—সারা ভারতের।

শোভনা সা (রোহিণী), রেহানা সুলতান (ভাবী), সুরেশ কুমার (দিনকর) এবং আতম প্রকাশের (রত্নাকর) অভিনয় ছবিটিকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে।

এই বিশেষ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করার জন্য প্রেস ইনফর-মেশন ব্যুরোকে অভিনন্দন জানালাম।

সাহিত্য সংবাদ

শ্রীযুক্তা পুষ্পদেবী সরস্বতী, শ্রুতি ভারতী সাহিত্য জগতে
পরিচিতা। তাঁর এগারোখানি উপনিষদ কাব্যানুবাদ গ্রন্থ
ও প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম ঈশ, কেন, কঠোপনিষদ
য়াইউনিভারসিটি হইতে লীলা পুরস্কার অর্জন করিয়াছে,
তাহা "উপনিষদ নির্মাল্য" নামে প্রকাশিত হয়েছে।
তাহার পর তাঁহার কাব্যানুবাদ প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য
তৈত্তিরীয়ো, ঐত্তেরীয়োপনিষদ একত্র পাঁচখানি
উপনিষদ কাব্যানুবাদ "উপনিষদ নৈবেদ্য" নামে (মূল্য ২৲
টাকা) প্রকাশিত হয়েছে। ইতিমধ্যে বইগুলি পশ্চিমবঙ্গ
সরকার কর্তৃক লোকশিক্ষার জন্য মনোনীত হইয়া অর্থ
সাহায্য পাওয়ায় মূল্য সুলভ হয়েছে। এরপর তাঁহার
শ্বেতাশ্বতর ও ছান্দোগ্য উপনিষদ কাব্যানুবাদ উপনিষদ্
অর্ঘ্য" নামে (মূল্য ৩৲ টাকা) প্রকাশিত হয়। এই
বইখানিতে তিনি ভট্টপল্লী নিবাসী পণ্ডিত মণ্ডলীর নিকট
হইতে সরস্বতী উপাধি পান। এরপর বৃহদারণ্যক উপনিষদ
কাব্যানুবাদ উপনিষদ "অঞ্জলি" নামে (মূল্য—৩৲ টাকা)
প্রকাশিত হয়। সম্পূর্ণ গীতার অনুবাদ ব্যাখ্যা ও শব্দার্থ-
সহ "অমৃতগীতা" (মূল্য—৫৲ টাকা) প্রকাশিত হয়।
এরপর ডাঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী ও ডাঃ মহানামব্রত
ব্রহ্মচারী "শ্রুতি ভারতী" উপাধিতে সম্মানিত করেন।
বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ সুকুমার সেন এই
বইগুলি সম্বন্ধে বলেন "শাস্ত্রের কৌটায় আঁটা
সংস্কৃত ভাষার কুলুপ দেয়া যে অধ্যাত্ম চিন্তা প্রায়
অনেকেরই নাগালের বাইরে ছিল তাহা কৌটা খুলিয়া
ব্যবহারোপযোগী করিয়া ধরিয়া দিয়া পুষ্পদেবী একটি মহৎ
কাজ করিয়াছেন। গভীর কথা সহজ ভাষায় বলিয়া তিনি
অপূর্ব কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।"

[প্রাপ্তিস্থান মহেশ লাইব্রেরী কলেজস্কোয়ার, কলিকাতা]

চিকিৎসক সমাজ—সম্মেলন ও পর্যটন সংখ্যা

অ্যালোপাথ, হোমিওপাথ, আয়ুর্বেদীয়, ইউনানী
চিকিৎসকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পরিচালিত কোন সঙ্ঘ
বা পত্রিকা চালানর প্রয়াস বোধহয় এই প্রথম।

বস্তুতঃ পত্রিকাটি খালি বৈজ্ঞানিক রচনার জন্যই নয়,
সাহিত্যপত্র হিসাবেও খ্যাতি দাবী করতে পারে। বাঁধা ধরা
কঠোর অনুশীলিত জীবন থেকে—বাইরে এসে ডাক্তাররাও
যে সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারেন, তার পরিচয় এই মাসিক
পত্রিকাটি পড়লে বোঝা যায়।

ডাক্তারদের ভেতর থেকে আমরা বনফুল, নীহার গুপ্তর
মত প্রথিতযশা সাহিত্যিকের আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করেছি।
তাঁরাও এই পত্রিকাটির লেখক। এঁরা ছাড়া ডাঃ বিশ্বনাথ
রায়, ডাঃ অরুণকুমার দত্ত, ডাঃ অমিয়কুমার হাতি ও
রবীন্দ্র কবিরাজ প্রভৃতির লেখাতে পত্রিকাটি সমৃদ্ধ।

তবে পত্রিকাটির ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদপট আরও
উন্নতমানের হবে বলে, আমরা আশা করি এবং কামনা
করি চিকিৎসক সমাজের এই প্রচেষ্টার সাফল্য।

শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

[প্রকাশক—ডাঃ অমল ঘোষ হাজরা, ১৫১, ডায়মণ্ড
হারবার রোড, কলিকাতা—৩৪]

শ্রমিক সমস্যা ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন

—সমর দত্ত

শ্রমের মর্যাদাদান আজকের দুনিয়ায় সর্বজনস্বীকৃত।
শ্রমের দ্বারাই যাঁদের রুজিরোজগার তাঁরাই শ্রমিকশ্রেণীতে
চিহ্নিত হয়েছেন। সেই শ্রমিকদের সমস্যাবলী নানাভাবে
ও নানাদিক থেকে সমাধানের চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছে
দেশেবিদেশে। বিভিন্ন দেশের নানান কর্মকেন্দ্রে শ্রমিক

সংস্থা গঠিত হয়েছে ও হচ্ছে। এই যে শ্রমিক শ্রেণীর শ্রমজীবনের প্রতিদিনের সমস্যাবলী এবং তার সমাধান করার জন্যে শ্রমিক সংস্থা গঠন ও শ্রমজীবী মেহনতী মানুষের স্বার্থে আন্দোলন পরিচালন—সেই প্রসঙ্গে সহজ সুন্দর বাংলা ভাষায় শ্রীসমর দত্ত আলোচনা করেছেন। তাঁর এই স্বল্পপরিসর গ্রন্থে তিনি আটটি প্রবন্ধ গ্রথিত করেছেন। ট্রেড ইউনিয়ন ও পলিটিক্স, শিল্প বিরোধ ও শিল্পে শান্তি, শিল্প পরিচালনায় শ্রমিকের ভূমিকা, শিল্প শ্রমিকের অভাব অভিযোগ দূরীকরণ পন্থা, ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ও শ্রমিক শিক্ষা পরিকল্পনা, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ও ইউনিয়ন কর্মীদের কর্তব্য, অটোমেশন ও ভারতের শ্রমিকশ্রেণী এবং ব্যাঙ্ক-কর্মচারী আন্দোলনের গোড়ার কথা প্রভৃতির প্রসঙ্গে লেখক আলোচ্য গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তিনি নিজে শ্রমিক আন্দোলনে শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখের সহযোগীরূপে বিশেষ অভিজ্ঞ এবং নানা পত্র-পত্রিকায় তিনি এই প্রসঙ্গে রচনাও প্রকাশ করে থাকেন। তাঁর আলোচনাগুলি আজকের দুনিয়ার সর্বাপেক্ষা জরুরী সমস্যা প্রসঙ্গে বিবৃত। তাই আশা করি তাঁর শ্রমিক সমস্যা ও শ্রমিক সংস্থার আন্দোলন প্রসঙ্গের এই গ্রন্থটি পাঠক সমাজে বিশেষ ভাবেই সমাদৃত হবে।

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

[অ্যাব্রফ বিটা পাবলিকেশন ১৬-১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য সাড়ে তিন টাকা।]
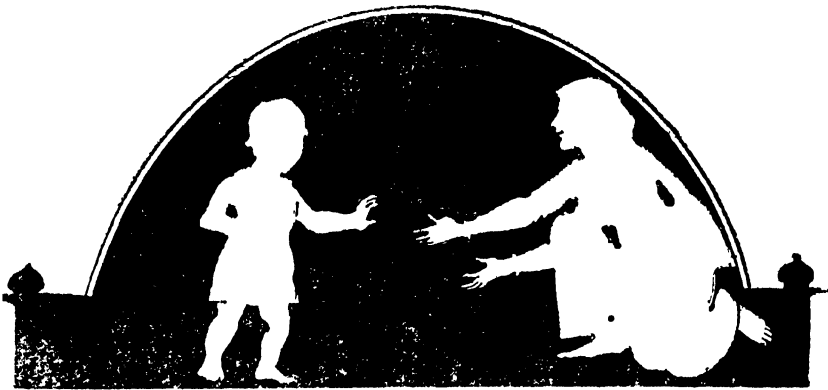
সম্পাদক—শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩।১।১, বিধান সরণী, (পূর্বতন কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট্ কলিকাতা ৬, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

তাল তাল উপন্যাস ও গল্প-গ্রন্থ

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়
পিপাসা ৪-৫০
তৃতীয় নয়ন ৪-৫০

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়
এক জীবন অনেক জন্ম ৬-৫০
নীলকণ্ঠী ৫৲
সরোবর ২.৭৫

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়
প্রথম প্রহরী ৩৲

সুধাংশুকুমার গুপ্ত
দিব্যদৃষ্টি ২-৫০

অনুরূপা দেবী
গরীবের মেয়ে ৪-৫০ বিবর্তন ৪৲
রামগড় ৪-৫০ বাগ্দত্তা ৫৲
পোষ্যপুত্র ৪-৫০ পথের সাথী ৩৲
হারানো খাতা ৩৲

পুষ্পলতা দেবী
নীলিমার অশ্রু ৩-৫০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
নীলকণ্ঠ ৩-৫০

শক্তিপদ রাজগুরু
খাসাংসি জীবানি ১২৲
জীবন-কাহিনী ৪-৫০
কুমারী মন ৩-৫০
গৌড়জনবধূ ৫-৫০
মণিবেগম ৬-২৫
কাজল গাঁয়ের কাহিনী ৫৲

জ্যোতির্ময়ী দেবী
মনের অগোচরে ২৲

ভাস্কর
রুগ্ন অন্ধ শিশু ২-৫০

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র
পরাজয় ২৲

রাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়
কলঙ্কিনীর খাল ২-৫০

ননীমাধব চৌধুরী
দেবানন্দ ৬৲

প্রফুল্ল রায়
সীমারেখার বাইরে ১০৲
নোনা জল মিঠে মাটি ৮-৫০

নরেন্দ্রনাথ মিত্র
পতনে উত্থানে ৫৲
সুধা হালদার ও সম্প্রদায় ৩-৭৫

ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়
অচল প্রেম ৪৲

পঞ্চানন ঘোষাল
একটি অদ্ভুত মামলা ৫৲
একটি নির্মম হত্যা ২-৫০
অপ্রস্তুত পৃথিবী ৫৲
একটি নারী-হত্যা ৩৲
অন্ধকারের দেশে ৫৲

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
নতুন আলো (গোর্কীর অনুবাদ) ২-৫০
মুস্কিল আসান ২-৫০

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রাচীনতার স্বাদ ৪৲
সহরতলী (১ম পর্ব) ২৲

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
অগ্নি-শিখা ৩৲
ফুলের মাশুল ১-৫০

পৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য
বিবস্ত্র মানব ৫-৫০
কার্টুন ২-৫০
দেহ ও দেহাতীত ৪৲
পতঙ্গ ১ম—২-৫০, ২য়—২-৫০
শ্রেষ্ঠ গল্প (স্ব-নির্বাচিত) ৪৲

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত
ভুলের ফসল ২৲
খেয়ালের খেসারৎ ২৲
বংশধর ২৲

ভোলা সেন
উপন্যাসের উপকরণ ২-০

অমরেন্দ্র ঘোষ
পদ্মদীঘির বেদেনী ৩৲
দক্ষিণের বিল ২য় ৪৲

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
বিরাজ-বৌ ৩-০০ রামের সুমতি ১-২৫ বিন্দুর ছেলে ১-২৫
পথনির্দেশ ১-২৫

সমরেশ বসু
ছিন্নবাধা ৭-৫০

মায়া বসু
অগ্নিবলয় ২-৭৫

নিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
রাশিয়ান শো ৪-৭৫

রামপদ মুখোপাধ্যায়
কাল-কল্লোল ৪-৫০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
কালকূট ৩৲ কানু কহে রাই ২-৫০ কাঁচামিঠে ৩৲ গৌড়-মল্লার ৪-৫০ বিজয়লক্ষ্মী ২-৫০
বহ্নি-পতঙ্গ ৩-৫০ পঞ্চভূত ২-৫০
ঝিন্দের বন্দী ৫৲ শাদা পৃথিবী ৩৲ ছায়াপথিক ৩৲
চুয়াচন্দন ৩-২৫

প্রবোধকুমার সান্যাল
নবীন যুবক ২-৫০ কলরব ২৲
প্রিয়বান্ধবী ৪৲
কয়েক ঘণ্টা মাত্র ২৲

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
গন্ধরাজ ৩৲

উপেন্দ্রনাথ দত্ত
মকরুল পাঞ্জাবী ২৲

বনফুল
পিতামহ ৬৲
মত্রএতৎপুরুষ ৩৲

সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য
মিলন-মন্দির ৬

প্রভাত দেবসরকার
অনেক দিন ৩-৫০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
কাক-জ্যোৎস্না ৩